কুশদহ।

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, গৈপুর ইছাপুর প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি ও

বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক

মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ

১৩১৫ সালের আশ্বিন হইতে

১৩১৬ " ভাদ্র পর্য্যন্ত।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

২৮।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্য্যালয়।

অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা।

কুশদহের প্রথম বর্ষের সূচী।

মাতৃমূর্ত্তি।

KUNTALINE PRESS.

কুশদহ।

"তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব ;
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ?"

প্রথম বর্ষ। | আশ্বিন, ১৩১৫। | ১ম সংখ্যা।

বন্দনা ও প্রার্থনা।

ভগবৎপ্রেরণা মানব-অন্তরে উদিত হইয়া যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাহা আকার ধারণ করিয়া বাহিরে কার্য্যে প্রকাশিত হয়। যাঁহার প্রেরণা অন্তরে ঘনীভূত হইয়া আজ 'কুশদহ' আকারে দেশের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল, সর্ব্বাগ্রে সেই জগৎপ্রসবিতা পরম পিতা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহার অপার করুণা ও মঙ্গলভাব ধ্যান করি এবং প্রার্থনা করি যে, এই 'কুশদহ' যেন সমদর্শী ও সংযতবাক্ হইয়া সদা সত্য ও ন্যায়, প্রেম ও প্রীতির সহিত দেশের সেবা করিতে পারে। বিধাতা যে গূঢ় অভিপ্রায়ে আমা-দিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন আমরা তাহা সম্যগ্রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তিনি দিন দিন সেই মঙ্গল অভিপ্রায় আমাদিগের মধ্যে প্রকাশ করুন। তাঁহার নামের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হউক।

কুশদহ প্রচারের উদ্দেশ্য ও সম্পাদকের নিবেদন।

কুশদহবাসীর মধ্যে বিশেষ ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উদ্দীপনা করাই 'কুশদহ' প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন জন্য সমাজ-সংস্কারবিষয়ক এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল তত্ত্বেরই ইহাতে আলোচনা হইতে পারিবে। রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যদিও কুশদহের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু দেশের সাধারণ অবস্থা ও শিক্ষার সহিত যে সকল বিষয়ে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, তাহার আলোচনা পরিত্যক্ত হইবে না।

'কুশদহ' পত্রখানি যাহাতে দেশের সকলের আদরের বস্তু হয় সম্পাদকের ইহা একান্ত ইচ্ছা, এজন্য সমস্ত কুশদহবাসীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই—যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, দয়া করিয়া তিনি সেই বিষয় যেন কুশদহে লেখেন। সকলের যত্ন ভিন্ন 'কুশদহ' কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে না, তবে সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে বাধ্য হইলাম যে, অসার বাক্যসর্ব্বস্ব প্রবন্ধ সকল, যাহাতে লেখকের জীবন ও চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য নাই এমত কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করা যাইবে না। প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকই দায়ী থাকিবেন।

'কুশদহ' গোবরডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত হইলেও, খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের প্রতি বিশেষ কর্ত্তব্য থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে কুশদহ যাহাতে 'মধ্য বঙ্গবাসীর' (Central Bengal) আদরের বস্তু হয় তাহার চেষ্টার ত্রুটি করা হইবে না। মধ্য বঙ্গবাসী সহৃদয় মহোদয়গণ সর্ব্ব প্রকারে ইহার প্রতি দয়া দৃষ্টি রাখিবেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইবে তাহা উদার ধর্ম্ম বিষয়েই লেখা হইবে এবং সকল শাস্ত্র ও সকল সম্প্রদায়ের যাহা সারতত্ত্ব তাহার আলোচনা হইবে। বিশেষ বিশেষ সাধন-তত্ত্বের কথাও বলা হইবে, কিন্তু কোন ধর্ম্মের প্রতি কটূক্তি বা শ্লেষ করা হইবে না।

সত্যভাবে সমাজতত্ত্বের আলোচনায়—অনেক সময় নিদ্রিত সমাজের জাগরণ জন্য ইহাতে তীব্র সমালোচনার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু

তাহাতেও বাক্যের সংযম ও ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে এবং কোন বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইবে না।

কুশদহ বা কুশদ্বীপ।

কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বে ৩৬ মাইল দূরে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গৈপুর ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহকে কুশদহ বলা হয়।

কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও ঐতিহাসিক ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়। আজ তাহার সুদীর্ঘ বর্ণনা করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না; তবে 'কুশদহ' নাম সম্বন্ধে ও তদন্তর্গত গ্রামসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হইল।

কুশদহকে কুশদ্বীপও বলা হয়। নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ এবং কুশদ্বীপের মধ্যে কুশদ্বীপের নাম এক সময় বিখ্যাত ছিল।

সমগ্র হিন্দুস্থান যখন মোগলকুলরবি আকবর শাহের অধীন হইল, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা তোডরমল্ল নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী, অর্থাৎ বর্ত্তমান চৌবেড়িয়ার কায়স্থ-কুল-ভূষণ রাজা কাশীনাথ রায়ের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। রাজা কাশীনাথ রায় মোগল-সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাঠানদিগেরে বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাট্ হইতে 'সমর সিংহ' উপাধি লাভ করেন। রাজা কাশীনাথের নামে জলেশ্বর ও ইছাপুর প্রসিদ্ধ।

রাজা কাশীনাথের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম শোনা যায়। ইনিই ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ। রাজা কাশীনাথের প্রভাবে কুশদ্বীপ সমৃদ্ধিশালী হয়। কালে তাঁহার অভাবে রাজার সম্পত্তির অংশ ইছাপুর চৌধুরী বংশে ন্যস্ত হয়।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ আকবরের শেষ জীবনের অতি দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত

সমগ্র দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চনগর বর্ত্তমান কাঁচ্‌ড়াপাড়া এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাজা কাশীনাথ রায়ের মৃত্যুর পর রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছেন শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে শাসন করিবার মানসে সসৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া কেবল প্রতাপপুর নামে ঐ স্থানটি বিখ্যাত করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রামে ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিদ্যার জ্যোতিতে যখন নবদ্বীপ সমুজ্জ্বল, তখন কুশদ্বীপ অপেক্ষা নবদ্বীপের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল; আবার শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়াও নবদ্বীপ সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কুশদ্বীপ, কুশদহ-সমাজ নামে খ্যাত হইয়াছিল। কুশদহের অন্তর্গত এই সকল গ্রামের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—জলেশ্বর, ইছাপুর, খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, হয়দাদ্‌পুর, গৈপুর, শ্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছী, বালিয়ানী, মল্লিকপুর, ধর্ম্মপুর, চৌবেড়িয়া, ভুলোট, বেড়ি, রামনগর, লক্ষ্মীপুর, বেড়গুম্‌, ঘোষপুর, চারঘাট, গয়েশপুর প্রভৃতি।

খাঁটুরানিবাসী বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বহু যত্ন চেষ্টায় কুশদহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া 'কুশদ্বীপ কাহিনীর' ২০০ শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিয়া পরলোকগত হন। তৎপরে বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত নিজ ব্যয়ে তাম্বুলী জাতির বিশেষ বিবরণ সহ "খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী" নামে একখানি পুস্তক ১৩০৮ সালে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক বিষয় জানা যায়। আমরা নিম্নে "কুশদ্বীপ কাহিনী" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, কুশদ্বীপ সমাজ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে, বাণিজ্যের স্ফুটিত লাবণ্যে, বলবীর্য্যের অমোঘ প্রতাপে এবং দেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বঙ্গীয় অপরাপর সমাজ অপেক্ষা যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ আর অন্য কোন সমাজেই পরিদৃষ্ট হয় না।

বলিতে কি, তৎকালে এই কুশদ্বীপ সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; এমন কি, ইহা তখন নবদ্বীপকেও কুক্ষিতলস্থ করিয়া লইয়াছিল। সেই জন্যই অস্মদ্দেশীয় নব্য ন্যায় মতের স্থাপয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলানিবাসী বিখ্যাত পক্ষধর মিশ্রকে যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি আপনাকে কুশদ্বীপের অন্তর্গত নবদ্বীপনিবাসী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ যেমন সকল সমাজের লোকগণ অপেক্ষা সমুন্নত হইয়াছিলেন, এতদ্দেশীয় শূদ্রমণ্ডলীও তেমনই অন্তর্বাণিজ্যে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া, প্রভূত ধনশালী ও সদাচারপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎপরে, কুশদ্বীপ কিছু দিনের জন্য হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিশেষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও ইহা এক অতি প্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী চক্রদ্বীপ অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপ অপেক্ষা ইহা অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীর আবাসস্থান হইয়া উঠে।"

উদার ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দের ভাবার্থ অনেক। যে বেদে যজ্ঞাদিকে কর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া ঐশীশক্তি অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যকে এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়া বৈদিক ঋষিরা স্তবস্তুতি করিতেন, তাহা বৈদিক ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে। যে উপনিষদ্ বা বেদান্ত ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন তাহাকে বৈদান্তিক ধর্ম্ম বলা হয়। আবার নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মকেও ধর্ম্মকর্ম্ম বলা যায়। দেবমূর্ত্তির ভোগ রাগাদি সেবাকেও দেবসেবা-ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে; তবেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ ছাড়া উহা কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ

কি? ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তদ্রূপ ধর্ম্মও কোন সীমাবদ্ধ ভাবের হইতে পারে না, ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন। ধর্ম্ম সকলেরই জন্য।

তবে আমাদের দেশে বা সর্ব্বত্র ধর্ম্মসাধনের মধ্যে এমন সংকীর্ণ ভাব প্রবেশ করিল কিরূপে? যাহাতে দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানকে এবং খৃষ্টান প্রভৃতিও হিন্দুকে ঠিক্ ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না—প্রকৃত উদার ধর্ম্মের ভাব কখনই এরূপ নহে।

কেবল মুখের কথায়ও ধর্ম্ম হইতে পারে না, ধর্ম্ম জীবনে বা চরিত্রে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইবে। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, যিনি বিশ্বব্যাপী সত্য ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যকেই এক পিতার সন্তান রূপে দর্শন করেন। তাঁহার নিকট সকল দেশই যেন স্বদেশ, সকল মানবকেই তিনি আত্মীয় বোধ করেন।

অবশ্য যথার্থ ঈশ্বরদর্শনকারী ব্যক্তি যে প্রণালীতে সাধন করিয়া আসুন না কেন, 'বস্তু' দর্শনে তাঁহার উদার ভাব হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনকারী ব্যক্তি দলে দলে জন্মান না, সুতরাং ভেদবুদ্ধিগত লোকসমাজে যদি ভেদভাবের ধর্ম্ম বা ক্ষুদ্রের পূজা উপাসনা পদ্ধতি নিয়ত প্রচলিত থাকে তবে তাহাতে মানুষকে আরও সংকীর্ণ ভাবাপন্ন করিয়াই রাখে। এজন্য এক উদার ধর্ম্মমতই সকলের গ্রহণীয় হওয়া উচিত। যত দিন এক উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবে সকলে দণ্ডায়মান না হইবেন তত দিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি কি রূপে আরম্ভ হইবে?

ধর্ম্ম কেবল ইহ লোকের জন্য নহে, ধর্ম্ম মানবাত্মার অনন্তকালের সম্বল। যেমন ইহ লোকের সাধু মহাজনগণের—তেমনি পরলোকবাসী অমরাত্মা সকলের সহিত কি আমাদের যোগ নাই? যখন আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি তখন কি ঋষিগণের সহিত এক হই না? এইরূপে কি ভারতীয় সাধকগণ কিম্বা অপর দেশীয় জ্ঞানী কর্ম্মী ও সাধুভক্তগণের সহিত কি যোগ অস্বীকার করা যায়? স্বর্গে ত আর সম্প্রদায়ভেদ নাই, পরলোকে যীশু এবং শ্রীচৈতন্য এখনও কি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া আছেন? না, তাঁহারা উভয়েই এক ঈশ্বর ইচ্ছা পালনে জয়ী হইয়া এখন উন্নত হইতে উন্নততর ভাবে ঈশ্বর ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত আছেন।

আবার ধর্ম্ম কি কেবল পরলোকের জন্য? ইহলোকে মানবে মানবে একতা হউক আর না হউক আপন আপন ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া স্বর্গে বা পরলোকে চলিয়া যাইব, আপন আপন সাধনের ফলে সদ্‌গতি লাভ করিব, ইহাও কখন, প্রকৃত ভাব হইতে পারে না। ধর্ম্ম আমাদের এরূপ আদর্শের হওয়া আবশ্যক যাহাতে সকল মানবে এক হইয়া একমাত্র ঈশ্বর ই[illegible] পালন দ্বারা পৃথিবীতেও সকল প্রকারে শান্তির রাজ্য স্থাপন করিতে পারা যায়। ধর্ম্মকে পৃথিবীতেও সফল করিতে হইবে।

জগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, যে জাতি যখনই একতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই জাতি উন্নতির পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় পতনের কি একটি প্রধান কারণ এই নহে যে, বহু দেবতার পূজায় আমরাও বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছি? তাই ভাই ভাইকে চিনিতে পারিতেছি না।

দেশের শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারও উদ্যম উৎসাহ চরিত্রের বলের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন চরিত্রগঠন যে কি রূপে হইতে পারে, আমরা এ কথা বুঝিতে পারি না। একতা ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। মূলে ধর্ম্মভাব না থাকিলে একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে কি রূপে?

কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে একতা-মূলক উদার ধর্ম্মভাব নিতান্তই প্রয়োজন। কোন ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া কোন মহৎ ফল লাভ হয় না। আত্মার উন্নতি যেমন ভূমা অনন্তকে ছাড়িয়া ক্ষুদ্রের পূজায় অসম্ভব, সামাজিক উন্নতিও তেমনি একতা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রকৃত পক্ষে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি কি রূপে হইয়াছিল তাহা যদি আমরা চিন্তা করি তবে ঐ ঋষিবাক্যে কর্ণপাত করিতে হইবে, ভারতের ঋষি কি বলিতেছেন—

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"।

"যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখস্বরূপ, অত এব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।"

আবার দেখ, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী দেবী গার্গী কি বলিতেছেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

"যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহাতে আমি কি করিব ?"

অতএব আমরা কেবল পার্থিব বিষয়কে মূল করিয়া সমস্ত মানবের একতা কোথায় পাইব ? আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের মিলনে উদার ধর্ম্ম বিধান প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে একেরই উপাসনা এবং ভাই ভাই এক পিতার সন্তান এই শিক্ষারই প্রচার করিতেছে। পূর্ব্বতন যত যত সাধু মহাজনগণ সেই একেরই প্রেরিত। এক এক জন এক একটি বিশেষ ভাবে—অর্থাৎ কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য, কেহ বাধ্যতা, কেহ বা জলন্ত বিশ্বাস, আবার কেহ ভক্তি, কেহ কর্ম্মযোগ দ্বারা সেই একেরই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালে মহাপুরুষগণের শিষ্য প্রশিষ্যগণ গুরুর নামে এক একটি দলে পরিণত হইয়াছেন। অবশ্য তাহারও প্রয়োজন ছিল। এক্ষণে সকল ভাবের মিলনে ভবিষ্যতের মহাধর্ম্ম প্রকাশিত হইল। সকল সাধু মহাজনগণকে যেমন আমরা স্বতন্ত্র মনে করিতে পারি না, তেমনি সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ভক্ত বিশ্বাসিগণকেও ধর্ম্মসাধনের সহায় জানিয়া সকলকেই তাঁহাদিগের বিশেষত্বের জন্য ভক্তি করিব।

এখন এমন দিন আসিয়াছে যে, দিন দিন ধর্ম্মের সংকীর্ণভাব চলিয়া যাইতেছে। সমস্ত পৃথিবীতে—ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং ভারতের সর্ব্বত্র উদার ধর্ম্ম গৃহীত হইতেছে।

উদারতা না উদাসীনতা ?

আজ কাল সাধারণের মধ্যে কোন রকম ধর্ম্মের কথা উঠিলেই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, তাঁহারা এক রকম উদার ভাবের মীমাংসা করিয়া শীঘ্রই আলোচনা শেষ করেন। সে উদার মীমাংসা বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম

সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হয় যে, 'সকল ধর্ম্মের একই উদ্দেশ্য; যিনি যে পথ দিয়া যান না কেন সকলেই সেই একস্থানে উপনীত হইবেন, সুতরাং ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই'। ইহাতে যে, সকল ধর্ম্মের মূল সত্য স্বীকার করা হয় তাহা বলা বাহুল্য। কথাটি শুনিতে বেশ, কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টির সহিত দেখিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে যে উদার ধর্ম্মবার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার প্রভাব সাধারণে অস্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারই ছায়া মৌখিক ভাবেও সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সত্যের প্রকাশ তেমন হয় নাই। কেন না, যাঁহারা মুখে এই উদার ভাবের কথা বলেন, অপর দিকে তাঁহাদের চরিত্রে দেখা যায় যে, চিরসংকীর্ণতা ও জাতিগত ভেদ-জ্ঞানের বদ্ধমূল সংস্কার বিশেষ ভাবে কাজ করিতেছে, উদারধর্ম্ম ব্যাখ্যা মুখে, কিন্তু চরিত্রে নহে।

উদারধর্ম্ম মত কি কেবল মুখে বলিবার বিষয়, না সাধনের বিষয়? এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত যাহা এক সময় আমার মনে হইয়াছিল তাহাই এখানে বলিলে কথাটি পরিষ্কার হইতে পারে। আমরা কত স্থানের নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যখন সহসা কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই স্থান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রয়োজনমত সেই স্থানের বিবরণ না জানিয়া, কখনই সে স্থানে যাইতে পারি না। তদ্রূপ যদি ধর্ম্ম আমার সাধনের বিষয় হয় তবে তাহার সত্যাসত্য ভাব সকল বুঝিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যথাসাধ্য অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ না করিলে চলে না। যদি উদার ধর্ম্মাদর্শ আমার ঠিক্ সাধনপথ বলিয়া বুঝিলাম, তবে কি আমি তদ্বিপরীত মত বা ভাব পোষণ করিয়া আর রাখিতে পারি? আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা গোপন করিয়া অন্যথাচরণ করা কি কপটতা নহে? অথবা ইহাকে প্রকৃত বিশ্বাসের অবস্থাই বলা যায় না।

আমি যখন বুঝিলাম কোন জাতির দোহাই দিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা, অপর দিকে কোন মানুষকে হীন জাতি জ্ঞানে অবজ্ঞা করা অত্যন্ত অন্যায়; তখন আমি তদ্রূপ আচরণ কিরূপে করিব। ঈশ্বর এক, তিনি

সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশ্য মানুষের মধ্যে অজ্ঞানতা বশতঃ হীনতা আছে স্বীকার করি। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যদি অজ্ঞানগণের উন্নতির জন্য কিছু কর্ত্তব্য আছে মনে না করেন তবে তাঁহাকে কখনও জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না।

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মনে জাত্যভিমানের ভেদজ্ঞান থাকা অসম্ভব; তাই বলি, উদারধর্ম্ম, মুখের কথা নহে, যখন তাহা সাধনে পরিণত হয়, তখন তদ্রূপ চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। উদারধর্ম্ম যখন সাধনের বিষয় হয় তখন তাহার সেই সাধনপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে কুসংস্কার বর্জ্জিত উদার ভাবাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সাধনের পথে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন অগ্রসর হওয়া যায় না।

ঈশ্বর অনন্ত ও সকলেরই ঈশ্বর, অতএব তিনি আমারও ঈশ্বর। আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে যদি ঘনিষ্ট ভাবে না হয়, তবে কি কেবল উদার মত লইয়াই আমার চলে? অনেক উত্তম বচনে কি হইবে যদি জীবন তাঁহার খাঁটি বিশ্বাস ধারণ করিতে না পারিল এবং মতে ও চরিত্রে যদি সামঞ্জস্য না হইল, উদার মতানুযায়ী যদি জীবন গঠিত করিতে না পারিলাম, তবে আর কি হইল? এ জন্যই মনে হয়, এই যে দেশপ্রচলিত অন্তঃসারশূন্য উদারতার কথা শোনা যায়, ইহাকে উদারতা না বলিয়া উদাসীনতা বলিলেই ঠিক্ বলা হয়। আমি যে রূপ উদারধর্ম্মের কথা মুখে বলি, কিন্তু তাহার সাধনতত্ত্বে যদি উদাসীন থাকি, সাংসারিক ক্ষতি যাহাতে না হয় ইহাই যদি আমার লক্ষ্য হয় তবে এমতাবস্থায় আমি যে প্রকার ধর্ম্মের কথা বলি না কেন, প্রকৃত পক্ষে আমি যে তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সত্য কি ?

(উদ্ধৃত)

কোন ভদ্রলোক রবিবাসরীয় বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া এক কালা ও বোবা বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্য কাহাকে বলে? বালক একখানি খড়ি লইয়া বোর্ডে এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা অঙ্কিত করিল। পুনরায় যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মিথ্যা কি? সে ঐ সরল রেখা মুছিয়া পূর্ব্বোক্ত বিন্দু দুইটার মধ্যে আর এক বক্র রেখা অঙ্কিত করিল। সত্যের পথ সরল ও অসত্যের পথ বক্র, কথাটি সকলে যেন মনে আঁকিয়া রাখেন।

—নীতি-কুসুম।

কে তুমি অন্তর মাঝে জাগিছ আমার ?

(কোন একটি স্বর্গীয়া মহিলার রচিত)

কে তুমি অন্তর মাঝে জাগিছ আমার ?
অপরূপ রূপরাশি, হৃদয় তিমির নাশি,
আলো করি দশ দিশি করিছ বিহার,
চিনেও চিনি না যেন কে তুমি আমার।

কে তুমি অন্তর মাঝে জাগিছ আমার ?
নাহি হেথা ফুলবন, ভ্রমরের গুঞ্জরণ,
নাহি হেথা কুসুমের পরিমল ভার,
গাঁথি নাহি যতনে প্রীতিফুলহার।

কে তুমি অন্তর মাঝে জাগিছ আমার ?
ভক্তি-নদী কুলুস্বরে, বহে না ত এ অন্তরে,

যা কিছু সুন্দর তাহা নাহিক আমার,
(তবু) কি হেরে, ভুলিল বল হৃদয় তোমার?

বুঝেছি তুমি হে দেব, কৃপার আধার,
নিজ গুণে দয়াময়, হইয়ে দীনে সদয়,
মলিন হৃদয়ে মম করিছ বিহার,
তরাবে অধম জনে বাসনা তোমার।

জান বুঝি দুরবল সন্তান তোমার—
ভীষণ ঝটিকাময়, সংসার সাগরে হায়,
হাবু ডুবু খাবে শুধু হারাইয়া পার,
পারিবে না কেহ তারে করিতে উদ্ধার;

তাই এ হৃদয়ে তুমি জাগিছ আমার।
ধন্য ধন্য দীননাথ! করি তোমা প্রণিপাত,
ধন্য হে করুণাময়, করুণা তোমার—
তার হে পাতকী, কর মহিমা বিস্তার।

---

২৪ পরগণা জেলা-সমিতি।

বিগত ২৭শে ২৮ শে ভাদ্র ইং ১২ই ১৩ই সেপ্টেম্বর আগড়পাড়া শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাগানে জেলা-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার নীলরতন সরকার এম্, এ এম্, ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে ২৪ পরগণা জেলা সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল;

এই জেলায় লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ, ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক ১০ লক্ষ। কারিগর জাতি স্ত্রীপুরুষে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার, চাষী ১৭ লক্ষ। ইহার মধ্যে ২

লক্ষ ৩০ হাজার লোক অর্থাৎ শতকরা ১১ জন লিখিতে পড়িতে সক্ষম। ইং ১৯০১ সালের ইন্‌কম টেক্সের তালিকায় কেবল মাত্র ২৮৯৩ জনের নাম পাওয়া যায়; অপর সকলের বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকার ও কম।

এই জেলাতে ইং ১৮৯৪ সালে ১৯ শত ২৭ টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯০১ সালে জানা যায় শতকরা ৪৩ জন বালক এবং ৩ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছিল। ইহাতে সকলে বুঝিবেন এ জেলায় স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কিরূপ।

১৯০১ সাল হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে হাজার জন লোকের মধ্যে ১৮ জনের ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে। এই জেলায় ৫০০০ হাজার পল্লীগ্রামের মধ্যে ভাগীরথীর সন্নিকটস্থ ন্যূনাধিক ৫০০ শত গ্রাম বাদ দিলে বাকী ৪৫০০ চারি হাজার পাঁচ শত পল্লীতে অধিবাসীদিগকে পানীয় জলের জন্য পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা, মজা নদী, নালা ও খাল বিলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই জেলা ১ কোটী বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত। ইহার মধ্যে ২৭ লক্ষ বিঘা ভূমিতে ধান্যের আবাদ হয়, ৩ লক্ষ বিঘায় পাট সর্ষপ প্রভৃতি শস্যের চাষ হয়। মোট আবাদী ভূমি ৩০ লক্ষ বিঘা।

এই জেলায় বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কল কারখানাগুলি রহিয়াছে ;—

গালার	কারখানা	২	টি	চিনির	কল	১	টি
সোরার	”	১	”	দুগ্ধের	”	১	”
চর্ব্বির	”	১	”	ময়দার	”	১	”
দড়ীর	”	২	”	পাটের গাঁট বাঁধা	”	১১	”
গ্যাসের	”	১	”	তুলার	”	৬	”
গাড়ী তৈয়ারি	”	১	”	তৈলের	”	২	”
চামড়ার	”	১	”	পাটের	”	৩৩	”
ট্রাম্‌ওয়ে	”	১	”	লোহা ও পিতল ঢালাইয়ের	”	১৩	”
মিউনিসিপালিটী	”	১	”	ডক্ ইয়ার্ড		২	”
রাসায়নিক দ্রব্যের	”	১	”	কেরসিন্ তৈলের ডিপো		৩	”
ইলেক্‌ট্রীক্	”	১	”				

ইহা ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা আছে।

চিনির কারখানা সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—৪০ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গায় ১২০ টি, * চিনির কারখানা ছিল, গত বৎসর ১০ টি, এ বৎসর ৬ টি, মাত্র অবশিষ্ট আছে।

সভাপতি মহাশয় যে সকল সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহার সমস্ত উল্লেখ করা এ স্থলে সম্ভব নহে। তবে দেশের পক্ষে একান্ত হিতজনক ২। ১ টি কথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"কোন জাতির উন্নতি একমাত্র পুরুষদিগের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। প্রাচীন কাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জীবন-সংগ্রাম অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্তর্জাতিক জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা যদি ১০দশ লক্ষ স্ত্রীলোককে আমাদের গলগ্রহ করিয়া রাখি তাহা হইলে আমাদের উন্নতির কোন আশাই নাই। স্বাভাবিক মেধা, স্মৃতিশক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতির গুণে আমাদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ কিছুতেই আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। কিন্তু আলস্য ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য দ্বারা আমরা তাঁহাদের ও ভবিষ্য বংশীয়দিগের সর্ব্বনাশ করিতেছি। অর্থাভাব ইহার একটি কারণ হইলেও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে আমরা কোন রূপেই অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব না। * * * * *

আর একটি কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ম্যালেরিয়া নিবারণই বলুন, জলকষ্ট নিবারণই বলুন, জলনিকাশের নূতন বন্দোবস্তই বলুন, আর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই বলুন, সকল কার্য্যই আমাদিগের সমবেত শক্তি ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতিগত জীবনের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু জাতিগত আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরের সমষ্টি মাত্র। আমাদিগের এই জেলার অধিবাসীদিগের মনকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে, যে কেহ

* আমাদের ধারণা ৬৪ টি চিনির কারখানা ছিল।— কুঃ সঃ

যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হন। আমরা সকলেই যেন একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশের যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি।

যে সকল কারণে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, আমাদিগের মধ্যে তাঁহার অভাব নাই। কিন্তু মাতৃভক্তির দ্বারা সে সকল অন্তরায় দূর করিতে হইবে। মাতৃভূমির কোন মঙ্গলকর কার্য্যের ইঙ্গিত পাইবামাত্র আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য ও অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে একত্র হইতে হইবে।"

সঞ্জীবনী।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

উত্তরচাতরা হইতে প্রাপ্ত।

দুই বৎসর হইল এখানে একটি যুবক-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র। সমিতির উদ্দেশ্য—সর্ব্বতোভাবে দেশের হিতকর কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করা। শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন মিশ্র মহাশয়ের সাহায্যে একটি স্বদেশী বস্ত্রালয় খোলা হইয়াছে এবং স্বল্প লাভে স্থানীয় ও অপরাপর সকলেই তাহা ব্যবহার করিতেছেন। গত বৎসর ধান্যাদি ভালরূপ উৎপন্ন না হওয়ায় দেশীয় লোকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র ও সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং সমিতির চেষ্টায় চাউল প্রদান করা হইতেছে। যাহারা উপার্জ্জনে অক্ষম তাহাদিগকে সাহায্য ও পরিশ্রমীদিগকে কলিকাতার খরিদ্ দরে চাউল প্রদত্ত হইতেছে। সোম ও শুক্রবারে পাঁপ্লীয়ার হাটে চাউল বিতরণ ও খরিদ্ দরে বিক্রয় করা হয়। আর এখানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড়ই অভাব। আশা-করি স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র মহোদয়গণ ও সমিতির উৎসাহী কার্য্যকুশলী যুবকগণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। *

—ইদানীন্তন গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী, ষ্টেসনের নিকটস্থ বড় বড় কয়েকটি বাগানের জঙ্গল কাটিয়া ও সমস্ত রাস্তার জল নিকাশের নর্দ্দামার

---

* দুই বৎসর অক্ষুণ্ণ ভাবে সমিতি যে গরীবদিগের সাহায্য করিতেছেন ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের কথা। আশা করি সমিতির সভ্যগণ "সর্ব্বতোভাবে" দেশের হিত কিসে হয় যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন।—কুঃ সঃ।

প্রতি যে প্রকার দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

—যমুনা নদীতে স্নানের ঘাট; স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের জন্য যাহাতে পৃথক্ হয়, ও মাল আমদানি রপ্তানির গোরুর গাড়ী ও নৌকা সকল যাহাতে স্নানের ঘাটের উপর না থাকিতে পারে এবং ঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপক্ষে মিউনিসিপালিটী মনোযোগী হইলে এবং তাহার একটি সুব্যবস্থা করিলে বড়ই ভাল হয়। এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ও সহকারি-সভাপতি এবং সভ্য মহাশয়গণ একটু উদ্‌যোগী হইলে হইতে পারে। স্ত্রী পুরুষদিগের স্নানের ঘাট পৃথক্ হওয়া নিতান্ত উচিত।

—গোবরডাঙ্গার পার্শ্বস্থিত হয়দাদ্‌পুরও গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর অধীন, কিন্তু কাছারি বাড়ীর দিক্ ভয়ানক জঙ্গলাবৃত! মনে হয় ইহাতে বাঘ আসিয়া স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লইতে পারে; হয়দাদ্‌পুরের বসু-মল্লিক জমিদার মহাশয় ও গোবরডাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর এবং পুরাতন বাগান সকলের অধিকারিগণ সকলেই যদি মনোযোগী হন, তবে কতক কতক পুরাতন ফলশূন্য গাছ কাটিয়া ও অপরাপর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনেক পরিমাণে ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে পারেন।

দেশের কত অভাব; দেশের হিতসাধনে যুবকগণই অগ্রসর হইবেন, ইহাই সময়ের ইঙ্গিত। পল্লীগ্রামের যুবকগণের যেন অধিকাংশেরই কোন কাজই নাই। দিবসের অধিকাংশ সময় পল্লীস্থ স্বর্ণকারের দোকানে দোকানে বসিয়া 'ধূমপান' করা আর অসার গল্প গুজবে সময়াতিপাত করাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি তাঁহাদের একবার কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগে, স্বদেশপ্রেম প্রাণে লাগে, তবে দেখিবেন জীবন কেমন অগ্নিময় হইয়া উঠিবে। যুবকগণ মনে না করেন যে, আমরা কোন রূপ বিদ্বেষ ভাবে এই কথা বলিতেছি। পল্লীবাসী যুবকগণ ভাবুন আপন আপন দেশের জন্য কিরূপে পল্লীর স্বাস্থ্য এবং সাধারণ নীতি চরিত্রের উন্নতি করিতে পারেন।

— o

ভূতপূর্ব্ব "কুশদহ"

আমরা প্রথম সংখ্যক কুশদহে, 'কুশদহ' প্রচারের উদ্দেশ্য ও বিবরণ ইত্যাদির বিষয় বলিতে গিয়া ভূতপূর্ব্ব 'কুশদহ' সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি নাই, এজন্য এবার প্রথমেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা গ্রাম হইতে 'কুশদহ' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। খাঁটুরা-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের মনে সর্ব্ব প্রথমে 'কুশদহ' বাহির করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল, এবং তিনি এই পত্রিকার পূর্ব্বাপর সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথমে কুশদহ মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে কলিকাতায় স্বর্গীয় বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ হয় বৎসরাবধি চলিয়া প্রথম প্রকাশিত 'কুশদহ' বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে কিছুদিন বাদে পুনরায় বাহির হয় এবং তাহাও অল্পদিনে বন্ধ হইয়া যায়।

তদনন্তর কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছায় ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (বর্ত্তমান কলিকাতা অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ) মহাশয়ের পরিচালনে 'ভেরি' নামক যে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হয় তাহার সহিত কুশদহ মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ১৬ই আশ্বিন হইতে 'ভেরি ও কুশদহ' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। বোধ হয় অনধিক ২ বৎসর কাল চলিয়া 'ভেরি ও কুশদহ'ও বন্ধ হইয়া যায়।

তৎপরে স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ের রাণাঘাটের সন্নিহিত জমিদারীর কাছারীবাটী ও সাধনাশ্রম মঙ্গলগঞ্জ নামক স্থান হইতে যখন শ্রদ্ধেয় প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় ভূতপূর্ব্ব 'সুলভ সমাচার' প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। তখন 'সুলভের' সহিত কুশদহকে মিলিত করিয়া "সুলভ সমাচার ও কুশদহ" নামে বাহির করা হইল। তৎপূর্ব্ব হইতে লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ও একটি

মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া মঙ্গলগঞ্জ হইতে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। ঐ মঙ্গলগঞ্জ মিশন্ প্রেসে সুলভ ও কুশদহ্ মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই রূপেও বোধ হয় অনধিক এক বৎসর কাল 'সুলভ ও কুশদহ' বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে, ক্ষেত্র বাবু কুশদহের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি এক্ষণে এক প্রকার বয়োবৃদ্ধাবস্থায় বাতরোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেশের জন্য অর্থাৎ খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের উন্নতির জন্য যৌবন কাল হইতে যে সকল চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন, আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহাদের মহদ্ভাব লোকে বুঝিতে পারিবেন।

সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

"জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী।
পাপতাপহারিণী, সুখমোক্ষদায়িনী।
স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য শান্তি শুভদাত্রী,
গৃহ সংসারের কর্ত্রী দুঃখনাশিনী।
মধুর কোমল কান্তি, বিমল রজত ভাতি,
মহাশক্তি চিন্ময়ী অনন্তরূপিনী;—
বসিয়ে হৃদয়াসনে, ঘন আনন্দ বরণে,
মোহিত করিছ মা ভুবনমোহিনী।
তোমার প্রেমে রঞ্জিত, আনন্দে পরিপূরিত,
দ্যুলোক ভূলোক চরাচর ধরণী;—
ভক্ত পরিবার লয়ে, বিহরিছ নিজালয়ে,
ওগো প্রেমময়ী-জন-মনোরঞ্জিনী।"

দুর্গাপূজা।*

এই যে সমস্ত বঙ্গে বা ভারতে 'দুর্গোৎসব' হয় ইহা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইল, এই দুর্গামূর্ত্তিই বা কোন্ সময় সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইল, এ বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে সংস্কারভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণা দেখা যায়। আর যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও জ্ঞানী ও ভক্ত, অবশ্য তাঁহারা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন; কিন্তু সাধারণে ইহার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারাতে এই পূজা তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তেমন সহায় হয় না। সাধারণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারও ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বে তেমন প্রবেশ করিতে না পারিয়া বোধ হয় অনেক পরিমাণে বাহ্য ভাবেই বদ্ধ আছেন। ফলতঃ এই দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনা করা বর্ত্তমান সময়ে অসঙ্গত বোধ হইবে না; বরং যথেষ্ট আলোচিত হওয়াই উচিত।

এ দেশে বর্ত্তমানে যে সমস্ত দেব দেবীর পূজা প্রচলিত আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ ও বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইতে অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বহুকালে সম্পন্ন হইয়াছে। বৈদিক দেব দেবীর ও পুরাণ-বর্ণিত দেবতাগণেরও মূল বৈদিক ঋষিগণের কবিত্বের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি আরও পরিষ্কার হইতে পারে।

বৈদিক সময়ে ভূমি-কর্ষণ কালে কর্ষিত ভূমির চিহ্নের নামকে 'সীতা' বলা হইত, এবং বৃষ্টির দেবতা মেঘেশ্বরের (ইন্দ্রের) স্ত্রী 'সীতা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। কালে যখন দাক্ষিণাত্যবাসিগণ কৃষি শিক্ষা করিল, তখন আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের নিকট হইতে তাহারা সেই সীতা চুরি করিয়াছে, এই ভাবে আখ্যায়িকা চলিতে লাগিল। এই কবিত্বের বিকাশে রামায়ণের আখ্যায়িকার উৎপত্তি হইল। রাম-চরিত এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ঘটনা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এইরূপে মহাভারতেরও অনেক আখ্যায়িকার

* এই প্রবন্ধটি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কোন ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক সে বিষয় অধিক বলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে ক্ষান্ত থাকা গেল।

আমরা দেখিতে পাই, ঋগ্বেদে ১২৭ ঋকের পর যে 'খিল' আছে তাহাতে দুর্গা শব্দ রাত্রি ও নিদ্রার দেবী বলিয়া পূজিতা হইয়াছে, 'দুর্গা-দুর্গম্যা' অর্থাৎ যাহার ভিতর সহজে যাতায়াত করা যায় না, সুতরাং রাত্রি। তার পর ইহাও বলা হইত দুঃখীর আশ্রয়,—যাহারা ভিতর এবং বাহিরে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত, তাহাদের যিনি আশ্রয় বা শান্তিদায়িনী নিদ্রা ; অর্থাৎ নিদ্রাতে সকলেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। এই কবিত্বের আরও একটু বিকাশে দেখা যায় যে, রাত্রি বা অন্ধকারের সহিত দিন বা আলোকের অভিন্ন সম্বন্ধ। অগ্নির দেবতাকে প্রথমে রুদ্র বলা হইত, এই অর্থে দুর্গাকে রুদ্রাণী বলা হইয়াছে।

ক্রমে আরও অগ্রসর হইলে দেখা যায় যাঁহাকে বেদমাতা গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে তাঁহার সহিত দুর্গা বা রুদ্রাণী এইরূপে মিশিয়া গেলেন,—ঋষিগণ পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন, পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ হিমালয় বা গিরিরাজ ; পর্ব্বতের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন রুদ্র, রুদ্রের স্ত্রী, রুদ্রাণী ;—পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান (যাঁহার নাম গায়ত্রী) ঋষিগণের মধ্য হইতে একই পবিত্র স্থানে হিমালয়ে প্রকাশিত হইয়াছিলেন বা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এইখানে গায়ত্রীর সহিত দুর্গা বা রুদ্রাণী মিশিয়া গেলেন। এই অর্থে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ২৬।৩০ শ্লোকে তাঁহাকে "উন্নত শিখরে জাতা" এই বলিয়া বর্ণিত আছে। ঐ আরণ্যকের ১৮ শ্লোকে রুদ্রকে অন্যান্য নামের সহিত উমাপতি ও অম্বিকাপতি বলা হইয়াছে। উমা শব্দের অর্থ, রক্ষাকারিণী এবং অম্বিকা শব্দের অর্থ মাতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একটি ব্যাখ্যায় অম্বিকা শব্দে শরৎকাল বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্য পরবর্ত্তী সময়ে শরৎকালে অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গাপূজা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে।

মুণ্ডকোপনিষদে অগ্নির যে সপ্তজিহ্বা বা সপ্তশিখার উল্লেখ আছে, তাহা এইরূপ ;—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, এবং বিশ্বরুচি, এই সমস্ত নাম অগ্নির স্বরূপই বলা যায়, সুতরাং কবিগণ রুদ্র বা অগ্নিদেবের এই সমস্তকে পত্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কেনোপনিষদে "উমা-ইন্দ্র সংবাদ" নামে একটি

আখ্যায়িকা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এইরূপে বলা যায় যে, কোন সময় দেবগণ অসুরদিগকে জয় করিয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তাঁহারা যে শক্তিতে অসুরদিগকে জয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের নিজের শক্তিতে নহে, তাহা ব্রহ্মের শক্তি। এজন্য ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি দিব্যরূপিনী নারী মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইলেন। তিনি যে কে তাহা জানিবার জন্য দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে পরে বায়ুকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তখন ব্রহ্মশক্তি তাঁহাদের অহঙ্কার বিচূর্ণ করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার শক্তি ভিন্ন দেবগণের একটি তৃণও নাড়িবার শক্তি নাই।

এই ঘটনাতেও দেবগণের চক্ষু খুলিল না, তার পর ইন্দ্র তাঁহাকে জানিবার জন্য বাহির হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র তথায় না যাইতে যাইতে শক্তি অন্তর্হিতা হইলেন, তথাপি ইন্দ্র তথায় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন উমা-হৈমবতী ঋষিগণের রক্ষাকর্ত্রী, অর্থাৎ হিমালয়ে জাতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিতা হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—"তোমরা যে শক্তিবলে অসুরদিগকে জয় করিয়াছ তাহা স্বয়ং ব্রহ্মেরই শক্তি।" কিন্তু তখন পর্য্যন্তও গিরিরাজকন্যা যে উমা-হৈমবতী, সে ভাবে গৃহীতা হন নাই। এখন আমরা দেখিতে পাইলাম ঈশ্বর-জ্ঞান এবং ঈশ্বরের শক্তি সম্মিলিত হইয়া একধারে প্রকাশিত হইয়াছে। তার পর আমরা এই ঈশ্বরী-শক্তিকেই দেবাসুরের যুদ্ধে দেখিতে পাইব।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি এই দুয়ের পার্থক্য এই দেখা যায় যে, প্রথমটি নিত্য ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় জন্ম-মরণ-রহিত, কোন সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না, নির্ব্বিকার নির্গুণ শুদ্ধস্বভাব; কিন্তু সাধক উপাসনায় যখন আরও অগ্রসর হইলেন তখন দেখিলেন তিনিই আশ্রয় বন্ধু, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা ভগবান্; তাঁহারই শক্তি জগতে পাপভার হরণ করিতে অবতীর্ণা হয়েন। ফলতঃ, নিত্য ও লীলা একেরই ভাব, একত্ব তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে না পারিলে কেবল ব্রহ্মলীলাতত্ত্ব অর্থাৎ কালে যাহা বিবিধ আখ্যায়িকা রূপে বর্ণিত হইয়াছে সেই কাল্পনিক পথ ধরিয়া প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে বা জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশ করা কখনই সহজ হইতে পারে না।

একত্ব তত্ত্ব যিনি সাধন করিতে পারিয়াছেন তিনি এ সকল তত্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সম্পূর্ণ আকার হওয়ার পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্য-জাতির ভিতর অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এই বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি চিহ্ন এই দেখা যায় যে, কিছু কিছু অনার্য্য বা আসুরিক ভাব ঐ দুর্গা দেবীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। দুর্গার আসুরিক ভাব চণ্ডীর কবি কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে এই রূপ একটি বর্ণনা আছে,—শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে দেবী যখন বড়ই পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি বলিলেন, —"অপেক্ষা কর, আমি সুরাপান করিয়া লই।"

দেবাসুরের যুদ্ধের মধ্যে আর একটি মহৎ পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা বেদ ও জেন্দাভেস্তা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। যে কারণে আর্য্যজাতি হইতে বর্ত্তমান পারশিকগণ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন তাহা উপাসনা পদ্ধতির জন্য। প্রথমে উভয় জাতি এক সঙ্গে দেবতা ও অসুরের পূজা করিতেন, পরে যখন উভয় জাতি পৃথক্ হইলেন, তখন তাঁহাদের পুজিত দেবতা ও অসুরের মধ্যেও বিরোধ কল্পিত হইল।

সমস্ত দেবাসুরের যুদ্ধে প্রধানতঃ তিনবার এই শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম প্রকাশ মধুকৈটভ বধের সময়; দ্বিতীয় মহিষাসুর বধে, তৃতীয় শুম্ভ নিশুম্ভ বধের সময়ে। পুরাণের অসুরনাশিনী চণ্ডী, দুর্গা অথবা কালী আর কিছুই নহেন, দেবতাগণের সম্মিলিত শক্তি; পক্ষান্তরে সমস্ত দেবগণের শক্তি সে কেবল এক পরব্রহ্মের শক্তিমাত্র।

চণ্ডীতে মহিষাসুর বধের যে বৃত্তান্ত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, যখন মহিষাসুরের অত্যাচারে সমস্ত দেবগণ প্রপীড়িত—দেবলোকচ্যুত, তখন দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের তেজ হইতে এক দেবী মূর্ত্তির সৃষ্টি হইল। তৎপরে সমস্ত দেব-গণ আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়া দেবীকে মহাশক্তিময়ী করিয়া তুলিলেন। সেই দেবীর দ্বারাই মহিষাসুর অসংখ্য সৈন্যগণ সহ বিনষ্ট হইল।

চণ্ডী ও দেবীপুরাণাদি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সমস্ত দেবাসুরের যুদ্ধ এক একটি আখ্যায়িকামাত্র। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমরা মহিষাসুর বধের ভিতর হইতে যে সুমহান্ উপদেশ লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদের গ্রহণীয় কি না ইহাই চিন্তার বিষয়।

যখনই কোন জাতি কোন জাতির দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে, তখন নিপীড়িত জাতি নিরুপায় হইয়া দৈবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যাহার যাহা থাকে ঐকান্তিক ভাবে সকলে তাহা দান করিয়া সর্ব্ব-সম্মিলনে এক নবশক্তি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। সম্মিলিত শক্তি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর হয় না। যখন দেবগণ অসুরদিগের দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন, তখন প্রাণের দায়ে সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া, সকলের অস্ত্র শস্ত্র অর্থাৎ যাহার যাহা বিশেষত্ব ছিল তাহা ঢালিয়া দেওয়াতে এক নবশক্তির অভ্যুদয় হইল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেব দেবীর উপাসক হইয়া ও বর্ত্তমান ভারতীয়গণ নানা বর্ণে বিভক্ত থাকিয়া, প্রকৃত একত্ব ভাব সাধনে কি প্রকারে উপনীত হইব? এ প্রকার ধর্ম্মভেদ ও জাতিভেদ সত্ত্বেও কি নবশক্তি লাভে আমরা সমর্থ হইব?

"সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নহিলে মায়ের দয়া কভু পাবে না।" বাঙ্গালী জাতির সঙ্গীতের ভিতর এই যে ভবিষ্যৎ বাণী হইয়াছে তাহা সাধনে আমরা কতদিন উদাসীন থাকিব? আমরা যতদিন অসুরনাশিনী দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিব ততদিন কেবল বাহিরের তিন দিনের বাহ্য পূজামোদে আমাদের কল্যাণ কোথায়?

পরমেশ্বর মঙ্গলময়, আমাদিগকে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের দুই দিক্ দেখিতে হইবে। সুখে এবং দুঃখে তাঁহার হস্ত প্রকাশিত হয়। বিপৎ-পরীক্ষায় তিনি আছেন, আবার শান্তিতেও তিনি আছেন। তিনি যেমন শক্তিময়, তেমনই জ্ঞানময়, তিনি আমাদের বিবেকের ভিতর দিয়া বাণী বলেন, তাঁহার বাণী শুনিলে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি প্রেমময় পিতা বা প্রেমময়ী জননী। চণ্ডীতে ব্রহ্মের মাতৃভাবের আভাস আছে বিকাশ তেমন নাই, ভীষণ দিক্ই অধিক দেখান হইয়াছে। সরল মাতৃভাব গার্হস্থ্য জীবনেই দেখিবার স্থল।

দুর্গাপূজায় আমরা আর একটি যে মহাসত্য লাভ করিতে পারি তাহা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তাহা এই যে বিচ্ছিন্ন শক্তির পূজায় ও বিচ্ছিন্ন জাতীয় চেষ্টায় কখনও অন্তর বাহিরের কার্য্য উদ্ধার হয় না। যখন একত্ব শক্তিকে সাধক ধরিতে পারেন এবং সমস্ত শক্তিই যে এক, এমন কি ঐ অসুরদিগের যে শক্তি তাহাও ঈশ্বরের শক্তি চণ্ডীর কবি এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; অতএব সর্ব্বাগ্রে একেকে বুঝিতে হইবে একেকেই বুঝিলে সকল তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে, সকল কার্য্যেও সিদ্ধি লাভ করিবে, মানব জীবন ধন্য হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

২৭শে সেপ্টেম্বর—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃষ্টল নগরে পরলোক গমন করেন। এই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার পরলোকগমনের ৭৫তম সাম্বাৎসরিক স্মরণীয় দিন। প্রত্যেক বৎসরে এই দিনে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ মহতী সভা হইয়া থাকে। এই সভায় অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি বক্তৃতাদির দ্বারা রাজার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া থাকেন।

এই সভাদ্বারা ও অন্যান্য কারণে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা উন্নত হইতেছে; কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, আজও শিক্ষিতগণের মধ্যে সাধারণতঃ রাজার বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞান অনেকে লাভ করিতে পারেন নাই। প্রায় অনেকে এই জানেন যে, রাজা রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে যিনি অধিক জানেন, তিনি এই বলিয়া থাকেন যে, রাজা সতীদাহ নিবারণ ইত্যাদি কাজ করিয়া গিয়াছিলেন।

যাঁহারা দেশের বা জাতির মধ্যে 'বড়লোক' (Great man) হইয়া দণ্ডায়মান হন, অবশ্য তাঁহারা অনেক মহৎ কার্য্য করেন সত্য, কিন্তু কেবল কতকগুলি কাজ দেখিয়া তাঁহাদের জীবনের মূলভাব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় না।

তাঁহারা কি ভাবে কাজ করেন সেই ভাবটি বুঝিতে সম্যক্ রূপে না পারিলে, মহাপুরুষগণের মহজ্জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা হইল বলা যায় না। তাঁহারা যে কোন কাজ করুন না কেন, সে কাজগুলি তাঁহাদের আন্তরিক ভাবের এক একটি প্রকাশ মাত্র। প্রধানতঃ মানবজীবনে শক্তি-সঞ্চার করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষণ। নিদ্রিত জাতিকে জাগান, পুরাতন চিন্তাস্রোতকে নূতন পথে চালিত করা এবং সমস্ত জাতির মুখ ফিরাইয়া দেওয়া ইহাই তাঁহাদের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে যাঁহারা মনে করেন আমাদিগের ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা যে আদর্শ লইয়াই চলি না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, "যাহা আমাদের আছে তাহাতেই আমরা সকল বিষয়ে উন্নত হইব"—তাঁহাদের কথায় আর কি বলিব। কিন্তু যাঁহারা সত্যই 'দেশের হাওয়া' ফিরাইতে চান, দেশব্যাপী জড়তা দূর করিতে চান, জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে চান, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন সময়োপযোগী সর্ব্ববিধ সংস্কার ব্যতীত কখনও নবশক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের সেই সংস্কারকার্য্য একটা বাহিরের ব্যাপার নহে। যাঁহারা এই কার্য্যকে কিছুই নহে মনে করিয়া অধিকন্তু সংস্কারকগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন তাঁহারা ভুল করিতেছেন; কেননা এই সংস্কারের ভাব আসিল কোথা হইতে? ইহার মূলে যে আদর্শ আছে। জাতীয় জীবনীশক্তি স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগকে সেই আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছে মাত্র।

মহাপুরুষগণের বিদ্যমান কালে তাঁহাদের দ্বারায় প্রায় সকল সংস্কার সাধিত হয় না, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় জীবনে এক একটি এমন শক্তি দিয়া যান যাহাতে দেখা যায় যে, বহু বৎসর পরেও জাতীয় জীবনের প্রকৃত উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়।

বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের মহজ্জীবনী আমরা যতই আলোচনা করিব ততই বুঝিতে পারিব আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ কিরূপ হইবে। তবে এ স্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, রাজা প্রথমে বুঝিয়াছিলেন মানবজাতির ধর্ম্মচিন্তার মূলে ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে তিনি ধর্ম্মের মূলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ

ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করিয়া দেখাইলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূলে একেরই উপাসনা রহিয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মূল ছাড়িয়া অন্যান্য ভাবের উপাসনা আসিয়া পড়িয়াছে। এজন্য ধর্ম্মের সংস্কার করা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষাতেই এ দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। তাঁহার ধর্ম্মভাব এই আদর্শের ছিল যাহাতে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি আনয়ন করে, এইজন্য দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াও সমাজসংস্কার, রাজনীতি-সংস্কার প্রভৃতি সকল প্রকারের জনহিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। রাজার এই বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মাদর্শ কেবল বাঙ্গালী জাতির নহে, সমগ্র মানবজাতির আদর্শ হইবে।

এ পর্য্যন্ত রাজার যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে যাহা "রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" পাঠ করিলে সকলে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

৩০শে আশ্বিন--রাখীবন্ধন—রাজনৈতিক নেতৃগণ বলিতেছেন, "লর্ড কর্জ্জন-কৃত বঙ্গ-বিভাগ-বিধান বাঙ্গালীর উন্নতি-পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইল। বাঙ্গালীর উন্নতি পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে পড়িল।" যদি এ কথা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে সে বিধান আপাততঃ ব্যর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড কর্জ্জন বঙ্গ-বিভাগ করিলেন, বাঙ্গালীও 'বয়কট' করিল। এই ঘটনাই সমস্ত ভারতের একতা-বন্ধনের কারণ হইল।

এই ঘটনার মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের হস্ত দেখিলেন তাঁহারা বুঝিলেন "এক-জন" আছেন, তিনি মঙ্গলময়; মানুষের দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যেও তিনি মঙ্গল সাধন করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাঁহারা রাজকর্ম্মচারীদিগের কেবল অন্যায় ও অত্যাচার দেখিয়া বিরক্ত হইতেছেন।

৩০শে আশ্বিন স্মরণে আমরা দুঃখ করিব, ঘরে ঘরে রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বালিব না, আমরা আহার করিব না ইত্যাদি ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আজ দুঃখ করিবার—সে কারণ ত দেখিতেছি না। যে ঘটনায় বা যে দিনে বাঙ্গালীর বা

সমস্ত ভারতের সুদিন আনয়ন করিল, সে দিন ত আর দুঃখের দিন রহিল না। যে দিনে কেহ ব্রহ্মমন্দিরে, কেহ মস্‌জিদে, কেহ চার্চ্চে, কেহ গঙ্গার ঘাটে, বা কালীঘাটে দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা কি আকস্মিক ব্যাপার? এ স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিল কিসে? যাঁহারা ইহার মূল দেখিতে না পাইয়া ইহাকে "স্বদেশী আন্দোলন" নামক একটা কিছু বাহ্যিক ব্যাপার মনে করিতেছেন—এমন কি যাঁহারা ইহার "ব্যাপকতা শক্তি" দেখিয়া একটু একটু বিস্ময়ভাবাপন্ন হইতেছেন, তাঁহারাও যে ইহার মূলদেশ দেখিতেছেন, তাহা বোধ হয় না। আমরা বলি এ ঘটনা আকস্মিক নহে—জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক ঘটে না। আজ ৫০ বৎসরের অধিক কাল হইতে বিধাতা পুরুষ এই বাঙ্গালী জাতির মধ্য হইতে স্বাধীনভাব স্ফুরণের সূত্রপাত করিয়া কতকগুলি লোকের প্রাণে নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মচিন্তায় যেমন স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তেমনই ভ্রম কুসংস্কার ছাড়িয়া সমাজসংস্কারেও প্রবৃত্ত আছেন। আমরা বিশ্বাস করি ইহা ভগবানের ক্রিয়া; ভগবান্‌ ঐ যে স্বাধীনতার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন তাহাই একটু ভিন্ন আকারে সমগ্র জাতীয়-উত্থানের ভাবে সকলে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র; কিন্তু মঙ্গলময় প্রেমময় ভগবানের হস্ত আমরা যদি না দেখিয়া তাঁহার ইঙ্গিত না বুঝিয়া ইহাকে সাংসারিক পথে চালিত করি তবে নানা ভেদের মধ্যে যে বিভিন্ন পথে পড়িব তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমরা শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ হই বা না হই, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু আসিয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মের মূল প্রায় ভারতে উৎপন্ন হইল কেন? বর্ত্তমানে সমস্ত ধর্ম্মের মিলনই বা ভারতে হইল কেন? ইহাতে কি বিধাতার কোন ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে না? কত কত জাতি ও দেশ থাকিতে ভারতে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-সমন্বয় হইল কেন? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বাঙ্গালী! তোমাকেই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচারকের কাজ করিতে হইবে। বাঙ্গালী-চরিত্র! তুমি হীন হইয়া থাকিতে পারিবে না, ভগবান্‌ তোমাকে জোর করিয়া ভাল করিবেন। তুমি যতই নিদ্রিত থাকিতে চেষ্টা করিবে, ততই তিনি তোমার কেশে ধরিয়া তোমাকে জাগাইবেন। এই যে এত আঘাত পাওয়া যাইতেছে, ইহাও যে জাগরণের জন্য এবং মঙ্গলের জন্য,

তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা যদি সকল ঘটনায় মঙ্গলময়ের হস্ত আছে বিশ্বাস করিতে পারি তবে এই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার হস্ত দেখিব না কেন? কেহ হয় ত বলিতে পারেন "কত লোকের জীবন যাইতেছে আর তোমরা ঘরে বসিয়া বসিয়া সুন্দর সুন্দর উপদেশ বাক্য বলিতেছ!" কিন্তু ঠিক্ তাহা নহে, জীবন-পরীক্ষায় যাহা বুঝিয়াছি, দুঃখে পড়িয়া যাহা শিখিয়াছি, যাহা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, তাহাই বলিতেছি। মঙ্গলময়ের হস্ত দেখিলে রাগ দ্বেষ প্রশমিত হয়, হৃদয় কোমল হয়, প্রাণে প্রেমের ভাব আসে, প্রেমের ভাব হইতেই রাখী-বন্ধন করে। বাহিরের সূতার বন্ধন কেবল ঐ ভিতরের নিদর্শন স্বরূপ। যদি সেই ভাবে রাখী-বন্ধন হয়—যাহা জাতিতে জাতিতে মিলাইয়া দেয়, সেই মিলনেই মানবজাতির উন্নতি সিদ্ধ হয়। জাতীয় উন্নতির অর্থ কি ইহা নহে যে, মানবের ভিতর জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রকাশে জ্ঞান, প্রেম ও বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পাদি পর্য্যন্ত সকল উন্নতির দ্বারা খুলিয়া যায় এবং বিচ্ছিন্ন শক্তির মিলনে কার্য্যেরও পূর্ণতা লাভ হয়?

পূজা-পার্ব্বণ দিনে—সমস্ত পূজা-পার্ব্বণগুলি যেন অধিকাংশ মানুষের কুপ্রবৃত্তি জাগাইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক একটি পূজার আমোদে নরনারীকে পশুপ্রায় করিয়া তুলে। কালীপূজার দিনে মদ্যপানের ব্যাপার যে কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা সকলেই জানেন। মানুষ কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া যে মন্দকার্য্য করে তাহা একরূপ, আর যখন তাহাকে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া করে, তখন তাহা আরো সাংঘাতিক হয়। ইহাতে মানুষের পাপ বোধ চলিয়া যায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—বঙ্গের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একটি সুন্দর অনুষ্ঠান, কিন্তু ইহাকে কালের উপযোগী করিয়া উদার ভাবে পরিণত করাই উচিত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা রাখীবন্ধনের উদ্দেশ্য আরও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। কেবল ভগিনীগণ আপন আপন ভ্রাতাকে কেন, সমস্ত নরনারীর মধ্যে যে ভ্রাতৃভগিনী সম্বন্ধ, সেই নরনারীনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠিত হইলে ভাল

হয় না কি? সহোদর সহোদরাদির মধ্যে যে প্রীতি অর্চনার প্রথা আছে তাহাও থাক, কিন্তু শিক্ষিতগণের মধ্যে উদার ভাবে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে সাধারণেও সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

বিজয়া—বিজয়ার দিনে পরস্পরে প্রণাম নমস্কার ও আলিঙ্গন করার যে প্রথাটি প্রচলিত আছে তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিজয়ার "সিদ্ধি পান" প্রথা যে কি চিরকুরীতিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন না? সিদ্ধি কি মাদক দ্রব্যের মধ্যে নহে?

অনুকরণ।

(উদ্ধৃত)

বিলাতে কুকুর থাকিবার জন্য গৃহস্থদিগের স্বতন্ত্র ঘর থাকে। কোন সময়ে এক গৃহস্থের বাড়ীর কুকুরগুলির মধ্যে কোন কুকুর স্বপ্ন দেখিয়া ডাকিতে লাগিল। অপর কুকুরেরা উহার ডাক শুনিয়া কারণ না জানিয়াই তাহার সহিত যোগ দিল, কেবল এক বৃদ্ধ কুকুর চুপ করিয়া রহিল, সে তাহাদের চীৎকারের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কিজন্যে ডাকিতেছে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। তাহার কোন সঙ্গী তাহাকে চীৎকার করিতে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ডাকিতেছ না কেন? সে বলিল, তুমি কি জন্য ডাকিতেছ? সঙ্গী কোন কারণ না পাইয়া বলিল, কেন সকলেই ডাকিতেছে। বৃদ্ধ কুকুর কহিল, আমি যাহা ভাবিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে, তুমি সকলকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা কি জন্য ডাকিতেছে। যদি কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পাও, আমাকে বলিও, আমি তৎপরে ডাকিব।

অন্যে যাহা করে, কারণ না জানিয়া তাহা করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য।

—নীতি-কুসুম।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গানিবাসী ব্যবসায়ীশ্রেণী তাম্বুলবণিক্ (তাম্বুলী) গণের কোন কোন ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার অন্তর্গত বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ক্রমশঃ তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন তাহারাও কুশদহবাসীরই অংশ-বিশেষ। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ মহাশয় তাম্বুলবণিক্ সমাজের বর্ত্তমান সভাপতি।

বিগত কয়েক বৎসর হইল তাম্বুলবণিক্ জাতির উন্নতিকল্পে তাম্বুলি-সমাজ সংগঠিত হয়, ঐ শ্রেণীর ভিতর যে সকল ভিন্ন ভিন্ন 'মেল' বা 'থাক্' আছে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পান ভোজন ও বিবাহ দ্বারা আদান প্রদান প্রচলিত করিয়া জাতীয় প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধি করাই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য, তদনুসারে কয়েকটি বিবাহও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এই সমাজের প্রধান উৎসাহী চরিত্রবান্ অন্যতম নেতা বাবু ভূতনাথ পালের পরলোক গমনে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সম্মিলনসূত্রে অন্যান্য স্থানবাসী শিক্ষিত তাম্বুলবণিক্‌গণের সংস্রবে কুশদহবাসী (সপ্তগ্রামী) তাম্বুলবণিক্‌গণের কথঞ্চিৎ উন্নতির আশা হইয়াছিল। ভূতনাথ বাবুর স্থানে উপযুক্ত নেতার অভাবে সমাজের কাজ ভালরূপ চলিতেছে বোধ হয় না।

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থাননিবাসী তাম্বুলবণিক্ জাতি একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীশ্রেণী। বহুকাল হইতে ঘৃত, চিনি, পাট, সূতা প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া এই শ্রেণী নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে ও পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে সর্ব্বদা অর্থব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বিগত ২৫ বৎসর হইতে ইঁহাদিগের ব্যবসায়ে অবনতি দেখা যাইতেছে। তাহার কারণ বিদেশী চিনি প্রচলিত হইয়া দেশীয় চিনির কারখানাগুলি উঠিয়া গেল। দেশী চিনির কারবারে নিশ্চিত লাভ ছিল, বিদেশী চিনির কারবারে অনিশ্চয়তার ব্যাপারে দাঁড়াইল, অর্থাৎ কখন অত্যন্ত লাভ হইল তৎপরে ততোধিক লোক্‌সান হইল। তাহারও কারণ দেশীয় চিনির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা একরূপ যেন আয়ত্তাধীন ছিল এবং সেই জ্ঞান অনেকটা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু যখন

বিদেশী চিনির যুগ আসিল। তখন প্রথমতঃ ইংরাজী ভাষা জানিবার ও নূতন রকমের বৈদেশিক অভিজ্ঞতার আবশ্যক হইল। কিন্তু যাঁহারা চির-দিন সহজসাধ্য পথে চলিয়া আসিয়াছেন সহসা তাঁহারা এই নূতন বৈদেশীয় অনভিজ্ঞ পথ ধরিতে না পারায়, এক প্রকার বলিতে পারা যায় এই অনভিজ্ঞ-তার জন্যই বিদেশী চিনির ব্যবসায়ে মোটের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কতকগুলি লোকের কারবার বন্ধ হইয়া গেল। এক্ষণেও যেন উন্নতির অপেক্ষা অবনতির দিকেই অধিকাংশের অবস্থা চলি য়াছে। ইঁহারাই প্রথম এদেশে বিদেশী চিনি প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই শ্রেণীর এক দিকে যেমন তাদৃশ আর্থিক উন্নতি দেখা যাইতেছে না, তেমনি অন্য দিকেও শারীরিক ও মানসিক বিশেষ অবনতি সংঘটিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা গতবারে যমুনার স্নানের ঘাট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি পাঠকগণ অবগত আছেন। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে, গোবরডাঙ্গার ষষ্ঠীতলার একটি মাত্র ঘাট, তাহাও এমত সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, একজন সরিয়া না দাঁড়াইলে আর একজন স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে না। এ অবস্থায় এক ঘাটে স্ত্রীলোকে ও পুরুষের স্নান করা যে কি শোচনীয় দৃশ্য তাহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

ঐ গ্রামের মধ্যে 'ষষ্ঠীতলার' ঘাট ও শাণের ঘাটকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলা যায়। গ্রামের অধিকাংশ ভদ্র-স্ত্রীলোক ও পুরুষের এই ঘাটেই স্নান করিতে হয়। আপততঃ এই দুইটি ঘাট পরিষ্কার হইলে গোবরডাঙ্গাবাসীর অনেক উপকার হইতে পারে। গ্রামের সকলেই যদি মনোযোগী হন তবে কি এই ঘাট দুইটি পরিষ্কার হয় না?

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, হায়দাদপুর গ্রামে কিছু কিছু জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে, এ বিষয় হায়দাদপুর কাছারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শিখরী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উদ্‌যোগী আছেন, কিন্তু আমরা গতবারেও বলিয়াছি এবারও বলিতেছি যে, পুরাতন বাগানের অধিকারিগণ মনোযোগী

না হইলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক একটি পুরাতন বাগানের জঙ্গলে গ্রাম আচ্ছন্ন। তাঁহারা কেবল বৎসরান্তে আম কাঁটালের সময় বাগানের সন্ধান লন বলিয়া বাগান ক্রমে ফলশূন্য এবং গ্রাম ও জঙ্গলাকৃত হইতেছে। কিন্তু সময়ে বাগান পরিষ্কার ও পুরাতন বৃক্ষ ছেদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ফলের গাছ বসাইলে লাভ ছাড়া লোক্‌সান কি? বর্ত্তমান সময়ে কাষ্ঠের ত অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। যাহা হউক গ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে গ্রামের লোক যদি একেবারেই দৃষ্টি না করেন তবে আর কি হইবে? এজন্য আমরা হায়দাদপুরের জমিদার মহাশয়ের ও গোবরডাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর এবং বারাশাতের সুযোগ্য সাব্‌ডিভিসান্যাল অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অগ্রিম চাঁদাদাতৃগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ।
" মণিলাল ঘোষ।
" উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
" কালীপ্রসন্ন রক্ষিত।
" দুর্গাচরণ রক্ষিত।
" যোগীন্দ্রনাথ দত্ত।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল।
" হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
" দ্বিজরাজ দত্ত।
শ্রীমত্যা স্নেহলতা দত্ত।
" সরস্বতী সেন।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত।
" হরিপ্রিয় কোঁচ।
" মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু।
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত।
" উপেন্দ্রনাথ বসু।
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। (দেবালয়)
" সারদাচরণ দাস।
" সহায়নারায়ণ পাল।
" শিখরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
" পঞ্চানন সাহা।
" পঞ্চানন পাল।
" শ্রীমন্ত সেন।
" চন্দ্রকুমার ঘোষ।
" মহেশচন্দ্র ভৌমিক।
" বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

দেবালয়ে বক্তৃতা।

বিগত ২৪শে ভাদ্র বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পল্লীস্থ দেবালয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনের মত" বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তামহোদয় স্বীয় বক্তব্য বিষয়ের অবতরণিকা স্বরূপ যাহা বলেন তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলেন,—

"অতি প্রাচীনকালে যখন ইতিহাস লিখিবার প্রথা অথবা লিখনপ্রণালী ইহার কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, সেই সময়ে মিসরদেশ তৎকালোচিত সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মিশরদেশীয় পক্ষীর আকারের ন্যায় লিখন-প্রণালী যাহা এক্ষণে সযত্নে বিলাতের Oxford Museum এবং Paris Museumএ রক্ষিত হইতেছে, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিখন-প্রণালী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মিসরদেশের পর বেবিলোন্, কেলডিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার দেশসমূহ একে একে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। তৎপরে চীনদেশবাসীগণও আপনাদিগকে অনেক উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন। চীনদেশের লোকদিগের ধারণা তাঁহাদের দেশ স্বর্গ Celestial Kingdom এইজন্য তাঁহারা আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। এখনও তাঁহাদের মন হইতে এ ভাব সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই। এই সমস্ত জাতিদিগের ন্যায় ভারতবর্ষও এক সময়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যে সমস্ত জাতির বিষয় উল্লিখিত হইল, তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটি বিষয়-বিশেষের পশ্চাদনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের আদর্শ স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। কেহ বা যুদ্ধে আপনাদিগের অপেক্ষা হীন বল জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের উপর আপন আধিপত্য

বিস্তার করিয়া, কেহ বা বাণিজ্য অথবা শিল্পের উন্নতি-সাধনকে আপনাদের উন্নতির আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া আপনাকে উন্নত করিয়াছিল, তাহা উপরোক্ত জাতি সকলের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতাকে আপনার আদর্শ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই ঋগ্বেদে ভারতবাসীর অতি প্রাচীন কালের সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন কেমন সুখকর এবং শান্তিজনক ছিল। বাস্তবিক সে সময়ে তাঁহারা দুঃখ কি তাহা এক প্রকার জানিতেনই না। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যে সকল সুখ এবং শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, সে সময়ে তাহার কোন প্রকার সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহারা কৃষিকার্য্য অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া যজ্ঞাদি উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে চরু, হবি এবং পিষ্টকাদি পাক করিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করিতেন এবং সোমরস পান করিয়া আনন্দিত হইতেন। বৈদিক যুগের ভারতবাসিগণ যে সুসভ্য ছিলেন তাহা তাঁহাদের এই পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার ভাব হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাদের জীবন অত্যন্ত সুখ এবং শান্তিপূর্ণ ছিল, দুঃখ কি তাঁহারা জানিতেনই না; এমন কি মৃত্যু যাহা অত্যন্ত শোকজনক ব্যাপার তাহাও তাঁহাদের শান্তি অপহরণ করিতে সমর্থ হইত না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহা হইতেই আমরা মৃত্যু যে তাঁহাদিগকে ব্যাথা দিতে পারিত না, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। আখ্যায়িকাটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল;—

কোন সময়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তৎকালীন প্রথানুসারে দাহ অথবা সমাধি দ্বারা মৃতদেহের সংকার করা হইত। উক্ত যুবকের মৃতদেহ সমাধিস্থানে আনীত হইলে পর একটি অঙ্কিত বৃত্তের মধ্যে তাহা স্থাপন করা হইল। প্রথমে তাঁহার স্ত্রী, তৎপরে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, তৎপরে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ, তৎপরে সমাগত দর্শকবৃন্দ সেই মৃত-

দেহকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে মাতঃ বসুন্ধরে—আমরা তোমার মধ্যে আমাদের এই আত্মীয়কে স্থাপন করিতেছি, তুমি ইহার দেহকে সযত্নে রক্ষা করিও, হে মৃত্তিকা, তুমি তুলার ন্যায় হও—তুলার ন্যায় হও' এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা মৃত্তিকা দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিলেন। পরিশেষে আপনারা বলিতে লাগিলেন,—'এ ব্যক্তির জীবনের অবসান হইয়াছে, অতএব ইহার জন্য শোক করা বৃথা; চল আমরা যাহারা আরও কিছুদিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিব, যাহাতে সুখ এবং শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারি তাহার জন্য যত্ন করি।

"পরলোক সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন আত্মা ইহলোক হইতে উন্নত পিতৃলোকে অথবা যমলোকে গমন করে। তথায় আত্মা পিতৃগণ এবং সমস্ত পরলোকগত আত্মার সহিত মিলিত হয়। এই পরলোকের অধিপতির নাম যম। পুরাণে যে যমের ভীষণ চিত্র বর্ণিত হইয়াছে ঐ যম তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইনি পরলোকগত আত্মাগণের অন্নপানের সুব্যবস্থা করেন। ইঁহার বাহন দুইটি সারমেয় পরলোকযাত্রী আত্মাকে পথ প্রদর্শন করিয়া সেই পিতৃলোকে লইয়া যায়। সেখানে যম পরলোকগত আত্মাকে বলেন "তোমার পৃথিবীস্থ আত্মীয় স্বজনগণ তোমার উদ্দেশে যাহা অর্পণ করিবেন তাহা তুমি উপভোগ কর এবং মৎপ্রদত্ত ভোজ্যাদিও উপভোগ করিয়া সুখে অবস্থান কর।" এইরূপে তাঁহারা পরলোককেও সুখের স্থান বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। শৈশবকাল যেমন সুখময় কাল বৈদিকযুগের ভারতবাসিগণের অবস্থাও সেইরূপ শৈশব-কালের ন্যায় অতি সুখের এবং আনন্দের কাল ছিল। এই বৈদিকযুগের অবসানে দার্শনিক যুগের আবির্ভাব হয়।

"খৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এক সহস্র বৎসর পর পর্য্যন্ত এই দার্শনিকযুগ এ দেশে বর্ত্তমান ছিল। এই দার্শনিক যুগের বিশেষত্ব জগৎ দুঃখময়, এই পৃথিবীতে বাস দুঃখভোগ ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ দুঃখভোগের কারণ। এমন সুখ এবং আনন্দের কাল যে বৈদিকযুগ তাহার পর কেন যে এরূপ ভীষণ দুঃখবোধের কাল আসিল, তাহা এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। এই দার্শনিকযুগে

ভিন্ন ভিন্ন অবতারবাদী দর্শনশাস্ত্রকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা দ্বারা কিরূপে এই দুঃখজাল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সংসারের অনিত্যতা-প্রতিপাদক এবং নানাবিধ দুঃখবোধের উদ্বোধক এই দার্শনিক ভাবের স্রোত ভারতের বক্ষের উপর দিয়া অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল। কালক্রমে রামানুজ নূতন যুক্তির অবতারণার দ্বারা এই স্রোত ফিরাইয়া দিলেন। রামানুজ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে শাণ্ডিল্যসূত্র এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তির উল্লেখ আছে; তথাপি তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই বলিয়া এবং রামানুজের মত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রামানুজকেই ভক্তিপথের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রামানুজ বলিলেন,—এ সংসার কেবল দুঃখময় নহে, ইহাতে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে। ইহলোকে দেহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের নামগুণানুকীর্ত্তন এবং তাঁহার অর্চ্চনাতেই পরম সুখ। এ সংসারকে দুঃখময় ভাবিয়া এখান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজন নাই; আমরা যতদিন ইহলোকে থাকিব শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অর্চ্চনাতে যে পরম আনন্দ তাহা উপভোগ করিয়া ধন্য হইব। আমাদিগকে জন্ম জন্ম মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া যদি সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ, কেননা তদ্দ্বারা আমরা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া ধন্য জীবন হইতে পারিব।

"এইরূপে রামানুজ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু এ স্থলে এ কথা স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, যে ভারত এতদিন কেবল নির্গুণ শুদ্ধ সত্ত্বমাত্র আত্মারূপী ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত ছিল, অকস্মাৎ কিরূপে সেই ভারতবাসীর মনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ভাব উদিত হইল। যে সময়ে রামানুজ স্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান ধর্ম্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভাবের পরিপোষক অনেক তত্ত্ব ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে লাভ করিয়াছিলেন। রামানুজের পর মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তিপথের আচার্য্যগণ এই নূতন ভাবস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন এবং পরিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বঙ্গদেশে বিশেষভাবে এই ভক্তিমার্গকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সর্ব্বশেষে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মকে তাঁহার বহুলশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গবেষণার ফলে নূতন আকার দান করেন। ইহাই এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে সুপরিচিত। রামানুজ স্বামী যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন সে স্রোত এখনও রুদ্ধ হয় নাই। জানি না ইহার পরিণাম কি।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় বলিতে গিয়া অবতরণিকা স্বরূপ যাহা বলা হইল তাহা না বলিলে অদ্যকার আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুটরূপে বুঝা যাইবে না, এবং আমারি মনেও একটা ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতাকে আপনার জীবনের এবং উন্নতির আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন,—ভারতবাসী ইহার দ্বারা আপনার প্রভূত অকল্যাণ-সাধন করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এই আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করিয়া শারীরিক বলবিধান এবং পার্থিব উন্নতিকে আপনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেন; তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এরূপ হীনবল হইয়া পরপদানত হইয়া থাকিতে হইত না।' আমি বলেতেছি,—ভারতবাসীর এ আদর্শ একদিন না একদিন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আধ্যাত্মিকতার প্রধান লক্ষণ অহিংসা এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন। বৈদিগযুগের ভারতবাসিগণ যজ্ঞাদি উপলক্ষে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাবের আদান প্রদান করিতেন। এমন কি পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণও তাঁহাদের এই ভ্রাতৃভাবের বহির্ভূত ছিল না। দার্শনিকযুগেও বুদ্ধদেব এই ভ্রাতৃভাব বিশেষভাবে প্রচার করেন। অহিংসা, সাম্য এবং মৈত্রী তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি জীবহিংসার কিরূপ বিরোধী ছিলেন তাহা 'বিনয় পিটকের পতিমোক্ষ সুত্তে' ভিক্ষুকদিগের দৈনিক জীবন যাপন বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তৎপাঠে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—যে স্থান দিয়া সৈন্যগণ গমন করিবে, ভিক্ষুকগণ সেই স্থান দিয়া গমন করিবেন না; অথবা অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শ্রবণ করিবেন না। জৈনধর্ম্মের সংস্থাপক জিনও উক্ত মত বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীরা এখনও রাত্রিকালে গৃহে আলোক প্রজ্বলিত করেন না, কারণ যদি কোন কীট পতঙ্গাদি তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। তাঁহারা সূর্য্যাস্তের, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে স্থানেই থাকুন না কেন গৃহে অথবা স্বীয় আবাসস্থানে প্রত্যাগমন করিবেনই।

করিবেন। তাঁহারা এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণও পাকাদির জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না। তাঁহারা দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে কোন গৃহস্থের বাটীতে গিয়া উপনীত হন এবং গৃহস্থ ভিক্ষায় স্বরূপ যাহা দান করেন তাহাই ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। আমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারতবাসীর অবলম্বিত আদর্শ-আধ্যাত্মিকতাকে সমস্ত পৃথিবীকে আপনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

"সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে জনৈক Rusian কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি শাক্যমুনির জীবনচরিত সমালোচনার্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"রুসিয়া দেশে অকারণে নরহত্যা সংঘটিত হয় দেখিয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইতাম এবং আমার মনে হইত যদি কোন মহাপুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি এই ভীষণ নরহত্যার পরিবর্ত্তে শান্তি এবং ভ্রাতৃভাবের রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিতে পারেন।' তদনন্তর তিনি রুষিয়া হইতে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে ইটালি গমন করেন। তথায় কোন পুস্তকালয়ে বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের পরিচয় পাইয়া তাহা পাঠ করেন। এই পুস্তকে তাঁহার মনোমত মহাপুরুষের সন্ধান পাইয়া তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রচারিত মহান্ ধর্ম্মবার্ত্তাকে সমগ্র সভ্য জগতে প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে গ্রন্থকার কিরূপ হৃদয়ের আবেগের সহিত ইহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারা যায়। পরিশেষে গ্রন্থ সমাপন করিয়া তিনি সমস্ত সভ্য জাতির নিকট রুষিয়া দেশে যাহাতে নরহত্যা নিবারিত হইয়া ভ্রাতৃভাব এবং শান্তি সংস্থাপিত হয় তাহার জন্য সহায়তা করিতে আবেদন করিয়াছেন। জার্ম্মাণি প্রভৃতি অন্যান্য সভ্য দেশেও যেমন হিন্দুশাস্ত্র বৌদ্ধশাস্ত্র এবং জৈন-শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হইতেছে, আশা করা যাইতে পারে, কালক্রমে উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহের সম্যক্ মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়া পৃথিবীকে শান্তি এবং ভ্রাতৃভাব স্থাপনে অগ্রসর হইবে। (ক্রমশঃ)

বাগআঁচড়ার একটি রত্ন।

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার প্রায় ১০ ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তরে যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রাম অবস্থিত। বাগআঁচড়া নিবাসী মল্লিকবংশের একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। তাঁহারা যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নবাব সরকারে কার্য্য করায় যে সকল সম্মানসূচক উপধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মল্লিক, মযদার, হালদার প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহারা কোন সময়ে সামাজিক দলাদলির গোলযোগে পড়িয়া হিন্দুসমাজচ্যুত হইয়া "পীরালি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। এজন্য তাঁহাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত নানা প্রকারে সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। পল্লীগ্রামবাসী, দরিদ্র, সামাজিক-বলহীন লোকের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কলিকাতা-বাসী ঠাকুরবংশীয়গণ এত উন্নত হইয়া—এমন কি আজ যে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পরিবার ধনে, ধর্ম্মে, গুণে, বিদ্যায় সর্ব্বগুণান্বিত হইয়াও জাত্যভি-মানিগণের নিকট আজও যখন আদর্শ পরিবার নহেন, তখন আর পল্লীগ্রামের গরীবের কথা কি বলিব। এই কারণে বাগআঁচড়ার মল্লিকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিচিত্রতা ঘটিয়াছিল।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম চারিদিকে ঘোষিত হইতে লাগিল তখন বাগআঁচড়ানিবাসী কয়েক ব্যক্তি কলিকাতায় আসিয়া যোড়া-সাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। তৎকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপাসনা ও উপদেশ, তাঁহাদের প্রাণে বড়ই ভাল লাগিল। শুনা যায় তখন হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কলিকা-তায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় হলধর মল্লিক একজন।

তৎপরে যখন মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত "ব্রাহ্মোপাসনাসমাজে" প্রতিভাশালী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি বাগআঁচড়ায় আসিলেন এবং গোস্বামী মহাশয় দীর্ঘকাল তথায় সপরিবারে বাস করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণালীপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগি-লেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের মধ্যেই অনেকে বিরোধী হইলেন, কিন্তু ক্রমে

বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মজীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সহজ সত্য সকল যতই বুঝিতে পারিলেন, ততই সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় বাগআঁচড়ায় প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইল। অনেকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী প্রকৃত ধর্ম্ম ও সমাজ অভাবে নিষ্প্রভ ভাবে ও নানা কুসংস্কারের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে সরল সত্যের মাধুর্য্যে তাঁহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন। এবং সামাজিক ভাবেও বালক বালিকা, যুবক যুবতীগণ সৎশিক্ষা লাভ করাতে কিছু কালের মধ্যে বাগআঁচড়ার অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইল।

আমরা এতক্ষণে বাগআঁচড়া ও মল্লিকদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম মাত্র। এক্ষণে তথাকার যে মৃত্যুটির কথা বলিব তাহা অতীব শোকাবহ ঘটনার কথা।

বর্ত্তমান সময়ের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে উপরিউক্ত গ্রামে শ্রীমান্ শশধর হালদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় যদুনাথ হালদার মহাশয়। এইস্থানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলিব। বিগত ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা হয়দাদপুর গ্রামে বাগআঁচাড়া নিবাসী বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বর মল্লিক দুই ভ্রাতায় বহুদিন পর্য্যন্ত পাঠশালা করিয়াছিলেন। বোধ হয় এখনও খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা ও হায়দাদপুরে কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা বিশ্বম্ভর, পীতাম্বর মল্লিক গুরু মহাশয়ের নাম ভুলেন নাই। ফলতঃ তৎকালীন তাঁহাদের পাঠশালায় হস্তলিপি ও শুভঙ্করী শিক্ষা অতি সুন্দর হইত। বিশ্বম্ভর মল্লিক মহাশয় শশধর বাবুর মেসো মহাশয় ছিলেন।

৭।৮ বৎসর বয়সে শশধর বাবুর পিতৃবিয়োগ হয় এবং ১০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকেন ; কিন্তু তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বড়ই মন্দ ছিল এরূপ ঘোর দারিদ্রতার ভিতর তাঁহার জীবনে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইতে থাকে—যাহা যৌবনে আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করে। এত অভাব ছিল যে, সকল দিন তাঁহার আহার জুটিত না, কিন্তু কেহ জানিতে পারিতেন না, যে তাঁহার আহার হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে একটি বিশেষ ঘটনা অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারে পুত্রবৎ কিছুকাল বাস করেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন।

শশধর বাবুর যখন ১৭।১৮ বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়; তাঁহার একটিমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও একটি কনিষ্ঠা ভগিনী সহ তখন তিনি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার মাতৃষসা ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিশ্বম্ভর মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাদিগকে লালন পালন করিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের মাতৃবৎ হইয়া আছেন।

শশধর বাবু এই প্রকার সাংসারিক বিপদ্ পরীক্ষার মধ্যে থাকিয়াও এমন শিক্ষানুরাগী হইয়াছিলেন যে, তিনি এই সময়ের মধ্যে সিটিকলেজে বি এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, তৎপরে দেড় বৎসর ময়মনসিং সিটিস্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। এত দরিদ্রতার পর, অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ও সংসারের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি এই সঙ্কল্প মনে রাখিয়া, ইংরাজী ১৯০৫ সালের ২৩শে আগষ্ট "ম্যান্‌চেষ্টার স্কলারসিপ্" লইয়া ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে ইংলণ্ডে গমন করেন। অক্সফোর্ডে মিউ ম্যান্‌চেষ্টার কলেজে ২ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপক (প্রফেসর) গণের মধ্য হইতে যে সকল পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবং তিনিও ইংরাজ জাতির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কোন বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানি হইতে কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

"এখানকার ইউনিটেরিয়ান্ বন্ধুরা যথার্থই ভাল। এমন ভদ্র এবং অমায়িক যে কি বলিব। এঁদের প্রেম ও সহানুভূতির কাছে বাস্তবিকই আমরা লাগিনা। এমন সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করিতে আমরা জানি না। আমি ইহার দ্বারা একথা বলিতেছিনা যে, ইংরাজরা সবই ভাল। কিন্তু মোটের উপর এদের ব্যবহার বড় মিষ্ট। বিশেষতঃ এই ইউনিটেরিয়ানদের। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসারগণ যে ভাবে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ও মেশেন, তাহা দেখিয়া শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধের বিষয় আমার নূতন ধারণা জন্মিতেছে। আমাদের দেশে ছাত্র ও শিক্ষকে অনেক তফাৎ। এখানে দেখিতেছি শিক্ষকদের সঙ্গে যত মেশা যায়, ততই লাভ, শিখিবার সুযোগও অনেক। আমাদের

প্রিন্সিপাল Dr. Cerpanter বড় ধার্ম্মিক লোক, তিনি ভারতবর্ষের কথা অনেক জানেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক খবর রাখেন।"

কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার মনে, হিন্দুদর্শনকে পাশ্চাত্য জগৎ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয় এবং এ সম্বন্ধে জার্ম্মানীতে সবিশেষ অলোচনা হইয়াছে শুনিয়া বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর জার্ম্মানী গমন করেন, কিন্তু হায়! ১৩ই অক্টোবর সহসা ড্রেস্‌ডেন নগরে পরলোক গমন করিলেন। শুনা গেল তাঁহার প্রথমে জ্বর হয় তৎপরে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কয়েক দিনেও জ্ঞান হইল না। এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তথাকার ডাক্তারগণ বলেন খাদ্যের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করায় এই রূপে মৃত্যু হইয়াছে।

এক্ষণে তঁাহার শোকে তাঁহার সকল আত্মীয়গণ ও ভ্রাতা ভগিনী ও মাতৃস্বসা ঠাকুরাণী যে কি প্রকার শোকাকুল হইয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তৎপরে তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংলণ্ডেরও অনেকগুলি ধর্ম্মাত্মা নরনারী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের শশধর বাবুর জন্য এতাধিক দুঃখিত হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে, ইদানি যে কয়েকটি ভারতবাসি ইয়োরোপে উদার একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, শশধর বাবু তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনি এই ধর্ম্ম প্রচারে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সহসা শশধর বাবুর অভাবে আমরা ভাবিতেছি বিধাতার এ কি লীলা! কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে, কখন কখন 'বিধাতা' তাঁহার দাসকে ইহলোকের কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া আরও গভীর ভাবে তাঁহার কার্য্য করান।

আমরা শশধর বাবুর গুণ ও শক্তির কথা বিশেষ কিছু এ প্রবন্ধে বলিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র একটি ঘটনার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় কোন সময় একদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একটি বক্তৃতা করেন। অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা সাধারণতঃ ভালই হইয়া থাকে। ঘটনা ক্রমে সে দিনের বক্তৃতাটি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লওয়া হয় নাই। পরে কথা হইল বক্তৃতাটি কি কেহ স্মরণ করিয়া

যথাযথ ভাবে লিখিতে পারেন? এ কথা শশধর বাবু শুনিয়া বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখিব। তৎপরে দেখা গেল তিনি এরূপে বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া গেলে যেরূপ হয় ইহাও তদ্রূপ হইয়াছে। এই ঘটনায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলেন, "তুমি শশধর নহ, তুমি শ্রুতিধর।"

স্বর্গ ও নরক।

(গল্প)

কোন নগরে এক মহিলা বাস করিতেন। একদা কোন মহাত্মা সাধুর ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার সাংসারিক ভাবের পরিবর্ত্তে প্রাণে ধর্ম্মভাব উপস্থিত হয় তৎপরে তিনি ঐ সাধুপুরুষের উপদেশ মতে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হন। ইহার পর সাধু পুরুষ আপন অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যান।

মহিলা নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত থাকায় ঈশ্বর কৃপায় অনতি বিলম্বে বিশ্বাস ভক্তির রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়া জীবনে শান্তি লাভ করেন।

ভগবানের করুণা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। এক সময় উক্ত মহিলা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী ছিলেন, কিন্তু যখন বিধবা হইলেন তখন অধিকাংশ স্থলে যাহা হয়, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ সবলের কৌশলে দুর্ব্বলাকে বিষয় বঞ্চিত হইতে হইল। কিন্তু সময়ে সত্যের জয় হইল, যিনি এক দিন অন্যের পক্ষে প্রবল ছিলেন আজ তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া কালের অধীন হইলেন; সুতরাং উপযুক্ত সময়ে মহিলা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

যে সময়ে তাঁহার হস্তে পুর্ব্ব সম্পত্তি ফিরিয়া আসিল তখন তাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও, তিনি বিধাতা প্রদত্ত ধন উপেক্ষা করিলেন না, এবং এই ঘটনায় ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া জনসেবায় অর্থ নিয়োগ করিলেন। অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদিগের আশ্রয় স্থান হইয়া সেবাশ্রমের জন্য এক্ষণে তাঁহাকে প্রশস্ত বাসগৃহে অবস্থিতি করিতে হইল। বিশেষতঃ বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভদ্র কর্ম্মচারী প্রভৃতির স্থান করিতে হইল। বলিতে গেলে এক্ষণে বাহির হইতে তাঁহাকে বিশেষ অবস্থাপন্ন ধনশালিনীর ন্যায়ই অনুভূত

হইত। কিন্তু তিনি কয়েকটি সহচরী বিধবা মহিলা সহ যে ভাবে ধর্ম্মসাধন ও সেবাব্রত পালন করিতেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক বৈরাগ্য ভাব গোপন থাকিত না।

মহিলা যখন এই অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাত্মা ঐ নগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সন্ধান লইলেন। যদিও প্রথমে যে স্থানে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন সেখানে আর দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু একটু অনুসন্ধানেই সন্ধান পাইয়া মহিলার আবাসে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বহুকাল পরে ধর্ম্মপিতা গুরুদেবের দর্শনে মহিলা বড়ই আনন্দিতা হইলেন, কিন্তু সাধুর মনে হইল কি জন্য মহিলার এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল? যাহা হউক তখন তিনি সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া বিশ্রামাদি করিতে লাগিলেন এবং মহিলা তাঁহার প্রভূত সেবা শুশ্রূষা করিলেন।

বিশ্রামাদির পর যখন তিনি সকলের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন, তখন মহিলা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াও সহসা কিছু না বলিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেন। সেই বিষয়ে কিছু বলিতে বলিতে সাধুপুরুষ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, এমত কালে রাজপথ দিয়া কতকগুলি লোক "হরিবোল" ধ্বনি করিয়া 'শব' লইয়া যাইতেছে শ্রুত হইল। তখন মহিলা একটি সহচরীকে কহিলেন, "ভগিনি, দেখিয়া আইস, শবদেহ এই যাহারা লইয়া যাইতেছে তাহারকি গতি হইবে? তাহাকে যমদূতে লইয়া যাইতেছে, কি স্বর্গদূতে লইয়া যাইতেছে? ইহা শুনিয়া সহচরী তদুদ্দেশে চলিয়া গেলেন। ইহাতে সাধুপুরুষ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোমার এই প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। কিরূপেই বা তুমি এত ধনশালিনী হইলে এবং তোমার ধর্ম্মজীবনে বা কিরূপে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইল যে শবদেহ দেখিয়া বলিতে পার যে, তাহাকে যমদূতে কি স্বর্গদূতে লইয়া গেল?

তখন মহিলা সবিনয়ে আপন অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিবরণ অর্থাৎ যে প্রকারে পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন তাহা জানাইয়া কহিলেন,—এ সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে সহচরী আসিয়া

কহিলেন,—"উঁহাকে যমদূতে লইয়া গেল।" ইহার কিছুক্ষণ পরে আরও একটি শব লইয়া যাইতেছিল কিন্তু তাঁহাকে দেখিলাম স্বর্গদূতে লইয়া গেল।"তখন মহিলা সাধুর প্রতি দৃষ্টিপাত ও ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, পিতা—উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন কিরূপে তিনি যমদূত ও স্বর্গদূত চিনিতে পারিলেন। সুতরাং সাধুর দ্বারা সহচরী জিজ্ঞাসিত হইলে সহচরী বিনীত ভাবে কহিলেন, পিতা, এ ত কঠিন কথা নহে। যখন প্রথম শব লইয়া যাইতেছিল, তখন দেখিলাম তাঁহার পশ্চাৎ লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"কে মারা গেল গা?" শববাহকের মধ্য হইতে যেমন তাহার নাম করিল,তাহার পশ্চাতে সকলে বলিতে লাগিল,—আঃ! "দেশের কণ্টক গেল! কত লোককে যে জ্বালাতন করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না।" ইত্যাদি। সুতরাং যাহার জীবিত কালে তাহার দ্বারা লোকে এত কষ্ট পাইয়াছে, তাহার অন্তর কত মলিন ছিল, সে ত জীবিত কালেই অন্তরে নরকবাস করিতেছিল। তাহাকে কি স্বর্গদূতে লইয়া যাইতে পারে? আর শেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন লোকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিল তখন তাঁহার নাম করিয়া সকলে একবাক্যে বলিল,— "আহা! আহা! এমন লোকও গেল! আজ কত লোকের অন্নের সংস্থান উঠিল কত বালক বালিকা অনাথ হইল ইত্যাদি"। অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ রূপই বলিতে বলিতে যাইতেছিল। তবেই জীবিত কালে যাহার দ্বারা লোকের এত দুঃখ দূর হইত, তাঁহার হৃদয়েই ত স্বর্গ বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং তাঁহাকে কি যম-দূতে স্পর্শ করিতে পারে?" এই কথায় সাধুপুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

আত্ম-বিচার।

আমরা যদি কাহারও দ্বারা দুঃখ বা অশান্তি ভোগ করি, তবে সহজেই সেই ব্যক্তিকে আমার এই দুঃখ অশান্তির কারণ জানিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই; আরও কত কি করি। কিন্তু যদি দিব্য-জ্ঞান-দৃষ্টিতে এই বিষয় আত্ম-বিচার করিয়া দেখিতে পারি তবে দেখিতে পাই, আমার প্রত্যেক দুঃখ অশান্তির কারণ কেবল অপরে নহে, কিন্তু আমিও। আমি প্রতি রাত্রিতে গৃহে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, তাহার মধ্যে যদি সহসা এক-

দিন দেখি আমার ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে, আমি তখন হায়! হায়! করিতে করিতে কত কি করিতে প্রবৃত্ত হই। অবশ্য জনসমাজের সাধারণ নিয়ম রক্ষার জন্য যে সকল রাজবিধি, সমাজবিধির আবশ্যক হয়, মানুষ আত্মরক্ষার জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তরাজ্যের সূক্ষ্ম নৈতিক বিচারে দেখি, আমার দুঃখের জন্য আমিই দোষী। চোর যে আজ আমাকে দুঃখিত করিল বা অশান্তিতে ফেলিল তাহার কারণ কি আমি নহি? আমি কেন অজ্ঞানদিগের জ্ঞানবিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করি নাই? কেন আমি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি দ্বারা সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার না করিয়া, হীনজাতি জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া, তাহাদিগকে দূরে দূরে রাখিয়া আমার শত্রু হইবার সুযোগ দিয়া আসিয়াছি? আমি আমার অর্থ কেন যথাসাধ্য গরীবের সেবায় কিছু কিছু না দিয়া অভাবগ্রস্তকে আজ চোর হইবার সহায় হইয়াছি? আমি যদি তাহাদিগকে আমার অর্থ হইতে কিছু কিছু দিয়া আসিতাম, তবে কখনই আমার এই গরীব-বঞ্চিত সঞ্চিত অর্থ তাহারা অপহরণ করিতে পারিত না এবং আমাকেও আজ এই দুঃখ অশান্তিতে পড়িতে হইত না।

স্থানীয় বিষয়।

(গোবরডাঙ্গার অভাব)

কিছুকাল হইতে অধিকাংশ পল্লীগ্রামের জনসংখ্যা কমিয়া আসিতেছে ও শ্রীহীন হইতেছে, তাহার একটি প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। গোবরডাঙ্গার অবস্থাও কতকটা ঐরূপ বটে, কিন্তু এখনও অনেক গ্রাম হইতে গোবরডাঙ্গার অবস্থা ভাল বলা যায়।

গোবরডাঙ্গা, খাঁটুরা, হয়দাদপুর, গৈপুর গ্রাম লইয়া গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটি। রাস্তাগুলির অবস্থা মন্দ নহে। তৎপরে গোবরডাঙ্গা, খাঁটুরার মধ্যে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল, একটি মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ও কয়েকটি পাঠশালাও আছে। দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে প্রতিদিন সমাগত রোগী

ঔষ্ধ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরিত হয়। উপযুক্ত ডাক্তার (প্রাক্‌টিসনার) অনেকগুলি আছেন; ২।৩টি কবিরাজও আছেন। পোষ্ট আফিস গোবরডাঙ্গায় ১টি ও খাঁটুরায় ১টি আছে। গোবরডাঙ্গা, রেলওয়ে ষ্টেশন। বাজার-হাট, দোকান পাট প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট আছে। ফলতঃ সাংসারিক অভাব মোচনোপযোগী যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা মোটামুটি একপ্রকার আছে বলা যায়। কেবল শিক্ষাবিষয়ে একটি বিশেষ অভাব আছে যে, এত বড় ভদ্রগ্রামে একটিও বালিকা-বিদ্যালয় নাই। ইতি-পূর্ব্বে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রথমে খাঁটুরা গ্রামে, পরে গোবরডাঙ্গায় ছিল; সে স্কুলটি উঠিয়া গেলে স্থানীয় লোকের দ্বারায় আর কোন চেষ্টা হয় নাই। যে ১০।৫টি বালিকা বালক-পাঠশালায় যায়, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই ভাল হয় না।

তৎপরে আর একটি গুরুতর অভাব আমরা অনুভব করিয়া আসিতেছি এবং তাহার অভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রামের নৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হইতে না পারায়, অনেক প্রকারে অনিষ্টের কারণ হইতেছে ও গ্রামের আভ্যন্তরিক অবস্থার অবনতি হইতেছে; সে অভাব জ্ঞানালোচনার কোন ব্যবস্থা না থাকা। মানবের উন্নতির জন্য আর যে সকল চেষ্টা হউক না কেন, জ্ঞানের উন্নতি করিতে না পারিলে মানবের প্রকৃত উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না।

আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় এ সম্বন্ধে একটি সদুপায় বিশেষ উপযোগী মনে করি;—গোবরডাঙ্গার কোন প্রকাশ্য স্থানে (সম্ভবতঃ বাজারেও হইতে পারে) একটি "সাধারণ-পাঠাগার" (পাব্‌লিক লাইব্রেরী) স্থাপন করিতে পারিলে ইহার দ্বারা দেশের লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে। এই লাইব্রেরীর জন্য অগ্রে দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এবং এই লাইব্রেরীর সহিত, জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি সমিতিও থাকা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে এই সমিতিতে জ্ঞানীদিগের দ্বারা বক্তৃতা করান আবশ্যক। এই কার্য্যে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হইলে অতি সহজে সকলেই উৎসাহিত হইতে পারে। এই উপায়ে প্রত্যেক পরিবারের বালক যুবকগণের কল্যাণসাধন হইতে পারিবে। এখন যাহারা

থিয়েটার ইত্যাদির আমোদে চিন্তা-বিহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে ইহাতে তাহাদের মতি গতি, স্বভাব চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমরা এ কার্য্যের নেতৃত্বে জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন বাবুকে মনোনীত করিয়া বিশেষ ভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের যথেষ্ট হিতসাধন করিতে পারেন।

স্থানীয় সংবাদ।

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ গোবরডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র কর্ম্মকারের সোনা রূপার দোকান-ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া চোর প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডুর বাড়ীর সদর ঘরে হরিদাস কর্ম্মকারের ঐরূপ দোকান-ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে, তাহাতেও কিছু লইতে না পারিয়া ঐ পার্শ্বস্থ অন্য ঘরের চাবি ভাঙ্গে। কিন্তু সে ঘরে রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যে মুদিখানা দোকান ছিল, তাহা কয়েক দিন পূর্ব্বে তুলিয়া লইয়া যাওয়ায় ঘরটিতে কেবল চাবি দেওয়া ছিল, সুতরাং খালি ঘরে-কিছু না পাইয়া চলিয়া যায়। চোরে এক রাত্রিতে ৩টি ঘরে চুরির যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা যে ইতর সাধারণ লোকের দ্বারা ইহা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। বিগত দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে শ্রীনাথ কর্ম্মকারের গহনার দোকানে যে প্রকার চুরি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অসাবধানতার ফল। উহা যে নিকটস্থ জানাশুনা লোকের দ্বারায় হইয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। পুলিস যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না; পুলিস কিছু করিতে না পারিলে দু কথা বলা একটা রীতি আছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক স্থলে বৃথা বাক্যব্যয়ে পর্য্যবসিত হয় মাত্র যাহা হউক এই দুই বারে যে চুরি ও চুরির চেষ্টা হইল, ইহার প্রথমটি দেশের নৈতিক অবনতীর ফল, দ্বিতীয়টি দরিদ্রতার ফল বলা যায়, অর্থাৎ ভদ্র লোকের চরিত্র হীন হইলে এই প্রকারে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং আহার অভাবে নিম্নশ্রেণীর লোক চোর ডাকাত হয়।

প্রার্থনা।

"তোমারি নামে ফুটেছে ফুল, গন্ধে প্রাণ করেছে আকুল,
যতনে গাথিয়া এনেছি মালা,
আদর করে একবার পরনা"।

বিনীত অনুরোধ।

আমরা যাঁহাদের হাতে 'কুশদহ' (পত্রিকা) প্রদান করিতে পারিতেছি, সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রথমতঃ এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন কাগজ খানি একবার পাঠ করেন। অবশ্য, যাঁহারা পাঠ করিয়া অযাচিত ভাবে আমাদিগের নিকট সদ্ভাব ও আনন্দ-সন্তোষ প্রকাশ দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি। ইহার মধ্যে যে সেই ভগবানের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তাঁহার আদেশে যে আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কি তাহারই নিদর্শন স্বরূপ মনে করিব না? কেন না, কুশদহ প্রচার দ্বারা যদি ১০।৫ টি আত্মাতেও আনন্দ সন্তোষ, শান্তির আভাস উৎপন্ন করিতে পারা যায়, কিম্বা কাহারও মনে যদি নবভাব, নবসংস্কারের বল আনিয়া দেয়, তাহাতে আমরা কৃতার্থ বোধ করিব। কিন্তু যাঁহারা কাগজ খানি হাতে পাইয়াও, যে কারণেই হউক না কেন, একবার পাঠ করেন না, আমরা তাঁহাদিগকেই এই অনুরোধ করিতেছি।

হয়ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের কাগজ পড়িবার সময় হয় না, কিন্তু সে কথা কি খুব ঠিক? 'মন' থাকিলে, এক মাসের মধ্যে একবার এই ক্ষুদ্র কাগজ খানি পড়িবার সময় হয় না, এ কথা, অন্ততঃ যুক্তি সঙ্গত নহে। সুতরাং সময় আছে, কিন্তু মন নাই, অর্থাৎ মন হয় না বলিয়া সময়ও হয় না; সেই পক্ষেই মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা এই অনুরোধ পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

হইতে পারে কুশদহে প্রকাশিত বিষয় গুলি সকলেরই অনুরাগ আকর্ষণ করিবার পক্ষে উপযোগী নহে, তথাপী আমরা—উপদেশের ভাবে নহে, কিন্তু পরীক্ষিত সত্য বলিয়া তাঁহাদের এই অনুরোধ করি, যে প্রথমতঃ যখন পড়িতে আরম্ভ করিবেন তখন একটু জোর করিয়া মনকে পাঠে নিবেশ করিবেন; দেখিবেন, পড়িতে পড়িতে ভাল লাগিবে, তাহার ভিতর হইতে কত ভাব, কত নূতন আনন্দ পাইবেন।

তারপর আর একটি কথা,—কুশদহ সম্পাদক, ব্যক্তিগত ভাবে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রয়াসী। কুশদহ পত্রিকা খানি যদিও ক্ষুদ্র, তথাপী বিশেষ বিশেষ কারণে, সম্পাদকের পক্ষে তাহা অসামান্য বিষয় হইয়াছে। বিশেষ পরিশ্রমের পর ইহাকে সকলের হাতে দিতে পারিতেছি। এমত স্থলে, যদি একবার সকলে পাঠ করিয়া না দেখেন, তাহা কত কষ্টের বিষয় হয় ভাবিয়া দেখুন। আর ইহাতে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী করা হয় না? অতএব সকলের নিকট অনুরোধ, যে একবার যেন কাগজখানি পাঠ করেন। বিশেষতঃ স্থানীয় বিষয় গুলি, স্থানীয় ব্যক্তি মাত্রেই যেন একবার করিয়া পাঠ করিয়া দেখেন। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহাদের মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।

এবার নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া পৌষের সংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায়, পৌষ ও মাঘ উভয় সংখ্যা একত্রে বাহির করিতে হইল, আশাকরি তজ্জন্য কেহ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

তারপর আর একটি কথা, আমরা কুশদহ পত্রিকা কুশদহ-বাসীর অনাদরের বস্তু হইবে না এই ভরসায় অনেক স্থলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাগজ পাঠাইয়াছি, তজ্জন্য সকলেই যে উহা লইতে বাধ্য এমন ত কোন কথা নাই? তবে, পর পর গ্রহণ করিলে একটা দায়ীত্ব জন্মায়; অথচ এখনও যদি কেহ অনিচ্ছুক থাকেন আমাদিগকে (৫ এক পয়সার কার্ডে) লিখিয়া জানাইলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা আর ক্ষতিগ্রস্থ হইব না; কিন্তু অসমর্থ স্থলে, অথচ কাগজ পাঠে আগ্রহ আছে জানিতে পারিলে, আমরা বিনা মূল্যে কাগজ পাঠাইতে কাতর হইব না। অন্যথা চাঁদার জন্য যাঁহার যাহা দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা পাঠাইলে বাধিত হইব। সকলেই যদি পশ্চাৎ দেয় মনে

করেন, তবে আমরা কিরূপে কাগজ চালাইব? কিন্তু আমরা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে এ পর্য্যন্ত সাধারণ চাঁদা ও বিশেষ দান যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যন্ত, আশাপ্রদ, কেবল অল্পদিনে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় আমাদের অর্থ-কষ্ট দূর হইতেছেনা। আমরা যথাস্থানে চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। (কুঃ সঃ)

অনন্ত প্রেমে জীবের উৎপত্তি, স্থিতি, ও উন্নতি। *

যিনি আপনার অন্তরে সেই প্রেমস্বরূপের প্রতি প্রেম অনুভব করেন, তিনি ধন্য! আবার, যিনি অনুভব করেন যে, যেমন তিনি সেই প্রেমস্বরূপকে ভালবাসিতেছেন সেইরূপ, সেই প্রেমস্বরূপও, তাঁহাকে ভালবাসিতেছেন। এই উভয় প্রেমের মিলন যিনি অনুভব করেন, তিনি আরও ধন্য!

মানুষ কি বলিতে পারে যে, আমি অগ্রে ঈশ্বরকে ভালবাসিয়াছি, তাহার পর তিনি আমাকে ভালবাসিয়াছেন? অগ্রে তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছি, তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করিয়াছি, তাহার পর, তিনি আমাকে ভালবাসিয়াছেন? অগ্রে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে ভালবাসিয়াছেন? এ সকল অসম্ভব কথা।

আমার জন্মের পূর্ব্বে ভবিষ্যতের গর্ভে, আমাকে দেখিয়া তিনি কি আমাকে ভালবাসিতেন না? যখন জননী জঠরে, জরায়ু-শয্যায় শয়ান ছিলাম, তখন কি আমি তাঁহাকে জানিতাম? কিন্তু তখন কি তিনি আমাকে ভালবাসিতেন না? অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া মাতা আমাকে প্রসব করিলেন। সেই যাতনার জন্য তিনি কেন তাঁহার শিশুকে ফেলিয়া দিলেন না?

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত উপদেশ।

সেই মাংসপিণ্ডে এমন কি গুণ, কি আকর্ষণ ছিল যে, তিনি আমাকে অমূল্য রত্ন মনে করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন? কোথা হইতে, মাতৃ-হৃদয়ে, আশ্চর্য্য অপত্য-স্নেহ আসিয়া, দুর্ব্বল অসহায় শিশুকে রক্ষা করিল? এই যে সুগভীর মাতৃস্নেহ ইহা সেই বিশ্বমাতার অপার স্নেহ-সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্র!

পরমেশ্বরের প্রেম অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার প্রেম পূর্ব্ববর্ত্তী। অদ্য যেমন, গত কল্য সেই রূপ ছিল, অনাদি কালে সেইরূপ। অনাদি অতীত কাল হইতে, তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে জানেন, প্রত্যেককে ভালবাসেন। অনাদি অতীত কালে, বর্ত্তমানে, এবং অনন্ত ভবিষ্যতে আমরা সেই ত্রিকালজ্ঞ প্রেমময় পুরুষের প্রেমাস্পদ। তাহার প্রেম চিরকাল।

মনুষ্য মাতার, অপত্য স্নেহ কেবল বর্ত্তমানেই বদ্ধ নহে। শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার কত আশা! তিনি কত আশা করেন যে, তাঁহার শিশু ভবিষ্যতে জ্ঞানী হইবে ধার্ম্মিক হইবে, সুখী হইবে! তাঁহার স্নেহের প্রতিদান করিবে!

মানুষ মা সম্বন্ধে যেমন, জগতের মা সম্বন্ধেও সেইরূপ। জগতের মা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের অনন্ত ভাবী জীবন দেখিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক সন্তান, অনন্ত জীবনে কত সত্য, কত প্রেম, কত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিবে, তিনি প্রেমের চক্ষে সকলই দেখিতেছেন। তাঁহার প্রেমের কেমন প্রতিদান করিবে, দেখিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক সন্তান অনন্ত জীবনে কত পবিত্র, ও উন্নত হইবে, ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বমাতা এখনই তাহা দেখিতেছেন।

মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের যে সকল বীজ বর্ত্তমান, তাহা অনন্ত ভাবী জীবনে কিরূপে অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; এখন যাহা মুকুল, তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপে প্রস্ফুটিত হইবে, মানবাত্মার মধ্যে যে সকল অব্যক্ত শক্তি রহিয়াছে, অনন্ত জীবনে তাহার কি প্রকার বিকাশ হইবে, বিশ্বজননীর ত্রিকাল-দর্শী চক্ষু এখনই তাহা সকলই দেখিতেছেন।

শর্ষপকণা তুল্য বীজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পর্ব্বত নিঃসৃত, অতি ক্ষুদ্র, সাগরগামিনী স্রোতঃস্বতী ক্রমে যেমন বিশাল আকার ধারণ করে; সেইরূপ, মানব হৃদয় নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয়, বিকসিত হইয়া আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করে। বীজরূপী বিবেক ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে,

মনুষ্য তাহার অনুরোধে, জগতের কল্যাণের জন্য আত্ম-স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়। জ্ঞানের বীজ, প্রেমের বীজ, সকলই অনন্ত জীবনে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিবে। জগন্মাতা পূর্ব্ব হইতেই তাহা সকলই দেখিতেছেন; এবং ক্রমে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের হস্তধারণ করিয়া পূর্ণ পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম, ও শান্তির দিকে লইয়া যাইতেছেন!

ভালকে সকলেই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু মন্দকে ভালবাসিতে কে পারে? মহাপুরুষেরা মহাপাতকীকেও ভালবাসিয়াছেন। কোথা হইতে তাঁহারা সেই প্রেম প্রাপ্ত হইলেন? সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু তাঁহাদের হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা জগৎকে ভালবাসিলেন, মহাপাতকীও তাঁহাদের প্রেমলাভ করিল।

অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বমাতা, মহাসাধু ও মহাপাতকী, উভয়কেই সমভাবে ভালবাসেন। অনাদি অনন্ত কালদর্শী বিশ্বমাতার চক্ষু দেখিতেছে যে, মহাপাতকীও একদিন সপ্তম স্বর্গের দেবতা হইবে! ঐ পাতকীর অন্তরে যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ রহিয়াছে, তাহা অনন্ত জীবনে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ সুন্দর ও আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিবে, তাহা বিশ্বমাতা এখনই দেখিতেছেন।

যাঁহার লীলায় পঙ্ক হইতে শতদল পদ্মের উৎপত্তি, তাঁহারই লীলায়, তাঁহারই কৃপায় মহাপাতকী স্বর্গের দেবতা হয়। তাঁহার প্রেম, অতীতকালে, বর্ত্তমানে, ও ভবিষ্যতে। তাঁহার প্রেম আমাদিগকে অনন্ত উন্নতি পথে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইতেছে। সেই অনন্ত প্রেমে আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি। আদি, মধ্য, অন্ত, সকলই সেই প্রেমে। আমাদের জীবন, মরণ সেই প্রেমের হাতে।

হে প্রেমস্বরূপ! তবে আমাদের ভয় কি? সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে, তোমারই প্রেম! তবে আমাদের ভয় কি?

দেবালয়ে বক্তৃতা,

ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের মত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ভারতের দর্শনশাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকেই এই দৃশ্যমান্ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই জগৎ অলীক স্বপ্নসদৃশ। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন যেমন সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন আর কিছুই থাকে না, সেইরূপ সপ্নসদৃশ অলীক এই সংসার মোহনিদ্রাভিভূত জীবের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মোহনিদ্রা অপসারিত হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তত্বজ্ঞান কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায় তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনকে, কেহ বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব যে আত্মা সেই আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা আত্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা আত্মসাক্ষাৎকারকেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও উপনিষদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি ভারতের দর্শনশাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা জীবাত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল দর্শনশাস্ত্রকার স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে ন্যায়দর্শন অন্যতম। অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রকারগণের ন্যায় ন্যায়দর্শনও একবিংশতি প্রকার দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের ঋষির নাম অক্ষপাদ গৌতম। মিথিলা প্রদেশের বর্ত্তমান সারণ জেলায় ইঁহার নিবাস ছিল। অক্ষপাদ-গৌতম বুদ্ধগৌতম এবং জৈনদিগের ইন্দ্রভূত গৌতম প্রায় সমসাময়িক; এবং বোধহয় ইঁহাদের মধ্যে পারিবারিক কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল। যদিও বুদ্ধগৌতম ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং অক্ষপাদ-ও ইন্দ্রভূত-গৌতম ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি মনে হয় তৎকালে কার্য্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ করা হইত। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র, মধ্যযুগের ন্যায়-

শাস্ত্র এবং গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থাদি লইয়া ন্যায়দর্শন এক বিপুল শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিবার এখন সময় নাই। তবে আমি একাদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য নামক জনৈক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বিষয় এবং তাঁহার প্রণীত কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থ হইতে কিছু বলিয়া অদ্যকার আলোচ্য বিষয় শেষ করিব।

"উদয়নাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশে বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময় এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। উদয়নাচার্য্যের সহিত বৌদ্ধগণের ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া প্রায়ই তর্কবিতর্ক হইত। একদিন তিনি বৌদ্ধগণের সহিত তর্ক করিতে করিতে কোন প্রকারে তাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ না হইয়া এক অলৌকিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। সে ব্যক্তি পতন সময়ে বলিল,—'ঈশ্বরো নাস্তি,' অর্থাৎ ঈশ্বর নাই; এই বলিয়া নিম্নে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরে তিনি তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্যকে পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। সে ব্যক্তি পতনকালে বলিল 'ঈশ্বরোঽস্তি', অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন। দৈবযোগে সে ব্যক্তি পর্ব্বতের সংলগ্ন কোন স্থানে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ রক্ষা পাইল। ইহা দেখিয়া উদয়নাচার্য্য বলিলেন,—"দেখ আমার শিষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিল বলিয়া ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিলেন আর তোমরা তাঁহাকে স্বীকার করিলে না বলিয়া তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিলেন না।" এই অন্যায় আচরণের জন্য অনেকে উদয়নাচার্য্যকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনিও আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া নরহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুরীধামে যাইয়া জগন্নাথ দেবের নিকট হত্যা দিলেন। কথিত আছে জগন্নাথ তাঁহাকে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তুষানলে মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে তিনি কাশীতে যাইয়া তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগ কালে তিনি জগন্নাথকে এই বলিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করেন যে, "যখন বৌদ্ধগণ তোমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিল তখন আমি তোমার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তুমি আমায় রক্ষা করিলে না"।

"ন্যায়দর্শন অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় সংসারকে মিথ্যা বলেন নাই। ন্যায়-দর্শনের মতে সত্য চারি প্রকার,—প্রত্যক্ষ, প্রমাণ, অনুমান এবং আগম। যাহা চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করি তাহা সত্য, যাহার প্রমাণ আছে তাহা সত্য, যাহা অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারি তাহা সত্য এবং যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ তাহাও সত্য। উদয়নাচার্য্য তৎকৃত কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিয়াছেন।"

"সর্ব্বশেষে তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় সমাপন করেন।"

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু।

দেবালয়।

গত সংখ্যক কুশদহে 'দেবালয়ে বক্তৃতা' শিরনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যাহার শেষ অংশ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহাতে দেবালয় সম্বন্ধে এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পল্লিস্থ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্থানের নাম "দেবালয়"। কিন্তু দেবালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী, যখন সকল শ্রেণীর ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই অবগত হইবার বিষয়, তখন আমরা দেবালয়ের বিবরণ প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেহ কেহ এই রূপ মনে করেন যে নিজের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে হইলে, অপরের ধর্ম্মে তেমন শ্রদ্ধা করা যায় না। যাঁহারা সকল ধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিয়া উদার ভাব প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে নিজের ধর্ম্মে তেমন দৃঢ় বিশ্বাসী ইহা প্রকাশ পায় না; যাঁহারা অধিক উদার, তাঁহারা, দৃঢ় বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। যদিও সকল ধর্ম্মেরই অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, শিখ-ধর্ম্ম প্রভৃতি যতগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মেরই আবান্তর বিষয়ে বহু

ভিন্নতা দেখা যায়, এবং তাহার মধ্যে সবই যে ভ্রমশূন্য তাহাও নহে, এমন কি মূল মতেও, চিন্তাগত—ভাবগত অনেক ভ্রম দৃষ্ট হয়, তথাপি সকল ধর্ম্মই সত্য মূলক এবং মৌলিক ভাব যাহা তাহা সার্ব্বভৌমিক, ধর্ম্মের যে এক একটি বিশেষত্ব ও তাহার মূলে যে উচ্চতা ও গভীরতা আছে, উচ্চ শ্রেণীর সাধক যাঁহারা, তাঁহারা সে তত্ত্ব বুঝিতে পারেন; তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারেন, যে যাহা আকাঙ্খার বস্তু তাহা অন্য ধর্ম্মেও আছে এবং তাহা হইতে তাঁহার গ্রহণ করিবার বিষয় আছে। ফলতঃ সকল ধর্ম্মের সঙ্গে যে কেবল সহানুভূতি করা যায় তাহা নহে, সাধনক্ষেত্রেও বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকগণের সহিত বহুদূর পর্য্যন্ত মিলিত হওয়াও যায়।

আমরা বিশেষ ভাবে অবগত আছি যে, বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে বহুদিন হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরোক্ত একটি বিশেষ ভাবের সঞ্চার হইয়া আসিয়াছে। ঐ উদার ভাবের আদর্শ তাঁহার মনে থাকায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ইতিপূর্ব্বে ইং ১৮৭৩ সালে "সাধারণ ধর্ম্ম সভা" নামে তিনি একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার কার্য্যও কিছু দিন চলিয়াছিল, কিন্তু তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায় ও উপযুক্ত লোক অভাবে সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত তিনি নিজ জন্মভূমি বরাহনগর গ্রামে বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন। বরাহনগর বাটির সম্মুখবর্ত্তী অংশ, "শশিপদ ইনিষ্টীটিউট" (শশিপদ হল), ও প্রায় ১২০০০৲ বার হাজার টাকা দান করিয়া কয়েকজন ট্রষ্টী দ্বারা কতকগুলি কার্য্য স্থায়ীভাবে চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তিনি, বার্দ্ধক্য সীমায় আসিয়া, ও ক্রমান্বয়ে পরিবার-বর্গের মধ্য হইতে কয়েকটি কন্যা, পুত্র ও দৌহিত্রাদি,—এমন কি ধর্ম্ম-কার্য্যের সহায় কারিণী স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পরলোকে বিদায় দিয়া নিজেও যেন পরলোকের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের শেষ কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হইয়াছেন।

বিগত ১৯০৮ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে তিনি তাঁহার কলিকাতা ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাড়ির নিম্নতল "দেবালয়" নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার সেই অন্তরনিহিত ধর্ম্মভাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দেবালয়ের বিশেষ ভাব "উদারতা"। এখানে সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক

জ্ঞানী ভক্তগণ বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন। দেবালয়ের উপাসনায় ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের প্রচারক, সাধক মাত্রেই আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানে সাধারণতঃ, নিম্নলিখিত সময়ে সপ্তাহের কার্য্য সকল হইতেছে।

সোমবার সন্ধ্যা ৬॥০ টায় ব্রহ্মোপাসনা, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ টায় বক্তৃতা বা শাস্ত্র ব্যাখা ও সঙ্কীর্ত্তন, শনিবার অপরাহ্ণ ৫ টায় বক্তৃতা, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ টায় সঙ্কীর্ত্তন। অন্যান্য দিনে অন্যান্য কার্য্য হইতেছে।

দেবালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে "দেবালয়ের অর্পণ পত্র" (ট্রাষ্ট ডীড্) হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল,—

"আমি শ্রীশশিপদ বন্দোপাধ্যায়—পিতা ৺ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বরাহনগর, থানা বরাহনগর, সবরেজিষ্টরী কাশীপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা; হাল সাকিন ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা উপস্বত্বভোগ—ভগবানের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ আমার জন্মভূমি উপরোক্ত বরাহনগর গ্রামে নানা প্রকার দেশহিতকর ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম; এক্ষণে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ঐ সকল কার্য্য করিতে ক্রমশঃ অসমর্থ হইতেছি। তজ্জন্য বরাহনগরের সেই সকল কার্য্যের একরূপ ব্যবস্থা যথাসাধ্য করিয়া দিয়া কার্য্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন ট্রষ্ট্রী নিযুক্ত করতঃ ট্রষ্টডিড্ বরাহনগর রেজিষ্ট্রি, আফিসে রেজিষ্ট্রি, করিয়া দিয়াছি। কলিকাতায় যে বিভাগে যতটুকু কার্য্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছি সম্প্রতি তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। তন্নিমিত্ত কলিকাতায় আমার নিজস্ব যে বসত বাটী আছে, তাহা ট্রষ্ট্ সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিবার মানসে ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক আমি সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে অদ্য এই অর্পণ পত্র (ট্রষ্টডীড্) লিখিয়া দিতেছি।"

"২। কলিকাতায় আমার একটি পাকা চৌতল বসত বাটী ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ এবং তৎসংক্রান্ত দুই কাঠা জমী আছে। ইহাই আমার

কলিকাতার সম্পত্তি। এই সম্পত্তির মূল্য চৌদ্দ হাজার (১৪০০০৲) টাকা হইবে। * * *

আমার এই বসত বাটী ও তৎসংক্রান্ত জমী-খণ্ডের চৌহদ্দি এইরূপ :—

উত্তর সীমা—সঙ্গীত সমাজের বাটী ও জমী; পূর্ব্বসীমা—বিপিনবিহারী রায়ের বাটী; দক্ষিণসীমা—আমাদের গলির রাস্তা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জমী; পশ্চিমসীমা—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটী।" * *

"৩। আমার সম্পত্তি ঐ দুই কাঠা জমী এবং তদুপরি নির্ম্মিত পাকা চৌতল বাটী নিম্নধৃত সর্ত্তানুসারে নিম্নলিখিত পাঁচজন ট্রষ্টীর হস্তে আমি অর্পণ করিতেছি, অর্থাৎ আমার পরিবারস্থ দুই জন ও আমার বিশ্বস্ত অপর তিন জন বন্ধুকে আমার সম্পত্তির ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলাম।"

"আমার জীবিতাবস্থায় এবং আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার হইতে অর্থাৎ আমার পুত্র, জামাতাগণ, এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আমার পৌত্র, দৌহিত্র এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশ হইতে এই সম্পত্তির দুই জন করিয়া ট্রষ্টী নিযুক্ত হইবে। আমার পুত্র, কন্যা ও জামাতাগণ যাঁহারা এখন বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদের সকলেরই সৎকার্য্যে উৎসাহ আছে। ভবিষ্যতে যাহাতে আমার বংশধরগণের সৎকার্য্যের সঙ্গে এবং বিশেষতঃ আমার অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের সঙ্গে যোগ থাকে সেই জন্য এই ব্যবস্থা করিলাম।"

"আপাততঃ নিম্নলিখিত আমার পরিবারস্থ দুই জন ও অপর তিন জন এই পাঁচজন ট্রষ্টী আমার এই সম্পত্তির ভার লইবেন।

ক। আমি শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জীবদ্দশায় আমি একজন ট্রষ্টী থাকিব। আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্র শ্রীমান আনরিয়ান রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এম, এ, আই, সি, এস, দেওয়ান কোচিন, আমার স্থানে ট্রষ্টী নিযুক্ত হইবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ আমার শূন্যপদ আমার পুত্রের দ্বারা পূরণ না হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণ আমার পরিবার হইতে অর্থাৎ আমার পৌত্র, জামাতা, দৌহিত্র, প্রভৃতি হইতে ঐ পদ পূরণ করিয়া লইবেন।

খ। আমার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান বিশ্বেশ্বর সেন, পিতা ৺কালিদাস সেন মজুমদার, সাকিন ১৮, ভুবনমোহন সরকারের লেন, কলিকাতা, পেন্স

ন্যাসন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সহকারী সম্পাদক। তাঁহাকে আমার পরিবারস্থ দ্বিতীয় ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলাম।

গ। অপর তিনজন ট্রষ্টীর পদে আমি নিম্নলিখিত তিনজনকে নিযুক্ত করিতেছি।

১। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, পিতা ৺শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস বাঁকুড়া, হালসাকিন ২১০।৩।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রসিদ্ধ মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসী নামক মাসিক পত্রদ্বয়ের সম্পাদক।

২। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিস বি,এস, সি, পিতা শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিস, নিবাস ২১০,কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার, পিতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নিবাস ২১০।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপরোক্ত তিন জনকে আমার সম্পত্তির অপর ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহাদের কাহারও পদ শূন্য হইলে ট্রষ্টী সমিতি তাঁহাদের ইচ্ছামত শূন্য পদ পূরণ করিয়া লইবেন। * * *

ট্রষ্টীগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ট্রষ্টী সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। এই সম্পাদক অপর ট্রষ্টীদিগের মত লইয়া সমুদায় কার্য্যাদি সম্পাদন করিবেন।

৪। আমার উপরোক্ত কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ২১০।৩।২ নম্বর বাড়ী দেবালয় নামে অভিহিত হইবে। এই নাম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবে না, এবং কেহ কখন ইহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

৫। ট্রষ্টীগণ আমার এই বাড়ী কখনও দান বা বিক্রয় করিতে কিম্বা বন্ধক দিতে পারিবেন না। ট্রষ্টী সমিতির বা ট্রষ্টী বিশেষের দেনা ইত্যাদির জন্য এ বাড়ী কোনরূপ দায়ী হইবে না; এবং তজ্জন্য ইহা কখনও বিক্রীত হইবে না।

৬। দেবালয়ের ট্রষ্টীগণ দেবালয়ের দ্বিতল ত্রিতল ও চৌতলস্থ প্রকোষ্ঠগুলি ভদ্রপরিবারের বসবাসের জন্য ভাড়া দিতে পারিবেন।

৭। যাঁহারা আমার "দেবালয়ের" দ্বিতল ত্রিতল ও চৌতলস্থ প্রকোষ্ঠগুলি ভাড়া লইয়া তথায় বসবাস করিবেন তাঁহারা সকলেই এ স্থানের দেবভাব ও

আমার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যবস্থাপত্রের পরভাগে লিখিত "দেবালয়" সভার সহায়তা করিতে যত্নবান হইবেন।

৮। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই "দেবালয়ে" বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ও পল্লীস্থ অপরাপর পরিবারের ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আমি যে সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়াছি সেই উপাসনা যাহাতে চিরদিন চলিতে থাকে, ট্রষ্টীগণও দেবালয়ের অধ্যক্ষ সভা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন; এবং বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে বাটীর বাসিন্দারা নিয়মিত ভাবে সেই উপাসনায় যোগদান করিবেন।

৯। কোন মদ্যপায়ী দেবালয়ের বাসিন্দা হইতে পারিবেন না এবং কখনও কেহ দেবালয় বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না। অন্য কোন ব্যক্তি ও এই "দেবালয়ে"র চতুঃসীমার মধ্যে আসিয়া যাহাতে মদ্যাদি পান বা মাদক দ্রব্য সেবন করিতে না পারে ট্রষ্টীগণ, দেবালয়ের অধ্যক্ষ সভা ও বাটীর বাসিন্দাগণ তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

সংশ্লিষ্ট সভা।

১০। আমার "দেবালয়ে" আমি "দেবালয়" নামে একটী সভা বা সমিতি সংস্থাপিত করিয়াছি। এই সভা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে, ইংরাজী ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতার ১৮৮২ সালের ৬ আইন মত রেজিষ্টার অব কম্প্যানীজ্ এর আফিসে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। এই রেজিষ্ট্রেসনের নম্বর ২৬৩। রেজিষ্টারী করিবার সময় "দেবালয়" সমিতির নিয়মাদির একখণ্ড প্রতিলিপি রেজেষ্টারী আফিসে দাখিল করা হইয়াছে। ঐ নিয়মাবলীর মধ্যে "দেবালয়" সমিতির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ধারাটী লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই :—

"The 'Devalaya' is an Associtión for devotional exercises and for literary, scientific, philanthrophic and charitable work."

অর্থাৎ ধর্ম্মানুশীলন, এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা, ও দানধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয় সমিতির উদ্দেশ্য।

১১। ট্রষ্টী সমিতি ও "দেবালয়" সমিতির অধ্যক্ষ সভা "দেবালয়" সমিতির এই উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া কার্য্য করিবেন। এবং দেবালয়ের পক্ষে যত দূর সম্ভব, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবেন।

১২। এই "দেবালয়ে" প্রতিদিন একমাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অনন্ত, সর্ব্ব-স্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান, ও পবিত্র ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা কিম্বা কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীবজন্তু বা জড়পদার্থ ঈশ্বর, ঈশ্বরের সমান অথবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজিত হইবে না।

১৩। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যতগুলি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তৎসমুদায়ের সকল আচার্য্য, প্রচারক ও পরিচারকগণ, অথবা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় ও একমাত্র তাঁহারই নিকটে প্রার্থনার সার্থকতায় বিশ্বাস করেন এবম্প্রকার একেশ্বরবাদী যে কোন সাধুভক্ত ব্যক্তি এই "দেবালয়ে" উপাসনা করিতে ও উপদেশাদি দিতে পারিবেন।

১৪। ভিতরের সমতা (uniformity) সত্ত্বেও যেমন বহির্জগতে নানাবিধ বিচিত্রতা লক্ষিত হয়—সেইরূপ মূল বিষয়ে সমতা থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মজগতের বাহ্যানুষ্ঠানাদিতে বিভিন্নতা আছে ও থাকিবে। আবহমান কাল হইতে ধর্ম্ম-জগতের বাহ্যানুষ্ঠানক্ষেত্রে বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও ইহা থাকিয়াই যাইবে। যখন এই বিশাল জগতের মধ্যে এমন দুইটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহারা আকৃতি প্রকৃতি সকল বিষয়েই সমান, তখন এই বিপুল সংসারের অসংখ্য জনসঙ্ঘের মধ্যে অবিভিন্ন একত্বের আশা করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? দুইটি মনুষ্যের আকৃতি প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট, সেইরূপ দুই ব্যক্তির ধর্ম্মসাধনার বাহ্য ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য, এক সম্প্রদায়ের দুইজন সমসাধকের ধর্ম্মভাবের ভিতরেও স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মজগতের প্রকৃত অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বতন্ত্রতা আছে বা থাকিবে বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষকে

আমার "দেবালয়" হইতে দূরে রাখা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি না। এই দেবালয় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির। মতের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই দেবালয়ে স্থান পান—ইহাই আমার আন্তরিক অভিলাষ। আমার এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই আমি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য এই "দেবালয়ে"র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া গেলাম। ট্রষ্টীগণ দেবালয়ের এই বিশেষ ভাবকে চিরদিন রক্ষা করিবেন।

১৫। এই দেবালয়ে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার রহিল। আমার প্রাণের ইচ্ছা এই যে, সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরাই যেন এই "দেবালয়কে" নির্ব্বিরোধে তাঁহাদের নিজের নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় কখনও এই "দেবালয়"কে কেবল তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিবেন না।

১৬। দেবসেবা ও জনহিতকর কার্য্যাদির পরিচালনা করিবার জন্য "দেবালয়ে" একটী কমিটী থাকিবে, এই কমিটীতে পূর্ব্বোক্ত ট্রষ্টী সমিতি হইতে তুইজন প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কমিটী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হয় তৎপ্রতি ট্রষ্টীগণ ও অধ্যক্ষ সভা দৃষ্টি রাখিবেন। এই কমিটি "দেবালয়ে"র প্রতি দ্বিবাৎসরিক সাধারণ সভাতে গঠিত হইবে। এই কমিটী প্রতিষ্ঠার সংবাদ সাধারণ সভার সভাপতি নিয়মিত সময়ে (অর্থাৎ কমিটী গঠনের পনের দিনের মধ্যে) দেবালয়ের ট্রষ্টী সমিতিকে জ্ঞাপন করিবেন।

১৭। কেবলমাত্র ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যই যে এই "দেবালয়" প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা নহে, এ দেশের সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের এবং দেশ-হিতৈষী ও সজ্জনগণের দেবালয়ে প্রবেশাধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই "দেবালয়ে" ধর্ম্মচর্চ্চার ন্যায় নিয়মিত রূপে নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চ্চা এবং জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানও হইতে পারিবে এবং এতৎসম্পর্কে নিয়মিত বক্তৃতা ও উপদেশাদি হইতে থাকিবে।

১৮। "দেবালয়ে" বিশুদ্ধ আমোদাদি হইবার পক্ষে কোন বাধা রহিল না। কিন্তু এইরূপ আমোদাদির ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে দেবালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা দৃষ্টি রাখিবেন—যেন তদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতির সীমা অতিক্রান্ত না হয়।

১৯। "দেবালয়" সভা গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে কেহ কখন ধূমপান করিতে পারিবেন না।

২০। এই "দেবালয়ে"র পূজা অর্চ্চনা, বক্তৃতা, আলোচনা বা উপদেশাদিতে এবং আলাপ ইত্যাদিতেও কেহ কখনও কোন ধর্ম্ম, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মসম্প্রদায় অথবা কোন সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা, বিদ্রূপ ঠাট্টা ও উপহাসাদি এবং কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষাত্মক বা অবমাননাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। এই দেবালয়ের সভাসমিতিতে কখন রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে না। "দেবালয়ের" ট্রষ্টী সমিতি এই নিষেধ বিধিটী প্রস্তরখণ্ডে খোদিত করিয়া "দেবালয়ের" কোন এক প্রকাশ্য স্থলে রক্ষা করিবেন।

২১। বালক বালিকাদিগকে শৈশবাবধি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বহুদিন হইতে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম। এতদুদ্দেশ্যে আমার জন্মস্থান বরাহনগরে আমি নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানাদির আয়োজনও করিয়াছিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে আমি এক সময়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশাদি দিতাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ নিজেরা উপাসনায় যোগ দিতে পারে না অথচ নানা প্রকার গোলমাল করিয়া অপরের উপাসনার ব্যাঘাত করে—এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে ও শিশুকাল হইতে সন্তানদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তা বোধে, ১৮৯১ খৃঃঅব্দে, আমার ২১০৷৩২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনের নিম্নতলের একটি গৃহে আমি "বাল্যসমাজ" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঐ সমিতির কার্য্য এক্ষণে এই "দেবালয়ে" নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে এই "দেবালয়" ঐ বাল্যসমাজের অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই স্থান হইতে 'বাল্য সমাজকে' কখনও স্থানান্তরিত করা

হইবে না। কিন্তু 'বাল্য সমাজের' কার্য্যপ্রসার বশতঃ যদি কখনও এই "দেবালয়ে" উহার স্থান সঙ্কুলান না হয়, তবে ট্রষ্টী সমিতি ও অধ্যক্ষ সভা সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ যথোপযুক্ত ব্যবস্থান্তর করিতে পারিবেন।

বাল্য সমাজের পরিচারক ও পরিচারিকা, ও সভ্য শ্রেণীভুক্ত বালকবালিকাগণ তাঁহাদের সভার কার্য্য চালাইবার সময় দেবালয়ের দেবভাব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইবেন।

বাল্যসমাজের পরিচালক পরিচালিকাগণ প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসের মধ্যে দেবালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লেখের জন্য বাল্যসমাজের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণ দেবালয়ের অধ্যক্ষ সভার নিকট প্রেরণ করিবেন।

২২। উপরোক্ত ৬ ধারায় 'দেবালয়ে'র দ্বিতল ত্রিতল ও চৌতলস্থ গৃহগুলি ভাড়া দেওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল গৃহের ভাড়া হইতে প্রাপ্ত মাসিক আয়ের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদি দিয়া এবং বাড়ী মেরামতের জন্য বাৎসরিক ৫০৲ টাকা রাখিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে ট্রষ্টীগণ মাসিক ২৫৲ টাকা দেবালয়ের অধ্যক্ষ সভার হস্তে দেবালয়ের কার্য্যের জন্য দিবেন; এবং বাৎসরিক ১০০৲ টাকা হিসাবে Postal Savings Bank এ শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের দেবালয় Fund হিসাবে জমা করিবেন—এই সকল কার্য্য করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ট্রষ্টীগণ দেবালয়ের বিশেষ কার্য্যে অথবা কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে দান করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত বাটী-মেরামতের জন্য যে ৫০৲ টাকা বার্ষিক জমা থাকিবে, বাটী মেরামতের জন্য প্রতি বৎসর তাহা সমুদয় ব্যয় না হইতে পারে। মেরামত করিয়া যে বৎসর যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা পাঁচ বৎসর অন্তর বাটীর বিশেষ মেরামতের জন্য ব্যয়িত হইবে।

উপরে প্রতি বৎসর যে একশত টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ টাকা যদি কোন দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ দেবালয় বাটীর বিশেষ ক্ষতি সংঘটন হেতু আমূল সংস্কারের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে সেইরূপ সংস্কারের জন্য ব্যয়িত হইবে।

দেবালয়ের আবশ্যকীয় মাসিক ব্যয়ের টাকা ভিন্ন আর সকল টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা হইবে। একশত টাকা জমা হইলে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিশরি

নোট অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া পোষ্টাফিসের কণ্ট্রোলারের অফিসে গচ্ছিত থাকিবে।

২৩। এই "দেবালয়ের" নিয়মিত কার্য্য চালাইবার জন্য এবং বাটীর সংস্কারাদির নিমিত্ত আমি যে যৎসামান্য অর্থের ব্যবস্থা করিয়া গেলাম, তদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য আশানুরূপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এমত অবস্থায় "দেবালয়ের" ট্রষ্টী সমিতি ও "দেবালয়" সমিতির অধ্যক্ষসভার নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, এই সব কার্য্য সুপরিচালনার জন্য তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক চাঁদা আদায় ও বিশেষ দান সংগ্রহ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে একটু চেষ্টা করেন।

উপসংহারে নিবেদন।

২৪। "দেবালয়ে" প্রতি সপ্তাহে এক দিন সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা আমি করিয়া গেলাম, তাহা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য আমি যে একটি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া গেলাম, সেই দিনে ঐরূপ উপাসনা হওয়ার পক্ষে যাহাতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয়, এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও দেশ হিতৈষণা প্রভৃতি বিষয়ের চর্চ্চার জন্য আমি প্রতিমাসে একটী সাধারণ সভা ও বক্তৃতার যে ব্যবস্থা করিয়া গেলাম, তাহা যাহাতে রহিত না হয়, ট্রষ্টী সমিতি ও "দেবালয়" সমিতির অধ্যক্ষ সভা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য "দেবালয়ের" জন্য আমি যে মাসিক ২৫৲ টাকা ব্যবস্থা করিয়া গেলাম, তাহা প্রধানতঃ এই সকল কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে।

২৫। আমি মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবং এই দেবালয়ের দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এই আশায় অদ্য এই ট্রষ্টডিড্ পত্র লিখিয়া দিলাম।

তারিখ ১লা জানুয়ারি, ১৯০৯,

১৭ই পৌষ, ১৩১৫ সাল।

মানুষে ভক্তি। *

মহাত্মা ঈশার শিষ্য সাধু যোহন বলিয়াছেন "দৃষ্ট ভ্রাতাকে যে ভালবাসে না, অদৃষ্ট ঈশ্বরকে সে ভালবাসিতে পারে না" (যোহনের প্রথম পত্র, ৪।২০)। ভালবাসা সম্বন্ধে যোহন যাহা বলিয়াছেন, আমার কাছে ভক্তি সম্বন্ধেও তাহা সত্য বলিয়া বোধহয়। মানুষকে অভক্তি, অশ্রদ্ধা, অসম্মাননা করিব, অথচ ঈশ্বরে ভক্তি হইবে, ইহা আমার কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধহয়। আমাদের হৃদয়ে যে ভক্তি নদী অবতীর্ণ হইতেছে না, অথবা বন্যার মত ভাবোচ্ছ্বাসের আকারে আসিয়া চলিয়া যাইতেছে, হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না, তার প্রধান কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে আমরা মানুষকে ভক্তি করিতে পারিনা। ভক্তির পাত্র ঈশ্বরই হউন আর মানুষই হউন, ভক্তি বস্তুটা একই, সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি ও মানুষে ভক্তিতে পাত্রগত ভিন্নতা সত্বেও দুটি যে অতি নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষে ভক্তি হইলেই যে ঈশ্বরে ভক্তি হইবে তাহা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু মানুষে ভক্তি হইলে যে ঈশ্বরে ভক্তি অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষে ভক্তি না হইলে যে ঈশ্বরে ভক্তি হইবে না তাহা সাধু যোহনের প্রীতি বিষয়ক উপদেশের তুলনায় বুঝাযায়। দৃষ্ট মানুষকে যে ভক্তি করিতে পারে না অদৃষ্ট ঈশ্বরকে সে কিরূপে ভক্তি করিবে? বস্তুতঃ প্রথমে মানুষকে ভক্তি করিয়াই আমরা ভক্তি শিখি। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনই আমাদের প্রথম ভক্তির পাত্র। এই ভক্তি যদি প্রসারিত হইয়া সমগ্র মানব সমাজে প্রবাহিত হয় তবে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরে ভক্তি সঞ্চার ও ভক্তি বৃদ্ধি আমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়—আমার এই ধারণা।

কিন্তু জিজ্ঞাসা উঠিতে পারে সাধু মানুষ যেন ভক্তির পাত্র হইলেন, অসাধু মানুষ কিরূপে ভক্তির পাত্র হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে সাধু অসাধুর মধ্যে বিভেদ রেখা টানা সম্ভব নহে, অসাধারণ মানবের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মানবের সম্বন্ধে বলা যায় যে মানব মাত্রই সাধুতা

* বিগত ৬ই মাঘ প্রাতঃকাল, সাধারণ ব্রহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রদত্ত উপদেশ।

অসাধুতার মিশ্রণ; নিরবচ্ছিন্ন সাধু যেমন পাওয়া যায় না, নিরবচ্ছিন্ন অসাধুও তেমনই পাওয়া যায় না। সুতরাং সাধুতাই যদি মানবভক্তির ভিত্তি হয়, তবে এই ভিত্তিরূপ সাধুতা অল্পাধিক সকলের মধ্যেই আছে, সুতরাং সকলেই অল্পাধিক ভক্তির পাত্র। এই বিষয়ে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে অসাধুতা সত্ত্বেও যদি মানুষ প্রেমের পাত্র হইতে পারে, তবে অসাধুতা সত্ত্বেও সে ভক্তির পাত্র হইতে পারে। বুদ্ধ ঈশা প্রভৃতি বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ মানুষ মাত্রকেই প্রীতি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর তাঁহাদের উপদেশ এই নয় যে গুণের তারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য করিতে হইবে। মানুষ মাত্রকেই গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে প্রীতি করিতে হইবে। ইহাই তাঁহাদের উপদেশের সার মর্ম্ম। মানুষের প্রতি গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে প্রীতি যদি সম্ভব হয়, তবে তাহার প্রতি গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে ভক্তিও সম্ভব বলিয়া বোধহয়। কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

প্রীতির ভিত্তি গুণ নহে, অন্ততঃ ব্যক্ত গুণ নহে। অব্যক্ত গুণ প্রীতির ভিত্তি কিনা, তাহা পরে দেখা যাইবে। গুণ যদি প্রীতির ভিত্তি হইত তবে অসাধু ব্যক্তি সাধুর প্রীতি ভাজন হইত না, পাপী মানব পুণ্যময় ঈশ্বরের অপার প্রীতির আস্পদ হইত না, অব্যক্ত দোষগুণ ক্ষুদ্র শিশু, জননীর স্নেহ আকর্ষণ করিত না। প্রীতির ভিত্তি গুণ নহে, প্রীতির ভিত্তি ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব জীব মাত্রেই অল্পাধিক পরিমানে ব্যক্ত, মানবে ইহা সুপরিস্ফুট। মানবের মানবত্বই প্রীতির নিদান। এই মানবত্বের পশ্চাতে একটা অব্যক্ত মহত্ত্ব, অব্যক্ত সৌন্দর্য্য, অব্যক্ত গুণরাশি বর্ত্তমান আছে, সন্দেহ নাই, এবং আমার বোধ হয় এই প্রচ্ছন্ন মহত্ব, সৌন্দর্য্য ও গুণরাশিই আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই গুণরাশি যখন প্রচ্ছন্ন ভাবেই কার্য্য করে, যখন গুণের অভিব্যক্তির উপর প্রীতি নির্ভর করে না, তখন ইহা বিশেষ রূপে আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। এখন আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে মানবের মৌলিক মানবত্ব ইহা যেমন প্রীতির নিদান, প্রীতির আস্পদ, তেমনি ইহাই ভক্তির নিদান ভক্তির আস্পদ। প্রীতির স্থলে যেমন গুণাগুণের বিচার অকর্ত্তব্য, গুণের তারতম্য অনুসারে যেমন প্রীতির তারতম্য হওয়া উচিৎ নহে, গুণাগুণ নির্ব্বিশেষেই প্রীতি করা কর্ত্তব্য তেমনই মানবের প্রতি ভক্তি প্রসারণেও গুণাগুণের

বিচার করণীয় নহে—গুণাগুণ নির্ব্বিশেষেই ভক্তি দেওয়া আবশ্যক। আমরা দুর্ব্বলাধিকারি বলিয়া কতদূর করিতে পারি কি না পারি, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে; কর্ত্তব্যের আদর্শ কি ইহাই বিচার্য্য। আমাদের প্রীতি অধিকাংশ স্থলেই গুণের তারতম্য অনুসারে প্রবাহিত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের প্রতি উপদেশ এই যে মানব মাত্রকেই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে হইবে। এই উপদেশ অনুসারে আমরা সেই সাধুকেই সেই পরিমানে আদর্শ সাধু বলিয়া মনে করি যাঁহার প্রীতি যে পরিমানে গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে মানব মাত্রের প্রতি ধাবিত। বস্তুতঃ যে সাধু পাপীকে যত অধিক ভালবাসিতে পারেন তাঁহাকেই আমরা তত উন্নত সাধু বলিয়া বিশ্বাস করি। তেমনি আমার বোধ হয় মানব মাত্রকেই গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে কেবল মানব বলিয়া ভক্তি করাই মানব ভক্তির উচ্চতম আদর্শ। উচ্চ শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের জীবনে এই গুণাগুণ নির্ব্বিশেষে মানব ভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মানব মাত্রেরই চরণে অবনত হন, সাধু অসাধুর বিচার করেন না।

এখন ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অনুপ্রকাশ, ঈশ্বরের মন্দির, ঈশ্বরের পূর্ণতার অনন্ত বিকাশের ক্ষেত্র মানব তাহার মানবত্ব সূত্রেই যদি আমাদের ভক্তির পাত্র হইল, তবে আমাদের বর্ত্তমান ভক্তিসাধন প্রণালীকে অতিশয় অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে, আর আমাদিগকে ভক্তি সাধনের প্রকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ বলিব।

সাধুতে ভক্তিই যে সাধারণ মানবে ভক্তি সাধনের সহজ উপায়, এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সাধুভক্তিই সর্ব্বপ্রথম সাধনীয়। কিন্তু সাধুতে ভক্তি হইতে গেলে প্রথমে সাধুতে বিশ্বাস থাকা চাই। কোন কোন স্থলে এই বিশ্বাসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে যেমন দেখা যায় যে কেহ কেহ ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাদের ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হয় না, তেমনি দেখা যায় কেহ কেহ সাধুভক্তির কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কোন সাধুকেই তাঁহারা ভক্তি করিতে পারেন না, অন্ততঃ গভীর রূপে ভক্তি করিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে তাঁহাদের চক্ষে কোন আধারেই প্রকৃত সাধুতার স্ফূর্ত্তি হয় না। যেমন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়াও, কেহ কেহ কোন বস্তু-

কেই ঈশ্বর দেখিতে পান না, বরং বিশ্বাসী কোন বস্তুতে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা মনে করেন সেই বিশ্বাসী একান্ত অন্ধবিশ্বাসী, পৌত্তলিক বা নরপূজক, তেমনই জগতে সাধুতা আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও কেহ কেহ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করেন না। বরঞ্চ ভক্তগণ তাঁহাদের সাধুতা কীর্ত্তন করিতে গেলেই তাঁহারা সাধুগণের দোষ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের অসাধুতা প্রতিপাদনে ব্যস্ত হন। এই শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে বলিতে হইবে যে প্রকৃত পক্ষে সাধুতায় ইহাদের বিশ্বাস নাই, সুতরাং ইহাদের হৃদয়ে সাধুভক্তি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব, কাজেই ঈশ্বরভক্তি সঞ্চারিত হওয়াও অসম্ভব। সাধুতায় এরূপ অবিশ্বাস হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। সাধুতে ভক্তি জন্মিতে গেলে বিশেষ বিশেষ মানবের জীবনে সাধুতার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা আবশ্যক।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের সাধুভক্তি আনুবীক্ষণিক। তাঁহারা দূরদেশে বা দূরকালে সাধু দেখিতে পান, কিন্তু নিকট দেশে, নিকট কালে সাধু দেখিতে পান না। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, শাক্য, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির নামে তাঁহাদের মস্তক অবনত হয়, কিন্তু নিজ গ্রামে নিজ সমাজে, নিজ জীবংকাল মধ্যে তাঁহারা ভক্তির পাত্র দেখেন না। এই দূরদৃষ্টি দোষ (Long sight) অল্পাধিক পরিমানে বোধহয় আমাদের সকলেরই আছে। চক্ষু খুব ভাল না হইলে একান্ত নিকটের বস্তু দেখাযায় না, বস্তুটা দেখিতে গেলে একটু দূরে ধরা আবশ্যক হয়। কিন্তু এটা চক্ষুর দোষ সন্দেহ নাই, আর এই চক্ষু দোষ না ঘুচিলে যে আমাদের ভক্তি হইবে না ইহাও নিশ্চিত। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যকে লইয়া আমরা কতক্ষণ থাকি বা থাকিতে পারি? আমাদের দৈনিক কাজ কারবার যাঁহাদের লইয়া, তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে না পারিলে আমাদের ভক্তি অনেকটা সাময়িক ব্যাপারই থাকিবে। এরূপ ভক্তি পোষাকি ভক্তি—জীবনগত ভক্তি নহে। এরূপ পোষাকি ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবা উচিৎ যে, আমাদের বর্ত্তমান হৃদয়ের ভাব যেরূপ তাহাতে বুদ্ধ, ঈশা যদি আমাদের নিকটে থাকিতেন, আমাদের সম-সাময়িক হইতেন তবে হয়ত আমরা তাঁহাদের ভক্ত না হইয়া তাঁহাদের উৎপীড়ক বা হন্তার দলভুক্ত হইতাম। হয়ত আমরা কাল্পনিক বুদ্ধ, কাল্পনিক ঈশাকে ভক্তি

করি, প্রকৃত বুদ্ধ, প্রকৃত ঈশাকে ভক্তি করি না। প্রকৃত সাধু-মানবকে ভক্তি করিতে শিখিলে নিকটের সাধুকেও ভক্তি করিতে পারিব, নিকটস্থ আধারেও সাধুতার ও সাধুভক্তির স্ফুর্ত্তি হইবে।

তৃতীয় কথা এই, নিজ সমাজে, নিজ পরিচয়ের গণ্ডির ভিতর সাধু দেখা অপেক্ষা নিজ পরিবারের, নিজ আত্মীয়দের মধ্যে সাধু দেখা, সাধুতা দেখা এবং সাধুভক্তি দেওয়া আরো কঠিন। অথচ আমাদের আত্মীয়গণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ, ইহাঁদের মধ্যে কত অসংখ্য গুণ বর্ত্তমান। এখানে ও সেই দূরদৃষ্টি, গুণগ্রাহিতায় বাধা দেয়। কিন্তু এই বাধা দূর করিতে হইবে। আপন জনকে গভীর ভক্তির পাত্র করিতে হইবে একটি ইংরাজি প্রবাদ বাক্য আছে "familiaritey bneeds contemht, ঘনিষ্ঠতা অবজ্ঞা জন্মায়। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার আবরণ ভেদ করিতে হইবে। এই আবরণ ভেদ করিয়া নিজ জনের মধ্যে গুণ দেখিতে হইবে, গুণকে ভক্তি করিতে হইবে এবং গুণ দোষের আবরণের পশ্চাতেও মূল ভক্তির আসম্পদ 'মানবাত্মা'কে দেখিতে হইবে।

চতুর্থ কথা এই, ঘনিষ্ঠতার আবরণ অপেক্ষা পদ ও সম্বন্ধের নিম্নতা রূপ আবরণ আরো দুর্ভেদ্য। নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠতা সত্বেও প্রকৃত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন বরং সহজ, কিন্তু নিজ পুত্র বা কন্যা, ভৃত্য বা নিম্ন কর্ম্মচারীকে নিজ পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, প্রভুত্ব বা উচ্চতর পদ ভুলিয়া ভক্তি ও সম্মান দেখান অতীব কঠিন। অথচ এই যে নীচে ভক্তি, এই ভক্তি না জন্মিলে বুঝা গেল যে ভক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক অহঙ্কার দূরীভূত হয় নাই। প্রকৃত ভক্তি লাভ করিতে হইলে নিজ শক্তি, বিদ্যা ও গুণের অহঙ্কারের ন্যায় নিজ উচ্চ সম্বন্ধ ও উচ্চ পদের অহঙ্কারও ভুলিতে হইবে। নিম্ন সম্বন্ধের ও নিম্নপদের ব্যক্তির নিকটেও অবনত হইতে হইবে। তাহাকে সামাজিক নিয়মের অনুরোধে নমস্কার বা প্রণাম না করিলেও হৃদয়ের ভাবে মুখের কথায় ও কার্য্যগত ব্যবহারে তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে। সামাজিক নিয়মের বন্ধন কোনকোন স্থলে ভাঙ্গিলেও কোন ক্ষতি দেখি না। আমার একটী কন্যা রাখীবন্ধনের দিনে বিনা উপদেশেই, কেবল নিজ হৃদয়ের ভাবাবেগে আমাদের মেথরাণীর হাতে রাখী বাঁধিয়া তাহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়াছিল, ইহাতে

আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম ও কন্যাকে তজ্জন্য বিশেষ প্রশংসা করিলাম।

পঞ্চম কথা এই—গুরুতর মত ভেদের স্থলে ভক্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন, অথচ এরূপ স্থলে যেমন অনর্থক অভক্তি প্রদর্শন করা হয়, অতি অল্প স্থলেই তেমন হয়। কাহারও সঙ্গে গুরুতর মতভেদ হইলেই আমরা অনেক সময় বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিকে গালাগালি দিই, উৎপীড়ন করি, আর গুণ শক্তি ও উচ্চপদ ভুলিয়া যাই, তাহাকে অপদস্থ অসম্মানিত করিতে চেষ্টা করি, এবং এই কার্য্যে নিজ শক্তি ক্ষীণ বোধ হইলে অন্যের সাহার্য্য গ্রহণ করি, বিশেষতঃ সেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর প্রভু বা শাসনকর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের শরণাপন্ন হই। এরূপ ব্যবহার আন্তরীক ভক্তি হীনতার উৎকট প্রকাশ ও ভক্তি পথের ভীষণ কণ্টক। ভ্রম সংশোধনের উপায় উৎপীড়ন, অভিযোগ বা অভক্তি প্রদর্শন নহে। ভ্রম সংশোধনের উপায় ধীর বিচার ও শান্ত সপ্রেম আলোচনা। অতিশয় সম্মানার্হ ভক্তি ভাজন ব্যক্তিরও মত-খণ্ডন আবশ্যক হইতে পারে। সংস্কার কার্য্যে, সত্য সংস্থাপনা কার্য্যে এরূপ মতের সমালোচনা সর্ব্বদাই আবশ্যক। কিন্তু এরূপ সমালোচনার সঙ্গে ভক্তির কোন বিরোধ নাই। গভীর ভক্তির সহিত এরূপ সমালোচনা চলিতে পারে আর এরূপ সভক্তি সমালোচনাই আমাদের আদর্শ।

ষষ্ঠ ও শেষ কথা এই—যাহাকে প্রকৃত পক্ষেই পাপী বলিয়া বিশ্বাস করি, যাহার পাপের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি ভক্তি রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, এবং এই বিষয়ে জয়ী হইলেই বোধহয় প্রকৃত ভক্তি পথে আরূঢ় হওয়াযায়। বাস্তবিক কথা এই পাপী যেমন পাপী হইয়াও প্রীতির পাত্র, তেমনি পাপী পপী হইয়াও অভক্তি অসম্মাননার পাত্র নহে সম্মাননা ও ভক্তিরই পাত্র। তার মৌলিক মানবত্ব যেমন প্রেমের আস্পদ তেমনি সেই মানবত্ব ভক্তির ও আস্পদ। পাপীর পাপ দেখিয়াও আমাদের ভুলা উচিত নয় যে সে ঈশ্বরের সন্তান. ঈশ্বরের মন্দির, অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র অনন্ত গুণরাশির ভাবী অধিকারী। এই সকল কথা মনে রাখিলে আর পাপীর প্রতি বিদ্বেষ থাকে না। তার প্রতি কেবল গভীর কৃপা ও তাহার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা ও চেষ্টার উদয় হয়। এই ভাবে হৃদয়কে চালিয়া না

দিয়া যখন তার দোষ কীর্ত্তন করি ও তার উপর গালাগালি বর্ষণ করি, আর মুখে বলি "নিন্দা করিবার জন্য নহে, সত্যের অনুরোধে বলিতেছি," তখন প্রকৃত পক্ষে সত্যানুরাগ বহুদূরে থাকে, তখন বস্তুতঃ প্রচ্ছন্নভাবে সেই পাপী হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের ইচ্ছা আর অন্যান্য নীচ সুখ আস্বাদনের ন্যায়, ঘৃণা বিদ্বেষ রূপ নীচতম সুখ আস্বাদনের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। যার হৃদয় পাপীর জন্য সত্যই কাঁদে তার চিন্তা, তার কথা, তার ব্যবহার, সম্পূর্ণ পৃথক।

সুতরাং আমার নিজের প্রতি ও আপনারা যে আমার ধর্ম্মবন্ধু আপনাদের প্রতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে মানুষ যেই হউক বা যাহাই হউক, তার সম্বন্ধে আমাদের হৃদয় হইতে সমুদায় অপ্রেম ও অভক্তি দূর হউক, রসনা হইতে সমুদায় কটূক্তি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা কথন দূর হউক, এবং ব্যবহার হইতে সমুদায় শুষ্কতা, তিক্ততা, অনাদর ও অসম্মাননা দূর হউক, আমাদের জীবন মানবভক্তিতে পূর্ণ হউক। তবে আশা করিতে পারি যে ভগবান নিজ ভক্তি-যোগ লইয়া আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবেন।

মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। এই মাঘোৎসবের নাম অনেকে শুনিয়াছেন, শিক্ষিত গণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন। কিন্তু কেন ব্রহ্মসমাজে মাঘোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা অনেকেই অবগত নহেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা বিবৃত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এদেশে যে ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার ত্যাগী গণের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বদ্ধ ছিল, তাহা সামাজিক ভাবে সাধনের বিষয় করিবার জন্য, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ভারতের—সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে একথা কেন তাঁহার মনে উদিত হইল? তিনি দেখিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন, কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত কোন রূপ উন্নতিই সম্ভব নহে। যদি ভারত কোন দিন উন্নত হয় তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারাই তাহা সংসাধিত হইবে।

সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির একান্ত অনুকূল জানিয়া, তাহা প্রচার জন্য তিনি উনাশীতিতম (৭৯) বৎসর পূর্ব্বে ১১ই মাঘ, যোড়াসাকোস্থ ৫৫নং অপারচিৎপুর রোডে কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই সমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে মানিকতলার বাগানে "আত্মীয়সভা" স্থাপন করিয়া তিনি ৬ই ভাদ্র ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন; প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ঐ স্থানে ৬ই ভাদ্র ব্রহ্মোপসনা আরম্ভ হয় বলিয়া ভারতের পক্ষে ঐ দিনও বিশেষ দিন বলিতে হইবে। ৬ই ভাদ্রও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উৎসব হইয়া থাকে। ১১ই মাঘ যোড়াসাকোস্থ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের দিন বলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দিনে ব্রহ্মোৎসবের প্রবর্ত্তনা করেন। তৎপরে ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় হইতে উৎসবের কার্য্য ১১ই মাঘের অগ্র পশ্চাৎ দিন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ১১ই মাঘ, বার্ষিক উৎসবের দিন, "সমস্ত দিন ব্যাপী" উৎসব হইয়া থাকে। এখন ১লা মাঘ হইতে একপক্ষের অধিককাল পর্য্যন্ত উৎসবের স্রোত চলিতে থাকে।

বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন সমাজস্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণও এই মাঘোৎসবের আধ্যাত্মিক-সুমধুর-তত্ত্ব-সুধা পানে পীপাসু হইয়া, উৎসব ক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন। সমাজ-মন্দিরে বহুলোক সমাগম হয়! ১১ই মাঘ ভোর ৪।৫ ঘটিকার পর মন্দিরে প্রবেশ করিবার স্থান থাকে না। সাধারণব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের স্থানাভাব দুর করিবার জন্য এবার কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তির প্রাণে আকাঙ্খার উদয় হওয়ায় উৎসব ক্ষেত্রেই সে কথা উত্থাপিত হয় এবং মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধির জন্য তখনই আড়াই হাজার (২৫০০৲) টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। বারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। এজন্য কুড়ি হাজার টাকার অধিক প্রয়োজন। দাতৃগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের নিকট দানের অর্থ প্রেরণ করিতে পারেন।

আর একটি কথা, বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে সামাজিক, বা পারিবারিক উপাসনা হয়, প্রথমে রাজা রামমোহনের সময়ে তাহা ছিল না, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার যে বীজ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা উপ্ত হইয়া বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়াছে। এই উপাসনা-ব্রহ্ম-সম্ভোগের শীতল ছায়ায়

কত তপ্ত প্রাণ নরনারী শান্তিলাভ করিতেছেন। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ ভারতে—সমস্ত জগতে যে কি প্রকার সুমহৎ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল, উদার, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সাধনের কথা *

আমি আজকার সঙ্গত-সভার উৎসবে সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বিনয় প্রকাশ করিবার জন্য নহে, কিন্তু সত্যের জন্য বলিতেছি যে, আমি বিশেষ কোন প্রকার সাধন ভজন করিতে পারি নাই। আমি যেরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, তাহার মধ্যে যে সকল সাধনের বিষয় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' বর্ণিত নবযোগ ভক্তি সাধন প্রণালীত দূরের কথা, আমরা নিত্য যে উপাসনা করি, যাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ গুলি প্রণালী পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহাও ঠিক সাধন করিতে পারি নাই। তবে আজ সাধনের কথা কি বলিব? কিন্তু ধর্ম্ম বন্ধুর আদেশের ভিতর ভগবানের যে কিছু ইঙ্গিত নাই, আমি তাহা মনে করি না; এবং নিজ অন্তরে চাহিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের কৃপার নিদর্শন ত অন্তরে আছে, সাধন না করিয়াও ত অনেক পাইয়াছি। ভগবানের কৃপার নিদর্শন কাহার অন্তরে নাই? বিশেষতঃ সাধকগণ প্রত্যেকেই ত ভগবানের কৃপা অনুভব করিতেছেন? তথাপি, ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কি ভাবে, কোন পথে, কি আকারে সে কৃপা উদয় হয়, তাহা শুনিতে সাধকগণ বড় ভালবাসেন, এই ভরসায় আমি যে সকল বিষয়, বিশেষ ভাবে জীবনে অনুভব করিয়াছি, তাহারই সম্বন্ধে যথাসাধ্য কিছু বলিতে চেষ্টা করিলাম।

আমার প্রথম কথা এই, আমি যে সময় আমার জীবনের পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম, তাহার পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মের জন্য কোন দিন ব্যাকুল ছিলাম না, অথবা এমন কোনও চেষ্টা করি নাই যাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মভাব লাভ করা যায়, বরং তদ্বিপরীত পথেই চলিতাম, তথাপি জীবনে এক মহা-পরিবর্ত্তন আসিল; এ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে কেবল জীবনে গুরুতর অশান্তি বোধ ছিল।

---

* সঙ্গত-সভার উৎসবে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পঠিত প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় কথা, যখন জীবনের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম, অন্তরে ঈশ্বরের বাণী শুনিতেছি; সে বাণী আদেশের ভাবে আসিতে লাগিল; তাহা এমন স্পষ্ট যে কখন তাহাতে সন্দেহ হয় নাই,—কখনও তাহা মন হইতে চলিয়া গেল না। এমন কি যখনই সে আদেশের বিষয় হইতে আমার অন্তর ম্লানভাব হইয়াছে, পরক্ষণে কোন ঘটনায় আবার সে ভাব উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বাণী আমারই ভাবে ও ভাষায় বটে, তথাপি তাহার পার্থক্য অনুভব করি, আমার মধ্যে কিন্তু আমার নহে।

এই বাণী শ্রবণকরা ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে আমি বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। ইহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধের ভাব স্থাপিত হইল।

তৃতীয় কথা এই যে, আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদিও সকল সাধু ভক্তের প্রতি ভক্তি করিতে শিক্ষা দেয়, তথাপি আমি একটি ঘটনায় এ বাণীর দ্বারাই একজন বিশেষ মনুষ্যের ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইলাম। এই মানুষ আমার নিকট অভ্রান্ত নহেন, কিন্তু তাঁহার জীবন আমার চক্ষে এক অনির্ব্বচনীয় আলোকে প্রকাশিত। আমার নিকট এ জীবন ঈশ্বরের দ্বারা আনীত। সে জীবনের কত গভীর বিষয়, আমার আয়ত্তের বিষয় হয় নাই, তথাপি সে জীবন আমার নিকট বিশেষ ভাবে নিয়ত বিদ্যমান। তাহাতে আমার এই উপকার হইয়াছে যে সর্ব্বদা একটি ধর্ম্মাদর্শ আমার সাম্‌নে থাকিয়া আমার ধর্ম্মানুরাগ ও ভক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতে সকল মহজ্জীবনে ভক্তি বিশ্বাস করায় কোন বাধা হয় নাই, বরং অনুকূল হইয়াছে।

এখন আমার আর একটি বিষয় বলিবার আছে। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে উপাসনা সাধন করিতে পারি নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ উচ্চ সাধকগণের উপাসনায় যতটুকু যোগ দিতে পারিয়াছি, ও নিজে সজনে নির্জ্জনে যে টুকু উপাসনা করিতে সক্ষম হইয়াছি, এবং জীবনের নানা ঘটনায় পরীক্ষা-বিপদে, দারিদ্র্যে, রোগে ও আত্মীয় বিচ্ছেদে, যে সকল কাতর প্রার্থনা হইয়াছে, তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মস্বরূপ যে ভাবে আমার নিকট প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোকে এখন আমি "আত্মজ্ঞানের" অবস্থা অনুভব করিতেছি। আমি বুঝিয়াছি আমি আত্মা, আমি শরীর নহি। অনন্ত-জ্ঞানের একবিন্দু আমি; আমার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান বস্তু; আমি আমার স্রষ্টা নহি, আমি

যাহার সৃষ্ট, আমি তাঁহার এবং তাঁহারই জন্য। আমি শরীর নহি, এই জ্ঞান নিশ্চয় হইলে, তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বস্তু অস্বীকৃত হইয়া যায়। জাতি বর্ণ, রূপ ও শারীরিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া বোধহয়। এই আত্ম-জ্ঞানের অবস্থায় বোধহয় মানব, প্রকৃতিকে কখন কখন একটু কঠোর ভাবাপন্ন করে, কিন্তু তাহার সঙ্গে, প্রেমের ধর্ম্ম, যোগ হইলে, পিতা, মাতা, পুত্র কন্যা, প্রভু ভৃত্য সকলের সঙ্গে সাংসারিক সম্বন্ধ ও ব্যবহার সত্ত্বেও যে, মূলে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ, তাহাই আত্মার সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাই জ্ঞান প্রেমের মিলনাবস্থা। আমি এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করি যে, এ প্রেমের আদর্শ, আমি ব্রাহ্মসমাজ হইতেই লাভ করিয়াছি।

আমাদের সম-বিশ্বাসীগণের মধ্যে কোন কোন স্থলে, আত্মজ্ঞানের অভাবে, যে প্রকার "ভেদ-জ্ঞানে"র লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত আছি! কিন্তু কি করিব; এজন্য কেবল কাতর দৃষ্টিতে বিধাতার দিকেই তাকাইতে হয়।

সত্যই যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে "নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান" বলে তাহা হইলে মানুষ অভয় প্রাপ্ত হয়। আপনাকে ভয়, বিপদ, রোগ, শোক, মায়া বা মোহের অতীত বলিয়া বুঝিতে পারাযায়। তাহাতে অতীব আনন্দানুভব হয়, এখানেও শাস্ত্রের ভাষায় "আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি"র অবস্থা উপস্থিত হয়।

আমাদের একটি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (প্রচারক) যিনি এখন পরলোকে, তিনি বলিতেন, আমি কিছুতেই আর 'দমি' না" এখন বুঝিতে পারি তিনি এ কথা, আত্মজ্ঞানের দ্বারাই বলিতেন।

আর একটি কথা সংক্ষেপেই বলিতেছি; আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সাধকের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন সাধকের সকল সংশয় ভাব চলিয়া যায়। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে জনমে মরণে; ক্ষতি কিম্বা লাভে, সকল ঘটনায় সকল অবস্থায় মঙ্গলময়ের 'হস্ত আছে জানিয়া সাধক শান্ত ভাব লাভ করেন।

এখন আমার সেই প্রথম কথা, উপস্থিত ধর্ম্মবন্ধু ও শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণের নিকট নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

আমি সাধনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিয়াও কিছুই সাধন করিতে

পারি নাই। কিন্তু জীবনের মূলে যখন দেখি 'একজন' সাধন করাইতেছেন, সে সাধনে যোগ কি ভক্তি, কর্ম্ম কি জ্ঞান, কি এক অ-বিভক্ত সাধন, সমস্ত জীবন ব্যাপী হইয়া চলিয়াছে তখন বলি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

চাকুরি ও কৃষি।

যে কার্য্যেকে অতি প্রাচীন কালে ঋষি ও রাজারা অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, যে কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষের গৌরব আজিও "সুবর্ণ প্রসবিনী" "সুজলা সুফলা-শস্য-শ্যামল" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যুবক দল সেই পবিত্র কৃষিকার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া সামান্য অকিঞ্চিতকর চাকুরি করিয়া আপনার বংশ ও জাতিকে কলঙ্কিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। কৃষকেরা ৬ মাস পরিশ্রম করিয়া ৬ মাস সুখে সচ্ছন্দে ঘরে বসিয়া জীবন ধারণ করে, আর আধুনিক নব্য বাবুরা বেলা ৯ ঘটিকার সময় উতপ্ত অন্ন গলাধকরণ করিয়া আপিসের শ্বেত প্রভুর 'ড্যাম শূয়ার' রূপ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যার সময় রাজপথে ধূলি সেবন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাসান্তে ১৫।২০।৩০ বা ৫০ টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না। হায়! অধিকাংশ চাকুরি প্রিয় যুবক উৎকোচ গ্রহণকে অন্যায় মনে করেন না কিন্তু পবিত্রচেতা কৃষকগণকে "চাষা" ও ছোট লোক বলিয়া ঘৃণা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। বঙ্গদেশের কি শোচনীয় সামাজিক দুর্নীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক জন ২৫ টাকা বেতনের চাকুরিতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সমাজে গণ্যমান্য ও প্রতিপত্তিলাভ করিতেছেন, আর একজন পবিত্র কৃষিকার্য্য করিয়া সমাজে চাষা নামে উপেক্ষিত, ও নীচ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্বহস্তে হল চাল্‌না যে কখনই অন্যায় নহে তাহা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ পুঃন পুঃন বলিয়া গিয়াছেন্। দেশাচার সেই পবিত্র বাক্য কর্ণপাতও করেন না। আমরা যদি খাঁটী স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে শিল্পবানিজ্য ও কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে। নতুবা শত শত বৎসর ধরিয়া স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিলে কখনই স্বাধীনতা

ও স্বরাজ লাভ হইবে না। সুতরাং স্বরাজলাভের প্রধান উপায় কৃষি। দেশের যুবকেরা শিক্ষা লাভ করিয়া যদি নূতন প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করেন, তাহা হইলে লাঞ্ছিত কুকুর-বৃত্তি অপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইতে পারেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন "চাষ যে করিব, তাহা কি খাইয়া করি" তাহার উত্তর এই যে, কি খাইয়া উমেদারি করেন? কি খাইয়া এপ্রেন্‌টিস্ করেন? আচ্ছা, তাই যদি একেবারে চাকুরির মায়া কাটাইতে না পারেন, তবে চাকুরি করিতে করিতে কিছু কিছু শাক শব্‌জি আরম্ভ করিয়া কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভে ক্রমশঃ কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতে পারেন। তবে নিজে সব তত্ত্বাবধান না করিলে অনেকস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। তাই আমাদের বিদুষি খনা বলিয়া গিয়াছেন,—

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি; তার অর্দ্ধেক কাঁদে ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে হা ভাত।"

তাই যুবকগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, কোদাল ও কলমের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। সেইজন্য আমরা পাঠকগণকে মধ্যে মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ উপহার দিব। (ক্রমশঃ) শ্রীরসিকলাল রায়।

স্থানীয় বিষয়।

তাম্বুলী সমাজ;—খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা ও বরাহনগর নিবাসী তাম্বুলী বা তাম্বুল বণিক্ শ্রেণী ও তাম্বুলী সমাজের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘৃত, চিনি ইত্যাদির ব্যবসায়ে এ শ্রেণী চিরদিন সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু এই শ্রেণীর সামাজিক রীতি কোন কোন বিষয়ে উন্নত নহে। বিবাহ পদ্ধতি অনেকটা অনুন্নত। সচারাচর চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সের বালক, সাত আট বৎসরের বালিকার সহিত বিবাহিত হয়। এ বয়সে অধিকাংশ বালক উপার্জ্জন-ক্ষম হয় না। উপার্জ্জন ক্ষম না হইয়া সংসার ভারাক্রান্ত হইলে যে, চির দরিদ্রা

ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? উপার্জ্জনে অক্ষম, কেহ কেহ পৈতৃক ধনে ধনী হয় বটে, কিন্তু অশিক্ষিত—অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক, ধন রক্ষায় সক্ষম হয় না। সকলেরই অর্থোপার্জ্জনে পটুতা আবশ্যক। নতুবা সে সামাজিক হইবার অযোগ্য। ব্যক্তিগত উন্নতিই সামাজিক উন্নতির কারণ।

পীড়িত অবস্থায় বালক বালিকার বিবাহ অনুচিত। পীড়িতের বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। যাঁহারা শাস্ত্রের নিষেধ বিধি না মানিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বর, প্লীহা, যকৃত গ্রস্থ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদের কার্য্যের ফলে সমাজে বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, অন্যদিকে রুগ্না প্রসূতির ক্ষীণ সন্তান, সংসারে রোগ শোক বৃদ্ধি করিতেছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সমাজ এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি সাধন, তারপর বিষয় কার্য্য শিক্ষা করিয়া অন্ততঃ বিবাহ করা কর্ত্তব্য। উন্নত সমাজের সদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। বর্ত্তমানে তাম্বুলী সমাজে যাঁহারা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় যত্নশীল, তাঁহারা কন্যাদিগের ও একটু বিদ্যাশিক্ষা দিয়া বিবাহ পদ্ধতির সংস্কারে যত্নবান হইয়া উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাইলে ভাল হয়।

তারপর তাম্বুলী শ্রেণীর কন্যার বিবাহে এ পর্য্যন্ত পাত্রকে পন-স্বরূপে নগদ টাকা দেওয়ার প্রথা ছিল না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা তাম্বুলী সমাজে নিঃশব্দে প্রবেশ-চেষ্টা করিতেছে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমাজ এজন্য কিরূপ দায়গ্রস্থ তাহা কে না জানেন? অতএব তাম্বুলী সমাজ সাবধান হউন, দৃঢ় হউন, এ কুপ্রথা যেন সমাজে প্রবেশ না করে। আমরা শুনিলাম এবিষয়ে বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রক্ষিত মহাশয় "তাম্বুলী-সমাজের" অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া উক্ত কুপ্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সকলে তাঁহার পক্ষ সমর্থন, ও ঐ দূষিত প্রথা নিবারণের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা জানি, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাম্বুলী সমাজে কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত মূল্যবান দান সামগ্রী প্রদানের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু খাঁটুরা-পালপাড়া নিবাসী পরলোক-গত কেদারনাথ পাল মহাশয় সে প্রথা নিবারণ করিয়া তাম্বুলী সমাজের বিশেষ একটি কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন।

বিনীত নিবেদন।

আমাদের কন্যা, মনোরমার পরলোকগমন সংবাদ, প্রসঙ্গক্রমে গতসংখ্যক কুশদহে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহা পাঠে ব্যথিত হইয়া, আত্মীয়, বন্ধুগণ যে সকল পত্র লিখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি ; এবং প্রত্যেক পত্রের স্বতন্ত্র উত্তর লিখিতে না পারিয়া এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

স্নেহের মনোরমার জীবনে যেটুক্ ধর্ম্মাঙ্কুর প্রকাশিত দেখা গিয়াছিল, তাহা যতদূর স্মরণে আসিল, লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার শ্রাদ্ধোপাসনায় দিবসে পঠিত হইয়াছিল। ব্যথিত আত্মীয় ও সহৃদয় পাঠকগণের তৃপ্তিহেতু নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম নিবেদন ইতি।

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
১৮ই ফাল্গুন ১৩১৫।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

স্নেহের মনোরমা।

(১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ; শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত।)

আমাদের স্নেহের মনোরমার ক্ষুদ্র জীবন, যাহার শারীরিক বয়স প্রায় ১৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, সে কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল মাত্র আমাদের নিকট বা ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে আসিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত অবস্থায় ছিল। যাহার জন্য মনোরমা নিজেই আমাকে বলিয়াছিল, "বাবা! আমি নরক হইতে উদ্ধার হইয়া আসিয়াছি।" মনোরমাকে আমি বর্ণপরিচয় হইতে বিজ্ঞানবোধের কতক অংশ পড়াইতে পারিয়াছিলাম। তাহাতেই তাহার শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া, একদা আমার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিল, "কাকা বাবু! আমার সময় চলিয়া যাইতেছে, এখন যদি আমি কিছু শিক্ষা করিতে না পারি তবে ভবিষ্যতে কি হইবে।" কোন দিন তাহার মাতাকে বলিয়াছিল, "মা আমি লেখা পড়া শিখিয়া তোমার দুঃখ দূর

করিব।" তাহার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় উন্নতির ব্যাঘাৎ হইতেছে দেখিয়া সময় সময় দুঃখ প্রকাশ করিত।

আমাদের দৈনিক পারিবারিক উপাসনা-প্রার্থনায় যোগ দিয়া তাহার যে টুকু ধর্ম্মজ্ঞান, বিশ্বাস, ও ভাব-ভক্তি হইয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিয়াছিলাম যে, উপাসনা কালীন সময় সময় তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইত। কোন সময় আমাকে বলিয়াছিল, "বাবা! উপাসনার সময় কেমন সুন্দর ভাব হয়, আহা! সেই ভাব সব সময় থাকে ত বেশ হয়। আমি ভাল লিখিতে পারিলে লিখিয়া রাখিতাম।" সামাজিক এবং পারিবারিক উপাসনার প্রতি তাহার বেশ অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

মনোরমা পর-চর্চ্চা পর-নিন্দায় বড় বিরক্ত ছিল, ঐ সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিত না। তাহার প্রাণে পরদুঃখ কাতরতার ভাব প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছিল। অপরের দুঃখ দেখিলে বা দুঃখের কথা শুনিলে, তাহাতে সে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিত, এবং নিজের অবস্থা ভাল হইলে পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে, এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিল।

মানুষের সেবা করিবার প্রবৃত্তি তাহার দেখা গিয়াছিল। আমাদের ঘরে গরীব বন্ধুরা আসিলে যে দিন ঘরে কিছুই থাকিত না, এক গ্লাস জল ও একটু হরিতকী দিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিতে চেষ্টা করিত।

মনোরমা প্রাতে বা রাত্রিতে একাকী উপাসনার ভাবে ধ্যান ও চিন্তা করিতে প্রয়াস পাইত। রাত্রিতে শয়ন কালীন প্রার্থনার মধ্যে বলিত। (একথা তাহার মা শুনিয়াছিলেন) "হে ভগবান যেই তোমার ডাক আসিবে, আমি যেন প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারি।" কোন কোন রাত্রিতে নিজে প্রার্থনার সময় তাহার মাঁকে কাছে বসিতে বলিত। কোন দিন দৈনিক মিলিত উপাসনা না হইলে, যেন আহারে তাহার তৃপ্তি হইত না।

মনোরমা কিঞ্চিদধিক সাড়ে বার বৎসর বয়সে আমাদের নিকট যখন আসিল, আমি তাহার নবজীবন কামনা করিয়া "মনোরমা"—এই নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহার মাতৃদত্ত "সুধা" নামেও অভিহিত করা হইত। এখন পরম মাতার বক্ষে কি নামে অভিহিত হইল তাহা তিনি ভিন্ন আমাদিগকে আর কে বলিয়া দিবে।

প্রার্থনা।

"কত শত আছে দীন, অভাগা আশ্রয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত, কাঁদিতেছে নিশি দিন;
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা আর পথ আছে, দাও তারে দরশন॥

—

"গাও হে! ভক্তসিংহ সবে,
সিংহরবে ব্রহ্মনাম গান।
কর ভীমনাদে ধরা কম্পবান।
হরিনাম সুধা,—সুধা বিলাইয়ে,
বাঁচাও পাপে হত জগৎ-জনের প্রাণ।
নাম কোলাহলে, জাগাও সকলে,
দুঃখী দীন হীনে কর শান্তি দান।
ঘোর পাপানলে, দেশ গেল জ্বলে,
হরিভক্তি-জলে কর হে নির্ব্বাণ॥

—

সুরাপান।

শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান কমিতেছে কি বাড়িতেছে, এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। আব্‌গারী বিভাগের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, সুরার কাট্‌তি মোটের উপর কম নহে। শিক্ষিত যুবাদলের ভিতর হইতে এক-শ্রেণীর গঠন হইয়াছে, যাঁহাদের মধ্যে সুরাপান একেবারে বন্ধ না হইলেও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, অথচ সুরার কাট্‌তি কমে নাই কেন? তাহার কারণ কলকারখানার কার্য্যে শ্রমজীবীগণের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের মধ্যে সুরাপান অত্যন্ত প্রবল হইতেছে। কেবল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী, কাঁকনাড়া, আগরপাড়া, আলমবাজার, বরাহনগর, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে সপ্তাহের পর

শনি রবিবারে, হাজার হাজার লোকের অবস্থা যাঁহারা পর্য্যবেক্ষন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তাহাদের অবস্থা কি প্রকার শোচনীয়। অন্যান্য শ্রেণীর অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, অথচ যাহাদের ব্যবসাকার্য্যে অর্থাগমের পথ নিতান্ত কঠিন নহে, তাহারা অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণীর হইলেও, তাহাদের মধ্যে সুরাপান অবাধে চলিয়াছে। যেখানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অধিক বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-সভ্যতা লাভের পক্ষে যে সুযোগ হয়, সে সুযোগ তাহাদের নিকট অল্প। অন্যদিকে অর্থাগমের পথ সহজ থাকায়, তাহারা সহজেই ঐ স্রোতে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং ইহাদের অবস্থার বিষয় ভাবিলে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়।

শ্রমজীবীগণ অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের পর একটু মত্ততার সুখ সম্ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে কি উপায়ে এই সর্ব্বনাশী কুঅভ্যাস হইতে ফিরাইতে পারা যায়, এই কার্য্য কঠিন সমস্যার ন্যায় হইলেও আমরা জানি, বর্ত্তমানে কেহ কেহ এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং ভদ্রশ্রেণীর, তাহাদের ভিতর হইতে এই মহাপাপ কি উপায়ে দূরীভূত করা যায়? এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি; এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহার্য্য প্রার্থনা করা আমাদের পক্ষে বৃথা, দেশের লোককেই এজন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এ বিষয়ে কথা হইয়াছে যে, আশু এক উপায় এই যে, এজন্য ঘোর আন্দোলন করা আবশ্যক; এই পাপে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা যদি সকলকে একটু বুঝান যায় তবে কি কিছুই ফল হইবে না? এজন্য একটী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, যাহা শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত করা হইবে।

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী "ব্রাহ্মবন্ধু সভায়" আলোচনা উত্থাপন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, বি.এ, মহাশয় সেই প্রবন্ধটী লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মানব জাতির বাল্যকালাবধি সর্ব্বদেশে কোন না কোন প্রকারে সুরার প্রচলন ছিল। * * * *

সধারণতঃ দেখা যায়, দ্রব্য বিশেষের ব্যবহারের দ্বারা, শারীরিক অনিষ্ট সাধিত

হইলে চিকিৎসা শাস্ত্র তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করেন; নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অধঃপতনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সামাজিক অবনতির কারণ বিদ্যমানে ব্যবস্থাশাস্ত্র উক্ত অনিষ্টকর বস্তুর ব্যবহারে নিষেধ-বিধি প্রচার করেন। চিকিৎসক, ধর্ম্মাচার্য্য ও ব্যবস্থাপক এই তিন শক্তির যেখানে সম্মিলন, তথায় এই তিনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বিচক্ষণতা, ধার্ম্মিকতা বা দেশ ভক্তির পরিচায়ক নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মদিরা প্রচলন দ্বারা শারীরিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল; তাহার প্রমাণ প্রথমতঃ চরক বলিতেছেন :—

বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাত-প্রকোপনাঃ।
ত এব মদ্যেদৃশ্যন্তে বিষেতু বলবত্তরাঃ॥

অর্থ :—বিষে সন্নিপাত-প্রকোপনকারী যে সকল গুণ দেখা যায়, মদ্যরূপ বিষে সে সকল অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়।

ওজঃ নামক শারীর ধাতু, জীবনী শক্তির সাক্ষাৎ আধার। সেই ধাতুর দশটি গুণ আছে। আর মদ্য-পদার্থে ঐ দশগুণের বিপরীত দশটি গুণ আছে; সুতরাং মদ্য পান দ্বারা জীবনী শক্তির সর্ব্বতোভাবে, অন্ততঃ আংশিক রূপে অনিষ্ট হইবেই হইবে।

—চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২শ অধ্যায়।

মদ্য সেবনে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহাতেই উন্মাদ, মদ, মূর্চ্ছাদি, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম উপস্থিত হওয়াতে, স্মৃতি বিভ্রংশ ও তাবৎ নিকৃষ্ট লক্ষণ জন্মায়। এই হেতু, মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিরা, মদ্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন।

—চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২শ অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট প্রভৃতি মহর্ষিগণ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মদ্যকে শরীর ও মনের ঘোরতর অহিতকারী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পর অকাট্য যুক্তিদ্বারা তাঁহাদেরই মত পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত সুরা সম্বন্ধে সমর্থন করিতেছেন।

২য়তঃ। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে মদিরা পানের বিরুদ্ধে বহুল প্রমাণ আছে; তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্ ।—শ্রুতিঃ

অর্থ। সুরা পান করিবে না, দান করিবে না এবং দানগ্রহণ করিবে না।

চতুর্ব্বর্ণেরপেয়াস্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ নারদ—বায়ু পুরাণ।

অর্থ। হে নারদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক, ইহাদের সুরাপান করা উচিত নহে।

তুমি মদ্য পান বা স্পর্শ করিও না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পঞ্চম আজ্ঞা।

শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারকগণও সুরাপান নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

৩য়তঃ। ভারতীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র সুরাপান সম্বন্ধে বলেন ঃ—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃসহ ॥

মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক।

অর্থ। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপানঃ স্বর্ণচুরি, গুরুপত্নী গমন এবং এতদনুষ্ঠাতাদিগের সহিত এক বৎসর সংসর্গ, এগুলিকে মহাপাতক কহে।

সুরাংপীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।

তয়া স্বকারে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিবাংততঃ ॥

গোমূত্রমগ্নিবর্ণম্বাপিবেদুদকমেব বা

পয়োঘৃতং বা মরণাৎ গোশকৃদ্রসমেব বা।

মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯১ শ্লোক।

অর্থ। দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য মোহপ্রযুক্ত সুরাপান করিলে, তাঁহার অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরাপান করা উচিত। এরূপ করিয়া সশরীরে দগ্ধ হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, অথবা অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, গোঘৃত বা গোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে।

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে প্রাচীন ভারতে মদিরা পানের বিপক্ষে বৈদ্য, ধর্ম্মপ্রচারক এবং ব্যবস্থাপক এই ত্রিবিধ শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল, অনুসন্ধানে জানা যায় যে জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপক ও ব্যবস্থা-প্রণেতৃগণ একবাক্যে সুরাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সকল

দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মতের বিষয় অবগত নহি সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না।

বাইবেল গ্রন্থে ওয়াইন (wine) শব্দটির ২৬১ বার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে ১২১ বার সাবধান করা হইয়াছে; ৭১ বার সাবধান ও তিরস্কার করা হইয়াছে এবং ৫ বার একবারে নিবারণ করা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি প্রমত্তকর পানীয় পান করে, সে এমন কি পৃথিবীতে নিজের মূল উৎপাটন করে। —বুদ্ধ।

সুরা পাপের জননী —মহম্মদ

"ধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রভাবে সুরাপান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দমন হয়। কনফুষসের প্রভাবে কোটী কোটী চীনবাসী, বুদ্ধদেবের প্রভাবে কোটী কোটী বৌদ্ধ এবং মহম্মদের প্রভাবে কোটী কোটী মুসলমান মদ্যপান করে না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিল।" প্রাচীনকালে যেরূপ মদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা চিনির রসে গেঁজলা উঠিলেই প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ের মদ্যের ন্যায় তীব্র ছিল না। তথাপি গ্রীসের রাজনীতিজ্ঞ ড্রাকোর আইন মতে মাতালদিগকে হত্যা করা হইত। স্পার্টার লাইকারগস, আইন করিয়া সমস্ত আঙ্গুর বৃক্ষ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

A lecture on Alcohal by K. L. Pyne.

হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক জাতি কোন বিজিত দেশকে ক্ষমতা হীন করিবার জন্য এবং উহাকে অধিক দিন অধীনে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে মদের দোকান স্থাপন ও বৃদ্ধি করিত।

"Medical Experience and Testimony."

ইংরেজেরা উত্তর আমেরিকায় আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে মদ প্রচলিত করিয়া তাহাদিগকে এতদূর উন্মত্ত, নির্ম্মূল ও অধঃপাতিত করিয়াছে, তাহারা খৃষ্টানদিগের নামে থু থু করে।

D. S. Govett, M.A.

(ক্রমশঃ)

থিয়েটার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উক্তি।

আমাদের দেশের নাট্যশালাগুলি যে দেশের কতদূর অকল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনস্বী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"থিয়েটার বা নাট্যশালার অভ্যুদয়ে আমাদের আমোদ প্রিয়তার অস্তিত্ব সূচিত; উহার প্রাদুর্ভাবে ইহার আধিক্য ও ব্যাপকতা জ্ঞাপিত। নাট্যশালার অভ্যুদয় অধিক দিন হয় নাই! পাইকপাড়ার রাজাদের বা মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনের নাট্যশালার কথা বলিতেছি না—তাহাও কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের কম হইবে। আমি ব্যবসায়ী নাট্যশালার কথা বলিতেছি। উহার বয়ঃক্রম আরও কম—বোধ হয় চল্লিশের অধিক নয়, ইহার মধ্যে কিন্তু পাঁচ সাতটা নাট্যশালা হইয়াছে, পাঁচ সাতটাই চলিতেছে। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কতই যে তথায় যায়, তাহার সংখ্যা হয় না—যায় কেবল আমোদের জন্য, লোক, মজিবার জন্য! যাহারা স্বল্পবয়স্ক, তাহাদের এই সকল রঙ্গালয়ের প্রবল প্রলোভন সহ্য করিয়া থাকা অসম্ভব বলিলেই হয়—তাহারা যথার্থই অধঃপাতে যাইতেছে। রঙ্গালয়ে সুশিক্ষা হইতে পারে না, এমন নয়। বোধহয় কুশিক্ষাই অধিক হইতেছে। সেখানকার নাচগান, সাজসজ্জা, হাবভাব, দৃশ্যপট সকলই ইন্দ্রিয়ের মোহকর, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। সে মোহকারিতা সে উত্তেজনার কাছে বুদ্ধ চৈতন্যের দুই একটা কথা বা ধর্ম্মাধর্ম্মের দুই একটা উপদেশ কিছুই করিতে পারে না; আমরা অন্তঃসার শূন্য, কর্ম্মহীন, অসংযতেন্দ্রিয়, বাহ্যবস্তুর মোহে মুগ্ধ—আমরাইত রঙ্গালয়ে মজিবার উপযুক্ত পাত্র। তাই আমরাও মজিতেছি, আমাদের গৃহের যাঁহারা লক্ষ্মী, তাঁহাদিগকেও মজাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মোহান্ধতায়, আমাদের অসংযম—উচ্ছৃঙ্খলতার আর কি সীমা আছে?

"এই সকল রঙ্গালয় আমাদেরই স্থাপিত, বিদেশীয়ের স্থাপিত নয়। স্থাপয়িতা-দিগের মধ্যে সুবোধ, সূক্ষ্মদর্শী, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক লোকও আছেন। স্বজাতির শোচনীয় ও ভীতিজনক অবস্থা দেখিয়া, কেমন করিয়া তাঁহারা ঐ

অবস্থার ভীষণতা ও শোচনীয়তা বৃদ্ধি করেন, বুঝিতে পারি না। কেবল মনে হয়, অপর সকলের ন্যায় তাঁহারাও মোহাচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁহারা যখন অপরের চৈতন্য সম্পাদনের প্রয়াসী তখন তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, বোধহয় তাঁহারা রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাই আমাদের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের নিকট বিনীত নিবেদন, ঐ সকল স্থানে যখন সুশিক্ষা হইতেছে না, এবং কর্ম্মী নই বলিয়া যখন আমাদের আমোদের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক, অসঙ্গত ও অন্যায়, তখন ঐগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। বন্ধ করিলে আর্থিক ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—বিলাস বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম বন্ধ হইলে, অন্য উপায়ে অর্থ আসিবে; এস্থানেও তেমনি বলি যে, "আমোদ বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম বন্ধ হইলে, অন্য উপায়ে অর্থ আসিবে। বিদেশীয় ব্যবসায়ী হইলে, তাঁহাদিগকে এ কথা বলিতাম না, বলিতে পারিতাম না। তাঁহারা আমাদের স্বদেশীয় ব্যবসায়ী, ঘরের লোক, পরমাত্মীয়, তাই তাঁহাদিগকে এ কথা বলিতেছি। বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা এদেশীয়ের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, করিবেই বা কেন? কিন্তু স্বদেশীয় ব্যবসায়ী, স্বদেশীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসায় করিলেই যেন ভাল হয়। তাঁহাদিগকে এরূপ ব্যবসায় বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলে, বোধ হয় অন্যায় বা অসঙ্গত কার্য্য করা হয় না।

"যদি রঙ্গালয় বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে, আশা করি যে উহার অপকারিতা কমাইতে অনিচ্ছা বা আপত্তি হইবে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার এক উপায়,—রঙ্গালয়ের সংখ্যা হ্রাস করা। আর এক উপায়, অভিনয়ে স্ত্রীলোক নিযুক্ত না করা। তৃতীয় উপায় স্ত্রীলোক এবং ২০ বৎসরের অনধিক বয়স্ককে অভিনয় দেখিতে না দেওয়া। চতুর্থ উপায়, ঘন ঘন অভিনয় বন্ধ করিয়া সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় করা। পঞ্চম উপায়, রাত্রি দশটার পর অভিনয় না চলে, এইরূপ নিয়ম করা। ইহাতে রাজার সাহায্য চাই না, রাজার সাহায্য সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়, রাজার সাহায্য পাওয়া যাইবেও না—রঙ্গালয়াধ্যক্ষগণের স্বদেশ প্রেমিকতাই এ কার্য্যের জন্য যথেষ্ট। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবগুলির বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

*　　*　　*　　*

আমাদের অমোদপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে, আমরা ধর্ম্মচর্য্যাও

আমোদে পরিণত করিতেছি। আমাদের অনেকের দুর্গোৎসবে সাত্ত্বিকভাব আর নাই, ভক্তিভাব আর দৃষ্ট হয় না, ভক্তের একাগ্রতা উন্মত্ততা বিলুপ্ত, অন্নদান, বস্ত্রদান আর নাই; আছে কেবল আমোদ, আহ্লাদ, নেশা, নাচ, থিয়েটার। ইহার অপেক্ষা অধোগতি আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মচর্য্যাকে ইন্দ্রিয়চর্য্যা করিয়া তোলা বড় ভয়ানক কাজ। এমন কাজ যে করিতে পারে, তাহার বাহ্য জগতই প্রদীপ্ত, অন্তর্জগত বিলুপ্ত। সে আপন কাজ এবং পরের কাজ, সকল কাজ করিবারই অনুপযুক্ত। তাই আমরা কোন কাজই করিতে পারিতেছি না, আমাদের কাজের সকল উদ্যমই নষ্ট হইতেছে। বাহ্য বস্তুর মোহ কাটান বা কমান ভিন্ন ইহার প্রতীকার নাই। আমাদের কিরূপ অন্তঃসার শূন্যতা ও অধঃপতন হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে—তাহা হৃদয়াঙ্গম করিবার জন্য যে জ্ঞান ও চৈতন্যের প্রয়োজন, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইবেও না; কেবল আমাদের ধর্ম্মভাবের প্রাণহীনতার উপর একটা প্রকাণ্ড মোহকর চাকচিক্যময় বাহ্যজগত আসিয়া পড়ায় চাপা পড়িয়াছে। এই জন্যই এ সকল কথা কহিতেছি। নহিলে কহিতাম না। অতএব আমাদের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহ্যবস্তুর বা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সংযমী হইতে হইবে—অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর দিকে ইন্দ্রিয়াদির যে স্বাভাবিক আবেগ আছে, একটা প্রকাণ্ড বাহ্যময়ত্ব আমাদের প্রাণশূন্য ধর্ম্মভাবের উপর নিপতিত হইয়া, যে আবেগকে এত বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা কমাইয়া ফেলিয়া, বাহ্য বস্তুকে আর কুকথা কহিতে দেওয়া হইবে না, আর আধিপত্য করিতে দেওয়া হইবে না। * * অন্তর্জগতে একবার দৃষ্টি পড়িলে, ধর্ম্মে প্রাণ প্রবেশ করিবে, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে; একক বা সম্মিলিতভাবে সকল সৎকর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ জন্মিবে।" (—সঞ্জীবনী)

পরমহংস রামকৃষ্ণ-সংবাদ।

বিগত ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি-জেলার কামারপুকুর গ্রামে পরমহংস মহাশয়ের জন্ম, পিতা ক্ষুদীরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি দেবী।

পরমহংস মহাশয় দক্ষিণেশ্বর (রাণী) রাসমণির কালীবাড়ি থাকিয়া সাধন ভজন করেন। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রায় শেষ জীবন পর্য্যন্ত তথায় ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অদ্যাপি একটি ঘরে তাঁহার জীবিতকালের ন্যায় দ্রব্যাদি সজ্জিত আছে। সাধনের স্থান পঞ্চবটি ও অন্যান্য চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কালীবাড়ি স্থানটি অতিশয় মনোরম। পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জন্মোৎসব হইত। স্বামী বিবেকানন্দ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যখন "রামকৃষ্ণ-বার্ত্তা" ও বেদান্ত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিলেন, তখন দক্ষিণেশ্বরের অধিষ্ঠাতা তথায় তাঁহাদের স্থান দিতে পারিলেন না। এই ঘটনায় পরমহংস রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র ও সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ, হিন্দুনামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর "বেলুড়মঠ" হইল ও তথায় জন্মোৎসব হইতে লাগিল। এখন পৌষ সংক্রান্তির পর দক্ষিণেশ্বরে একটি উৎসব হয়। জন্মোৎসব অন্যান্য স্থানেও হইতেছে।

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ১ টার সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ভক্ত-সেবক রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে তাঁহার সমাধি-মন্দির করিয়াছেন। তথায় ঐ সময় বার্ষিক তিরোভবোৎসব এবং দৈনিক সেবাদি হয়।

পরমহংস মহাশয় দেহত্যাগ কালে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত তেজস্বী সন্ন্যাসী শিষ্য ১৯।জন বর্ত্তমান রাখিয়া জান, তাহার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ প্রধান বলিয়া খ্যাত। এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ, আরো ২ জন দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ প্রভৃতির শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, বর্ত্তমানে

আশী, পচাশী (৮০।৮৫) জন সন্ন্যাসী পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ-মিসনের কাজ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইং ১৯০২ সালের ৪ ঠা জুলাই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-মিসনের প্রধান স্থান কলিকাতা বেলুড়মঠ। সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। ইহার কয়েকজন ট্রষ্টী আছে, সকলেই সন্ন্যাসী শিষ্য। সভাপতি বৎসরের কয়েক মাস বেলুড়মঠে থাকেন, অবশিষ্ট সময় মঠ সকল পরিদর্শন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতে সম্পাদক বেলুড়মঠে থাকেন। বর্ত্তমানে যে যে স্থানে মঠ,ও কোন মঠে কে কার্য্য করিতেছেন, যথা :— (১) কাশীতে স্বামী শিবানন্দ। (২) মায়াবতী (কুমায়ুনে) স্বামী বিরজানন্দ। (৩) মান্দ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (৪) ব্যাঙ্গলোর (মহিসুরে) স্বামী আত্মানন্দ। আমেরিকায় ছয়টী "বেদান্ত সোসাইটী" আছে, যথা :—ছুইটি (New york) নিউইয়ার্কে স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ। ছুইটি (California Sanfrancko) কালিফার্ণিয়া স্যান্‌ফ্রাস্কোতে, স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ। (৫) Pits burgs) পীট্‌স বার্গস্ এ স্বামী বোধানন্দ। (৬) (Los Angelos) লস্ এ্যাঞ্জিলস্, এ স্বামী সচ্চিদানন্দ *। সেবাশ্রম,—(অর্থাৎ সাধু বা অন্যান্য রোগীদিগের চিকিৎসালয়,) যথা :—(১) কাশীতে স্বামী অচলানন্দ। (২) বৃন্দাবনে ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ। (৩) কংঙ্খল (হরিদ্বারে) স্বামী কল্যাণানন্দ। (৪) মুর্শিদাবাদ—ভাব্‌দাগ্রামে অনাথাশ্রম ও একটি স্কুল, (বালকদিগের জন্য) স্বামী অখণ্ডানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমেরিকা হইতে ধর্ম্মের জন্য যে ছুইটি মার্কিন নারী এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা প্রসিদ্ধা। তিনি বাগ্‌বাজার বোস্‌পাড়া লেনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, নিয়মিত-রূপে তাহার কার্য্য চালাইতেছেন। মহিলাদিগের মধ্যে লেখাপড়া ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহার সহকারিণী এখানকার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী-প্রপীড়িতের সেবায় প্রয়োজন মতে সন্ন্যাসীগণ নিযুক্ত

* ইনি কুশদহের মধ্যে, বনগ্রামের সন্নিকট চাঁপাবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং গোবরডাঙ্গা গ্রামে বিবাহ করেন, ইঁহার পত্নী ও বালক-পুত্র বর্ত্তমান।

হন। বিগত দুর্ভিক্ষে পুরী, মুর্শিদাবাদ, যশোহর জেলায় ১৫,২১৭৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। কার্য্যকালে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া খান, দুর্ভিক্ষ তহবিলের অর্থ গ্রহণ করেন না।

মায়াবতীতে একটি ছাপাখানা আছে, ও ইংরাজী ভাষায় "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হয়। কলিকাতা বাগবাজার ১২, ১৩ নম্বর গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন হইতে "উদ্বোধন" নামক মাসিক পত্র বাহির হয়। বর্ত্তমান ১৩১৫ সালের মাঘমাস হইতে উদ্বোধন ১১ শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। নিজের বাড়িতে উদ্বোধন আফিস; তথায় পরমহংস রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম-লিখিত) এইস্থানে ও ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন রামকৃষ্ণ মিসনের সকল পুস্তক, রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ৩৮ নং নন্দদের ষ্ট্রীট, পোঃ বরাহনগর। পাওয়াযায়।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যুৎপন্নমতি-

স্বর্গীয় রাসবিহারী দত্ত।

সাধু মহাত্মাগণ ব্যতীত সাধারণ মানবের মধ্যে যাঁহাদের বিশেষ গুণ এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদের জীবনাদর্শ সাধারণের পক্ষে অধিক গ্রহণীয়। সাধারণ মানবে ক্রটী দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, যে সকল গুণ ও শক্তির বিকাশ দেখা যায় তাহাকে আদর ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে দেশে, যে গ্রামে এবং যে জাতির মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশ—সেই গ্রামবাসী ও সেই জাতির পক্ষে ঐ সকল ব্যক্তির চরিত আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যদিও মানবের গুণগ্রাম দেশকালে বদ্ধ থাকিবার বিষয় নহে, তথাপি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করা জাতীয় উন্নতির পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক।

আমরা আজ যাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, যিনি খাঁটুরা গ্রামে, দত্ত পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি বিশেষভাবে খাঁটুরার আনন্দ বর্দ্ধক ছিলেন, যাঁহার অভাবে খাঁটুরা গ্রাম সত্যই নিষ্প্রভ হইয়াছে, সেই প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রিয়দর্শন রাস-বিহারী দত্ত মহাশয়ের সমগ্র জীবনী আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সম্ভবও নহে, মাত্র তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করাই আজকার উদ্দেশ্য।

তৎসম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই তাঁহার সম্বন্ধে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, "বিষাদ" নামক যে কবিতা পুস্তকখানি লিখিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার জীবনের অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনী বলা যায় না। এজন্য তাঁহার একখানি জীবন চরিত লেখা হইলে ভাল হয়। কুশদহের মধ্যে কে আছেন যিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা, রাসবিহারী বাবু বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী, পরীক্ষা দ্বারা বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ সহকারে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল ও জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। তাহাতে অনেক শিক্ষণীয় ও সাধারণের উপকারের বিষয় ছিল, এবং রাসবিহারী বাবুর কীর্ত্তি-স্বরূপ পুস্তক খানি রক্ষাকরা একান্ত উচিত। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী বাবু এ বিষয়ে যত্নবান হইলে ভাল হয়।

তারপর রাসবিহারী বাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে তিনি কেমন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একটি দলের নেতা হইয়া, কখন গীত-বাদ্যে, কখন নাটকাভিনয়ে ও বিবিধ শিল্প রচনা দ্বারা সকলকে অত্যন্ত চমৎকৃত করিতেন। ফলতঃ বিবিধ শিল্প কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি ছিল। তিনি একটু অধিক বয়সে ব্যায়াম চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়া, "খাঁটুরা ব্যায়ামশালার" (জীব নষ্টীক পার্টির) কার্য্যে, যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য জনক। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিনা শিক্ষকের সাহায্যে, নিজ উদ্ভাবনী শক্তি যোগে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন তাহাতেই নেতৃত্ব পূর্ব্বক সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহার "রাজাভিষেক ও হরিশ্চচন্দ্র" নাটকাভিনয়

আজও আমাদের মনে জাগরূক রহিয়াছে। নিজে প্রধান অভিনেতা হইয়া আপন অংশ যেমন সুন্দর অভিনয় করিতেন, তেমনই সমস্ত অভিনয়ক্ষেত্রের কার্য্যশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেও দক্ষ ছিলেন। কি যে একটা শক্তি তাঁহাতে ছিল, যাহাতে সকলেই আহ্লাদের সহিত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজেকে সুখী মনে করিত।

তাঁহার সম্বন্ধে, পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বিহারীর যখন পাঠ্যবস্থা, তখন একদিন আমি দেখি একখানি সামান্য কাগজে একটি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত, যাহা অনেক পরিমাণে বিহারীর অনুরূপ। পরে জানিতে পারিলাম উহা বিহারীর নিজেরই লিখিত। তখন আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলাম"। বাস্তবিক ইহা আশ্চর্য্য হইবার বিষয়। এই খানেই তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার অঙ্কুর বলা যায়। তাঁহার এই স্বাভাবিক শক্তিশালী জীবন যদি উচ্চ শিক্ষা প্রণালীর অধীনে সংযত ও উন্নত হইতে পারিত, তবে যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী হইতে পারিতেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু তিনি কোন কাজ একাদিক্রমে অধিক দিন ধরিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তাঁহার লিখিত তৈল-চিত্র (অয়েল পেন্টিং) দুই একখানি বোধহয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত পরলোকগত বিজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একখানি ছিল। রাসবিহারী বাবু শেষ জীবনে ছায়াচিত্রবিদ্যা (ফটোগ্রাফ) শিক্ষা করিয়া বাড়ীর ও প্রতিবাসী নরনারীর প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া যথেষ্ট আমোদ সম্ভোগ করিতেন।

তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাব ও যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহার উল্লেখ করিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এজন্য কেবলমাত্র তাঁহার নাম আজ কুশদহবাসীর মনে জাগরূক করিতে চেষ্টা করা হইল। আমরা উপসংহারে আর একটি কথা বলিয়া আজকার বক্তব্য শেষ করিব।

খাঁটুরা বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে না পারায় ও অন্যান্য কারণে স্কুলের অবস্থা যখন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়ে, তখন তিনি নামমাত্র সম্পাদক থাকিয়া, স্কুলের সকল ভার রাসবিহারী বাবুর হস্তে প্রদান করেন। তদবধি তিনি স্কুলের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া দেশের উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণেও ক্ষেত্রবাবু সম্পাদক আছেন বটে

কিন্তু রাসবিহারী বাবুর পদানুসরণ করিয়া তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীযুক্তবাবু প্রমথনাথ দত্ত সে কার্য্য চালাইতেছেন। এক্ষণে আমরা বলি রাসবিহারী বাবুর যাঁহারা আত্মীয় আছেন, সকলে মিলিয়া, (যেহেতু তাঁহার পুত্রাদি নাই) খাটুরা স্কুলে একটি "রাসবিহারী বৃত্তি" (স্কলারসিপ্) দেওয়া হউক; তাহাতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা এবং সাধারণের উপকার হইবে। সকলে মিলিয়া একার্য্যে উদ্যোগী হইলে বোধহয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

রাসবিহারী বাবু প্রায় ৫৩ বৎসর বয়সে ১৩০৯ সালের ২৮শে ভাদ্র পরলোক-গমন করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র দত্ত। পিতামহ স্বর্গীয় কালীকুমার দত্ত।

স্থানীয় সংবাদ।

বিগত ১লা মার্চ্চ বারাসত-বসিরহাট (লাইট) রেলওয়ে, বসিরহাট হইতে হাস্নাবাদ পর্য্যন্ত ৯ মাইল লাইন খোলা হইয়াছে, এই লাইন টাকি হইয়া গিয়াছে।

বর্ষের বিদায়'উপহার।

হাসি মাখা মুখে এসে কাঁদিয়া বিদায় লও
কোথা হ'তে চলে এস কোথা বা চলিয়া যাও ?
এসে ছিলে যেই দিন সেদিন (ও) এমনি রবি—
হেসে ছিল পূর্ব্বাকাশে বিকাশি নবীন ছবি ;
সেদিন এমনি করে পাখী গেয়েছিল গান,
নব সহকার পরে তুলিয়া পঞ্চমে তান।
কোয়েলা গাহিয়াছিল নব বসন্তের কথা,
প্রকৃতি ভুলিয়া ছিল নিহার-পরশ-ব্যাথা ;
কত আশা সাধ লয়ে এসেছিলে ধরা-বুকে,
নবীন উৎসাহে মাতি অসীম পুলক সুখে।
তার পর পরে পরে ষড় ঋতু গেছে চলে ;
ধরণীর রঙ্গভূমে কাল যবনিকা ফেলে।
তুমিও চলেছ আজি চির জনমের তরে,
মিশাইতে মহাকায় অনন্ত বারিধি নীরে।
এসে ছিলে কারে লয়ে কি ধন ফেলিয়া যাও
বারেক কি পানে তার নিমেষের তরে চাও ?
যে দেশে চলেছ আজি সে ভূমি কোথা না জানি,
কোন জগতের পারে কোথা সেই রাজধানী ?
কোন জলধির তীরে, কোন নন্দনের পরে
অমর সুরভি স্নাত কোন স্বপ্নময় পুরে,
নীরব মন্থর পায়ে আবার চলেছ যেথা
যাইবে কি লয়ে সেথা ধরণীর দুটো কথা ?

লবে কি অঞ্চলে ভরি বিদায়ের উপহার ?
মরমের অশ্রু রাশি ব্যাথা নিরাশার ভার ?
আজি এ বরষ-সাঁঝে মনে পড়ে সেই গান
জীবন-বরষ প্রাতে হয়েছে যে অবসান।

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।
গোবরডাঙ্গা ও এলাহাবাদ।

বর্ষশেষ।

কাল বা সময় নিত্য। কালের শেষ নাই, সুতরাং অবিভাজ্য ; কিন্তু আমাদের এই সৌর জগতের একটি প্রধানতম পদার্থ সূর্য্য ; সূর্য্যের প্রকাশমান কালকে আমরা দিন বলি। সৌর-গতি-বিভাগ, কাল বিভাগ এক কথা। নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহর অহোরাত্র, পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর প্রভৃতি কালের বিভাগ জ্ঞাপন করিতেছে! সৌর-গতি গণনার আর একটি নাম জ্যোতিষ। জীবন ও কাল পক্ষান্তরে একই বস্তু, সুতরাং জীবন-গতি-গণনায় কাল-বিভাগ-অপরিহার্য্য। এখন আমরা জীবন-গতি-গণনার একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি।

ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে আপন কারবারের দৈনিক হিসাব রাখিতে হয়। জমা খরচ, দেনা পাওনা এবং তহবিল মিল আছে কিনা তাঁহাকে নিয়মিত দেখিতে হয়। কোথাও মাসিক হিসাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সকলকেই বর্ষশেষে হিসাব নিকাশ করিতেই হইবে। সংবৎসরের কার্য্যে লাভ হইল কি লোকসান হইল তাহা না দেখিলে তাঁহার আগামী বৎসরের কাজ চলিতে পারে না। যিনি পরিপক্ক ব্যবসায়ী তাঁহার কারবারে যদি কোন কারণে ক্ষতি হয়, তিনি তাহাতে ভগ্নাশ হন না, বরং তিনি সাবধান হন, যে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ কার্য্য যাহাতে আর না হয়।

মানব জীবনে যিনি উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী, বা যিনি ধর্ম্ম সাধনে সাধক, তাঁহারও জীবনের একটা হিসাব রাখিতে হয়। তিনিও দৈনিক, মাসিক

এবং বিশেষ ভাবে বার্ষিক জীবনের হিসাব না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। সাধক দেখেন বিগত বর্ষ হইতে জ্ঞান-দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি হইল কিনা, যত কল্পনা ছিল, এখন সত্য-চিন্তা, সত্য-ধারণা হইতেছে কি না। প্রেমের হিসাবই বা কিরূপ দাঁড়াইল, বিগত বর্ষে যে আমার প্রিয় তাহাকে ভাল বাসিতাম কিন্তু এক্ষণে যে আমার নিন্দা করিয়াছে, আমার বিদ্বেষী হইয়া নানা কথা—ভণ্ড কপট, মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তাহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া প্রাণের শান্তি-ছায়া দান করিতে পারিতেছি কি না। বিশ্বাস বৈরাগ্য যোগে ভগবানকে ভাল লাগিতেছে কি না, তাঁহার উপাসনায় আরাম বৃদ্ধি হইতেছে কি না; কিম্বা যদি দেখি এ বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতেও নিরাশ না হইয়া তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বলি "জয় ব্রহ্ম জয় তোমারই কৃপার জয়," তুমি পাপীকে কখন ত্যাগ করিতে পার না।

ব্যবসায়ে আর এক প্রকার ঘটনা দেখা যায়। সমুদয় বৎসর ধরিয়া খরিদ বিক্রয় আমদানি রপ্তানি বেশ চলিয়াছে, খরিদ অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় বেশ হইয়াছে; সরঞ্জাম খরচ উচিত মত হইয়াছে, অথচ কাজে লাভ দেখা যাইতেছে না। তহবিল-মৌজুত কিছু নাই, অধিকন্তু যথা সময়ে দেনা পরিশোধ হইতেছে না। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, ক্রয় বিক্রয়ে লাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রায় সমস্তই ধারে বিক্রয় হইয়াছে; যাহা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাকে বলে বিলাত লোকসান।

ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও ঠিক এই রূপ একটি হিসাব আছে। ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করা হইয়াছে, উপাসনা প্রার্থনা বা জপ তপ পূজা আহ্নিক এ সকল নিয়মিত চলিয়াছে, বার ব্রত বিধি পালন, বা সামাজিক উপাসনা ও উৎসবাদিতে যোগ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু জীবনে ধর্ম্ম দেখা যাইতেছে না। বিশ্বাস নির্ভরের অভাব, প্রেমের অভাব, জীবনে শান্তির অভাব দেখা যাইতেছে। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, বিধি নিয়ম পালন সকলই হইয়াছে বটে কিন্তু সত্যের পূজা হয় নাই, (সকলই ধারে বিক্রয় হইয়াছে) উপাসনায় অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু কথা সরল আন্তরিক হয় নাই, ভাবে শব্দে যোগ হয় নাই। পূজা আহ্নিকের মন্ত্র উচ্চারণ ঠিক হইয়াছে কিন্তু মন্ত্রের ভাবার্থ উপলব্ধি করি নাই, মন্ত্রে যে সকল প্রার্থনা করিয়াছি তাহা আমার আকাঙ্ক্ষার

বিষয় হয় নাই। সুতরাং, অনেক করিয়াও জীবনে শান্তি নাই, (ক্রয় বিক্রয়ের লভ্যধন, তহবিলে মৌজুত নাই) এরূপ অবস্থায় হিসাব ভাল করিয়া মিলাইয়া আমরা আগামী নববর্ষের জীবন-লাভের পথে যেন অগ্রসর হইতে পারি।

সুরাপান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতীতকাল ছাড়িয়া এক্ষণে বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। এখনও পল্লীগ্রামে প্রাচীন কালের মদ্যের প্রকার বিশেষের প্রচলন দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে অদ্য আলোচনা উত্থাপন করিব না। সুসভ্য ইংরেজ, তাঁহার পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতবর্ষে যে সুরাবিষের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেই সুরাপানের অপকারিতা ও তন্নিবারণে (আমাদের) কর্ত্তব্য কি, তাহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি শরীর-তত্ত্ববিদ্ নহি সুরাপানে যে সকল দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি ঘটে এবং শরীর ও মন ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকা বশতঃ মনের উপরে সুরার কি কি কার্য্য হয়, তাহা শরীর তত্ত্বজ্ঞই বিশেষরূপে বিদিত আছেন! আমি মাত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পরে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিব।

---

* আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে সহযোগিনী সঞ্জীবনী সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, এবং কাটোয়া সহযোগী "প্রসূন" ৬ই চৈত্রের সংখ্যায় "কাটোয়ায় সুরার আধিক্য" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি এ সময়ে ইংরাজী, বাংলা সংবাদপত্র সমূহ সুরাপান সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করুণ। আমরা প্রসূনের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (কুঃ সঃ)

ঐ সম্বন্ধে সুবহুল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা পাঠ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

অনারেবল আর্চ্চ ডিকন জ্যাফেজ (১৮৪৬ সালে) বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে আমরা একটী লোককে খ্রীষ্টান করিতেছি, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজদিগের মদ্যপান প্রথা এক হাজার মাতাল করিতেছে।" এই কথা অত্যুক্তি নহে। এদেশে যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রথম বিস্তৃত হয় তখন ইংরেজী শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত যুবকগণ মদ্যপান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ৺রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত এবং ৺রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পাঠ করিলে এ বিষয়ের অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে।

সকল প্রকার মদ্যেই সুরাসার (এলকোহল বা স্পীরিট) নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। ইহা থাকাতেই মদ্য উত্তেজক, বিষাক্ত ও মাদক হয়। এই সুরাসারের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন মদ্যে ভিন্ন প্রকার। যে মদ্যে যত অধিক, সে মদ্য তত অনিষ্টকর। ১০০ ভাগ মদ্যে সচরাচর নিম্নলিখিত ভাগ অনুসারে সুরাসার বর্ত্তমান থাকে, মণ্টবিয়ার ২, শ্যাম্পেনে ১২, শেরীতে ১৮, পোর্টে ২২, জিনে ৩৮, হুইস্কিতে ৪৫, রম ও ব্রাণ্ডিতে ৫৩, এক্স নংতে ৫৫ ভাগ সুরাসার থাকে। দেশী মদে সুরাসারের পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই, তবে, বিক্রয়কালে জল মিশ্রিত না করিলে, কোন কোন স্থানে দেশীয় মদে বিদেশীয় মদের অপেক্ষা অধিক সুরাসার থাকিতে পারে :—(মদিরা এবং on Alcohol.)

সুরাপানের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের মাত্র মত প্রদান করা গেল।

"আমাদের হিন্দুর জগত সাত্ত্বিক জগত। পূর্ব্বকালে আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই সত্ত্বগুণভাবাপন্ন ছিল। সত্ত্বভাবের পরিস্ফূরণই হিন্দুজীবনের গৌরব। এই ভাবের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। অতি পূর্ব্বকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—সে সময়েও আমাদের যেটুকু গুণ ছিল, আজি

সুরাপানে শারীরিক ক্ষতি।

সুবিখ্যাত ডাক্তার স্যার বেঞ্জামিন ওয়ার্ডরিচার্ডসন, এফ, আর, এস, এম, ডি মহোদয় মানবদেহের উপর সুরাসারের কার্য্য সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

১। মুখমণ্ডল।—সুরাপায়ীর বদনমণ্ডলের রক্তবাহী শিরা সমূহ বিস্তৃতাকার ধারণ করে এবং মুখাকৃতি রক্তাক্ত হইয়া দুরন্ত সুরার কৃতিত্ব প্রকাশ করে।

২। The Tissues :—tissues জীবনী শক্তির মূল। সুরাসার এই জৈবিক, Tissueর নানাপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে।

৩। মূত্রাশয় (Kidneys) সুরাপায়ীগণের মূত্রাশয় বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

৪। মাংসপেশী :—সুরা মাংসপেশীর ক্ষমতা হ্রাস করে; অপর্য্যাপ্ত সুরাপান দ্বারা মাংসপেশী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় এবং অবশেষে মাংসপেশী শরীরের ভার বহন করিতে পর্য্যন্ত অক্ষম হয়। আমি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি যে, সুরাপান দ্বারা মাংসপেশী সবল ও কর্ম্মক্ষম হয় বলিয়া যে একটী মত আছে তাহা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

৫। রক্ত ;—সুরাসার রক্তের কোন উপকার সাধন করে না, অতি অল্প পরিমাণে অর্থাৎ ৫০০ শত অংশে এক অংশ সুরাসার বর্ত্তমান থাকিলে রক্তের অনিষ্ট হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক থাকিলে অত্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা, অত্যধিক সুরা বিপদ ঘটাইতে পারে।

কালি তাহারও একেবারে অভাব দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজ মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা যথেচ্ছাচারিতা আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে প্রাণ পণে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এখন কাহারও হৃদয়ে সেরূপ বল আর নাই। * * মন্দ কার্য্যের স্রোত যদি সমাজ মধ্যে অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে তবে সমাজ কতদিন টিকিবে? সুরাপান আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মাইবার একটী প্রধান কারণ। সে জন্য সুরাপান সম্বন্ধেই বলিতেছি। সংযম ও নিয়ম রক্ষা আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য। মস্তিষ্ককে শীতল রাখিয়া

৬। জলবৎত্বক বা ঝিল্লি (The membranes)—ঝিল্লি সুস্থাবস্থায় থাকিলে শরীর পুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সুরাসার ঝিল্লিকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে আর কাহাকেও বোধহয় তেমনিটি করে না।

৭। হৃদপিণ্ড ;—দুই আউন্স সুরাসারে হৃদয়ের স্পন্দন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬০০০ বার বৃদ্ধি করে।

৮। চক্ষু :—সুরাসার চক্ষুর স্নায়ু ও উপাদানের শক্তি নষ্ট করে।

৯। সুরাপায়ীগণ শীতকালে অধিকতর ঠাণ্ডা বোধ করে ; সুরাপান ঠাণ্ডার সহিত অকাট্য বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুরাপায়ীগণ ঠাণ্ডা দূর করবার জন্য আবার সুরার আশ্রয় গ্রহণ করে। (যখন রুসিয়ার কোন সৈন্যদল শীতকালে যুদ্ধ যাত্রা করে, সেই সময় যে সকল সৈন্য মদ্য পান করে, তাহারা শীত সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে যাত্রা করিতে দেওয়া হয় না!—Pathfinder).

১০। সুরার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা খাদ্যের কার্য্য করিতে পারে। কোন কোন সুরার যথা—বিয়রের মধ্যে যে মদিরা আছে তাহাতে চর্ব্বি বৃদ্ধি করিয়া শরীরকে অপটু করে। পরে এই চর্ব্বি হৃদপিণ্ড ও মূত্রাশয়ে গমন করিলে নানা প্রকার কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়। মোটের উপর সুরাতে সুখ দেয় না, বরং শরীরকে দুর্ব্বল করে, জীবনী শক্তিকে নষ্ট করিতে সুরাসারের ন্যায় মজবুত

সংযতভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ। কিন্তু সুরাপান করিলে কি সংযত থাকিয়া নিয়ম রক্ষাকরা সম্ভবপর ? ইহার দ্বারা ত যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বলিতে বড় দুঃখ হইতেছে যে এই বিষম অনিষ্টকারী সুরাকে সকলেই আদরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। * * কাটোয়ার ভিতরে যে ভীষণ ব্যাপার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা সকলকেই ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ মদ্য এখানে বিক্রীত হইত এখন তাহা অপেক্ষা ১০ গুণ বেশী বিক্রীত হইতেছে।

(—প্রসূন)।

আর কেহ নাই। কোন চিকিৎসক, কোন ধর্ম্ম যাজক, কোন কবি এবং কোন চিত্রকর ইহাকে অধিকতর কালরঙ্গে চিত্রিত করিতে পারে না। ভবিষ্যৎ যুগে লোকগণ আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, সুরাপানের বিরুদ্ধে এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

চাকুরি ও কৃষি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মাটি।

কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমেই মাটির পরীক্ষা করা উচিত এদেশে সাধারণতঃ মাটি তিন প্রকার যথা—এটেল, বেলে ও দোয়াঁস। আরও কয়েক প্রকারের মাটি এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—বোদ মাটি, পলি মাটি, কাঁকুরে মাটি; ইহার মধ্যে চাষের পক্ষে দোয়াঁস মাটি, বোদ মাটি ও পলি মাটি উৎকৃষ্ট। এই তিন প্রকার মাটিতে চাষ আবাদ করিলে কখনই বিফল মনোরথ হইতে হয় না। ক্ষেত্র ও বীজ উৎকৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই ভাল ফসল হইয়া থাকে। সেই জন্য কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভাল মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করা নিতান্ত দরকার। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলে যেমন মানুষ সুস্থ থাকে না তেমনি অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে উদ্ভিদের স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকে না। যে স্থানের মাটি অনুপযুক্ত সে স্থানে কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কৃষি কার্য্যে সকল সময় সকল সুবিধা ঘটিয়া উঠে না কিন্তু অধ্যবসায় থাকিলে অসুবিধার মধ্যেও সুবিধা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেমন, যেখানে মাটি কেবল বালি, সেখানে বালির সঙ্গে এঁটেল মাটি মিশাইয়া, যেখানের মাটি এঁটেল, সেখানে বালি মাটি মিশাইয়া দোয়াঁস করিয়া লইতে পারা যায়। মাটীতে ক্রমাগত ফসল করিতে হইলে বিনা সারে মাটির উর্ব্বরতা থাকেনা শরীর পোষণের জন্য যেমন পুষ্টি কর আহার দরকার মাটির উর্ব্বরতার জন্য ভাল সারের দরকার। কোন্ কোন্ জমীতে কি প্রকার সারের আবশ্যক

তাহাও জানা দরকার নতুবা অনেক সময় উল্টা হইয়া পড়ে। সুতরাং মাটির উপরই কৃষিকার্য্যের লাভালাভ নির্ভর করিতেছে। উৎকৃষ্ট মাটি উপযুক্ত সার ঠিক সময়ে কার্য্য করিলে কৃষি কার্য্যে কখনই লোকসান হইবেনা। অনেক সময় নির্ব্বাচনের দোষে অথবা অসময়ে আবাদের জন্য লোকসান হইতে পারে; সেই জন্য কৃষি কার্য্যে বিশেষ সাবধান ও হুসিয়ার হইতে হইবে। কয়েক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে ভাল মাটির অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।

১। যে মাটিতে রৌদ্র আলো ও বাতাস পাইবে সে মাটি ভাল হইবে।

২। মাটির ওজন কম হইলে অর্থাৎ মাটি হাল্‌কা হইলে সেই মাটি উৎকৃষ্ট।

৩। মাটি খুঁচিয়া আল্‌গা করিয়া যত বেশী দিন যে মাটিতে ফাঁপ থাকিবে সেই মাটি তত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মাটির গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোক রৌদ্র ও বাতাস পাইলেই মাটি কৃষি কার্য্যের উপযোগী হইবে। মাটির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে যাহা এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকায় স্থান হইবে না। সেইজন্য অল্প কথায় এ দেশবাসীকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিব।

শ্রীরসিকলাল রায়। (বাগ্‌নান্)

ধর্ম্ম ও অর্থের মিলন। *

সৃষ্টিকাল হইতেই জগতে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ প্রায় সকলেই গরীব লোক ছিলেন; কেবল বুদ্ধদেব রাজকুমার ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্বভাবতঃ এইরূপ মনে হয় যে, ধন, ঐশ্বর্য্য থাকিলে কেহ কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধনের সঙ্গে যেন ধর্ম্মের চিরবিরোধ। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "ছুঁচের ভিতর দিয়া উট পার হইতে পারে, কিন্তু ধনীলোক কখনো ধার্ম্মিক হইতে পারে না।" আমাদের পরমহংস মহাশয় সাধনা করিতেন "টাকা মাটি মাটি টাকা ইত্যাদি।"

---

* বহুদর্শী, প্রাচীন, সাধক শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্গত সভাতে পঠিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সারাংশ বিশেষ।

আবার দেখুন, কেবল এই ভারতবর্ষে অন্যূন ৫০ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন; তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম সাধন করেন, নিজের দেহ রক্ষার্থে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করা পাপ মনে করেন; ভারতবাসীগণ তাঁহাদিগের ব্যয় ভার বহন করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের ব্যয়ও বড় কম নহে; ইঁহারা আটা, ময়দা, ঘৃত দুগ্ধ ও ছোলার ডাল প্রভৃতি যথেষ্ট সেবা করিয়া থাকেন; এক একটি সাধুর জন্য যদি ন্যূন পক্ষে মাসিক ৪৲ টাকাও ব্যয় হয়, তবে এই ৫০ লক্ষ সাধুর জন্য মাসিক ২ কোটী টাকা এবং বার্ষিক ২৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ভারতবর্ষেই হিন্দু বৈষ্ণব মুসলমান ফকির ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী লোকও কম নহেন। তাহার সংখ্যাও ৫০ লক্ষের অধিক ভিন্ন কম হইবে না। তদ্ভিন্ন জগতের বিভিন্ন দেশেও এই শ্রেণীর মত লোক রহিয়াছেন। এই সমস্ত লোক যদি নিশ্চয় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ব্যয়ভার বহন করিতেন এবং অপরের সেবা করিতেন তবে জগতের কত কল্যাণ সাধিত হইত। জগতে সাধুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে সমস্ত মানবই সাধু হয় জগদীশ্বরের ইহাই ইচ্ছা কি? মনে করুন এই ভারতবর্ষে ৩০ কোটী লোক বাস করেন, তন্মধ্যে ৫০ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী রহিয়াছেন, তাই অবশিষ্ট ২৯ কোটী ৫০ লক্ষ তাহাদিগের ব্যয় ভার বহন করিতে পারে। যদি সাধুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ২০ কোটী হয় তবে অবশিষ্ট দশ কোটী লোকে তাহাদিগের ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন কি না? আর সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যদি ৩০ কোটী লোকই সাধু হয়েন তবে তাঁহাদিগের ব্যয় ভার বহন করিবে কে?

অন্যদিকে দেখুন, এই জগতে কত তীর্থস্থান, কত দেব-মন্দির, কত গির্জ্জাঘর, কত মস্‌জেদ, কত দেবালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে; আবার কত সাধু অনুষ্ঠান, লোকহিতকর কার্য্যে অর্থাৎ কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎসালয়, কত সেবালয়, কত আতুরাশ্রম, কত কুষ্ঠাশ্রম কত অনাথাশ্রম, কত জলাশয় রাজবর্ত্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত টাকা ব্যয় সাপেক্ষ; এই সমস্ত ব্যয়ভার জগৎবাসী ধনিগণই অধিকাংশ বহন করিয়াছেন, অথচ সাধুগণ এই ধনিগণকে অধার্ম্মিক বলিয়াছেন: তাঁহাদিগের মতে এই ধনিগণই যেন ষোল আনা অধার্ম্মিক এবং যাঁহারা পরমুখাপেক্ষী সাধু, তাঁহারাই যেন ষোল

আনা ধার্ম্মিক। আমার মতে কেহ ষোল আনা অধার্ম্মিক নহেন, আর কেহই ষোল আনা সাধু নহেন। টাকা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রকার মতভেদ দেখিয়া, ঐই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, কেবল টাকা ছাড়িলেই ধর্ম্ম হয় না; বরং টাকা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। ঈশ্বরের কৃপা, মানবের শুভ ইচ্ছা এবং টাকা এই তিনের মিলনেই ধর্ম্মকর্ম্ম সব হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে পারে না। এখন আর সেই প্রাচীন কালের ন্যায় এক জন ধর্ম্ম করিবে, অপর লোক তাহার দেহ রক্ষা করিবে, সে দিন নাই। কেন না ধর্ম্ম সকলেরই প্রয়োজন, সকলেই স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, আত্মরক্ষা করিবে, পরিবার পরিজনদিগকে প্রতিপালন করিবে, জগৎবাসী নরনারীগণের সেবা করিবে, সমস্ত নরনারীগণের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জগতের উন্নতি সাধন করিবে। এই জন্য জগদীশ্বর এই ধনধান্য, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, নদী, পর্ব্বত ও সাগর, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া মানবের হস্তে সমস্ত কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছেন। এই যে ঈশ্বরের সন্তান প্রতাপশালী মানব, টাকা ভিন্ন তাহার দেহ রক্ষা হইতে পারে না। মানবের হস্তেই যখন জগদীশ্বর সমস্ত জগতের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন মানব জীবিত না থাকিলে, ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মপালন করিবে কে? সুতরাং মানব-দেহ রক্ষার মূল যে টাকা, সেই টাকা না হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না। আবার দেখুন যে টাকাই হইল সমস্ত ধর্ম্মের মূল, সেই টাকা উপার্জ্জন ও টাকা ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ বিধি ব্যবস্থা না থাকিলে টাকার সদ্ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন হইবে। প্রাচীন যুগে বিধি ছিল টাকা ছাড়, না হইলে তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবে না, ইহাই সকলে শিরোধার্য্য করিয়াছেন এবং যাহারা টাকা ছাড়িতে পারিতেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু এই নব যুগের নব বিধি, টাকা চাই—অর্থাৎ এ যুগে এক ব্যক্তি সাধন ভজন করিবেন, অপর সকলে তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন, তাহা নহে; প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীনভাবে টাকা উপার্জ্জনও করিবে, সাধন ভজনও করিবে। তবে টাকার সদ্ব্যবহার চাই। এই জন্য বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের কৃপা, মানবের শুভ ইচ্ছা এবং টাকা এই তিনের মিলন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পারে না। ঈশ্বরের

কৃপাই আমাদিগের মূলধন; এই যে আমাদিগের দেহ, মন, প্রাণ, ইহাই ঈশ্বরের কৃপার দান—এই দেহ মন প্রাণ লইয়াই ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানব স্বাধীন-ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনদিগকে প্রতিপালন করিবে, ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে, সাধন ভজন করিবে এবং ঈশ্বরের বিধি অনুসারে অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। অর্থাৎ নরনারীগণ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জগতের উন্নতি সাধন করিবে। যখন হিংসাবিদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া নরনারীগণ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, তখনই এই ধরাধামে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে।

কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়।

(কালা-বোবা-স্কুল)

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে হউক, বা ইহকালে পিতা মাতার শারীরিক পাপে কিম্বা নৈসর্গিক নিয়মেই হউক, অনেকের কালা-বোবা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঐ সকল সন্তানের জন্য পিতা মাতার অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ কাল জনসমাজের ধর্ম্মভাব কমিয়া যাওয়ায় প্রকৃত বাৎসল্যেরও কিছু অভাব দেখা যায়। স্বার্থের ভাব এতই প্রধান হইয়াছে যে, সন্তান পালনেও স্বার্থপরতা, তাই 'হাবা' ছেলেটার প্রতি অপেক্ষাকৃত যত্নের অভাব হইয়া পড়ে। কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহারও যে কিছু উন্নতি হইতে পারে, তাহার প্রতিও যে কর্ত্তব্যের সমান দায়িত্ব, তাহা চিন্তা না করিয়া উহা অদৃষ্টের ফল ভাবিয়া অধিকাংশ স্থলে নিশ্চেষ্ট থাকা হয়। ইয়োরোপ, আমেরিকায় কালা-বোবা, অন্ধ প্রভৃতির শিক্ষা প্রণালী যাহারা দেখিয়াছেন বা সবিশেষ শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে শিক্ষার কি অদ্ভুত ক্ষমতা।। যাহাদের জানয়ার সাদৃশ্যে জীবন কাটাইতে হইত তাহারা মানুষের মতই হইতেছে।

বিধাতা পুরুষ ভগবান, কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্রে কোন্ মহৎকার্য্য করেন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় শ্রীনাথ সিংহ নামক একটি ভদ্রলোক তাঁহার কালা-বোবা ভাই রামদাসের বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিয়া,

তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে এই সূত্রে তাঁহার মনে একটা চেষ্টার ভাব উদয় হয়। তৎপরে তিনি বম্বে হইতে কয়েক খণ্ড পুস্তক আনাইয়া, কালা-বোবার শিক্ষা প্রণালী কিছু অবগত হন। তাহাতে তিনি উৎসাহিত হইয়া এ বিষয়ে আরো চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ বাবু রাজা নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের একটি কালা-বোবা কন্যাকে ও হ্যারিসন রোডস্থ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের দুইটি পুত্রের শিক্ষা দেন। এই হইতে আরও ২।১টী ছেলেকে শিক্ষা দিতে থাকেন, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ একদা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ও খাসিয়া ব্রাহ্মমিসনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে কথা হয়। নীলমণি বাবু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে এই বৃত্তান্ত বলেন। তৎপরে সিটী কলেজের একটি ঘরে ১৮৯৩ সালের মে মাসে মূক বধির বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। উমেশ বাবু উহার উন্নতির জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণের দ্বারা একটি সভা সংগঠন করেন, এবং নানাপ্রকারে স্কুলের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে কাজে হাত দিতেন, প্রগাঢ় আন্তরিকতার ভাবে সে কাজ গ্রহণ করিতেন।

ইহার অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত যামিনী নাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মজুমদার অবৈতনিক শিক্ষক রূপে শ্রীনাথ বাবুর কাজে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিছু দিন পরে উমেশ বাবু ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য যামিনী বাবুকে ইংলণ্ডে পাঠান। তিনি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া স্কুলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। দুঃখের বিষয় যে ১৯০৫ সালের ২৪ শে জানুয়ারী স্কুলের মেরুদণ্ড-স্বরূপ শ্রীনাথবাবু, ও ১৯০৭ সালের ১৯শে জুন স্কুলের প্রাণ-স্বরূপ উমেশবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যামিনী বাবু স্কুলের পরিচালক (প্রিন্সিপাল) ও ছাত্রাবাসের (বোর্ডিংএর) অধ্যক্ষ (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্) এবং বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার প্রভৃতি ৬ জন শিক্ষক আছেন। তদ্ভিন্ন একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, ও সম্পাদক ডাক্তার প্রাণধন বসু কর্তৃক সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯০৪ সাল হইতে ২৯৩, অপারসার্কুলার রোডে নিজের বাড়িতে শিক্ষালয় ও ছাত্রাবাসের কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে ৩৯টি বালক ছাত্রাবাসে থাকিয়া

ও ১০টি বালক ও ২টি বালিকা (বালিকা সংখ্যা কম জন্য, বোর্ডিং না থাকায়) বাড়ি হইতে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। সুতরাং ছাত্র ও ছাত্রীতে মোট সংখ্যা ৫১টি। ৪ বৎসরের কম, ১৬ বৎসরের অধিক ছেলে, ৪ বৎসরের কম ১১ বৎসরের অধিক বয়সের মেয়ে লওয়া হয় না। স্কুলে ভর্ত্তি হইতে ফি ১৲ টাকা, বেতন মাসিক ৫৲ টাকা, কিন্তু প্রকৃত গরীবের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রাবাসের ব্যয় মাসিক ১০৲ টাকা দিতে হয়। প্রত্যেক "জেলা বোর্ড" হইতে কালা-বোবার জন্য মাসিক ১০৲ টাকার বৃত্তি কতকগুলি দেওয়া হয়। কেবল জেলা ২৪ পরগণায় ৫৲ টাকার হিসাবে পাওয়া যায়। চেষ্টা করিলে ঐ সকল বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপস্থিত ২৪ পরগণায় ২টি, খুলনায় ২টি, বগুড়ায় ১টি, ও পাটনায় ১টি বৃত্তি খালি আছে। বর্ত্তমানে মূক বধির বিদ্যালয়ে ১৯টি বালক জেলাবোর্ড হইতে, একটি বালক মানিকতলা মিউনিসিপালিটী হইতে বৃত্তি পাইতেছে, তদ্ভিন্ন কয়েকটি বালক ও ১টি বালিকা ব্যক্তিগত সাহায্যে শিক্ষা করিতেছে।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এসম্বন্ধে অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

এই বিস্তৃত বঙ্গে, কেবল ভদ্রঘরে কালা-বোবা ছেলে কত আছে সকলে একবার চিন্তা করুন, আর ১৬।১৭ বৎসরের স্থাপিত এই শিক্ষালয়ে মাত্র ৪৯টি বালক শিক্ষা লাভ করিতেছে। যদি বলাযায় এত ব্যয়ভার বহন করিয়া কয়জনে এখানে ছেলে পাঠাইতে পারে? এ কথা খুব সত্য! কিন্তু আমরা বলি, কত হাজার হাজার সাধারণ ছেলের জন্য কত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, আর "হাবা ছেলেটার সময় খরচের এতই অভাব হয়?" জগদীশ্বর সকল সন্তানের জন্য সমান স্নেহ দিয়াছেন, সমান কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব দিয়াছেন। আমরা দেশের সকলকেই এই অনুরোধ করিতেছি যে, হাবা ছেলে বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা না করেন, অর্থাভাবের স্থলে একটু চেষ্টা করুন দেশের দয়াবান, হৃদয়বান গণের মন যাহাতে এই দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আর যে সকল অনাবশ্যকীয় বিষয়ে ব্যয় হয় তাহা না করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হউন।

দেবালয়-সংবাদ।

বক্তৃতা সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাজী আব্দুল গোফুর সাহেব "ইস্‌লাম্‌ নীতি", ৬ই তারিখে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "ধর্ম্মে জ্ঞান ও বিশ্বাসের স্থল" ১১ই তারিখে শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলাল সেন "কৃপা ও সাধন" ১৩ই তারিখে রেভারেণ্ড মিষ্টার টানৃথিয়েল "ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ" ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, "হিন্দু ত্রিমূর্ত্তি" ২০শে তারিখে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "কলিকাতার নৈতিক অবস্থা" এবং ২৫শে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন "বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ।

প্রতিবাসীর সহিত মনোবিবাদের প্রতিশোধ লইবার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ। বিগত ৬ই চৈত্র গৈপুরে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকারের অনুপস্থিতে, রাত্রি ১০ টার পর তাঁহার বাড়ি অগ্নিদাহ হইয়া গিয়াছে। "তুমি প্রতিবাসীর প্রতি তদ্রুপ ব্যবহার করিও না, যেরূপ ব্যবহার তুমি পাইতে ইচ্ছা কর না" এই মহদ্বাক্যে কতদিনে সকল মানুষের বিশ্বাস হইবে!

বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার সাধুখাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা সত্যই দুঃখিত হইয়াছিলাম। সূর্য্য কুমার তৈলকার জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন ভদ্র, নম্র ও সুশীল ছিলেন যে ভদ্র শ্রেণীর সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য বোধ হইত না। সূর্য্যকুমারের বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক হয় নাই।

আড়বেলিয়ায় নৃসংশ ডাকাতির সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। অর্থ অলঙ্কার পত্রত লইয়া গিয়াছে আরও শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ মিত্র মহাশয় যে নির্দ্দয়রূপে আহত হইয়াছেন ইহাই বিশেষ কষ্টের কথা। বিগত ১৫ই চৈত্র রবিবার রাত্রি ১০ টার পর প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র লোকে এই কার্য্য করিয়াছে।

কুশদহের বিশেষ সাহায্য ও সাধারণ চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাম	স্থান		টাকা
শ্রীযুক্ত হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	(জুয়েলারস্)	…	৫৲
〃 হরিপ্রিয় কোঁচ	… …	…	৫৲
〃 বিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল,	…	…	৪৲
〃 খগেন্দ্রনাথ পাল	(বাগবাজার)	…	৪৲
〃 শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	(দেবালয়)	…	২৲
〃 শরৎচন্দ্র রক্ষিত	(খাঁটুরা)	…	২৲
〃 মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ,	(প্রফেসার সং কঃ)	…	২৲
〃 যোগীন্দ্রনাথ দত্ত	… …	…	২৲
〃 মহেশচন্দ্র ভৌমিক	(বৃন্দাবন মল্লিকের লেন)	…	২৲
〃 দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল	(বাদুড়বাগান লেন)	…	১৲
〃 কালীপ্রসন্ন রক্ষিত	(বরাহনগর)	…	১৲
〃 দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় বি এল,	(বসির হাট)	…	১৲
〃 শশীভূষণ বসু ডাক্তার	〃	…	১৲
〃 কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় উকিল	〃	…	১৲
〃 সম্পাদক বারলাইব্রেরী	… 〃	…	১৲
〃 পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক	… …	…	১৲
〃 রামদয়াল বিশ্বাস	(বেলগেছে)	…	১৲
〃 যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সব্ রেজেষ্টার	(বারাসাত)	…	১৲
〃 ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিল	(বনগ্রাম)	…	১৲
〃 কাজি এবাদুল্লা	… 〃	…	১৲
〃 পার্ব্বতিচরণ আশ	… …	…	১৲
〃 গোপালচন্দ্র দে	(আহিরিটোলা)	…	১৲
〃 নীরদাকান্ত সান্যাল	(কাশী)	…	১৲
〃 নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	(মতিহারী)	…	১৲
〃 জ্যোতিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারিষ্টার	(রুদ্রপুর)	…	১৲
〃 সারদাচরণ আশ	(খাঁটুরা)	…	১৲
〃 বঙ্কুবিহারী বসু	(নন্দরাম সেনের গলি)	…	১৲
〃 ললিতমোহন নাগ চৌধুরী	(আড়বেলিয়া)	…	১৲
〃 কালীদাস দত্ত	(টালা)	…	১৲
〃 নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	(সামবাজার)	…	১৲

সঙ্গীত।

ভিন্ন কেহ নহি মোরা, সবে একেরই সন্তান।
একেরই আশ্রয় ল'য়ে জুড়াব তাপিত প্রাণ।
হিন্দু বা মুসলমান, ইহুদি কিম্বা খ্রীষ্টান;
শিখ বৌদ্ধ আদি সবে পূজে এক ভগবান্।
যত ধর্ম্ম ধরাতলে, একেরই মহিমা বলে,
মুক্তি-পথে ল'য়ে চলে বিশ্বাসী জনে;
যুগে যুগে দেশে দেশে, যত সাধুগণ এসে,
সকলেই এক ভাবে জুড়ায় পাপীর প্রাণ।
তবে কেন হিংসা দ্বেষে, অকুলে বেড়াও ভেসে,
ত্বরা করি লও এসে একেরই শরণ;
হ'য়ে এক পরিবার চল ভাই ভবের পার,
আশ্রয় ক'রে তরণী সুন্দর নববিধান।

(চিরঞ্জীব শর্ম্মা।)

টাউন হলে ধর্ম্মসঙ্ঘ।

বিগত ৯ই ১০ই ১১ই এপ্রেল অর্থাৎ ২৭শে ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র, শুক্র শনি রবিবারে কলিকাতা টাউন হলে "ধর্ম্মসঙ্ঘ" নামে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মসঙ্ঘ সংগঠনের জন্য ইতিপূর্ব্বে একটী কার্য্য নির্ব্বাহ সভা গঠন হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম,এ বি,এল মহাশয়। ধর্ম্মসঙ্ঘ বা মহাধর্ম্ম সম্মিলন সভার উদ্দেশ্য সকলে একত্রে ধর্ম্মালোচনা করা। হিন্দু মুসলমান

খ্রীষ্টীয়ান ব্রাহ্ম বৌদ্ধ জৈন, পার্সি প্রভৃতি সমাজের প্রতিনিধিগণ ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মের মূল মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বিগত চিকাগো মহাধর্ম্মমেলা, (রিলিজান অব পার্লেমেণ্ট) তাহাও এই ভাবে হইয়াছিল। আজ আবার সেই ধর্ম্ম-সম্মিলন বঙ্গের মহানগরী কলিকাতা রাজধানীর বক্ষে সম্পন্ন হইল। নানা লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রাণ কি এক মহাপ্রাণতার দিকে ধাবিত হইতেছে। মানুষ যেন আর পাঁচটা ধর্ম্ম রাখিতে চাহিতেছে না। পাঁচটী ধর্ম্মকে একটী ধর্ম্মে পরিণত করা মানে এ নয় যে সকল ধর্ম্মের বিলোপ করিয়া একটী ধর্ম্ম গ্রহণ করা। সকল ধর্ম্মের মূলেই সত্য আছে, সুতরাং সরল সত্যের পথে মিলন অবশ্যম্ভাবী। এত কালের ধর্ম্মে ধর্ম্মে সঙ্ঘর্ষে এই এক মহাসত্য বাহির হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব, ইহা সার্ব্বভৌমিক সত্য। যতই ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রীতি বাড়িবে ততই মিলন বা ধর্ম্মসমন্বয় নিকটবর্ত্তী হইবে। এযুগ উদারতা ও মিলনের যুগ। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সভার কার্য্য বিবরণ।

প্রত্যহ ১২ টার সময় কার্য্য আরম্ভ হয় ও ৫ ঘটিকার সময় শেষ হয়, ২ টা হইতে ২॥ টা পর্য্যন্ত অবকাশ ছিল। দ্বারভাঙ্গাধিপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবেশ পথে মহারাজা স্বেচ্ছাসেবক দল ও বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি গণ ও কমিটির সভ্যগণের দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা প্রা[illegible] হন। সভাপতি ও কমিটির সভ্যগণ প্রভৃতি আসন গ্রহণ করিলে সঙ্গীত আরম্ভ হয়। কমিটির চেয়ারম্যান্ মহারাজাবাহাদুরকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর তাহা সমর্থন করিলেন ও মহারাজা বাহাদুর সভাপতি হইলেন। তৎপরে জাতীয় সঙ্গীত হইল। মহারাজা বাহাদুর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সভাপতির বক্তৃতার সারাংশ। (অনুবাদিত)

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি অতিশয় আনন্দের সহিত আপনাদের জানাইতেছি যে এই ধর্ম্ম সঙ্ঘ, যাহার সভাপতি আমাকে আপনারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, ইহা আমাদের-

ধর্ম্মজীবন গঠনের এক মহান্ সহায় হইবে। এই ধর্ম্মসঙ্ঘে যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন; প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভাব ও প্রত্যেক ধর্ম্মে, সার সত্য যাহা নিহিত রহিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা এই ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

এইরূপ ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন অতি প্রাচীনকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সভাতে অন্য কাহাকেও যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মের একটী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাজা অজাতশত্রুর কর্ত্তৃত্বে বৌদ্ধদের প্রথম ধর্ম্মসঙ্ঘ রাজগীরে হয়। তাহার পর বৈশালী, প্যাটনা ও পঞ্জাবে বৌদ্ধদের ধর্ম্মসঙ্ঘ হয়। কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধন, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন করেন। জৈনদের বিখ্যাত ধর্ম্মসঙ্ঘ মথুরাতে হয়। কুমারিকাভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য এই ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন প্রচলিত করেন। যদিও তাঁহাদের ধর্ম্মে জয়লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্মের তর্ক সঙ্গত বিবেচনা করিতেন। সম্রাট্ আকবরের আমলেও ধর্ম্মসঙ্ঘ হইয়াছিল, আধুনিক ধর্ম্মসঙ্ঘ চিকাগো, ভেনিস্ ও ইউরোপের ভিন্ন প্রদেশেও হইয়াছিল। এমনকি আমাদের আধুনিক ভারত-বর্ষে প্রায় অধিকাংশস্থলে ধর্ম্মসঙ্ঘ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কুম্ভমেলা সর্ব্ব প্রকারে বিখ্যাত। এই মেলা ধর্ম্মজীবন গঠনের অনেক সহায়তা করে।

মানবের মধ্যে কেবল মাত্র ধর্ম্মের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, যেদিকে যাওয়া যাক্ না, এমনকি নিকৃষ্ট অশিক্ষিত মানবও একজন উচ্চ স্রষ্টার পরিচয় স্বীকার করে।

আমরা আজ এই ধর্ম্মসঙ্ঘে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। মানব, মানবের ভ্রাতৃত্বে মিলন ও তাহার পর ঐশ্বরিক মিলনই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, আজ ইহা আমায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে। আমি বিশ্বাস করি এই আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথনের অন্তরালে একজন রহিয়াছেন, যিনি আমাদের যথাযথ পরিচালনা করিবেন, যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইনা কেন? যত প্রকার ভগবানের আরাধনা আছে, তত প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম আছে।

বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম মানবাত্মার ধর্ম্মের ক্ষুধার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কিন্তু ঈশ্বর সকল প্রাণে বিরাজ করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইতেছেন। মানবজাতি একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব। আমরা আজ এই মহাসত্য অবলোকন করিতে ও এই সত্য আনয়নের সহায়তা করিতে একত্র হইয়াছি। ইত্যাদি—

মহারাজা বাহাদুর বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া নিম্ন লিখিত ধর্ম্ম সমূহের প্রবন্ধ পাঠের জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথম দিবস ঃ—

১। য়ীহুদীধর্ম্ম ২। জোরোয়েষ্টোরধর্ম্ম ৩। বৌদ্ধধর্ম্ম ৪। জৈনধর্ম্ম ৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম।

দ্বিতীয় দিবস। ১। খ্রীষ্টধর্ম্ম ২। ইস্‌লামধর্ম্ম ৩। শিখধর্ম্ম। ৪। থিওসফি। ৫। দেবধর্ম্ম ৬। অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত ৭। মানবধর্ম্ম।

তৃতীয় দিবস। ১। বীরশৈব ২। শৈব সিদ্ধান্ত ৩। বল্লভাচার্য্য ৪। বিশুদ্ধাদ্বৈত ৫। রামানুজ বৈষ্ণব ৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭। আর্য্য সমাজ ৮। সৌর উপাসনা ৯। শাক্তধর্ম্ম ১০। সনাতনধর্ম্ম।

তাহার পর হিন্দিভাষায় জাতীয় সঙ্গীত হইয়া এই সভার অবসান হয়।

হজরত মহম্মদ।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগ। এ যুগে ধর্ম্মে ধর্ম্মে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে, সাধুতে সাধুতে বিরোধ অথবা মতভেদ থাকিবে না; তাহার লক্ষণ চারিদিকে দৃষ্ট হইতেছে। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীকে এই মহা সমন্বয়ের সুসমাচার প্রদান করেন। সমস্ত ধর্ম্মের সম্মিলনে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলনে এক মহাশাস্ত্র, সমস্ত সাধু মহাজনগণের সম্মিলনে এক অখণ্ড ধর্ম্মজীবন কিরূপে হইতে পারে তাহা স্বীয় জীবনের দ্বারা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিধাতার নিকট হইতে এই কার্য্যের বিশেষ ভারং প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, এই কার্য্য সাধনের জন্য প্রাণপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক প্রভা কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না, কারণ তিনি যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের নহে, তাহা

ঈশ্বরের। মহর্ষি ঈশা দেহত্যাগ করিবার পুর্ব্বে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "বৎসগণ আমার এখনও অনেক বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু তাহা বলা হইল না, এবং বলিলেও তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কিন্তু নিরাশ হইও না, আমি চলিয়া গেলে স্বয়ং পবিত্রাত্মা তোমাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিবেন। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও কি সেই কথা প্রযুজ্য নহে? তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ভগবান ত নিরস্ত হইতে পারেন না। তাঁহার যে বিধান তিনি সমগ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়কে এক সম্প্রদায়ে, সমস্ত ধর্ম্মকে এক ধর্ম্মে, সকল শাস্ত্রকে এক শাস্ত্রে এবং সকল জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, তাহা তিনি পূর্ণ করিবেনই করিবেন। তাই চিকাগোতে মহাধর্ম্মমেলা, কলিকাতা টাউনহলে ধর্ম্মসভ্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমন্বয়ের মহালক্ষণ সকল, সকল জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া বিধাতার জীবন্ত লীলার পরিচয় পাইতেছি। কেবল তাহাই নহে ব্যক্তিগত জীবনেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান, পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিতেছেন। তাই এই শুভ সময়ে ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান হজরত মহম্মদের পবিত্র চরিত্র সমালোচনা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব মনস্থ করিয়াছি। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের জীবন শাক্যসিংহ, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের সহিত তুলনায় কোন অংশে হীন না হইলেও,—মুসলমান সম্প্রদায়ের কোরাণ হদিস্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ হইলেও,—দেওয়ান হাফেজ, মহর্ষি মনসুর প্রভৃতি এ সম্প্রদায়ভুক্ত পরম প্রেমিক ও বৈরাগী সাধকগণ সাধনরাজ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেও, ভারতবাসী, মুসলমানধর্ম্ম ও মুসলমান জাতির প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ মুসলমানধর্ম্মপ্রচারকগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সকল দেশ ও সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হয় নাই। বিশেষভাবে ভারতে তাহা অত্যন্ত কুফল উৎপাদন করিয়াছে। হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করা, তাঁহাদিগের পবিত্র দেবমন্দির ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ, বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মুসলমানধর্ম্মে

দীক্ষিত করণ প্রভৃতি গর্হিতাচরণ দ্বারা তাঁহারা হিন্দু ভ্রাতাদিগের অন্তরে যে ঘৃণার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল মুসলমান জাতির প্রতি বিদ্বেষেই পর্য্যবসিত হয় নাই, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের-প্রতি পর্য্যন্ত আন্তরিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের তত দোষ নাই, কারণ তাঁহারা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারই উত্তেজনায় এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম কাটাকাটির ধর্ম্ম, অন্যকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনয়ন করিতে পারিলেই স্বর্গ লাভ হইবে, মহাপুরুষ মহম্মদ কেবল ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, অনেকের হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা হজরত মহম্মদের জীবনী ও মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা মনেই করেন না। হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা সর্ব্বাগ্রে অপনীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মহম্মদ একেশ্বরবাদী হইলেও অন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি কিরূপ উদারভাব পোষণ করিতেন, তাহা খ্রীষ্টীয়ানমণ্ডলীর সহিত তিনি যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সন্ধিপত্র পাঠ করিলে সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়, সেই সন্ধিপত্র খানি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ মহম্মদের সহিত খৃষ্টীয়ান মণ্ডলী এবং তৎসম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসী এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের সন্ধিপত্র (৬২৫ খৃষ্টাব্দ)। মহম্মদ, যিনি সমস্ত মানবজাতিকে শান্তির সুসমাচার দান করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই সন্ধিপত্রের বাক্যগুলি বলিতেছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার সহিত মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণের, বিধাতার অভিপ্রেত যে সম্বন্ধ তাহা যেন অঙ্গীকার পত্রের ন্যায় লিপিবদ্ধ থাকে। যে কেহ এই অঙ্গীকার-পত্র মান্য করিয়া চলিবে, তাহাকেই প্রকৃত মুসলমান এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে, আর যে কেহ ইহা হইতে বিচ্যুত হইবে, তিনি রাজাই হউন অথবা প্রজাই হউন, সামান্য ব্যক্তি হউন অথবা মহৎ ব্যক্তিই হউন, তাঁহাকে শত্রু বলিয়া পরিগণিত করা হইবে।

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আমার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যসামন্ত দ্বারা পৃথিবীতে তাঁহাদের যত স্থান আছে, সকল স্থান রক্ষা করিব। আমি স্থলে কিম্বা সাগরে, পূর্ব্বে অথবা পশ্চিমে, পর্ব্বতোপরি কিম্বা

সমতলভূমিতে, মরুভূমিতে কিম্বা নগরে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের মন্দির, গির্জা, উপাসনাস্থান, মঠ এবং তীর্থস্থান সমূহ নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিব। সেই সকল স্থানে আমি তাঁহাদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইব, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কোনপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত না হয় এবং আমার শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে সকল প্রকার অনিষ্টপাত হইতে রক্ষা করিবে। তাঁহাদিগের নিকট আমি ইহাই অঙ্গীকার করিতেছি।

যে সকল বিষয়ে আমি মুসলমানগণকে অব্যাহতি দান করিব, সেই সকল বিষয়ে আমি তাঁহাদিগকেও অব্যাহতি দান করিব। আমি ইহাও আদেশ করিতেছি যে তাঁহাদিগের কোন ধর্ম্মাচার্য্যকে তাঁহার অধিকৃত স্থান হইতে বিচ্যুত করা হইবে না, কোন সন্ন্যাসীকে মঠ হইতে এবং কোন তপস্বীকে তাঁহার তপস্যাকুটীর হইতে বলপুর্ব্বক তাড়িত করা হইবে না। আমার ইহা অভিপ্রায় যে, কোন মুসলমান তাঁহাদিগের কোন পবিত্র গৃহকে যেন ধ্বংস না করে, কিম্বা মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ অথবা বাস করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে যেন গ্রহণ না করে। যে কেহ এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে সে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে এবং তাহার প্রেরিত পুরুষের অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবে। সন্ন্যাসী, ধর্ম্মাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ লোক সকল স্বেচ্ছায় যাহা প্রদান করিবেন, তদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন-প্রকার কর গ্রহণ করা হইবে না। খৃষ্টীয়ান বণিকগণ, তাঁহারা ধনবানই হউন অথবা ক্ষমতাশালী হউন সমুদ্রপথে বাণিজ্য, সমুদ্র হইতে মুক্তা উত্তোলন অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা রত্নাদির খনির কার্য্য করিবার জন্য বাৎসরিক দ্বাদশ ড্রাক্‌মার অধিক করদান করিবেন না। ইহাও কেবল যে সকল খৃষ্টীয়ান আরবদেশবাসী তাঁহাদের জন্য, কিন্তু ভ্রমণকারী এবং বৈদেশিকদিগকে কোনপ্রকার করই দিতে হইবে না। সেইরূপ যাঁহাদের ভূসম্পত্তি, ফলের বাগান এবং শষ্যক্ষেত্র আছে, তাঁহারা যথাসাধ্য দান করিবেন। এই সকল ব্যক্তি যাঁহাদের নিকট আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার্থে সংগ্রাম করিতে হইবে না। মুসলমানগণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্র, সৈন্যদিগের নিমিত্ত খাদ্য কিম্বা অশ্ব, ইহার কিছুই প্রার্থনা করিবেন না। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন

তাহাই গ্রহণ করিবেন। যদি কেহ যুদ্ধের সময় অর্থ দান করেন অথবা কোন প্রকারে সাহায্য করেন, তবে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। আমি আদেশ করিতেছি, কোন মুসলমান কোন খৃষ্টীয়ানের প্রতি অত্যাচার করিবে না। যদি উভয়ের মধ্যে বিবাদের কারণ উপস্থিত হয়, তবে সততার সহিত তাহার মীমাংসা করিতে যত্ন করিবে! যদি কোন খৃষ্টীয়ান কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়াচরণ করে, তবে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং উৎপীড়িত ব্যক্তির ক্ষতি পূরণ করা মুসলমানের কর্ত্তব্য। আমার অভিপ্রায় আমার শিষ্যগণ খৃষ্টীয়ানগণকে যেন ঘৃণা না করেন, কারণ আমি ঈশ্বরের সমক্ষে তাঁহাদিগের নিকট শপথ করিয়াছি যে তাঁহাদিগকে এবং মুসলমানগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখিব। তাঁহারা উভয়েই সকল বিষয়ে সমান অংশভাগী হইবেন। বিবাহাদি ক্রিয়াপোলক্ষে তাঁহাদিগকে যেন কোন প্রকারের ক্লেশ দেওয়া না হয়।

কোন মুসলমান কোন খৃষ্টীয়ানকে, "আমাকে তোমার কন্যা দান কর" ইহা বলিবে না, এবং যে পর্য্যন্ত না সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করে সে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। যদি কোন খৃষ্টীয়ান নারী কোন মুসলমানের নিকট ক্রীতদাসীরূপে অবস্থান করে, তবে তাহাকে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে না অথবা তাহার ধর্ম্মাচার্য্যগণকে অমান্য করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে না। ইহাই ঈশ্বরের আদেশ। যে কেহ ইহা অমান্য করে, সে ঈশ্বরকে অমান্য করিবে এবং সে মিথ্যাবাদী।

উপরোক্ত বিষয় মদিনাতে হিজরীয় চতুর্থ বর্ষের, চতুর্থ মাসের শেষভাগে, সোমবার, নিম্নস্বাক্ষরকারিগণের সমক্ষে, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের কথিত বাক্যানুসারে মাউইয়া ইবন্ আবু সোফিয়ান দ্বারা লিখিত হয়। পরমেশ্বর শান্তিবিধান করুণ।

স্বাক্ষর—আবুবেকার এস সদ্দিক্। ওমর ইবন্ এল খতুব্।
ওসমান ইবন্ আব্বাস। আলি ইবন্ আবু তালেব।

এবং এতদ্ব্যতীত আরও তেত্রিশ জন।

এই সন্ধিপত্রে যাহা বর্ণিত হইল ঈশ্বর তাহার সাক্ষী হউন। স্বর্গের এবং পৃথিবীর অধিপতি পরমেশ্বর গৌরবান্বিত হউন। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

সুরাপান। (৩) *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাসারে কি কি রোগ উৎপন্ন করে।

প্রথমতঃ—কলেরা বা অন্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় সুরাপায়ীগণই প্রথমে আক্রান্ত হয়।

Dr. W. W. Hall,

লণ্ডন বাসীর মধ্যে যে বাত (Gout) রোগ দেখা যায় তাহার প্রধানতম কারণ বিয়ার নামক মদ্যপান।

Dr. Charles R. Dysqale.

সুরাসার শরীর হইতে অম্লজান হরণ করে এবং যে ব্যক্তি যত সুরাপান করে তাহার তত বেশী রোগ হয়।

Dr. AlliSon.

---

* সুরাপান সম্বন্ধে নববিধান বলেন,—"মানুষ নিজে মাদক দ্রব্য উৎপাদনপূর্ব্বক অর্থাগমের চেষ্টা করে, দেশের শাসনকর্ত্তার দল ইহা বিস্তারের প্রধান সহায় এবং উপসত্বভোগী, এইরূপে রাজা প্রজা উভয়ে উভয়কে নরকে ডুবায়। আবার কতকগুলি জনহিতৈষী ব্যক্তি সুরাপান নিবারণের জন্য উৎসাহী হন। ইহাও এক লীলা। এই মাদক বিষ সেবনের পরিণাম ফল উন্মাদ রোগ। আমেরিকায় শতকরা ২৫ হইতে ত্রিশ, ইংলণ্ড এবং ওয়েলে ১৫ জন, স্কটলণ্ডে ৭২, তন্মধ্যে স্ত্রীলোক আছে। লণ্ডনে ৫০, প্যারিসে ৫১, (স্ত্রীলোক ২২) ভিয়ানা ৪০, প্রুসিয়া ৪৫। শতকরা এই পরিমাণে উন্মাদ-গ্রস্ত। মদ্যপান করিয়া ঐ সকল দেশের শতকরা ৯০।৮০।৭০।৬০।৫০ এবং চল্লিশ জন নরনারী ফৌজদারী বিচারে সমর্পিত হয় এবং প্রায় শতকরা ৫০ জন দরিদ্র ভিখারী অনাথ নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে বেড়ায়।

(নববিধান—চৈত্র ১৩১৫)

বৃদ্ধ সুরাপায়ীগণ ক্ষিপ্ত কুক্কুর দষ্ট হইলে অপায়ীগণ অপেক্ষা অধিক দিনে আরোগ্য লাভ করে।

বিখ্যাত M. Pasteur.

সুরাসার হৃদরোগ উৎপাদন করে; যক্ষা রোগ বৃদ্ধি করে। ইহা ছোঁয়াচে রোগ ডাকিয়া আনে এবং রোগ নিবারক টিকার শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়।

Prof. G. Sims Woodhead, M. D.

লোকে মনে করে সুরাসার তাহাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের শক্তিকে বর্দ্ধিত করে। বহুদর্শিতা কিন্তু প্রমাণ করে যে, সুরাসার সকলের শক্তির হ্রাসই সাধন করে। ইহাতে যে কেবল শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে দেয় না, শরীরকে রোগগ্রস্ত করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলে, আয়ু ক্ষয় করে, মানসিক শক্তি হ্রাস করে এবং বংশপরম্পরা ক্রমে সুরার প্রতি একটা আসক্তি উৎপন্ন করে, তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা শরীরের যতই ক্ষতি করে, সুরাপায়ী ততই মনে করে, সে উন্নতির দিকেই গমন করিতেছে।

[Mac Dwel Cosgrave
M. D. E. F. R. C. P. T.

মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন রোগ ও মদ্যপান-প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়।—ডারউইন।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর সুরাপানে হৃদ-রোগ, মৃগী, উদরী, লালার দোষ, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, প্লীহার পীড়া, অম্ল, বহুমূত্র, গাত্রদাহ, ভয়ানক মূর্ত্তি-দর্শন, অনিদ্রা, যকৃতের সঙ্কোচ, শিরঃপীড়া, নেত্র রোগ, উন্মাদ, ভীষণ কম্প, জীবনী শক্তির ক্ষয় হয়।

এলকোহল একপ্রকার বিষ। রসায়ন ও শরীরতত্ত্বে ইহা বিষ বলিয়াই গণ্য।

Dr. James Miller F. R. C. E.
Surgeon in ordinary to the
Late Queen Victoria.

সকল প্রকার মদ হইতে এমন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা

রক্ত, মাংস পেশী কিম্বা দেহের মধ্যে জীবনী শক্তির আধার এরূপ কোন অংশের উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয়।

বিখ্যাত রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ব্যারন্ লীবিগ।

বিয়ার-পায়ীকে দেখিলে, সুস্থ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার রোগ হইতে মুক্ত হইবার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না।

Scientific American

সুরা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক পরিপাকের ব্যাঘাত করে।

৺ মহেন্দ্রলাল সরকার M. D,

আর কোন দ্রব্যই এত নিশ্চিত রূপে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বিনষ্ট করিতে পারে না যেমন অত্যধিক মদ্যপান —   (ক্রমশঃ)

Dr. Pavy.

কিউপায়ে ফুস্‌ফুসের পুষ্টি ও উন্নতি বিধান হয়।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে আমাদের ফুস্‌ফুস দুইটী। মোটা মোট হিসাবে জানাগিয়াছে, এই ফুস্‌ফুস দ্বয় সত্তর কোটীরও অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে গঠিত। এই বায়ুকোষগুলি অতি সূক্ষ্ম কৈশিক শিরা সকলের জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বাহিরের বাতাসের সহিত অম্লজান বাষ্প এই সকল বায়ুকোষে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং ইহা কৈশিকশিরা মধ্যস্থ দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে। রক্ত কিরূপে পরিষ্কৃত হয় তাহা এখনই দেখা যাইবে।

আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিলে পেশীর সঙ্কোচ ও প্রসারণ হয় এবং ইহা হইতে রক্তে কারবণিক এসিড উৎপন্ন হয়। কারবণিক এসিড দূষিত বাষ্প, সুতরাং ইহাতে রক্তও দূষিত হয়। রক্ত এই দূষিত বাষ্পকে চালাইয়া বায়ুকোষের চতুঃপার্শ্বস্থ কৈশিকশিরা সকলের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে। তথায় অম্লজান বাষ্পের সহিত ইহার পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে

বায়ুকোষগুলি বাহিরের বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্পে পূর্ণ হয় এবং সেই বাষ্প বায়ুকোষ ও কৈশিকশিরার প্রাচীর ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ রক্তের সহিত মিলিত হয় আর রক্তের কারবনিক এসিডও এই প্রাচীর ভেদ করিয়া প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত হয়। বায়ুকোষগুলি যত অধিক পরিমাণে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিবে ততই রক্ত পরিষ্কারের পক্ষে সুবিধা হইবে। বায়ুকোষের গহ্বর বড় ও তাহাদের সকলগুলির ব্যবহার হইলে অধিক পরিমাণ অম্লজান বাষ্প গ্রহণ তাহাদের দ্বারা সম্ভব। আর তাহা হইলে ফুস্‌ফুসের আয়তন ও বাড়িয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, কি উপায়ে ফুস্‌ফুসের এইরূপ পুষ্টি ও উন্নতি বিধান হয়।

এইমাত্র দেখা গেল যে, ফুস্‌ফুসের পুষ্টি বায়ুকোষগুলির পুষ্টির উপর নির্ভর করে। এখন এই বায়ুকোষের পুষ্টি কিরূপে হয় দেখিতে হইবে। সে পুষ্টি এক গভীর শ্বাসগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না।

গভীর শ্বাসগ্রহণ কাহাকে বলে? অধিকক্ষণ ব্যাপী নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলিকে যথাসম্ভব বায়ুদ্বারা পূর্ণ করাকে গভীর শ্বাসগ্রহণ কহে। অধিকাংশ ব্যক্তিই ফুসফুসের নিম্ন ও তলস্থ বায়ুকোষগুলিকে উপেক্ষা করিয়া উপর ও মধ্যস্থ বায়ুকোষগুলির ব্যবহার করেন। কিন্তু গভীর শ্বাস গ্রহণে ফুসফুসের মধ্যে অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে যে সকল বায়ুকোষ বহুদিন হইতে বদ্ধ ও অব্যবহার্য্য হইয়া আছে তাহাদের মধ্যে পর্য্যন্ত বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ফোলাইয়া দেয় এবং আবশ্যক মত অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযোগী করিয়া দেয়। ইহাতে সেই সকল বায়ুকোষের পার্শ্বস্থ কৈশিক শিরায় রক্ত সজোরে বিশুদ্ধ হইতে থাকে ও ফুস্‌ফুসের পুষ্টি ও উন্নতি বিধান হয়।

সুস্থ ও সবল ফুস্‌ফুসকামী ব্যক্তিকে সদাসর্ব্বদা ও নিয়মানুসারে এইরূপ গভীর শ্বাসগ্রহণ অভ্যাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই গভীর শ্বাসগ্রহণ দ্বারাই ফুস্‌ফুস উপযুক্ত পরিমাণে প্রাণসম ও রক্ত পরিষ্কারক অম্লজান বাষ্প প্রাপ্ত হয়। ফুস্‌ফুস সবল ও সুস্থ থাকিলে শরীরে রক্তও সতেজ ও বিশুদ্ধ থাকে; কারণ তাহা হইলে শরীরস্থ দূষিত রক্ত পরিষ্কারের পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। রক্ত সতেজ ও বিশুদ্ধ থাকিলে সহজে কোনরূপ ব্যধি শরীরকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। যাঁহার ফুসফুস সুস্থ ও সবল আছে, ক্ষয়কাস

রোগ (Consumption) হইতে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা তাঁহার নাই। যিনি অল্পদিন হইতে ক্ষয়কাশ পীড়ায় আক্রান্ত বুঝিয়াছেন তিনি যদি প্রকৃত পদ্ধতি ও নিয়মানুসারে গভীর শ্বাসগ্রহণ অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তিনি সহজেই উক্ত পীড়ামুক্ত হইয়া নীরোগ শরীর লইয়া কালযাপন করিবেন।

এইরূপ শ্বাসগ্রহণের যথেষ্ট অবসর আমাদের নিকট আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু—তাহা ত্যাগ করা আমাদের উচিত নহে। কতকগুলি অবসরের নাম এই স্থানে উল্লেখ করা গেল, যেমন প্রাতঃকালে ট্রেণ ধরিতে যাইবার সময়; বাগানে অলসভাবে পাদচারণা করিবার সময়; বৈকালে ভ্রমণ করিবার সময়; দ্বিচক্র যানে আরোহণ করিবার সময়; নদী তীরে পদব্রজে অথবা নদীর উপরে নৌকায় করিয়া ভ্রমণ করিবার সময়। এই শেষোক্ত দুই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কেননা ইহাতে বায়ুস্থ সুবিশুদ্ধ অম্লজান বাষ্পই ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তও খুব ভালরূপ পরিস্কৃত হয়। গভীর শ্বাস (deep breathing) অভ্যাসের জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া না রাখিলেও যে প্রত্যেক ব্যক্তি অতি সহজে ইহা অভ্যাস করিতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্যই উদাহরণ গুলির উল্লেখ করিলাম। তাহা হইলে পাঠক স্মরণ করিয়া দেখুন, বিশুদ্ধ বায়ু ও ফুস্‌ফুসের সমস্ত বায়ুকোষের পুষ্টি ও উন্নতি হইলে ফুস্‌ফুসের আর কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। যাঁহার শরীর মোটা কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ দুর্ব্বল ও অপুষ্ট, তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার শরীর মধ্যম আকারের সবল মাংসপেশী-যুক্ত ও যাঁহার সুস্থ ও পুষ্ট ফুস্‌ফুস্‌ আছে তিনিই সুখী। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই গভীর শ্বাস গ্রহণ অভ্যাস করিয়া সুস্থ সবল ফুস্‌ফুস্‌ লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি অনেক ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। গভীর শ্বাসগ্রহণ সম্বন্ধে কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইলনা। যথা সময়ে তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিভাকর আশ,

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

পরলোকগত রাধারমণ সিংহ। ইনি রাণাঘাট এবং শান্তিপুরের মধ্যস্থিত হবিবপুরনিবাসী চতুর্দ্দশগ্রামী-তাম্বুলী-পরলোকগত রামযাদব সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা তিন সহোদর, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিনোদবাবু বর্ত্তমান, মধ্যম বঙ্কুবাবু প্রায় ৬ ছয় বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাধারমণ বাবু যৌবন কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সত্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের জমিদারি ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহা অগ্রজদিগের হস্তগত থাকায়, তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশেষে মাত্র পোনর হাজার টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অগ্রজদিগকে "প্রাপ্তিপত্র" (ফারখৎ) লিখিয়া দেন। ঐ অর্থও তিনি অধিক দিন রাখিতে পারেন নাই। বিগত দশবৎসর কোন বিশেষ ঘটনায় তিনি সর্ব্বসান্ত হইয়া পড়েন এবং তৎসঙ্গে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সকল বিপদ পরীক্ষা সহ্য করিয়া ১৯০৭ সালের ২৩ সে আগষ্ট, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণকে কৃষিবিদ্যা (এগ্রীকালচার) শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠান। যদিও তিনি সায়েণ্টিফিক্ ইন্ ডাষ্ট্রীয়াল এ্যাসোসিয়েসন্ হইতে সত্যশরণের পাথেও এবং কলেজের বেতন (প্যাসেজ ও ফিস্) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় চারি বৎসর থাকার ব্যয়ভার, শূন্য হস্তে এই ভগ্ন শরীরে মাথায় লওয়া সহজ সাহসের কথা নহে। তিনি সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য চিরদিন মুক্ত হস্ত ও বিশেষ ভাবাপন্ন ছিলেন! ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বিগত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সত্যশরণকে এক্ষণে আরো ২ বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিতে হইবে। এদিকে বিগত ১৮ই ফাল্গুন বুধবার রাত্রিকালে ৫১ বৎসর বয়সে রাধারমণ বাবু কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটস্থ বাসায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন। এখন সেই অনাথবন্ধু ভিন্ন এই পরিবারের আর কে আছে?

বিগত ৯ই বৈশাখ; ২২শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় ২১০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কুমুদবিহারী রায়ের সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত মঙ্গলগঞ্জের জমিদার খাঁটুরা নিবাসী পরলোকগত লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ের চতুর্থী কন্যা কল্যাণীয়া গায়ত্রীর শুভবিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ৪৪।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান ইহঁাদের মঙ্গল করুন। নবদম্পতী বর্ত্তমান যুগধর্ম্মসাধনে একটী "সুখীপরিবার" হউন।

অনেকে আমাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি সকলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, এজন্য উপরোক্ত স্থানীয় ব্রাহ্ম বিবাহের মুদ্রিত পদ্ধতির অনুলিপী অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে তাম্বুলীজাতির বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। আজও একটী বিশেষ কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, আশাকরি কুশদহ-তাম্বুলী সমাজ বা সমগ্র তাম্বুলী-সমাজ এ বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন। কুরীতি কুপ্রথা সম্বন্ধে, বিচার পূর্ব্বক সমাজে নিয়ম করিয়া তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য। অন্ধভাবে চিরদিন এক নিয়মে চলিতে হইবে ইহা কখন যুক্তি সঙ্গত নহে। ব্যক্তিগত জীবনে বিষয় বিশেষের দ্বারা সদৃষ্টান্ত দেখান, তাহাও প্রয়োজন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রুগ্ন রুগ্নার বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এই শ্রেণীর অনেকের ধারণা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। তাই জ্যেষ্ঠ পীড়িত, দুর্ব্বল অসুস্থ্য হইলেও তাহার বিবাহ দেওয়া হয়, কিন্তু রুগ্ন বা অপর কোন কারণে জ্যেষ্ঠের বিবাহ অনুচিত বিবেচিত হইলে, জ্যেষ্ঠের অনুমতিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে। ইহা শাস্ত্রেরই বিধি। রুগ্ন বা রুগ্নার বিবাহে সমাজের যে কত অনিষ্ট হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহাদের আর একটি ধারণা এই যে পুত্রের বিবাহ না দিলে পুত্র খারাপ হইয়া যাইবে। ইহাও সত্য বলিয়া বোধহয় না, কেন না, বিবাহ না দিলে পুত্রাদি খারাপ হয় একথা স্থলবিশেষে সত্য হইলেও, বিবাহ দিলেও যে খারাপ হয় তাহা যথেষ্ট দেখা যাইতেছে। ভাল হওয়া বিবাহের উপর নির্ভর করে না কিন্তু তাহা সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ সাপেক্ষ। এ কথা কি তাঁহারা বুঝেন না?

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর নূতন বৎসরের ধার্য্যে অনেকের ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সতাই।৶০ ছয় আনার স্থলে ৷৷৴০ নয় আনা ট্যাক্স দিতে অসমর্থ, কেননা অনেক সময়।৶০ আদায়ের জন্য ঘটী বাটি লইয়া টানাটানি করিতে হয়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মুখে বলুন আর নাই বলুন, তাঁহাদের অন্তরের ভাব এই যে, ট্যাক্স ৷৷৴০ স্থলে ৸০ দিতে ক্ষতি নাই, যদি গরীবের পয়শা অপব্যয় না হয়।

ইতিপূর্ব্বে যমুনার ঘাট সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই সময় নদীর জল কম হইয়াছে, ঘাট পরিস্কারের এই সময়, যাঁহারা বুঝিতেছেন ট্যাক্স বেশী দিতেই হইবে, তাঁহারা চেষ্টা করুণ যাহাতে যমুনার ঘাঠ পরিস্কার হয়। আমরাও বারাসাতের সবডিভি-স্যানাল অফিসার মহোদয় এবং গোররডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে অন্ততঃ গোবরডাঙ্গার কয়েকটী প্রধান স্নানের ঘাটের দুর্গতি দুর হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।

আড়বেলিয়ার ডাকাতি বাদে আরো কয়েকটী ডাকাতির কথা শোনা গিয়াছে ২৪ পরগণার মধ্যে উপর্য্যোপরি কয়েকটী ডাকাতি হইয়া গেল কিন্তু এপর্য্যন্ত একটীও ধরা পড়িল না একথা পুলিষের পক্ষে ভাল কথা নহে।

সঙ্গীত।

বাউলের সুর—আড়খ্যামটা।

মানুষে ঠাকুর বিহার করে নরহরি রূপ ধরি।
দেখ দিব্যজ্ঞানে, প্রেমনয়নে, অভিমান পরিহরি।
কি ভাবে কাহার সনে, আছেন তিনি সঙ্গোপনে,
কে তাহা জানে;—কত যুগধর্ম্ম প্রকাশিলেন নররূপে অবতরি।
ন্যায় সত্য সাধুগুণে, দয়া ধর্ম্ম প্রেম পুণ্যে, দেখ সে ধনে;
সে যে হরিঅংশ হরিবংশ হরিধনে অধিকারী।

(—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।)

পূর্ব্ব ও পশ্চিম।

পশ্চিমদেশ বা খৃষ্টীয় জগৎ ধর্ম্মসম্বন্ধে বলেন,—ওয়ার্ক ইজ ওয়ারসিপ্ (Work is worship) অর্থাৎ কর্ম্মই উপাসনা;—জগতের সেবায় আপনাকে অর্পণ কর, নরনারীর সেবার জন্য, ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের জন্য দিনরাত খাট, জীবন পাত কর, ইহাই উত্তম উপাসনা। আর পূর্ব্বদেশীয় বা ভারতীয় ধর্ম্ম বলেন,—ওয়ারসিপ ইজ বেষ্ট ওয়ার্ক (Worship is best work). ঈশ্বর উপাসনাই উত্তম কর্ম্ম। এ দেশের ধর্ম্মে নরসেবার কথা যে নাই তাহা নহে; বিশেষতঃ উপনিষৎ-যুগ ছাড়িয়া বৌদ্ধ যুগে আসিলে সর্ব্বজীবে "মৈত্রী" ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে বৈষ্ণব যুগে "নামে রুচি জীবে দয়া"র কথাই প্রধান বলা যায়। কিন্তু এ দেশের সাধকগণ যতক্ষণ কর্ম্ম করেন ততক্ষণ তাঁহাকে লোকে উচ্চ সাধক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, সাধারণতঃ এই সংস্কার যে "উহার এখন কর্ম্মক্ষয় হয় নাই, এখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এখন বাসনা আছে" ইত্যাদি,—আবার কোন লোক উচ্চ সাধক বা জ্ঞানী নাই হউক, যদি দেখা

যায় তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া বসিয়াছেন একেবারে সঙ্গ বিরহিত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ লোকে তাঁহার সম্বন্ধে বলিবে, "এই, এইবার লোকটা ঠিক যায়গায় গিয়াছে," অর্থাৎ যিনি ত্যাগী, এমন কি, যিনি মৌনী তিনিও এ দেশের ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের লোক। কিন্তু পশ্চিম দেশীয়গণ যাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেখেন না, কেবল যিনি ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত তাঁহাকে তাঁহারা ঠিক ধার্ম্মিক মনে করিতে পারেন না। খৃষ্টীয়মণ্ডলীর কর্ম্মোত্তম জগতের কত সহস্র সহস্র অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি, এমন কি নরমাংসভোজী রাক্ষসসম নরনারীদিগকে পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের পথে আনিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? আর অন্যদিকে ভারতীয় সাধকগণ গভীর ধ্যান ধারণায় ভগবৎস্বরূপের যে উচ্চ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আজ সমস্ত জগৎ স্বীকার করিতেছেন।

এই যে দুইটী বিপরীত আদর্শ, ইহাও বাহিরের দৃশ্য। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধেও পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আদর্শের ভিন্নতা দেখা যায়। পূর্ব্বদেশের যদিও একটা বিশ্বাস আছে যে, ঈশ্বর জগতের পাপভার হরণজন্য নররূপে অবতীর্ণ হন, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ধারণা সাধারণের মধ্যেও এই ভাব দেখা যায় যে, ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ সর্ব্বভূতস্থিত অন্তরাত্মা; অর্থাৎ ঈশ্বর পরমাত্মাস্বরূপ। ঈশ্বর আমার বাহিরেও আছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমার ভিতরেই আছেন। আমি তাঁহাতে অভিন্ন। অভিন্নভাবে যোগ-সাধনদ্বারা আমিত্ব নাশই এ দেশের উচ্চ ধর্ম্মভাব। আর পশ্চিমদেশের ভাব, ঈশ্বর একজন সতন্ত্র ব্যক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর একজন আমি একজন। যদিও খৃষ্ট বলিলেন, "আমি এবং আমার পিতা (ঈশ্বর) এক, সে একত্ব ইচ্ছাযোগে এক। পূর্ব্বদেশ সাধারণতঃ অদ্বৈতভাব প্রধান, পশ্চিম দেশে দ্বৈতভাবই প্রধান।

বর্ত্তমান যুগ ধন্য, যে এই বিপরীত ভাবের মিলন বা সমন্বয়-সাধন আরম্ভ হইয়াছে। তাই এই নবযুগের মূলসূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-মুখে প্রকাশিত হইল "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" অর্থাৎ তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই উপাসনা। পরমাত্মার গভীর যোগধ্যানের সহিত নরসেবা, নরসেবার সহিত যোগধ্যানের মিলনে ধর্ম্মাদর্শ পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। এক দেশের ভাব অপর দেশ যখন সাধন করিয়া আত্মস্থ করিবেন তখনই প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিমকে এবং পশ্চিম পূর্ব্বকে জয় করিবেন।

হজরত মহম্মদ। (২)

মহাপুরুষ মহম্মদ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কেবল আরব দেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় একজন দৃঢ়বিশ্বাসী একেশ্বরবাদী ধর্ম্মবীরের বিশেষ অভাব অনুভূত হইয়াছিল। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য মহম্মদ বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে অভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় নাই। যত দিন না তাহা পূর্ণ হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মহম্মদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইবে এবং পূর্ণ হইলেও মহম্মদ আধ্যাত্মিক রাজ্যের সেই বিভাগের অধিপতি হইয়া চিরদিন বিরাজ করিবেন; তাঁহাকে সরাইয়া দিবার উপায় নাই, সরাইয়া দিলে বিধাতার বিধান অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। "লাএলাহি ইল্লা" এক ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। অনেকে বলিতে পারেন একথা ইহার অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণকর্ত্তৃক ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, ইহা এ দেশের অতি পুরাতন কথা। পক্ষান্তরে বাইবেল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত একেশ্বরের মহিমাগানে পূর্ণ। তবে মহম্মদ আর কি নূতন কথা বলিলেন? একথা সত্য হইলেও মহম্মদ-প্রচারিত একেশ্বরবাদের ভিতর কিছু নূতনত্ব আছে! প্রথমে ভগবানের দিক দিয়া দেখা যাউক। ইহা ধ্রুব সত্য তাঁহার রাজ্যে বিনা কারণে কোন বিষয় সংঘটিত হয় না। তাঁর প্রত্যেক কার্য্য উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সেই উদ্দেশ্যের মূলে জগতের পরিত্রাণ নিহিত আছে। যদি উপনিষৎ অথবা বাইবেলোক্ত একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দ্বারা চলিত, তাহা হইলে মহাপুরুষ মহম্মদের আগমন প্রয়োজন হইত না; কিন্তু তাহা হইল না বলিয়া প্রেরিত-পুরুষ বিধাতাকর্ত্তৃক বিশেষ ধর্ম্মবিধান লইয়া প্রেরিত হইলেন। এক্ষণে দেখা যাউক বিধাতা আরব দেশকেই কেন এই নবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ ক্ষেত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। আমরা গীতাকারের মুখে শুনিয়াছি, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহং" অর্থাৎ যখন কোন দেশে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেই দেশে ভগবান বিধান প্রেরণ করেন। যে সময় প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ

করেন, সে সময়ে আরব দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ হীন ছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আরব দেশ পৌত্তলিকতা ও দুর্নীতির দুর্গস্বরূপ হইয়াছিল। যে কাবামসজিদ্ এক্ষণে "লাএলাহিইল্লা" এই পবিত্র মন্ত্রদ্বারা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, যাহা এক্ষণে সমস্ত মুসলমান ভক্তবৃন্দের পরম পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বে অসংখ্য দেবমূর্ত্তির অধিষ্ঠানভূমি ছিল। যে কোরেশজাতি নবধর্ম্মের প্রভাবে "আল্লাহো আকবর" এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, তাহারাই পূর্ব্বে ঘোর অসহিষ্ণু এবং দুর্নীতিপরায়ণ ছিল।

আরব দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীর তৎকালীন আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক। মহর্ষি ঈশার প্রায় ছয় শত বৎসর পরে প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই ছয় শত বৎসরের মধ্যে মহর্ষি ঈশা-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ রোমানক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানগণের দ্বারা নিতান্ত বিকৃত ভাব ধারণ করে। মহর্ষি ঈশার ব্রহ্মপ্রেম, পিতৃ-আনুগত্য, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণগুলিকে আত্মস্থ করার পরিবর্ত্তে মেরী ও ঈশার প্রতিমূর্ত্তি ধূপধূনা প্রভৃতি উপায়দ্বারা বাহ্যিক পূজার আকার ধারণ করিল। বস্তুত সে সময় প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া পালন করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। কেবল শাস্ত্রোক্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠান সাধনই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এরূপ সময়ে মহম্মদের ন্যায় একজন ঘোর অপৌত্তলিক, দৃঢ়বিশ্বাসী একেশ্বরবাদীর আগমন যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা কে অস্বীকার করিবে। মুসলমান ধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে এ বিশ্বাস আমাদের নাই, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম না আসিলে খৃষ্টধর্ম্ম কখনও কুসংস্কার অথবা পৌত্তলিকতার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিত না। এ বিষয়ে বিধাতার বিধান সিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা যে এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মের বিশুদ্ধ একেশ্বর-বাদে আলোকিত, তাহার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানধর্ম্মের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতই তাহার কারণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।

একদিবস সাহেবদিগের ছোট হাজরির পরই পার্ব্বতী ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মূর্খ তোমাকে প্রথমে আশুতোষ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল?" মহাদেব সহাস্যবদনে সে নামে তাঁহার অপ্রীতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বাক্য নিঃসরণ না করিয়াই তর্জ্জনীনির্দ্দেশ দ্বারা গঙ্গাতীরস্থ ভক্তিতে নিমীলিতনেত্র জনৈক ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। ভোলানাথ তদ্দর্শনে সহাস্যবদনে ঈশানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট ইতিপূর্ব্বে একটি মকদ্দমা রুজু হইয়াছে না?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, মাদক দ্রব্যে মহাযোগীরও বুদ্ধিভ্রংশ করে। তাহা না হইলে আমার প্রশ্নের এরূপ উত্তর শুনিতে হইত না। সাধারণ লোকে যে বলে, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত', হর হে! তোমার যে তাহাই হইল। সুসময়, দুঃসময়, অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কে তাহাই নিষ্পত্তি করিয়া দিবার প্রার্থনায় তাহারা অদ্য প্রাতে একখানি দরখাস্ত ফাইল করিয়াছে। কিন্তু রক্তচন্দন কোর্টফীযুক্ত বিল্বপত্র ডেমিতে না লিখিত হওয়ায় আমি তাহা নামঞ্জুর করিব মনে করিয়াছি।"

মহাদেব বলিলেন "তাহারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই ডেমিতে লিখিত ও কোর্টফীযুক্ত দরখাস্ত পেশ করিতে আসিতেছে। মকদ্দমা নিষ্পত্তি না করিয়া তুমি ঐ জাহ্নবীতটস্থ ব্রাহ্মণের উপর তাহাদিগকে স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে হুকুম দিও। তাহারা তোমার হুকুমানুযায়ী কার্য্য করিলেই তুমি তাহাদিগের তৃপ্তি-জনক রায় দিতে পারিবে এবং আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহারও সদুত্তর পাইবে।

উক্ত বাদী প্রতিবাদী পার্ব্বতীর এজলাসে হাজীর হইলে তিনি বৃষবাহনের আদেশানুযায়ী উক্ত ব্রাহ্মণের উপর তাহাদিগকে স্ব স্ব ক্ষমতা প্রদর্শনের আজ্ঞা দিলেন।

ব্রাহ্মণ তীব্রবুদ্ধি ও মহাবিদ্বান, এই কথা শ্রবণমাত্র অজ্ঞান বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বলিল, "আমি স্পর্শমাত্র তাহার দ্বারায় মূর্খতমের কার্য্য করাইব। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে যাহার ইচ্ছা হয় অগ্রসর হও।"

সুসময় অজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দী হইলেন। ব্রাহ্মণ নিমীলিত নেত্রে শিবচরণ ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে যেমাত্র অজ্ঞান প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি শিবচরণ বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অদ্য ছয় মাস হইল, প্রত্যহ গমনাগমন করিয়া আমি যাহাকে নানা গুরুতর বিষয়ে উপদেশ দিতেছি—ইহারই মধ্যে আমার উপদেশে যে রাজার দুইবার রাজ্য রক্ষা হইয়াছে—যদি সে সত্যই রাজবংশোদ্ভব হইত, তাহা হইলে সে কি বারেকমাত্রও আমার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে চিন্তা করিত না? আমি কি আহার করি বা কোথায় থাকি, এ সম্বন্ধে কি সে কোন অনুসন্ধান করিত না? অতএব আর আমি ইহার সেবা করিব না। 'হীন সেবা ন কর্ত্তব্যা'। কিন্তু পাছে ভবিষ্যতে অন্য কোন ভদ্রলোক ইহার রাজনামে প্রতারিত হইয়া আমার মত বৃথা সময় ক্ষেপণ করেন, এই জন্য আমি এ সভাস্থ রাজার মস্তকে দারুণ পদাঘাত করিয়া এ রাজ্য হইতে প্রস্থান করিব। এ কথা গোপন থাকিবে না—কোন ভদ্রলোকও এ ইতর রাজার উপাসনা করিবে না।

অন্যান্য দিবস এইরূপ পূজা আহ্নিকের পর ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন এবং তৎপরে রাজসভায় গমন করিতেন। অদ্য অজ্ঞানতাড়িত হইয়া তিনি ভাগীরথীতীর হইতেই রাজসভায় গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মন্ত্রী আদি সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজও সহাস্য বদনে বলিলেন, "অদ্য আমার কি সৌভাগ্যের দিন যে, আপনি ইতিমধ্যেই আমার শুভকামনায় সভাস্থ হইয়াছেন! ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মহারাজের সন্নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহার মস্তকে দক্ষিণপদ দ্বারায় প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ঢাকানিবাসী নিপুণ স্বর্ণকার-নির্ম্মিত নূতন রাজমুকুট ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রাজরক্ষীদিগের শাণিত তরবারি কোষমুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া মহারাজ হস্তসঞ্চালনদ্বারা তাহাদিগকে ক্ষণেক স্থির থাকিতে আজ্ঞা দিয়া, নূতন রাজমুকুট ভগ্ন হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তাহার দিকে নয়ন সঞ্চালন করিলেন। ব্রাহ্মণকে জীবিতাবস্থাতেই যমযাতনা ভোগ করাইয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিবেন, এই অভিপ্রায়েই রাজা রক্ষকদিগকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মুকুটপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি দেখিলেন, একটি বিষধর ক্ষুদ্র সর্প তন্মধ্যে রহিয়াছে। তদ্দর্শনেই তিনি স্থির করিলেন, "ব্রাহ্মণ নররূপে

তাঁহার ইষ্টদেবতা। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ভক্তের প্রাণনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়াই অদ্য নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই নিকটস্থ হইয়া দয়ার্দ্র বিপ্র কালস্বরূপ মুকুটস্থ সর্পকে দূরীকৃত করিলেন। তাঁহার পদস্পর্শে আমার মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়েই মুকুটদূরীকরণ ছলে চরণ দ্বারা এ দাসের মস্তক স্পর্শ করিয়াছেন।" এইভাবে তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। ক্ষণপরে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে মহারাজ গদগদ স্বরে বলিলেন, "দেব! অদ্য হইতে এ নরাধম আপনার ক্রীতদাস হইল। আমার আর সিংহাসনে অধিকার রহিল না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করুন। এ রক্ষিত দাসকে যখন যাহা অনুমতি করিবেন, দাস কায়মনোবাক্যে তাহাই প্রতিপালন করিবে।"

সভাস্থ মহারাজের মস্তকে পদাঘাতেই অজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ প্রকাশ হইয়াছিল। আবার মুকুটমধ্যে বিষধর সর্প দেখাইয়া সুসময় নিজ ভুজবল প্রতিপন্ন করিলেন। প্রথম উদ্যমে পরাজয় স্বীকার করা অজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে; এইজন্য সে প্রতিদ্বন্দ্বী সুসময়ের নিকট ছয় মাসের সময় প্রার্থনা করিল। হাস্যবদনে সুসময় তাহাতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ নানাবিধ অবিহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সুসময়ের অনুকূলতায় তাঁহার তাহাতে কোন বিপদ বা অপযশ হয় নাই। যে দিবস ছয় মাস পূর্ণ হইল, সেই দিবসের অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণের অজ্ঞানাক্রান্ত মনে উদয় হইল যে, ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্রকারেরা বুদ্ধিমত্তার সহিত লোকপ্রতারণার নিমিত্তই রাশি রাশি বিধির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানোদয় হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদিগের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিয়া 'অন্নভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ' হইয়াছিলাম। যে দিবস শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করিয়াছি, সেই দিবস হইতেই আমি রাজ্যেশ্বর হইয়া সিংহাসনভোগ করিতেছি। অদ্য ছয় মাস ক্রমাগত অবিহিত কর্ম্ম করাতে উত্তরোত্তর আমার যশ ও ধন বৃদ্ধি হইতেছে। আমাকে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে হইবে। অতএব আচার্য্যগণ যে কার্য্যকে অতিপাতক বলিয়া গিয়াছেন, অদ্যই আমি সেই কার্য্য করিব। মহারাজ আমাকে ইষ্টদেবতা বোধে ভক্তি করেন ও সেই জন্য পিতৃসম্বোধন করিয়াও থাকেন। কনিষ্ঠা

মহারাণী তজ্জন্য আমাকে দেবতা বলিয়াই জানেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমার অবারিত দ্বার। অবিলম্বেই আমি উক্ত মহারাণীকে হরণ করিব ও তাহারই ফলে সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিব।

ব্রাহ্মণ দীর্ঘসূত্রী ছিলেন না। যখন মনন, তখনই কার্য্যোদ্যম। তিনি অবিলম্বেই অন্তঃপুরে মহারাজ মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রাণদাতার শ্রীচরণে মস্তক লুঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রণামান্তর মহারাণী যেমাত্র দণ্ডায়মানা হইলেন, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। রাণীর আর্ত্তনাদে রাজা গাত্রোত্থান করতঃ ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিলেন এবং ঈর্ষা ও ক্রোধে হুতাশনপ্রায় হইয়া শাণিত তরবারি হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে কতিপয় পদ দূরে গমন করিবামাত্র রাজপ্রাসাদ ভয়ঙ্কর শব্দে ভূমিসাৎ হইল। মহারাজ তদ্দর্শনে কণ্টকিতদেহে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অদূরে দেখিলেন ব্রাহ্মণ এবং মহারাণীও তদবস্থ। মহারাণী আর ধৃতা নহেন! ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যেন আকাশের মধ্যে ভগবানকে দেখিতেছেন—নয়নধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

এ সমস্ত ব্যাপার দর্শনে মহারাজের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আবার তিনি তাঁহাদিগের প্রাণনাশনিবারণে সদা তৎপর ইষ্টদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ মনের ভাবে তিনি অনুতপ্ত-হৃদয়ে ব্রাহ্মণরূপী ইষ্টদেবচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে রোরুদ্যমান হইলেন। ছয় মাসের পর অন্ত অজ্ঞানকে সুসময়ের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কোন মুখে আর পরাজিতাবস্থায় অজ্ঞান সে সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণদেহে বাস করিবে? অজ্ঞানত্যক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ উপস্থিত দুষ্কর্ম্ম ও ইতিপূর্ব্বের মহাপাতক স্মরণ করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কিসে পাপক্ষয় হইবে, এই চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এ বর্ব্বর মহারাজের নিকট সহস্রবার দোষ স্বীকার করিলেও সে তাহা বিশ্বাস করিবে না। অতএব তাহার শুভকামনায় সতত সচেষ্টিত থাকিয়া যদ্যপি এ পাপ-জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার গত ছয় মাসের মহাপাতকের সহস্রাংশের শতাংশেরও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সেই জন্য তিনি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আর কখন আমাকে অবিশ্বাস বা আমার আজ্ঞার বিচার করিবে?' মহারাজ করযোড়ে

অতিশয় কুণ্ঠিতভাবে উত্তর করিলেন, 'এ দেহে জীবন থাকিতে আর কখন এরূপ দুষ্কর্ম করিব না'। গম্ভীরস্বরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তবে তোমাকে আগামী কল্য হইতে সভাস্থ হইয়া রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে হইবে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

(—গল্প-পঞ্চ)

সুরাপান। (৪)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অধুনাতন চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে ঔষধার্থ সুরা ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছেন। ডাক্তার্ জন হিজিন বটম বলেন, "আমি চিকিৎসা কালে ২০ বৎসর সুরাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এবং ৩০ বৎসর সুরাসার ভিন্ন চিকিৎসা করিয়াছি; এক্ষণে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, নব ও সাপ্য রোগে সুরা ভিন্ন চিকিৎসা করিলেই অধিক উপকার হয়।" ডাক্তার বোমণ্ট বলেন, "আমি সুরা ভিন্ন সহস্র সহস্র রোগ চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। সুরা পুষ্টিকর কিম্বা তেজস্কর নহে।"

পরলোকগত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছেন, "চিকিৎসা কার্য্যে ৩০ বৎসর অভিজ্ঞতার পর আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, সুরাপান করিলে লোকে ভালরূপে কার্য্য করিতে পারে না, এবং অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহা দিন দিন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সুরা ভিন্ন চিকিৎসা করিলেই অধিক সুফল পাওয়া যায়।"

প্রসিদ্ধ ডাক্তার্ Sir Victor Horsle (সার্ ভিক্টর হর্সেল) F. R. S. F. R. C. S. বলেন, "বর্ত্তমানে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কার্য্যে সুরাসারের

---

* এই গল্পটী স্থানাভাবে একেবারে শেষ করিতে না পারাতে আমরা দুঃখিত হইলাম। আগামী বারে পাঠকপাঠিকাগণ দয়া করিয়া সম্ভবতঃ প্রথম অংশ আর একবার পাঠ করিয়া লইবেন।—(স্বঃ সঃ)

ব্যবহার ক্রমেই হ্রাস করিয়া দিতেছেন, কেননা অনেক দিনের পরে তাঁহারা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতেছেন; দেখিতে পাইতেছি যে, খাদ্য রূপে বা ঔষধ রূপে ইহা কোন কর্ম্মেরই নয়।”

প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রকার পদার্থ দেহের অনিষ্ট সাধন করিলে চিকিৎসকগণ তাহার ব্যবহার বন্ধ করিতে প্রয়াসী হন; মানসিক বা আধ্যাত্মিক অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিলে ধর্ম্মযাজকগণ উক্ত জিনিষ ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হইলে ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা তাহার ব্যবহার বন্ধ করিতে চেষ্টিত হন; কিন্তু যেখানে এই তিন শ্রেণীর শক্তি বর্ত্তমান, তথায় সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে যে সেই পদার্থটি দৈহিক, মানসিক বা সামাজিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করতঃ পাপের আকর বলিয়া ঘৃণিত হইবার যোগ্য পদ-বাচ্য। প্রাচীনকালে সুরার বিরুদ্ধে ত্রিবিধ প্রকারের শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সুরাপান সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে কিছু কিছু বলা হইল। নীতিবিদ্ ও ধার্ম্মিকগণ সুরা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদেরও দুই এক জনের মতের উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন কোন আইনকর্ত্তার অভিমতও ব্যক্ত হইয়াছে; সুরা রাক্ষসীকে ধ্বংস করিবার জন্য অনেক সুসভ্য দেশে ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গভীর শ্বাস।

গভীর শ্বাসগ্রহণদ্বারা কি উপায়ে ফুস্ফুসের পুষ্টি ও উন্নতি সাধিত হয় গতবারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, গভীর শ্বাসসম্বন্ধে গুটীকতক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। গভীর শ্বাস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—স্বেচ্ছাকৃত (Voluntary) ও বলকৃত (Compulsory)। যে গভীর শ্বাস শারীরিক উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয় না, যখন তখন ইচ্ছা করিলেই গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহাকে স্বেচ্ছাকৃত আর যাহা শারীরিক উত্তেজনা দ্বারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎপন্ন হয় তাহাকে বলকৃত গভীর শ্বাস কহা যায়। সরল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রথমোক্ত গভীর শ্বাস গ্রহণে শারীরিক

পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না এবং শেষোক্ত গভীর শ্বাস গ্রহণে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

এইস্থলে একটী বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। উপরি উক্ত উভয়বিধ গভীর শ্বাস ও সাধারণ শ্বাস গ্রহণ করিবার সময় এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যেন বায়ু নাশাপথ দিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে আবার ঐ পথ দিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে নির্গত হইয়া যায়। মুখ দিয়া যেন উক্ত উভয় অথবা কোন একটী কার্য্য সম্পন্ন না হয়। কারণ তাহা হইলে মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসত্যাগ একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। ক্রমে এই অভ্যাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গমনাগমন করিতে থাকে। কিন্তু এরূপ হইলে ফুস্‌ফুস্ খারাপ হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে শরীরের রক্তও দূষিত হইয়া উহা শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করিবার পক্ষে সহজ করিয়া তুলে। বাহিরের বায়ু নাসাপথ দিয়া ফুস্‌ফুসে গমন করিবার সময় উহার মধ্যস্থ অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা সকল নাসাপথের কোমল পর্দ্দায় (mucus) আবদ্ধ হইয়া যায় এবং সুবিশুদ্ধ বায়ুই ফুস্‌ফুসে যাইয়া উপনীত হয়। এতদ্ভিন্ন বাহিরের বায়ু গরম থাকিলে উক্তপথ দিয়া যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত শীতলতা এবং শীতল থাকিলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ফুস্‌ফুসের উপযোগী বায়ুই ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। কিন্তু মুখ দিয়া যে বায়ু ফুস্‌ফুসে গমন করে তাহা উক্ত পথ দিয়া যাইবার সময় আদৌ ধূলিকণাবিহীন কিম্বা ফুস্‌ফুসের উপযোগী শীতলতা ও উষ্ণতায় পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বায়ু সম্পূর্ণ অবিশুদ্ধ অবস্থায় ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইয়া উহার অনিষ্টসাধন করে। অর্থাৎ ফুস্‌ফুসে অকস্মাৎ শীতল কিম্বা উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে শরীর সর্দ্দি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়। এই সব কারণে বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত ব্যক্তিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে যাহার মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাসত্যাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার পরমায়ু কমিয়া যায় এবং সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য পরমেশ্বর আমাদের নাসিকার সৃজন করিয়াছেন তখন উহার দ্বারাই যে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়া তাঁহার ইচ্ছা তাহা উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে যে আমাদের অনিষ্ট সাধন হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এক্ষণে এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা না করিয়া পূর্ব্ব প্রস্তাব উত্থাপন করা যাউক।

স্বেচ্ছাকৃত গভীরশ্বাস শয়ন, উপবেশন, গমন ও ভ্রমণ সকল অবস্থাতে গ্রহণ করা যাইতে পরে। ইহা গ্রহণ করিবার সময় গাত্রে যদি কোন প্রকার কষা আবরণ থাকে তবে তাহা উন্মোচন করা কর্ত্তব্য ; কারণ তাহা না করিয়া উক্তশ্বাস গ্রহণ করিলে বক্ষ ও পঞ্জরে বাধা লাগে। সুতরাং বায়ুকোষমধ্যস্থ বায়ু উহাদিগের মধ্যে স্বাধীন ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে না পারায় ফুস্‌ফুসের উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন আনিয়া দেয়। প্রাতঃকাল ও সায়াহ্ন এই প্রকার শ্বাস প্রশ্বাস শিক্ষা করিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। অন্ততঃপক্ষে বালক-বালিকাগণ প্রতিবারে কিয়ৎক্ষণ করিয়া দিনে দুই বার এবং যুবকগণ তিন বার করিয়া এই গভীর শ্বাস অভ্যাস করিলে যথেষ্ট হয়।

এইবার গভীর শ্বাস গ্রহণের প্রকৃত প্রণালী 'এই স্থলে বর্ণনা করা গেল। ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়া বায়ু ধীরে ধীরে নাসাপথ দিয়া ফুস্‌ফুসে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সময়ে হস্তদ্বয় যেন মুষ্টিবদ্ধ না থাকে। এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন স্কন্ধদ্বয় উচ্চ না হয় ; উদর উপর দিকে আকর্ষিত না হয় এবং প্রশ্বাসত্যাগের সময় যেন উহা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া না যায়। এতদ্ভিন্ন গভীর শ্বাস গ্রহণে সফলতা লাভ diaphragom (ড্যাফ্রাগম) নামক উদর ও বক্ষ প্রভেদক পেশীর কার্য্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি এই পেশী ঠিকভাবে কার্য্য করে এবং ইহা বশীকৃত হয় তবেই গভীর শ্বাস গ্রহণে সফল হওয়া যায়। বায়ু ফুস্‌ফুস কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে এই পেশী নামিয়া যাইয়া ফুসফুসের বিস্তৃতি ও বক্ষদেশের গভীরতা সাধন করে, আর বায়ু ফুস্‌ফুস হইতে বাহির হইবার সময় এই পেশী উঠিয়া বায়ুর বহির্গমন ক্রিয়ার সহায়তা করে। স্বেচ্ছাকৃত গভীর শ্বাস একেবারে দুই নাসাপথ দিয়া গ্রহণ না করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা এক নাসারন্ধ্র টিপিয়া রাখিয়া অপর নাসাপথ দিয়া লইতে পারা যায় এবং প্রশ্বাস ত্যাগের সময় যে নাসারন্ধ্র টিপিয়া রাখা যায় সেই নাসাপথ দিয়া উহা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে সমভাবে দুই ফুস্‌ফুসের পুষ্টি সাধনের সুযোগ পাওয়া যায়। যদি কেহ বুঝেন তাঁহার দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল তবে তিনি বাম নাসিকা টিপিয়া দক্ষিণ নাষাপথ দিয়া বায়ু গ্রহণ অভ্যাস করিবেন। আবার যদি কাহারও বাম ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল বলিয়া বোধহয়, তাহা হইলে তিনি দক্ষিণ নাসিয়া টিপিয়া বাম নাশাপথ দিয়া বায়ু গ্রহণ অভ্যাস করিবেন। ইহা অনেকটা আমাদের

যোগশাস্ত্রোক্ত রেচক ও পূরকের অনুকরণ। তবে তাহাতে আসনের দরকার হয় কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার আসনের আবশ্যক হয় না। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া বায়ু খানিকক্ষণ ফুস্‌ফুসে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিক্ষা করা উচিত। একেবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিখা উচিত নহে, কারণ তাহাকে ফুস্‌ফুসের অপকার হয়। চারি সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আবদ্ধ করিয়া রাখিবার সময় বৃদ্ধি করা উচিত। ইহাকে বায়ু ধারণ ক্ষমতা কহা যায়। ইহা ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধির পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। এবার এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে বলকৃত গভীর শ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে। *

শ্রীবিভাকর আশ।

আষাঢ়ে।

প্রথম বরষা-বায়ু ফেলিয়া নিশ্বাস
নামিছে ধরার বনে, সুনীল আকাশ
নিবিড় জলদ ছিন্ন, চঞ্চলা দামিনী
গুরু গুরু গরজেনে কাঁপায় অবনী।
পরাণে আনিছে বহি বরষা-সমির
অতি দূর অতীতের আলেখ্য রুচির,
শ্যামল কানন শ্যাম সিপ্রা নদী-তীর
নব জল-কণ-সিক্ত শীতল সমির।
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ে দীর্ঘ রাজপথে
থেমে আসে কোলাহল, নব ধারা-পাতে
শ্রীহরিত উপবনে মল্লিকা মালতী
অদূরে মন্দিরে বাজে সন্ধ্যার আরতি
গম্ভির জলদ মন্দ্রে, মহা কালেশ্বর
মহাযোগে মগ্ন যেন, দূরে সৌধ-পর

---

* গতবারে এই প্রবন্ধপাঠে কেহ কেহ বলেন,—"ইহাতে বক্ষস্থলে বেদনা হয়", বোধহয় এবার তাহা একপ্রকার খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি লেখক মহাশয় উক্ত ভ্রম দূর করিলে ভাল হয়। (কুঃ সঃ)

ঝম ঝম ধারা জল পড়িছে ঝরিয়া
বাতায়নে বিদ্যুল্লতা ঝকিছে নাচিয়া,
রুদ্ধ কক্ষে বিরহিণী চমকিয়া চায়
কুঙ্কুম, কস্তুরী, মালা, নীরে ভাসি যায়।
গিরি শিরে গর্জ্জে মেঘ রজনী গভীর
নাহি বাজে রাজপথে চরণ-মঞ্জির,
নব বরষায় আজি শুনি সে কাহিনী
উজ্জয়িনী কোকিলের সুধাময় ধ্বনি।

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

স্থানীয় সংবাদ।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল। কুশদহ অঞ্চলের স্কুলসমূহে নিম্নলিখিত সংখ্যাক্রমে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস হইয়াছে।

রাণাঘাট	প্রথমবিভাগে	১টী,	দ্বিতীয়বিঃ	৫টী,	তৃতীয়বিঃ	০	মোট	৬টী
বনগ্রাম	„	০	„	২	„	২	„	৪
গোবরডাঙ্গা	„	০	„	১	„	১	„	২
বারাসাত	„	৪	„	৩	„	০	„	৭
বসিরহাট	„	৩	„	৮	„	১	„	১২
ধানকুড়িয়া	„	৩	„	১	„	০	„	৪
নিবধাই	„	১	„	৩	„	০	„	৪
গুস্তে	„	০	„	৩	„	০	„	৩

উপরোক্ত পরীক্ষার ফল দৃষ্টে বসিরহাট স্কুলের ফল অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া বোধহয়। তৎপরে মহাকুমার সহিত তুলনায় গ্রাম্য স্কুল ধানকুড়িয়া, নিবধাই ও গুস্তেও মন্দ নয়। গোবরডাঙ্গা স্কুলে মাত্র যে ২টী ছেলে পাস হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় বিভাগেরটী গয়েশপুর নিবাসী শ্রীমান্ ননীগোপাল চৌধুরী আর তৃতীয় বিভাগেরটী গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মধুসূদন। গোবরডাঙ্গা এন্‌ট্রেন্স্ স্কুলের অবস্থা যেন ক্রমে হীন হইতেছে। সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

গোবরডাঙ্গায় বারইয়ারি পূজা। গোবরডাঙ্গা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"খুব ধুমধামের সহিত গোবরডাঙ্গায় বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। দেশে কিন্তু শত সহস্র অভাব অথচ সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।" সত্যই, দেশের অভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কেহ যেন সে অভাব বুঝেন না। অথবা বুঝিয়াও নিশ্চেষ্ট। উক্ত বারইয়ারি পূজায় ৫০০৲।৬০০৲ টাকা সংগ্রহ হয়, অথচ এই টাকা প্রায় সমস্তই, আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় হয়। অবশ্য সাধারণের জন্য সময় সময় একটু আমোদ আহ্লাদের প্রয়োজন কিন্তু যে বিশুদ্ধ আমোদে লোক শিক্ষা ও অন্যান্য সুফল হয় তাহার উল্লেখ করা এ প্রস্তাবে অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে এক কথা এই বলা যায় যে, নাচগানের মধ্যে থিয়েটার, বাইনাচ হইতে যাত্রা ভাল। অতএব তাহাতে কিছু ব্যয় করিয়া বাকী দেশের সৎকাজে—যাহাতে লোকের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতিকারার্থে ব্যয় করিলে ভাল হয় না কি?

এই যে যমুনার ঘাটগুলি পরিষ্কারের জন্য পূর্ব্ব হইতে বলা হইয়াছে—তাহাতে কি সাধারণের কোন কর্ত্তব্য নাই, দেশের একজন প্রধান ব্যক্তির বা সমস্তই অন্য কিছুর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? দেশে এমন কি একজনও নাই যাঁহার মনে এর জন্য একটা বদ্ধপরিকর চেষ্টার ভাব আসিতে পারে।

তৎপরে আর একটী কথা শোনা যায় যে এই বারইয়ারিক্ষেত্রে কুপন খেলিতে দিয়া কতকগুলি অর্থ সংগৃহীত হয়। এই অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা যে কি অন্যায়, অনেকে সে জ্ঞান হারাইয়াছে, এবং ইহাতে কৃষক পর্য্যন্ত অপর সাধারণের যে কি অনিষ্ট হয় তাহাও বোধহয় বারইয়ারির অধ্যক্ষেরা ভাবেন না। এই প্রকাশ্য স্থানে কু-পন খেলার ফল অত্যন্ত সাংঘাতিক।

যাহারা জুয়া খেলা করে তাহারা সঙ্কুচিতভাবে গোপনে এই খেলা করে। কেননা তাহারা জানে যে জুয়াখেলা গভর্ণমেণ্ট আইনে নিষিদ্ধ, কিন্তু বারইয়ারি ও মেলা প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যে এই কুপনখেলা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। সে সকল স্থানে থানা কিম্বা ফাঁড়ি যে নাই এমন নহে, পুলিষ কি কিছুই খবর রাখেন না; অথবা তাঁহাদের নিকট আগেই সে খবর আসে বলিয়াই এই কার্য্য অবাধে চলে। কিন্তু গ্রাম্য পুলিষ জানেন যে তাহাতে তাঁহাদের কখন কিছুই হয় না।

কুশদহের চাঁদা প্রাপ্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত	শিবদাস কুণ্ডু	১৲	শ্রীযুক্ত	শশিভূষণ পাল	১৲
„	বিরজাপ্রসাদ রক্ষিত	১৲	„	পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
„	সুরেশচন্দ্র পাল	১৲	„	জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার	১৲
„	শিশিরকুমার ঘোষ	১৲	„	পাঁচুগোপাল ইন্দ্র	১৲
„	প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲	„	কালিবর রক্ষিত	১৲
„	শিবনাথ কর্ম্মকার	১৲	„	প্যারিনাথ নাগ	১৲
„	হরিভূষণ আশ	১৲	„	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
„	উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত	১৲	„	দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী	১৲
„	কালীমোহন বসু	১৲	„	যদুনাথ বসু	১৲
„	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲	„	মুন্সী সামসুল হক্	১৲
„	আনন্দচন্দ্র রায়	১৲	„	অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৲
„	ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲	„	হরিদাস প্রামাণিক	১৲
„	হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	„	ভূজঙ্গেশ্বর শ্রীমানি	২৲
„	রাধানাথ মিত্র	১৲	„	চুনীলাল মুখোপাধ্যায়	১৲
„	তারিণীচরণ আশ	১৲			

(ক্রমশঃ)

অসমর্থ পক্ষে দুই বারে চাঁদা গৃহীত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ না পাইলে প্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না।

অনেকস্থলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কুশদহ পাঠাইয়াছি, তজ্জন্যই যে সকলে কাগজ লইতে বাধ্য এমন নহে, তবে পরপর গ্রহণ করিলে একটা দায়িত্ব জন্মায়; এ সম্বন্ধে আমরা পৌষ, মাঘ সংখ্যায় (৫০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই "কাগজ পাঠাইবেন না" একথা লেখেন নাই। তাহাতে আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ আছি। এক্ষণে প্রথম বৎসর শেষ হইয়া আসিল, যাহাতে দ্বিতীয় বৎসরে আকার বৃদ্ধি করিয়া একটু উন্নত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য গ্রাহকগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা চাঁদার টাকা দেন নাই তাঁহারা যদি প্রসন্নচিত্তে অন্ততঃ সাধারণ চাঁদাটীও পাঠান তাহাতে সে চেষ্টায় বিশেষ সহায়তা করা হইবে।

দাসের প্রার্থনা।

আমরা কয়েক দিনের জন্য সহরের কার্য্যালয় ছাড়িয়া আমাদের কুশদহস্থ পল্লীবাসে গিয়াছিলাম। দূর হইতে যে স্থানের বিষয় মনে যেরূপভাবে কাজ করে, তাহার নিকটে গেলে সেই ভাব আরো প্রবল হয়। আমরা জানি পল্লীবাসিগণের সাধারণতঃ জ্ঞান ও নৈতিক অবস্থা কেমন, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে গ্রামের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশানুভব হয় তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

যে সকল অভিযোগ, অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যথা;—চুরী এবং পুলিসকাহিনী, মাৎলামী ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের বিক্রম ও অবিচার, ইত্যাদি ইত্যাদি, যদি সমস্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা কাগজেও স্থান সঙ্কুলন হয় না, অধিকন্তু তজ্জন্য কত লোকের বিরাগভাজন হইতে হয়। অথচ তাহার ফল কিছুই ভাল হয় না। কাগজে লিখিয়া কখন কি মানুষের দোষ সংশোধন করা যায়? কাগজে লেখার স্বার্থকতা অন্য প্রকার হইতে পারে। মানুষ যখন স্বার্থ ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া চলে তখন সে কোন হিতকর কথা শুনিতে চাহে না। বিশেষতঃ ধনী ও ক্ষমতাশালীগণের ত কথাই স্বতন্ত্র। এরূপ অবস্থায় আমরা মানবমণ্ডলীর অন্যায় অত্যাচার, পাপ ও স্বার্থমূলক কার্য্যের জন্য অনন্যোপায় হইয়া সেই পাপহারী "লোকভঙ্গ নিবারণ জন্য যিনি সেতুস্বরূপ" হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারই কৃপার ভিখারী হই। তিনি নরনারীকে সুমতি দান করুন। মানুষ যখন নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপিত হইয়া অন্তরের বিবেক দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে তখন অন্তরে বাহিরে শান্তি সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানুষের শাসক নহে। কিন্তু বিবেকই প্রত্যেকের পরিচালক গুরু। "ক্রমোন্নতিবাদ" যদি সত্য হয়, তবে ক্রমশঃ মানবের অবিবেকতা চলিয়া যাইবেই। ভগবান করুন দিন দিন মানব অন্তরে বিবেক জাগ্রত হউক।

হজরত মহম্মদ। (৩)

বিধাতার বিশেষ বিধানে ভারতেও মুসলমানজাতির শুভাগমন হইয়াছে। রাজ্যতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ ইহার মূলে কেবল ধনলোভ, লুণ্ঠন এবং রাজ্যবিস্তারের পিপাসাই দেখিতে পান। কিন্তু যাঁহারা প্রত্যেক ঘটনার মূলে বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় ও মঙ্গল হস্ত দেখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইহাকে বিধাতার বিশেষ বিধান ভিন্ন অন্য কোনরূপে গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের সে ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা এখন পাইতেছি। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রধান দেশ। ব্রহ্মতত্ত্বের যে সকল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাদপি তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, এমন আর কোন্ দেশে হইয়াছে? কিন্তু যখনই নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের আরাধনা অসম্ভব মনে করিয়া এদেশের লোক দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজায় নিরত হইয়াছে, বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহারই সাধনায় আপনাদিগকে ঢালিয়া দিয়াছে; তখনই ঈশ্বর এদেশকে পৌত্তলিকতা, ও জাতিভেদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসী ধর্ম্মবীর সন্তান মহম্মদের ভাব, তাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মের সহিত যোগে এক হওয়াকেই ধর্ম্মসাধনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

যোগধর্ম্মাদ্ধিধর্ম্মজ্ঞ ন ধর্ম্মোঽস্তি বিশেষবান্। বরিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মানাম তং সমাচর ভার্গব॥ (হরিবংশ)

হে ধর্ম্মজ্ঞ ভার্গব, যোগধর্ম্ম হইতে আর কোন ধর্ম্ম বিশেষ নহে। উহাই সর্ব্বধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব সেই যোগানুষ্ঠান কর।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি, য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ (ঋগ্বেদ)

যাঁহাতে সমুদয় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ সকল স্থিতি করে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিল, সে ঋক্‌দ্বারা কি করিবে? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন।

তন্দদর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতংগহ্বরেষ্ঠং পুরাণম। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বাধীরো হর্ষশোকোজহাতি॥ (কঠ)

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন, তিনি নিত্য; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ (গীতা)

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয়, তাহাকে যোগ বলা যায়।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ (গীতা)

এইরূপে যোগী ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মের স্পর্শসুখ সম্ভোগ করেন।

সংযতঃ সততং যুক্ত আত্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তথা চ আত্মনাত্মানম সংপ্রযুক্তঃ প্রপশ্যতি॥ (মহাভারত)

ব্রহ্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বদা সংযত থাকিয়া যোগী হয়েন. এবং তিনি সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানিং ধিয়া যোগ প্রবৃত্তয়া। ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥ (ভাগবত)

যোগযুক্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান দ্বারা অবধারণ করিয়া এই আত্মাতে পরমাত্মাকে চিন্তা করিবেক। উপাস্য-দেবতার সহিত উপাসকের মিলনই যোগসাধনের উদ্দেশ্য। ঋষিগণ বলিয়াছেন "দুইটী সুন্দর পক্ষী প্রণয়যোগে সখ্যভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তম্মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর একজন অনশন থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।" কালে ঐ যোগধর্ম্ম বিকৃত হইয়া অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনের পরিবর্ত্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে একই পদার্থ ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একমাত্র পরমাত্মাই সত্য এবং তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই

অলীক এই মায়াবাদের ধর্ম্ম এক সময়ে এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে পুরাণে ঈশ্বরের সহিত সেব্য সেবক সম্বন্ধের যে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অবতারের সহিত ভক্তের লীলারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদের শেষ সীমা অদ্বৈতবাদ, ভক্তির চরম-সীমা অবতারবাদ। এতদুভয়ের মধ্যে আর অন্য কোন পথ নাই। যদি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে চাও তোমাকে যোগী হইতে হইবে এবং "আমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে হইবে। আর যদি ভক্ত হইতে চাও অবতারের পূজা কর, তাঁর মূর্ত্তি গড়িয়া নানা উপচারে পূজা করিয়া স্বীয় ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ কর, তাঁর নামগুণানুকীর্ত্তন কর, তাঁর মর্ত্ত্যলীলা অনুধ্যান কর। উপরে যে ধর্ম্মের কথা বলা হইল তাহাই এদেশের প্রচলিত ধর্ম্ম। যদিও ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মের সহিত ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তথাপি ইহারই প্রাধান্য এদেশের সাধকগণের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এদেশের নিরাকারবাদী সাধক মাত্রেই অদ্বৈতবাদী এবং ভক্তিমার্গী সাধক মাত্রেই অবতারবাদী। কিন্তু যদি বলা হয় নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তিযোগে সাধন করিতে হইবে, তাঁর বাণী শুনিয়া চলিতে হইবে, দাসের ন্যায় তাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে, তবে, সে সাধনের পথে হিন্দুধর্ম্ম সাক্ষাৎ-ভাবে কোন সহায়তা প্রদান করিতে পারেন না। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম এই ভাব দান করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছে। 'মহর্ষিঈশা ব্রহ্মের সহিত প্রকৃত যোগ কি তাহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।' জীবের জীবত্ব সম্পূর্ণ-রূপে বজায় থাকিবে অথচ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে হইবে এভাব মহর্ষি ঈশাই কেবল পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি, "আমি এবং আমার পিতা এক," এই কথা দ্বারা "দুইটী সুন্দর পক্ষী প্রণয় যোগে একবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে এই কথার পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আর একটি নূতন ভাব এদেশকে দান করিয়াছেন। তাহা কর্ম্মযোগ। পূর্ব্বে যোগীরা নির্জ্জনে ব্রহ্মেতে চিত্ত-সমাধান করিয়া যোগ সাধন করিতেন, কিন্তু মহর্ষি ঈশা শিক্ষা দিলেন আমার পিতার ইচ্ছা পালন করাই আমার ধর্ম্ম। আমার পিতা কার্য্য করিতেছেন, আমিও কার্য্য করিতেছি। ইহার দ্বারা তিনি এদেশের যোগীদিগের নিষ্ক্রিয় ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ঈশা আমাদিগকে

নিরাকার ঈশ্বরকে ভালবাসিতে, তাঁর সহিত ইচ্ছাযোগে যুক্ত হইয়া তাঁর আদেশানুসারে জীবন পথে চলিতে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তাহাতেও হইল না। এদেশের আর এক মহা বিপদ ছিল তাহা পৌত্তলিকতা। মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণ এবিপদের হাত হইতে আপনারা রক্ষা পাইলেন না, তাই তাঁহাদের দ্বারা এদেশের সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। করুণাময় বিধাতা এদেশকে এবং সমগ্র পৃথিবীকে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সন্তান মহম্মদকে প্রেরণ করিলেন।

আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্ম, মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম এবং হজরত মহম্মদের ধর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া কি নূতন আকার লাভ করিয়াছে এক্ষণে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই ত্রিবিধ ভাবের সমন্বয় স্বীয় জীবনে সাধন করিয়া এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নবযুগের সূত্রপাত করেন তিনিই শ্রীরামানুজ স্বামী। রামানুজ স্বামী যে মত প্রচার করেন তাহা "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামে প্রসিদ্ধ। এ মত শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণের মত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।

(শেষ অংশ)

দেবোপম ব্রাহ্মণ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়াই এইরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া মহারাজ কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, "এ দাসের কি আর সিংহাসনে অধিকার আছে ?". ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আবার বিচার ?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "সিংহাসনে উপবেশন যে আমার অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মৃগয়ায় বহির্গত হও, আলস্য দূর হইবে।" মহারাজ বলিলেন, "দাস আপনার সঙ্গত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনেও অনিচ্ছুক।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বৎস ! আমি তোমার সমভিব্যাহারী হইয়া বনমধ্যে গমন করিব।"

তৎপরদিবস প্রত্যূষে মৃগয়াগমনের আজ্ঞা প্রচার হইল। মহারাজ মৃগয়ার বেশ পরিধান পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের

রাজবংশীয়গণ হস্তিপৃষ্ঠস্থিত সু-উন্নত লৌহময় হাওদাভ্যন্তরে থাকিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারায় যেরূপে শিকার করিয়া থাকেন, তাৎকালীন শিকারপ্রিয় মহারাজা, রাজা বা অন্য বীরপুরুষগণ তাহা করিতে অপমান জ্ঞান করিতেন। মৃগয়ায় তরবারি, বর্শা ও তীর ধনুক ব্যবহৃত হইত। সুপ্ত সুদীর্ঘ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূলরাজ বধ করিতে হইলে, বীরপুরুষ গজ বা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের কিছুদূরে মল্লের ন্যায় তরবারি হস্তে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত নরঘাতীকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত বামহস্তে পৃথ্বীতলে শব্দ করিতেন। প্রবুদ্ধ ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক যখন তাঁহার মস্তকোপরি আসিত, বীর করধৃত তরবারিদ্বারায় তাহার মধ্যদেশ দ্বিধা করিয়া ফেলিতেন—শার্দ্দূলের সম্মুখার্দ্ধ তাঁহার পশ্চাতে ও পশ্চাদার্দ্ধ তাঁহার সম্মুখে ভূতলস্পর্শ করিয়া তাঁহার বীরপণার পরিচয় দিত। আহা! সে নরশোণিতলোলুপের রুধিরাপ্লুতদেহে ও সেই লোহিতবর্ণ তরবারি হস্তে যখন সেই বীরপুরুষ হাস্য করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন কোন্ নরদেহধারী বা ধারিণী সে মূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত বা আনন্দোন্মত্ত না হইতেন!

মহারাজ ও ব্রাহ্মণ বনপ্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে দুঃসময় জ্ঞানকে বলিল, "এ সুবুদ্ধি ও বিদ্বান ব্রাহ্মণের উপর অগ্রে তুমি নিজ ক্ষমতা প্রকাশ কর। আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তোমার প্রয়াস বিফল করিব।" বিনা বাক্যব্যয়ে জ্ঞান ছায়ারূপে ব্রাহ্মণ-অন্তরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ণভাবে তিনি কেবল বিশ্বপতিতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। জ্ঞানের ছায়ায় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মজন্য অনুতাপানল প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইল। মহারাজের সামান্য শুভকামনায় ব্রাহ্মণ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, যদি তাহাতেও তাঁহার রাশি রাশি পাপের কণামাত্রেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ক্ষণপরে 'একটী নীলগাইএর' প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহারাজ অশ্বে কষাঘাত করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে কৃষ্ণসারের পশ্চাতে দৌড়িল। রাজচরিত্র বিলক্ষণ জ্ঞাত থাকাতে সমভিব্যাহারী লোক সকল কিয়দ্দূর গমন করিয়াই নিজ নিজ অশ্বের গতি শ্লথ করিল। 'মহারাজের ন্যায় অশ্বারোহী পৃথ্বীতলে দুর্ল্লভ,' এবম্প্রকার বাক্যে মহারাজ সন্তুষ্ট হন, ইহা বিলক্ষণরূপে জানিয়াই সমভিব্যাহারী লোকগণ 'বাহাল তবীয়তে' অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থমনে ইচ্ছামত আহার ও

হাস্ত পরিহাসে বনবিহারসুখভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণে সেরূপ অভ্যাস না থাকিলেও, ব্রাহ্মণ মহারাজের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াই যাইতেছিলেন। দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে সেরূপ অশ্বারোহণে অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্ন-দেহে মহারাজ ভূপতিত হইতেছেন, ইহা দর্শনমাত্র ব্রাহ্মণ স্বয়ং সরিষার ফুল দেখিতে দেখিতেও অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মহারাজের দেহ ধারণ করিলেন! তাঁহাকে বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত অবসন্ন-দেহে বিকলেন্দ্রিয় হইয়াও তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, এই সময়ে মহারাজ নয়নোন্মীলন করিয়া ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়াও বাক্যস্ফুরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী আমলকী সংগ্রহ করিলেন। মহারাজ দেখিলেন, সে ফলগুলি সমস্ত পিশিত করিয়া তাহার রসের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত তাঁহারই বদনাভ্যন্তরে দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ যে তাঁহার অপেক্ষা অধিক শুষ্ককণ্ঠ, তাহা বুঝিতে পারিয়া মহারাজ মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "এ ব্রাহ্মণ আমার সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা। আমার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। আমি শত জন্মেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

ব্রাহ্মণ মহারাজের মস্তক উরুদেশে ধারণ করিয়া বসিলেন এবং ক্লান্তিপ্রযুক্ত তাঁহার নিদ্রাবেশ হইতেছে দেখিয়া সে অবসন্নদেহেও যথাসম্ভব শান্তিলাভ করিলেন। এই সময়ে দুঃসময় মহারাজের কটীবন্ধনস্থিত উভয়পার্শ্বে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার কোষাগ্রভাগ ছিন্ন করিয়া দিল। মৃগয়াসক্ত রাজা মহারাজারা সহসা নিকটাগত হিংস্রজন্তুকে ঐ রূপ ছুরিকাদ্বারায় বধ করিতেন। শাণিত ছুরিকাগ্রভাগ বহির্গত হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ শঙ্কিত হইলেন; কারণ সে ছুরিকা বিষলিপ্ত ছিল। কোন মতে তাহাতে মহারাজের অঙ্গস্পর্শ হইলেই তিনি নিশ্চয়ই বিগতপ্রাণ হইবেন, এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ নিজহস্তে ছুরিকার অগ্রভাগ পটভাবে ধরিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যদি কোন মতে মহারাজের অঙ্গ সঞ্চালিত না হয়, তাহা হইলে তিনি সে ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করিবেন, আর যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত বা অঙ্গুলি সমস্ত অঙ্গ হইতে ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে মহারাজ নিরাপদ হইবেন। তাঁহার কি হইবে? তিনি

সানন্দে শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে মহারাজের হিতার্থে নিজ পাপকলুষিত দেহ পরিত্যাগ করিবেন। সুব্রাহ্মণ এতদ্রূপ চিন্তাই করিতেছিলেন!

ছুরিকার শেষার্দ্ধভাগ কোষমুক্ত হইয়াছে। ঈষৎ সঞ্চালন দ্বারা ব্রাহ্মণ তাহা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই সময় দুঃসময় মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিল। এক্ষণে তাঁহাকে দুঃসময় আচ্ছন্ন করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার ইতিপূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া স্থির করিলেন, "তাঁহারই বধোদ্দেশে সমভিব্যাহারে আনীত অস্ত্র দ্বারায় সুদৃঢ় চর্ম্মকোষ ছিন্ন করতঃ ব্রাহ্মণ ছুরিকা হস্তগত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন—তাহার দ্বারায় কোন মতে একটী আঘাত করিতে পারিলেও তিনি বিষ-প্রভাবেই কালকবলিত হইবেন, আর ব্রাহ্মণ নিষ্কণ্টকে নিজনামে রাজ্যভোগ করিবেন, এই তাঁহার মনোগত ভাব।

দুঃসময়োত্তেজিত বুদ্ধিতে মহারাজ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি কটূক্তি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পারিষদবর্গ নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন, তাঁহার ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি নানারূপ সত্য মিথ্যা দোষ কীর্ত্তন করিবার জন্য স্ব স্ব বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বাক্য ঘৃতাহুতির ন্যায় মহারাজার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করিল এবং তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণকে নরক হইতেও ভয়ঙ্কর ভূমধ্যস্থকারাগারে প্রতিগ্রন্থিতে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াই যে ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, তাঁহার সিক্তগাত্রের উপর নানাবিধ বৃশ্চিকাদি যাহাতে বিচরণ ও মধ্যে মধ্যে দংশন করে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে অনুমতি দিলেন।

বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক দুঃসময় জ্ঞানকে বলিল "রাজভোগে সদা সুখী ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র আমি ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইতেছি। দেখ, তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলে না। এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে পরাজয় স্বীকার করিবে কি না?"

জ্ঞানকে নিরুত্তর দেখিয়া সুসময় ও অজ্ঞান তাঁহার পরাভব মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিল। তাহাতেও জ্ঞান বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না দেখিয়া সকলে পার্ব্বতী সন্নিধানে গমন করিলেন। প্রণত হইয়া প্রফুল্লবদনে নিজকীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া

দুঃসময় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রার্থনা করিল। সুসময় দুঃসময়ের প্রতাপ দেখিয়া সরলান্তঃকরণে পরাজয় স্বীকার করিলেন। অজ্ঞান বিষণ্ণবদনে ও ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীকার করিল, সে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান বিনীতভাবে করযোড়ে অধোদৃষ্টিতে পার্ব্বতীসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পার্ব্বতী জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নির্ব্বিবাদে দুঃসময়ের নিকট পরাজয় স্বীকার কর কি না?"

জ্ঞান পূর্ব্বোক্তভাবে অপরাধীর ন্যায় মৃদু অথচ সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "মা! দুঃসময় মহাশয় নিজকীর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য?"

পার্ব্বতী হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি স্পষ্টাক্ষরে আমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দাও।"

জ্ঞানকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া দুঃসময় প্রভৃতি সকলেই বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "হয় পরিষ্কার করিয়া পরাভব স্বীকার কর, নচেৎ পুনরায় সমরের জন্য প্রস্তুত হও।"

পার্ব্বতী পূর্ব্ববৎ হাস্যবদনে পুনরায় উত্তর করিতে বলায়, জ্ঞান তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং কাতর বচনে কহিলেন, "জগজ্জননি! দুঃসময়কথিত কার্য্যসম্বন্ধে আমি কোনরূপ প্রতিবাদ করি নাই। আপনি যথেচ্ছা বিচার করিয়া দিন। আপনার মীমাংসায় কস্মিন্‌কালেও আমার কোনরূপ ক্ষোভ উপস্থিত হইবে না।"

তাহাতেও ঈশানী উচ্চহাস্য করতঃ বলিলেন, "তোমার পরিষ্কার উত্তর পাইবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগের মকদ্দমায় রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।"

তখন জ্ঞান গলদশ্রু হইয়া গদগদস্বরে বলিলেন, "মা গো! বুঝিলাম, এ দাসকে কষ্ট দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। 'আমি পরাভূত হই নাই,' এ কথা বলিলে, আমার অহঙ্কার প্রকাশ হইবে এবং তাহা হইলেই আমার চিরসহচর বিনয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। বিনয়বিরহ আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারিব না। পাষাণি! তবে কি আমার প্রাণনাশই তোমার অভিপ্রেত?" এ দিকে আবার, যদি দুঃসময় প্রভৃতির সন্তোষার্থে বলি, 'আমি পরাভূত হইয়াছি,' তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা স্পর্শ করিবে এবং তাহা হইলেই আমার এ চিরস্বচ্ছ অঙ্গ মলিন হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থাতেও ত এ দাস জীবিত থাকিবে না।"

জ্ঞানের কথা শুনিয়া দুঃসময় ঘৃণাসূচক হাস্য করিতে করিতে সুসময়ও অজ্ঞানকে বলিল, "দেখ্, এ বেটা কোন না কোন জন্মে সলিসিটার, উকিল বা কৌন্সুলী ছিল। তদ্ভিন্ন তাহার মুখে এরূপ কূট ভাষা শুনা যাইত না।"

তচ্ছ্রবণে জ্ঞান দুঃসময় প্রভৃতি সকলকে বিনীতভাবে বলিলেন "ভাই, যদ্যপি সে ব্রাহ্মণ, তাঁহার উপস্থিত দুরবস্থাতেও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, ইহা বলেন, তাহা হইলেই মুক্তকণ্ঠে আমি আমার পরাজয় স্বীকার করিব।"

দুঃসময় ও অন্যান্য সকলে উচ্চহাস্য করতঃ কহিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ পরাভবে কাহারও বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না। অভিমানবশতঃ তুমি ক্ষিপ্ত হইয়াছ, দেখিতেছি—নচেৎ এরূপ অবস্থাতেও ব্রাহ্মণের ক্ষোভ হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে কিছুতেই তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারিতে না। সহসা পরমসুখের সিংহাসনচ্যুতির পর এ ঘোর নরকযন্ত্রণা কি সুখের? যাহা হউক তোমার ক্ষিপ্ততা দূর করিবার জন্য আমরা সকলে ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিতেছি, তুমি সমভিব্যাহারী হও।"

সর্ব্বাগ্রে দুঃসময় অবনত দেহে তদবস্থ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার যন্ত্রণাদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহাশয় গো! আপনি অদ্য হইতে প্রত্যহ প্রত্যুষে বৃহস্পতি দেবের পূজা করিবেন। আপনার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দ বা সৌভাগ্যের সময় এ হতভাগ্যের জীবনে আর কখন উপস্থিত হয় নাই। কোন অপদেবতার ছলনায় আমি গত ছয় মাসের মধ্যে যে পাপপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে আমার মনে হইয়াছিল যে আমার সহস্রজন্ম কষ্টভোগেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। অদ্য নিজপ্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াই মহারাজের প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছিলাম। আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া মহারাজ পুরস্কার বা সুমিষ্ট বাক্যের পরিবর্ত্তে এ ঘোর যাতনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃশ্চিকের দংশন যত অনুভব করিতেছি, ততই আমার আশা হইতেছে, হয় ত জীবনাবশেষের পূর্ব্বেই আমি পাপমুক্ত হইব। এ দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং ইহার ক্ষয় বা নাশে আমার কোনও দুঃখ নাই। কিন্তু পাপমুক্তির আশা যে কত বিমলানন্দদায়িনী, ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলেই আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

দুঃসময়ের প্রফুল্লবদন ব্রাহ্মণের কথায় বিশুষ্ক হইল। ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি জ্ঞানচরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "অদ্য বুঝিলাম, আপনি সর্ব্বজয়ী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি মহারাজরাজেশ্বরকে মুহূর্ত্তমধ্যে, চীরখণ্ড পরিধায়ী ও ভিক্ষোপজীবী করিতে পারি—আমার প্রতাপে মহাবল অসুরও অচিরাৎ জরাজীর্ণ ও শীর্ণকায় হইয়া যায়। আবার সুসময়ের কৃপায় তাহারাই অনতিবিলম্বে সুস্থকায় ও ধনবান্ হইতে পারে। কিন্তু আপনি সকল অবস্থাতেই আপনার অনুগৃহীত লোককে সুখানুভব করাইতে পারেন। অধিক কি এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনারই অনুকম্পায় লোকে অন্তিমকালেও স্থির বুদ্ধিতে ও সহাস্যবদনে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ ও তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে পারে। অতঃপর সকলেই অবিলম্বে ভবানীর এজলাসে হাজির হইলেন। তিনি দুঃসময়াদি সকলেরই প্রমুখাৎ জ্ঞানের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বিচারের জন্য তোমরা আমার নিকট আসিয়াছিলে কেন বলিতে পার?"

দুঃসময়, সুসময় ও অজ্ঞান বলিল, "মা! আপনি ঈশ্বরী বলিয়া, বিচারের নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়া থাকি।"

ভবানী বলিলেন, "বৎসগণ? এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই আমি ঈশ্বরী। তিনি আমার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলেই, আমি যে শিরপদচ্যুতা হইয়া কুক্কুরী অপেক্ষাও অধম হইব, তাহা কি তোমরা অদ্যাবধি বুঝিতে পার নাই?"

প্রীত হইয়া সকলে এবং গলদশ্রুভাবে জ্ঞান শিবানীচরণে প্রণত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যসাধনার্থে প্রস্থান করিলেন।

দুঃসময় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং যে প্রকারে ছুরিকাকোষ ছিন্ন হইয়াছিল ও প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ছুরিকা করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হওতঃ এক্ষণে কারামুক্ত ব্রাহ্মণচরণে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে এক্ষণে ব্রাহ্মণ এককালে নিশ্চিন্ত। মহারাজ দেবতাবোধে তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে স্তুতি করেন এবং রাজপ্রদত্ত সম্পত্তির আয়ে তাঁহার কোন অভাব নাই। পাছে আবার অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া

পাপে রত হন, এই আশঙ্কায় তিনি সতত শিবচরণ ধ্যান করিতেন। তাঁহার বদনে সর্ব্বদাই 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং' শুনা যাইত।

পার্ব্বতী জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতির বিবাদ ভঞ্জন করিতে কোনরূপ ক্লেশ পাইলেন না। উপরন্তু তিনি ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্তান্তঃকরণে ও ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে নিজপতি দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানে নিয়ত রত দেখিয়া পুলকিত মনে বিশ্বেশ্বরকে পুনঃপুনঃ আশুতোষ বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গীতশ্রবণে।

কে গায়, কে গায়, সুধাময় স্বরে!
কেন গায় গান, কি ভাবের ভরে!
কি মধুর বীণা-নিন্দিত তান!
উঠিছে নাচিয়া পুলকে পরাণ;
রকতের স্রোত বেগে বহে যায়,
বিদ্যুতের মত শিরায় শিরায়।
কণ্টকিত দেহ, আনন্দিত মন,
মধুমাখা স্বরে জুড়ায় শ্রবণ।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

গভীর-শ্বাস সম্বন্ধে শেষ কথা।

সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যে অবগত হইলাম, কেহ কেহ মদীয় প্রবন্ধপাঠে বলিয়াছেন, গভীরশ্বাসগ্রহণে বক্ষঃস্থলে বেদনা হয়। এরূপ বেদনা হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ যাঁহারা সাধারণভাবে শ্বাসগ্রহণ করেন তাঁহারা শুদ্ধ ফুসফুসের উপরিস্থ বায়ুকোষগুলিরই ব্যবহার করেন। একারণ বহুদিন হইতে তাঁহাদের ফুসফুসের মধ্যস্থলে অবস্থিত ও নিম্নতলস্থ বায়ুকোষগুলি রুদ্ধ অবস্থায় থাকায় প্রথম প্রথম গভীরশ্বাসগ্রহণে সেগুলির মধ্যে বায়ুপ্রবেশ

করিয়া তাহাদিগকে ফুলাইতে চেষ্টা করে। ইহাতে বক্ষঃ ও পঞ্জর বিস্তৃত হওয়ায় ইহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ পেশী ও অস্থিগুলিতে চাড় লাগে এবং তাহাতে বেদনা হইতে পারে। কিন্তু ইহা অধিক দিন থাকে না। যেমন যাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম করা অভ্যাস নাই, তাঁহারা যদি এইরূপ পরিশ্রম করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পেশীর চালনা হওয়া বশতঃ অনেকস্থলে বেদনা হয়; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে ও শরীরের পেশীগুলি পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী হইলে সে বেদনা অন্তর্হিত হয়। গভীরশ্বাস গ্রহণ একপ্রকার শারীরিক পরিশ্রম। সুতরাং ইহাতে বেদনা হইলে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। আমি নিজে বহুদিন হইতে গভীর শ্বাসগ্রহণ করিতেছি, কিন্তু কদাপি কোন স্থলে বেদনা অনুভব করি নাই। *

এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। এবারে বলকৃত গভীরশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে গভীরশ্বাস কঠোর শারীরিক পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে বলকৃত গভীরশ্বাস কহে অর্থাৎ কঠোরভাবে শারীরিক পরিশ্রম করিতে করিতে যে গভীরশ্বাসের উৎপন্ন হয় তাহাকে বলকৃত গভীরশ্বাস কহে। ইতঃপূর্ব্বে একবার বলা গিয়াছে যে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিলেই পেশীর সঙ্কোচ ও প্রসারণ হয় এবং তাহাতে রক্তে দূষিত কারবণিক এসিড বাষ্পের উৎপত্তি হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অধিক পরিমাণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চালনা করিলে পেশী যে পরিমাণ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইবে রক্তে সেই পরিমাণ কারবণিক এসিড উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে এইরূপ কারবণিক এসিডকে দূরীভূত করিতে হইলে আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ অম্লজানের আবশ্যক হয় এবং গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের পূরণ হয়। কারণ রক্তস্থ কারবণিক এসিড বাষ্পকে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে বিশুদ্ধ অম্লজান বাষ্প আনয়ন করিয়া দেওয়াই শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য। যে সকল পরিশ্রমে

---

* উপরোক্ত প্রবন্ধসম্বন্ধে প্রতিবাদের ভাবে যাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, কিন্তু লেখক যখন বলিতেছেন "আমি বহুদিন হইতে গভীর শ্বাসগ্রহণ করিতেছি", তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট এ বিষয় আলাপ করিতে পারেন। (কুঃ সঃ)

অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পৈশিক বল ব্যয়িত হয় সেই সকল পরিশ্রমে অধিক অম্লজানের আবশ্যক হয়। দৌড়ান, লাফালাফি করা, কুস্তি করা, ভারী বস্তু উত্তোলন করা, ইহাদিগকে এই সকল পরিশ্রমের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। কারণ এইরূপ পরিশ্রমে, যে পদদ্বয় অধিক পরিমাণ মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য সম্পন্ন করে—সেই পদদ্বয়ের পেশী বেশী কার্য্য করিয়া রক্তে খুব কারবণিক এসিড বাষ্পের উৎপাদন করে। তাহাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলেই আমরা উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু পাইবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে থাকি। শ্বাসপ্রশ্বাসের এইরূপ দ্রুত গমনাগমনে ফুসফুসের আদৌ পুষ্টি হয় না। কারণ ইহাতে ফুসফুসের সকল বায়ুকোষ বায়ুগ্রহণে সক্ষম হয় না। উপরিলিখিত ব্যায়াম করিতে করিতে যখনই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্রুত চলিতে থাকিবে তখনই উহা হইতে নিরস্ত হইয়া বিশ্রামলাভ করা কর্ত্তব্য। কারণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিমিত ও গভীরভাবে হইলেই ফুসফুসের উন্নতি হয়। যে কোন ব্যায়াম অভ্যাস করিবার কালে আমাদিগকে এই বিষয়টীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অথবা যে পর্য্যন্ত আমাদের শ্বাসপথদিয়া বায়ু স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিবে, সে পর্য্যন্ত বুঝিব যে আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছি না।

পাঠকগণের অনুমতি ও রুচিকর হইলে আমি ফুসফুসের উন্নতি ও পোষণোপযোগী অনেক ব্যায়াম প্রকাশ করিতে পারি। সর্ব্বশেষে একটা কথা বলিয়া রাখি, যে ব্যায়ামই অভ্যাস করা যাউক না কেন তাহা পরিমিত ভাবে অভ্যাস করা উচিত; কারণ মিতাচারই সকল বিষয়ে উন্নতিলাভের প্রশস্ত উপায়।

শ্রীবিভাকর আশ।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

ম্যালেরিয়া।

খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গৈপুর গ্রামে গৃহস্থের বাড়ি ঘর একণে অধিকাংশ পাকা এমারৎ হইয়াছে। ছোট বড় রাস্তা সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ভাল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চারিদিকে গ্রাম সকল দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ নিষ্প্রভ হইতেছে। বারমাস যাহারা তথায় বাস করে তাহাদের মধ্যে প্রায় এমন একটী লোক দেখা যায় না যাহার মুখে ম্যালেরিয়া ক্লিষ্টতা প্রকাশ নাই। বর্ষার সময় শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে এই জ্বর আরম্ভ হয়, আর পৌস মাঘ পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ থাকে। যদিও ফাল্গুন চৈত্র হইতে চারি মাস কাল একটু ভাল যায়, কিন্তু যাহারা বর্ষ বর্ষ ভোগিয়া পুরাতন অবস্থায় আসিয়াছে তাহারা তেমন সুস্থ হয় না। তাই দেখা যাইতেছে ম্যালেরিয়াই পল্লীগ্রামের সকল সুখ এবং শ্রী সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ গ্রাম জনশূন্য হইয়া জঙ্গলাবৃত হইতেছে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট।

এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ায় প্রতিবিধান জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারুন না পারুন অন্ততঃ আমাদের অভাব অভিযোগ যে শুনিতেও প্রস্তুত আছেন, এই ভরসায় আমরাও আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

দূষিত জল।

ম্যালেরিয়ার একটী বিশেষ কারণ নদীর জল দুষ্ট হওয়া। কুশদহস্থিত গোবরডাঙ্গা গৈপুর বালিয়ানি ইছাপুর, ঘোষপুর চারঘাট প্রভৃতি বহুগ্রামের পাদদেশ প্রবাহিতা যমুনা নদীর জল ইতিপুর্ব্বে যখন ভাল ছিল—যখন নদীর স্রোত প্রবল ছিল তখন এরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

নদী মজিয়া যাইতেছে।

অনেক দিন হইতে এই নদীর অবস্থা হীন হইয়া আসিতেছে। নদী মজিয়া যাওয়ার নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে একটী কারণ, নদীর দুই ধারে চাষ করিতে দেওয়া। বর্ষার ধোয়াট মাটীতে নদীগর্ভ পূর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বে নদীর ধারে এরূপ চাষ ছিল না, জমি পতিত থাকিত। নদীও গভীর ছিল।

পাট ধোয়া।

তৎপরে এই সময় আসিতেছে যখন পাট পচান ও পাটধোয়ার জন্য নদীর জলে বিষম অত্যাচার হইবে। গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর নিয়ম আছে বটে যমুনায় পাট পচাইলে তাহার জরিমানা হয়, কিন্তু প্রতিবৎসর ক্ষেত্রওয়ালারা অনেকে বোধহয় প্রস্তুত হইয়া যমুনায় পাট ফেলে। কেন না তাহারা দশটাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া ততোধিক লাভের কাজ উদ্ধার করিয়া লয়। এ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটী কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের প্রতি এ কার্য্যের ভার দিয়া জরিমানার মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে কোন প্রতিকার দেখা যায় না।

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন সন্নিহিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষের দোকানে চুরী হইয়া গিয়াছে। চাউল ময়দা ঘৃতাদি প্রায় ১০০৲ টাকার দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। ৩ দিন পরে পুলিষ আসিয়া যথারীতি তদন্ত পূর্ব্বক "যদি চোরের সন্ধান পাও সংবাদ দিও" এই আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে পুনঃপুনঃ চুরীর কথা শোনা যাইতেছে কেন?

ছাতিনগ্রাম—রাণী ভবানীর পিত্রালয়।

আমি কে?

প্রশ্ন হইল আমি কে? অর্থাৎ আমার প্রকৃত স্বরূপ কি? উত্তর। আমি কে, বা বস্তুতঃ আমি কি, এই তত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে, আমি কি নহি, তাহা বুঝিতে হয়। মনুষ্য দেহধারী জীবের মধ্যে যে মনে করে, এই দেহই আমি, সে প্রথম শ্রেণীর অজ্ঞানী বা স্থূলদর্শী; তাহা হইতে একটু উন্নত মানব, মনকেই আমি বলিয়া বিবেচনা করে। অর্থাৎ কেবল হাঁ, না, ইহা করিব, উহা করিব না, এইরূপ সঙ্কল্প বিকল্প লইয়া যে মনের স্বরূপ, যে মন মানবকে একবার হাসায়, একবার কাঁদায়, যে মানব মনাতীত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম, সেও যে অজ্ঞানী তাহাতে আর সন্দেহ কি? তৎপরে আর এক শ্রেণীর মানব, বুদ্ধিকে আমি মনে করে; অবশ্য বুদ্ধির স্থান মনের উপর, অর্থাৎ বুদ্ধিতে বিচারশক্তি এবং সদসৎ জ্ঞান দৃষ্ট হয়। কিন্তু বুদ্ধি অহঙ্কার মুক্ত নহে, বুদ্ধি কখন দিব্য জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না, বুদ্ধি আত্মত্যাগের দেবভাব ধারণা করাইতে অসমর্থ; সুতরাং বুদ্ধিও আমার প্রকৃত স্বরূপ নহে। দেহ আমি নহি, মন আমি নহি, বুদ্ধিও আমি নহি, তবে আমি কি? বা আমি কে? সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, "নেতি" "নেতি" যাহা আমি নহি তাহাই উত্তমরূপে অগ্রে সাধন কর, তাহা হইলে স্বতঃই আত্মস্বরূপ, জ্ঞানচক্ষে বা প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে নিজেই বুঝিতে পারিবে।

পরমাত্মা-স্বরূপ কিম্বা জীবাত্মা-স্বরূপ সম্বন্ধে, উপনিষদ পাঠে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে; যেমন, সমুদ্রের বিষয় শুনিয়া বা চিত্র দেখিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে সমুদ্র সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। শ্রেষ্ঠ সাধকের মুখে ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনা বা ব্রহ্মোপাসনা শুনিয়া এবং তজ্জন্য সাধকে, হর্ষ পুলকাদি ভাবের প্রকাশ দেখিয়াও একপ্রকার আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞান হয়, কিন্তু সে জ্ঞানে স্বরূপ জ্ঞান হয় না; তাহাকে তটস্থ জ্ঞান বলা যায়। তটস্থ জ্ঞান কিরূপ! যেমন সমুদ্রের কূলে বসিয়া তাহার তরঙ্গাদি দৃষ্টে যে জ্ঞান হয়, সমুদ্র সম্বন্ধে

তাহাকে তটস্থ জ্ঞান বলে, ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রের কথা শুনিয়া ও চিত্র দেখিয়া যে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল, এক্ষণে সচক্ষে সমুদ্র দেখিয়া যে জ্ঞান হইল, তাহা কত ভিন্ন। তৎপরে সমুদ্রে অবগাহন করিলে সত্য সত্যই শরীরের যে অবস্থা বশতঃ সমুদ্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে স্বরূপ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। অতএব হে প্রবর্ত্তক! ব্রহ্ম কি, আমি কি, এই উভয় স্বরূপে সাদৃশ্য কি, আমি ব্রহ্মযোগে অধিকারী কি না, যোগের পরিণতি ফল কি, যোগে আমার কোন্ স্বরূপ লাভ হয়, এই সকল অমূল্য তত্ত্ব—যাহার প্রথম কথা আমি কে, বা আমি কি? জানিবার যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি কি নহি, তাহাই অগ্রে জানিতে চেষ্টা কর। অন্যথা আমি বস্তু কি তাহা প্রথমে ধারণা হইতে পারে না।

সঙ্গীত।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

বারবার ডাকি, ওহে প্রাণ পাখী!
তবুও কি ঘুম ভাঙ্গেনা?
যত নিশি গেল, তত প্রভাত এলো,
সুপ্রভাত কভু দেখনা।
যে ধ্যানে ঘুমাও, জাগ সেই জ্ঞানে,
সুপ্রভাত হবে প্রভাতে কেমনে?
অবসন্ন প্রাণে, বিষাদিত মনে,
করিছ 'কল্পনা' "জল্পনা"।
যে বাসনা লয়ে আছ দিবানিশি,
নিশিত তন্দ্রায় স্বপ্ন যোগে মিশি,
কভু কাঁদ, কভু হয় মৃদু হাসি,
বিচিত্র মায়ার কল্পনা;—
স্বপ্ন খেলা তরে এসেছ কি ভবে?
মোহের স্বপন কতই দেখিবে?

জাগ দিব্য জ্ঞানে প্রভাত জীবনে
জগত বন্দনে বন্দনা। (কর)
এ দেহ পিঞ্জরে আছ আত্মারাম,
তাই কি ভুলেছ তব নিজ নাম,
ভুলেছ কি সেই "পরম" প্রিয় নাম
তাই বুঝি এ বিড়ম্বনা ;—
খাঁচার পাখী হয়ে কতদিন রবে ?
খাঁচা ছেড়ে পাখী যেদিন চলে যাবে,
স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, খাঁচা পড়ে রবে,
বদ্ধ পাখী পাবে কতই যাতনা।
দেহে থেকে আত্মা দেহ বদ্ধ নয়,
আত্মজ্ঞানোদয়ে, দেহ মুক্ত রয়
পরমাত্মা হয়, অনন্ত আশ্রয়
কি ভয় মরণ ভাবনা ;—
অমরাত্মা হয়ে এসেছ এ ভবে
দেহনাশে আত্মনাশ নহি হবে
বিশ্বাসীর মত, হয়ে শান্তচিত,
সাধিলে বিফল হবে না। (সাধনে)

দাস—

হজরত মহম্মদ।

(পরিশিষ্ট।)

উপনিষদোক্ত "তত্ত্বমসি", অহংব্রহ্মাস্মি, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", প্রভৃতি মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু রামানুজ স্বামী বলিলেন "ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা ও সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা তদীয় দাসস্বরূপ। শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুজ আচার্য্য

প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। রামানুজ স্বামী ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে স্বীয় মতের পরিপোষক ভাব লাভ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আচার্য্য কেশবচন্দ্র একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। যে সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন সে সময়ে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইত। তৎপরে পূজ্যপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রহ্মকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন। যদিও পরমহংসদেব যে ভাবে সাধনাদি করিতেন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সে পথের লোক ছিলেন না, তথাপি তাঁহার সত্যপ্রিয়তা গুণে তিনি এ মধুরভাব গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক্ষণে যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মকে মা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন, এই মা নামে "কত সুধা, কত মধু, কতই আরাম।" সত্যপ্রিয় সাধকের নিকট সত্য কখনও উপেক্ষিত হয় না। তাই রামানুজ স্বামী যখন দেখিলেন খৃষ্টধর্ম্মে ও মুসলমানধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত সেব্য সেবক সম্বন্ধরূপ মহারত্ন লুক্কায়িত আছে, তখন তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া স্বয়ং অগ্রে তাহা আত্মস্থ করিলেন এবং তৎপরে সমগ্র দেশকে সেই ধর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। এখন হইতেই ভক্তির ধর্ম্ম ও তাহার সাধন প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল।

রামানুজস্বামী এই পর্য্যন্ত করিয়াই নিরস্ত হইলেন, কারণ ইহারই জন্য তিনি বিশেষভাবে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে যেমন পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, রামানুজ স্বামীকেও তেমনি স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মসূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে হয়; এবং বিচারে প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। রামানুজস্বামী খৃষ্টধর্ম্মের একেশ্বরবাদ, মুসলমানধর্ম্মের একেশ্বরবাদ এবং আর্য্যধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারিবে না, দীক্ষাগুরু হইতে পারিবে না

এ সমস্ত ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি পৌত্তলিকতারও প্রশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ দূর করা, পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন করা তাঁহার জীবনের কার্য্যভার ছিল না, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের কার্য্য।

রামানুজ স্বামীর'পর রামানন্দ স্বামী প্রাদুর্ভূত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন ও সর্ব্বজাতীয় লোককে আপন শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। ইঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে একজন জোলা তাঁতি একজন চামার, একজন রাজপুত, একজন জাট এবং আর একজন নাপিত জাতীয় ছিল। রামানন্দ স্বামী কেবল সর্ব্বজাতীয় লোককে আপনার শিষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহাদিগকে গুরুপদেরও অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীরের নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মহাপুরুষই সর্ব্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মকে ও উভয় জাতিকে এক ধর্ম্মে ও এক জাতিতে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। এইজন্য তিনি তাৎকালিক হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার দেখিয়াছিলেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র ও পণ্ডিতকে এবং কোরাণ ও মোল্লাকে তুল্যরূপে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কবীর জপ, পূজা ও জাতিভেদাদির বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন এবং সংসারের দুঃখময়স্বরূপ সবিশেষ বর্ণন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন।

ভারতের ধর্ম্ম বৈরাগ্যপ্রধান। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, রামানন্দ এবং কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই সংসারত্যাগী বৈরাগী ছিলেন। মহর্ষি ঈষা এবং তাঁহার শিষ্যগণও বৈরাগী ছিলেন। কিন্তু হজরত মহম্মদ গৃহস্থ ব্যক্তি হইয়াও ঈশ্বরের সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই আধ্যাত্মিক প্রভাব এদেশে ব্যর্থ হয় নাই। একজন মহাপুরুষের জীবনে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইনি বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্য একটি অসামান্য বিস্ময়ের বিধি দিয়া গিয়াছেন ; হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে সেরূপ উপদেশ দেওয়া সহসা সম্ভাবিত বোধ হয় না। তিনি কহিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই ; উত্তম বসন পরিধান,ও সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়-সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক তাঁহার যোগ কর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

সুরাপান।

(পরিশিষ্ট।)

[এই ক্ষুদ্র কলেবরবিশিষ্ট কুশদহের কয়েক সংখ্যায় "সুরাপান" সম্বন্ধে যে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মযাজকগণ, চিকিৎসকগণ, ও ব্যবস্থাপকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্রবন্ধের এক স্থানে যে লেখক বলিতেছেন "সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে যে সেই পদার্থটি (সুরা) দৈহিক মানসিক বা সামাজিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করতঃ পাপের আকর বলিয়া ঘৃণিত হইবার যোগ্য পদবাচ্য।" সুতরাং আমরা ঐ সত্যটির পুনরুক্তি করিয়া, আর একটি মাত্র মতের প্রতিবাদ উদ্ধৃতদ্বারায় প্রবন্ধ শেষ করিতেছি,—এই মতে পরিমিত পায়ীগণের ভ্রম প্রদর্শীত হইয়াছে।

অবশেষে আমরা বিধাতা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে এই প্রবন্ধ পাঠে জনসাধারণের হৃদয় দিন দিন সুরা বিতৃষ্ণ হউক। (কুঃ সঃ)]

অধুনা পরিমিতপায়ী নামে এক দল লোক মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন। ইহারা মাতাল অপেক্ষাও দেশের অধিক অমঙ্গল সাধক। মাতালকে লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু পরিমিত পায়ীগণের দৃষ্টান্তে লোকে দেহটাকে স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও কর্ম্ম করিবার ওজুহাতে সুরা সেবন আরম্ভ করে। ফল যাহা হয়, সকলেই বিদিত আছেন। সকল মাতাল এককালে পরিমিতপায়ী রূপে সুরার নিকট দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভক্ত ভৃত্যের ন্যায় সুরাদেবীর নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে।

ওয়েল্‌স প্রদেশীয় এক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক নিম্নলিখিত গল্প দ্বারা একজন পরিমিত পায়ীর ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন ;—

"এক রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখি যে, আমি কি জানি কিরূপে নরকে গমন করিয়া যমরাজের সভাগৃহে উপস্থিত হইয়াছি। অল্পক্ষণ তথায় থাকিতে না থাকিতে, দ্বারে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইল। সয়তান (পাপ) ডাকিতে লাগিল, "হে সহচর, শীঘ্র পৃথিবীতে এস।" উত্তর হইল, "কেন? কি হইয়াছে?" সয়তান বলিল, "পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচাকর প্রেরিত হইতেছে।" সহচর ঐ স্থানে আসিয়া দেখিল যে প্রচারকগণ, তাঁহাদের পরি-

বারবর্গ এবং শত শত বাইবেল ও পুস্তিকার বাক্স রহিয়াছে। কিন্তু পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিল যে স্তরে স্তরে বিবিধ প্রকার মদের পিপা সাজান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সহচর বলিল, "এখনও ভয়ের কারণ নাই। এই সকল পুস্তকের বাক্স যত উপকার করিবে, পিপাগুলি 'তাহা' অপেক্ষা অধিক অপকার করিবে।" এই বলিয়া সে এক মিনিটে নরকে ফিরিয়া আসিল। পুনরায় দ্বারে জোরে আঘাত হইল এবং ঘন ঘন ডাক হইতে লাগিল, "উহারা পরিমিত সুরাপায়ীদিগের সভা স্থাপন করিতেছে।" সহচর দেখিতে আসিল, কিন্তু ত্বরায় এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল যে, "ইহাতে নরকের আধিপত্য বিস্তার করিবার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। লোকের অল্প মদ খাইয়া আশা মিটিবে না, এবং লোকদিগের মনের এত বল নাই যে লোভ সম্বরণ করিতে পারে।" পুনরায় অধিকতর জোরের সহিত আঘাত হইতে লাগিল, ও অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ডাক হইতে লাগিল, "হে সহচর, তুমি এখনও এস, নতুবা সকলই নষ্ট হইবে; ইহারা সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করিতেছে;" সহচর আসিয়া বলিল, "কি! ইহারা কোন প্রকার সুরাপান করিবে না? ইহা আমার পক্ষে বড়ই দুঃসংবাদ!"

"On Guard,"

স্বপ্ন হইলেও ইহাকে অমূলক চিন্তামাত্র বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহাতে পরিমিত সুরাপানের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি নিহিত রহিয়াছে। সুরাপান করিলেই ইচ্ছাশক্তির উপর আধিপত্য থাকে না সুতরাং প্রায় সকল স্থানেই পরিমিত পায়ীকে, পরিমিত পানের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়।

এক যুবা তাহার ফাঁসির কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, "এক চামচে মদের জন্যই আমার এ দশা ঘটিল।" এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিতে লাগিল, "যখন আমি শিশু ছিলাম, বাবা আমাকে কোলে করিয়া তাঁহার গ্লাস হইতে এক চামচে মদ দিতেন। এইরূপে আমার মদের পিপাসা উপস্থিত হইল; এবং মদের ঝোঁকে এমন কার্য্য করিলাম, যাহার জন্য ভীষণ শাস্তি পাইতে হইল।"

Staunch Tetotalor.

লোকে বলে, একটু করিয়া মদ্য খাইতে দোষ নাই; সকল মদ্যপায়ী তো মাতাল হয় না। কেহ ইহা জানে না যে, মদ খাইবামাত্র যদি মাতাল হইত,

তাহা হইলে, কেহ একবার ভিন্ন আর দুইবার মদ খাইত না। ইহা বুঝিয়াই একজন লোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "হে ঈশ্বর! মানুষ যেন প্রথম বার মদ খাইয়াই ঘোরতর মাতালের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

'Orations J. B. Gongh,

একদা কোন ধর্ম্মযাজক এক সভাস্থলে এই বলিয়া পরিমিত পানের প্রশংসা করিতেছিলেন যে, সাধু ব্যক্তিদিগের সুরাপান করিবার নীতি সঙ্গত ক্ষমতা আছে এবং পান হইতে সম্পূর্ণ বিরতি ধর্ম্মোন্মাদের লক্ষণ ও বাইবেলের অনুমোদিত নহে। তাঁহার কূট তর্ক জাল রচনাকার্য্য শেষ হইবার পর এক বৃদ্ধ উত্তেজনা ও দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে দণ্ডায়মান হইয়া, লোকমণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া এই ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, "আমি এক যুবকের বিষয় জানি, যে যুবক অতি শীঘ্র শীঘ্র মাতাল হইতেছে। আমার ভয় হয়, সে সর্ব্বদাই জনসাধারণের প্রিয় কোন এক ধর্ম্মযাজকের দৃষ্টান্তের ওজর করে। সে বলে যে, যখন সেই আচার্য্য সুরাপান করেন ও তাহার অনুকূলে যুক্তি দেখাইতেছেন, তখন সেও সেইরূপ করিতে পারে। হে ভদ্র ব্যক্তিগণ, সেই প্রমত্ত হতভাগ্য যুবাই আমার পুত্র; এই মাত্র যে ধর্ম্মযাজক বক্তৃতা করিলেন, সেই যুবা তাঁহারই অসদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতেছে।

—Temperance Tract No. 40.

এক সময় স্কট্‌লণ্ডের এক ধর্ম্ম যাজক সম্পূর্ণ বিরতি অপেক্ষা পরিমিত পানের অধিক গুণ, এই বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন; তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই সভাস্থলের মধ্য হইতে এক হতভাগ্য মাতাল উঠিয়া বলিল, "বাহাবা! আচার্য্য মহাশয়, আপনারা আমাদেরই পক্ষে!" প্রচারক এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "আমি আর তোমাদের দিকে হইব না। আমি একবারে পান বন্ধ করিব।"

"Talks on Temperance," page 31.

এখন প্রশ্ন এই যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত মদ্যপান জড়িত ছিল বলিয়া, তথায় মদ্যপান নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বর্ত্তমানে সেই ইংলণ্ড দেশেও মদ্যপানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, স্বার্থান্ধ শৌণ্ডিকগণের অর্থবল এবং ক্ষমতার প্রভাব না থাকিলে

আইনের সাহায্যে সুরা প্রস্তুত ও পান বন্ধ হইত। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মযাজক ও গ্রন্থকার সুরাপানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেছেন। প্রভুর ভোজে (Lord's supper) অনেকে সুরার পরিবর্ত্তে সুরা-সারহীন পানীয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শীতপ্রধান দেশের যখন এই অবস্থা, তবে কেন এ রাক্ষসী ভারতবর্ষ জুড়িয়া বসিয়া আছে? ইহার মূলে ইংলণ্ড-প্রত্যাগত যুবকগণের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ড প্রবাস কালে শীত নিবারণ ও পাঠ-গ্রন্থে সমধিক মনোনিবেশ করিবার জন্য বা ভদ্রতার খাতিরে, মিতপায়ী হইয়াছেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী এবং বাপ তাড়ান মা-খেদান ব্যক্তির দল। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে নতুবা যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা কঠিন হইত না যে বঙ্গসমাজে সুরার প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সুরা দেবী অতি মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মৃদু পাদ-বিক্ষেপে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোকদিগের গৃহে অশান্তির আগুণ প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য প্রবেশ করিতেছেন—আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত সম্পর্ক রাখি না, বলি, "আহা যাক্ ও যে পরিমিত পায়ী।" কৃপায় পরিবর্ত্তে স্নেহের সহিত অপরিমিত পায়ী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-মাতালকে সর্ব্ব প্রকার আক্রমণ হইতে যেন রক্ষা করিতে সকলে ব্যগ্র! কি এক কাল নিদ্রা আসিয়া যেন সকলকে গ্রাস করিয়াছে—সকলে ভাবিতেছেন, এখন আর কেহ মদ বড় বেশী খায় না, কেন না আমার বন্ধু যদু, মধু ও শ্যাম যে সুরা স্পর্শও করেন না ও সুরা-পানকে পাপ মনে করেন। কেহ সরকারী কাগজপত্র, যাহাতে এ সম্বন্ধে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাঠও করেন না।

১৮৪৬ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল শীল, সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে মদ্যপান করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে এরূপ প্রথা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; তৎপরে ১৮৬৩ সালে ৺ প্যারীচরণ সরকার "Bengal Temperance Society" নামক সভা স্থাপিত করেন। ১৮৭০ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন "Indian Reform Society" ও তৎসঙ্গে তাহার এক মাদক-নিবারণী শাখা সভা স্থাপন করেন এবং ১৮৭৬ সালে এক আশা দল (Band of Hope) স্থাপিত হয়। এই সভাগুলিতে যুবক সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। আন্দোলনের সভ্যগণের মধ্যে এখনও অনেকে

জীবিত আছেন। সে সভাগুলি মৃত। মাদকতা নিবারণের ভার এখন ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করুন। সামঞ্জসীভূত জীবন যাপন (Complete Living) এর ভাব ব্রাহ্মগণই প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ও পাপ প্রসবিনী সুরা রাক্ষসীর সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করুন। ঈশ্বরের এই প্রিয় কার্য্য তাঁহারা করিবেন না, তো আর কে করিবে?

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, বি, এ।

সনাতন ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

কাশীমিশ্রের বহির্ব্বাটী।

পিণ্ডার উপরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তবৃন্দ

নিম্নে প্রণতঃ হরিদাস, দূরে ভূমিষ্ঠ সনাতন।

শ্রীগৌ। দূর হ'তে ভক্তি ভরে
কে আমারে হরিদাস করিছে প্রণাম?
অতি শীর্ণ দেহ, পীড়িত কি কেহ?
মুখ খানি আহা বড় ম্রিয়মাণ!
চেন কি উহারে হরিদাস?
মুখ দেখে মনে হয় দেখেছি কোথায়,
কিন্তু পরিচিত হয় না বিশ্বাস;
সনাতন—আছে বৃন্দাবন,
ঠিক যেন তাঁহারি মতন।

হরি। প্রভো ঠিক তাই বটে!
এসেছেন কাল সিন্ধু তটে—
আমার কুটীরে।
উপবাসে, দীর্ঘক্লেশে, পথ পর্য্যটনে,
দেখিলাম মূর্চ্ছিত শরীরে,

দাঁড়ায়ে বাহিরে—
অশ্রুধারা দু নয়নে!
কণ্ডুরস গায়, চেনা নাহি যায়,—
অতি শীর্ণ কায়।
বৈষ্ণবের বেশ দেখে,
ধরিলাম যেই বুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
চিনিতে হ'ল না দেরী সনাতন বলি—
বুঝিলাম একটী লক্ষণে;
সিদ্ধ দেহ যদিও মূর্চ্ছিত,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
হৃৎপিণ্ড পূর্ণ জাগরিত!
কর্ণ দিতে বুকে, শুনিলাম সুখে,
"জয় গুরু শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়!"
উঠিতেছে পুণ্য ধ্বনি ভরিয়া হৃদয়!
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণ ধন কে আছে এমন,
জীবনে মরণে, বৈষ্ণবের গণে—
বিনা রূপ সনাতন্?

শ্রীগৌ। দীন হতে অতি দীন, তারা দুটী ভাই,
গণ্ডিতের শিরোমণি—
কিন্তু কি সহিষ্ণু! কি বিনয়!
তৃণাদপি সুনীচ যা,
মূর্ত্তিমান্ যেন তাহা,
কি কঠোর বৈরাগ্যের ব্রত!
অচল অটল—সাধনাতে
ঠিক যেন পাষাণের মত।

হরি। কণ্ডুময় কায়, লাগে কারও গায়,
সেই ভয়ে সিংহদ্বারে—শীতপথে না করি গমন
তপ্ত বালুকায় চলা নাহি যায়,

স্থানীয় বিষয়।

কুশদহ শাখা-কার্য্যালয়ে পাঠাগার। গোবরডাঙ্গা কুশদহ শাখা-কার্য্যালয়ের সংশ্রবে একটী পাঠাগারের সূত্রপাত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র পত্রিকা উপস্থিত থাকে, সকলে বিনাব্যয়ে তাহা পাঠ করিতে পারেন।

কুশদহ পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হইতে কবিরাজ শ্রীকালীপদ বিশারদ উক্ত পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করায় স্বভাবতঃ শাখা-কার্য্যালয়ের এবং পাঠাগারের কার্য্য সম্পাদন করা "শান্তিনিকেতন ঔষধালয়ের" সংশ্লিষ্টভাবে তাঁহারই প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, তিনিও নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজ বলিয়া এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে তাহা নিয়মিতরূপ পাঠ করিলে, জ্ঞান সংস্কারাদি সম্বন্ধে অনেক উপকার লাভ করা যাইতে পারে। ঈশ্বর কৃপায় সহজভাবে এই পাঠাগারটী যেমন সংস্থাপিত হইয়াছে বর্ত্তমানে যাঁহারা এইস্থানে পাঠ করিতেছেন তাঁহারা উহাকে নিজের বস্তু মনে করিয়া নিজ নিজ জ্ঞান সংস্কারের উন্নতি সাধনার্থে সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া যাহাতে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটীকে স্থায়ী ও পর পর উন্নত করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

খাঁটুরা রিডিং রুম। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সংপ্রতি খাঁটুরা স্কুলবাটীর পার্শ্বের ঘরে একটী রিডিং রুম "পাঠাগার" স্থাপনে উদ্‌যোগী হইয়া খাঁটুরা নিবাসী কোন সদাশয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে কতকগুলি সংবাদ পত্রাদি সংস্থান করিয়া দিতেছেন। যাহাতে এই প্রমুক্ত বায়ু সমাগম স্থানে বসিয়া সকলে সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মাষ্টার মহাশয় এই রিডিং রুমের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দেশের কোন একটী সৎকাজ ব্যক্তিবিশেষের শুভবুদ্ধির দ্বারায়

উৎপন্ন হইতে পারে—তজ্জন্য সেই ব্যক্তিবিশেষের যত্নও অধিক হইতে পারে, তথাপি তাহাকে কার্য্যকরী এবং স্থায়ী করিতে হইলে পাঁচখানি হাত একত্র করিতে হয়, বিশেষতঃ এই পাঠাগার সাধারণের জন্য, সুতরাং খাঁটুরা, হায়দাদপুর নিবাসী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই এ কাজে যোগদান করা আবশ্যক।

খাঁটুরা স্কুলগৃহে পাঠাগার, স্থান সম্বন্ধে অত্যন্ত উপযোগী হইতেছে। খাঁটুরা হয়দাদপুর উভয় গ্রামের পক্ষে এই স্থান সাধারণ। স্কুল প্রাঙ্গনে যেমন ছেলেদের খেলার ভূমি, শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে তেমন জ্ঞান ও নীতির উৎকর্ষ সাধনও আবশ্যক, তৎপক্ষে এই পাঠাগারটী স্থায়ী হইলে সম্ভবতঃ এই উভয় গ্রামের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং গ্রামস্থ ভদ্রব্যক্তিমাত্রেরই এই কার্য্যে যত্নশীল হওয়া উচিত।

যে সকল উর্দ্ধতন বংশ অধঃপাতে গিয়াছে তাহারা যে কোন সদৃষ্টান্তে আসিবে এমত সম্ভাবনা দেখা যায় না। তন্নিম্নস্থ বালকগণের হিতার্থে প্রত্যেক পিতামাতা অভিভাবকের চেষ্টা করা উচিৎ।

বালিকাবিদ্যালয়ের অভাব। গোবরডাঙ্গায় যে একটী পাঠশালা আছে তাহাতে ১০।১১টী বালিকা ছাত্রীও আছে। কিন্তু বালকদিগের সঙ্গে একই শিক্ষক দ্বারা, উভয় প্রকৃতি—উপযোগী, অথচ যাঁহার প্রধান লক্ষ্য বালকদিগের প্রতি—তাঁহার দ্বারা বালিকার শিক্ষা হইতে পারে না। বালিকা-দিগের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষয়িত্রীর দ্বারায় শিক্ষা হওয়াই বিহিত। অভাবে বিশিষ্ট সৎপ্রকৃতি এবং বালিকাগণের শিক্ষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক হওয়া আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে আমরা একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াও শিক্ষক অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এক্ষণে একটী উপযুক্ত স্থানীয় শিক্ষকের সন্ধান পাইয়া এবং একার্য্যে গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এজন্য আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমহোদয়-গণকে জানাইতেছি, যে অন্ততঃ বর্ত্তমানে যাঁহারা ঐ বালক পাঠশালায় বালিকা প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা একটু উদ্‌যোগী হইলে একটী সতন্ত্র বালিকাবিদ্যালয় হইতে পারে।

মিউনিসিপাল বজেট। ১৯০৯।১০ সালের নূতন এ্যাসেস্‌মেণ্টে যেমন কর বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমন ব্যয় সম্বন্ধে বজেট হইয়াছে কিন্তু বজেট এখন পাস হয় নাই। যেমন আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তেমন ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে এসকল তত্ত্ব মিউনিসিপাল সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সাধারণে যদি দেখে এবার অতিরিক্ত কিছু কাজ হইয়াছে যাহাতে অবশ্য ব্যয় 'বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা হইলে যাহারা কষ্টেসৃষ্টে ট্যাক্স দেয় তাহারাও সন্তুষ্ট থাকে।

যমুনার স্নানের ঘাটের রাস্তা। যমুনার স্নানের ঘাটের যে সকল ছোট ছোট রাস্তা আছে, বিশেষতঃ ষষ্ঠিতলায় পুরাতন ঘাট পরিষ্কার অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া যাওয়ায় তৎসঙ্গে রাস্তাটীও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে পূর্ব্ব পার্শ্বে যে ঘাট বহতা আছে তাহার রাস্তায় কখন একমুষ্ঠী খাব্‌রা দিতে দেখা যায় না। শোনা যায় তথাকার ব্যবসায়ীগণ কখন ঐ রাস্তায় খাবরা দিয়াছিলেন, তাই অদ্যাপি চলিতেছে, এবং তাঁহাদের ও অপরাপর মাল আমদানি রপ্তানী হয়। যে ঘাট স্ত্রীলোক এরং পুরুষের স্নানের ঘাট, সে ঘাটে যথন মাল আমদানি রপ্তানী হয় তখন, ঘাটের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত জল ঘোলা হয় এবং গাড়ির ভিড়ের ভিতর দিয়া স্ত্রীলোকদিগের যাতায়াত যে কি কষ্টকর হয়, তাহা কে দেখে। এটী কি দেশের গৌরবের কথা? ওয়াড কমিশনারগণ কেন যে এমন অমনোযোগী, এ কি দেশের বাতাসের দোষ! এই ছোট রাস্তা কয়েকটী ও ঘাট পরিষ্কার করিতে কি এতই ব্যয় হয়।

খাঁটুরা ব্রাহ্মমন্দিরের উত্তর কাঁচা রাস্তা। খাঁটুরা ব্রাহ্মমন্দিরের উত্তর দিয়া পশ্চিম মুখে যে রাস্তাটী গৈপুর ইছাপুর পাকা রাস্তায় মিলিয়াছে, ঐ রাস্তা প্রথমে ৺গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে বহুদিন হইল ঐ রাস্তা মিউনিসিপালিটীর হাতে আসিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাস্তাটীতে খাব্‌রা পড়িল না, বর্ষার কাদায় ভদ্রলোকদিগের জুতা খুলিয়া যে কষ্টে যাতায়াত করিতে হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ট্রেণে যাতায়াত জন্য বহুলোকের ঐ পথে চলিতে হয়।

ফলে এবারকার বজেটে এইরূপ একটা অতিরিক্ত ব্যয়ের কিছু থাকিলে যেন ভাল হইত।

কুশদহের বর্ষ পূর্ণ।

ঈশ্বর-কৃপায় "কুশদহের" এক বৎসর পূর্ণ হইল। যে সময় কুশদহ প্রচারের ইঙ্গিত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসময়েই কার্য্যারম্ভ বশতঃ বাঙ্গালা কিম্বা ইংরাজি বৎসর আরম্ভের সঙ্গে সংযোগ ঘটে নাই। বৎসরের মধ্যস্থ আশ্বিন মাসে আরম্ভ হইয়া সুতরাং বর্ত্তমান ভাদ্রমাসে বর্ষ পূর্ণ হইল।

ভগবৎ প্রেরণায় যে কুশদহ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম সংখ্যায় "বন্দনা ও প্রার্থনায়" ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ প্রভু পরমেশ্বর আমা-দিগকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। যে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহা আমাদের সাধ্য ও শক্তিতে নহে। নিরাশার দিনে বার বার তাঁহার দয়ার প্রকাশ দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। প্রধানতঃ কুশদহ মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্যে যেপ্রকার অর্থাভাব ঘটিয়াছে তাহার মধ্যেও একমাত্র তাঁহারই করুণায় সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে।

এইরূপে ভগবদ্‌করুণা ও বিশ্বাসের গূঢ় রহস্যের কথা আমরা কেন বলি-তেছি? একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা জানি "কুশদহ" একখানি স্থানীয় ক্ষুদ্র পত্রিকা, বড় বড় পত্রিকার সহিত ইহার প্রতিযোগীতা করার কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহাতে অনেক ত্রুটীও আছে বিশেষতঃ আমরা কুশদহ সম্বন্ধে যে সকল কর্ত্তব্যবোধ পোষণ করিতেছি, এবৎসরে তাহার কিছুই সাধন করিতে পারা যায় নাই। তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এই অল্পদিনের মধ্যে কুশদহের কতকগুলি ধর্ম্মানুরাগি ঈশ্বরবিশ্বাসি গ্রাহক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্ততঃ একথা তাঁহাদের জন্য বলিবার প্রয়োজন আছে। কুশদহ একখানি সামান্য পত্রিকা হইলেও ইহা "বিশ্বাসসূত্রে" প্রকাশিত। বিশ্বাসিগণ বিশ্বাসের কথা শুনিতে বড় ভাল বাসেন, তাই এই আভাসটুকু দেওয়া হইল। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

———

"আমার জন্মভূমি।"

আমি দেখিতেছি, আমার জন্মভূমি ম্যালেরিয়ায় দিন দিন মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। আমি জানি আমার জন্মভূমি পল্লিগ্রামে, এখানকার লোকের মনের ভাব অতি সংকীর্ণ রকমের। সকলে আপন আপন স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, প্রতিবাসী পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব অতি অল্প, অধিকন্তু হিংসা দ্বেষ বিবাদে পূর্ণ। এখানকার নারীসমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁহাদের মধ্যে পারিবারিক উচ্চ কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকাশ হয় না। সুতরাং তাঁহারা পুরুষের কোন উচ্চভাব সাধনে, সহায় না হইয়া সাধারণতঃ কেবল সাংসারিক মায়ামোহ বৃদ্ধি করেন। তারপর ভবিষ্যৎ বংশ বালক ও যুবকদলও প্রায় বিপথগামী; তাঁহাদের শিশু-হৃদয়-ক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কারের বীজ, মাতৃস্তন্যের সহিত উপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনুকূল (সমাজ, সঙ্গ, শিক্ষাদি) জল বায়ু আলোকাদি পাইয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। বালিকাগণের কথা আর কি বলিব? তাহারাও ত বর্ণবোধশূন্যা; যাহারা ভবিষ্যতে গৃহিণী হইবে, তাহারা শিক্ষাহীনা। এইরূপে যেদিকে দেখা যায় প্রায় সন্তোষজনক দৃশ্য কোনটাতে দেখা যায় না, তথাপি আমার জন্মভূমি। আমি আমার জন্মভূমিকে ভালবাসি। কেন ভালবাসি তাহা বলিতে পারি না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মাকে কেন ভালবাসি তাহা যেমন জানি না, তদ্রূপ আমার দেশ আমার প্রিয়। স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ যখন বলেন, "এ দেশ, এ জাতির কিছু হবে না" এ নিরাশার কথা শুনিলে বড় দুঃখ হয়। দেশের উন্নতি বা অবনতি কি হবে সে ভাবনা আমরা করি না, জগৎকর্ত্তা ভগবানের হাতে সে ভার, কিন্তু আমি যে দেশের মাটিতে জন্মিয়াছি সে দেশ আমার দেশ, আমার প্রিয় স্বদেশ ও স্বজাতি।

জগতের কোন বস্তু নিখুত নহে। ব্যক্তিগত কিম্বা জাতিগত দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও আমার দেশ আমার জাতি আমার চিত্তাকর্ষক। অবশ্য স্বদেশ-প্রীতি বলিতে কেবল মাটিকে ভালবাসা নহে, কিন্তু মানুষকে ভালবাসা; জাতিকে ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসা যে বড়ই কঠিন, তাহা যে সহজে হয় না? প্রেম ভক্তির অভাবেই ত মানবসমাজ শ্মশানতুল্য হইয়াছে, এ প্রেম ভক্তির মূল

কোথায়? আমরা যে অভক্ত হয়ে দুস্কৃতির পথে চলিয়াছি, যিনি ভক্ত তিনি সকল বিষয়েই ভক্ত। ভক্ত কে? যিনি ঈশ্বরভক্ত তিনিই প্রকৃত ভক্ত। ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত যে ভক্তি তাহাতে ত্রুটী প্রকাশ পাইবেই পাইবে। সুতরাং তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। যিনি ঈশ্বরভক্ত তিনি মাতৃ, পিতৃ, স্বদেশ ও স্বজাতি এবং রাজভক্ত। ঈশ্বরভক্তির সহিত সকল প্রকার ভক্তি ও প্রেম, প্রীতি ভিন্ন আকারে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকিবেই। তাই আমাদের বিশ্বাস, মানবজীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের তুল্য অমূল্যধন আর কিছুই নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা যদি স্বদেশপ্রেম, "আমার জন্মভূমি" এই অহেতুকী প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে তাহাতে কোন ব্যাভিচার ঘটিবে না। ইহাতে স্বদেশ-প্রেম থাকিবে কিন্তু বিদেশ বিদ্বেষ থাকিবে না। এই ভাবে স্বদেশসেবা সে কেবল নিজের সাধন ও সিদ্ধির অবলম্বন। রজঃগুণ শূন্য জনসেবা নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করে, কখন তাহা ব্যর্থ হয় না। জয় দয়াময়।

ধর্ম্ম-ইতিহাসে দুইটি চিত্র।

এ দেশের ধারাবাহিক ধর্ম্ম-ইতিহাসে দুইদিকে দুইটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, নির্গুণ ও সগুণবাদ, নিরাকার ও সাকার ভজনা।

হিন্দুধর্ম্মের আদি শাস্ত্র বেদ। বেদের বাল্যভাব, সরলভাব দেবতায় স্তব-স্তুতি। বেদের দেবতা পুরাণের দেবতা নহে, কিন্তু জল বায়ু অগ্ন্যাদি জড় শক্তির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া এক এক দেবতাবোধে তদুদ্দেশে স্তব স্তুতি ও পার্থিব কামনায় প্রার্থনা। এইটি ভাবের বা ভক্তির চিত্র। তৎপরে উপনিষদ, জ্ঞানের চিত্র, যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বের বিকাশ। উপনিষদ বেদের অন্তভাগ জন্য তাহার আর একটি নাম "বেদান্ত।" বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যে, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা নাই, মায়াদৃষ্টিতে জগৎ জ্ঞান হয়, জগৎ অবস্তু, রজ্জুতে সর্প ভ্রমতুল্য। "ঘটাকাশ পটাকাশ" সেই এক মহাকাশ মাত্র। আত্মা ও পরমাত্মা একই বস্তু, মায়াদৃষ্টিতে জীবাত্মার পৃথক সত্তা বোধ হয় মাত্র। এই জ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান, ইহার শেষ পরিণতি, "অদ্বৈতবাদ" ও "মায়াবাদ"।

বহুকাল জ্ঞানের সাধনায় ধর্ম্মজগত আর একটি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই নির্গুণ, নিরঞ্জন, অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেবল স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মা রূপে এবং বহির্জগতে শক্তিরূপে দেখিয়া আর তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, সাধকশ্রেণী তখন পরমেশ্বরের লীলা দর্শনে অভিলাসী হইলেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ভগবান নররূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন জগৎ কিছুই নহে, ইহাই মায়াবাদের মূলসত্য, কিন্তু জগৎ বাস্তব অবস্তু হইলে তাহাতে ঈশ্বরের লীলা সম্ভবে না সুতরাং এই অসত্যের যেন অজ্ঞাত প্রতিবাদ স্বরূপ ঐভাব বা মতের উদয় হইল; তখন উত্তম পুরুষে পরমাত্মার প্রকাশ দর্শন হইল। প্রথমে কপিলাদিমুনিতে ক্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে; এই যুগ অবতারবাদের যুগ বা পৌরাণিক যুগ, ইহাও প্রধানতঃ ভক্তির চিত্র।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তৎপরে তন্ত্রে মাতৃভাবের সাধন; বেদে ঐশী শক্তি, বেদান্তে, জ্ঞানময় পরমাত্মা, পুরাণে উত্তম পুরুষ, এই উত্তম পুরুষে পতিভাবের সাধন পর্য্যন্ত হইয়া তন্ত্রে মাতৃভাবের প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাও ভক্তির চিত্র।

ইত্যবসরে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব উদয় হইয়া একটি জ্ঞানের চিত্র প্রকাশ করিলেন। জগৎ মিথ্যা এবং জগৎ দুঃখময়, যে দুঃখ দূরের উপায় নির্দ্ধারণে পর পর ছয় প্রকার দার্শনিক তত্ত্বের (ষড়দর্শন) আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছিল। রাজকুমার বুদ্ধদেবও জগতে জরা মরণ ব্যাধি, দুঃখের এই তিন প্রকার অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসী হন। এবং গভীর সাধন দ্বারা নির্ব্বাণ তত্ত্ব লাভ ও প্রচার করেন। তিনি বলিলেন, জগতে দুঃখ আছে তাহা সত্য; দুখের কারণও সত্য, দুঃখ দূর করা যায় ইহাও সত্য। দুঃখের কারণ বাসনা, গভীর জ্ঞানের সাধনে বাসনা দূর করা যায়, বাসনা ত্যাগ নির্ব্বাণ প্রাপ্তি প্রায় একই অবস্থা। তিনি যে সত্য দেখাইলেন, ইহাও জ্ঞানের চিত্র।

"এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা নাই", এই সূত্র হইতে যে অদ্বৈতবাদও মায়াবাদ, তাহার স্রোত ফিরাইলেন, রামানুজ স্বামী। তিনি বলিলেন, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ এই তিনেরই পৃথক সত্তা আছে, ব্রহ্ম স্বয়ং, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম সাপেক্ষ, ব্রহ্ম শক্তিতেই জীব ও জগতের উৎপত্তি স্থিতি সকলই, কিন্তু জীবের

স্বাতন্ত্র্য আছে, জীবও নিত্য; নিত্য ভগবানের সঙ্গী, জীবাত্মার ধ্বংস কখন হইবে না। অবিনাশী ভগবান হইতে অবিনাশী জীবাত্মা প্রবাহ। জীব যদি নিত্য না হয়, আজ আছে কাল নাই (যাহা শরীরের স্বরূপ) তাহা হইলে জগৎ কার্য্যও সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব ভগবান আমাদের সঙ্গে লীলা করিতেছেন, জীবাত্মা পরমাত্মার লীলার নিত্য সঙ্গী ও তাঁহার নামগুণানু-কীর্ত্তনে যে পরমানন্দ তাহাতে পৃথিবীর কোন দুঃখই অধিক বোধ হইতে পারে না। প্রধানতঃ এই খানে ভক্তির আরম্ভ এই ভক্তি শ্রীচৈতন্য দেবে নিতান্ত পুষ্ট।

এই সময় বঙ্গদেশ অপেক্ষা কঠিন মাটীর দেশ পঞ্জাব ক্ষেত্রে গুরু নানক জ্ঞানের চিত্র মূলে লইয়া ভক্তিভাবে নিরঙ্কার এক অদ্বিতীয়ের ভজনা প্রবর্ত্তিত করেন। যেমন তাঁহার ধর্ম্মের যোগ-ভক্তি মিশ্রভাব ছিল, তদ্রূপ সামাজিক চিত্রেও হিন্দু মুসলমানকে এক করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে তৎ শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা শিখসমাজ গঠিত হয়। শিখধর্ম্মে ত্যাগ বৈরাগ্যের সঙ্গে ধর্ম্মার্থে যুদ্ধ বিগ্রহও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধ ভিন্ন তাৎকালিন এই নব-ধর্ম্ম-মণ্ডলীর রক্ষার উপায় ছিল না।

রামানুজ স্বামী প্রবর্ত্তিত "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং দ্বৈতবাদ—ঈশ্বরের সঙ্গে সেব্য সেবকভাব অজ্ঞাতসারে ঐ উভয় ধর্ম্মের ফল বলা যায়।

জ্ঞানের চিত্র; সত্য, স্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত নির্ব্বিকার বিশুদ্ধস্বরূপের ধ্যান, যোগ, সমাধি। ফল একাত্ম লাভে ভূমানন্দ সম্ভোগ; সাধনোপায়, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস।

ভক্তির চিত্র; সেব্য সেবকভাবে গুণময়, সাকার, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভগবানের সেবা ও জীবসেবা। ফল ভক্তি, সেবানন্দ ভজনানন্দ।

বহুকাল ভারতে জ্ঞান ও ভক্তির অসম্মিলনে ও সংঘর্ষে "ক্রমাভিব্যক্তির" নিয়মে বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসমন্বয় হইল। যাহার মূলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিত্র, কিন্তু অজ্ঞেয় ও নিগুর্ণবাদ পরিত্যক্ত। জ্ঞান দৃষ্টিতে সাকার খণ্ডভাব বর্জ্জিত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ভক্তিতে ভজন সাধন। মায়াবাদ দূরে গেল। ভিতরে ত্যাগ বৈরাগ্য বাহিরে তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম করা, আত্মদেশের সেবা পরমসুখ

কর কার্য্য, সে কার্য্যে শুষ্ক কর্ম্ম-ফল-বাদ বা সকামকর্ম্ম খণ্ডিত হইয়াছে। আদিষ্ট কর্ম্মসাধনে নিবৃত্তি ও শান্তি প্রাপ্তি হয়,—কিন্তু নিষ্ক্রিয় হইয়া হয় না। ঈশ্বর আদেশে যে কর্ম্ম তাহা সকল অকর্ম্ম নাশক এবং আত্মার পোষক।

জ্ঞানযোগ ও গভীর বিশ্বাসযোগে সর্ব্বময় সর্ব্বগত নিরাকার সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার আদেশ বাণী শ্রবণ, ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিশেষত্ব। একান্ত বিশ্বাস ও সরল প্রার্থনা তাহার সাধন উপায়।

প্রায়শ্চিত্ত।

কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট।

সুবুদ্ধি রায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবেশ।

সুবু। প্রণাম করিয়া,
ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে—
শ্রীগৌরাঙ্গ। পাইয়াছি এ সংবাদ
রামকেলি গ্রামে, সনাতন স্থানে
(স্মিতমুখে) বলিয়াছে সনাতন
করেছ কল্পনা তুষানলে ত্যজিবে জীবন।
সুবু। প্রভো! প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হবে।
হিন্দু আমি—আর্য্য বংশোদ্ভব
প্রাণত্যাগে করি নাক ভয়;
অচ্ছেদ্য অভেদ্য মানবাত্মা
জানি আমি ইহাও নিশ্চয়;
জানি আমি জীর্ণ বস্ত্র মানব শরীর;
প্রভো! প্রভো! কি করি কি করি!
প্রাণ মোর বড়ই অস্থির!

যেই কর্ম্ম ফলে এ দুর্গতি ঘোর
ঘটিয়াছে মোর
ঘৃণ্য এই কলেবরে,
প্রভো! প্রভো! ঘৃণ্য এই কলেবরে
ঘৃণ্য ঘৃণ্য (ক্রন্দন)

শ্রীগৌ। "বিলাপ সম্বর রায়,
যাও বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তব সব দোষ যাবে।
আর নাম করিতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে ॥"
এ সংসারে কৃষ্ণ নাম অমৃত সমান
বাঁচে মরা—শুষ্ক তরু হয় ফলবান্।
পেয়েছ দুর্লভ জন্ম নরজন্ম রায়
সহস্র কর্ত্তব্য তব মুখ পানে চায়;
বিষয়ের মদে হরিধনে ছিলে ভুলে,
হরিরচরণ দুটি লও আজ বুকে তুলে।
বিবেকের তুষানল জ্বালি দাও বাসনায়,
পরিতাপ তপ্ত ঘৃত ঢেলে দাও রসনায়,
কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠে দাও স্বার্থ বলিদান,
"তবাস্মি" এ পূত মন্ত্র
আজ হ'তে কর ধ্যান;
সেবার কাঙ্গাল হয়ে
কার্য্যক্ষেত্র বেছে লও
হরি হরি হরি বলে,
বিপন্নের মুখে চাও!
করি পরিত্যাগ স্বসুখ বাসনা,
কর রায় প্রাণপণে মাতৃভূমি আরাধনা
নরসেবা—পশুসেবা—দেব-উপাসনা

প্রায়চিত্ত এর নাম—
একমাত্র ইহাতেই হয় নর পূর্ণকাম।

সুবু! প্রভো! প্রভো! কর আশীর্ব্বাদ!
বলে দাও দয়া করে
কোথায় যাইলে পরে
পুরে চিরতরে অধমের মনোসাধ?

শ্রীগৌ। মথুরার পথে গিয়া
কর রায় অবস্থান—
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে—মনে জেন
মার যত্ন হয় সমাধান।
তুচ্ছ নহে, ঘৃণ্য নহে, মানবজীবন
এ জগতে দীন যারা—
ঘৃণ্য নহে কভু তারা
তারা মহাজন!
আর্য্যদেশে আর্য্যধর্ম্ম নহে শুধু
পণ্ডিতের তরে—
বেদান্ত, পুরাণ, ন্যায় সাংখ্য বেদগান
কয় জন জানে? কয় জন পড়ে?
পড়ে নাক যারা মলিন বসন পরা
অগণ্য অসংখ্য তারা
ভারতের—স্বদেশের প্রাণ—
দাঁড়াইয়া আছে দূরে
ঘৃণ্য তুচ্ছ নীচ চাষা,
শূদ্র ব'লে কিম্বা যারা চিরদিন হতমান।
তাদের সেবায়—দিয়েছি সঁপিয়া কায়
লয়েছি সন্ন্যাস—
তুমি রায় কর সে সেবায়
আজি হ'তে যোগদান।

প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও জন্মভূমি পাশ!
দুঃখী নরনারী যত—যে যেখানে আছে,
তোমার কর্ত্তব্য রায়
আজ হ'তে তাহাদের কাছে।
দীনহীন সেবাভার নিজ স্কন্ধে লবে,
অমানী হইয়া রায় সবে মান দিবে।
"গ্রাম্যকথা না কহিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে,
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে,
ব্রজের রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে!"
যাও রায় মথুরার পথে গিয়ে
কর অবস্থান—
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে
মনে রেখ মার যজ্ঞ হয় সমাধান।

সুবু। শ্রীচরণে দিও স্থান চলিনু বিদায়
লভিয়া এ প্রাণস্পর্শী
উপদেশ মধুময়।

শ্রীগৌ। যাও রায় হইবে কল্যাণ।

সুবু। সংসারের পরিত্যক্ত
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে—দেখ প্রভো!
মার যজ্ঞ হয় যেন সমাধান।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

ফুস্‌ফুস্‌ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের উন্নতি। *

স্বাভাবিক যাহা তাই পরিমিতাচার ;
কৃত্রিম সাধনা দেহে জন্মায় বিকার।
পরন্তু স্বভাব আর মানব সুকার্য্যে
আছে বার্ত্তাবহু পূর্ণাপূর্ণ তত্ত্ব রাজ্যে।
যথাযথ ভাবে তাহা করিলে সাধন
সিদ্ধ হয় মনোরথ মঙ্গল কারণ।
নিয়ন্তা—নিয়ম এই ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়
লঙ্ঘন করিলে তাহা আনে মৃত্যুভয়।
কি শ্বাস প্রশ্বাস আর শরীর রক্ষণ
ভূতে চিতে মাখামাখি সৃজন কারণ।
কেবল ভূতার্থ লয়ে হয় না সাধন ;
ফলিতার্থ তত্ত্বক্ষেত্রে আছে নিরূপন।
স্মর জীব-নাথে শুদ্ধ থাকহ সতত
প্রাণায়ামে পাবে বল স্বাস্থ্যসুখ যত।

পরিব্রাজক।

বিবাহ সংস্কার।

হিন্দুসমাজে যে কত রকম জাতি আছে তা ঠিক করা সহজ নহে। এক এক জাতির মধ্যে কত রকম থাক্, মেল ইত্যাদি আছে। তার মধ্যেও অবস্থা অনুসারে উচু নীচু ভাবের চা'ল চলন রীতি পদ্ধতি কত ভিন্ন। এ সমস্ত নিয়ে হিন্দুসমাজ, কাজেই পুরাতন হিন্দুসমাজটা কত বড় ও কত রকমের।

---

* "কুশদহ" পত্রিকায় শ্বাসপ্রশ্বাসের উন্নতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিয়াছে তাহা শুভদায়ক মনে করিয়া এই কবিতা রচিত ও প্রেরিত হইল।

যদি কোন জিনিষ ভাল হয় বা মন্দ হয়, একেবারে একদিনে হয় না, কতকটা কোরে হয়। তাই আজ কাল যাঁরা সভ্য হচ্চেন বিদ্বান হচ্চেন তাঁরা আপনাদের সামাজিক পদ্ধতিও একটু একটু কোরে সংস্কারের চেষ্টা কচ্চেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের মধ্যে বিদ্বান সভ্য যাঁরা, তাঁরা সেকালের "অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ফল" কামনা ছেড়ে দিয়ে সচরাচর ১৩।১৪ বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দিচ্চেন। কিন্তু এখনও ঐ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই পাড়াগাঁয়ে এমন অবস্থা আছে, যাঁরা ৫।৬ বছর না পার হ'তেই মেয়ের বিবাহ দেন। কয়েকটা প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান আছে, যার উপর মানব-জীবনের উন্নতি অবনতি খুব নির্ভর করে। তার মধ্যে বিবাহ একটা প্রধান।

কোন কোন সমাজের বিবাহপদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি অহিত নিয়ম বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাঁরা সে সকল বিষয় ঠিক ভেবে দেখেন না। এমন যে অসভ্য কোল, ভীল সাঁওতাল জা'ত, যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও স্বভাবের নিয়মে বিবাহ সম্বন্ধে অনেক সু-নিয়ম দেখা যায়। ছোটবেলা বিবাহে যে মানুষের অনেক অনিষ্ট হয় কেবল তা নয়, মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্বজ্ঞান ও সংসার প্রতিপালনের উপযুক্ত ক্ষমতা না হ'তে বিবাহে প্রতি নরনারীর পক্ষে বা সমাজের পক্ষে, কতদূর অনিষ্টকর, তা একটু স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

হিন্দুর বিবাহ যে আধ্যাত্মিক বিবাহ এ ভাব মলিন হয়ে গেছে; প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ অনুষ্ঠান সাংসারিক ভাবের হয়ে দাঁড়িয়েছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনং" এই বাক্যই আদর্শ হয়েছে। উহাও শাস্ত্র বাক্য হ'লেও অনেক আধুনিক কথা, আত্মার জন্য বিবাহ এটা একরকম উপহাসের বিষয় হয়েছে বল্লে, বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আত্মা কথাটা জনসমাজ হ'তে একরকম উঠে যাচ্ছে শরীরসর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঈশ্বরকৃপায় আমাদের মধ্যে জাতীয় উন্নতির একটা আকাঙ্ক্ষা এসেছে। সেটা কিসে সফল হ'তে পারে, তার জন্য কতজনে কত রকমে ভাব্‌ছেন। আমরা বলি, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা যাহাতে অধিক হয়, তাহা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অনুকূল। তাহা কিরূপে হ'তে পারে? শরীর

পোষণোপযোগী খাদ্য, পরিপক্ক বয়সের সন্তান, এবং চরিত্রবান হওয়া আবশ্যক। বাল্যবিবাহ এই তিন অবস্থারই বিরোধী। উপার্জ্জনের ক্ষমতা না হ'তে বিবাহে সমাজে দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। অপক্ক বয়সের সন্তান দীর্ঘায়ু ও মেধাবী হয় না, অসময়ে বিবাহে শিক্ষার অভাবে চরিত্রবান হইতেও পারে না। আমরা একথা বল্‌ছিনা যে বাল্যবিবাহ নিবারণ জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়, কিন্তু তাহাতে যে অনেক অনিষ্ট নিবারণ হবে তাতে আর সন্দেহ নাই; এমন কি, ঐ মারাত্মক কুপ্রথা নিবারণ না হলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। যাঁরা এই প্রথা পরিত্যাগ করে উন্নতিকর প্রথা অবলম্বন করেছেন, (যেমন ব্রাহ্মসমাজ,) তাঁদের মধ্যে দারিদ্র্য কম, অন্যান্যবিষয়েও অপেক্ষাকৃত উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্র সমান হিন্দু-সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কতটুকু? তথাপি আমরা দেখ্‌ছি প্রায় সকল উন্নতিকর ব্যাপারের মূলে ব্রাহ্মসমাজের বা ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক। যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তে একটু একটু করে ছেলে মেয়ের বিবাহের বয়স বাড়াচ্ছেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শিক্ষাও দিচ্ছেন, তাঁরা হিন্দুসমাজে উন্নত। আমরা ইহা বলিনা যে কেবল বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিলে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে; শিক্ষা, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্ম্মের বন্ধন যদি পরিবারে না থাকে বাল্যবিবাহ নিবারণ হওয়া অসম্ভব।

যাঁরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন নাই, তাঁরাই মনে করেন বাল্যবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অকাট্য বিধি, কিন্তু যাঁরা প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা জানেন, যে বিধিশাস্ত্র চিরবদ্ধ নহে, কালে বা যুগে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। সম্ভবতঃ মুসলমান শাসনকালে বাল্য-বিবাহ প্রবল হয়েছিল, কেন না তখন জাতি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই বিধি আবশ্যক হয়েছিল।

কুশদহের মধ্যে যত রকম জাতি ও সমাজ আছে তার অধিকাংশ অনুন্নত। সুতরাং অধিকাংশস্থলে শিশুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ এখনও প্রচলিত।

খাটুরা গোবরডাঙ্গার তাম্বুলী জাতির সামাজিক উন্নতির জন্য "তাম্বুলীসমাজ" নামে একটি সভা আছে, তাহাতে "জীবন্ত ভাবের" উন্নতিকর কোন আলোচনার কথা শোনা যায় না। ঐ সমাজের নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও আছে, তাহার নিয়ম এমনি অনুদার যে তাহা কোন পত্রিকার সহিত বিনিময় করা

হয় না। ঐ সভা যদি একটু উদারভাবে স্বীয় সামাজিক কুরীতি সকল দূরের চেষ্টা করেন তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাম্বুলীসমাজের অবস্থা ফিরিতে পারে।

স্থানীয় বিষয়।

গোবরডাঙ্গার বাজারে অত্যাচার। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, গোবরডাঙ্গার বাজারে, বাজারের সময়, জমীদার বাড়ীর দ্বারবানেরা, বিক্রেতাদিগের মাছ তরকারি অপেক্ষাকৃত সুলভে লইবার চেষ্টা করে। তজ্জন্য তাহাদের সঙ্গে কখন কখন বচসাও হয়, আর যাহারা ভালমানুষ, দুর্ব্বল রকমের তাহারা অত্যাচার সহ্য করে। বিশেষতঃ চাউল বিক্রয়িনি স্ত্রীলোকদিগের নিকট খুচরা চাউল লইবার সময় মাপের গোলযোগ হয়, তাহারা খুচরা চাউল (১ পালি, ৴২॥ সেরের কমে) বিক্রয় করিতে চাহে না। দ্বারবানেরা ফড়েদের নিকট খুচরা চাউল সচ্ছন্দে পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বাবু যদি এই অত্যাচার নিবারণ করেন তাহাতে সাধারণে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে।

হাতীর অত্যাচার। আমরা নিম্নলিখিতঘটনার প্রতি গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিগত ২রা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্নে আমরা খাঁটুরা স্কুল হইতে দেখিলাম, স্কুলের উত্তরেই ৺হরিবংশ হালদারের বাগানে জমীদার বাবুদের দুইটি হস্তী লইয়া মাহুতেরা প্রবেশ করিয়াছে ও বাগানের গাছপালা খাওয়াইতেছে। হরিবংশ হালদারের নাবালক পুত্র সুতরাং স্ত্রীলোকরাই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বকাবকি করিতেছেন। ইহাতে আমরা বুঝিলাম বাগানের বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করায় তাহাদের অবস্থানুসারে বড়ই ক্ষতি হইয়াছে—এইজন্য ঐরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ইহাও বলিতে শোনা গেল "আমরা গরীব অনাথা বলে কি আমাদের প্রতি এই অত্যাচার, "বড়বাবু" কি এইরূপে লোকের ক্ষতি করিতে তোদের বলেছেন, যা দেখি হরিঘোষের বাগানে," ইত্যাদি।

আমরা আরো অনেকবার এই হাতীর অত্যাচারের কথা শুনিয়াছি,

বিশেষতঃ জাম্‌দানির লোকেদের মুখে শোনা যায় "হাতীর জন্য কলাগাছ ও নারিকেল চারা আর থাকিল না।" বস্তুতঃ চারিটি হাতীর খোরাক বড় সহজ নহে। এই বিষয়ে বড়বাবু কোনরূপ ব্যবস্থা করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন। সেণ্ট্রেল বেঙ্গল রেলওয়ে, ষ্টেট রেলওয়ে হইয়া ষ্টেসনগুলির সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে। গোবরডাঙ্গা ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে প্লাট্‌ফরম, প্যাসেঞ্জারদের ঐ দিকে উঠিতে ও নামিতে হয়। কিন্তু গোবরডাঙ্গা, গৈপুর ইছাপুর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের প্যাসেঞ্জারদের লাইনের উপর দিয়া পশ্চিমদিকে যাতায়াত করিতে হয়, অথচ লাইনের উপর দিয়া যাতায়াত করিলে পুলিস সোপরোদ্দ করার নিয়ম আছে। কার্য্যতঃ কয়েকটি তাহা হইয়াছে, তবে যে দুইটি গেট আছে তাহা নিতান্ত দূরে দূরে। ব্রহ্মমন্দিরের নিকট উত্তরের গেট পার হইয়া যাইতে হইলে খাঁটুরা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হয় সুতরাং তাহা কখন সম্ভবপর নহে। দক্ষিণের গেট দিয়া যাইতেও প্রায় এক মাইল রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হয়। এমত অবস্থায় ষ্টেসনে একটি পুল করা ভিন্ন উপায় কি আছে? প্যাসেঞ্জারদিগের এই মহাকষ্ট দূর করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্র মনোযোগ করিলে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন গ্রামবাসি সকলে মিলিয়া একখান দরখাস্ত করিলে বোধ হয় শীঘ্রই ফল হইতে পারে।

পানীয় জলের অভাব। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড়ই অভাব। বিগত মার্চ্চমাসে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী কমিসনার, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি কূপ (পাৎকূয়া) ও একটি সতন্ত্র পুষ্করিণী করিতে মিউনিসিপালিটীকে উপদেশ দিয়াছেন; তাহাত এখন অনেক দূরের কথা। আপাততঃ সহজ সাধ্য দুই একটি আমাদের পরীক্ষিত বিষয় প্রকাশ করিতেছি সকলে যদি একটু আলস্য জড়তা দূর করিয়া এই উপায় অবলম্বন করেন তাহাতে অনেক উপকার পাইবেন।

পল্লীর পুষ্করিণীর জল গন্ধ হইলেও সাধারণ লোকে তাহা পান করিতে বিরত হয় না। কিন্তু তাহা না করিয়া বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান করা ভাল।

বাড়ির কোন খোলা জায়গায় চারিদিকে খুঁটি পুতিয়া একখানি পরিষ্কার কাপড় টাঙ্গাইয়া মধ্যস্থলে একটি সামান্য ভারি পাথর কিম্বা পরিষ্কার কোন জিনিষ দিয়া কাপড়ের নিম্নে কল্‌সী পাতিয়া বৃষ্টির সময় জল ধরিয়া রাখিলে, ২।৩ দিন পর্য্যন্ত পান করা চলে। অসুস্থ শরীরের পক্ষে সে জল শীতল বোধ হইলে, গরম করিয়া পুনরায় শীতল করিয়া পান করিলে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন নদী কিম্বা অপেক্ষাকৃত ভাল পুকুরের জল গরম করিয়া ফট্‌কিরি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইলে জলের বিশেষ দোষ নিবারিত হয়।

জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা এন্‌ট্রেন্সস্কুলের ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় শিক্ষক, ইছাপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদ আমরা দুঃখের সহিত পত্রিকাস্থ করিতেছি। জয়গোপাল বাবু ন্যূনাধিক ৪১ বৎসর ঐ স্কুলের কার্য্য করিয়া বৎসরাধিক কাল শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ অবসর লইয়া ছিলেন। যদিও তিনি সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু স্কুলের দায়ীত্ব একপ্রকার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার সময়ে অনেকগুলি হেড্‌মাষ্টার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দেশের যে প্রকার অমুন্নতির অবস্থা তাহাতে, তাঁহার অভাবে স্কুলের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিলেও মঙ্গলের বিষয়।

বিনিময় পত্রিকাদি প্রাপ্তি স্বীকার।

সাপ্তাহিক।

১। Unity and the minister. ২। হিতবাদী। ৩। বসুমতী। ৪। প্রসূন। ৫। পল্লীবার্ত্তা।

পাক্ষিক।

৬। ধর্ম্মতত্ত্ব। ৭। তত্ত্বকৌমুদী।

মাসিক।

৮। তত্ত্ববোধিনী। ৯। বামাবোধিনী। ১০। নব্যভারত। ১১। মহাজন বন্ধু। ১২। যুবক। ১৩। বিধানপ্রকাশ। ১৪। মুকুল। ১৫। দেবালয়। ১৬। তিলি-বান্ধব (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১।২ সংখ্যা) ১৭। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (ত্রৈমাসিক)

কুশদহের চাঁদা প্রাপ্তি। (৩ আষাঢ় হইতে)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রক্ষিত	১৲
" অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী	১৲
" কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
" গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়	১৲
" ক্ষীরোদগোপাল পাল	১৲
" চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
" বেণিমাধব ঘোষ	১৲
" কার্ত্তিকচন্দ্র দে	১৲
" একটি মহিলা	১৲
" বরদাকান্ত ঘোষ	১৲
" কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
" তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" মহিমানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
" যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১৲
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৲
" সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
" সুরেশচন্দ্র মিত্র	১৲
" কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়	২৲
" শশিভূষণ নাথ	১৲
" সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	১৲
" বলরাম মুখোপাধ্যায়	১৲
" কল্যাণকর চট্টোপাধ্যায়	১৲
" খগেন্দ্রনাথ পাল (আহিরিটোলা)	১৲
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" হরিশ্চন্দ্র বল	১৲
" রাখালদাস রক্ষিত	১৲
" হেমনাথ বন্দোপাধ্যায়	১৲
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
" হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়	১৲
" রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়	১৲
" সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য	১৲
" সুরেন্দ্রনাথ দাস	১৲
" সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী	১৲
" অশ্বিনাকুমার দাস গুপ্ত	১৲
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" ডাঃ নেয়ামতুল্লা	১৲
" বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী	১৲
" জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী	১৲
" পাঁচুকড়ি মণ্ডল	১৲
" নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় বর্ষের জন্য)	১৲
" জগৎপ্রসন্ন মিশ্র	১৲
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲

কুশদহ।

খাটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়
সম্বলিত ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও
বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক হইতে
১৩১৭ „ আশ্বিন পর্য্যন্ত।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কুশদহ কার্য্যালয়,
২৮।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুশদহর দ্বিতীয় বর্ষের সূচী।

কুশদহ।

"তোমারি তরে মা স'পিনু দেহ,
তোমারি তরে মা স'পিনু প্রাণ ;
তোমারি (তরে) আঁখি বরষিছে,
এ বীণা তোমারি গাহিছে গান।"

দ্বিতীয় বর্ষ। কার্ত্তিক ১৩১৬। ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

"কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত প্রাণ।"

হে করুণাময় বিধাতা ! তোমার কৃপাতেই যে আজ দ্বিতীয় বর্ষের "কুশদহ" আরম্ভ হইল, তাহাতে আর কোন সন্দেহই রহিল না। আজ দুই মাস কাল হইতে কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া এ সম্বন্ধে তোমার যে গূঢ় রহস্য দেখিলাম, তাহাতে এখন মুক্তকণ্ঠে তোমার মহিমা ও করুণার কথা সর্ব্বাগ্রে না বলিয়া কিরূপে অকৃতজ্ঞের ন্যায় নীরব থাকিব ? কিন্তু তোমার করুণার কথা বলিতে গিয়া কিছুই বলা হয় না। তবে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মহিমার কথা যেন না ভুলি। প্রভু পরমেশ্বর ! প্রথম বর্ষের "কুশদহ" পত্রিকার পরিচালনে যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা করিয়া এবার নূতন বল দাও, যেন তোমাতে সর্ব্বদা চিত্ত রাখিয়া এই কার্য্য সাধন করিতে পারি. এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সেবার কার্য্য করাইতেছ, তাঁহাদের যেন মঙ্গল হয়।

কুশদহ।

কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; সুতরাং ইহা কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা কুশদহ নামে অভিহিত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কুশদহকে পূর্ব্বে কুশদ্বীপ বলিত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে কুশদ্বীপও একটী দ্বীপ। তবে কি কুশদ্বীপ সেই সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটী দ্বীপ? পুরাণোক্ত কুশদ্বীপ সম্ভবতঃ মধ্য এসিয়ার কোন স্থানকে বলা হইত। বোধহয় সেই সময়ে কুশদ্বীপের সমৃদ্ধি ও উন্নতি দেখিয়া ইহার নাম কুশদ্বীপ রাখা হইয়াছিল। কুশদ্বীপ যে এককালে বঙ্গ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিল এবং এখানে বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর ও বিপুল ধনশালী ভাগ্যবান লোকের বসতি ছিল তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগর রাজ বংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যুদয়ের সময়ে কুশদ্বীপের অন্তর্গত জলেশ্বরে, কাশীনাথ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহার বাসস্থানের চিহ্ন এখনও জলেশ্বরের নিকট মাঠে দেখা যায়। তাঁহার পূজিত শিব, আজও বৎসর বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে মহা সমারোহে পূজিত হইয়া থাকে;—এবং উক্ত দিবসে তথায় একটী মেলা হইয়া থাকে। উক্ত শিব, জাগ্রত শিব বলিয়া কুশদহের মধ্যে সকলের বিশ্বাস।

ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়ার ফরম্যান প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন সেই সময়ে জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায় বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে কুশদ্বীপ নামে নবদ্বীপ রাজ্যের একটী প্রধান নগরের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু এই কুশদহের মধ্যে কুশদ্বীপ বা কুশদহ নামে কোন নগর বা গ্রাম দেখা যায় না। এই কুশদহ যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজগণের অধিকৃত রাজ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ নদীয়া জেলাকে ৭২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণার পরিমাণ ফল ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় কুশদহের পরিমাণফল ১,০৯৪৪৯ বর্গ বিঘা এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৮,৯৮৭৲ টাকা এবং ইহার মধ্যে চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া

ধর্ম্মপুর, জলেশ্বর, মাটিকোমরা, শ্রীপুর, ইছাপুর, মল্লিকপুর, নাইগাছি, গৈপুর, বালিয়ানি, খাঁটুরা, হদুরপুর, গোবরডাঙ্গা, কানাই নাটশাল, ঘোষপুর, গয়েশপুর চারঘাট, বেড়গুম, বেড়ী, রামনগর, ভুলোট (রামচন্দ্রপুর সম্বলিত) ও ডুমা প্রভৃতি ভদ্র প্রধান গ্রাম। কুশদহে দশ সহস্র অধিবাসীর বাস। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বে ইছাপুর সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল তৎপরে খাঁটুরা। এক্ষণে গোবরডাঙ্গা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; এবং এখানে কুশদহ সমাজের সমাজপতির বাসস্থান। আমরা ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থানের ইতিবৃত্ত লিখিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভুতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

অধ্যাত্ম যোগ।

যাঁহারা সাধক এবং যোগতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ নহে। এক শ্রেণীর মানবের মধ্যে দেখা যায়, যাঁহারা ধর্ম্মের দুই চারিটী তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন, কোন কোন সময় ইহাদের মুখে যোগের কথাও শোনা যায়, কিন্তু তাহা প্রায় বাহ্যিক কোন না কোন প্রকার যোগের কথা। তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কতকগুলি ভ্রান্ত মত লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। প্রধানতঃ, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের অভিমান, অহঙ্কারাদি দেখিয়া সহজেই সকলে বিশ্বাস করেন, আমিত্ব দূর না হইলে কেহ ঈশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে একথা সত্য। যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ দুই বস্তুর মিলন। অতএব অধ্যাত্মযোগ কাহাকে বলে? জ্ঞানে জ্ঞানে, প্রেমে প্রেমে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলনই অধ্যাত্ম যোগ। জীবাত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানতায় পরিণত হয় অর্থাৎ পরমাত্মা ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বস্ব এই তত্ত্ব ভুলিয়া জীব যখন এই স্থূল দেহাদিকেই আমি ও সংসারকেই আমার মনে করে, তাহার নামই অজ্ঞানতা। মানুষ যখন সেই অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া ঈশ্বরকেই

আশ্রয় করে, তখন জ্ঞান যোগের আরম্ভ হয়। এইরূপে হৃদয়ের সমগ্র অনুরাগ আসক্তি, সদ্ভাব সকল ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম প্রেমযোগ বা ভক্তিযোগ। স্বসুখ বাসনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুখী হওয়া, তাঁহার ন্যায় মঙ্গল সঙ্কল্প হইয়া, তাঁহার ইচ্ছা পালনই ইচ্ছাযোগ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ইচ্ছাযোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরে ও জীবে একত্ব ভাব উপস্থিত হয়। অতএব, ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ইহার মধ্যে কোন জড় ভাব নাই। তবে যাঁহারা মনে করেন, একেবারেই অধ্যাত্ম যোগ হয় না এজন্য আগে ক্রিয়া যোগ দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া লইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই, তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলি, যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে প্রথম হইতেই যদি আদর না করা হয়, তবে বাহ্যপ্রিয় মানবকে ঐ বহিরঙ্গে আবদ্ধ থাকিতেই দেখা যায়। "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" জ্ঞানই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত পথ। কোনরূপ বাহ্যিক বিষয়ের দ্বারা মানবাত্মার মুক্তি হইতে পারে না। এই জন্য, অধ্যাত্ম যোগকেই যোগ বলা যায়।

প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানতাই আমিত্ব। আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি বুদ্ধিমান এইরূপে যত আমিকে স্বতন্ত্র একটা কিছুর অভিমান করি, তাহাই আমিত্ব। এই আমিত্ব হইতেই "আমি, আমার" স্বার্থভাবে পরিচালিত হইয়া মানুষ সকল অপকর্ম্ম করে, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানেই আমিত্ব বিনাশ হয়। মানুষের যখন প্রকৃতই দিব্য জ্ঞান হয়, তখন সে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া আমি শূন্য অন্ধকার মাত্র। আমির মূল সকলই ঈশ্বর। এই জ্ঞান হইলে যে পরম ভাবানন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে তখন আর কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি আমিত্ব পরিত্যাগ কর। জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মারূপ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল উদ্বেগ, উত্তেজনা, মোহ এবং কামনার জ্বালা হইতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যেমন জলের মীন জলেই সঞ্জীবিত, তদ্রূপ জীব-স্বরূপ পরম-স্বরূপে যুক্ত হইয়াই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; ইহাই অধ্যাত্ম যোগাবস্থা।

যোগ দুই বস্তুর মিলন। এক বস্তু আর এক বস্তুতে মিলিল, এজন্য একের অস্তিত্ব লোপ হইল তাহা নহে। পরমাত্মার সহিত জ্ঞানে জ্ঞানে, ভাবে ভাবে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলনে জীবের পূর্ব্বের মলিন স্বরূপ অজ্ঞানতা, অপ্রেম, কুইচ্ছার লোপ হইল, এখন সেখানে জ্ঞান, প্রেম বা ভক্তি ও শুভ ইচ্ছার বিদ্যমানতা

রহিল সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তি অর্থে বিনাশ নহে। পরমাত্মা অনন্ত স্বরূপ, পূর্ণ এক অদ্বিতীয়। পরমাত্মা পরমেশ্বরে কোটী কোটী জীবাত্মা মিশিয়া গেলেও পরমাত্মার কিছুই বৃদ্ধি হয় না, আর কোটী কোটী সৃষ্টি হইলেও তাঁহার ওজন কমে না। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মায় নিশিয়া গেলে জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ হইল বলাও যা আর জীবাত্মার ধ্বংস স্বীকার করাও তাহা। জীবাত্মা যদি এক সময় ধ্বংস হইবে, তবে এত জ্ঞান, প্রেম, শুভ ইচ্ছা সকলইত মিথ্যা বস্তু। যদি বলা যায় জ্ঞান অবস্তু, জ্ঞানেরও ধ্বংস হয় তাহা হইলে, আর কোন সত্যই থাকে না, এত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম সাধন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। মানব অন্তরে যে সত্যের আদর, সত্যের বল দেখা যায়, তাহা হইতেই পারিত না, যদি জ্ঞান সত্য বস্তু না হইত। অতএব জ্ঞানের ধ্বংস নাই; জ্ঞান বস্তুই সত্যবস্তু, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ জ্ঞানময়। জীবাত্মা, পরমাত্মার সেই অনন্তজ্ঞান অনন্তকাল লাভ ও উপভোগ করিবে। ভগবৎ জ্ঞানী, কামনা শূন্য পূর্ণ ভাবাপন্ন।

এখন শেষ কথা এই, যোগী যখন যোগসাধন করেন তখন তাঁহার আত্মজ্ঞান থাকে, এ আত্মজ্ঞান অভিমানের আমি নহে। যে আমি কোন অবস্থায় যায় না, এ সেই মৌলিক আমি। যোগের প্রথম অবস্থা ও মধ্যম অবস্থায় আত্মবোধ থাকে। তন্ময় অবস্থায় থাকে না কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে তখনও যোগ করিতেছে যে সে যায় না, সে লুপ্ত হইয়া আনন্দ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। যদি বল সে আনন্দ ভগবানই ভোগ করেন, তাহা বলা যায় না, আনন্দ স্বরূপ ও আনন্দ ভোক্তা, দুই না হইলে ভোগ হয় না। বিশেষতঃ যোগীর যোগ কেন? স্বরূপে স্বরূপ মিলন। এই জন্য ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না মা গো চিনি খেতে চাই"। প্রকৃতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিয়া আনন্দ ভোগ করে। সাধারণ অবস্থায়ও দেখা যায় মানুষের যদি কখন অত্যন্ত শোক দুঃখ বা আনন্দ হর্ষ উপস্থিত হয় তবে সেও কিছুক্ষণের জন্য "আত্মভোলা" হইয়া যায়, তাহা বলিয়া সে কি থাকে না? তাহা নহে। তদ্রূপ যোগী যোগে তন্ময় হইলেও যোগীর লোপ হয় না।

মানুষ আমিত্বের দৌরাত্ম্য দেখিয়া, তার গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে

চাহে। আমিত্ব বিনাশ সম্বন্ধে এক সময় কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের যখন কার্য্য হয় তখন তাহাদের বিস্মৃতিতেই হয়, অর্থাৎ "চক্ষু" "চক্ষু" এইরূপ স্মরণ করিয়া দর্শন কার্য্য হয় না, "কর্ণ" "কর্ণ" এইরূপ ভাবিয়াও শ্রবণ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্মরণে আসে তখনই যখন তাহাদের পীড়া হয়। চক্ষে যদি বেদনা হয় চক্ষুর বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে পড়িবে, তদ্রূপ আমাদের আমিত্বের পীড়া হইলেই তাহাদের কথা স্মরণ হয়। আমি ধনী আমি মানী এই অভিমান রূপ পীড়াই আমিত্ব। যিনি ধনী মানী হইয়াও তিনি নিজে তাহা মনে না করেন, তবে নিরাভিমানের কি সুন্দর ক্রিয়াই না হইতে থাকে।"

মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে আমি বা আমার এই জীবন মিথ্যা নহে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপেই আমার স্বরূপ, এবং অধ্যাত্ম যোগ একটা ভয়ানক ব্যাপারও নহে, উহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবে তার ধর্ম্মের জন্য কত আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ হইতে পারে। কিন্তু হায়! মানুষ ভ্রান্ত মতের ঘোরে প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাসের পথে প্রকাণ্ড প্রাচীর দিয়া কি যন্ত্রনাই ভোগ করিতেছে। ভগবান জীবের মঙ্গল করুন।

জীব-ইচ্ছা ও জীবনাথের ইচ্ছা।

"এই তত্ত্ব নিহিত আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে"।

দুটি ইচ্ছা সৃষ্টি মাঝে করিতেছে কার্য্য,—
ব্রহ্মেচ্ছা জীবেচ্ছা উভয়ের গতি ধার্য্য
হয় তত্ত্বক্ষেত্রে, যথা ইচ্ছাময় যিনি
হন সর্ব্বে-সর্ব্বা,—সর্ব্ব মূলাধার তিনি।
দুই ইচ্ছা অহরহ কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
করে কার্য্য নিরবধি সাজি নানা সাজে।

জানিবারে সেই তত্ত্ব প্রাণ মম চায়
ব্যাকুল হইয়া প্রাণ-ময় পানে ধায়।
ভাবিতে ভাবিতে আর চলিতে চলিতে
পরাণ আকুল হল না পারি বুঝিতে;
করুণা হইল তাঁর যিনি কৃপাময়,
ভাতিল সে তত্ত্ব হৃদে গূঢ় অতিশয়।
বর্ণন না হয় তার, তথাপি বলিব,
তাঁর মূল ইচ্ছাধরি জীবেচ্ছা ভনিব।
কথাটা প্রকৃত এই "ইচ্ছা ভবেশের,"
তাহাতে আকাঙ্ক্ষা রূপে হৃদে মানবের
বহে বেগ,—উঠে কত সাধের তরঙ্গ
না হয় গণন তার সৃষ্টির এ রঙ্গ।
জীব-ইচ্ছা বিভু-ইচ্ছা যবে মিশে যায়
শুভ কর্ম্ম যত কিছু তাহাতে জন্মায়।
মানুষের ইচ্ছা দেব-ভাব প্রাপ্ত হলে
স্বার্থ পরতার বল যায় কোথা চলে।
তখন সকল কার্য্য হয় সুধাময়
মন প্রাণে অহরহ হয় সুখোদয়।
 কি ভৌতিক কি আত্মিক কার্য্য দেখি যত,
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কর্ম্ম কত কত,
বিভু-ইচ্ছা মূলে সে সবার উৎপত্তি
সম্বন্ধ সূত্রেতে, যথা জীবের নিয়তি
যোযিত স্বকর্ম্মে, যার ফল সম্ভোগিয়া
চলেছে অনন্ত পথে জ্ঞান উপার্জ্জিয়া
লভিবারে অচ্যুত আনন্দ ব্রহ্মপুরে—
আসিলে যথায়, যায় মোহমায়া দূরে।
স্বরতি বিরতি হয়ে আত্মরতি আনে,
ব্রহ্ম ইচ্ছা হেরিয়ে সাধক সর্ব্বস্থানে,

হন আপ্তকাম জীবনাথে ইচ্ছাবরি
দেখেন মঙ্গলে বিশ্ব আছে পূর্ণ করি ;—
ব্রহ্মময় সব প্রতিভাত আত্মজ্ঞানে।
"এই তত্ত্ব নিহিত আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে"।

পরিব্রাজক

মাধ্যাকর্ষণ।

এই বিপুল বিশ্বের যে দিকে দৃক্পাত করি, সেই দিকেই আমরা পরম-পিতা পরমেশ্বরের অপার করুণা রাশি দেখিতে পাই। তিনি মনুষ্যকে সকলই দিয়াছেন ;—মস্তকে বুদ্ধি, হৃদয়ে উৎসাহ, চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার কিছুরই তাহার অভাব নাই ;—আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই হইল। জগদীশ্বরের বিশ্ব পুস্তক অতীব প্রকাণ্ড ; সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ ত দূরের কথা, কেহ জীবনে ইহার এক পৃষ্ঠার অধিক পাঠ করিয়াছে কিনা সন্দেহ! কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য ঐ একপৃষ্ঠা হইতেই কত নব নব তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা কত কুসংস্কার দূরীকৃত করিয়াছেন। অর্কমণ্ডলের আলোক দর্শনে রাত্রির বিভীষিকাচয়ের ন্যায়, জ্ঞানালোকেও সংসারের কুসংস্কার পলায়ন করে। পূর্ব্বে অনেকে আলেয়া দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইত ; কত নির্ব্বোধ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে ; কিন্তু তাহাদেরই বংশধরগণ এখন তাহা লইয়া ক্রীড়া করে!

পরমেশ্বরের এই বিশ্ব পুস্তকের নাম বিজ্ঞান। একজন ইংরাজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "God's Book, which is the Universe, and the reading of His Book, which is Science, can do you nothing but good, and can teach you nothing but truth and wisdom." বিশ্বই ঈশ্বরের পুস্তক, এবং ইহা পাঠই বিজ্ঞান ; ইহা তোমার মঙ্গল ব্যতীত কিছুই করিবে না এবং সত্য ও জ্ঞান ব্যতীত কিছুই শিখাইবে না। এই পুস্তকের প্রতি যিনি একবার মাত্র আকৃষ্ট হ'ন, তিনি আর উহা ছাড়িতে

পারেন না। কিন্তু ইহার প্রাথমিক আলোচনা কিঞ্চিৎ কঠিন। চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। তাই ভূদেব বাবু বলিয়াছেন, "যেমন, অপরিজ্ঞাত এবং বিশৃঙ্খল রূপে সম্বদ্ধ কোন পুস্তক হস্তে পড়িলে তাহা খুলিয়া তাহার কোথায় আদি কোথায় অন্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মৌনভাবে এবং ম্লান মুখে সেই পুস্তক রাখিয়া দিতে হয়, পরিদৃশ্যমান এই প্রকৃতি পুস্তকের প্রতি হঠাৎ অবলোকন করিলেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। * * কিন্তু এই জগদ্রূপ গ্রন্থ মনুষ্যকৃত কোন গ্রন্থ অপেক্ষা যে বিশৃঙ্খল হইবে এমত সম্ভব নহে। ইহার প্রাকৃতিক বিভাগ অবশ্য থাকিবেই থাকিবে।" অনেক মহাত্মা কিন্তু ইহার দুই একটী সূত্র ধরাইয়া দিয়াছেন; এ স্থলে একটী সূত্রই আমাদের আলোচ্য।

সার আইজাক্ নিউটন একটী আতা ফল বৃক্ষ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া যাহা আবিষ্কার করেন, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। হায়, ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে এরূপ কত শত নিউটন বর্ত্তমান আছেন! কিন্তু এই সুবৃহৎ "সুজলা সুফলা শ্যামলা" বঙ্গভূমিতে একমাত্র তারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কর্ত্তা;—আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইহা কি কম পরিতাপের কথা।

যাহা হউক, নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যাবতীয় বস্তুরই পরস্পরের প্রতি টান আছে। ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ কহে। যে দ্রব্য যত বড় তাহার আকর্ষনী শক্তিও তত অধিক। আবার ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুর অপেক্ষা পৃথিবী বৃহত্তম সুতরাং ইহার মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। (১) এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সকল দ্রব্যই কেন পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয় না? তাহার উত্তরে নিম্ন লিখিত উদাহরণটী যথেষ্ট মনে করি। মনে করুন, একস্থানে একটী গরু বাঁধা আছে; ইহার কিছু দূরে কচি ঘাস অথবা অন্য কোন দ্রব্য আপনি লইয়া গেলেন। গরুটী নিশ্চয়ই আপনার দিকে আসিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু সমর্থ হইবে না; কারণ ঘাসেরও আকর্ষণ আছে বন্ধনেরও আছে। ইহাদের মধ্যে

(১) যে শক্তি প্রত্যেক বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। ইংরাজীতে ইহাকে Gravity কহে। এবং বস্তু সকলের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে Gravitation বলে। বাঙ্গালায় কিন্তু দু'টীই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত।

বন্ধনের আকর্ষনী শক্তি অধিক; সুতরাং সে কি প্রকারে বন্ধন ছিন্ন করিবে? তবে চুম্বকের কথা স্বতন্ত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে,—প্রত্যেক দ্রব্যই পৃথিব্যাভিমুখে আকর্ষিত। এক্ষণে যদি একখানি প্রস্তর ও একখানি কাগজ একসঙ্গে কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িতে আরম্ভ করে; তবে কোন্‌খানি অগ্রে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে? সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন প্রস্তর খণ্ডই অগ্রে ভূপতিত হইবে। তবে কি বস্তু বিশেষের সহিত মাধ্যাকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়? না, তাহা নহে। কি ছোট, কি বড়, কি গুরু, কি লঘু সকল বস্তুই একই আকর্ষণে আকর্ষিত। গিনি ও পালক (Guinea feather) নামে কাচের একপ্রকার নল আছে। তন্মধ্যে একটী গিনি ও একটী পালক আছে, উহা 'বায়ুহীন-করণ-যন্ত্র' (Air pump) দ্বারা বায়ু শূন্য। নলটী উল্টাইলেই গিনি এবং পালক এক সঙ্গে অপর প্রান্তে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বুঝাইতেছে যে, বায়ুদ্বারাই বস্তু সকল অগ্র পশ্চাৎ পতিত হয়।

কিন্তু পল্লীগ্রামে শতাধিক মুদ্রাব্যয়ে ঐরূপ একটী যন্ত্র ক্রয় করা সকলের সাধ্য নহে; সুতরাং একটী সহজ উপায় লিখিত হইতেছে। একটী পয়সার সমান করিয়া এক খণ্ড কাগজ কাটিয়া লউন, এবং তাহার উপর পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া ফেলিয়া দিন, দেখিবেন পয়সা ও কাগজ একসঙ্গে ভূমি স্পর্শ করিবে। কিন্তু সাবধান যেন কাগজ পয়সার উপর উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়—ফাঁক না থাকে।

গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২·১৯১ ফিট বা ৯৮১·১৭ সেণ্টিমিটার (centimetre) হিসাবে বস্তু সকল অবতরণ করে। স্মরণ রাখিবেন কোন বস্তুর একটী নির্দ্দিষ্ট উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিতে যত সময় লাগে নামিতে ও ঠিক তত সময় লাগিবে। এ স্থলে দেখা কর্ত্তব্য যে, যখন দ্রব্যটী উঠিতে থাকে, তখন তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকর্ষিত হইলেও, মৎপ্রদত্ত বলের দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হইতে থাকে এবং উহার শেষ হইবামাত্রই পড়িতে আরম্ভ করে। তখন উহার কিছুই পূর্ব্ব বেগ (২) থাকে না—মাধ্যাকর্ষণের বলে নামিতে

(২) যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য কিম্বা যন্ত্রের নিকট হইতে দ্রব্যটি যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম 'পূর্ব্ববেগ'। ইংরাজীতে ইহাকে Initial velocity কহে।

থাকে, এবং যত অধিক দুর নামিতে থাকে তত বেশী বল পায় ও সর্ব্বশেষে যখন উহা ভূমিস্পর্শ করে তখন উহার বেগ 'পূর্ব্ববেগের সহিত সমান' হয়। আবার; যখন ইহা উঠিয়াছিল তখন মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল এবং নামিবার সময় যেমন 'পূর্ব্ববেগ' কিছুই ছিল না কিন্তু 'পূর্ব্ববেগের' মাধ্যাকর্ষণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই! পরন্তু ঠিক তদ্রূপ সাহায্য মাধ্যাকর্ষণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং উঠা ও নামা উভয়েরই সময় সমান। এ বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ হইবে তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুটী কৌশলে 'লম্বভাবে' ছোড়া উচিত।

পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। উঠিবার সময়=পূর্ব্ববেগ ÷ মাধ্যাকর্ষণ। উচ্চতা=(পূর্ব্ববেগ × পূর্ব্ববেগ) ÷ (২ × মাধ্যাকর্ষণ)! পূর্ব্ববেগ = ½ × মাধ্যাকর্ষণ × সময়। উঠা ও নামার সমস্ত সময় =(২ × পূর্ব্ববেগ) ÷ মাধ্যাকর্ষণ। (১)

বলাবাহুল্য, যে উল্লিখিত নিয়মগুলি পরীক্ষার্থী ও রীতিমত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজন। যদি একটীমাত্র পাঠকও প্রমাণ প্রার্থনা করেন, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব; আর মনে করিব পল্লীগ্রামেও বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

এই কঠিন বিষয়, অতিসংক্ষেপে ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের ভাল লাগিলে আগামী বারে নিউটনের গতির তিনটী নিয়মের বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

---

(১) For proof See, W. Briggs and G. H. Bryan's 'Mechanics', or Loney's 'Statics and Dynamics, or any other book of the kind.

জাতীয় সঙ্গীত।

(কীর্ত্তন)

কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম আজ কে শুনালে।
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আটকোটী প্রাণ কে মাতালে।
বন্দে মাতরম্ মাতরম্, উঠ্‌ছে ধ্বনি কি মধুরম্,
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল।
শক্তি খেলে মায়ের নামে, পাষাণ গলে মায়ের গানে;
ভক্তি-রস-লীলা এবে, নবীন বেশে দেখা দিল।
মরা প্রাণে ধরে আগুন, প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ;
যা ভাবি নাই, যা শুনি নাই, সে আগুণ আজ কে জ্বালাইল।

বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালী।

এখন আর দেরী নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো!
আজ আপন পথে ফির্‌তে হবে সাম্‌নে মিলন স্বর্গ।
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলিল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য!
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে, আন্ আপনার থালা ভরে,
আন্, আরতির প্রদীপ জেলে আন্‌রে বলির খড়্গা!
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরী কেন করিস্ তবে,
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্‌তে হয়.ত মর্‌গো!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয় ভ্রমণ। *

কোন সময় নানকচরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার স্বর্গীয় জীবন-প্রভায় আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। তৎপরে অমৃতসরের গুরুদরবারার অবিশ্রান্ত ভজনাদির বিষয় শুনিয়া প্রাণে এই এক গূঢ় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, একবার অমৃতসর (অর্থাৎ অমৃত সরবর) দেখিব। আর এক সময় হিমালয় ও ভারতের প্রাচীন তীর্থ হরিদ্বার, ঋষিকেশ, এবং গোমুখী গঙ্গার বর্ণনা সকল শুনিয়া তদ্দর্শন পিপাসা বলবতী হয়, কিন্তু এতদিন প্রাণের ভাব প্রাণেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বর্ত্তমানে আমার পক্ষে একটী সুযোগ হইল, সংসারে আমার একমাত্র স্ত্রী, তিনি খুলনার জনৈক বন্ধুর স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন আমার আর কোন সাংসারিক দায়ীত্ব রহিল না। বহুদিনের গূঢ় উদাসভাব যেন সময় পাইয়া উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল এই সময় সাধারণ ভাবে অতিবাহিত করা উচিত নহে, জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুসময়। "যাই একবার নিঃসঙ্গভাবে, উদাসপ্রাণে, যথাইচ্ছা তথা, কিন্তু

---

* আমার হিমালয় ভ্রমণবৃত্তান্ত মুদ্রিত করিব এরূপ সঙ্কল্প ছিল না, এজন্য দৈনিক পুস্তকে (ডায়েরীতে) অতি সংক্ষেপে যা কিছু লেখা ছিল। এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমার শরীর মন ও আত্মার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। মনের বল, বিশ্বাস নির্ভরের প্রসার এবং আত্মার আনন্দ, অধিকন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্টই লাভ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ঐ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ করিতাম, তখনও সেই আনন্দ ও উৎসাহের ভাব প্রকাশিত হইত। যাঁহারা তাহা শুনিতেন কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতের ন্যায় হইয়া শুনিতেন। একদা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার জনৈক ধর্ম্মবন্ধু আমাকে বলিলেন, "আপনি এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত "কুশদহ" পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" কথাটা আমার মনে একটু লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে পরে, দৈনিক পুস্তক দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল এত সংক্ষিপ্ত লেখা কিরূপে প্রকাশ করা যায়, আর ইহাকে যদি একটু বিস্তার করা যায়, তাহাতেও ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, সুতরাং ঐ সংক্ষিপ্ত ভাব রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব ঘটনা সকল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইল। অগত্যা এ প্রবন্ধে ভাষার ত্রুটী সত্বেও ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হইল। পাঠকপাঠিকাগণ ইহাকে ডায়েরী মনে করিয়া পাঠ করিবেন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

এ নহে বাতুলের খেলা।” চল মন চল সেই হিমালয়-প্রবাহিতা গঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, সেখানে জ্ঞানযোগী শঙ্কর-পন্থি পরমহংসদিগকে দর্শন করিব; আর চল, পঞ্জাবক্ষেত্রে নানক-তীর্থে চল। আর আর জনপদ সকল দর্শনে ভগবানের মহিমা ও লোকচরিত অবলোকন কর।

প্রথমত মনে হইল দূরদেশে একেবারে নিঃসম্বলে যাওয়া উচিত নহে, অতএব কিছু অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কয়েকদিনের মধ্যে যত রকম উপায় ছিল দেখা গেল, কিন্তু, “বিধাতার কলম রদ করে কে” ৫৲টী টাকাও সংগ্রহ হইল না। তখন মনে হইল তবে কি এ সকল আমার কল্পনা মাত্র। মন বড় বিষাদযুক্ত হইল। যেন ঘন মেঘে প্রাণ ঢাকিল। ইতিপূর্ব্বে বন্ধুবর শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত স্বীকার করিয়াছিলাম তম্‌লুক যাইব, সুতরাং কয়েকদিনের জন্য তথায় চলিয়া গেলাম। সেখানে পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের নিকট ভগবানের নাম গান করিলাম সৎপ্রসঙ্গও হইল। তৎপরে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় প্রকাশ হইল না। অন্ধকার ঘনীভূত হইলে তাহা অধিকক্ষণ থাকে না। অন্তরে আলোক পাইলাম, “নিঃসম্বলে চলিয়া যাও, সাংসারিক বুদ্ধি কেন, আমি সর্ব্বত্র আছি।” তখন মনে একটী সাহসের ভাব আসিল, সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

পথে,—চুঁচড়া, হুগ্‌লি, বোলপুর।

৫ই আশ্বিন শুক্রবার (২১ সেপ্টেম্বর) ১৩১৩ সাল। বেলা ২টার পর কলিকাতা হইতে একাকী নিঃসঙ্গভাবে ২৲ টাকা কয়েক আনা মাত্র সম্বলে যাত্রা করিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেণে উঠিয়া আগড়পাড়া জনৈক আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করায়, নিঃসম্বলে দূরদেশ ভ্রমণে চলিয়াছি দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পাথেয় দিলেন। ইহাতে কিছু ভগবানের ইঙ্গিত বোঝা গেল।

আগড়পাড়া হইতে কাকনাড়ায় নামিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার সময় চুঁচড়ায় পৌঁছিলাম। তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাহার সহিত সাক্ষাত হইল। আমি বলিলাম শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রচারক মহাশয় যিনি প্রতি শনিবারে এখানে ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসনার কার্য্য করিতে আসেন, তিনি কল্যও আসিবেন। আমাকে

এখানে একদিন থাকিয়া আপনাদের সহিত আলাপ ও ভগবানের নাম করিতে বলিয়াছিলেন এজন্য আমি আজ এখানে আসিলাম। তখন তিনি আমাকে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাহার বাড়ী লইয়া গিয়া রাত্রিতে তথায় থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিশোরী বাবুর সদর ঘরে বসিয়া গোপাল বাবু ও কিশোরী বাবুর সহিত আমার কিছু সৎপ্রসঙ্গ হইল, এবং প্রার্থনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিলাম। তাহাতে তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রিতে কিশোরী বাবু, ঘরের তৈরী আহারীয় আনিয়া দিলেন, আহার করিয়া সেই ঘরেই শয়ন করিলাম।

৬ই আশ্বিন শনিবার প্রত্যূষে উঠিয়া চুঁচড়ার পল্লীতে বাড়ী বাড়ী নামগান করিলাম। বেলা ৯ কি ৯॥০ টার সময় হুগ্‌লি বাবুগঞ্জে শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহের বাসায় গেলাম। অনেক দিনের পর পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়েই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি তখন অসুস্থ শরীরে সপরিবারে অনেকগুলি সন্তান সহিত কষ্টে সৃষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে যথেষ্ট যত্ন আদর করিলেন। তাঁহার বাসায় উপাসনা ও আহারাদি হইল।

সন্ধ্যার সময় চুঁচড়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিলাম, বৈকুণ্ঠ বাবু উপাসনা করিলেন, আমি সঙ্গীত করিলাম। রাত্রিতে আমি রাধারমণ বাবুর বাসায় রহিলাম।

৭ই আশ্বিন রবিবার। প্রাতে গঙ্গায় স্নানাদি করিয়া হুগলিঘাট ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিলাম। হুগলিঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাধারমণ বাবুর দুইটী পুত্র আমার সঙ্গে আসিল, বালকের সরল মুখচ্ছবি, দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে মমতা হইতে লাগিল। ট্রেণে কয়েকটী লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ ও একটী সঙ্গীত করি। বেলা ২টার পর বোলপুর,' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে আসিলাম। আমার নিকট একখানি রেলওয়ে-সময়-নিরূপক পুস্তক (টাইম টেব্‌ল) ছিল, কিন্তু ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন যে অনেকদূরে তাহা না জানিতে পারায় অসময়ে পৌঁছিলাম। এমন সময় অন্নাহারের আশা ছিল না, তথাপি অল্পক্ষণের মধ্যে "গরম গরম ভাতে ভাত" পরিষ্কার অন্ন পাওয়া গেল। কুশদহ অন্তর্গত জসাইকাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় ওখানকার "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামক বোর্ডিং স্কুলের একজন শিক্ষক, তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি আমাকে বিশেষ যত্ন করিলেন।

৮ই সোমবার। শান্তিনিকেতনের উপাসনালয়, কাঁচ এবং শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত স্বচ্ছ ও সুন্দর; মানব অন্তরে আধ্যাত্মিক উপাসনালয় যে প্রকার স্বচ্ছ ও সুন্দর, ইহাও যেন সেই আদর্শে গঠিত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে, তাহার মধ্যে শান্তিনিকেতন, শান্ত-পাদপ শ্রেণী আবৃত; আমলথী হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষরাজী প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের তপোবনের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন উপাসনা মন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে দামামা শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনি হয়। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপাসনা পাঠ করিবার জন্য ও একজন সুকণ্ঠ গায়ক (তানপুরা যোগে) ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। আমি উপাসনায় যথাসাধ্য যোগ দিলাম। পরে অনেকক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া ভগবৎ চিন্তায় শান্তিভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। মহর্ষিদেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার পুত্র দীপেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাত ও অল্পকিছু আলাপ হইল। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন কষ্ট হইতেছে না ত?" আরো বলিলেন "মহর্ষিদেবের ইচ্ছা ছিল এই শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মগণ আসিয়া সাধন ভজন করিবেন, তিনি তাহার জন্য গৃহ এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সময়ে দেখা গেল, সাধন ভজন জন্য প্রায় কেহ আসেন না, এক আধ বেলা বেড়াইবার জন্য কিম্বা স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কেহ আসেন, সুতরাং তাহার জন্য নিয়ত আয়োজন রাখা বৃথা হয়। এক্ষণে যাঁহারা আসেন স্কুল বোর্ডিং এর মধ্যে আহার করিতে হয়।" তৎপরে রবীন্দ্রবাবু "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামে এখানে যে একটী আদর্শ বালক-বিদ্যালয় ও বোর্ডিং (আশ্রম) করিয়াছেন, তাহার নিয়মাদি খুব ভালই বোধ হইল। আমি যখন এখানে গেলাম তখন পূজার ছুটী হইয়াছে, স্কুল বন্ধ, বোর্ডিংএর ৫।৭টী বালক কেবল দেখিলাম। আমি যে অল্প সময় ওখানে ছিলাম তাহাতে দেখিলাম, প্রাতঃকালে বালকগণ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের পট্টবসন পরিধানপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একখানি আসন লইয়া এক এক বৃক্ষমূলে পূর্ব্বাস্যে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান অভ্যাস করেন। ঋষি বালকগণের ন্যায় এই দৃশ্য বড়ই আনন্দপ্রদ। তৎপরে

বৃক্ষলতাপুষ্প বৃক্ষাদির সেবা করিতে হয়, তাহাতে শারীরিক ব্যায়ামের কার্য্যও হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে শুনিলাম, স্কুলের মত বেঞ্চ চেয়ার সজ্জিত গৃহে ১০টা হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত ক্ল্যাস হয় না। কিন্তু এক এক শিক্ষকের নিকট কয়েকটী করিয়া ছাত্র, দেশীয়ভাবে চৌকির উপর কম্বলে বসিয়া দুইবেলা পাঠাভ্যাস করেন। এবং নানাপ্রকারে প্রাকৃতভাবে শিক্ষাদি প্রদত্ত হয়। যে শিক্ষকের যে কয়েকটী ছাত্র, তাহারা দিনরাত্রি তাঁহার নিকট থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহাতে শিক্ষার সঙ্গে নীতি চরিত্র এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানেরও গঠন হইয়া থাকে। আমি কয়েকটী বালককেই দেখিলাম তাহারা বেশ শান্ত শিষ্ট। অল্প সময়ে আমার সঙ্গে তাহাদের একটা আনুগত্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি আশ্রমের অতিথি (গেয়েষ্ট) আমার প্রশ্নের উত্তর অতি বিনীতভাবে দিয়াছিল। শুনিলাম এখানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অনেক ব্যয় হয় সুতরাং অধিকাংশ ব্যয় আশ্রম বহন করেন। এখানে অধিক বয়স্ক ও হীন জাতীয় ছাত্র লওয়া হয় না। ইহা ঠিক ব্রাহ্ম বোর্ডিং নহে। এখানকার শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তকাদি স্বতন্ত্র হইলেও ছাত্রদিগকে এনট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত করা হয়।

৯ই আশ্বিন বেলা ২টার সময় সময় শান্তিনিকেতন হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় তিন মাইল পথ চলিয়া বোলপুর ষ্টেশনে আসিলাম। লুপ লাইনে যাইবার আমার উদ্দেশ্য না থাকায় ডাউন ট্রেনে উঠিয়া কড়লাইনে খানা জংশনে আসিলাম। (ক্রমশঃ)

পরলোকগত

"কথক" ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসিদ্ধ কথকগণের নামে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামের নামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ সুকণ্ঠ ধরণী কথকের নাম আজও বঙ্গের চারিদিকে ধ্বনীত আছে। বোধহয় এখনও এমন ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার সুমধুর কথকতা শ্রবণ করিয়াছেন। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে, ৬২

বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাঁহারই খুল্লতাত, পণ্ডিত প্রবর সুবিখ্যাত রামধন শিরোমণি মহাশয় বিদ্যা ও সদ্‌গুণে এবং কবিত্বে কথক শ্রেণীর যথার্থই শিরোমণি ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার একটি পুত্রকে কথকতা শিক্ষা দিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে তেমন যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে ভ্রাতষ্পুত্র যুবক ধরণীধর অন্তরাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া সুন্দর শিক্ষা করিতে ছিলেন। একদা ধরণী আপন মনে "আলাপচারি" করিতেছেন, সহসা রামধন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই এরূপ কোথায় শিখ্‌লি ?" যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা শুনিয়াই তিনি শিখিয়াছেন, তখন শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক ধরণীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, ধরণীধরও নিজ কোকিলকণ্ঠে বঙ্গ মোহিত করিলেন।

ধরণীর উন্নতির আর একটি শুভযোগ হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়। এক সময় শিরোমণি মহাশয় ইছাপুর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কথকতা করিতেছিলেন, একদা শিরোমণি মহাশয় ধরণীকে বলিলেন, "আজ আমার শরীরটা ভাল না, বেদী খালি যাবে, যা তুই আজকার মত বলিয়া আয়।" ধরণী প্রথমতঃ একটু কুণ্ঠিত হইলেন কিন্তু তাঁহার উৎসাহবাক্যে তাঁহার সাহস হইল, এবং তিনি ইছাপুর চলিয়া গেলেন। এদিকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাল্কি করিয়া শিরোমণি মহাশয়ও ইছাপুর গিয়া শুনিলেন, অন্যদিন অপেক্ষাও আজ ধরণী ভালই বলিতেছে, তিনি অন্তরালেই রহিলেন এবং কথা শেষ হইয়া গেলে যখন শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তখন শিরোমণি মহাশয়ও ধরণীর সম্মুখে উপস্থিত; ধরণী যেন একটু লজ্জিত হইলেন কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদে তাঁহার কুণ্ঠা ভাব দূরে গেল। সেই হইতে ধরণী প্রকাশ্যে কথকতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের এবং ধরণী কথক মহাশয়ের উৎকৃষ্ট পদাবলী যদি আমরা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা কুশদহে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে ধরণীবাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রফেসর শ্রীমান্ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা একান্ত উপকৃত হইব।

ধরণী কথক মহাশয়ের সমসময়ে ও তৎপরবর্ত্তি কয়েকজন কথক খাঁটুয়া গোবরডাঙ্গায় হইয়াছিলেন।

দেশের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথকতার আদর কমিয়া গিয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে আর কোন সুবিখ্যাত কথকের নাম শোনা যায় নাই কিন্তু তন্মধ্যে থিয়েটারের প্রচুর, উন্নতি হইয়াছে। কথকতা শুনিয়া জাতীয় চরিত্র কোন ছাঁচে গঠিত হইত, আর থিয়েটার দেখিয়া কোন ছাঁচে গঠিত হইতেছে, তাহা দেশের লোক কি কিছুতেই বুঝিবেন না?

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

(১)

আমাদের দেশে স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া তাচ্ছিল্য করা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে স্ত্রীজাতি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নহে। স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা। বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতি যে, অকর্ম্মণ্য ও আমাদের (পুরুষের) গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আমাদের (পুরুষের) দোষে। স্ত্রীশিক্ষার অভাবেই স্ত্রীজাতি আমাদের গলগ্রহ স্বরূপ ও সৎকার্য্যের বাধা স্বরূপ হইয়াছে। নারীজাতি যে পুরুষাপেক্ষা হীন নহে, তাহা ইতিহাসাদি গ্রন্থে উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; বর্ত্তমানে রণ পাণ্ডিত্যে ও নীতি কৌশল প্রদর্শন করিয়া পুরুষ যেমন পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতেছেন, নারীজাতিতেও ঐ সকল গুণ পূর্ব্বকালে বিরল ছিল না। লীলাবতী, খনা প্রভৃতির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হই; সংযুক্তা, অহল্যাবাই প্রভৃতির সুশাসন নৈপুণ্য রাজশক্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত হই; এবং তারাবাই, দুর্গাবতী প্রভৃতির সামরিক কৌশল ও নীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। স্ত্রীজাতি যে, কর্ত্তব্যবোধে নিজপুত্রকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতে পারে, সে দৃষ্টান্তও এই দেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। অদ্য এই বিষয় একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। পন্না চিতোরাধিপতি উদয়সিংহের ধাত্রী। উদয় সিংহের

শৈশবাবস্থায় রাজকার্য্য পরিচালনার্থ তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, তদীয় পিতার দাসী পুত্র বনবীরের হস্তে মন্ত্রিগণ, শাসন দণ্ড অর্পণ করেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ বনবীর রাজ্য লালসায় মত্ত হইয়া শিশুর প্রাণ বধ করিতে কৃত সংকল্প হয়। ইহা এক বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের মুখে পন্না অবগত হইয়া, সেইদিন রাত্রে, একটী ফলের চাঙারির মধ্যে শিশুকে রাখিয়া, পত্রো লতা দ্বারা চাঙারি আচ্ছাদিত করিয়া, সেই ক্ষৌরকারের সাহায্যে এক নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। এদিকে অস্ত্র হস্তে ঘাতক আসিয়া শিশুর তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে পন্না, নির্ব্বাক অবস্থায় অনায়াসে অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্বীয় নিদ্রিত শিশুকে দেখাইয়া দিল। ঘাতক ধাত্রী পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া প্রস্থান করিল। ধাত্রী নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, স্বদেশের জন্য, মিবাররাজ-বংশ রক্ষার জন্য অনায়াসে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, সেই নারীজাতির অবনতির মূল কারণ একমাত্র আমরাই। যতদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না হইবে,—যতদিন স্ত্রীজাতি শিক্ষার দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইতে না পারিবে, এবং বিলাসিতার ভীষণ পরিণাম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিবে, ততদিন দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না, হইতেও পারে না। শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, এবং শিক্ষাব্যতীত মানব, আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে না; যদি দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাও তাহা হইলে দেশে ধর্ম্মভাব জাগরিত কর। ধর্ম্মভাব জাগরিত করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাই বলিতেছি, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! যদি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য দেশবাসীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, যদি জননী জন্মভূমির দুর্গতি মোচন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি স্বদেশপ্রেমে মত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে হে মাতৃসেবক! দেশে স্ত্রী শিক্ষারও ব্যবস্থা কর; নচেৎ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাত্‌রা

সিগারেট।

সম্প্রতি "ল্যান্সেট" নামক বিলাতী চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় সিগারেটের অপকারিতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ল্যান্সেটের ইংরেজ ডাক্তার লিখিয়াছেন,—

"সিগারেট টানিবার সময় ধোঁয়া নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া ফুস্ ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, উহাতে হাঁপ, কাশি, যক্ষ্মা, রক্তামাশয় ও বক্ষঃক্ষত প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ জন্মিয়া থাকে," ইংরেজ ডাক্তারের কথা এই; এবং প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রও সিগারেটের সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু ঐ বিষোপম সিগারেট বিক্রীত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বর্ষে বর্ষে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের একটি বন্ধু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি আর কখনও কলিকাতায় আসেন নাই, কয়েক দিন থাকিয়া তিনি কলিকাতার বহু স্থান দেখিয়া একদিন বলিলেন,—"কলিকাতায় আসিয়া একটি নূতন দৃশ্য দেখিলাম। একটি বালক মায়ের কোলে চড়িয়া সিগারেট টানিতে টানিতে চলিয়াছে!"—বাস্তবিকই তাই।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

রোগ শয্যায়—

কুশদহ সংক্রান্ত কার্য্যে আমি বিগত ১০ই আষাঢ় গোবরডাঙ্গায় গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়ি। ঐ অবস্থায় আষাঢ় ও শ্রাবণ, দুই বার কুশদহ বাহির হইবার পর, আমার বাম হাতের অঙ্গুলিতে একটা আকস্মিক বেদনা হইয়া, পরে তাহাতে অস্ত্র চিকিৎসা হয়। ক্রমে ঘায়ের অবস্থা প্রবল এবং দূষিত হইয়া পড়িল। ১১ই আশ্বিন কলিকাতায় আসিয়া, ভাদ্রের ১২শ সংখ্যার কুশদহ বাহির করা হয়। পূজার বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রাহকগণের কাগজ পাঠাইয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তৎপরে কলিকাতার দুই একটি বিজ্ঞ চিকিৎসক ঘায়ের অবস্থা দেখিয়া ভাল বোধ করিলেন না, এমন কি আঙ্গুলটী কাটীয়া বাদ দিবার সম্ভাবনা বিচিত্র নহে, ইহারও আভাষ পাওয়া গেল। তখন নিরুপায় প্রায় হইয়া অতর্কিত ভাবে একটী ধর্ম্মবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া আমাকে, ৪৩নং বিডন ষ্ট্রীটে ডাক্তার শশিভূষণ নাগের নিকট লইয়া গেলেন।

ও পরদিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার অধীন হইলাম। ভগবানের কৃপায় তাঁহার আশ্চর্য্য "মলমের" গুণে ১০।১৫ দিনে ঘায়ের অবস্থা ফিরিল, আঙ্গুলটী রক্ষার আশা হইল। বর্ত্তমানে ঘা আরোগ্যাবস্থায় আসিয়াছে, কিন্তু বিগত দেড় মাসের মধ্যে ঐ দারুণ ক্ষত, তাহার উপর প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর এবং অরুচিতে আমি মৃতকল্প হইয়া পড়িলাম। জীবনের কোন উত্তম উৎসাহ যেন রহিল না, সুতরাং "কুশদহ" প্রকাশের আশাও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। শয্যাগত হইয়া ভগবানের নাম মাত্র ভরসা রহিল। তৎপরে ঐ অবস্থায় তাঁহার আশ্চর্য্য করুণার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইলাম। এত রোগ যাতনায়ও আমার এমন মনে হয় না যে, কোন দিন কোনরূপ অসহ্য যাতনা হইয়াছে, করুণাময়ী কোন দিন শান্তি হরণ করেন নাই, এবং অভাবনীয়রূপে ঔষধ পথ্যাদি সকল "জননী" অন্তরালে থাকিয়া যোগাইলেন। তারপর দেখি, সহসা কোথা হইতে "কুশদহের" সকল আয়োজন প্রস্তুত, তাঁহার বাণী অন্তরে বলিল, "উঠ, এবার বর্দ্ধিত আকারে, নূতন সাজে "কুশদহ" বাহির কর।" তখন আমার প্রাণ তাঁহার চরণে প্রণত হইল। তাই বলি, শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় গ্রাহকগণ! আসুন, কুশদহের প্রতি একটু বিশ্বাসের ভাবে, ধর্ম্ম দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা যেন তাঁহার করুণা না ভুলি। ভগবান সকলের মঙ্গল করুন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা এবার বড়বাজার চিনিপটীর চিনি ব্যবসায়ীগণের, বারইয়ারির ব্যয় সম্বন্ধে সদ্দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহারা বারইয়ারির যাত্রা গানের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কুশদহ প্রভৃতি স্থানের গরীব গৃহস্থের মাসিক ও অন্যান্য সাহায্য করিতেছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ ও শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এইরূপে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে বিশেষ ইচ্ছুক। ঈশ্বর করুন তাঁহাদের এই শুভইচ্ছা, বাহ্যিক নাম ও সুখ্যাতির জন্য না হইয়া, আন্তরিক দয়ার ভাব হইতে হউক, যাহাতে ইহ এবং পরলোক সফল হয়।

আরো সুখের বিষয় এই যে এবার বারইয়ারিতে যাত্রা ভিন্ন, অশ্লীল, অপবিত্র বারাঙ্গনার নৃত্য গীত, হয় নাই। কলিকাতা সহরে প্রায় প্রত্যেক পটীতে এক একটী বারইয়ারি হয়। সকলেই যদি এইরূপে অপবিত্র নাচ গান বন্ধ করিয়া, যাত্রাগানে কিছু ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট অর্থ ভাল বিষয় ব্যয় করেন, তাহাতে দেশের কত অভাব মোচন হইতে পারে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গৈপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কলিকাতা এম্ এম্ বসু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সাঁওতাল পরগণা, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও দেরাদূনে বৎসরাধিক বিশেষ প্রশংসার সহিত চিকিৎসা কার্য্য করিয়াছিলেন। দেরাদূনে দুটী টাইফয়েড (Typhoid fever case) কেস্ অতি দক্ষতার সহিত আরোগ্য করিয়া কয়েক খানি প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে (সাহারাণপুর জেলায়) দেওবন্দে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন। এখানেও একটী Typhoid fever case আরাম করিয়াছেন এবং অল্পকালের মধ্যে সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। যদিও তিনি বিদেশে আছেন, তথাপি তিনি কুশদহ- বাসী, এজন্য আমরা উত্তরোত্তর তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

কুশদহের চাঁদা প্রাপ্তি। (সাবেক)

শ্রীমতী সুপ্রভা আশ	১৲	শ্রীযুক্ত নয়ানকৃষ্ণ দেব	১৲
" গায়েত্রী রায়	১৲	" হরিচরণ বসু	১৲
শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর আইচ	১৲	" ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়,	১৲	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲	" বিজয়কৃষ্ণ বসু	১৲
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল	১৲	" রবীন্দ্রনাথ বসু	১৲
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র	১৲	" আশুতোষ বাগচি	১৲
" প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১৲	Mr. Charles S. Paterson	১৲
" অম্বিকাচরণ দে স্কোয়ার	১৲	শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ	১৲

গ্রাহকগণের প্রতি।

একবৎসরের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল, সমগ্র কুশদহের মধ্যে এরূপ একখানি মাসিকপত্র সুন্দর রূপেই চলিতে পারে। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হয়, তাহা কি এখনকার দিনে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে! ঈশ্বর কৃপায় এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গ্রাহকের নিকট হইতে কুশদহের স্থায়িত্বের কামনা যুক্ত পত্র ও অভিমত পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম বর্ষের কুশদহের যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে, তাহার একটী প্রধান কারণ অর্থাভাব। কুশদহের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে এমন ব্যক্তি অনেক আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে একাই কুশদহের সামান্য ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। প্রথম বর্ষে যেরূপ পরিশ্রমে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যিনি একমাত্র একাজের নিয়ন্তা, —সেই ভগবানই জানেন। কিন্তু এ কথা বলি না যে, ঐ পরিশ্রমে কাতর হইয়াছি; বরং আত্মপ্রসাদ লাভই হইয়াছে। তবে এবার এ দাসের শরীর ভগ্ন; আর যে দ্বারে দ্বারে দয়াভিক্ষা করিতে পারিব এমন বোধহয় না; তাই দয়ালু গ্রাহকগণকে একথা জানাইলাম। যদি দয়া হয়, অগ্রিম চাঁদা প্রেরণ করুন।

যিনি অগ্রিম চাঁদা দিতে অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলি যে, পরমুহূর্ত্তে কি হইবে তাহা কেহ জানেন না, সুতরাং জীবনের নশ্বরতা এবং অনির্দ্দিষ্ট ঘটনার বিষয় ভাবিলে কেহই কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারেন না। আমরা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত, গ্রাহকশ্রেণীর যিনি দুই এক টাকার জন্য নির্ভর এবং বিশ্বাসের আশ্রয় না করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। যাঁহারা এক বর্ষ কাগজ গ্রহণ করিয়া শেষ সংখ্যা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে আমরা যেন তাঁহাদের প্রতি কোন অনুযোগ না রাখি।

বিনীত—দাস।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। ২য় সংখ্যা।

সঙ্গীত।

সারঙ্গ।—ত্রিতালী।

পাপ তাপে তাপিত ধরণী।

মানব সব, হাহাকার রব

ছাড়ে দিবা রজনী।

হইল ম্লানতর যৌবন সুন্দর,

পশি কীট তাহে করে ছারখার;

জ্ঞানহত মদে মত্ত এমনি।

পাপ প্রলোভন, যেন হুতাশন,

নিরন্তর সবে করিছে দহন

নাই উপায়, তব পায় মাগে জননী।

এমনি করিয়ে সারা জীবন যায়

তবু কি নাহি চেতন্য পায়

যাতে মরে তাই করে, তার তারিণী॥

স্বর্গীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ।

সিদ্ধান্তবাগীশ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের নিকট সুপরিচিত। খড়দহ, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি প্রধান মেলের অনেক কুলিন হড়ভাবাপন্ন। বিশেষতঃ খড়দহমেলে সিদ্ধান্তী নামে যে পৃথক একটী থাক আছে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সেই থাকের সৃষ্টিকর্ত্তা। হড়দোষও তাহা হইতে হইয়াছে।

কিন্তু কেবল থাকের সৃষ্টিকর্ত্তা বা একটী ব্রাহ্মণসমাজের গোষ্ঠীপতি বলিয়া সিদ্ধান্তবাগীশের নাম চিরস্মরণীয় হয় নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী

বলিয়াও নহে। সিদ্ধান্তবাগীশের কীর্ত্তিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করিবার সামগ্রী আছে। তিনি বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। তাঁহার যশ একদিন সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারেও গীত হইয়াছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ভারত একদিন তাঁহার জয়গান করিয়াছিল। বাঙ্গালীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিদেশীয়গণও চমৎকৃত হইয়াছিল। সম্রাটের স্বরচিত জীবনীতে উজ্জ্বল অক্ষরে যে বাঙ্গালীগণের অমানুষী কার্য্যকলাপ লিখিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তবাগীশ সেই বাঙ্গালীগণের নেতা ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার তিনিই দেখাইয়া বাঙ্গালীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ কে? কোথায় ও কোন সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন? কিরূপে তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইলেন? কিরূপেই বা তিনি দিল্লীর সম্রাটকে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন তাহা আমরা সকলে জানি না। জানিবার চেষ্টাও করি না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বিষয় জানিতে পারি, আলস্য করিয়া তাহা সকলকে জানাইবার সুযোগ পরিত্যাগ করি। যাহা হউক যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইছাপুরের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। কুশদহ মধ্যে আধুনিক কালে (মেল বন্ধনের পরবর্ত্তী কালে) সিদ্ধান্তবাগীশের বংশ সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। যখন নদীয়া রাজবংশেরও অভ্যুদয় হয় নাই তখনও ইছাপুরের চৌধুরীবংশ সাধারণের নিকট সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু ইছাপুরই তাঁহার জন্মভূমি নহে। প্রবাদ আছে তিনি প্রথমে চালুন্দিয়া-তীরে বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরও তাঁহার আদি বাসস্থান নহে। যশোহর জেলায় ঝিকরগাছা ষ্টেসনের অল্প পূর্ব্বে লাউজানি নামক স্থানে একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। রাজা মুকুটরায় এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উক্ত রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অধিবাসীগণ নানা স্থানে পলায়ন করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও পলায়ন করিয়া বিষ্ণুপুরে আগমন করেন। বিষ্ণুপুরে তখন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জনৈক মহাযোগী বাস করিতেন। কয়েক বৎসর তাঁহার নিকট

থাকিয়া তিনি যোগাভ্যাস করেন। তৎপরে যোগী তাঁহাকে সংসারে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করায় তাঁহার আদেশক্রমে সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধান্তবাগীশ প্রথমে জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়ের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন রাজা কাশীনাথের সহিত তাঁহার শোণিতসম্বন্ধ ছিল। এবং কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহারই তালুক ভোগ করিতে থাকেন। যাহাই হউক ইহা নিশ্চিত যে ইছাপুরে আসিয়া বাস করার সময় হইতে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিদ্ধান্তবাগীশ প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার অল্প পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কর দিব কি করিয়া? ব্রাহ্মণ চিরকালই নিষ্করে বাস করে"। বঙ্গাধিপ উত্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বশে আনিবার জন্য বিস্তর সৈন্য সাজাইয়া ইছাপুর যাত্রা করিলেন। সহস্র সহস্র সৈন্য যমুনা পার হইতে লাগিল। যমুনা তখন প্রবলা নদী হইলেও তাহার উপর নৌকার জাঙ্গাল বাঁধা হইল। বিস্তর হাতী ঘোড়া কামান ও নৌকা দেখিয়া কুশদহবাসী সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাগীশ কিন্তু ভীত হইলেন না। সৈন্য সজ্জাও করিলেন না। সে সামর্থও ছিল না। প্রতাপাদিত্য সৈন্য লইয়া যমুনার উত্তর পারে শিবির স্থাপন করিলে, সিদ্ধান্তবাগীশ একাকী ছদ্মবেশে বঙ্গেশ্বরের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। যোগপ্রভাবে বঙ্গাধিপকে কোন অলৌকিক বিষয় দেখাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেন এবং পরে আত্মপরিচয় দিলেন। উদারহৃদয় মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তাঁহার অধিকার ত অক্ষুণ্ণ রহিলই উপরন্তু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কেবল একখানি গ্রাম অর্থাৎ যে স্থানটুকুতে মহারাজের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি চাহিয়া লইলেন। কেন না বঙ্গাধিপের নিয়ম ছিল যে অপর ব্যক্তির অধিকারে তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল অদ্যাপি সে স্থান প্রতাপপুর নামে খ্যাত। এই ঘটনা একদিকে সিদ্ধান্তবাগীশের অলৌকিক ক্ষমতা ও অপর পক্ষে মহারাজ

প্রতাপাদিত্যের মহানুভবতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। যতদিন প্রতাপপুর গ্রাম বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই ঘটনার স্মৃতি লোপ হইবে না। এই গ্রাম গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে একমাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে যমুনাতীরে অবস্থিত।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সময় হইতে কুশদহ সমাজের পুষ্টিলাভ ঘটে। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এতদঞ্চলে বাস্ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণের প্রদত্ত নিষ্কর-ভূমিদানপত্র এখনও অনেকের নিকট আছে এবং অনেক ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সে সকল ভূমি ভোগ করিতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কুশদহস্থ ব্রাহ্মণগণের ভোগপ্রমাণবৃত্তি বাহল রাখিয়াছিলেন মাত্র, নূতন করিয়া দান করেন নাই; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত সনন্দে ইহার উল্লেখ আছে। সত্য বটে, সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণের আর পূর্ব্বাবস্থা নাই, কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ নহেন কিন্তু সুরনাথ বাবুর ন্যায় উদারহৃদয় ও অমায়িক ব্যক্তি অবস্থাবিপর্য্যয়েও কখন সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইবেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সৎসঙ্গ।

মহারাজ বিশ্বামিত্র মৃগয়াসক্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবের তপোবন-সন্নিকটে উপস্থিত হন্। অরুন্ধতীপতিকে প্রণাম না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন অবৈধ জ্ঞানে, তিনি তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। প্রণামান্তে বিদায়ের প্রার্থনা করিলে, শ্রীরামগুরু তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণের আদেশ করাতে, তিনি কুণ্ঠিতভাবে উত্তর করেন, 'বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় আসিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে একাকী প্রসাদ গ্রহণ করিলে আমার মহারাজ নামে কলঙ্ক হইবে'।

সহাস্যবদনে বশিষ্ঠদেব তাঁহার সমস্ত লোককেই আহার করিতে বলায়, বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে পুনরায় বলিলেন, "তপস্যাশ্রমের পীড়া উৎপাদন করা ও তপস্যার ব্যাঘাত জন্মান মহারাজদিগের কর্ত্তব্য নহে।"

বশিষ্ঠদেব পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে উত্তর করিলেন, "বিশ্বামিত্র! মহারাজেরা

অনুগ্রহ করিয়াই যে তপস্যার বিঘ্ন জন্মান না, ইহা তুমি মনেও করিও না। হিংসাশূন্য তপোবনে হিংস্রক শার্দ্দূলও গৃহপালিত মার্জ্জারবৎ শান্ত হইয়া থাকে। আবার ভগবানের সর্ব্বাভাবশূন্য এবং ত্রিতাপনাশী শ্রীচরণ নিয়ত ধ্যান করিয়া, যে তপস্বীগণ কালাতিপাত করেন, তাঁহাদিগের কি কোন বিপদ বা অভাব থাকিতে পারে ?

রজোগুণপ্রধান মহারাজের কর্ণে তপোধনের উক্তি সুশ্রাব্য বোধ হইল না। কিন্তু স্বাভাবিক সভ্যতার অনুরোধে তিনি আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেবদুর্লভ নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তৎপরে কামধেনুদর্শন, উৎকৃষ্ট ধেনু বলিয়া তাহাতে রাজাধিকার আছে, ইহা নিবেদন, উক্তধেনুপ্রসূত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃগণের সহিত সমর, বিশ্বামিত্রপরাজয়, বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ, 'ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং' এইকথা বলিয়া বিশ্বামিত্রের তপস্যারম্ভ, পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই বেশ্যার সংশ্রবে সর্ব্বথা সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বর্গবেশ্যাসংস্পর্শে তপস্যায় ব্যাঘাত, তপঃপ্রভাব পরীক্ষার নিমিত্ত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গপ্রেরণে বিফলযত্ন, ব্রহ্মাপ্রদত্ত রাজর্ষিপদপ্রাপ্তেও মহারাজার ক্ষোভ ও ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যান্তে ব্রহ্মার বদন হইতে "মহর্ষি" শব্দ শ্রবণ, এ সমস্ত বিষয়ই বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়া পূর্ণকাম হইয়াছেন। মিত্রের নিকট বিষাদ প্রকাশ করিলে বিষণ্ণের হৃদয় সেরূপ আর ভারাক্রান্ত থাকে না। শ্রবণমাত্র মিত্র সে বিষাদের অংশ গ্রহণ করেন। তদ্রূপ জয়ে বা আনন্দে সাধারণ মনুষ্য সুস্থির থাকিতে পারে না। সে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পরম শত্রুর নিকট তাহা প্রকাশ করে; কারণ উক্ত কথা শ্রবণে শত্রু যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ বা বিষণ্ণ হয়, সেই পরিমাণে জেতার আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে! পরাজয় অবধি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেন। এ যাট হাজার বৎসরেও তাঁহার সে ভাবের কণামাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই; সুতরাং তিনি অবিলম্বেই বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন করিলেন।

দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বশিষ্ঠদেব, 'এস রাজর্ষি এস' এতদ্রূপ সম্বোধনে

তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অসন্তোষব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, "স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে মহর্ষি বলিয়াছেন"।

তচ্ছ্রবণে সহাস্যবদনে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "পিতা সমধিক জ্ঞানী। আমি যথাজ্ঞানে তোমাকে রাজর্ষি বলিয়াছি"।

বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ সক্রোধে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রজোগুণমিশ্রিত তপঃপ্রভাবে প্রাণিমাত্রই পীড়িত হইয়া থাকে। সেই পীড়ানিবারণ মানসেই বিশ্বামিত্রসম্মুখে ব্রহ্মা বদন হইতে 'মহর্ষি' শব্দ নির্গত করিয়াছিলেন। আবার সেই উৎপাত উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর বিশ্বামিত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, 'আবার কেন? পূর্ণ মনোরথ হইবার পর ত আর তপস্যা করিতে হয় না'।

বিশ্বামিত্র অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার পুত্র যে আমাকে রাজর্ষি ভিন্ন কিছুতেই মহর্ষি বলিতে চাহেন না"।

ব্রহ্মা সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস! কে কি বলিবে তৎসম্বন্ধে আমি কি বলিব? বশিষ্ঠ অন্যায় বলিয়া থাকে, সে তাহার ফলভাগী হইবে। তুমি কিন্তু পূর্ণকাম হইয়া আর তপস্যা করিও না। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে, তুমি পূর্ব্বতপস্যার ফল হইতে বঞ্চিত হইবে"।

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কথায় বুঝিলেন,. তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপেই মহর্ষি হইয়াছেন এবং মানসগতিতে পুনরায় বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ আবার তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মিথ্যাবাদী নিকৃষ্ট লোকও দণ্ডার্হ—উৎকৃষ্ট লোক রোষ বা অসূয়াবশতঃ সত্যের অপলাপ করিলে সমধিক দণ্ডেরই যোগ্য হইয়া থাকে—আর বশিষ্ঠের মত তপস্বী ব্রহ্মবাক্যে অবহেলা করিয়া যখন আমার মর্য্যাদা অযথারূপে ভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন ধর্ম্ম ব্যবস্থানুসারেই তিনি আমার বধ্য। অতএব অদ্য রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিশ্চয়ই আমি তাঁহার প্রাণনাশ করিব।

বিশ্বামিত্র সংকল্পিত কার্য্য করিবার মানসে সশস্ত্র হইয়া নিশীথে বশিষ্ঠের লতামণ্ডপপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং পতিব্রতা অরুন্ধতীকে জাগরিতা দেখিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি শুনিলেন, অরুন্ধতী ইক্ষ্বাকুবংশের হিতকারী পতিকে বলিতেছেন,

"দেখ, দেখ নাথ ? লতাপত্রমধ্য দিয়া কি সুন্দর নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ আমাদিগের মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছে"। বশিষ্ঠ আবার তদুত্তরে পতিপ্রাণা পত্নীকে বলিতেছেন; "মুগ্ধে! কলঙ্কী শশীর জ্যোতি কি এরূপ নির্ম্মল ও নয়নানন্দকর হয় ?" সরলা অরুন্ধতী অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "তাই ত নাথ! আমি ভুলিয়াছি। আমাকে বলিয়া দেও, এ কিসের জ্যোতি"। বশিষ্ঠ স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন, "এ আমার বিশ্বামিত্রের ষষ্টিসহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যার জ্যোতি"।

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অস্থির। তিনি ভাবিতেছেন, "হা ধিক্ আমাকে! আমার তপস্যাতেও ধিক্ থাক! আমি যে বশিষ্ঠের শতপুত্রহন্তা, সেই বশিষ্ঠই আবার তাঁহার সেই পুত্রদিগের জননী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা অরুন্ধতী-দেবীকে বলিতেছেন, 'আমার বিশ্বামিত্রের তপস্যার জ্যোতি'। তাঁহাকেই বধ করিবার জন্য আমি এক্ষণে এস্থানে দণ্ডায়মান! জানি না—এতক্ষণেও আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিলাখণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইল না কেন! আমার পাপ হইয়াছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আমার ত্রিশ সহস্র বৎসরের তপস্যার ফল ঐ পিতৃসম বশিষ্ঠদেবকেই দান করিয়া পাপমুক্ত হইব। না হয় ব্রহ্মা আমাকে মহর্ষিপদ হইতে আপাততঃ বঞ্চিত করিবেন—আমি না হয় আবার ঐরূপ দীর্ঘ-কালব্যাপী তপস্যা করিয়া তাঁহাকে মহর্ষিত্ব পুনর্দান করিতে বাধ্য করিব"।

দীর্ঘসূত্রতা কাহাকে বলে, তাহা সে কালের কোন ক্ষত্রিয় সন্তান জানিতেন না। বিশ্বামিত্র ত ক্ষত্রিয়গণাগ্রগণ্য। সুতরাং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তিনি সেই নিশীথ সময়ে বশিষ্ঠের পদানত হইয়া কাতরবচনে বলিলেন, "শত-পুত্রহন্তাকে যে মহাত্মা 'আমার' বলিতে পারেন, সেই তাপসকুলগৌরবকে —সেই বশিষ্ঠদেবকে বধ করিতে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমার ঘোর পাপ হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আমার পরিত্রাণ সাধন করুন। পাপমুক্তির আশায় আমি আপনাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কৃপানিধান! তাহা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে মর্ম্মবেদনা দিবেন না"।

সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত বিশ্বামিত্রের মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্যই তোমার দান গ্রহণ করিব"।

সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং আচমন পূর্ব্বক উক্ত তপস্যাফলদানে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, বশিষ্ঠদেব অন্যমনস্ক। তিনি কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলিলেন, "কোন নির্ধন পুরুষ সসম্মানে বা সমাদরে কোন ধনবান্ লোককে কিছু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে, সে ধনী তাহা অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু দানগ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি তদ্বিনিময়ে তাহাকে কি দিবেন, তাহা স্থির করিয়া থাকেন। আমিও তোমাকে দানগ্রহণের পূর্ব্বে কি দিব, তাহা স্থির করিতেছি!

অরুন্ধতীপতির এ কথা শ্রবণে রজোগুণপ্রধান বিশ্বামিত্রের বদনে অভিমানের চিহ্ন দেখা দিল। তিনিও অভিমানব্যঞ্জকস্বরে ও বিরক্তিভাবে বলিলেন, "কি দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দিন। অনর্থক বিলম্ব আমার সহ্য হয় না"।

স্মিতবদনে বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি বহুবিধগুণের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছি তোমাকে কোন গুণটী দান করিব—অর্থাৎ তোমাতে যে গুণের সম্যক্ অভাব আছে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব এবং তদ্বারায়ই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে"।

কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরেই বিশ্বামিত্র বলিলেন "যদি স্থির করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে গুণটা আমাকে দিতে অনর্থক আর বিলম্ব না করিলেই ত ভাল হয়"।

বশিষ্ঠদেব পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ বৎস! তুমি যে গুণের দরিদ্র, তাহা স্থির করিয়াছি; কিন্তু তাহার কত পরিমাণ তোমার সহ্য হইবে, তাহাই স্থির করিতে আমার এত বিলম্ব হইয়াছে। তোমাতে 'সৎসঙ্গ' গুণের এককালীন অভাব দেখিতেছি। সুমেরুপ্রমাণ সে গুণ আমাতে আছে। অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম, তাহার তণ্ডুলকণাপ্রমাণ তুমি সহ্য করিতে পারিবে। অতএব এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমাকে তাহা দান করিলাম, তুমি 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহা গ্রহণ কর"।

বিশ্বামিত্র সহসা 'স্বস্তি' শব্দ মুখনির্গত করিয়াই সক্রোধে বলিলেম, "আমার মহারাজবংশে জন্ম—আমি ক্ষুদ্রপক্ষিযোনিসম্ভূত নহি। আপনার উক্ত তণ্ডুলকণাপ্রমাণ 'সৎসঙ্গ' ব্যঙ্গোক্তি না হইলে, আমার উদরপূরণ ত হইবেই না। তাহাতে অন্য কোন প্রকার ফললাভ আছে কি না, তাহা আপনি অথবা

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন—আমার এ ৬০ হাজার বৎসরব্যাপী তপস্তামার্জ্জিত বুদ্ধিতেও সে বিষয়ের কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত আছেন কি"?

বশিষ্ঠদেব স্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নিশীথে স্থির মনে ভগবচ্চরণ ধ্যান করিতে যে কত আনন্দলাভ হয়, তাহা কিয়দ্দিনের তপস্যাতেই তুমি একরূপ ত অবগত হইয়াছ। সেইজন্য বলি, তুমি ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক এ বিষয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর—আমি তাঁহার শ্রীচরণধ্যানে রত হই"।

বিশ্বামিত্র আর তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "শ্রীভগবানের একটী নাম ত 'দর্পহারী'। তাঁহার নিকট ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাকে বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে হইবে না। বশিষ্ঠের অনুরোধ মত সমস্ত কথা বলিলেই ভগবান তাঁহার অহঙ্কারের পরিচয় পাইবেন। তাহা হইলে আমার বৈরনির্যাতনেচ্ছা অনায়াসেই সাধিতা হইবে"।

এতদ্রূপ চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বামিত্র শ্রীভগবানের সম্মুখীন হইয়া প্রণত হইলেন। আনন্দময়ও সানন্দে তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি রসায়ন যুক্ত করিয়া উক্ত সমস্ত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে করিতে স্নেহগদ্‌গদ বচনে বলিলেন, "আমার বশিষ্ঠ ত সুস্থশরীরে ও সুস্থিরমনে কুশলে আছে"?

বিশ্বামিত্র এককালে অবাক্। তিনি ভাবিতেছেন, "শালগ্রামের উঠা বসা বুঝা ভার। স্বপত্নী সত্যভামার দর্পচূর্ণ করিতে পারিলেন, নিজ বাহন গরুড়, ভক্তপ্রধান সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান চন্দ্র, অধিক কি কনিষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণকেও কুণ্ঠিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। আর ত্রিপণ্ড বশিষ্ঠের বেলায় যত জঞ্জাল। ক্রোধে আমার অঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে"। কিন্তু 'সামীপ্যাবস্থার' কেমনই প্রভাব, এরূপ ক্রোধেও বিশ্বামিত্রের বদনে একটী বাক্যও নিঃস্বরণ হইতেছে না। তৎপরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি করযোড়ে তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে অনুনয় করায়, ভগবান বলিলেন, "বিশ্বামিত্র! তুমি জনৈক বুদ্ধিমান লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া আইস। বারম্বার একই কথা নির্ব্বোধকে বুঝাইতে হইলে আমার অন্যান্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে"।

পাঠক মহাশয়গণ! ভগবানের শেষোক্তিতে অভিমানী বিশ্বামিত্রের মনের

অবস্থা আপনারাই ভাবিয়া দেখিবেন। আমি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে, তিনি আরক্ত বদন ও নয়নে এবং কম্পিত ওষ্ঠাধরে নিবেদন করিলেন, "বুদ্ধিমান লোকটার নামোল্লেখ করিয়া দিন্। আবার কাহাকে আনিতে কাহাকে আনিয়া বসিব"!

শ্রীভগবান্ সহাস্যবদনে অনন্তদেবকে ডাকিতে বলাতে, বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ও অনন্তদেব! শীঘ্র আইস, ভগবান্ তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন"।

বিনীতভাবে অনন্তদেব উত্তর করিলেন, "ভগবানাদিষ্ট পৃথ্বিভার পরিত্যাগ করিয়া যাই কিরূপে"?

রজোগুণবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রুত অর্দ্ধাংশ বাদে বক্রী ৩০ হাজার বৎসরের তপস্যার বল নিজদণ্ডে অর্পণপূর্ব্বক তাহা পৃথ্বিতলে সংলগ্ন করিয়া অনন্তদেবকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আসিতে পার। আমি পৃথিবী স্থির করিয়া দিয়াছি"।

তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশের বলে তিনি ত্রিভুবন ধারণ করিতে পারেন; সুতরাং তুচ্ছ পৃথিবীর কথা আর কি ভাবিবেন! কিন্তু অনন্তদেবের মস্তক ঈষৎ সঞ্চালনে ধরা অস্থিরা হইতেছেন দেখিয়া, অপমানশঙ্কায় উক্ত যষ্টিতে তাঁহার সম্পূর্ণ তপস্যার বল প্রদান করিয়া তিনি ভাবিলেন, "আবার না হয় ৩০ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া বশিষ্ঠকে দান করিব"। কিন্তু তাহাতেও পৃথিবী স্থির রহিল না দেখিয়া, 'ধিক তপস্যার বল', এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বল উক্ত যষ্টি হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং অপমানাশঙ্কানিবারণার্থে সে কাষ্ঠখণ্ডে বশিষ্ঠপ্রদত্ত 'তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গ'-বল প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বসংহা সুস্থিরা হইয়াছেন।

নিজের অসারতা ও বশিষ্ঠদেবের দেবাতীত ক্ষমতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র অন্যমনস্কভাবে অনন্তদেবকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অনন্তদেব কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি উত্তর করিলেন "ভগবানের মতে তুমি আমাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। 'তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের' কত গুণ তাহা তিনি একবারমাত্র বলিবেন। তুমি তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়া আমার স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে"।

অনন্তদেব হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "তবে সে ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ত আমার বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই ত পৃথিবীধারণেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার ষাটহাজার বৎসরের কঠোর তপস্যার বল অপেক্ষা বশিষ্ঠদেবপ্রদত্ত তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের বল কত অধিক"।

অনন্তদেবের কথা শ্রবণমাত্র বিশ্বামিত্র অভিমানশূন্য হইলেন। সত্ত্বগুণ-প্রভাবে তিনি আপনাকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে করিতে করিতে বশিষ্ঠদেবের নিকটে আসিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বশিষ্ঠদেব গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে 'মহর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় দুইটী হস্ত বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্বামিত্র অতি কুণ্ঠিতভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া বশিষ্ঠদেবের চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! এতকালের পর অদ্যই প্রবুদ্ধ হইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি কীটানুকীট অপেক্ষা অপদার্থ ও নীচ। কবে লোকে আমাকে কৃষ্ণসখা শ্রীঅর্জ্জুনের ন্যায় 'বীভৎসু' বলিয়া ডাকিবে! আপনি আমার গুরু—আর এ অধমকে 'মহর্ষি' বলিয়া উপহাস করিবেন না"।

বশিষ্ঠদেব সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! ইতিপূর্ব্বে তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহর্ষির সমস্ত গুণই উপার্জ্জন করিয়াছিলে। অভিমানই তাহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে অভিমানশূন্য হইয়াছ, আমিও তোমাকে 'মহর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে তুমি সত্বরই সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারশূন্য হইয়া পরমপদ লাভ কর"।

কিরূপে বৃদ্ধি করিয়া হীনতেজ জ্বর দূরীভূত করিতে হয়, তাহা বহুদর্শী চিকিৎসকগণই বুঝিতে পারেন। বাক্যাহুতির দ্বারায় অভিমান বৃদ্ধি করিয়া কি প্রকারে অহঙ্কারাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, তাহা বশিষ্ঠদেবের ন্যায় দেবোপম যোগী পুরুষগণই স্থির করিতে পারেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দুদিনের ধরা।

কিসের এ হাসি রাশী
কিসের এ আঁখি জল?
দুদিনের ধরা এ যে
তৃণাগ্রে শিশির-দল।
এত অশ্রু এত তাপ
এত ব্যথা হাহাকার
দুদিনে ফুরাবে সব
নিমিষেতে একাকার,
এ যে ক্ষুদ্র মরভূমি
পলকে স্বপন চুর
প্রভাত-জলদ-রাশী
দেখিতে দেখিতে দূর।
আজ যারে হেরিতেছি
কাল তারে কোথা পাব!
আজ যারে ভাল বাসি
কাল তারে ফেলে যাব!
হাসিলে শারদ-শশি
চন্দ্রীকা নাচিলে জলে,
তারকা নীহিম ভরা
ধরণী ছাইলে ফুলে,
পলকে মাতায়ে প্রাণ
কোন দূরে চলি যায়?
দুদণ্ডের খেলা ভোর
অতীতে মিলায় কায়।

মিছা এই ধরা যদি
মরুমরিচীকা-ভার
তবে কেন এত অশ্রু
কেন এত হাহাকার ?

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

ভারতে লোকক্ষয়।

বহুদিন হইতে বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশে লোকক্ষয়ের আরম্ভ হইয়াছে, এখন কিন্তু ভারতের সর্ব্বস্থানেই ইহার আধিপত্য, এই আধিপত্য অনুদিন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ম্যালেরিয়ার ক্রমবিকাশের কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, শুদ্ধ বঙ্গ বলিয়া নয় সমগ্র ভারত মহাশ্মশানে অচিরে পরিণত হইবে। দেশে ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, প্রায় সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সহজপ্রাপ্য অথচ কিছুতেই কিছু হইতেছে না। কারণ রোগের চিকিৎসা লইয়া লোকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত, রোগের নিদান নির্ণয় বা নির্ণীত নিদানের উচ্ছেদ সাধনে তাহার সহস্রাংশের একাংশ চেষ্টাও করে না। শ্রাদ্ধ শান্তি বারোয়ারি এবং বিবিধ আমোদ প্রমোদে দেশে প্রভূত অর্থব্যয় হইতেছে কিন্তু পচা পুকুর ডোবা, প্রবাহশূন্য শৈবালপূর্ণ খাল বিল নদী একই ভাবে বিরাজ করিতেছে। কতশত ধনবানের উচ্চ অট্টালিকা লোকাভাবে ভগ্নস্তূপরূপে পরিণত হইতেছে, কতশত গণ্ডগ্রাম উড় পড়িয়া যাইতেছে ক্ষমতাশালী প্রভুত্বশালী যাহাদের শুদ্ধ কথায়,সামান্য চেষ্টায় অসাধ্যসাধন হইতে পারে তাঁহারা গ্রামে ম্যালেরিয়া দর্শনে স্ব স্ব প্রাণ লইয়া ভিটা ত্যাগ করেন। আর নিরুপায় দরিদ্রগণ জ্বরজ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে থাকে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকে বারোয়ারির চাঁদা দেয়। শ্রাদ্ধে ও কন্যা পুত্রের বিবাহাদি উৎসবে কর্জ্জ করিয়াও ধুমধাম করে, কিন্তু যাহা লইয়া জগৎ, যাহাতে আমার আমিত্ব, সেই জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট। যে দেশে পিতা রুগ্ন দেহে সন্তান উৎপাদন করিতে এবং যকৃৎপ্লীহোদর পুত্ররত্নের বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করে না, সে দেশের শিক্ষা মূর্খতার নামান্তর মাত্র, সে দেশের বক্তৃতা পাগলের চীৎকার, সে দেশের

সভাসমিতি উন্মত্তের সম্মিলন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া চিন্তা করিতে জানে না, মিলিত হইয়া কাজ করিতে গেলে নিজেরই পুষ্টির দিকে খরদৃষ্টি রাখে তাহারা মরিবে না তো মরিবে কে?

একমাত্র অবরুদ্ধ জলই ম্যালেরিয়ার কারণ নহে, কারণ বিস্তর। এই সমবেত বহু কারণে ভারত ছারেখারে যাইতেছে এবং অভূতপূর্ব্ব বিবিধ নামধেয় রোগ আসিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। ম্যালেরিয়া এবং এই সমস্ত নূতন রোগের যত কারণই থাকুক, আমার বিশ্বাস গোবংশ ধ্বংস এবং দরিদ্রতাই তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সভ্যতাবৃদ্ধির দ্বারা দেশে গোচারণের স্থান নাই। কাঁচা ঘাসই গরুর পুষ্টিকর খাদ্য, তাহারা সেই খাদ্যের অভাবে সামান্য মাত্র আহারে বা বিচালি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। অনেকে অবস্থা-বৈগুণ্যে গরু পুষিতেই পারে না। দুষ্ট অর্থাৎ ক্ষুধাতুর গরুর শাসনের জন্য গো-পুলিশ সংস্থাপিত হইয়াছে, এই সমস্ত পুলিশে দুরাচার গরুদিগকে অনশনে কয়েদ থাকিতে হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ অসংখ্য বৃষগাভী এবং গোবৎস মানুষের উদরগহ্বরে প্রেরিত হইতেছে। সমগ্র দেশটাতেই গরু মারিবার ফাঁদ পাতা।

এদিকে দেশে গরুর সংখ্যা যত কমিতেছে, লোকের স্বাস্থ্যও সেই পরিমাণে ক্ষয় পাইতেছে; এদেশের লোকের পক্ষে দুগ্ধ এবং ঘৃতই প্রধান পুষ্টিকর আহার। কিন্তু ইহার পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। শিশু জলসাগু খাইয়া এবং পূর্ণ বয়স্কেরা কাঁচকলাপোড়া খাইয়া কতকাল তিষ্টিতে পারে। এই অনাহার ক্লিষ্ট অপুষ্ট শিশুদিগের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবশে যৌবন সীমায় উপস্থিত হয়, তাহার পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে পরিনীত হইয়া পুন্নাম নরকের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। এই প্রপৌত্র আবার যথা সময়ে বংশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। নির্ব্বংশ হওয়া হিন্দুদিগের পক্ষে বড়ই মনঃক্ষোভের বিষয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? তাই মনে হয় ভারতের বিলোপ দূরবর্ত্তী নহে।

একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে সম্পূর্ণ না হউক বহু পরিমাণে গরুর অকাল মৃত্যু এবং গোজাতির অবনতির নিবারণ করা যাইতে পারে। সর্ব্বত্র গোচরণের প্রশস্ত ময়দান করাই গোরক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। মিউনিসিপাল আইনের সাহায্যে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে কুত্রাপি ভূমি লাভের ব্যাঘাত হইতে পারে না। তবে কি জান, আমরা মিউনিসিপাল

সভ্য লোকের পায়ে যাহাতে কাদা না লাগে ইহাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। এরূপ মনে করিলে কখনই কিছু হইবে না। যে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, গোচারণের প্রশস্ত মাঠ নাই, লোকেরা জ্বরে, বসন্তে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে ক্রমাগত মরিতেছে প্রমাদ গুনিয়া বড় মানুষেরা বিপৎকালে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য, রাজপুরুষেরা কেন এমন স্থানে 'গোদের উপর বিষফোড়া' করিয়া লোকদিগকে অধিকতর ক্লেশভাগী করেন বুঝিতে পারি না।

মিউনিসিপালিটীর ন্যায় মনে করিলে সর্ব্বত্রই গোচারণের মাঠ করা যাইতে পারে, কেবল একটু একতার প্রয়োজন। যে স্থানে বারোয়ারির ধূমধাম হয় সে স্থানে গরুচরিবার মাঠও হইতে পারে। ফলকথা, যদি সবংশে বাঁচিতে চাও, অগ্রে গরু রক্ষা কর। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পাইলে রোগের বীজাণু আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। দুর্ব্বলতাই রোগের কারণ। সকলই দেখিয়াছে লোকে একবার জ্বরাক্রান্ত হইলেই পুনঃ পুনঃ জ্বরে পড়িতে থাকে, কারণ দৌর্ব্বল্য; এই দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ পান। সম্মিলিত চেষ্টায় যেমন বারোয়ারি হয়, সেইরূপ গোচারণের মাঠও হইতে পারে। রেলওয়েও জাহাজ আমাদের ধ্বংশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানকার রোগ সেইখানেই থাকিত, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত, ইদানীং তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ভারতে ও ইংলণ্ডে চাউল এবং গোধূম প্রায় তুল্য মূল্য, ভারত হইতে খাদ্যের রপ্তানি হইতেছে বিদেশ হইতে নানাবিধ অশ্রুত-পূর্ব্ব রোগের আমদানী বাড়িতেছে, লোকে একে খাইতে পায় না তাহার উপর রোগ, কাজেই যম দ্বার যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে উৎপত্তি কমিতেছে।

কেহ কেহ বলেন আমেরিকা ও ইউরোপেও তো রেলওয়ে ও জাহাজ আছে, সেখানে তো লোক না খাইয়া মরে না এক স্থানের রোগ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে না? ইহার উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের লোক মানুষ, আর আমরা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিরহিত অক্ষম পশু। তাহারা অন্য দেশ হইতে শস্য সম্পত্তি স্বদেশে লইয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিদেশের ধন রত্ন স্বদেশে আমদানি করে। যেখানে

খাদ্যের ও সম্পদের অভাব নাই, মানুষ মানুষের মত বলীয়ান ও তেজস্বী, তত্রত্য লোক রোগের বীজ পরিপাক করিতে পারে। ভারত নিরন্ন এবং দরিদ্র সুতরাং এখানে যে রোগের একবার আমদানি হয় তাহা আর ছাড়িতে চায় না। রেলওয়ে জাহাজ যেখানকার জিনিস, সেখানেরই গৌরব ও শোভা, আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কৃতান্ত।

অসময়ে আহার ও আহারান্তেই ছুটাছুটী শীতপ্রধান দেশের পক্ষেই শোভা পায়, আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। যাহারা ইংরেজী লেখাপড়া করে বা কোন আফিসের চাকর, তাহার অধিকাংশই অম্ল বা অজীর্ণতা ও তদানুষঙ্গিক বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কোনরূপে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকে। 'শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'। শরীর না থাকায় কোন কার্য্যেই ইহাদের আন্তরিকতা নাই, ইহারা যাহা কিছু করে, যাহা কিছু বলে সমুদায়ই সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত সুতরাং পরিণাম শূন্যগর্ভ।

কিন্তু আমরা যতই কেন চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিরহিত হই না রাজ-পুরুষগণ নিশ্চেষ্ট নহেন, তাঁহারা দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা আমদানি রপ্তানির হিসাব, স্বদেশ জাত পণ্যের উৎপত্তি ও স্বদেশীয় পণ্যের বিক্রয় কৌশল আমাদের চক্ষের উপর সর্ব্বদাই ধরিয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য তোমরাও আমাদের মত হও। কিন্তু আজ অন্ধ আমরা তাহা দেখি না, তাঁহাদের ভাব ভঙ্গী বুঝি না সুতরাং আমাদের মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অপরাধী করা যায় না, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি, 'তারার' অপরাধ কি?

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

দুঃখ।

কত দুঃখ কত যন্ত্রণা সয়ে
রহিয়াছি আমি, তোমারে চেয়ে,
দিনে দিনে যত সহিয়াছি জ্বালা;
সেত দুঃখ নয়, তোমারই প্রেমের মালা।

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

জাতীয় সঙ্গীত।

পাহাড়িয়া মিশ্র।

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান!
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান!
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তোমারে করিতে দান!
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক জুটে!
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা দীন আয়োজন,
চির দারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধূলা লুটে!
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে!
রাজা তুমি নহ, হে মহা তাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়!
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন, তাই আমাদের দিয়ো!
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়!
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয় ভ্রমণ। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পথে,—গিরিডি, দেওঘর, বাঁকিপুর।

খানু জংসন হইতে রাত্র ৯টার সময় মধুপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গিরিডির ট্রেণ ছাড়িতে অনেক সময় ছিল। টিকিট করিয়া, মাত্র ৫১০ দুই পয়সা রহিল এবং তাহাতে দুইবার চা পান করিলাম। রাত্রি অল্প শীতল ছিল। প্রায় ২টার পর ট্রেণ ছাড়িল এবং ৪টার পর গিরিডি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমি ফাষ্টক্লাস ওয়েটিং রুমে কোচে শুইয়া অল্পক্ষণ নিদ্রা গেলাম। যখন বাহিরে এলাম তখন পরিষ্কার প্রাতঃকাল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

১০ই আশ্বিন বুধবার, প্রাতে গিরিডিতে ব্রাহ্মগণ প্রভাতী কীর্ত্তন করিয়া পথে চলিয়াছেন, আমি তাহাতে যোগ দিলাম। প্রাতে এরূপ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন বড়ই মধুর লাগিল।

১২ই শুক্রবার পর্য্যন্ত গিরিডিতে ছিলাম, তখন এখানে ব্রাহ্মসমাজে উৎসব ছিল তাহাতে যোগ দিলাম। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা হইল। তিনিও বলিয়াছিলেন, "যোগীন্দ্র! বোধহয় তোমার সহিত ইহলোকে এই শেষ দেখা"। আমি এই তিন দিনই গণেশবাবুর বাড়িতে ছিলাম।

গিরিডি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক বাড়ি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের লোকই অধিক। খোলা জায়গায় একটু দূরে দূরে এক একটী বাড়ি, দৃশ্যটী বেশ সুন্দর বোধ হইল। বেড়াইবার মাঠ বিস্তৃত। এখানে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও আমার পাথেয়র কথা বলিতে হয় নাই। আমি আপাততঃ এখান হইতে দেওঘর যাইব শুনিয়া শ্রদ্ধেয় রামলাল বাবু বিশেষ সন্তোষ ভাবেই কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়াছিলেন।

১৩ই আশ্বিন শনিবার প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। ৫-২০ মিনিটে গিরিডি হইতে ট্রেণ ছাড়িল, কিছুক্ষণ পরে মধুপুর গাড়ি বদলের সময় দেখি, উমেশবাবু! (সিটী কলেজের প্রিন্সিপল শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) পচম্বা হইতে দেওঘর আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বালকপুত্র আনন্দ। হঠাৎ আমাদের এই

সম্মিলন বিশেষ আনন্দপ্রদ হইল এবং উমেশ বাবুর সহিত দেওঘরে আমি প্রকাশ বাবুর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে পারিবারিক উপাসনা উমেশবাবু করিলেন, তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনায় যোগ দিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গীত করিয়া কয়েকদিন বড়ই উপকৃত হইলাম। সেই সময়ে দেওঘর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার ফকির চন্দ্র সাধুখাঁর বাড়িতে উপাসনা ছিল। সোমবার রাত্রে স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পুত্র যোগীন্দ্র-নাথের শ্রাদ্ধোপাসনা হইল। ঋষিপুত্র, যোগীন্দ্রনাথও কৌমার্য্য ব্রতধারী ঋষি ও ভক্ত সেবক ছিলেন। রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ও জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণসহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উমেশবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় আমার মনে ভগবানের অনন্তভাব, ও আমাদের প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণার এমন একটী সুন্দর স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, যাহা এখন প্রকাশ করা সহজ বোধ হয় না, তবে যতদূর স্মরণ হয়; তাহাতে এইমাত্র বলা যায় যে—ভগবান এই জগতে আমাদের মঙ্গল ও সুখ শান্তির জন্য কত অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমরা অনন্তকাল ধরিয়া (ইহ, পরলোকে) তাহা উপভোগ করিব। তিনি যে অনন্ত করুণাময়, এই ভাব উজ্জ্বল বোধ হইয়াছিল।

সোমবার রাত্রেই আমরা দেওঘর হইতে রওনা হইলাম। উমেশবাবুর সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ পরিচয়াদি ভাল রকমই ছিল কিন্তু এই তিন দিনের সঙ্গগুণে কি যে মহচ্চরিত্রের ভাব দান করিলেন, তাহা আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না। এমন শান্ত সুমিষ্ট প্রেমপূর্ণ জীবন বড়ই দুর্লভ। ১৪।১৫ বৎসরের বালক আনন্দও একখানি ছোটখাট "প্রিয়দর্শন" ছবির মত, আমার প্রাণে সেই হইতে জাগরিত হইয়া রহিয়াছে। আনন্দের পাঠশিক্ষাদি পথে পথেও পিতার নিকট অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়াছিল দেখিয়া ভাবিলাম, পণ্ডিত পুত্রের শিক্ষা এইরূপে চলিবে না কেন? যাত্রাকালিন উমেশ বাবু আমার হাতে আস্তে আস্তে একটী টাকা গুঁজিয়া দিতেছেন দেখিয়া, আমি প্রথমে তাঁহার নিকট টাকা লইতে অস্বীকার করিলাম; কিন্তু তাঁহার ভাব আমাকে পরাস্ত করিল। প্রকাশবাবুও ১৲ টাকা দিয়াছিলেন।

আমরা বৈদ্যনাথ জংসনে ২টার সময় একস্‌প্রেস্ ট্রেণ ধরিলাম, উমেশবাবু

চুনার যাইবেন, বোধহয় তাঁহার ইন্‌টার ক্লাসের টিকিট ছিল আমি বাঁকিপুরের টিকিট করিয়া থার্ডক্লাস গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় ছিল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বসিবার স্থান পাইলাম, এবং ১৬ই মঙ্গলবার প্রাতে বাঁকিপুর পৌঁছিলাম।

১৬ই ও ১৭ই দুইদিন বাঁকিপুর শ্রদ্ধেয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ি থাকিয়া ডাক্তার কামিখ্যাবাবু, শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল গুপ্ত ও ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিলাম। অনেক দিনের পর সাক্ষাতে পরস্পরের মধ্যে আনন্দানুভব হইল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামিখ্যা বাবু যখন মঙ্গলগঞ্জে ছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী নিতান্ত শিশু ছিল; সে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ মাত্রকেই মা সম্বোধন করিত অর্থাৎ তাহার নিকট এ জগত মা বলিয়াই বোধ হইত মাত্র। সেই শিশু "নবজীবনকে" বড় দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রকাশবাবু এ সময় পাহাড়ে গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পর্কীয় নাতি, গিরিন্দ্রনাথ বাড়িতে ছিল, ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান ও নম্র; আমার কোন কষ্টই হয় নাই। মেয়েদের বোর্ডিং প্রকাশবাবুর স্বর্গীয়া পত্নী অঘোর কামিনীর স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির উপাসনাগৃহটী নিতান্ত পবিত্র গাম্ভীর্য্যভাবপূর্ণ; অনুরুদ্ধ হইয়া এই গৃহ-দেবালয়ে মেয়েদের লইয়া আমাকে দুইদিনই উপাসনা করিতে হইয়াছিল।

১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, প্রাতে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদের ছাত্রাবাসে (বোর্ডিংএ) আমরা উভয়ে উপাসনা করি; উপাসনার কার্য্য আমাকেই করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু উপাসনার প্রথমে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ একটী সঙ্গীত করেন, অদ্যাপি সেই সঙ্গীতের কথা ভুলিতে পারি নাই। যখন যেখানে সেই সঙ্গীত করিয়াছি, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন প্রায়ই তাঁহারা তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন। সে সঙ্গীতটী এই :—

কীর্ত্তনের অংশবিশেষ।

(খয়রা) "চল চল ভাই, মার কাছে যাই,
নাচি গাই প্রেমভরে।
(গিয়ে) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে,
হেরি তাঁরে প্রাণ ভরে।

থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে;
(আর রব না, রব না;—দেহ-পুর-বাসে)
সেই জন্মস্থান হেথা অবস্থান,
কেবল দুদিনের তরে। (চল চল ভাই ইত্যাদি)
মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসে মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ তলে,
(সুরে সুর মিলায়ে) অনন্ত জীবনে
অনন্তমিলনে, বিহরিব লোকান্তরে"।

তৎপরে আহার করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া ১০-৩৫ ট্রেণে বাঁকিপুর ছাড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের বিদ্যা শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরও তদনুরূপ আবশ্যক। আমি এমন কথা বলিতে চাহি না যে, পুরুষ অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করেন, স্ত্রীলোকেও সেই সমুদয় বিদ্যা শিক্ষা করুন। জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন, বিবাহিত না হইলে, মানব পূর্ণ-অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অনূঢ় অবস্থায় মানব অর্দ্ধাঙ্গ থাকে। বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট স্ত্রী বিহারের সামগ্রী নহে; অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। হিন্দুশাস্ত্রে সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মকার্য্য করিলে তাহা অপূর্ণ থাকিয়া যায় ইহা উক্ত আছে। সহধর্ম্মিণীকে লইয়া যদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিতে হইবে। নারীজাতি যদি শিক্ষিতা না হয়েন, তাহা হইলে মানব পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না; কেন না, অর্দ্ধাঙ্গ অনুন্নত থাকিলে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ পুষ্টিলাভ করিতে অক্ষম হয়।

সুতরাং মানব পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইল না। শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মভাবেরও উন্মেষ হয় না। বিদ্যা ধর্ম্মের একটী প্রধান সহায়। শিক্ষা না হইয়া ধর্ম্মভাব উন্মীলিত হইলে, উহার আর উৎকর্ষতা লাভ হয় না; বরং কোন কোন স্থলে উহার দ্বারা নানাবিধ কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান কি? তাঁহার উপাসনাই বা কি? এবং তাঁহার উপাসনায় মানবের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারিলে যে তাঁহারা কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকৃত সুশিক্ষা অভাবে, তাঁহারা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া ও অধর্ম্মে নিরত হইয়া অমূল্য মনুষ্যজীবন বৃথা নষ্ট করেন, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাতরা।

স্থানীয় সংবাদ।

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ, খাঁটুরা নিবাসী মঙ্গলগঞ্জের জমিদার স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ের দৌহিত্রী ও সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণেল আর, এল, দত্ত (রসিক লাল দত্ত) মহাশয়ের পৌত্রী, কুমারী আশালতার সহিত বাঁকিপুরের ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরার সিভিল হাঁসপাতালের ডাক্তার শ্রীমান্ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ ৩৭নং থিয়েটার রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় পাত্র পাত্রীর জীবনে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ উজ্জ্বল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় দেওয়ানজী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। তিনি অনেকদিন হইতে ভগ্নশরীরে সংসারের নানা পরীক্ষা ভোগ করিয়া, অনূন ৬৫ বৎসর বয়সে বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ নিমোনিয়া রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বিচক্ষণ তদ্রূপ শান্ত নিরীহ-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন,

জমিদারী বিভাগে কার্য্য করিয়া এমন শান্তভাব রক্ষা করা, এ তাঁহার স্বাভাবিক জীবনেরই ফল। গোবরডাঙ্গা জমিদার বাবুদের ষ্টেটে তিনি যৌবনকাল হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়া চিরদিন সসম্মানে কাটাইয়াছিলেন। যদিও মধ্যে অল্পদিন ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে চাঁচল প্রভৃতি ষ্টেটে অল্পদিন কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আবার সেই পূর্ব্ব পদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর অধিককাল তাঁহাকে পৃথিবীর দাসত্ব করিতে হইল না। তাঁহার জীবন আর একটী স্বাভাবিক সদ্ভাব ছিল। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, যেমত তাঁহার চিরানুরক্ত ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্যেষ্ঠের প্রতি কোনদিন বিচলিত হয় নাই, তেমনি তিনিও সংসারে নানাবিধ স্বার্থের সংঘর্ষ সত্বেও চিরদিন ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং ঐক্যতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল সহোদর ভ্রাতার প্রতি নহে, পুরন্দরবাবুর মৃত্যুতেও তিনি সহোদরের ন্যায় কাতর ছিলেন। যাহা হউক ঈশ্বর কৃপায় তিনি উভয় পক্ষের পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি যাঁহাদিগকে ইহলোকে রাখিয়া গেলেন, তাঁহারা তাঁহার ঐ সকল সদ্গুণের অধিকারী হউন, এবং ভগবান পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে স্থানদান করুন।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণের বনগ্রামের সহযোগী "পল্লীবার্ত্তায়" জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,—"গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। বর্ত্তমান সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সকলেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে উদাসীন। কেবলমাত্র গোবরডাঙ্গার বাবুদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয় চলিতেছে। ইহার উপর যদি দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে, অচিরাৎ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইবে। আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন"। পত্রপ্রেরক মহাশয় কথাটী উল্লেখ করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ধারণায়, তাঁহার "আশা করি সাধারণে এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন" এই মন্তব্যটী উল্টা বলা হইয়াছে। কারণ অগ্রে বাবুদের এমন কিছু যত্নবান

হওয়া আবশুক, যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্নবান হন। নতুবা আপন হইতে দেশের লোক যত্নবান হইবেন তাহার বড় সম্ভাবনা নাই। বড়বাবু ইচ্ছা করিলে দেশের কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী 'স্কুলকমিটী' গঠন করিয়া, যোগ্য ব্যক্তিগণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার দিয়া, বৎসর বৎসর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ, ছেলেদের উৎসাহজনক নানাবিধ উপায় গ্রহণ এবং নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা, এবম্বিধ উপায় দ্বারা শীঘ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন। অবশ্য এ প্রকার করিতে হইলে আরও অর্থের আবশুক; বড়বাবু একটু চেষ্টা করিলে যাহা হইতে পারে, আর কাহার দ্বারা তাহা হয় না, কিন্তু সেরূপ মতি ও সে মন কোথায়? বহুদিন পূর্ব্বে যখন শক্তিকণ্ঠবাবু হেড-মাষ্টার ছিলেন, তখন একবার স্কুলের মুখ ফিরিয়াছিল, সেবার ৪টী ছেলেই প্রথম বিভাগে পাস হইয়াছিল। মঙ্গলগঞ্জ মিসন হইতে ছেলেদের মেডেল দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাবুদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যুবক বাবুদের কথা ভাবিলেও মনে হয় তাঁহারাও যে দেশের কাজ করিবেন এমন লক্ষণ ত দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বর্ষ 'কুশদহ'র উন্নতি দর্শনে অনেকে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কুশদহের স্থায়ীত্ব কামনাসূচক পত্রাদি লিখিতেছেন। এরূপ কামনা অধিকাংশের মনে হইলে সচ্ছন্দে কাগজখানি পরিচালিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

আমরা এবার যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে কুশদহ পাঠাইতেছি, তাহা সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি, তাঁহারা গ্রাহক হইলেন; অন্যথা অনিচ্ছা থাকিলে একটু জানাইবেন। অগ্রিম চাঁদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাঠা'ন সকলের পক্ষে ঘটে না, এজন্য আমরা পর পর ভিঃ, পী, করিতে চাই, আশাকরি ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। তবে, ঈশ্বরকৃপায় এই সামান্য চাঁদা দানে যাঁহাদের কষ্ট নাই, তাঁহারা মণি-অর্ডারে পাঠাইলেই ভাল হয়। নতুবা মাসিক ২৯৲ ৩০৲ ব্যয় নির্ব্বাহ আমরা কিরূপে করিব?

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সঙ্গীত।

বেহাগ।—আড়া।

তোমারি করুণায়, নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গল-নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে।
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥

শাস্ত্র সঙ্কলন।

১। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋকবেদ মং ১। অং ২২। মু ১৬৪। ঋ ৩৯।

যাঁহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ সকল স্থিতি করে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিল, সে ঋক্‌দ্বারা কি করিবে? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন।

২। প্রণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনোবিদুঃ
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং মনসৈবাপ্তব্যম্॥

যজুর্ব্বেদ, প্রপাং ১৪। অধ্যায় ৭। প্রাং ২। ষ ২১।

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া জানেন; তাঁহারাই সেই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চয় জানেন। কেবল মনের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হয়েন।

৩। অকামো ধীরো অমৃতঃ সয়ম্ভুং রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোবাত্মানং ধীরমমরং যুবানম্।

অথর্ব্ববেদ ১০। ৮। ৪৪।

সেই পরমাত্মা কামনাপরিশূন্য, বিকারবিরহিত, অমৃত, স্বয়ম্ভু, নিজ আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত, কিছুতেই ন্যূন নহেন, অবিকারী অমর শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাকে জানিয়া মনুষ্য আর মৃত্যুকে ভয় করে না।

৪। অপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদো-
দথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যথা তদক্ষরম ধিগম্যতে

মুণ্ডকোপনিষৎ ১। ১। ৫।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

৫। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

ঈশোপনিষৎ। ১।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভোগ কর; কাহার ধনে লোভ করিও না।

৬। নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ॥

তলবকারোপনিষৎ। ১০

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না ; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

৭। অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

কঠোপনিষৎ। ২। ২০।

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতা ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করেন।

৮। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্॥

কঠ ২। ২৩।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। (ক্রমশঃ)

কুশদহ। (২)

ইছাপুর ও চৌবেড়িয়া।

"If after every tempest come such calms,
May the winds below till they have wakened death,"

(Shakespeare)

"উত্থান ও পতন" জগতের নিয়ম। যে মিশর, রোম, গ্রীস একসময়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল আজ তাহা কোথায় ? যে আর্য্যগণ বিস্তার, বুদ্ধিতে ও রণকৌশলে এক সময়ে সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল

আজ তাঁহাদের সে সমস্ত কীর্ত্তি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন সবই সেই নিয়মের অধীন তখন একটা সামান্য কুশদহ সে নিয়মের অধীন হইবে না কেন? যেমন প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ "কুশদহ" বঙ্গদেশের মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক্ষণে অবনতির নিম্ন স্তরে সমাসীন হইয়াছে। কুশদহের অবনতির কারণ কি? যতদিন কুশদহ মধ্য প্রবাহিতা যমুনানদী খরস্রোতা ছিল ততদিন ইহার অবনতির কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যমুনানদীর অবনতির সহিত যে কুশদহের অবনতি ইহা অনেকে স্বীকার করিবেন।

কুশদহ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ইহার অধিকাংশ যশোহর ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত, অল্প অংশ নদীয়ার মধ্যে অবস্থিত। এ প্রদেশের মধ্যে কোন পাহাড় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ইহা একটী সুজলা সুফলা শ্যামল শস্যক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে নদী, বিল, খাল, জঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আছে। নদীর মধ্যে যমুনা নদীই প্রধান। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কাঁচড়াপাড়ার নিকট ভাগিরথী হইতে বহির্গত হইয়া বাগের খালের মধ্যদিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখী হইয়া, সোনাখালি, বীরুই, চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া, জলেশ্বর, গাইঘাটা, মাটিকোমরা, শ্রীপুর, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বালিয়ানী, গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, গয়েশপুর, ঘোষপুর ও চারঘাটের নিম্ন দিয়া চারঘাটের কিছু পূর্ব্বে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কুশদহের অনেকগুলি গ্রামই ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার সহিত আরও দুইটী নদী মিলিতা হইয়াছে—একটী টেংরার খাল অপরটী চালুন্দিয়া। টেংরার খাল আজও বর্ত্তমান কিন্তু চালুন্দিয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে বিল ও খালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। শুনা যায় পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত প্রশস্ত নদী ছিল। ইহা দিয়া অনেক বড় বড় নৌকাদি গমনাগমন করিত। এই চালুন্দিয়ার গর্ভে পুষ্করিণী খনন করিবার সময়ে অনেকে বড় বড় নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন।

কুশদহের মধ্যে ইছাপুর একটী প্রাচীন স্থান। ইছাপুরের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া বড়ই কঠিন। অনেকে অনুমান করেন ইছাপুরের প্রাতঃস্মরনীয় ৺ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের সময় হইতে ইহার উন্নতি। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্ব্বে ইছাপুরের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাই না বলিয়া আমাদের এরূপ ধারণা।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গার সুবাদার দাউদ খাঁ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে যখন দিল্লীর প্রধান সেনাপতি তোডরমল্ল উক্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন তখন চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়িয়া) কায়স্থ রাজা সমর শেখর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়ে ইছাপুরে নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নামে একজন সামান্য জমীদার ছিলেন। ইঁহাদিগের পর জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়ের নাম পাওয়া যায়। কাশীনাথ রায়ের নিকট সিদ্ধান্তবাগীশ একজন সামান্য কর্ম্মচারীরূপে থাকিতেন। রাজা কাশীনাথের মৃত্যুর পর সিদ্ধান্তবাগীশ একজন বিখ্যাত যোগ-সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। বঙ্গের শেষবীর যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশের অলৌকিক কার্য্যে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। আবার বঙ্গের সুবাদার মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লীনগরীতে লইয়া যাইতেছিলেন তখন ইছাপুরের নিকট শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া অবস্থান কালে নিজ অদ্ভুত্ ক্ষমতাবলে মানসিংহের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বলে সিদ্ধান্তবাগীশ ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরের চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ, আদিশূর রাজার যজ্ঞে আনীত কান্যকুব্জবাসী দক্ষের সন্তান। ইঁহার সবিশেষ পরিচয় গৈপুর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুশদহের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দিয়াছেন।

চৌবেড়িয়া যমুনানদীর উপরেই অবস্থিত। যখন সমরশেখর চৌবেড়িয়ায় রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে ও তৎপূর্ব্বে ইহার নাম চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ছিল। তৎপরে ইহার নাম সংক্ষেপ করিয়া চৌবেড়িয়া হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যমুনা নদী ইহার প্রায় চারিদিকে বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম চৌবেড়িয়া হইয়াছে। চৌবেড়িয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম স্থান। ইঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া পরে হুগলী কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনে ইনি উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি পুরস্কারাদিও প্রাপ্ত হন।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাক বিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। এবং অতি অল্প কাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে ডাক বিভাগের অন্যতম সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া "প্রভাকর" পত্রে প্রকাশ করিতেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক মহাত্মা লঙ্‌ সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লঙ সাহেবের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। নীলকর দিগের অত্যাচার এই "নীলদর্পণের" জন্য অনেক কমিয়া যায়। "নবীন-তপস্বিনী, "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" প্রভৃতি নাটক এবং "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন ও "দ্বাদশ কবিতা" এবং "সুরধনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচনা ললিত ও মনোহর। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষার লেখক দিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। কুশদহ দীনবন্ধুর জন্য সম্মানিত।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক।

সত্য পরিত্যাগে—ভারতের পতন।

বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীসাধিপতি—দিগবিজয়ী আলেকজান্দার দি গ্রেট্‌ ভারত জয় করিতে আসিয়াছিলেন। পুরুরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পুরু পরাজিত হইয়াছিলেন। সৈন্য সামন্তবিহীন পুরুরাজ বিজয়ী আলেকজান্দারের সম্মুখে নীত হইলে নির্ভিক ও অক্ষুদ্ধচিত্তে, বিজয়ীর সম্মুখে মৌন হইয়া রহিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করেন কিনা। "না" এই উত্তর পাইয়া গ্রীসাধিপতি প্রশ্ন করেন,

"আপনার 'না' বলিবার কারণ কি।" পুরু উত্তর করিয়াছিলেন, "সৈন্ত সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকাতে আমি এক্ষণে সৈন্য শূন্য হইয়াছি; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই এরূপ নিবীর্য্য ছিল না যে প্রাণ ভয়ে তাহাকে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হয়। ফলতঃ শত্রুপক্ষীয় দ্বিগুণ সৈন্যদিগকে সমন সদন দেখাইয়া আমার সৈন্য দল স্বর্গের প্রশস্ত সোপানে আরোহণ করিয়াছে। আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত; কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন কুলক্রমাগত আচরণের বিরুদ্ধ বলিয়াই—যবনজেতা—ক্ষত্রিয় বীরকে দেখিতে পাইতেছেন। যগুপি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহার অভিরুচি হয়,—তাহা হইলেই যবন ও ক্ষত্রিয় শোণিতের প্রভেদ কি—আমি তাহা যবনবীরকে বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিতে পারি।"

ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে উভয়েই একইরূপ অস্ত্রে সুশোভিত হইলেন। মানসিক ও দৈহিক বলে এবং অস্ত্র সঞ্চালনে বোধ হয় উভয়েরই সমান নৈপুণ্য ছিল; কারণ তাহা না হইলে বাগযুদ্ধের দ্বারায় ক্রোধ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইত। যাহা হউক এ যুদ্ধে আলেকজান্দারেরই পরাজয় হইয়াছিল। গ্রীসরাজ-কুলতিলক ইহার পর আর ভারত অধিকার করিতে যত্ন করেন নাই। তাঁহার মহানুভবতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে তিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, "যদিও গৃহ-বিবাদে এক্ষণে ভারতের ক্ষত্রিয় সন্তান অবসন্ন, তত্রাচ কেহ যেন মনে কখন না ভাবেন যে ক্ষত্রিয় বীর বীর্য্য হীন। আমি ইহাও না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে বিশেষ অনুসন্ধানেও আমি বা আমার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই একজন ইতর হিন্দুকেও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিলাম না।"

বহু বৎসর পরে চীন দেশের সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য পরদেশ ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে দ্বাদশ বৎসর অবাস্থতির পর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, এ স্বর্ণ-প্রসূতির সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে কেহই কখন মিথ্যা কথা বলে না। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপারটি বোধ হয় মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় পুলকিত করে।

চীন মহোদয় এক দিবস কোন ভারতবর্ষীয় বিচারপতির নিকট উপবিষ্ট হইয়া বিচার শ্রবণ ও পদ্ধতি দর্শন করিতেছিলেন। জনৈক ইতর লোকের উপর অভিযোগ হইল। পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হইলে প্রাণবধই তাহার দোষের সমুচিত দণ্ড। বিচারপতির সম্মুখে সে আনীত হইল। তিনি তাঁহাকে পরিষ্কাররূপে

বুঝাইয়া দিলেন যে, যদ্যপি সে উক্ত দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতিশয় কাতর ভাবে ও করযোড়ে সে নিবেদন করিল যে, সে তাহার শোক সন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর এক মাত্র অবলম্বন। বিচারপতি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, যে দোষ অস্বীকার করিলেই তাহার নিষ্কৃতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কারণ তাহার উক্তা বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার উক্ত অপরাধের অন্য সাক্ষী ছিল না। দোষী ইতর লোক কাঁদিয়া আকুল, সে বলিতে পারিল না যে সে সে কুকর্ম্ম করে নাই। তাহাকে অন্তরিত করা হইল। সাক্ষীরূপে তাহার জননী আহুত হইয়া কিছুতেই বলিতে পারিল না যে তাহার একমাত্র পুত্র সে দোষের কার্য্য করে নাই! বিচারপতি বৃদ্ধাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, এ মকর্দ্দমায় অন্য সাক্ষী ছিল না। তাহার সন্তান নির্দ্দোষী এই কথাটি মাত্র সে একবার তাহার মুখ নির্গত করিলেই তাহার পুত্রকে লইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে গমন করিতে পারে। কিন্তু চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "আমার অদৃষ্ট দোষে বাছা যে সে দোষ করিয়াছে"।

হিন্দু সন্তানগণ! একবার ভাবিয়া দেখ,—হিন্দুত্ব কি ছিল, আর এখনই বা হইয়াছে কি?

ভারতের অধঃপতনের পরিণাম, তাহাতে মুসলমান অধিকার স্থাপন। ছয় সাত শত বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে—ইংরাজাধিকার আরম্ভ হয়। রাজ বিপ্লবে বা পরিবর্ত্তনে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তাহা দূরীভূত হইলে, অর্থাৎ প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে, লোকমনোমুগ্ধকর ও আপামর সাধারণকে শিক্ষাপ্রদ কথকতা, চিরস্মরণীয় শ্রীশ্রীগদাধর শিরোমণি মহাশয় এই বঙ্গদেশেই সুপ্রকাশ করেন। তাঁহার এ কীর্ত্তি বোধ হয় চিরকালই জগতে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া ঘোষিত হইবে; কারণ এরূপ প্রথা অন্য কোন দেশে কখন ছিল না—নাই এবং হইবে বলিয়াও অনুমান করা যায় না। যখন শিরোমণি মহাশয়ের যশে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এক দিবস অপরাহ্ণে কোন পথিক বিশ্রাম-বিপণি সম্মুখে বাহক দিগের বিশ্রামার্থে শিবিকা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কোন সুবেশ সম্পন্ন ভদ্রলোককে তাঁহার নিকট আগমন করিতে দেখিয়া শিবিকা হইতে

বহির্গত হন এবং সে আগন্তুককে নত শির দেখিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করেন। আগন্তুকও শিবিকাতেই গমনাগমন করেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া শিরোমণি মহাশয় বিবেচনার সহিতই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন "কৃপণের ধন কাহার প্রাপ্য।" সহাস্য বদনে শাস্ত্রের বচন প্রকাশ করিয়া শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন "তস্কর, রাজা ও অগ্নি, কৃপণের ধন অধিকার করিয়া থাকেন। একত্রিভূত হইয়া আসিলে প্রত্যেকেই উক্ত ধনের তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি ঐ তিনজনের মধ্যে কেহ অনাগত থাকেন, তাহা হইলে অপর দুই জন উক্তধন সমানাংশে গ্রহণ করেন। যদ্যাপি ঐ তিন জনের মধ্যে একজন মাত্র আগমন করেন তাহা হইলে উক্ত ধনে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার হইয়া থাকে"। এ ব্যবস্থায় উক্ত ভদ্রলোক অতিশয় পুলকিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গুণ ব্যাখ্যায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভদ্রলোকটি করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বিশেষ লভ্যের প্রত্যাশায় শিরোমণি মহাশয় কোন ধনী লোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন; সেই জন্য তিনি সে সময়ে উক্ত ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলায়, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে ও উক্ত ধনী লোকের নিকট তিনি কত টাকা প্রাপ্তির আশা করেন। সহাস্যবদনে শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর হইল—"আপনার কল্যাণে পঞ্চলক্ষাধিপতি হইয়াছি এবং যে স্থানে গমনে উদ্যত হইয়াছি সেখানেও পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন লভ্যের প্রত্যাশা করিনা"। করযোড়ে ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি বহুগুণের আধার। সেই জন্য আপনাকে নিঃস্ব করিবার প্রযত্ন যুক্তিও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ! আপনি যে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে একজন ভদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্ট থাকিতে পারেনা। এদিকে আবার সে ধন এক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার করায়ত্ব হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্য কাহার অধিকার উপস্থিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ এক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা বা অগ্নি সে ধনের জন্য উপস্থিত হন নাই। আমি তস্কর

এবং আপনি কৃপণ। আমার নাম রঘুনাথ। আপনি আপনার বিমাতার ভরণপোষণ করেন না বলিয়া কৃপণের মধ্যে গণ্য। পণ্ডিত হইয়া আপনি কখনই ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্ম করিবেন না, ইহা স্থির জানিয়াই আমি অনুরোধ করিতেছি, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার অধিকার আমাকে অর্পণ করিয়াই আপনি পুনরায় ধন উপার্জ্জনে বহির্গত হইবেন। যদি অতঃপর কৃপণতা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে উক্ত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রারও হিসাব আমাকে পরে দিলেই হইবে।

শিরোমণি মহাশয়ের বদন শুষ্ক ও নয়ন স্থির। কিন্তু তিনি রঘুনাথের যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্র-সম্মত কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। মৌন হইয়াই তিনি শিবিকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার বাহকগণ গুরু কার্য্যানুরোধ অনুমান করিয়াই সত্বরপদে তাঁহার গৃহের সম্মুখদ্বারে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। বহির্গত হইয়াই রঘুনাথের বিনীত ভাব দর্শন ও মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্চিত ধন বহন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তিনি ন্যূনপক্ষে পঞ্চবিংশতি বিভীষিকাপ্রদ বদন নয়নগোচর করিলেন এবং ভাবিলেন তস্করদিগের কি সুন্দর কার্য্যতৎপরতা। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি রঘুনাথকে কহিলেন, "তস্করপ্রবর! যে কথকতার প্রসাদে আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাদিগকে সেই কথকতা শ্রবণ করাইয়া তোমার করে এই সংগৃহীত অর্থ অর্পণ করি"।

এ সময়ে এ সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে রঘুনাথ অসম্মত হইলেন না; কারণ তখন পর্য্যন্ত যামিনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয় নাই। দুই প্রহরের পরও অন্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে ইহা স্থির বুঝিয়াই রঘুনাথ অনুচরবর্গকে সুরস কথকতা শ্রবণের আদেশ করিলেন। যখন শিরোমণি মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন, তখন পরদিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। স্বদলবলে অবাক হইয়া রঘুনাথ করযোড় করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আশ্চর্য্য শক্তি। আমার অনুচরবর্গ হৃদয়-শূন্য এবং তাহাদিগকে একরূপ লৌহ বা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার কথায় প্রস্তর দ্রবীভূত ও লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছে। আপনার সঞ্চিত ধন আপনার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি গ্রহণ করিলাম কিন্তু আপনার মর্য্যাদা

রক্ষার্থে আমি তাহা আবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে বিমাতা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পরদুঃখ মোচন যেন আপনার ব্রত হয়। আর যেন কৃপণতাকলঙ্ক আপনার নিষ্কলঙ্ক যশশশী স্পর্শ না করে এবং আমাকে যেন আর আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে না হয়”।

শিরোমণি মহাশয় দুইটি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ ভাবে কহিলেন, “রঘুনাথ! কালপ্রভাবে যদি বঙ্গদেশবাসির হৃদয়ে তস্কর প্রবৃত্তি প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা যেন তোমার মত তস্কর হয়। বাল্মিকী তস্কর ছিলেন, পরে তিনি আদি কবি হইয়া জগতের গুরু হইয়াছেন। আমার মনে হয় তুমি তাঁহারই অনুগ্রহকণাসম্ভূত। তুমি আমার গুরু হইলে। আজি হইতে আমার পাপনিবৃত্তির ভার তোমারই উপর রক্ষা করিলাম। আমাকে দেখিও।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাতীয় সঙ্গীত।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

জাগ জাগ ঋষিবংশধরগণ।
হের হের হের সবে মেলিয়া নয়ন॥
সমিধ কুশ লয়ে করে, কর গুরুর সন্ধান,
লভি মনোমত গুরু, পূজ দিয়ে মন প্রাণ।
লভ আত্মজ্ঞান সবে, হে অমৃতের সন্তান,
‘পূর্ণ’ মোরা ‘শক্তিধর’ সবে বুঝহ সন্ধান।
এ দারিদ্র্য মালিন্য মোদের, মাত্র আবরণ,
মোরা ভস্মাবৃত বহ্নি ধূলামাখা মণি সমান।

শ্রীবঙ্কুবিহারী পাল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি।

(১).

গত এক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার উন্নতির জন্য কত কত মহাত্মা তাঁহাদের দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের উপর এখন প্রত্যেক সুশিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মৃত্যুর হার হাজারে ৮০ ছিল; এখন তথায় মৃত্যুর হার তাহার পঞ্চমাংশেরও কম। প্রসবাগারের সংস্করণ ও প্রসবচিকিৎসার ক্রমোন্নতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক বসন্ত রোগের অত্যাচারে কত কত গ্রাম পল্লী জনশূন্য হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা জেনার বসন্ত নিবারক টীকা আবিষ্কার করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এখন আমরা ঐ টীকা দ্বারা বসন্ত রোগ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি। সম্প্রতি পণ্ডিত হাপ্‌কিনের ওলাওঠা নিবারক টীকা লইয়া যেরূপ পরীক্ষা চলিতেছে তাহা যদি সফল হয় তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই আমাদের দেশ হইতে ওলাউঠাভীতিও দূর করিতে সমর্থ হইব। উক্ত মহাত্মা ওলাউঠা বিষ ক্ষীণ করিয়া লইয়া উদরের পার্শ্বে দুইবার হাইপোডার্মিকরূপে প্রয়োগ করেন। প্রথম বিষ প্রয়োগের পর দেহের উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হয়, শিরঃপীড়া এবং প্রয়োগ-স্থানে অল্প বেদনা ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়। কাহার কাহার কয়েক দিবস পর্য্যন্ত উদরাময় হইয়া থাকে। ষষ্ঠ দিবসে বিষের অপেক্ষাকৃত উগ্রতর দ্রব্য দ্বিতীয়বার প্রবিষ্ট করান হয়। এ সময়েও শরীরের তাপ পুনরায় কিছু বৃদ্ধি হয়, স্থানীক বেদনা প্রকাশ পায় কিন্তু স্ফীতি দৃষ্ট হয় না। ঐ বেদনা তিন দিবসের অধিক থাকে না। উদরাময় বা কোন প্রকার পরিপাক বিকার উপস্থিত হয় না এবং সচরাচর ২৮ ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থাবস্থা তিরোহিত হয়।

এনাটমি বা শারীরতত্ত্বের কথা চিন্তা করিলে কতই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই তখন সুপ্রসিদ্ধ হার্ভি রক্তসঞ্চালন প্রণালীর আবিষ্কার করেন। সে সময়ে তিনি মনে করিতেন রক্ত ধমনী হইতে একেবারে শিরায় প্রবাহিত হয়। কিছু

দিন পরে মহাত্মা ম্যাল্‌পিঘি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্যাপিলারি সার্কুলেশন আবিষ্কার করিলেন। এখন আমরা প্রত্যেক শারীরযন্ত্রের সূক্ষ্মতত্বও বলিতে অপারক নহি।

অস্ত্র-চিকিৎসার দিন দিন যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। অল্প দিন পূর্ব্বেও বিজ্ঞ বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ওভেরিয়ান বা ইউটারাইন্ টিউমার উৎপাটন করিতে ভীত হইতেন। এক্ষণে বীজাণুবিনাশ প্রণালীর (Antiseptic treatment) সাহায্যে নব্য চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে উদরের অভ্যন্তরে অস্ত্রচালনা করিতেছেন। ১৮৩১ সালে ডাক্তার জেমস্ সিম্‌সন্ ক্লোরফরম্ আবিষ্কার করেন। তদবধি বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসায় রোগীর কোন ক্লেশই নাই বলিলে চলে। ক্লোরফর্মের আঘ্রাণ প্রয়োগ করিলে রোগী নিদ্রিত অবস্থায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। সুতরাং অতি কঠিন অস্ত্রচিকিৎসাও অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এ ভিন্ন অস্ত্র হইবার পর অস্ত্রের জ্বালা অল্প অনুভব হয় এবং রক্তপাতও কম হয়। সন্ধিবিচ্যুতি সংস্থাপন, মূত্রাশয়স্থ অশ্মরী প্রভৃতি শলাকাদি দ্বারা পরীক্ষাকরণ, আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি মুক্তকরণ ইত্যাদিতে রোগীকে ক্লোরফর্মের আঘ্রাণে অচেতন করিয়া এখন অনায়াসেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

পূর্ব্বকালে উত্তপ্ত লৌহশলাকা অস্ত্রাহত স্থানে সংলগ্ন করিয়া ক্ষত আরোগ্যের চেষ্টা করা হইত। তখনকার রোগীর ক্লেশ মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বায়ুস্থ জীবাণু (Bacteria Germ) সংযোগে ক্ষত বিকৃত হয়। যে পর্য্যন্ত উহারা ক্ষত স্পর্শ না করে সে পর্য্যন্ত তাহাতে পূযোৎপত্তি হয় না। এই মতের পরিপোষক হইয়া মহামতি লিষ্টার মহোদয় তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পচননিবারণী চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করেন। কার্ব্বলিক এসিড্ নামক জীবাণুনাশক ঔষধ ঐ মহাত্মাই আবিষ্কার করেন। তৎপরে পারক্লোরাইড্ লোসন প্রভৃতি অনেকানেক জীবাণুনাশক ঔষধ বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষতের কোন চিকিৎসা আবশ্যক হয় না। যাহাতে ক্ষতে ঐ সকল জীবাণু আদৌ প্রবেশ করিতে না পারে অথবা যে সকল জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা করাই সকল চিকিৎসকের উদ্দেশ্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা প্রদাহের নাম শুনিলেই শিরা ছেদ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করাইতেন। কিন্তু এখন ঐরূপ চিকিৎসা পরিত্যক্ত

হইয়াছে। কারণ দেখা যায় রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা না করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। তৎকালে জ্বর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই চিকিৎসকেরা জলৌকা প্রয়োগ করিতেন। এইজন্য বিলাতে ডাক্তারদিগের অপর একটি নাম ছিল লীচ্ (Leech)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পথে,— গয়া, কাশী।

বেলা প্রায় ৩টার সময় গয়ায় পৌঁছিলাম। চন্দ্রবাবুর সহিত পূর্ব্বের আলাপ পরিচয় ছিল না বলিয়া একটু কেমন মনে হইল, কিন্তু তাঁহার বাসায় আসিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা 'ডায়েরীতে' এইরূপ লেখা ছিল,—"প্রবীন, হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে মনে আশ্চর্য্য ভাব হইল, যেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বেও আলাপ পরিচয় ছিল, সঙ্কোচ ভাব চলিয়া গেল, সর্ব্বত্রই যেন মায়ের কোল মনে হইতে লাগিল"। গয়ায় আসিয়া আশ্চর্য্য রকমের আনন্দে, প্রাণ উৎসাহিত হইল, কেন জানি না।

১৯শে আশ্বিন শুক্রবার প্রাতের কার্য্যাদী সমাপ্ত করিয়া "বিষ্ণু-পাদ মন্দির" দেখিতে বাহির হইলাম। বেলা অনুমান ৯টার পর তথায় উপস্থিত হইয়া বোধ হয় ১২টা পর্য্যন্ত ছিলাম। বিষ্ণুপাদ মন্দিরে গিয়া প্রাণে কেমন একরকম ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল, কিছুক্ষণ বসিয়া কাঁদিলাম, কেন কাঁদিলাম ঠিক যেন তাহার কারণ জানি না; পিতৃপুরুষ এবং আত্মীয় স্বজনগণকে স্মরণ হইতে লাগিল। আবার মনে হইল, 'গৌরচন্দ্র' এইখানে কি দেখে কেঁদে আকুল হয়ে ছিলেন। বিস্তৃর্ত মন্দির প্রাঙ্গনের একদিকে অপেক্ষাকৃত

বেলতলায় বসিয়া কিছুক্ষণ উপাসনা প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে কিছুক্ষণ যদৃচ্ছা মতে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে, এক স্থানে দেখিলাম, শত শত নরনারী পিতৃ পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতেছে, পাণ্ডাগণ মন্ত্র বলাইতেছে; ইহাতে আমার মনে হইল, ইহারা সাক্ষ্যাত ভাবে ভগবানের নিকট পিতৃলোকের জন্য প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিতে জানে না, বলিয়াই 'পাণ্ডা'রা যা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছে, তাহার অর্থও অনেকে বুঝে না, তবে বিশ্বাস এমনি বস্তু যে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিয়া এইরূপে তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে চরিত্র গঠন হয় না। বৈকালে রামশীলা প্রেতশীলা, ফাল্গুনদী ও তাহার পুল ইত্যাদি দেখিলাম।

২০শে শনিবার অতি প্রত্যুষে 'বুদ্ধগয়া' দেখিতে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে ৫ টা পয়সা মাত্র ছিল। হাঁটিয়া ৭ মাইল পথ যাইতে হইবে। কতক দূর গিয়া পুরাতন জুতা পায়ে বড়ই লাগিতে আরম্ভ হইল। তাহাতে চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। একটু পরে, পশ্চাতে একখানি অশ্ব শকটের শব্দ শুনিতে পাইলাম, যখন তাহা নিকটে আসিল তখন দেখিলাম তাহাতে প্রিয় সত্যেন্দ্র বাবু (ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন) ও তাঁহার ভাগিনেয়,—গৌরীবাবুর পুত্র শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ; তাঁহারা আমাকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিতে আমাদের ৯টা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মন্দির ও দীর্ঘ বুদ্ধ মূর্ত্তি, এবং বোধি-দ্রুম, একে একে সমস্ত দেখা হইল; বোধিদ্রুম অর্থাৎ যে বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া বুদ্ধদেব ভজন-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ধারা বাহিক রূপে রক্ষা করা হইতেছে, বর্ত্তমান বৃক্ষ বৃহৎ না হইলেও শোনা যায় ইহাও সেই আদি বৃক্ষের বংশধর। চীন হইতে আনিত একটা কাঁচের বুদ্ধমূর্ত্তি ও মহন্তের বাড়ির সম্মুখ পর্য্যন্ত দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। প্রথমে আমার সঙ্কল্প ছিল যে সমস্ত দিন বুদ্ধগয়ায় থাকিয়া অপরাহ্ণে বাসায় ফিরিব, কিন্তু তাহা না করিয়া সত্যেন্দ্র বাবুর গাড়িতে আসিয়া গয়ায় ন্যাংটা বাবাজীর আশ্রমে যাইবার জন্য পথে নামিলাম। বেলা তখন বোধ হয় ১১-৩০ হইবে। আশ্রমের নিকটস্থ পুকুরে স্নান করিয়া কাপড় শুকাইয়া লইয়া আশ্রমে গেলাম। আশ্রমটী অতি মনোরম, ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের পাদদেশে উচ্চ ভূমিতে আশ্রমের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করিয়াছে, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও প্রকাণ্ড ইঁদারা

আশ্রয় ও সুনির্ম্মল সুশীতল পানীয় দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ শ্রেণী আশ্রমের উত্তাপ নিবারণ ও শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রমুক্ত বায়ু কি মধুর লাগিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। গৃহ-ছায়া, এবং বৃক্ষ-ছায়া যুক্ত রোয়াকের এক প্রান্তে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান ধারণায় শান্তি উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম, ধ্যানে উপলব্ধি হইল, "মাকে (অর্থাৎ ভগবানকে মাতৃভাবে) নিকট করিতে হইবে"! কিছুক্ষণ পরে এক সাধু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! ভোজন করেগা? আমি। হাঁ! করনে সক্তা, আর্থাৎ করিতে পারি বলিলাম। পুরি দুগ্ধ মিষ্টান্ন, আহার পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, গৃহের উপরকার ঘরে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনী শুনিয়া উপরে গেলাম; তথায় গিয়া দেখিলাম, ২।৩টী বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট এই আশ্রম-স্বামী ন্যাংটা বাবাজীর অনেক অমানুষী শক্তি ও সাধুতার কথা শুনিলাম এবং বলিলেন এক্ষণে বাবাজী হরিদ্বারে আছেন, কিছু দিনের মধ্যে এখানে আসিবেন এমত সম্ভাবনা আছে। যাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইল তিনি মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইহার কথায় জানা গেল, ইনি ধর্ম্ম এবং সাধুভক্ত সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন, ন্যাংটা বাবাজীর সঙ্গে ইহার পূর্ব্বের পরিচয় আছে। অবিনাশ বাবু আমাকে আমার গন্তব্য স্থানের অনেক সন্ধান বলিয়া দিলেন। অপরাহ্ণে ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় চন্দ্র বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

গয়া সকল রকমেই ভাল লাগিল। শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সমদারের গৃহে রাত্রে পারিবারিক উপাসনা করিলাম, বাগ আঁচড়ার সুশীল বাবু আমার বাগ্‌নানের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রসিকলাল রায়ের জামতা। রসিক বাবুর কন্যা (সুশীলের স্ত্রী) উপাসনায় যোগ দিলেন, এবং ঠিক মেয়ের মত যত্ন করে আমাকে আহার করাইলেন।

গয়া ব্রহ্মমন্দিরটীও ছোট খাটর মধ্যে বেশ সুন্দর। ২১শে আশ্বিন রবিবার মন্দিরে সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা হইল, চন্দ্রবাবুর একান্ত অনুরোধে আমাকেই বেদীর কার্য্য করিতে হইল, ৫।৭টী উপাসক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে আহারাদী করিয়া গয়া হইতে রওনা হইলাম, বিদায় কালীন চন্দ্রবাবু প্রীতির ভাবে আমার হাতে ২৲টী টাকা ট্রেণ ভাড়ার জন্য প্রদান করেন।

ষ্টেশনে আসিয়া কাশীর টিকিট করিয়া কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে উঠিলাম, এবং অনেকক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িল।

২২শে আশ্বিন সোমবার প্রাতে কাশীতে আসিলাম। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত ৬ দিন কাশীতে থাকা ঘটিল। প্রথমে বন্ধুবর শ্রীমন্ত সেনের গুরুদেব যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে উঠি, দুই রাত্রি তথায় শয়ন ও একদিবস মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রিয়বন্ধু ক্ষিতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন, আমি এখানে সপরিবারে ছিলাম, দুঃখের বিষয় আর আমরা ২ দিন মাত্র এখানে আছি, যাহা হউক এই ২ দিনও আপনি এইখানেই থাকুন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে আমি তাঁহার গৃহে অতিথি হইলাম। তাঁহার বাড়ি উপাসনা হইল না, কেন না তাঁহারা হিন্দু পরিবার তবে ব্রহ্মসঙ্গীত হইল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার নিকট গল্প শুনিয়া খুব গা ঘেঁসা হইল। ১ দিবস সাহার ছত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন, ও রাত্রে পরমহংস—অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থিতি করি, অদ্বৈতাশ্রমের ভক্ত সঙ্গ বড় মিষ্ট বোধ হইয়াছিল।

এ সময়ে এখানে আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত সপরিবারে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছিলেন, এক দিবস তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্ন-ভোজন, এবং দুই দিবস সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম সঙ্গীত করিলাম। শ্রদ্ধেয় শিবানীদেবী প্রভৃতি অনেকগুলি স্ত্রীলোক গান শুনিলেন, প্রথম দিনের গানে অতি উজ্জ্বলভাবে মাতৃভাব প্রকাশ হইয়াছিল। কাশীবাসী স্বদেশস্থ নরনারী অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কয়েকদিন বিশ্বেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকার ঘাট, কেদার ঘাট, অন্নপূর্ণার ঘাট বেড়াইলাম, ইতিপূর্ব্বে আরও একবার এখানে আসিয়াছিলাম এজন্য এবার অধিক আর কিছু দেখিবার ইচ্ছা হইল না।

চুনার হইতে উমেশ বাবু (শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত) মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাধানাথ দেব সপরিবারে কাশী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, এজন্য উমেশবাবুর সহিত আবার দেখা হইল, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম দেখিতে গেলাম, সেবাশ্রমের কার্য্য প্রণালী বড় ভাল বোধ হইল। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বিবেকানন্দ-শিষ্যবৃন্দ বিপন্ন দুস্থ রোগীদিগের সেবা দ্বারা তাহাদের কষ্টের জীবনেও কথঞ্চিৎ শান্তিদান করিতেছেন, ইহাতে তাহারা

যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ সূচক ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কঠিন প্রাণও বিগলিত হয়। ভগবানের নামে যাঁহারা নরসেবা-ব্রত (যে প্রণালীতেই হউক) গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিজে ত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সেবা কার্য্যে তাঁহাদের কখন অর্থাভাব হয় না; তথাপি একথা সত্য, যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধনীগণের পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মার্থে মুক্ত-হস্ততার দিন দিন খর্ব্বতা ঘটিতেছে। একদিন সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিলাম। এখান হইতে কয়েক জনকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলাম এবং খুল্‌না হইতে স্ত্রীর এক খানা দীর্ঘ পত্র পাইয়াছিলাম। ইতি মধ্যে যোগীন্দ্রবাবু সপরিবারে এলাহাবাদ প্রয়াগতীর্থ দর্শন করিয়া আসিলেন; তাঁহার শরীরে জ্বরভাব হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ভগবানের নামগান ও প্রার্থনাদি করিলাম, তাহার পর তিনি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, 'হরিনামে জ্বরও ছেড়ে যায়'। কাশী হইতে বিদায় কালিন যোগীন্দ্রবাবু আমার পায়ের জুতা ছেড়া দেখিয়া ২॥০ টাকার ১ জোড়া জুতা ও ট্রেণ ভাড়ার জন্য নগদ ৪॥০ টাকা দিয়াছিলেন। ২৭শে আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৯টার পর বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশনে আসিয়া লক্ষ্ণৌয়ের টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন! (৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শিক্ষা ব্যতিরেকে মানব, নীতিশাস্ত্রজ্ঞও হইতে পারে না। অধুনা স্ত্রীজাতির মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় মহিলাসমাজে নীতিশাস্ত্রের বন্ধন শিথিল হওয়ায় নীতি-জ্ঞানের অভাবে কতকগুলি মজ্জাগত দোষ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এক্ষণে তাহা দূরীকরণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে কি প্রকারে পিতামাতার সেবা, পতিভক্তি, অতিথি-সৎকার, সন্তান লালন পালন ও তাহাদের সুশিক্ষাপ্রদান, এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ সংসারের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিতে হয়, তাহা যদি শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে অক্ষম

হন। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে, সন্তান যে ভালরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তম শিক্ষা প্রচলিত না হইলে যে তাঁহাদের মধ্যে চরিত্রহীনার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, সে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই সকল বিষয় আমরা (পুরুষগণ) যদি দৃক্‌পাত না করি তাহা হইলে আর অন্য উপায় নাই। এই অবনতির একমাত্র দায়ী পুরুষগণ। কারণ স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পুরুষগণ স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্টতারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন। এই স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দেশে যে কত কত মহা-অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাত্‌রা।

জাপানী মহিলা ও তাহাদিগের নিত্যকর্ম্ম।

জনৈক বঙ্গবাসী সুধীজন চীন ও জাপান দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার যে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা জাপানী মহিলাদিগের নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বড়ই প্রীতিকর জ্ঞানে নিম্নে তাহার কতকটা সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের বক্তব্যসহ প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের দেশের মহিলাগণের সহিত জাপানী মহিলাগণের কত পার্থক্য। আমাদের দেশের মহিলাগণ ভাবেন, যদি তাঁহারা রান্নাবান্না করিয়া পরিজনের দশজনকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারিলেন, তবেই নিত্যকর্ম্মের অধিকাংশই সম্পন্ন হইল। আহার পর যাহা একটু অবসর মিলে সে সময়টা তাঁহারা বৃথা পরচর্চ্চায় সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এমন দেখা যায়, তাঁহারা তাহাতে এতই নিমগ্ন যে, কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রীতিমত দুগ্ধপান করাইতে ভুলিয়া যান। তাহার পর ছেলেটির যদি ব্যারাম পীড়া কিছু হইল, গৃহিণী একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়েন ও ডাক্তার ডাকিতে পাঠান। পারিবারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকে যে একেবারেই অজ্ঞ, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, তাঁহারা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, কাজেই আপনাদের দেশের বা জাতির দশটা খবর রাখিবার অবসর পান

না। আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই যাঁহারা ভালরূপ জানেন না, তাঁহাদেরনিকট স্বজাতি বা স্বদেশের উপকারের প্রত্যাশা করা যায় কিরূপে? এদিকে তাঁহাদের জাপানী ভগিনীদের শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, স্বদেশ প্রেম, সন্তান বাৎসল্য ইত্যাদি উচ্চ আদর্শ সম্যকরূপে দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোন্ গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্না।

জাপানী মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম এমন মিতব্যয়িতার এবং সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করেন যে, পরিবার হাজার দরিদ্র হইলেও উহাকে দারিদ্র-ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পুত্র কন্যাদিগকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা বেশ জানেন। গত যুদ্ধের সময় এই সব ক্ষুদ্র কুটিরবাসিনী মহিলাগণ স্বদেশকে যে বীররক্ত উপহার প্রদান করিয়াছেন, উহা ইতিহাসের পত্রে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। কেবল স্বদেশের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কেন, এই কর্ম্মময় সংসারের জীবন-সংগ্রামে চারিদিকেই এই জননীদের চরিত্র প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের মাতাদের অমনোযোগিতার জন্য আশৈশব আমাদের মনে ভীরুতা ও কাপুরুষতার ভাব প্রশ্রয় পায়, আত্ম-নির্ভরের ভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। জুজুর ভয়ে কত বালকের সৎসাহসের লোপ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানের জননীরা যাহাতে পুত্রকন্যাগণ স্বাধীনভাবে ছুটাছুটী করিয়া খেলিতে পারে, উহারই উপায় করেন এবং উহার জন্যই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন—পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভৎর্সনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহ মমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই জাপানে ছোট ছোট মেয়েদিগকে কেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন দেখা যায়! সচরাচর এখানে ঝগড়া বিবাদ নাই, কচিৎ কখন ঘটিলেও উহারা নিজে আপোসে মিটাইয়া লয়। আমাদের দেশে পুত্রকন্যাদির মাতাতে মাতাতে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধাভিনয় দেখা যায়, জাপানে তেমনটী এ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই। ছেলেদিগকে ক্রন্দন করিতেও সচরাচর দেখা যায় না। এই সবই মাতার সুশিক্ষার ফল। চারি-বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশব হইতেই এক মহা উচ্চ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এখানে

ছেলেদের ক্রীড়া—ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের—শিল্পকার্য্য ও উদ্যান ভ্রমণ। এই সকল ছেলে মেয়েরা প্রকৃতিকে যেমন সমাদর করিতে জানে, এমন জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশব হইতে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান শিক্ষা করে, এবং উহার বিষময় ফল সন্তানেরা যৌবনোন্মুখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেরদিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ নরনারী পর্য্যন্ত এই স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য লইয়া এত নিমগ্ন যে উহাঁদের মনে কোনও প্রকার উচ্চ চিন্তা স্থান পাইবার অবসর পায় না। ৩।৪ বছর হইতে ছেলে মেয়েদের মনে বিবাহের ভাব দেওয়া যায়। এদেশে (জাপানে) ১৭, ১৮ বৎসরের বালক, ১৪, ১৫ বৎসরের বালিকা স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নতা কচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র এবং স্বাধীনভাবে মিলিতে পারে যে, উহা দেখিলে মনে হয়, কেন এই জাতির উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ভাব জাতীয় উন্নতিরদিকে প্রসারিত হইবে না। যতই জাপানীদের সহিত মিশিতেছি, ততই দেখিতেছি উহাদের সহিত আমাদের কত বিভিন্নতা! এই বিভিন্নতা যে ভারত-বাসীদিগের পতনও অধীন অবস্থা-হেতু ঘটিয়াছে তাহা জানা কথা। প্রাচীন আর্য্যদিগের সময়ে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য অবস্থায় ভারতের ও স্ত্রীজাতির কত না উন্নতভাব ছিল? কালে যখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে, তখন ভারতবাসীগণের কর্ত্তব্য যে, জাপানীদের সহিত মিলে মিশে আত্ম-নির্ভর ও মহিলাদিগের উন্নতির বিষয় সকল শিক্ষা কল্পে বিশেষ যত্নবান হয়েন, ইহাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন।

উদ্ধৃত—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ৯ম সংখ্যা।

চাত্‌রা।

গোবরডাঙ্গার অনতিদূরে চাত্‌রা নামে একটী পল্লীগ্রাম আছে। প্রশস্ত রাজপথাদির কিছুই এখানে বিদ্যমান নাই। কিন্তু এখানে যাহা আছে মানব মাত্রেরই তাহা স্পৃহনীয় বস্তু। প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের গৃহেই দেবী লক্ষ্মী বিরাজমানা। অতিথি কুটুম্ব বুভুক্ষু কেহই এখানে নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাখ্যাত

হয় না। প্রাচীন আর্য্যসম্মত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আজও এইস্থানে বর্ত্তমান সুতরাং গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও এ পক্ষে গণ্ডগ্রাম বা নগরের শিরোধার্য্য অমূল্যরত্ন।

কিন্তু বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয় লক্ষ্মীর এতাদৃশ কৃপা সত্ত্বেও জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি দুরন্ত রোগের প্রভাবে চাত্‌রা ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। সবিশেষ সাবধান না হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবে। যাঁহারা এখন আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই রুগ্ন ও দুর্ব্বল; বাহ্যাকৃতি দেখিলে বোধ হয়, নিতান্ত দীনদরিদ্র অপেক্ষাও ইঁহারা দুঃখে দেহভার বহন করিতেছেন।

ভদ্র পল্লীর দক্ষিণে হৃৎকারজনক দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণী, উত্তরে খানা ডোবা সংকুল নিবিড় বাঁশ বাগান। পরিষ্কৃত জলবায়ুর নিতান্ত অভাবে বৎসরের কোন ঋতুতেই এখানে সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অধিবাসীর অবস্থা খুবই সচ্ছল, মনে করিলেই তাঁহারা বাঁশবাগান নন্দনকাননে এবং নরকের পুষ্করিণী অমৃতসরে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু কি জানি কি মোহে তাঁহাদের চৈতন্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া আছে !!

সাধারণের মোহনিদ্রা ভঙ্গের জন্য সময়ে সময়ে শক্তিমান লোকসংগ্রহপটু ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, এখানেও এখন তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ এবং তদীয় সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিশ্র প্রভৃতিকে যেরূপ জানি এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন মিশ্র মহাশয়-দিগের যেরূপ পরিচয় পাই তাহাতে আশা করিতে পারি, উৎসাহী যুবকসম্প্রদায়, পরিণত বয়স্ক মহাশয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে গ্রামের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। জীবন ও বংশরক্ষারূপ মহাস্বার্থের জন্য সাধারণ লোককে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করাইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগে ? ভদ্র পল্লীর অতি দূরে উন্মুক্ত বায়ুসেবিত দরিদ্র কৃষক পল্লীর সুস্থ ও সবলশরীর লোকদিগের প্রতি একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, ভদ্র পল্লীর সুশিক্ষিত ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের বিবেচনার দোষে কেমন ভীষণ বিড়ম্বনায় জীবন যাপন করিতেছেন; আশা করি সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র প্রভৃতি সক্ষম ও উদ্‌যোগী যুবকদলের কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া অচিরেই পরম পরিতোষ লাভ করিব।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয়।

(সৎকার্য্যে প্রতিযোগীতা।)

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের সন্নিহিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যস্থলে, চিকিৎসালয়টী সুদৃশ্য, সুযোগ্য চিকিৎসক, অবাধে ঔষধদান, সকল রকমেই উহা ভাল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় উহার পার্শ্বে জমি লইতে সচেষ্ট হন। বাধাবিঘ্নের পর, জায়গা লওয়া তাঁহার হইল। শোনা গেল তিনি সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুষ্করিণী খনন করিবেন। পুষ্করিণী ত হইলই অধিকন্তু একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেও লাগিল। তাহাতে অধিকাংশ লোকেই বলিতে লাগিলেন পাশাপশি ২টা ডাক্তারখানার প্রয়োজন কি? আর কোন ভাল কাজ করিলেই ত হইত? একখানা দোকানের পার্শ্বে আর একখানা দোকান করার ন্যায় সৎকার্য্যেও প্রতিযোগীতা কেন? ইতিমধ্যে রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় পরলোকগত হইলেন, অল্পদিনের ভিতর ডাক্তারখানাও বন্ধ হইয়া গেল; তখন দেখা গেল ভাগ্যে রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয় হইয়াছিল, নতুবা যাহারা এতকাল বিলাতী ঔষধ অবাধে সেবন করিত না—তাহারা কিছুদিন ঔষধ সেবন করিয়া এখন ঔষধ না পাইলে উপকারের পরিবর্ত্তে বিষম অপকারই হইত।

রামগোপাল বাবুর সময়েও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন এই কাজ চিরস্থায়ী করিবার জন্য ট্রাষ্টী করা উচিত। কিন্তু অনভ্যাস বা অনভিজ্ঞতা বশতঃ ব্যবসায়ীর হাতের টাকা ট্রাষ্টি সম্পত্তি করা হইয়া উঠিল না।

রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় পরলোক গমন করিলে তাঁহার সুপুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র সুচারুরূপে "রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয়ের" কার্য্য চালাইতেছেন। উহা বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ব্যয় বার্ষিক ১৮০০৲ শত টাকা। বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রক্ষিত মহাশয়, সহকারী শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত, কম্পাউণ্ডার অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী ইহার কার্য্যে আছেন। প্রতিদিন গড়ে ৮০ জন রোগীকে ঔষধ দান করা হয়।

এখন আমরাও শরৎবাবুকে বলিতেছি, তিনি এই কার্য্যকে চিরস্থায়ী

করিতে একটী ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি করুন। ৫ জনকে কিরূপে ট্রাষ্টী করিয়া ট্রাষ্টডিড্ লেখাপড়া করিতে হয় তাহা ১ম বর্ষ কুশদহের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রাষ্টী ডিডের অনুলিপী আছে তাহা দেখিবেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে জানিতে পারিবেন। ট্রাষ্টী সম্পত্তি না করিলে এ সৎকার্য্য চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, যদি তিনি এই কার্য্যকে স্থায়ী না করেন, তবে (ঈশ্বর কৃপায় এমত না হউক) তাঁহার অবর্ত্তমানে যখন এই কার্য্য বন্ধ হইবে, তখন দেশের একটী ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। এ বিষয়ে শরৎবাবু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

স্থানীয় সংবাদ।

অনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ;—গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার চারঘাট নিবাসী ধনঞ্জয় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। চারঘাট একজন ভাললোক হারাইলেন।

সম্প্রতি চাঁদপাড়া ষ্টেশনে এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় সিঁদ দিয়া চুরি হইয়া গিয়াছে।

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ।—"তত্ত্বপ্রসূন" নামক একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক সদ্‌গ্রন্থ ৩৬ নং রামকান্ত বসুর লেন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ৵১০ আনার টিকিট সহ লিখিলে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন। উপস্থিত হইয়া লইতেও পারেন। গ্রন্থখানিতে কয়েকটী গভীর তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু জন এ গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এবার যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে "কুশদহ" পাঠাইতেছি, তাহা সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি তাঁহারা গ্রাহক হইলেন। অন্যথা অনিচ্ছা থাকিলে একটু জানাইবেন। নূতন বা পুরাতন গ্রাহকগণ দয়া করিয়া এই সামান্য চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠাইলেই ভাল হয়। অগ্রিম চাঁদা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পাঠান সকলের পক্ষে ঘটে না, সুতরাং আমরা পর পর ভিঃ, পী, করিতে চাই, আশাকরি ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া কেহ আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.
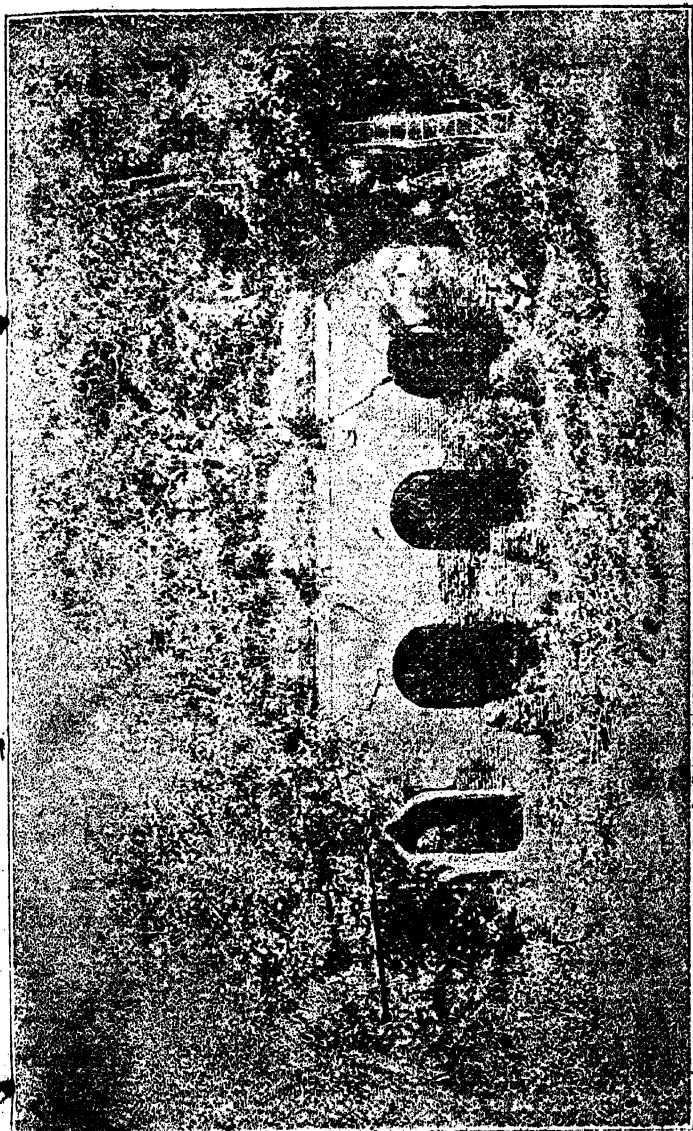
মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনমন্দির।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সহরের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই "কুশদহর" অগ্রিম চাঁদা প্রদান করিয়াছেন, মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই এখনও চাঁদা দেন নাই। এই সংখ্যা প্রাপ্তির পর সকলে দয়া করিয়া ক্ষুদ্র চাঁদাটী পাঠাইলে ভাল হয়। গ্রাহকগণের যত্নই যে কাগজের অন্যতম জীবন তাহা কে না জানেন।

২য় বর্ষ। মাঘ, ১৩১৬। ৪র্থ সংখ্যা।

সঙ্গীত।

আলেয়া—একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তার।
তুমি যার যে তোমার,
ঐ অভয়পদ দিয়ে প্রহরী হইয়ে,
রক্ষা কর যারে নিরন্তর। (তুমি)
মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন,
তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ
নাহি ডরে কালে, তব নামের বলে,
করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বলেতে পেয়েছে যে জন,
অজর অমর অনন্ত জীবন,
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়,
বধে তারে সাধ্য কার। (প্রাণে)
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্,
তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ,
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
লয়েছ যার সকল ভার। (তুমি নিজে)

নমস্কার।

মধুর পাখীর গান বনে উপবনে,
রবির উদয় রাঙ্গা পূরব গগণে,
চঞ্চলা বিজলী-ক্রীড়া মেঘ শিরে শিরে,
শস্যের শ্যামল ক্ষেত্র নদী তীরে তীরে,
তৃণের কোমল শয্যা হরিৎ প্রান্তরে,
উচ্চ-শির গিরি শোভে চুম্বিয়া অম্বরে,
মেঘের নীরদ কান্তি আকাশের তলে,
অমল-কমল শোভা সরসীর জলে,
আঁধারে তরুর শিরে জোনাকির মণি,
নদীর জলের স্রোতে কল কল ধ্বনি,
ক্লান্ত-দেহ শান্তকারী সুবাস পবন,
পর্ব্বতের শির হতে জলের পতন ;—
প্রকৃতিকে দেন যিনি হেন অলঙ্কার
নমি তাঁর পদে আমি শত শত বার।

প্রভাতের বিন্দু বিন্দু শিশির-কণায়,
বিশাল বারিধি-বক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়ায়,
শ্যামল-তরুর প্রতি পাতায় পাতায়,
তারকার চাহনিতে আকাশের গায়,
বরষার ঝর্ ঝর্ বারিধারা পাতে,
চাঁদের বিমল করে পূর্ণিমার রাতে ;—
জগতের ছোট বড় সমুদয় কাজে,
প্রকৃতির মনোরম সমুদয় সাজে ;
যাঁহার বিরাটরূপ শোভিছে সতত
নমি তাঁর পদে আমি হইয়ে প্রণত।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৯। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

কঠোপনিষৎ ৬। ৯।

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

১০। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে ॥

কঠ ৬। ১২।

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষুঃ দ্বারা কাহারও কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি আছেন, এই কথা যে বলে তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

১১। ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২। ৮।

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা ভবসাগরের ভয়াবহ স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

১২। অপানিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

শ্বেত ৩। ১৯ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি দূরগামী; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন। এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু তৎসমুদায় জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়াছেন।

১৩। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩। ৪। ৮।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর সকল হইতে প্রিয়।

১৪। ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মাধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়-মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং ॥

বৃহ ৪। ৫। ১২।

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদয় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্। যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সত্যেতে বিদ্যমান এবং যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই এই পরমাত্মা, তিনি অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম।

১৫। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ম্ভগোঃ সর্ব্বাপৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞ-বল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাম্ জীবিতং তথৈব তে জীবিতম স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥

বৃহ ৪। ৪। ২। ৩।

মৈত্রেয়ী বলিলেন "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবেক। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব।" এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

দিদিমা (আমার পিতামহী) আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকেও জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম। ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন। এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সেই সূর্য্য অর্ঘের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"। দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্ত্তন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না।

---

* "ব্রহ্মজ্ঞান" ও "ঋষির" জন্য ভারত চির গৌরবান্বিত। নানা কারণে বর্ত্তমান ভারতের পতন হইলেও, যে দেশে একবার ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে সে দেশের—সে জাতির চিরপতন অসম্ভব। তাই বুঝি আবার আমরা ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ঋষি-বার্ত্তা শুনিলাম। যদি কেহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঋষিত্বে সন্দেহ করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, ঋষি কে? কাহাকে ঋষি বলা যায়? উত্তর। যিনি "মন্ত্র দ্রষ্টা," অর্থাৎ যিনি বেদ দর্শন করেন, অথবা যাঁহার ভিতর হইতে বেদ-মন্ত্র প্রকাশ পায়। এই বাক্যের প্রমাণ আমরা আমাদের নিজের কথায় কিছু না বলিয়া, তাঁহার "স্বরচিত জীবন চরিত" হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার নিজ মুখের ৪১ বৎসরের বৃত্তান্ত, কেমন সরল সত্য এবং মধুর বর্ণনা, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব ইহাও মহর্ষি জীবনের ফল স্বরূপ; পঞ্চকাল সহরের ব্রহ্মোৎসবের প্রভাব, বৎসরের পর বৎসর ধর্ম্মার্থির প্রাণে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। * * *

দিদিমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব। পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা ও মোহর পাইলাম, লোককে বলিলাম যে আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে "যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস্‌নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি; তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।" গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা

সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই, ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দজ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয় দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল। পরে, দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে

আচ্ছন্ন করিল। কি রূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। * * *

এইরূপে তাঁহার জীবনে বিষয়-বিরাগ, ও ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন—

এক এক দিন কোচে পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কোচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া আবার কোচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না—আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কোচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটী খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। * * * আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরও বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম আমি আর বাঁচিব না। * * *

তিনি যখন জ্ঞানপিপাসু হইয়া শাস্ত্রাধ্যায়নের অভিলাষে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন তিনি বলিতেছেন,—

সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ ছিল। তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। আমাদের বাটীতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি, নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যকরণ পড়িব। তিনি কহিলেন, ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব। তখন চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। একদিন চূড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহি করিয়া দেও। আমি বলিলাম কি লেখা? পড়িয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে যে, তাঁহার পুত্র

শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহি করিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে আমাদের সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন, কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।" আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কিসে পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, মহাভারতে। তখন আমি তাঁহার নিকটে মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই—"ধর্ম্মে মতির্ভবতুবঃ সততোত্থিতানাং সহ্যেকএব পরলোকগতস্য বন্ধু। অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্তভাবমুপয়ন্তি ন চ স্থিরত্বং॥" তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ, স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহাভারতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি।

ধৌম্যঋষির উপাখ্যানে উপমন্যুর গুরুভক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমি ধর্ম্মপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি। একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল।

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়,

শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে। আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না—চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে, ইহা কে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

বহুপূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল, আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা। তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। সৃষ্টির কৌশল-চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত। এই সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্তজ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি, তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনাকর্ত্তা নহেন,

তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্ট বস্তু সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সেই নিত্য সত্যপূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে? * * *

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার অদ্বিতীয় ধনী প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মহর্ষিও বালক-কালাবধি রাজা রামমোহন রায়কে অবলোকন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন,—

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে ছুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন ব্রাদার! এখন তুমি টান।

যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর অবিশ্বাস জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহারি অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশভাব, তখন হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধন-রক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে যতক্ষণ না কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সেদিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠকখানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে; আমাকে বুঝাইয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন, এ তো সব ব্রহ্ম-সভার কথা—ব্রহ্ম-সভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে "ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলেই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশ্বরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই গূঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চির দিন যাহা চাহিতেছি ইহা তাহাই বলে।

আমার বিষাদের যে তীব্রতা, তাহা এই জন্য ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখ হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোন প্রকার সুখ ছিল না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন এই দৈববাণী আমাকে বলিল যে, সকলপ্রকার সাংসারিক সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্ন হইলাম। এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্য যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ঈশ্বরের উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলাম।

আহা! সে দিন আমার পক্ষে কি শুভদিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্যং পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নিকট সকল গূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ পাঠ করি এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট আর ছয় উপনিষৎ পাঠ করি। প্রতিদিন যাহা পড়ি, তাহা অমনি কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার পর দিন বিদ্যাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি আমার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বলিতেন যে, "তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে শিখিলে? আমরা তো এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না।" আমি বেদের উচ্চারণ একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট শিখি। যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এইটুকু আভাস দিতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, তৎপরে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রণয়ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা, উপনিষদ—উদ্ধার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকে তাহার সংস্কার, তৎপরে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ ও সত্যের মহিমায় ঋণ পরিশোধ এবং সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তি, সুদীর্ঘকাল একাকী শৈলাদি ভ্রমণ, গভীরধ্যান, যোগসাধন, প্রচুররূপে ঈশ্বর-সম্ভোগ, এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে বৃহৎ ধর্ম্ম পরিবার গঠন। তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহত্ব প্রায় ৯০ নব্বই বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে মত্ত থাকা—এ বিস্তৃত বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থানাভাব। এজন্য ধর্ম্মপিপাসুবৃন্দ তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত পাঠ করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

হিমালয় ভ্রমণ। (৪)

পথে,—লক্ষ্ণৌ, বেরিলি।

২৮শে আশ্বিন রবিবার প্রাতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার বিনয়ভূষণ বসুর বাসায় আসিলাম। অনেক দিনের পর বিনয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েরই মধ্যেই আনন্দানুভূত

হইতে লাগিল। স্নানাদি করিয়া, মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা আমাকে করিতে হইল, কিন্তু আজ রবিবারে মন্দিরে সামাজিক উপাসনা বিনয়বাবু করিলেন। লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরটী বেশ সুন্দররূপে সুগঠিত।

২৯শে সোমবার প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া "মচ্চিভবন" "তস্‌বিরখানা" প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। মচ্চিভবন প্রকাণ্ড প্রাসাদ, কতই কারুকার্য্যে বিনির্ম্মিত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তস্‌বির খানাও একটী প্রকাণ্ড ভবন, নবাব সাহেবদিগের বড় বড় অয়েলপেইণ্ট প্রতিকৃতি একটী প্রশস্ত গৃহে সজ্জিত রহিয়াছে। চিত্রগুলি এমন সুন্দর চিত্রিত ও জীবন্ত ভাব প্রকাশক যে দেখিলেই বুঝা যায়, কোন্‌টী ধর্ম্মভাবের মূর্ত্তি, কোন্‌টী বীরত্বের মূর্ত্তি। লক্ষ্ণৌ সহর বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও খুব বিস্তৃত। নবাবী চিহ্ন সকল এখনও দেদীপ্যমান, তন্মধ্যে কতকগুলি বিলাসিতার ব্যাপার -শতাধিক বেগম গৃহ ইত্যাদি দেখিয়া মনে হইল, ইহাই মুসলমান রাজত্বের পতনের কারণ। বৈকালে, বিনয়বাবু আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর যখন বুঝিলেন, আমার নিকট পাথেয় নাই, তখন প্রকারান্তরে অন্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতে লাগিলেন, "এরূপে ভ্রমণ করা সঙ্গত নহে।" আমি সংক্ষেপে বোধ হয় তাঁহার কথার এইরূপে উত্তর দিয়াছিলাম। "আমিত কিছু অসঙ্গত দেখিতেছি না, এই ভ্রমণ আমার জীবনে প্রয়োজন ছিল এবং ইহাতে আমার অনেক উপকার হইবে বুঝিয়াছি, আর আমি যে কিছু পাথেয় ও আহারীয় সাধারণের নিকট গ্রহণ করিতেছি, তাহার বিনিময়ে ভগবানের নাম গান এবং সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা অমূল্য পদার্থ কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। জগতে বিনিময় ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তবে বিনিময় ব্যাপারটা খুব কঠিন, কোন কোন সময় মানুষ তাহার অপব্যবহারে পরস্পরের অপকার করে"। আমি আর অধিক কিছু না বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া পুরাতন বন্ধু শ্রদ্ধেয় অঘোরবাবুর বাসায় গেলাম। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় বাগআঁচড়ায় থাকিয়া তথাকার অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। অনেক দিনের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাতে উভয়েরই বিশেষ আনন্দ হইল। ইতিমধ্যে আমাদের উভয়ের জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহার বিষয়ে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া তখন আমি বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিলাম।

অঘোরবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এখান হইতে যাবেন"? আমি বলিলাম, "আগামী কল্য রাত্রের ট্রেণে এ সহর ছাড়িব ভাবিয়াছি"। তিনি বলিলেন, "কল্য ৫টার সময় বিনয়বাবুর বাসায় গিয়া আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিব"।

৩০শে মঙ্গলবার প্রাতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। অনেকটা দূর ছিল বলিয়া একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। স্নানাদি করিয়া বিনয়বাবুর সহিত পারিবারিক উপাসনা করিলাম। ঈশ্বর কৃপায় শান্তভাবে বিনয়বাবুর পারিবারিক মঙ্গলকামনা আন্তরিকভাবে প্রার্থনাদি করিতে পারিয়া সুখী হইলাম। বৈকালে বিনয়বাবু আমাকে এবং আর একটী যুবককে, একখানি সেকেণ্ড ক্ল্যাশ গাড়িতে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলেন। বোধ হয়, "আরামবাগ" নামক একটী স্থানে গিয়া আমরা কথাবার্ত্তায় বেশ আনন্দানুভব করিলাম। সেইদিন একটু গরমও ছিল, সুতরাং এই ভ্রমণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তৃপ্ত হইলাম। বাসায় আসিয়া আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় অঘোরবাবু আসিয়া "গরীব বন্ধুর সামান্য সেবা" এই কথা বলিয়া আমার হাতে ১৲ টাকা দিলেন।

আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া বোধ হয় রাত্রি ১০ টার পর ট্রেণে উঠিয়া ৩১শে আশ্বিন, বুধবার প্রাতে বেরিলী পৌছিলাম।

একেবারে হরিদ্বার যাওয়াই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেণ ভাড়া কম হওয়ায় বেরিলী পর্য্যন্ত আসিলাম। "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য"। ষ্টেশন হইতে এক্কা গাড়িতে চড়িয়া সহরের দিকে আসিতে লাগিলাম। বেরিলীতে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি না থাকায় এক্কা ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখানে এমন কোন বাঙ্গালী বাবু আছেন, যাঁহার বাসায় আমি থাকিতে পারি? এক্কা ওয়ালা বলিল "মহারাজ" (মহারাজ শব্দ এখানে সাধুদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকে, আমারও অনেকটা সাধুদিগের ন্যায় বেশ হইয়াছিল তাই বলিল মহারাজ।) "বাবু প্রিয়নাথ বকিল (উকিল) কা বাগিচা মে চলিয়ে, যেত্তনে বাবুলোক আতেহেঁ হুয়াঁ ঠারতেহেঁ।" অর্থাৎ প্রিয়নাথ উকিল বাবুর বাসায় অনেক বিদেশী ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন।

এক্কা ওয়ালা আমাকে বাবু প্রিয়নাথ উকিলের উদ্যানবাটীর ফটকের নিকট নামাইয়া দিয়া গেল। আমি ভিতরে গেলাম, তথনও বাড়ীর সকলে উঠেন নাই।

একজন দ্বারবান্ আসিয়া বলিল মহারাজ! "বৈঠিয়ে, বাবু সাহেব কোঠিমে হ্যায় নেহি, লেকেন্ আপ্‌কা টাহার্নেকো কুছ্ হরজ নেহি; ছেলিয়া বাবু কোঠিমে হ্যায়, ম্যায় খবর দেতেহেঁ।" একটু পরে ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক বালক, প্রিয়নাথ বাবুর পুত্র আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় বসাইল। তৎপরে আমার ইঙ্গিত মত স্নানাগার (বাথ্ রুম) দেখাইয়া দিলে, আমি হাত মুখ ধুইয়া আসিলাম, তাহার পর দেখি, আমার জন্য এক পেয়ালা চা ও কিছু খাবার আসিল, তাহা পান আহার করিলাম। ঐ খানে বসিয়া আর একটী যুবক হারমোনিয়মে স্বর দিতেছিল। আমি তাহাতে গলার স্বর সংযোগ করিয়া সঙ্গীত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাদের চঞ্চলচিত্ত অন্যদিকে গেল দেখিয়া, আমি আর সঙ্গীত করিলাম না। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যে ইহাও জানিলাম, যে, বাবু প্রিয়নাথ উকিল—প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বালী, উত্তরপাড়া, কিন্তু এখন এইখানেই এক রকম বসবাস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আর দুই কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যে একজন ঝান্সীর সব্‌জজ, আর একজন উপস্থিত বক্সারের মুনসেফ্, তাঁহারাও ছুটীতে এখানে আসিয়াছেন, তিন ভ্রাতায় একত্রে নৈনিতাল গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

এই গৃহে যে প্রকারে আশ্রয় পাইলাম তজ্জন্য প্রাণে যে ভাব হইয়াছিল তাহা ডায়েরীতে এইরূপে লেখা ছিল,—"যেখানে নিরুপায় সেইখানেই 'মায়ের কোল' নিকট হইতেছে; মা, মা বলে কবে বিগলিত হ'ব"। বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম এবং এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। প্রিয়নাথ বাবুর বাঙলায় একটী স্বতন্ত্র ঘর অতিথি অভ্যাগতের জন্য আছে, তথায় শয্যা, আলোক, জল, বসিবার জন্য চেয়ার, টেবিল, লেখনী, সজ্জা সমস্তই প্রস্তুত থাকে, কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

প্রিয়নাথ বাবুর বাঙলায় থাকিয়া সহরের ভিতর বেড়াইতে গেলাম। প্রথমে বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার ঘরে সঙ্গীত-বাদ্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান! নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রযোগে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীতের চর্চ্চা নিয়মিতরূপে করেন। আরো শুনিলাম পার্শ্বের বাড়িতে মুকুন্দবাবু, একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। আমি তো সঙ্গীত শাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ, তথাপি একটু ভয়ে ভয়ে জানাইলাম, আমি সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহি;

কিন্তু ভগবানের নাম গান করা একটু আধটু অভ্যাস আছে; যদি আপনারা অনুগ্রহ করে শোনেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর সারদাবাবুর বাড়িতে আমার সঙ্গীত হইবে স্থির হইল। সঙ্গতের সঙ্গে সর্ব্বদা আমার সঙ্গীত করা অভ্যাস না থাকায় ভাবিলাম তালে ঠিক হইবে কি না, অথচ বাদ্যযন্ত্র উপস্থিত সত্ত্বেও সঙ্গতের সহিত না গাহিলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক একটু ব্যাকুল ভাবে ভগবানের স্মরণ করিয়া বাসা হইতে সারদাবাবুর বাড়ী আসিলাম। যথা সময়ে আমার সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গত হইতে লাগিল, আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম; ডায়েরীতে এইরূপ লেখা আছে—"প্রথম দিন সঙ্গীত খুব হইল, সত্যই 'তাঁর' শক্তিতে হইল। স্মরণ লয়েছিলাম, প্রকাশিত হইলেন; তালে ঠিক হইয়া গেল।"

এইদিনেই রাত্রিতে প্রিয়নাথ বাবুরা বাসায় আসিলেন। আমি বৃহস্পতিবার প্রাতে বাঙলার নিকট দাঁড়াইয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিলাম, প্রিয়নাথ বাবুর জামাতা—গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেবল মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন, প্রিয় বাবুরা তিন ভ্রাতায় নির্ব্বাক ছিলেন। আহারের সময়ে আমাকে লইয়া, একঘরে একত্রে, (আমি স্বতন্ত্র পংক্তিতে) বসিয়া সকলের আহার হইত।

অযোধ্যানিবাসী রামপেয়ারে স্বরণ নামক জনৈক প্রাচীন ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল। রামপেয়ারের স্ত্রী পরিবার নাই, এখানে এক ভাই ছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ভাইপোদের দেখিতে আসিয়াছেন, বাজারে তাহাদের দুগ্ধ দধির দোকান আছে।

সারদাবাবুরা আমাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "কয়েকদিন আপনি এখানে থাকুন আমরা আপনার পথ খরচের জন্য কিছু চাঁদা তুলিয়া দিব।" তাহাতে বোধ হয় আমি এইরূপই বলিয়াছিলাম "আমি এখন হরিদ্বারে যাইব, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিব এমন ইচ্ছা আছে, এখন আমার আর কোন অর্থের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমি আর বিলম্ব করিব না।"

বেরিলী ছাড়িবার সময় ক্ষিতীশবাবু আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "হরিদ্বার তীর্থস্থান, তথায় কেবল যাত্রির ভিড় হয়, আপনি সেখানে থাকিবেন না, কন্খলে থাকিবেন, কন্খল বেশ নির্জ্জন স্থান এবং সাধুদিগের অনেক আশ্রম আছে।

তথায় থাকিলে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের যে সেবাশ্রম আছে বোধহয় সেখানেও থাকিতে পারিবেন।"

৩রা কার্ত্তিক শনিবার রাত্রি ১২টার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিলাম, গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল, কিন্তু এমনি মনে উৎসাহ ও আনন্দ ছিল, যে, সে কষ্ট কিছুমাত্র বোধ হইল না—৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতে হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

কেন ?

কেন উঠে চাঁদ নীলিম আকাশে
ফুটে থাকে তারা শত ঠাঁই হাসে,
কেন রবিকর নিশীথ নীরব
কাহার আদেশ, কাহার বিভব ?

কেন ডাকে পাখী, কি মহিমা কয়
কাহার ইঙ্গিতে বহিছে মলয়,
কেন নর হাসে কেন কাঁদে তারা
মোহের স্বপনে থাকি আত্মহারা ?

কিসের লাগিয়া হরষিত মনে,
থাকে ফুটে ফুল সজনে,বিজনে,
মধুর নিনাদে নদী কল্লোলিত,
কল কল রব কেন উল্লাসিত ?

অথবা বিজলি কালমেঘ কোলে
চমকি চমকি কেন নভে দোলে,
কেন বা ধরাতে আসে যায় আর ?
মানব জনম কি সাধন তার ?

সকলি বুঝিবা এক আজ্ঞা হতে
জগতের মহা অভাব পূরাতে,
সাধিছে মঙ্গল মহৎ-মহান
তাই নিজ কর্ম্মে, নহে কিছু আন।

শ্রীপৃথ্বীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল।

গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের জন্ম কোষ্ঠী অবশ্যই আছে কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। না দেখিলেও অনুমান খণ্ডের জ্ঞানপ্রভাবে বলিতে পারি ইহা বয়সে পাঁচের কোটার মাঝামাঝি সংখ্যায় আসিয়াছে। প্রাচীন নিয়মানুসারে এখন বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত হইলেও আমরা ইহার আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গোবরডাঙ্গার স্কুল বাল্যে স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর অপত্যনির্ব্বিশেষ যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইহাকে সুস্থ, সবল এবং কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তিনি সর্ব্বান্তকরণে তৎসমুদায়ই সরবরাহ করিতেন, তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি রাখিতেন।

ক্রমে ইহা যৌবনসীমায় উপস্থিত হইল, কালবশে ইহার একমাত্র প্রতিপালক বাবু সারদাপ্রসন্ন পৃথিবীর মায়া কাটিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে ন্যস্ত হইল; কোর্ট অব্ ওয়ার্ড তাঁহার পরিজনের ন্যায় স্কুলের জন্যও একটা বাঁধাবাঁধি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার ভরণপোষণের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই, কেন না ইহার কিছু দিনের পর হইতে মিউনিসিপালিটীও কিছু কিছু সাহায্য করিতেছিলেন।

হতভাগ্যের লক্ষণই এই, তাহার প্রথমে সুখ এবং শেষে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, এই স্কুলের পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিল। মিউনিসিপালিটী সাধারণের সম্পত্তি, সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি ও স্থিতি; কিন্তু কিজন্য জানি না আজও বুঝিতে পারিলাম না, যে কি বিচারে কোন্ মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে স্কুলের এই মিউনিসিপাল এড্ বন্ধ হইল। এদিকে গবর্ণমেণ্ট এড্ ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করিল, বাবুরাও কিঞ্চিৎ ন্যূনহারে মাসিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন। আয় এইরূপে খুব কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও মোটাভাত ও মোটাকাপড়ের অভাব-ক্লেশ হয় নাই, স্কুল একরকম সুখে দুঃখে চলিতে লাগিল।

তারপরই একেবারে সর্ব্বনাশ। অকস্মাৎ অচিন্তনীয় পরিণাম। এই দারুণ অনাটনের সময় এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্কুল হঠাৎ সৌখীন হইয়া বসিল। অনেক

সময়ে সামাজিকতার খাতিরে পেটে না খাইয়াও বৃদ্ধকে হেয়ারব্রাশ্ ব্যবহার করিতে হয়, প্যাণ্টলুন কোট দিয়া নিজের বার্দ্ধক্যসুলভ হাড়্ গোড় ঢাকিতে হয় নতুবা আত্মরক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তরে সখ না থাকিলেও কালের গতিতে এবং সামাজিকতার অনতিক্রমনীয় প্রভাবে বিদ্যালয়কে এখন বাহ্য সৌখীনতা দেখাইবার প্রয়োজন হইল।

সে, পূর্ব্বে পর্ণাচ্ছাদিত আট্চালা গৃহে কেমন সুখে সচ্ছন্দে, কেমন মনের সুখে—কেমন অনন্যসাধারণ সম্ভ্রমের সহিত কালযাপন করিত। এখন বিল্ডিংএর মধ্যে থাকিয়াও সতত সন্ত্রস্ত,—কখন কে কিরূপ রিমার্ক করিবে এই শংকায় নিরন্তর উদ্‌বিগ্ন। এখন প্রাচীরপরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত বাস্তভূমিতে প্লেগ্রাউণ্ড চাই, বিনোদকানন চাই, পাইখানা ও ফিল্টার্ড ওয়াটার্ চাই, বাজারের মিষ্টদ্রব্য ভোজনে রসনা পরিতৃপ্ত হইলেও তাহা আনিতে সাহস হয় না কারণ নিশ্চয়ই তাহাতে রোগের বীজাণু আছে। এ সমস্ত ব্যতীত সভ্য জনোচিত একটী লাইব্রেরীরও প্রয়োজন। ইহার যে কোন একটীর অভাবে ভদ্র সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

সখ এই পর্য্যন্ত হইলেও ততটা ভাবিবার বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেকালে ইঁদুর ধরিতে পারিলেই বিড়ালের কার্য্যদক্ষতা সপ্রমাণ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না, এখনকার দিনে ইঁদুর ধরা বিড়ালের কোয়ালিফিকেশন্ নহে, গাত্রে দুই তিনটা ডোরা ডোরা দাগ থাকিলেই হইল। এই স-কলঙ্ক বিড়াল শূন্য গৃহ অরণ্যের নামান্তরমাত্র। এখন কার্য্য পরিচালনার জন্য অন্ততঃ দুজন গ্র্যাজুয়েট্ এবং দুজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্ চাই, অন্যান্য শিক্ষকদিগেরও অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্গল দ্বার মুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। দরিদ্র পল্লীগ্রামের স্কুলে এত বাড়াবাড়ি সহিবে না বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে চিন্তা বিড়ম্বনামাত্র যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ তল্লাস করা উচিত "যত্নে কৃতে যদি সিধ্যতে কোঽত্র দোষঃ।"

এখন কথা এই যত্ন করে কে? এক বাবুরা ব্যতীত এ বিপত্তি সাগরের অন্ততরণী দেখি না। গোবরডাঙ্গা স্কুলের সন্তান সন্ততি ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার, স্কুলমাষ্টার, কেরাণী, নায়েব, গোমস্তা, মার্চেণ্ট আর কতই বা বলিব অসংখ্য বর্ত্তমান, কিন্তু কখন এক পয়সার মিছরি দিয়াও জননীর কুশল

জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা, বিপন্না জননী অদ্যাপি হাঁটকুড়ীর মত তাঁহার পিতৃকুলের মুখ পানে চাহিয়া আছেন। মাননীয় 'কুশদহ' সম্পাদক মহাশয় ইঙ্গিতে বলিয়াছেন "কাহাকেও কিছু না বলাতে স্কুলের সন্তানদিগের কিছু অভিমান হইয়াছে, মাননীয় জমীদার মহাশয়গণ আহ্বান করিলে তাঁহারা সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন"।* দেশের লোকের মনের ভাব এমন হইলে বাবুরাও সানন্দে সকলকে আহ্বান করিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি।.........দ্বিতীয় উপায় বারোয়ারি,বারোয়ারির টাকায়, ভদ্র সমাজে এখন বিস্তর সৎকার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ তামসিক প্রকৃতি লোকের প্রীতির নিমিত্ত দুদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, সেই জন্য মাননীয় জমীদার মহাশয়দিগকে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি, দেশের মঙ্গলের জন্য, সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রকৃতি মহানুভব মহাশয়গণের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ, যেন বারোয়ারির অর্দ্ধেক টাকা ব্যয়িত হয়, অপরার্দ্ধ আমোদ আহ্লাদের জন্য ব্যয় করিয়া যেন সর্ব্বসাধারণকে সুখী করা হয়। যাঁহারা বারোয়ারির কেবল গান বাজনার পক্ষপাতী তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে দেশে স্কুলের প্রয়োজন নাই অথবা স্কুল থাকাতে দেশের একটী মহান্ অকল্যাণ হইতেছে? যদি তাহা না হয়, তবে বারোয়ারির কতক টাকা দিয়া স্কুল রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কেন যে এত দিন বারোয়ারির টাকায় কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় নাই ভদ্রসমাজ বলিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। এরূপ হইলে দেশের সকলকেই বারোয়ারির চাঁদা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিদ্যাশিক্ষা ও আমোদ প্রমোদ উভয়ই প্রার্থনীয়। এখন হইতে বারোয়ারির

* "স্কুলের সন্তানদিগের অভিমান হইয়াছে, * * * সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন।" এরূপ কথা তো কোথাও আমরা বলি নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনজন্য বনগ্রাম সহযোগী বলিয়াছিলেন, "আশা করি সাধারণে এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন"। তাই আমরা বলিয়াছিলাম (অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) আপন হইতে দেশের লোক যত্নবান্ হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। বরং বড় বাবু যত্নবান্ হইয়া দেশের কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী "স্কুল কমিটী" গঠন করিয়া, অগ্রে স্কুলের প্রতি সাধারণের যত্ন আকর্ষণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়কে আর একবার ঐ লেখাটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (কুঃ সঃ)

কার্য্য দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকই যেন আনন্দ লাভ করে এবং সকলেই যেন বারোয়ারির পক্ষপাতী হয়। গোবরডাঙ্গার বারোয়ারি ও স্কুলের কর্তৃত্ব একই শক্তিশালীহস্তে ন্যস্ত, তাই ভরসা আছে, গুটিকতক তুচ্ছ টাকার জন্য স্কুলের হঠাৎ অনশনমৃত্যু ঘটিবে না।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

হয়দারপুর।

গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত হয়দারপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। একটি পল্লী বলিলেও বলা যায়। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও অধিকাংশ ব্যবসায়ী ধনীর বাস। তন্মধ্যে তৃতীয় পুরুষ, পরলোকগত রামজীবন আশ, ভগবতিচরণ দে এবং রামচন্দ্র কোঁচের নাম উল্লেখ যোগ্য। তৎপরে, পরলোকগত সৃষ্টিধর কোঁচ, রামগোপাল আশ, শ্রীরাম আশ, রামগোপাল রক্ষিত, মঙ্গলচন্দ্র আশ, গোপালচন্দ্র আশ, প্রভৃতি ধনীগণের জন্য গ্রামখানি এক সময়ে সমৃদ্ধির গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। সেও অধিক দিনের কথা নহে, অন্যূন ৪০।৫০ বৎসরের কথা। কিন্তু তখনও ঐ গ্রামের যুবকদলের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না; কেন না ধনের সঙ্গে শিক্ষাবিহীনতা হইলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল। অন্যদিকে, সর্ব্বত্রই বিধাতার বিচিত্র লীলা, তাই বুঝি, ঘন আঁধার রাত্রির মধ্যে খদ্যোতিকার সদৃশ, ঐ দুর্নীতি পরায়ণ যুবকদলকে সুপথ দেখাইবার জন্য এবং ভবিষ্যতে গ্রামের নামকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবার জন্য তাহার মধ্যে পরলোকগত রাসবিহারী চেল, বি, এ, ভুতনাথ পাল, বি, এ, বিহারীলাল আশ এবং লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, উদ্ভব হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধ চক্ষু দেখিয়াও দেখে না, অসাড় হৃদয় জাগিয়াও জাগে না। ফলে কি হইল?, কয়েকটী যুবকের অকালমৃত্যু, ধনক্ষয়, কেহ বা চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় থাকিয়া কিছু কালের মধ্যে ইহলীলা শেষ করিল। অবশেষে একটী বালকের একটু জাগ জাগ ভাব দেখিয়া আমাদেরও মনে হইল, বুঝিবা সুভদিন আসিল, কিন্তু গ্রামখানির এমনি দুর্ভাগ্য, যে সেই বালক বা যুবক হরিবংশও প্রভাতকুসুম, প্রভাতেই ঝরিয়া পড়িল। এখন ধনে, স্বাস্থ্যে, নীতিতে বা ধর্ম্মে, সকল রকমেই যেন হয়দারপুর গ্রামের অবনতির অবস্থা দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি—জনৈক যুবক এই গ্রামের নৈতিক অবস্থার দিন দিন অবনতি দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা এই পত্র প্রাপ্তে দুঃখের মধ্যেও সুখী হইলাম, এই জন্য যে, দেশের দুর্গতি দূরের একটী প্রধান উপায় "ব্যথিত হৃদয়।" কোন দেশ, কোন জাতি অথবা কোন ক্ষুদ্র পল্লীর দুর্দ্দশার জন্যও যদি অন্যের হৃদয় কাঁদে, আর সেই বেদনা বোধ ক্রমে ঘনীভূত হয়, তবে তাহা হইতেই মহৎ মঙ্গল ফল উৎপন্ন করে। আমরা বলি, গ্রামে যে ২।৪ টী চরিত্রবান্ যুবক আছেন, তাঁহারা একত্র হইয়া বিনীতভাবে জ্ঞান আলোচনা করুন, এবং সাময়িক পত্রিকা ও ভাল ভাল পুস্তক পাঠ দ্বারা, যাহাতে অপরেও জ্ঞান পথে—সৎপথে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করুন। শুভ চেষ্টার ফল-স্বরূপে ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিবেন। আর এ পথের সম্বল বিশ্বাস ও দৃঢ়তা। অন্যথা পাশব বলে মানুষকে ভাল করা যায় না।

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি,—

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত সংগৃহীত "কুশদ্বীপ কাহিনী ও খাঁটুরার ইতিহাস" নামক সপ্তগ্রাম বিবরণী সম্বলিত, সুবৃহৎ গ্রন্থ, কুশদহ নিবাসী নরনারীকে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ডাকে লইলে তিন আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত।

১৫৩।১ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের রুদ্রপুরের একটী বন্ধু অযাচিতভাবে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়া 'কুশদহের' মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। দাতার একান্ত অনিচ্ছায় নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে দাতা এইটুকু অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "কুশদহ সম্পাদককে অসুস্থ শরীরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, এই সামান্য সাহায্য প্রদত্ত হইল, সুবিধা থাকিলে ১০০৲ একশত টাকা দিতাম, যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হইত।" ভগবান্ দাতার হৃদয়কে দিন দিন আরো উন্নত করুন।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

আলফন্স ডোডে।

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

"কুশদহ" ৫ম সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল, ইতিমধ্যে সহরের অধিকাংশ গ্রাহকগণ চাঁদা প্রদান করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন; কিন্তু মফঃস্বলের অধিকাংশ গ্রাহকগণ অদ্যাপি চাঁদা প্রেরণ করেন নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, এই সংখ্যা প্রাপ্তির পর দয়া করিয়া ক্ষুদ্র চাঁদাটী পাঠাইবেন। ইতি মধ্যে যাঁহাদের মণি-অর্ডার না পাইব, আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইতে চাই, যদি কাহার কোনরূপ অসুবিধা হয় বা আপত্তি থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া পত্রদ্বারা জানাইবেন, কোন্ সময় টাকা পাঠাইবেন বা ভিঃ পিঃ করিব, অন্যথা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ)

২য় বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৬। [৫ম সংখ্যা।

মাতৃস্তোত্রম্।

জয় দেবি পরারাধ্যে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি,
জগদ্ধাত্রি মহাবিদ্যে মাতঃ সর্ব্বার্থসাধিকে।
ভবভারহরে সর্ব্বমঙ্গলে জগদীশ্বরি,
বিমূঢ়মতিজীবানাং পাপসঙ্কটবারিণি।
বরদে শুভদে লোকপ্রসূতে জীবিতেশ্বরি,
মানবানাঞ্চ দেবানাং চিরকল্যাণদায়িকে।
প্রসন্নবদনে বিশ্বজনয়িত্রি দয়াময়ি,
বিচিত্রগুণসম্পন্নে শিবে সন্তানবৎসলে।
বহুরূপা নিরাকারা ত্বং হি ভুবনমোহিনি,
বিজ্ঞানঘনরূপা ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণী।

রাজরাজেশ্বরি ত্বং হি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী,
গৃহাশ্রমেষু বিত্তেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতে।
চরণাশ্রিতভৃত্যানাং ত্বং নিত্যসুখবর্দ্ধিনী,
নির্ব্বান্ধববিপন্নেষু বরাভয়প্রদায়িকে।
বিশালভবদুস্তারে জননীনামসম্বলম্,
ঘোরমোহান্ধকারেষু দিব্যজ্যোতির্ব্বিকাশিনি।
নিশ্বাসে শোণিতাধারে প্রাণরূপেণ সংস্থিতে,
সর্ব্বব্যাপিণি কল্যাণি চিদ্‌ঘনস্বরূপে সতি।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রি সর্ব্বজ্ঞে ত্বং সর্ব্বসাক্ষিরূপিণী,
স্থাবরে জঙ্গমে নিত্যং শক্তিরূপেণ সংস্থিতে।
মুমুক্ষুসাধকানাঞ্চ তপঃসিদ্ধিপ্রদায়িকে,
আনন্দময়ি মাতস্ত্বং ভক্তচিত্তবিহারিণী।
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপেণ সর্ব্বভূতে বিরাজিতে,
অন্তর্যামিনি যোগেশি ক্ষেমঙ্করি কৃপাময়ি।
নমস্তেঽনন্তরূপিণ্যৈ অভয়ে ভুবনেশ্বরি,
অদ্বিতীয়ে দুরারাধ্যে পাষণ্ডদণ্ডকারিকে।
অন্নদে পুণ্যদে মাতার্য্যগধর্ম্মপ্রবর্ত্তিকে,
বেদাগমেষু তন্ত্রেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতে।
চিন্ময়ি প্রতিভাদাত্রি অমৃতানন্দভাষিণি,
ত্বং হি জ্ঞানং বলং পুণ্যং শান্তিঃ সৌভাগ্যদায়িকে।
ত্বং হি মম ধনং প্রাণাঃ ত্বং হি সর্ব্বস্বরূপিণী,
ত্বং হি বেদো বিধিস্তন্ত্রং মন্ত্রো ভজনসাধনম্।
ত্বন্নামস্মরণৈর্গানৈর্জীবন্মুক্তির্হি লভ্যতে,
বিতরাকিঞ্চনে দীনে মাতস্তে করুণাকণাম্।
দেহি পাদসরোজং মে নরামরনিষেবিতম্,
তব পাদারবিন্দেষু প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

১৬। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

কঠোপনিষৎ ৩।১৪

হে জীবসকল, উত্থান কর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন।

১৭। এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

কঠ ৩।১২

এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করিতেছেন। অধ্যাত্মদর্শী সাধকগণ একাগ্র মনে তাঁহাকে দর্শন করেন।

১৮। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

কঠ ২।২৪

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম্মফলকামনাপ্রযুক্ত যাহার মন স্থির হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১৯। স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥

কঠ ১।১২

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকে কেহ

ভয় করে না, ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে আনন্দিত হন।

২০। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥

কঠ ৫।৮

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন, তাঁহাতে লোকসকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

২১। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

তলবকারোপনিষৎ।৪

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

২২। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

কঠ ৪।২

অল্পবুদ্ধি লোকসকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

কৃষ্ণকুমার বাবুর কারাবৃত্তান্ত।

ছাত্রসমাজের আমার কয়েকটী অতি প্রিয় বন্ধু, আমার কারাবাস কালে ঈশ্বরের যে কৃপা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং সেখানে কিরূপে আমি জীবন

যাপন করিতাম সে সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

কয়েকখানি সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমাকে পুনঃ পুনঃ সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট সে সকল কথা বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি। আপনারা এখানে আমার ধর্ম্মবন্ধুগণ উপস্থিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ যুবকগণ যখন এই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছেন তখন আজ সেই কথা—আমার প্রাণের কথা আমি আপনাদিগের নিকট বলিব।

যখন কলিকাতা সহরে সর্ব্বাগ্রে একটা নির্জ্জন ঘরে আমাকে আবদ্ধ করে, তখন রাত্রি প্রায় ৭টা। যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম তখন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ হইল। আমি দেখিতে পাইলাম, ঈশ্বর সেই গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইলাম, তাঁহার প্রেমের জ্যোতিতে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম একি! তোমার সন্তান যখন বিপদের মধ্যে পতিত হয় তখন কি তুমি এমন করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক? ঈশ্বরের এমন জীবন্ত, এমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। আমি দেখিলাম তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে—তিনি আমার চতুর্দ্দিকে। তিনি আমার প্রাণ, মন পূর্ণ করিয়া রহিলেন। সারারাত্রি কাটিয়া গেল, এক মিনিটও ঘুম হইল না।

তারপর যখন আমি রেলগাড়ীতে উঠিলাম, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে কি দয়া তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। যখন টুণ্ডলা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম তখন আমার প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইল,"হে ঈশ্বর! ৫৫ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তোমার নিকট সম্পূর্ণ ধরা দিতে পারি নাই, তাই কি প্রভু তুমি আমাকে, দয়া করে ধরে নিয়ে এলে? তাই কি তুমি এই কারাবাসকে আমার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য এমন আয়োজন কর্‌লে? এমন কৌশল কর্‌লে? আমাকে নিয়ে চল্লে? তুমি যে আমার তা'ত প্রভু আমি জানি। কিন্তু এবার আমি সে কথা কারাগার হতে অনুভব করে যেন বাহির হই। এবার যেন তোমার কাছে সম্পূর্ণ ধরা না দিয়ে আমি না ফিরি। এবার এই দয়া তুমি কর।"

যে তিনজন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ—একজন জেলার, একজন এসিষ্টাণ্ট জেলার

ও একজন ওয়ার্ডার—তিন জনেই ইংরেজ—ইঁহারা যে আমাকে কি আদর-যত্ন করেছিলেন তা' আর আমি বল্‌তে পারি না। তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। যিনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তিনি একজন Indian Medical Serviceএর লোক; তিনি যে কত স্নেহ করেছেন তা আমি বলে উঠ্‌তে পারি না। তার পর আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ যিনি, তাঁহার সদ্ব্যবহারের কথা ভাষায় বর্ণনা হয় না। যিনি কমিশনার—আমি তাঁহার নামটা ঠিক জানি না—তিনিও অতিশয় সদ্ব্যবহার করেছেন।

এ সকল কাহার করুণা? কার কৃপায় তাঁহারা আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন? আমি তাঁহাদের এক এক জনের মুখে পিতা পরমেশ্বরের ছবি দেখ্‌তেম। দেখ্‌তেম, তিনি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে, তাঁহাদিগকে সুমতি দিচ্ছেন।

আমি প্রতিদিন প্রাতে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ কর্‌তেম। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, প্রাত্যহিক উপাসনা কর্‌তেম। আজ আপনারা এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনাদের অনেককেই উপাসনার সময় দেখ্‌তে পেতেম, অনেকের জন্যই প্রাণ হতে প্রার্থনা উঠ্‌ত। এখানে যত প্রচারক উপস্থিত আছেন, বা নাই, সব যায়গায় সকল প্রচারকের জন্য আমার প্রাণে এই প্রার্থনা উঠ্‌ত—'প্রভু তুমি তোমার সেবকদিগকে বল দাও, যাতে আমাদের দেশের সকল প্রকার কল্যাণ হয়।' এখানে যত ব্রাহ্ম আছেন, যত ধর্ম্মবন্ধু আছেন, সকলের কথা স্মরণ কর্‌তাম। যাঁরা রোগার্ত্ত তাঁদের জন্য প্রাণে এই প্রার্থনা আস্‌ত—"ভগবান, ইঁহাদের দ্বারা যে তোমার আরো অনেক কাজ করাইতে হইবে—ইঁহাদিগকে এখান হইতে নিয়ে যেয়ো না।" এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত কি অসঙ্গত, ভাল কি মন্দ, এতে ফল হয় কিনা তা মনে আস্‌ত না, প্রার্থনা আস্‌ত, তাই প্রার্থনা কর্‌তেম।

ভগবান কি প্রার্থনা শোনেন না? শোনেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে এই, মানুষ সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা করে তিনি সে সব প্রার্থনা শুনেন। পূর্ব্বে আমি শুনেছি যে, তিনি সকলের সকল প্রার্থনা শোনেন না। এক একবার প্রার্থনা ক'রে আমার ভয় হ'তো কিন্তু আমি দেখেছি এই, আমার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেহ হয়তো বল্‌তে পারেন যে তোমার সব

প্রার্থনা যখন ঈশ্বর শোনেন, তবে আরও আগে মুক্তি লাভের জন্য কেন প্রার্থনা কর নাই? না, আমি মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থনা করেছি, "তুমি যেজন্য আমাকে কারাগারে আন্‌লে—তার চিহ্ন না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।" ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনেছেন।

লোকে বলত একটা ঘটনা উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে—রাজার জন্মদিন উপলক্ষে আমার মুক্তি হতে পারে, আমার মন বল্‌ত—না, তা হলে লোকে বল্‌বে এ মানুষের কৃপা, ঈশ্বরের কার্য্য নয়। আমি প্রার্থনা কল্লেম "ঈশ্বর, আমাকে এমন করে মুক্তি দাও যে তাতে তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে।" আমি সর্ব্বশেষ প্রার্থনা কর্‌তেম, "ঈশ্বর, আমার জন্মভূমির কল্যাণ যাতে হয় তা' তুমি কর।" আমি বেশ জানি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে—অনেক পরিমাণে হয়েছে।

প্রার্থনার পর, যখন ৬টা বেজে যেত,অন্যান্য কাজ শেষ করে, ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বাহিরে বেড়ান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি নিয়ম কল্লেম, এই এক ঘণ্টা যেমন শরীর চল্‌বে, মনকেও তেমনি সাধন, তেমনি একটা Disciplineএর মধ্যে আন্‌তে হবে। ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপ মনে আন্‌তেম, আর তাই নিয়ে সাধন কর্‌তেম। "সত্যং"—ঈশ্বর "সত্যং"; শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে মন জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত।

এইরূপে এক ঘণ্টা সাধনের পর ঘরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, উপাসনায় প্রবৃত্ত হতেম। এই উপাসনাতেও পরিবারের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, দেশের জন্য প্রার্থনা কর্‌তেম।

৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে বই পড়্‌তেম। আমি কতকগুলি বই চেয়েছিলেম; জেলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সেগুলি দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কি অপরাধে আমাদের পতন হল, এই প্রাচীন জাতি কিরূপে বড় হয়েছিল আর কেন, কি অপরাধে তাহাদের পতন হল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা। বিনা অপরাধে ত কাহারও পতন হয় না; আর ঈশ্বরের রাজ্যের এই এক অখণ্ড নিয়ম যে অপরাধ করে কেহ নিষ্কৃতি পায় না, যে পাপ করে তাহার পতন হবেই। তাই আমি এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলাম যে, প্রাচনী জাতি সমূহ ধ্বংস হ'ল কেন? আমি শিখদের উত্থান ও পতনের বিবরণ পাঠ

করিতে প্রবৃত্ত হলেম। এইরূপ মারহাট্টা জাতির পতনের কারণও জানিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু এদেশে এবং ইংলণ্ডে অনুসন্ধান করেও বই পাওয়া গেল না। এসিরিয়া, বেবিলনিয়া, ঈজিপ্ট—এক সময়ে যারা এত উন্নত হয়েছিল তারা এমন পতিত হল কেন? এই সকল পতিত জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমি দেখ্‌লেম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সময় সময় কতকগুলি পাপ এসে প্রবেশ করে; মানুষের পাপের ফলে জাতির মধ্যে কতকগুলি পাপ এসে পড়ে; তার পর সেই পাপ দূর কর্‌বার জন্য যদি একদল লোক জীবন উৎসর্গ করে তখন আবার তাদের উত্থান হয়।

২টার সময় আবার পড়্‌তে বস্‌তেম। এইরূপে আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি, যা জীবনে হবার আর উপায় ছিল না। তার পর জলযোগ ক'রে ৪টায় আবার বাহির হ'তেম। আবার ১ ঘণ্টা সেই ঈশ্বরের স্বরূপের সাধনায় মনকে নিযুক্ত কর্‌তেম। ৫টার সময় ফিরে এসে এক ঘণ্টা পড়্‌তাম। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উপাসনা, প্রার্থনা করতেম, কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের লোকদের জন্য প্রার্থনা কর্‌তেম, তা নয়, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যাঁরা নানাস্থানে নানা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেম। ৯টায় শয্যায় গমন কর্‌তেম।

নানা বই পড়ে, জাতি সমূহের উত্থান পতনের ইতিহাস পড়ে, আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছে—পূর্ব্বেও বরাবর আমার এই ধারণা ছিল—যে মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে এই আদেশ প্রচার করেছেন যে, যে জাতি ধর্ম্ম পথে চলে সে জাতির কল্যাণ হয়, আর যে জাতি অধর্ম্ম পথে চলে সে জাতির অকল্যাণ হয়। একজন যদি পাপ করে, সমাজ দুর্গন্ধময় হ'য়ে যায়, সে জাতির পতন অনিবার্য্য হয়। আমি একথা বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলি, কেহ একজনও পাপের পথে যেয়োনা, তোমার পাপের ফলে সমাজ কলুষিত হবে, তোমার দেশের অধোগতি হবে।

ট্রেণে যখন আস্‌ছি, আমার একজন পূর্ব্বতন ছাত্র আমাকে বল্‌লে—"শুনেছেন, আলিপুরের উকিল, আশুবিশ্বাসকে গুলি ক'রে মেরেছে।" শুনে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হ'ল। আশুবাবু ও আমি অনেক দিন একসঙ্গে স্বদেশের সেবা করেছি! তাই মনে হল, কেন আমার দেশের লোক এমন

কুকর্ম্ম কর্‌লে—এতে যে আমার দেশে পাপের সঞ্চার হল, দেশ যে উৎসন্ন যাবে। আমার মনে হল, এই আমার কারাবাসে যদি আমার পুত্র কেঁদে আকুল হয়, তবে আশুবাবুর ছেলেদের পরিবারের কি যাতনা হয়েছে!

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বলিদান ব্যতীত জাতির কল্যাণ হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সে বলিদান কি এমনি করে কর্‌বে? আর, ঐ যে দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি, সামাজিক অত্যাচার, ধর্ম্মের গ্লানি—উহা দূর করিবার জন্য তিল তিল করে রক্ত দান করিবে না (আত্ম) বলিদান করিবে না?

এদেশের মধ্যে দেখি কয়েক জন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বার্থ সুখের চিন্তা ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের সকল কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এস না, দেশের কল্যাণ যাঁরা চাও, তাঁদের মত সকল ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে যোগ দাও।

কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, শিক্ষিত যুবকেরা ডাকাতি করিতেছে। আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমি শুনিয়াছি, কোন কলেজের ছেলে ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া ধরা পড়ে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেরা দুই একজন ধরা পড়েছে বটে; কিন্তু অনেকে মুক্তিলাভও করেছে। আমি জানি না ভদ্রলোকের ছেলে কেহ, একজনও ডাকাতি করেছে কি না। যদি দুই একজন এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকে, সমস্ত শিক্ষিত যুবকদের প্রতি ডাকাত বলিয়া যে সন্দেহ জন্মেছে, যে অপবাদ রটেছে, তা' দূর কর্‌তে হবে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাঁরা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। আপনারা ত আমাকে জানেন, আমার সুকার্য্য দুষ্কার্য্য, ভালমন্দ, আপনারা সবই জানেন। আপনারা আমাকে যেরূপ জানেন এমন আর কেহ জানে না। আপনারা যদি জান্‌তেন যে ব্রাহ্মসমাজের যে মাহাত্ম্য তা হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি—কোন সত্য হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি—আমাকে আজ আপনারা লাথি মেরে দূর করে দিতেন। আমি জানি, ব্রাহ্ম-সমাজের লোক কোন মানুষ দেখে না, সত্যকে দেখে। সুতরাং আপনারা যে আমাকে কোন গর্হিত দুষ্কর্ম্মকারী বলে মনে করেন না, তা' আমি আজ বুঝেছি—আগেও বুঝেছি—কারণ ব্রাহ্মসমাজ হ'তে জেলে আমার নিকট সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে।

২

কিন্তু আমাকে যাঁরা কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন আজ বলছি তাঁদের প্রতি আমার ঘৃণা নাই। ঈশ্বর কারাগারে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, সুতরাং যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের জন্য আজ আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—ভগবান দয়া করে তাঁদের সুমতি দিন্। আর আমাকে যে তাঁরা দয়া করেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিই।

জীবাত্মার ব্যাকুলতা।

"পূজিব প্রাণেশে বলি জীবাত্মা ব্যাকুল!"

ওরে জীব! দেখরে অন্তরে প্রবেশিয়া,
কি চায় তোমার আত্মা পরাণ ভরিয়া।
অপূর্ণ পূরণ করি পূর্ণে গতি তার,
পূজিতে প্রাণেশে করে ইচ্ছা অনিবার।
ভবাগারে আঁধার দেখিয়া জ্যোতি চায়,
জ্যোতির্ম্ময় কৃপাকরি দেন তাহা তায়।
লভিয়া আলোক সেই কত সুখী হয়,
স্বভাবে এভাব হয় আপনি উদয়,
যেমতি আঁধার ঘরে শিশু দীপালোক
পেয়ে, কান্না ভুলে খেলে পাইয়া পুলক,
তেমতি জীবাত্মা নিরখিলে স্বপ্রকাশ,
হয় তার হৃদে কত আনন্দ-বিকাশ।
তিনি হন চির-পূজ্য সকলের মূল,
"পূজিব প্রাণেশে বলি জীবাত্মা ব্যাকুল!"

পরিব্রাজক

কুশদহ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কুশদহ" সম্বন্ধে এ দেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভীমসেন দিগ্বিজয়ে, বহির্গত হইয়া কুশদহ জয় করিয়া ইহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কারণ কুশদহকে পৌণ্ড্রদেশ কহে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ,—গোপ, গোপাঙ্গনাগণ সহ এ দেশে আসিয়া কুশদহকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। গয়েশপুর, ঘোষপুর, গোপিনীপোতা, কানাইনাট্যশালা, গোবরডাঙ্গা, গোপীপুর (গৈপুর), গোপালপুর প্রভৃতি স্থানের নাম তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কানাই নাট্যশালা গ্রামের ভূমি খনন কালে অনেক উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভিত্তি, সুবৃহৎ বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ মনুষ্য কঙ্কাল দেখা গিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় বহু পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধনজন পূর্ণ মহা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

এই কুশদহের পূর্ব্ব সীমায় যেখানে ইছামতী নদীর সহিত যমুনা নদীর মিলন হইয়াছে সেই স্থানে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সহিত রাজা মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল; এবং সেই যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া মানসিংহ দিল্লীতে লইয়া যাইতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে প্রতাপাদিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুশদহের দক্ষিণ সীমায় যে পথ "গৌড়বঙ্গ" বলিয়া খ্যাত, সেই পথ দিয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিতে গিয়াছিলেন, উক্ত পথের চাপ্‌ড়া নামক স্থানে মানসিংহ যখন সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হন্, তখন দারুণ বর্ষাকাল। সৈন্তদিগের মধ্যে খাদ্যাভাব হওয়ায় মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভবানন্দ মজুমদার রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য এই কুশদহের মধ্য দিয়া লইয়া মানসিংহের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে মানসিংহ যদি ভবানন্দ মজুমদার, চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়, ও গৃহ শত্রু কচুরায়ের সাহায্য না পাইতেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের ইতিহাস আজ আমরা অন্যরূপ দেখিতাম।

ইছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার বংশাবলীর বিবরণের সহিত ইছাপুরের বিবরণ বর্ণনা করিব।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের ৪ পুত্র ও ১টী কন্যা। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্ধুরীণের সময়ে ইছাপুরের বিখ্যাত ৫টী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই ৫টী মন্দিরের নাম নবরত্ন, যোড়বাঙ্গালা, নাটমন্দির, দোলমঞ্চ ও মঠমন্দির।

এই ৫টী মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহারা তাৎকালীন ঢাকাই শ্রেষ্ঠশিল্পী দ্বারা রঘুনাথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি যে কয়েকটী মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সেই অবস্থায় আছে। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ও তাঁহার বংশের অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ইছাপুরে বাস করান; এবং অনেকে এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। এই চৌধুরী বংশের পঞ্চানন চৌধুরীর এক কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ হয়। এবং রামচরণ চৌধুরীর কন্যার সহিত সারষা নিবাসী শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ই গোবরডাঙ্গার বর্ত্তমান জমীদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ। গোবরডাঙ্গার বিবরণ লিখিবার সময়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরীর পিতামহ নবকুমার চৌধুরীর কন্যা পীতাম্বরী দেবীর সহিত কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। ইছাপুর ও গৈপুরের মধ্যে যে খাল আছে, সেই খালের ধারে কৃষ্ণনগরাধিপতির কাছারি বাড়ী ছিল। আজও লোকে ফকির পাড়ার ঘাটকে কাছারি বাড়ীর ঘাট বলিয়া থাকে। এই কাছারির ম্যানেজার একদা নৌকাযোগে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে যমুনানদীতে অবগাহমানা পীতাম্বরী দেবীর অলোকসামান্যরূপ মাধুরী দেখিয়া রাজরাণী হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া নবকুমার চৌধুরীর নিকট মহারাজার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। পীতাম্বরী দেবীকে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী লইয়া গিয়া তথায় উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শুনা যায় তাঁহার করতল প্রকৃতিদত্ত অলক্তক রঞ্জিত ছিল এবং কথোপকথনের সময়ে সমাগত স্ত্রীলোকেরা মনে ভাবিতেন আমার সহিত স্বয়ং লক্ষ্মী কথা কহিতেছেন। উক্ত নবকুমার চৌধুরীর ঈশ্বরচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ নামে দুই পুত্র ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র স্বর্গীয়

পরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এবং বৈদ্যনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই চৌধুরী বংশের কালীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যার সহিত নলডাঙ্গার রাজা শশিভূষণ রায়ের বিবাহ হয়। ইনি নলডাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা প্রমথভূষণ রায়ের পিতামহ এবং রাজা প্রমথভূষণ রায়ের সহিত রতন চৌধুরীর পৌত্রী শ্রীমতী পতিতপাবনী দেবীর বিবাহ হয়। এই চৌধুরী বংশের ভুবন চৌধুরীর ভগ্নী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সহিত ভূকৈলাসের স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন ঘোষালের বিবাহ হয়। এই সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ইছাপুর মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইছাপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্মুখে একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে ঃ—

"ভূকৈলাসের স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন ঘোষালের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমির হিতার্থে প্রদত্ত হইল। ১২৮৯ সাল।"

ইছাপুরের বিখ্যাত বিগ্রহ গোবিন্দদেব প্রথমে কাহার দ্বারা খোদিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তৎপরে উক্ত প্রস্তর-বিগ্রহ ভগ্ন হইলে মুলুকচাঁদ চৌধুরীর স্বপ্ন হয় যে "শিবনিবাসের রাজার বাড়ী যে প্রস্তর আছে সেই প্রস্তর আনাইয়া আমার মূর্ত্তি খোদাই কর," সেই স্বপ্ন অনুযায়ী তাঁহারা শিবনিবাসের রাজবাড়ী হইতে উক্ত প্রস্তর চুরি করিয়া আনিয়া গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার পরদিবস এই গোবিন্দদেবের দোল হয় এবং সেই উপলক্ষে একটী বৃহতী মেলা হয়।

চুঁচড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের, এই ইছাপুরে নীলকণ্ঠ চৌধুরীর বাড়ীর এক কন্যা জগদম্বার সহিত বিবাহ হয়। উক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার গোবিন্দদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নোট্ জাল করা অপরাধে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়। তাঁহার সুদৃশ্য বাড়ীতে এক্ষণে চুঁচড়ার কলেজ স্থাপিত আছে।

দেবী ঠাকুরুণ—ইছাপুরের সুদৃশ্য পৈতা, রন্ধনকার্য্য ও শিল্পীর জন্য বিখ্যাত। একদা প্রাণকৃষ্ণ হালদার শ্বশুরবাড়ী আসিলে দেবী ঠাকুরুণ পঞ্চবর্ণের গুঁড়ির দ্বারা এমন আসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে প্রাণকৃষ্ণ হালদার উহা প্রকৃত আসন বলিয়া বসিয়াছিলেন, এবং হলকসা (দ্রোণ জাতীয়) পুষ্প দ্বারা এমন অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তিনি উহা প্রকৃত অন্ন বলিয়া আহার করিতে উদ্যত

হইলে, দেবী ঠাকুরুণের হস্তস্থিত পাখার বাতাসের দ্বারা ফুল সকল উড়াইয়া দিলে, সমাগত স্ত্রীলোকগণ হাসিয়া উঠিলে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এবং দেবী ঠাকুরুণের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এই দেবী ঠাকুরুণ পৈতা বিক্রয় করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দেবী ঠাকুরুণ যমুনার ঘাটে স্নান করিবার জন্য জাঙ্গাল বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, আজও লোকে সেই জাঙ্গালকে "দেবী ঠাকুরুণের জাঙ্গাল" বলিয়া থাকে। এই "কুশদহ" লেখক কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেটে "দেবী ঠাকুরুণের জীবনী" লিখিত হইয়াছিল।

যেখানে মল্লিকপুরের ঘাট সেই স্থানে যমুনার দক্ষিণ পারে "গুহ" উপাধিধারী একজন জমীদার বাস করিতেন। তাঁহার বাস্তু ভিটায় অনেকে টাকা পড়িয়া পাইয়াছেন শুনা যায়।

ইছাপুরে এক সময়ে এত বসতি ছিল, যে স্থানান্তর হইতে একটী ভদ্র লোক ইছাপুরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু এমন একটু স্থান পান নাই যে তথায় বাস করেন। যে মহামারী গদখালী, শ্রীনগর, দেবগ্রাম, উলা (বীরনগর) প্রভৃতি গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল, সেই মহামারী ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কুশদহে প্রবেশ করিয়া ইছাপুরকে জনশূন্য করে। ইছাপুরের যাহা কিছু ছিল তাহা মাননীয় সুরনাথ চৌধুরী মহাশয় ইছাপুর পরিত্যাগ করায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে ইছাপুর জনশূন্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং দিবাভাগে—"ফেরু পাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।" জরে, ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ দরিদ্র ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শত বৎসরের মধ্যে রোগ-বিজ্ঞানেরও কত উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুরাকালে উন্মাদ রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না।

তখন উন্মাদ্ রোগীকে দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে প্রহার ব্যবস্থা করা হইত। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্করোগ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমান সময়ে উন্মাদাগারের এবং উন্মাদ্ রোগীর চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্ রোগ ও হৃদ্‌রোগ তখন নির্ব্বাচিত হইত না। এখন পরিদর্শন, সংস্পর্শন, মেন্‌সুরেশন্, পার্কশন্ এবং অস্কল্টেশন্ প্রভৃতি উপায়ে ঐ সকল রোগ আমরা অনায়াসে পরীক্ষা করিতেছি। ষ্টেথেস্‌কোপ্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে জরায়ুমধ্যস্থ শিশু-হৃদয়ের টিক্ টিক্ শব্দ অথবা ক্ষুদ্র শ্বাসনালী মধ্যস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মার বুড়্ বুড়্ শব্দ শ্রবণ এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালে শোথ একটি স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণ্য হইত। এখন শোথকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তখন শোথের একই প্রকার চিকিৎসা ছিল, অধুনা মূল কারণ নির্দ্ধারিত করিয়া তদনুসারে ইহার চিকিৎসা করা হয়। তখন প্রস্রাবের বহুবিধ পীড়া নির্ণয় করা বাতুলের কল্পনা বলিয়া বোধ হইত। ব্রাইটাময় (Bright's disease) নামক পীড়া ১৮২৭ সালে ডাক্তার রিচার্ড ব্রাইট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন রাসায়নিক এবং অণুবীক্ষণিক পরীক্ষার সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার প্রস্রাবের পীড়াই নির্ব্বাচিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্ত্রাবরোধ (Obstruction of bowels) নামক রোগে অনেক চিকিৎসক অর্দ্ধ সের বা আরো অধিক মাত্রায় রোগীকে পারদ সেবন করাইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন পারদের ভার দ্বারা মল নিঃসৃত ও অন্ত্রমুক্ত হইবে। এক্ষণে এইরূপ কুসংস্কার পূর্ণ চিকিৎসা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে আমাশয় রোগের কিরূপ চিকিৎসা হইত তাহা ডাক্তার গুডিভ সাহেবের লিখিত "প্রাচ্য ভূখণ্ডে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। তিনি বলেন, "তখন আমাশয় রোগে রোগীর বল রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকেরা মদ্য ও মাংস উপযুক্ত পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিতেন। রোগীকে ইচ্ছামত কালিয়া, পোলাও, ব্রাণ্ডি এবং প্রচুর পাকা ফল খাইতে বলা হইত।"

ভৈষজ্যবিদ্যার উন্নতির কথা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। দিন দিন কত নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ঔষধের আকার প্রকারেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রোগ, পাত্র ও প্রয়োজন ভেদে

অনেক নূতন প্রয়োগপ্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রোগী ঔষধ সেবনে অক্ষম হইলে চর্ম্মভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ, মর্দ্দন, শ্বাসদ্বারা ঔষধদ্রব্য কণ্ঠনালী এবং ফুস্‌ফুসের অন্তর্গতকরণ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যদবধি ভিয়ানানগর নিবাসী ডাক্তার কোলার, কোকেইন্ আবিষ্কার করিয়াছেন, তদবধি চক্ষুরোগ চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এণ্টিপাইরিণ্, ফিনাসিটিন্ প্রভৃতি আবিষ্কারের পর হইতে অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর হ্রাস করা অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত ঔষধ যে প্রকারে আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এক সময়ে কতকগুলি নির্ব্বোধ লোক দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস্ পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্ব অঞ্চলে পিরু, বলিভিয়া ও কলম্বিয়া প্রভৃতি প্রদেশজাত মহামূল্য সিঙ্কোনাবৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত ঐ বৃক্ষ রোপণ করিত না। ইহাতে কুইনাইন অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল এবং অনেক মহাত্মা নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে কেহ এণ্টিপাইরিণ্, কেহ ফিনাসিটিন্ কেহ বা সেলিসিলিক্ এসিড্ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

বীজতত্ত্বের (Bacteriology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অদৃশ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুই ওলাউঠা, যক্ষা, ধনুষ্টঙ্কার, প্রভৃতি রোগের কারণ তাহা আমরা জানিয়াছি। আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল অদৃশ্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জীবাণু আমরা পরিষ্কাররূপে চক্ষে দেখিতেছি। ধন্য বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান! (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (ডাক্তার)
গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৫)

হরিদ্বার-কঙ্খল।

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে একাগাড়ি করিয়া এক মাইল দক্ষিণে কঙ্খল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আসিলাম। তখন বেলা ৭-৩০ হইবে। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী

কল্যাণানন্দের নিকট আমি ২।১ দিনের জন্য এই স্থানে কেবল আশ্রয় পাইতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এস্থান রোগীদিগের জন্য আছে, কখন রোগী আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, রোগী না আসিবার সময় পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন।" বোধ হয় দুইটী ঘর একেবারে খালি ছিল, আমি তাহার একটীতে রহিলাম। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটী বড় হল্ ঘরে পরমহংসদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হইল এই ঘরে নির্জ্জন সাধন-ভজনাদি লইয়া থাকে। তারপর আর একটী ঘরে ডিস্‌পেন্সেরী, একটী ঘর ডাক্তার বাবুদের জন্য, আর একটী ঘরে স্বামী কল্যাণানন্দ থাকেন। এই ঘরগুলি একশ্রেণীতে একটী একতালা এমারৎবাড়ী বিশেষ, সমস্ত ঘরের সম্মুখে টানা বারাণ্ডা। ইহার একটু দূরে আর একটী একতালা দুইটী ঘর, তাহাতে সাধারণ রোগীসকল থাকে। এতদ্‌ব্যতীত পাকা পায়খানা, কাঁচা বড় বড় ২ খানি ঘরের একখানা রশুই ও আহারের জন্য আর একখানিতে মহিষ, গরু থাকে। আশ্রমের মধ্যস্থলে একটা বড় পাকা ইদারা আছে। এক বিস্তৃত চতুর্ব্বেষ্টিত ময়দানের মধ্যে এই আশ্রম।

আমি এখানে থাকিয়া ছত্রে মাধুকরী করিয়া আহার করিতে লাগিলাম। ক্রমে ডাক্তার বাবু, কম্পাউণ্ডার যুবক ব্রহ্মচারী তিনকড়ি মহারাজ এবং কল্যাণ স্বামীর সহিত আমার আলাপ হইল, তাঁহারা আমার গান শুনিলেন। ছত্রে যেরূপ রুটী ও দাউল ভিক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে আমার মনে হইল, প্রত্যহ একবার আহারই যথেষ্ট, ইহাতে শরীরও ভাল থাকিবে এবং সাধন ভজনের পক্ষে একটু অল্পাহারই সুবিধা হইবে, কিন্তু রাত্রে আশ্রমে আহারের সময় আমাকে ডাকিয়া সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন, সুতরাং আমি রাত্রে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিলাম। এইরূপে একবেলা ছত্রে ও একবেলা আশ্রমে আহার করিতে লাগিলাম।

এখানে এখন অল্প অল্প শীতবোধ হইয়াছিল। আমার নিকট একখানি রঙ্গিণ কম্বল ও একখানি গরম গায়ের কাপড় ছিল, তাহাতেই চলিতে লাগিল। আমার ঘরে একখানি খাটীয়া ছিল, তাহাতে শয়ন করিতাম। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া অন্যান্য কাজ সারিয়া উপাসনা, প্রার্থনায় ও ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইতাম। প্রথম দিনের বিষয় ডায়েরীতে এইটুকু লেখাছিল, "এখানে থাকিবার এবং আহারের

ভাবনা নাই, এখানে কিছুদিন থাকিয়া সাধন ভজন করিবার পক্ষে বেশ অনুকূল। আজকার ধ্যানে অন্তরে বড়ই সুন্দর ভাবের উদয় হইয়াছিল, ধর্ম্ম জীবনের যেন একটা নূতন পথের আলোক পড়িল, নবজীবনের আভাস পাইয়া প্রাণ ভক্তি-বিগলিত হইল, তখন স্বতঃই এই প্রার্থনা হইল, হে মাতঃ! তুমিই সকলের মূলাধার, তোমার একি করুণা, ব্যাকুলতা দাও আরও ব্যাকুলতা দাও।"

৫ই কার্ত্তিক সোমবার। কয়েকখানা পত্র লিখিলাম, তাহার মধ্যে খুলনায় স্ত্রীকে একখানা। ৬ই এইসকল নামে পত্র লিখিলাম, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, উপেন্দ্র ও বিনয়কে। ৭ই বুধবার ত্রৈলোক্য এবং জনার্দ্দনকে পত্র লিখিলাম। অর্থাৎ প্রাণের যতই উচ্ছাস হইতে লাগিল, ততই আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবগণকে সেই ভাবের আভাস না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আজকার ধ্যানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। প্রাণে আনন্দ ও ভক্তি, কৃতজ্ঞতার ভাব খেলিতে লাগিল।

হরিদ্বার পৌঁছিবার পূর্ব্বে ট্রেণে একটী পরমহংসের সহিত অল্প আলাপ হইয়াছিল, আজ হটাৎ তাঁহার সঙ্গে বাজারে দেখা হইল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া "ঘণ্টাকুটীরে" লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে আলাপের পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বলিয়াছিলেন "স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেদান্ত প্রচারে বর্ত্তমান পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তনের ভাব আসিয়াছে, অনেকের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।" আমাকে তাঁহার স্বরচিত একখানি হিন্দী গ্রন্থের ম্যানাস্ক্রিপট্ হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন, "আপনি এই আশ্রমে আসিয়া থাকুন।" তাহাতে আমি বলিলাম, আমি আপনাদের মত দশনামী, (গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি) কোন শ্রেণীর সাধু নহি, আমি বাঙ্গালী ব্রহ্মজ্ঞানী পন্থী, সুতরাং আমার এখানে থাকিবার কি সুবিধা হইবে? আশ্রমের মহান্ত মহারাজ আসিলে (সে সময় তিনি অন্যত্র গিয়াছিলেন) তাঁহার সহিত আমার মত ও ভাবের মিল না হইলে যদি তিনি নারাজ হন্? তাহাতে রামানন্দ স্বামী (সাধুর নাম রামানন্দ স্বামী) বলিলেন, (আমাদের সকল কথাই হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল,

কেন না তিনি হিন্দুস্থানী সাধু) "আপনার কোন চিন্তা নাই, মহান্ত মহারাজ বিদ্বান ব্যক্তি। এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর সে দিন আমি ঘণ্টাকুটীর হইতে চলিয়া আসিলাম।

প্রথম দিন হইতেই গঙ্গায় স্নান করিয়া এবং গঙ্গা দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না। গঙ্গার গভীরতা অধিক নহে কিন্তু বিস্তৃতি অনেক। নানা প্রকারের ছোট বড় গোলাকার প্রস্তররাশির উপর দিয়া, সুনির্ম্মল সুশীতল সলিল ধারা প্রবাহিতা। এমন স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ও সুশীতল জলরাশি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। দূরে পর্ব্বতমালা; ঐ গিরিরাজ নিঃসৃতা গঙ্গা বহু বিস্তৃত, এইরূপ কতদূর ইহার বিস্তৃতির সীমা তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক "গোমুখী" "হৃষিকেশ" "লছমনঝুলা"র কথা পরে বলিব। এক্ষণে স্নান করিয়া অতিশয় আরাম বোধ করিলাম। তৎপরে ৯৷৷০।১০ টার মধ্যে ছত্রে (মাধুকরী) ভিক্ষা করিতে হইত। এখানে এখন ৬টী ছত্র খোলা আছে, প্রত্যেক ছত্র হইতে দুইখানি করিয়া বড় বড় রুটি ও কিছু দাউল প্রদত্ত হয়। যে কোন পন্থীর সাধু হউন,—দেখিলাম, সাধু বেশধারী মাত্রকেই ভিক্ষা দেওয়া হয়, সাধুর সংখ্যা যতই হউক কেহ বিমুখ হন্ না। আমি একটি গেরুয়া বস্ত্র-খণ্ডের ঝুলি করিয়া তাহাতে রুটি ও বাটুয়া ঘটীতে দাউল লইতে লাগিলাম।

প্রথম দিনেই দুইটী বাঙ্গালী পরমহংস সাধুর সহিত (এখানে প্রায় সকল সাধুই পরমহংস, অল্পই ২।৪ জন দণ্ডী ও ব্রহ্মচারী দেখা যায়) আমার আলাপ হয়, আমি এখানে কিছুদিন থাকিতে ইচ্ছা করি, শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "কোন আশ্রমে বা মঠে থাকিতে গেলে কিছু না কিছু তথাকার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, এজন্য সাধারণতঃ ছত্রে মাধুকরী করিয়া সুবিধা মত কোন স্থানে আসন করিয়া থাকাই ভাল, বিশেষতঃ আপনার পক্ষে। আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়া ছত্র সকল দেখিয়া লইবেন, এবং থাকিতে থাকিতে সকলই অভ্যাস হইয়া যাইবে।" এইরূপে তাঁহারা অনেক, সৎকথা বলিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। আমিও তাঁহাদের কথাই ঠিক মনে করিয়া,প্রথম দিন হইতেই মাধুকরী করিতে লাগিলাম। প্রথমে ২।১ দিন আমাকে ভিক্ষা গ্রহণে অনভ্যস্তের ন্যায় দেখিয়া ছত্রের জনৈক পাচক বলিয়াছিল "মহারাজ নয়া সাধু হায়।"

আমি সকল ছত্রে যাইতাম না, কেন না তত আহার্য্য আমার আবশ্যক হইত না, ৩।৪টী ছত্রে গেলেই আমার যথেষ্ট হইত। আমি মাধুকরী লব্ধ ভিক্ষা-অন্ন লইয়া গঙ্গাতীরের কোন ঠাকুর বাড়ী—এখানে অনেক ঠাকুর বাড়ীও আছে তথায় থাকা যায় কিন্তু এরূপ স্থানে শুনিলাম চোরে ও বাঁদরে কিছু বিরক্ত করে, যাহা হউক আমি প্রত্যহ একটী স্থানে বসিয়া আহার করিতাম, ইতিমধ্যেও বাঁদরদের প্রতি উপেক্ষা করা চলিত না, একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই, এমন ভাবে সম্মুখের রুটী আত্মসাৎ করিত যে, মানুষকেও বাঁদরের নিকট নির্ব্বোধের ন্যায় হইতে হইত। সুতরাং আমি তাহাদিগকে রুটীর মোটা মোটা ধারগুলি দিতাম। তৎপরে গঙ্গায় অসংখ্য মৎস্য দেখা যাইত, সমস্ত মাছই রোহিত মৎস্যের ন্যায়, কেবল লম্বা কিছু বেশী। তাহাদেরও অবশিষ্ট একটু আধটু রুটী দিয়া ঝুলি ও লোটা পরিষ্কার এবং জলপান করিয়া কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিতাম। ক্রমে একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ ও সদ্ভাব হইয়া গেল, সে প্রায়ই ঐখানে অপনার সরঞ্জাম লইয়া ঘাটীয়া ব্রাহ্মণের ব্যবসা করিত। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া তাহার নিকট ঠাকুরজল ও প্রসাদ লইয়া সময় সময় এক আধ পয়সা কিম্বা একমুষ্টি আতপচাউল দিত। কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি সন্ন্যাসী সাধু নহি, বাঙ্গালী গৃহী, আমি যদি এখানে সপরিবারে বাস করি, তাহার জন্য ঘর বাড়ী পাওয়া যায় কি না? তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আমার মা আছেন, আমার বাড়ীতে আপনাকে ঘর দিতে পারি, অথবা এখানে মাসিক ।৵০ আনা বা ॥০ আনা ভাড়া দিলে দুই একটা ঘর যুক্ত বাড়ী পাইবেন।

এইদিন অপরাহ্নে আমি ঘণ্টাকুটীরে, থাকিবার জন্য আসিলাম। আসিবার পূর্ব্বে কল্যাণস্বামীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "ঘণ্টাকুটীর গঙ্গারধারে বেশ নির্জ্জনস্থান, মন্দ কি, দেখুন না সেখানে কেমন লাগে।" কল্যাণস্বামীর বয়স অনুমান ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হইবে, একহারা দেহখানি অথচ দৃঢ় কর্ম্মঠ; কুমার-সন্ন্যাসী অত্যন্ত অল্পভাষী, দেখিলে যেন ভয় হয় কিন্তু দাড়িম্ব ফলের অবরণ মধ্যে যেমন সুমিষ্টরস, তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ। কল্যাণানন্দ স্বামীর কথা আমার নিয়ত মনে আছে।

ঘণ্টাকুটীরে আমাকে একটী স্বতন্ত্র ছোট ঘর ও একখানি খাটীয়া দিয়া, রামানন্দ স্বামী বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালী সাধু, কষ্ট করিয়া ছত্রে মাধুকরী

কেন করিবেন, এই আশ্রমেই দুইবেলা ভোজন করিবেন। এই আশ্রমের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা এমন আয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে সেই অর্থে এই আশ্রমের সাধুসেবার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।" আমি তাহাতে অমত প্রকাশ করিলাম না। এই আশ্রমের মধ্যস্থলে একটী ছোট মন্দিরের ন্যায় ঘরে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিমূর্ত্তি আছে, এবং ঐ ঘরের উপরের চূড়ার নিম্নে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বাঁধা আছে—বোধ হয় এইজন্য আশ্রমের নাম "ঘণ্টাকুটীর"। যাহা হউক, শুনিলাম, ভোজনের পূর্ব্বে ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যত সাধু শান্ত উপস্থিত হইবেন সকলেই ভোজন করিতে পাইবেন, ইহাই প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে বাহিরের সাধু শান্ত উপস্থিত হইতে দেখিলাম না, কেবল যাঁহারা সময় সময় আশ্রমে থাকেন, তাঁহারাই উপস্থিত হইলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম।

ঘণ্টাকুটীরে প্রথম রাত্রি শেষে অর্থাৎ ৯ই কার্ত্তিকের প্রত্যূষের ধ্যানে প্রাণে এমন একটি পবিত্রতার জ্যোতি প্রকাশিত হইল যে, তখন মনে হইল, অপবিত্রতা তো কিছুতেই নাই, জগতময় সকলই পবিত্র। তার পর ভাবিলাম, মানব মনে কতই লজ্জা, সঙ্কোচের কারণ উপস্থিত হয়, উহা মনের বিকার মাত্র, এই যে মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল, ইহার মধ্যে কোনটীই ত অপবিত্র বা অনাবৃশ্যকীয় নহে, ইহার অঙ্গবিশেষের মূলভাবে লজ্জাস্করই বা কেন? সকলই ত মহাকার্য্য সাধক যন্ত্রমাত্র —স্ত্রী জাতির স্তন, লজ্জাস্কর অঙ্গ জন্য আবৃত থাকে, আহা! স্তন কি পবিত্র আধার; মাতৃস্নেহ—মাতার বক্ষের রক্ত, ক্ষিরধারে জীবপ্রবাহ-রক্ষা-কারিণী-শক্তি, দুগ্ধরূপে ঐ আধারে প্রবাহিতা; এই স্তনের পবিত্রতার বিষয় ধ্যান করিতে করিতে নিষ্পাপ অন্তঃকরণে—বালকের ন্যায় বিচরণ করাইতো স্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

গ্রিপডাম্বেল (Grip dumb-bell.) ।

আমার ধারণা, যাঁহারা গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়া অপরিমিত দৈহিক বলসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়া কেহ কোথাও অসাধারণ শক্তিশালী হইতে পারিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। যদি বলেন, গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়াই তো পাশ্চাত্য সমাজের মিঃ ইউজেন স্যাণ্ডো (Mr. Eugen Sandow) আজ জগত মধ্যে শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই ? গ্রিপডাম্বেলই কি মিঃ স্যাণ্ডোকে শক্তিশালী করিয়াছে ? সত্য বটে, তাঁহার Body Building পুস্তকের একস্থানে দেখিতে পাই, "It is not my own powers of weight lifting that I wish anyone to emulate, But that it is the practice of light and gradual exercise that I have obtained my great strength," অর্থাৎ ওয়েটলিফ্‌টিং (ভার তোলা) দ্বারা আমি শক্তিশালী হই নাই, লঘু ও ক্রমিক পরিশ্রমই আমাকে শক্তিশালী করিয়াছে। পাঠকগণ ইহাতেই আত্মহারা হইবেন না। তিনি প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার Physical Culture নামক পুস্তকের ১৩৭ পৃষ্ঠায় আবার কি বলিতেছেন দেখুন, "When I was a young man I was a mere stripling, and thought to strengthen my frame by a little exercise like a wooden wand or a light iron bar ; it loosened my muscles and made them pliant, but no great amount of development came from the exercise. This set me thinking. So I began to increase my weight and found that I could easily put up a 100lb. dumb-bell "

অর্থাৎ কাষ্ঠদণ্ড কিম্বা হাল্‌কি লৌহদণ্ডের একসার্সাইজ দ্বারা আমার শরীর দৃঢ় করিতে যাইয়া দেখি তাহাতে মাংসপেশী ঢিলা ও নরম হইয়া যাইতে লাগিল ; অপিচ সেরূপ পুষ্টিও অনুভব করিতে পারিলাম না। ইহাতে চিন্তিত হইলাম এবং আরও ভার বাড়াইয়া দিলাম ; তখন দেখিলাম যে আমি সহজেই ১০০

পাউণ্ড (প্রায় ১ মণ দশসের) ডাম্বেল লইয়া একসার্সাইজ করিতে পারি। আবার ঐ পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "The dumb-bell and the barbell have been my chief means of physical training," অর্থাৎ ডাম্বেল ও বারবেল আমার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে দেখুন, মিঃ স্যাণ্ডো তাঁহার দুই পুস্তকে দুই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বুঝিব না কি যে, শক্তিশালী হইবার প্রকৃত উপায় চাপিয়া রাখিয়া সাধারণ লোকে যাহাতে শক্তিলাভের আশায় অপ্রকৃত উপায় আশ্রয় করিয়া মিছামিছি কালক্ষেপ করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা? অথবা এবংবিধ উক্তিদ্বয়ের কারণ পাঠকগণই বিচার করুন। তিনি কখন ওয়েটলিফ্‌টিং-এর নিন্দা করিয়া লাইট একসার্সাইজকে তাঁহার শক্তি সঞ্চয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার কখন লাইট একসার্সাইজের নিন্দা করিয়া ভারী ডাম্বেল ও বারবেল একসার্সাইজকে তাঁহার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আপনারা এক্ষণে মিঃ স্যাণ্ডোর কোন্ উক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিবেন—প্রথম বা দ্বিতীয়? আমি অনেকদিন হইতে ঐ পথের পথিক; সে কারণ আমার মতে গ্রিপডাম্বেল অথবা লাইট একসার্সাইজ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চাকুরিজীবি কিম্বা অল্পবয়স্ক বালকগণের পক্ষে এবং ওয়েটলিফ্‌টিং একসার্সাইজ শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল কিয়ৎ পরিমাণে দৃঢ় করিবার পক্ষে যে উপকারী সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে অপরিমিত বলশালী হইবার আশায় বহুকাল ধরিয়া উক্ত একসার্সাইজের সেবা করিলে পরিণামে যে সে আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না তাহা সুনিশ্চিত। নিজে নিজে শারীরিক বলবৃদ্ধির যদি কোন উপায় থাকে তবে সে ওয়েটলিফ্‌টিং একসার্সাইজের অভ্যাস। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশেও মালকাঠ তোলা নামক এই শ্রেণীর একরূপ একসার্সাইজের প্রচলন ছিল। তখন স্নান করিবার ঘাটে ছোট বড় নানাবিধ ওজনের মালকাঠ পড়িয়া থাকিত এবং প্রায় প্রত্যেক স্নানার্থীই জলে নামিবার পূর্ব্বে দু'একবার করিয়া সেগুলিকে তুলিত অথবা তুলিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ইদানীং আর উহার প্রচলন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তে ওয়েটলিফ্‌টিংএর আবির্ভাব

হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বারান্তরে এই ওয়েটালফ্‌টিং সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিদ্যাকর আশ।

ন্যাশন্যাল লক্‌ ফ্যাক্টরী।

কলিকাতা শ্যামবাজার ২০৬।৪, অপারসারকুলার রোডস্থ "ন্যাশন্যাল লক্‌ফ্যাক্টরীর" প্রস্তুত অনেক প্রকার পিতলের চাবিতালা ও কল, এবং লোহার গ্যালবানাইজ তালা দেখিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম। চাবিগুলি দেখিতে বিলাতী অপেক্ষা মন্দ বোধহয় না, অথচ মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। হুইলিং, ডিটেক্‌টর, কিক্যাচার নামক তালাগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুপ্ত কৌশল চমৎকার জনক। (কুশদহের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ন্যাশন্যাল লক্‌ফ্যাক্টরী দ্রষ্টব্য)

এই কারখানার স্বত্বাধিকারী "আশ পাল এণ্ড কো"র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্‌ খগেন্দ্রনাথ আশ কুশদহ নিবাসী ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহারা কুশদহস্থ সকলের নিকট এই দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।

স্থানীয় সংবাদ।

আরোগ্য সংবাদ। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী সুবিখ্যাত প্রবীন বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংসা অতিশয় পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় এক্ষণে তিনি যে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। কেশব বাবু যে আমাদের দেশের বহুদর্শী, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমরা ভগবানের নিকট কামনা করি, তিনি আরো দীর্ঘকাল ইহলোকে বিদ্যমান থাকিয়া শেষজীবনের কর্ত্তব্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করুন।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ"১ম সংখ্যা কার্ত্তিক মাস হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র মাস পর্য্যন্ত গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। আমরা মফঃস্বলের কাগজ যথাসাধ্য সতর্কতা ও যত্নের সহিত ডাকে পাঠাইয়া থাকি, তবুও যদি কেহ কোন সংখ্যা না পাইয়া থাকেন, পত্রদ্বারা জানাইলে এখনও তাহা পুনরায় পাঠাইতে পারিব, কিন্তু ৩০শে বৈশাখের পর আর আমরা দায়ী রহিলাম না। তৎপরে অগ্রিম চাঁদা না পাইয়াও এপর্য্যন্ত যাঁহাদের কাগজ পাঠাইতেছি, তাঁহারা যেন চাঁদা পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন, ইতি মধ্যে যাঁহাদের মণিঅর্ডার না পাইব, তাঁহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্তু ভিঃপি ফেরত দিয়া যেন আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ)

২য় বর্ষ।] চৈত্র, ১৩১৬। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সঙ্গীত।

মুলতান—একতালা।

যখন ভেবে চিন্তে দেখি, (দেখি) আমার বল্‌তে আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই।

যত মহামূল্য ধন, প্রাণ প্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই।

তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় বল তোমারে ছাড়িয়ে, আপনার বলে, তুলে নিতে কোলে, তোমা বিনে আর কারেও না পাই।

(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান চির জন্মভূমি, (যত) আত্মীয় স্বজন, হারান রতন, একাধারে প্রভু তোমাতে পাই; তুমি সুখ শান্তি শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, তুমি চিন্তামণি ভবের ভাবনা, নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই।

বর্ষশেষে প্রার্থনা।

কি শুভক্ষণেই "লালাবাবু" শুনেছিলেন, "বেলা গেল বাসনায় আগুণ দাও," সকলেই তো দেখে, বেলাগেল, দিনগেল, এবং বর্ষগেল, কিন্তু ঐরূপ "বেলা গেল"র ভাব কয়জনের মনে উদিত হয়? কয়জনে ভাবে, দিনে দিনে জীবনের দিন ফুরাইল, কিন্তু এ জীবনে কি করিলাম, কেন এ জগতে এসেছিলাম কে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং কিজন্যই বা পাঠাইয়াছিলেন। আবার যাঁহারা জীবন-পথে জাগিয়াছেন, জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য যাঁহারা কিছু বুঝিয়াছেন, ঐরূপ শ্রেণীর জনৈক মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—

"স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক সত্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করেন তিনি কি আনন্দিত থাকেন।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

জ্ঞানীর নিকট বর্ষশেষ নাই, কেন না, জ্ঞানীব্যক্তি আনন্দময়; আনন্দ, অক্ষয় পদার্থ, সুতরাং আনন্দে অবস্থিত ব্যক্তি অনন্তজীবনে সঞ্জীবিত, তাঁহার নিকট কালের ব্যবধান চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানীর পদে পদে দুঃখ, অজ্ঞানতাই সকল দুঃখের কারণ। যে অজ্ঞানতায় পড়িয়া আছে, তাহার নিকট দিন, মাস, বর্ষশেষ হইতেছে আর একমাত্র অখণ্ড-কাল ঈঙ্গিতে বলিতেছে, "ঐ দেখ, এখনও তোমার বৃথা জীবন যাইতেছে—এখনও তুমি অনন্তজীবনে প্রবেশ করিতে পার নাই।" জীবন আর সময় একই বিষয়, সময় নষ্ট করা আর জীবন নষ্ট করা একই কথা। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও,

এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন ॥

ব্যাখ্যা ;—হে জীব সকল ! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও ; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম-ধনকে ভুলিয়া রহিবে। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ কর, উত্তম জ্ঞানবান আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার যষ্টি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান ; সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলকে উন্নত করিতে হয় ; এবং ঈশ্বর প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয় ; অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এ দুর্গম পথেও সুগম হইয়া উঠে ॥

ভগবান করুন, বর্ষশেষে এবং নববর্ষারম্ভে মানব-অন্তরে শুভ বুদ্ধির উদয় হউক।

দাস—

কেন নাহি মরিলাম ?

এ জীবনে কিছু যদি নাহি সাধিলাম,
অবহেলে শুধু প্রাণ হ'ল অবসান
নীরব নিস্তব্ধ ভীত কর্ত্তব্য-সংগ্রামে ;
কি হবে জীবন, কেন নাহি মরিলাম ?
এ ধরার বুকে যদি নাহি পারিলাম
ভেদিতে ভীষণ ঘোর অন্ধকার পথ ;
জ্ঞানালোকে যদি পথ নাহি দেখিলাম ;
কি হবে জীবন, কেন নাহি মরিলাম ?
উদ্দেশ বিহীন হ'য়ে যদি ভাসিলাম
অনন্ত মোহের পথে,—অতৃপ্ত বাসনা,—
"কে আমি" বিশ্বের মাঝে নাহি জানিলাম,
কি হবে জীবন, কেন নাহি মরিলাম ?

যে গৃহে সাধিতে কর্ম্ম ভবে আসিলাম,
শান্তির ত্রিদিব বুকে বিশ্বচরাচরে ;
তোমার আরতি সেথা নাহি করিলাম,
কি হবে জীবন, কেন নাহি মরিলাম ?

শ্রীপৃথ্বীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

২৩। ইন্দ্রিয়াণাম্প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি ॥

মনুসংহিতা ২।৯৩

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নিশ্চয় দোষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিলে সিদ্ধি লাভ হয়।

২৪। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

মনুঃ ২।৯৪

কাম্য বস্তুর উপভোগে কখন বাসনা নিবৃত্ত হয় না বরং আরও বৃদ্ধি পায়, ঘৃতসহকারে অগ্নি যেরূপ আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২৫। যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥

মনুঃ ২।১৬০

যাহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ এবং সর্ব্বদা সংযত, সে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বপ্রকার ফললাভ করে।

২৬। পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রুয়াৎ ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ ॥

মনুঃ ২।১২৯

পরস্ত্রীকে মাননীয়া সৌভাগ্যবতী ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবেক।

২৭। যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

মনুঃ ২।১২৭

পিতামাতা ইহলোকে সন্তানের জন্য যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন; পুত্র শতবর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

২৮। সন্তোষম্পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

মনুঃ ৪।১২

সুখার্থী সংযত ব্যক্তি পরম সন্তোষলাভ করেন; কারণ সন্তোষই সুখের মূল, অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

২৯। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

মনুঃ ৪।১৬০

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবেক।

৩০। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥

মনুঃ ৪।১৫৮

প্রতিদিন একাকী নির্জ্জনে আপনার হিতচিন্তা করিবেক। একাকী চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

৩১। অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাম্ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

মনুঃ ৫।১০৯

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

৩২। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাজিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

মনুঃ ১০।৬২

মনু বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্য বাক্য, অচৌর্য্য, দেহ ও চিত্ত শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এ সমুদয়ই সকল জাতির সাধারণ ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞেয়বাদ।

"এই সৃষ্টি দেখিয়া বোধ হয় ইহার একজন স্রষ্টা (creator) আছেন, কিন্তু তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারা, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের যত চিন্তা, তাহা মনের এক একটা কল্পনা মাত্র। প্রকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ কেহ ধারণাও করিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-চিন্তার অতীত।" এই প্রকার যাঁহাদের মত তাঁহাদিগকে "অজ্ঞেয়বাদী" বলে। আমাদের দেশে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকটা অজ্ঞেয়বাদের ভাব ইতিপূর্ব্বে প্রবল ছিল, এক্ষণে তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপেও বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই অজ্ঞেয়বাদের ভাব এক সময় যত প্রবল ছিল, বর্ত্তমানে যেন তাহা অনেক কমিয়াছে। অজ্ঞেয়বাদীগণ আরো বলেন যে, "ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যদি কিছু বুঝিতে পারিত তবে সকলেই তো এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের মধ্যে এত মতভেদ দেখা যাইতেছে তখন, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ সকলই মানব-মনের কল্পনা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত, বা প্রধান খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের দ্বারা এক একটা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে।" তারপর তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বারা ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক গত যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ের একদল লোকের মত এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, "ধর্ম্ম বলিয়া একটা কোন জিনিষ জনসমাজে রাখিবার প্রয়োজন নাই। পরস্পরে সদ্ভাবে মিলিয়া সুখ-শান্তির বিধান করাই যথেষ্ট ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন কতকগুলি অমীমাংসিত বিষয় লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপাততঃ অজ্ঞেয়বাদের যুক্তিগুলি যেন সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং আংশিক ভাবে যে কিছু সত্য উহাতে নাই তাহাও নহে, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদের যে কোথায় ভ্রান্তি তাহা তত্ত্বদর্শী প্রকৃত সাধকগণ সহজেই ধরিতে পারেন। অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের প্রথম কথা,—ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্যকরূপে মানব-বুদ্ধির অতীত, এ কথা অতীব সত্য হইলেও, এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহ কোন সত্যই বুঝিতে পারেন নাই তাহা সত্য নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বা গুণ অনন্ত। যেমন প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিত্বে এক কিন্তু গুণ অনেক। ফলতঃ মানব-অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ, অনন্ত ভাবেই হইতেছে। যে সময়ে, যে দেশে, যে জাতির প্রকৃতিতে যে ভাব বিকাশের উপযোগী হইয়াছে তখন সেখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও তেজঃভাব, কোথাও শান্তভাব, কোথাও পুরুষ, কোথাও প্রকৃতি, কোথাও নিরাকার—গুণবাচক ভাব, কোথাও সাকার—লীলার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং সকলই সেই একের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু মানব অন্তরে, তাঁহার প্রকাশ বহুভাবে হয়। মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতিগত বহু বিচিত্র অবস্থা, সুতরাং প্রকাশকের ভেদানুসারে এক প্রকার ভেদভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, অপরদিকে একেরও বহুত্বে প্রকাশ জনিত আর একটা ভেদ হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন মানব মাত্রেই অপূর্ণ,—অপূর্ণতা জনিত ত্রুটী বা ভ্রান্তি কিছু না কিছু উচ্চ শ্রেণীর মানবেও থাকিয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল ভ্রান্তিও ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এ বিরোধ ধর্ম্মে ধর্ম্মে নহে, সত্যে আর অসত্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। "ধর্ম্ম যো বাধতে ধর্ম্ম ন সঃ ধর্ম্ম কু ধর্ম্ম তৎ"। ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মের বাধা উপস্থিত করে না।

দ্বিতীয় কথা, সম্প্রদায়গত, বিচিত্রতার মধ্যেও অনেক একতা আছে, যেমন ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে; কেহ বহু ঈশ্বর বলেন না, সকলেই বলেন "ঈশ্বর এক"। তৎপরে বিশেষ বিশেষ "ভাব" সম্বন্ধেও যথেষ্ট একতা দেখা যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি ভাবের একতা সাধকগণের মধ্যে অবস্থানুসারে স্বভাবতঃ উপস্থিত হইয়াছে। দাস্যভাব যখন সাধকের মনে উপস্থিত হয়, তখন বহুপূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সাধকে একই ভাব দেখা যায়। অতএব ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবল যে বিভিন্নতাই দেখা যায়, আর যে কিছুই একতা নাই, তাহা নহে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখা যায়, একতা এবং বিচিত্রতার দ্বারায়, এক মহা অনির্ব্বচনীয় একতাই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর ইহাও সত্য যে, যতই বহির্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ততই ঈশ্বর-তত্ত্বের নব নব ভাব মানব-অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, আর কতকগুলি সত্য সেই আদিকালে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, এখনও তাহাই আছে; যেমন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ এই ভাব আদিতেও ছিল এখনও আছে। ঈশ্বরের যিনি যে ভাবেই আরাধনা এবং অনুষ্ঠান করুন না কেন ঈশ্বরের ঐ তিন স্বরূপে সকলেই বিশ্বাসী; ঐ তিন ভাবের অভাব কেহই স্বীকার করেন না।

প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্ব লাভের জন্য জ্ঞান এবং বিশ্বাস এ দুয়েরই প্রয়োজন। যদি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকে, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে কেহ প্রয়াসী হন, তবে তিনি অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি বিপদে পতিত হইতে পারেন। আবার যদি কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া কেবল বিশ্বাসের পথে চালিত হন, তিনিও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কুসংস্কারে পড়িতে পারেন। এজন্য ধর্ম্ম সাধন পথে বা ঈশ্বর-তত্ত্ব-লাভের পথে, জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়ই প্রয়োজন। অজ্ঞেয়বাদ আর কিছুই নহে, বিশ্বাস বিহীন জ্ঞানে ঈশ্বরকে ধরিতে গিয়া ঐ অবস্থায় উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে,—

কোন সময়ে জনৈক পণ্ডিত জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব মনে করিয়া শাস্ত্র পাঠ এবং জ্ঞানালোচনা করিয়াও ঈশ্বরের প্রকৃতভাব ধারণা করিতে পারিলেন না। বহু দিবস এই প্রকার করিয়াও যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না, তখন তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, এ জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে দিন সমুদ্র কূলে গিয়া, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছেন, তখন দেখিলেন, অনতিদূরে এক বালক কোন প্রকার খেলা করিতেছে। পণ্ডিত, বালকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন বালক একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া ক্রমাগত এক এক গণ্ডুষ জল সমুদ্র হইতে আনিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" বালক বলিল, "আমি এই গর্ত্তে সমস্ত সমুদ্রের জল আনিব।" পণ্ডিত বলিলেন, "তাও কি কখন সম্ভব?" তখন বালক বলিল, "তুমি অনন্ত

ঈশ্বরকে তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে চাও, তবে আমারও ইহা হইবে না কেন?" তখন পণ্ডিতের চৈতন্য হইল, তিনি বুঝিলেন আজ ভগবান্ কৃপা করিয়া ঐ বালকের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুলিতলোচনে, করযোড়ে বলিলেন, "হে দয়াময়! আজ আমি বিশ্বাসের আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার কঠোর জ্ঞান-সাধনার পথও সফল হইল। প্রভু! তুমিই সত্য তুমিই সত্য!"

যাঁহারা ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস বাদ দিয়া জনহিতকর কার্য্য করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের কার্য্য ভিত্তি শূন্য। মানবীয় শক্তিতে যে কার্য্য হয়, তাহার প্রসারতা, গভীরতা, এবং স্থায়ীত্ব কোথায়? ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস একটা "মহাশক্তি," কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষার দিনে শক্তি দেয় কে? আগে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্ম্ম, তাহার উপর সমগ্র মানব জীবন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম সকলের মূল ধর্ম্ম। তবে একথাও সত্য যে, সম্প্রদায়ীক ধর্ম্মভাব ভবিষ্যতে থাকিবে না, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় যে এক একটী মূল সত্য লইয়া অবতীর্ণ, তাহা কি চলিয়া যাইবে? তাহাও নহে, কিন্তু সকল সত্যের মিলনে এক-মহাধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্ম হইবে। সময় তাহার যথা যোগ্য নাম করণ করিবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব, এবং প্রত্যেক মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ তাহাতে থাকিবে, বর্ত্তমানে যাহার সূচনা চারিদিকে দেখা যাইতেছে। ঈশ্বরের মহিমাই মহিমান্বিত হউক!!

আলেকজাণ্ডার ও যোগী।

কোন সময়ে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, ভারতজয় করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া শুনিলেন, এখানে এক যোগী পুরুষ আছেন। যোগী কেমন দেখিবার জন্য তাঁহার মনে কৌতুহল জন্মিল। যোগীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি অনুচর পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি যোগীর নিকটে গিয়া বলিল "ভারতজয়ী" আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট আপনাকে ডাকিতেছেন। তচ্ছ্রবণে যোগী বলিলেন "ভারতজয়ী কোন ব্যক্তিকে জানি না, এবং তেমন ব্যক্তির নিকট আমার কোন প্রয়োজনও দেখি না।" অনুচর রাজসন্নিধানে আসিয়া অবিকল

যোগীর উক্তি ব্যক্ত করিলে, বহুজন পরিবেষ্টিত স্বয়ং আলেকজাণ্ডার যোগীর নিকট গমন করিলেন। যখন যোগীর নিকট রাজা আপনাকে "ভারতজয়ী" বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন যোগী বলিলেন, "তুমি এখন মনে করিতেছ আমি ভারতজয় করিয়াছি, কিন্তু তোমার পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতজয় করিয়া ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ আর তাহা মনে করিতে পারিতেছেন না, কিছুদিন পরে তোমার অন্তে যিনি জয় করিবেন, তখন তোমার জয়ও থাকিবে না তবে আর তুমি প্রকৃতপক্ষে ভারতজয় করিলে কি রূপে? আর তুমি তো ভারতজয় করিয়াছ, কিন্তু আপনাকে আপনি জয় করিয়াছ কি?" যোগীর এবম্প্রকার প্রশ্নের, রাজা কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া, শ্রদ্ধা-ভক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যোগীর প্রশান্ত বদন অবলোকন পূর্ব্বক নিজের অজ্ঞানতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, "আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি তো মানুষ মারিবার জন্য অনেক প্রকার বস্তু সঙ্গে আনিয়াছ কিন্তু পরোপকার করিবার জন্য কি আনিয়াছ?"

রাজা যোগীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন "আমি আপনাকে কিছু প্রদান করিতে চাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনার কি চাই।" যোগী বলিলেন, "তোমার নিকট এমন কি বস্তু আছে যাহা আমাকে দিবে? দ্বিতীয়তঃ আমার তো কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই।" রাজা বলিলেন "আপনি বলেন কি? আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে এ প্রদেশ দান করিতে পারি।" যোগী বলিলেন, "আমার তো এ প্রদেশ পূর্ব্ব হইতেই আছে, তুমি আর অধিক কি দান করিবে।" রাজা এ কথার গভীর অর্থ কতদূর বুঝিলেন জানি না, কিন্তু তিনি যোগীকে কিছু দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, "আমি এই স্থানে বসিয়া অবাধে, প্রকৃতির নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেছিলাম, তোমরা আসিয়া আমার ঐ বায়ু অনেক পরিমাণে রোধ করিয়াছ, তুমি আমাকে এই দান কর যে, বায়ুর আড়াল ছাড়িয়া দাও।"

কুশদহ। (৪)

ইছাপুরের শেষ অংশ।

এক সময়ে ইছাপুর বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল; ১০।১২টী টোলে বিদেশস্থ ছাত্রগণের দ্বারা এই স্থান মুখরিত হইত। এক্ষণে সেই সমস্ত টোলের ক্বচিৎ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেই সময়ের সরলচিত্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর সরল ভাব সম্বন্ধে নিম্নের গল্পটী দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

একদা স্থানীয় গোবরডাঙ্গার জমীদার স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বিশাল অট্টালিকার প্রাঙ্গনে কলিকাতার বিখ্যাত নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি হইতে থাকে। সমাগত দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ইছাপুরের কয়েকজন সরল চিত্ত অধ্যাপক ছিলেন। নর্ত্তকীর নৃত্য স্থানের নিকট না বসিলে তাঁহাদিগের দর্শন ও শ্রবণের অঙ্গহানি হইত, এ কারণ তাঁহারা সকলের অগ্রে সভার মধ্যে বসিয়াছিলেন। নর্ত্তকী, নৃত্য করিবার সময়ে হঠাৎ তাহার পা কোন অধ্যাপকের গাত্রে লাগিল; নর্ত্তকী তাঁহার পদধূলি না লওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন ও সমাগত অধ্যাপক-দিগকে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে বলিলেন—"বোধ করি এই নর্ত্তকী বেশ্যা হইবে," তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! এমন সুন্দরী ও কৃষ্ণ প্রেমিকা কখন বেশ্যা হইতে পারে;" অনেক তর্ক বিতর্কের পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তাঁহারা সারদাপ্রসন্ন বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এ বেটী বেশ্যা না হইলে তর্কপঞ্চানন ভায়ার গাত্রে পদপ্রদান করায় তাঁহার পদধূলি পর্য্যন্ত লইল না কেন?"

সারদাপ্রসন্ন বাবু অতি রসিক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি বলিলেন "কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিল বলিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিল, এক্ষণে আপনারা আসরে যান, এইবার আপনার পদধূলি লইবে।" এই কথা বলিয়া সারদাপ্রসন্ন বাবু গোপনে সেই নর্ত্তকীকে সমস্ত বলিয়া পদধূলি লইতে বলিয়া দিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি লইলে তিনি তাহাকে "সতী সাবিত্রী সমানা হও", ইত্যাদি, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা কি কম সরল চিত্তের পরিচয়!

"চির দিন কখন সমান যায় না" এই কথার সার্থকতা আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। দেবগর্ব্ব দিব্য পারিজাত কালে গন্ধবিহীন মাদার পুষ্পে পরিণত হইয়াছে; দেবভীতিপ্রদ স্বর্ণলঙ্কা কালে সামান্য মনুষ্য বাস-স্থান হইয়াছে; ধন ধান্য লোকজন পূর্ণ ইছাপুর যে কালের কঠোর আঘাতে হিংস্রশ্বাপদ সঙ্কুল স্থান হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

যে মহামারী গদখালি, উলা বা বীরনগর, শ্রীনগর, রাণাঘাট, দিগ্‌নগর প্রভৃতি স্থান শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, সেই মহামারী ইছাপুর বা কুশদহকে এককালে নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে ইহার অধিবাসিগণের সুখশান্তি হরণ করিয়া ইহাকে মহাশ্মশানের চিরাদর্শ করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষম ব্যাধি কুশদহের মধ্যে প্রথমে ইছাপুরে প্রবেশ করে। ইহার প্রকোপে ইছাপুরের তিন চতুর্থাংশ লোকে এককালে কালকবলে পতিত হয়। ইছাপুরের জমীদার বংশের অনেক মহাত্মা এই বিষম ব্যাধির প্রকোপে লোকান্তরিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে কুইনাইনের প্রচলন এই কুশদহে হইয়াছিল।

গোবরডাঙ্গা। পূর্ব্বে বলিয়াছি কুশদহ সমাজের সমাজপতি এই গোবরডাঙ্গায় বাস করেন। পূর্ব্বে ইছাপুরের চৌধুরী বংশের যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী কুশদহ সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তৎপুত্র শশিভূষণ চৌধুরী নিজ ভাগ্য দোষে সমাজপতির আসন হইতে অপসৃত হইলে গোবরডাঙ্গার জমীদার মহাশয় এক্ষণে সেই সম্মানে সম্মানিত। গোবরডাঙ্গাকে এক্ষণে কুশদহ সমাজের রাজধানী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোবরডাঙ্গায় স্কুল, দেবালয়, হাট, বাজার, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপালিটী, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। রেলওয়ে ষ্টেশনটী প্রকৃত পক্ষে খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত। চিনির কারখানার জন্য গোবরডাঙ্গা বিখ্যাত। বিলাতী চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় এক্ষণে চিনির কারখানা বিলুপ্ত প্রায়।

যমুনানদী ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে এই স্থানের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার। ব্রাহ্মণ, তাম্বুলি ও কৈবর্ত্ত এখানকার প্রধান অধিবাসী। সাধারণ লোকের অবস্থা তত সুবিধা জনক নহে। এখানকার ৺আনন্দময়ী জাগ্রত দেবী। গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় জমীদার

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত দ্বাদশ শিব মন্দির সম্বলিত ৺আনন্দময়ীর বাটী, গোবরডাঙ্গা ও মছলন্দপুর ষ্টেশনের মধ্যে যে যমুনায় পুল আছে তাহার উপরে ট্রেণ আসিলে পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই আনন্দময়ীর মন্দির ও জমীদারদিগের শোভনীয় প্রাসাদ দৃষ্টি গোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে লবণ।*

সিমলা শৈলে কন্‌ফারেন্স ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিকার জন্য যে সকল যুক্তি ও মতের আলোচনা করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে সে সকল আলোচনা বহুদিবস হইতে চলিতেছে, কন্‌ফারেন্স রোগীদিগকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিতে মত দেন। দৃষ্টান্ত দেখান এই যে এক সময়ে ইটালী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছিল, কিন্তু বেশীভাগে কুইনাইন ব্যবহারে আশ্চর্য্য ভাবে উপকার পাওয়া গিয়াছিল। কনফারেন্সের মতে, মশকেরাও এক বিষম শত্রু। লবণ যে ম্যালেরিয়ার একটি বিশেষ প্রতিষেধক পদার্থ তাহাই এবারকার কন্‌ফারেন্সের নূতন আলোচ্য বিষয়। আমি আশা করি ম্যালেরিয়াগ্রস্থ জনগণ এ বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না।

ম্যালেরিয়া রোগপ্রবণ দেশে কোষ্ঠবদ্ধতা একটি প্রধান কারণ, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া শীতল জল সহ কিছু লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার, ও ভাবী কোন সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। "চা" পায়ীরা প্রাতেঃ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে লবণ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইবেন।

রেঙ্গুনের মিঃ এফ্‌ এন্‌ বার্ণস্‌ "চেম্বার্স অব্‌ জার্ন্যাল" নামক পত্রে লিখিয়াছেন

---

* এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কুশদহ ম্যালেরিয়া প্রাবল্য দেশ এজন্য উক্ত ঔষধ সম্বন্ধে বার বার সাধারণের মনে উদিত হওয়া অনুপযুক্ত নহে। আমরাও সকলকেই ঐ ঔষধ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। (কুঃ সঃ)

ভারতের ও ব্রহ্মদেশের নানা জেলাতে ম্যালেরিয়া জ্বর হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। তিনি আরও বলেন যে আমি ৪০ বৎসরাবধি উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু বিগত ৩০. বৎসরের মধ্যে কোন পীড়ায় কোন ঔষধ (লবণ জল ব্যতীত) সেবন করিতে হয় নাই।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল ডাঃ গমেল উষ্ণপ্রধান দেশে সংক্রামক পীড়ার প্রতিকার কল্পে একখানি পুস্তকে লবণের উপকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

মানব শরীরের শোণিতে প্রতি এক হাজার ভাগের মধ্যে ২½ হইতে ৬ ভাগ পর্য্যন্ত সোডার ভাগ আছে। সোডার ভাগ এত কম হইলেও উহার কার্য্যকারিতা কম নহে। যাহার শরীরস্থ শোণিতে যত পরিমাণ সোডা থাকা আবশ্যক, যদি তদপেক্ষা কিছু অল্প থাকে তাহা হইলে সেই শোণিতে নানা প্রকার বিষাক্ত বীজের বাসস্থান হয়, যে পর্য্যন্ত সোডার অংশপূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত সেই সকল বিষাক্ত বীজ আপনাপন ক্ষমতানুযায়িক কার্য্য করিতে বিমুখ হয় না। যদি শোণিতে সোডার অংশ পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ম্যালেরিয়া বিষ দেহে প্রবেশ করিলেও অচিরাৎ তাহার ক্ষমতার হ্রাসতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। লবণ সোডারই প্রকারন্তর মাত্র সুতরাং লবণ সেবন করিলে দেহস্থ শোণিতে সোডার অংশ কম হইতে পারে না।

কলিকাতা প্রবাসী একজন ভদ্র ইংরাজ প্রায় ৬০ বৎসর কাল আমেরিকা ও ভারতের ম্যালেরিয়া পূর্ণ নানা স্থানে ঐ একমাত্র লবণজল প্রত্যহই নিয়মিত রূপে সেবন করিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অক্ষত ভাবে বাস করিয়াছিলেন। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইটালীর ম্যালেরিয়া জ্বরে লবণের এই গুণ আবিষ্কার করেন, তাঁহার নিকট উক্ত কলিকাতাপ্রবাসী ইংরাজ মহোদয় এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করেন। প্রয়োজন বুঝিলে রোগী ঐ জলের সহিত কুইনাইন খাইতে পারেন।

প্রস্তুত প্রণালী,—একটি পাঁইট বোতলে বড় চামচের এক চামচ লবণ দিয়া পরে নির্ম্মল শীতল জলে উহা পূর্ণ কর, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ বোতলস্থ জল এক ছটাক লইয়া তিন ছটাক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান কর। উহার স্বাদ মন্দ হইবে না, ম্যালেরিয়া জ্বরের এরূপ অমোঘ ঔষধ আর আছে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যাহাদিগের প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে

তাহাদিগের পক্ষে অমৃত স্বরূপ বলিলেও চলে। প্রতিবোতলে ব্যয় ৫ পয়সার অধিক হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

হোমিও এবং ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

হিমালয় ভ্রমণ। (৬)

হরিদ্বার।

৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার। আজ জগদ্ধাত্রী পূজা। সেবাশ্রমে আমার নিমন্ত্রণ হইল, এই নিমন্ত্রণের কারণ, কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র মহারাজ ও উপেন্দ্র বাবু সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া আজ সেবাশ্রমের ভক্ত-সেবা করিলেন। আমি যদিও কয়েক দিন ঘণ্টাকুটীরে গিয়াছি, তথাপি কল্যাণ স্বামী যেন আমাকেও সেবাশ্রমের একজন মনে করিয়া ঐ নিমন্ত্রণ করিলেন। বাহিরের আর কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই। বেলা ৩টার সময় আহার হইল। সমস্তই নিরামিষ ভোজ্য, সেবাশ্রমে দৈনিকও নিরামিষ ভোজন হয়।

দৈনিক উপাসনাদি আমার বেশ হইতেছে। প্রাণের ভাব মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণকে পত্রের দ্বারায় জ্ঞাপন করিতেছি। ১০ই কার্ত্তিক প্রত্যুষকালের ধ্যানে এই জ্ঞান উপলব্ধি হইল, জড় অজড় অর্থাৎ সাকার এই দৃশ্যমান জগৎ, মানব শরীর, আমি এবং আমার তাবৃৎ বস্তু কিম্বা নিরাকার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি, সকলই ব্রহ্ম-পদার্থ,—ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নহে। আমার মায়ার বস্তু কিছুই হইতে পারে না, সকলই ভগবানের—"আমি" "আমার" এই জ্ঞান মিথ্যা—ভ্রান্তিমাত্র।

১১ই কার্ত্তিক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্তের এক পত্র পাইলাম। আজ মধ্যাহ্নে আর একটী আশ্রমে ঘণ্টাকুটীরের সমস্ত সাধুদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সুতরাং আমারও হইয়াছিল, কিন্তু তথায় যাইবার আমার তত ইচ্ছা ছিল না। তাহাতে একটী সাধু বলেন, "পঙ্গতমে চলিয়ে"। পংক্তি ভোজনের নাম "পঙ্গত", অগত্যা পঙ্গত দেখিবার জন্যও গেলাম। অনেক বেলা হইল। সমস্ত সাধু

পরমহংসগণ একত্রে এক পংক্তিতে বসিলেন, বোধ হয় ২।৪ জন কিছু পৃথকও বসিলেন। প্রথমে শালপাতা দিয়া অনেক বিলম্বে এক একটী দ্রব্য পরিবেশন করিতে লাগিল। সকল দ্রব্যের কথা আমার স্মরণ নাই, বড় বড় মিঠায়ের কথাটা মনে আছে। পুরী অর্থাৎ লুচি মোটা মোটা আর নিতান্ত টক্ দৈ। অতিশয় বিলম্বের জন্য আমার ধৈর্য্যচুতি হইতে লাগিল, এমন কি একবার আমি কিছু আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার পার্শ্ববর্ত্তী সাধু বলিলেন "ঠাহ র, আবি হরিহর হোয়া নেহি"। শেষে দেখিলাম, একজন শঙ্খধ্বনি করিল, আর একজন কি দুই জনে মন্ত্র পাঠ করিয়া তার পর সকলে "হরিহর" এই শব্দ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। আমি দ্রব্য সকলের প্রকৃতি বুঝিয়া অল্পেই কার্য্য শেষ করিলাম।

১২ই খুল্না হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র পাইলাম। এই দিনে আর একটী ঘটনা ঘটিল। প্রাতে শুনিলাম, ঘণ্টা কুটীরের মহান্ত মহারাজ গতরাত্রে আশ্রমে আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মনে করিলাম অবশ্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করা আমার উচিত। তখন তিনি ভিতরে আছেন শুনিয়া আমি বেড়াইতে চলিয়া গেলাম। বেলা ৯টার পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি সম্মুখের বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তির সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া নমস্কার করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সাধুগণে পরস্পর "নমঃ নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করেন তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহা বলি নাই। মহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্ ব্রহ্মচারী হ্যায় ?" তাহাতে আমি বলিলাম "নেহি, ম্যায় বাঙ্গালী ব্রহ্মজ্ঞানী হ্যায়।" তাহার পর আমাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বলিতেছি। মহান্তজী প্রথমেই বোধ হয়, "ব্রহ্মজ্ঞানী" শব্দ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়; অর্থাৎ আপনি ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন! তিনি আরো বলেন, কোন পথ ব্যতীত কি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে? তাই তিনি, তাঁহার ভাষায় বলিয়াছিলেন, "কিস্তরে ব্রহ্মজ্ঞান হোনে সক্তা? কৈ পথ বেগর জ্ঞান হোনে সক্তা?" আমি তাঁহার কথার উত্তর এইরূপ দিয়াছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞান, সাধন এবং ভগবৎ কৃপাতে লাভ হয়। সকল ধর্ম্ম পথেই এক একটী সাধন-প্রণালী আছে। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন, বাঙ্গালায়

এবং সর্ব্বত্র "ব্রাহ্মসমাজ" নামে যে ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমি তাহার কথাই বলিতেছি। ফলতঃ আমি আপনাদিগের ন্যায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের নহি, আমি এক নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসক, এই অর্থে আমি আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়াছি। ইহার পর তিনি আমাকে আর কিছু না বলায় আমি কুটীরে চলিয়া গেলাম।

তাহার পর গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম। যখন ভোজনের জন্য ঘণ্টা বাজিল, তখন আহার করিতে যাইতে মনে কেমন ইতস্ততঃ ভাব আসিল। আমার ঘরের নিকটে একটী সাধু থাকিতেন, তিনি আমাকে ডাকিলেন, "মহারাজ! ভোজন করনে কো আইয়ে।" আমি জলের লোটা লইয়া যে ঘরে আহারাদি হয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, সম্মুখেই মহান্তজী ছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন, "তুম্হারা হিঁয়া আস্থান নেহি হোয়েগা।" আমি বলিলাম, মহারাজ! হাম্ আপনা মন্‌সে হিঁয়া নেহি আয়াথা, রামানন্দজী ম্যায়কো প্রেমসে বোলায়াথা, ইস্‌বাস্তে ম্যায়নে আয়া, লেকেন, হাম্ আবি চলে? অর্থাৎ আমি এখনই চলিয়া যাইব কি? তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ! হিঁয়া বে-পড়্‌চা কা আদমী নেহি রাখ্‌তেহেঁ।" অর্থাৎ এখানে পরিচয়ে অমিলের কোন সাধুর স্থান হয় না। আমি তখনই আমার সামান্য বস্ত্রাদি কম্বলে জড়াইয়া আশ্রমের বাহিরে আসিলাম। মহান্তজীর নাম জ্ঞানগিরি।

বাহিরে অনতিদূরে এক কুঁটীরে আর একটী বাঙ্গালী সাধু থাকিতেন। তথায় দেখি, আমার সেই প্রথম পরিচিত আর দুইজন সাধুও বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, "ব্যাপার কি! এত বেলায় আসন বগলে লইয়া কোথায় চলিয়াছেন?" আমি বলিলাম, ঘণ্টাকুটীরে আমার থাকা হইল না, জ্ঞানগিরির সহিত আমার অমিল হইল। ইহার পর তাঁহারা বলিলেন, "এত বেলায় ভোজন না করিয়াই চলিয়া যাইতে বলিল," আমি বলিলাম হাঁ! তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বসুন! এখানেই ভোজন করুন।" আমি বলিলাম, "এখন ভোজন কিরূপে হইবে?" তিনি বলিলেন, "আজ আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অদ্যকার মাধুকরী সমস্ত মৌজুত আছে। আপনি ভোজন করিয়া এখানে বিশ্রাম্ করুন, আমরা নিমন্ত্রণ সারিয়া আসি।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আমাকে যে ভোজ্য দিয়া গেলেন, তাহা আমার বেশী

হইল, নিকটে এক কুক্কুরী শাবকমণ্ডলী পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, সুতরাং কুটীর অংশ তাহারা প্রাপ্ত হইল।

যথা সময়ে সাধুরা আসিলেন; কিছুক্ষণ পরে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ২জন সাধুর সঙ্গে আর এক ক্ষুদ্র আশ্রমে গেলাম। তথায় বসিয়া অন্যান্য কথার পর আমার থাকার কথা লইয়া তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, শেষ স্থির হইল "সেবাশ্রমে থাকার যদি অসুবিধা না হয়, তবে রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা তথায় থাকুক, কেননা গোফায় বা কুটীরে থাকা অভ্যাস নাই, সহসা ঠাণ্ডা লাগিতেও পারে, কিন্তু আহারের জন্য কোন চিন্তা নাই, মাধুকরী করেন ভাল, নতুবা আমাদের মাধুকরী হইতে আপনারও চলিয়া যাইবে।" আমি বলিলাম, মাধুকরী করিতে আমার কোন কষ্ট নাই। ফলতঃ এই দিন হইতে তাঁহাদের সহিত আরো যেন ঘনিষ্টতা হইল, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় সেবাশ্রমে গেলাম, কল্যাণানন্দ স্বামী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, আপনি এই স্থানেই থাকুন। বোধহয় রাত্রে গান শোনা হইবে বলিয়া ডাক্তারবাবু ও তিনকড়ি মহারাজও খুব খুসী হইলেন।

১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার। দাড়ী গোঁফ কামাইয়া মস্তক মুণ্ডণ করিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল,—করিয়া ভালই লাগিল।

১৪ই কার্ত্তিক। সেবাশ্রমের ইঁদারার জলে স্নান করি। অপরাহ্ণে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম, শরীর ভাল বোধ হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া উপাসনা করিলাম। ধ্যানে এই উপলব্ধি হইল;—জীবনে সত্য লাভ হইলে তাহা কখন গোপন থাকে না, যে প্রকারেই হউক তাহা প্রকাশ পাইবেই, অর্থাৎ যিনি জীবনে প্রকৃত কোন সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহা জগতকে দিয়া যাইতেই হইবে, তজ্জন্য তাঁহার চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। এই জন্যই বোধহয় ভারতের সাধকগণ, সাধনেই অধিক তৎপর, কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত নন্।

১৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১লা নবেম্বর। প্রাতে শরীর ভাল বোধ হইল। আজ পূর্ণিমা। গোবরডাঙ্গা হইতে জনার্দ্দনের এক পত্র পাইয়া জানিলাম, আমাদের "মেয়েটীকে পাড়ায় রাখিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ আমাদের ১২ বৎসর

বয়স্কা কন্যাটী বিধবা হওয়ার পর, শশুরবাড়ী অবস্থাপন্ন,নিকট আত্মীয় অভিভাবক কেহ না থাকায়, আমি তাহাকে আমাদের নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় অপর দূর-সম্পর্কীয়গণ কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তজ্জন্য আমরা পৃথিবীর বল প্রয়োগ না করিয়া বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া নিরস্ত ছিলাম। আজ সহসা এই সংবাদ আসিল যে, তাহাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে, এখন নিজেরাই তাহাকে আমাদের বাড়ী রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতিপ্রযুক্ত, আমার প্রতিবাসী সহোদর প্রতিম শ্রীমান্ শিবনাথ কর্ম্মকার আপনার কন্যার ন্যায় নিজ বাড়ীতে যত্নপূর্ব্বক মেয়েটীকে রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বিধাতার অদ্ভুত মহিমা আমার অন্তরে একবার বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল, কৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন করিলাম, প্রভু? তুমি তোমার স্মরণাগতের বোঝা সত্যই মাথায় করিয়া বহন কর!

এই সংবাদ পাইয়াই শিবনাথকে ও জনার্দ্দনকে পত্র লিখিলাম, কিন্তু সহসা ব্যস্ত হইবে বলিয়া খুলনায় স্ত্রীকে আজ পত্র লিখিলাম না। কলিকাতা হইতে বিনয়ের এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম, তাহাতে আমার এইরূপ ভাবে দেশভ্রমণে আসা যেন সঙ্গত হয় নাই, এবং নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে, নরম গরম অনেক কথা লিখিয়াছিল।

পূর্ব্ব পরিচিত সাধুদ্বয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে ক্রমে জানিলাম, একের নাম পূর্ণানন্দ স্বামী, বয়স অনুমান ৫৫ বৎসরের কম নহে। পূর্ব্ব নিবাস শান্তিপুরে ছিল, ২৯ বৎসর হইল সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। বহু ভ্রমণ করিয়াছেন, কোন কোন সাধু মহাত্মার দর্শনও সঙ্গ করিয়াছেন; একবার কোন পাহাড় হইতে পড়িয়া পদে এমন আঘাৎ লাগিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন আছে, কিন্তু এখনও চলিতে ফিরিতে, খুব মজবুত আছেন। তাঁহার সরল ও নির্ম্মল স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাইতে লাগিলাম। অপর শিবানন্দ স্বামী, বয়স ৪৫ বৎসরের কম নহে। পূর্ব্ব নিবাস ময়মানসিং জেলা। ইহাঁর দেহখানি বেশ বলিষ্ঠ রকমের দীর্ঘাকার সুন্দর পুরুষ, স্বভাবও অতি মিষ্ট ও সরল। তাঁহাদের অবস্থা যেমন আমি জানিলাম, তাঁহারাও আমার অবস্থা মোটামুটী জানিয়াছিলেন, এবং প্রথম দর্শনাবধি আমাদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা সর্ব্বদা চলিত। যে দিন যে তত্ত্ব, স্বভাবতঃ উঠিত তাহারই আলোচনা হইত; তাহার মধ্যে জীব ও

ব্রহ্মের একত্ব, যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে, তৎসম্বন্ধে ও গৃহী-সাধক এবং সন্ন্যাসীর অবস্থাগত কথাই বেশী বেশী হইত, ফলতঃ আমারও যেমন তাঁহাদের যেটী বিশেষ তত্ব, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা হইত, তাঁহারাও আমার কথিত তত্ব অগ্রাহ্য না করিয়া বরং তাহাতে বিশেষত্ব কি আছে বোধহয় তাহা বুঝিবার জন্য মনোযোগ করিতেন, আমার কথা অনেক সময় জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অথচ ভেদ, যাহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে, সেইদিকে যাইত। যাহা হউক, এইজন্যই যেন আমাদের ঘনিষ্ঠতার বাঁধন একটু একটু করিয়া বাঁধিয়া গেল। তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বেড়ানও হইত এবং কথাবার্ত্তাও চলিত। ইতিমধ্যে ২।৩ দিন কন্খল হইতে হরিদ্বার বেড়াইয়া আসিলাম। হরিদ্বারে যাত্রীর ভিড় অত্যন্ত,—কতকটা কালীঘাটের মত। হিন্দুস্থানীরা আত্মীয়গণের অস্থি-ভস্ম আনিয়া রাশী রাশী গঙ্গায় ঢালিয়া দেয়।

ইতিমধ্যে পূর্ণানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই ঋষিকেশ যাইব, এ সময় প্রায় সমস্ত সাধুরাই ঋষিকেশে গিয়া থাকেন কারণ কন্খল অপেক্ষা ঋষিকেশ পাহাড়ের নিম্নে এজন্য তথায় বায়ুর বেগ কম লাগে এখানকার মত অত্যধিক শীত বোধ হয় না।" তাহাতে আমি বলি, "আমিও আপনাদের সঙ্গে ঋষিকেশ যাইব। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমাদের এই পরামর্শ স্থির হইয়া আছে।"

আজ অপরাহ্নে পূর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী সেবাশ্রমে আসিয়া (অন্যান্য দিনেও আসিতেন) পূর্ণানন্দ স্বামী, আমার আসবাব সম্বল কিরূপ আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে কৌশলে একখানি কাপড় ও এক খানি উড়ানী আর ১খানি চিরুণী যাহা আমার নিকট চাহিয়াছিলেন, চাহিবা মাত্র আমি ঐ সমস্ত তাঁহাকে দিলাম। কাপড় ও চাদরখানি তৎক্ষণাৎ গৈরিক রং করিতে শিবানন্দ স্বামীকে দিয়া বলিলেন "যাহা হউক মাথায় বাঁধা চলিবে।" তারপর আর কি আছে, তাহাও চাহিলেন কিন্তু দেখিলেন সন্ন্যাসীর মতই আমার সম্বল। আমার মনে হইল, এটা কেবল আমাকে পরীক্ষা করা মাত্র তাঁহার কাপড় চাদর কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। চিরুণীখানা তাঁহার মুণ্ডিত-মস্তকে (নেড়া মাথায়) একবার দিয়া ডাক্তার বাবুকে তাহা দিলেন। এই কার্য্যকালে পূর্ণানন্দ স্বামীর মধ্যে এমন একটা সারল্য—বালকত্বভাব প্রকাশ

পাইয়াছিল, যাহা অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে। যাহা হউক এইরূপ করিয়া সে দিন তাঁহারা নিজ আসনে চলিয়া গেলেন।

১৬ই কার্ত্তিক। বিনয়ের প্রেরিত ৩৲ টাকা মণি-অর্ডারে পাইলাম। ভ্রাতা উপেন্দ্ররও ভক্তিভাবপূর্ণ এক পত্র পাইলাম। বিনয়ের পূর্ব্ব পত্রের উত্তর যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব ও উপেন্দ্রর পত্রের উত্তর দিলাম। বেলা ২টার সময় সহসা পূর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আমরা ঋষিকেশ চলিয়াছি, আপনি যদি যাবেন শীঘ্র চলুন।" আমি তৎক্ষণাৎ কম্বলে সামান্য বস্ত্রাদি জড়াইয়া প্রস্তুত হইলাম।

যাত্রার পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ স্বামীকে বলিলাম, আজ আমার ৩৲ টাকা মণি-অর্ডারে আসিয়াছে, তাহা কি সঙ্গে লইব? ঋষিকেশে প্রয়োজন হইবে কি। তিনি বলিলেন, "গঙ্গার তীরে পাহাড়ের নিম্নে কুটীর করিয়া থাকিতে হইবে, সময় সময় খালি কুটীরও পাওয়া যায়, কিন্তু যদি না পাওয়া যায় তবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ১৲ টাকার বেশী খরচ হইবে না, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি ১৲ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া আর ২৲ টাকা কল্যাণানন্দ স্বামীর নিকট রাখিয়া যাত্রা করিলাম। যখন যাত্রা করিলাম, তখন যে কি অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব আসিল তাহা এখন আর বর্ণনা করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

ভগ্ন-তরী।

আঁধার জলধী মাঝে ভাসিয়া চলেছে কোথা
জীবন-তরণী
কোন্ দূরে কোন্ পারে ভিড়িবে এ জীবন তরী
কিছু নাহি জানি!
সম্মুখে দীগন্ত ব্যাপি তরঙ্গ-গর্জ্জন-রোল
ঝটিকা-প্রলয়
বিজলী ঝলকে দূরে আশার আলোক যথা
ভগন হৃদয়!

দূরে দূরে—অতি দূরে কোথায় যাইব বহি
দিঠি লক্ষ্যহীন,
অবসন্ন শ্রান্ত কায়া না জানি কোথায় গিয়া
হইবে বিলীন!
জীবনের চির লক্ষ্য কোন্ অনন্তের কোলে
কোন্ সন্ধ্যা বেলা
—অস্তমিত রবি-রেখা যাবে কি না যাবে দেখা
ভাঙিবে এ খেলা,
নীরবে মিলায়ে যাবে ধরণীর শ্যাম লেখা
সসীমের কোলে
সীমা হারানর দেশে পৌঁছিব কি নিশা শেষে
চির লক্ষ্য-স্থলে!
তরঙ্গ ঝটিকা ঘন পলকে নীরব হবে
ঘুচিবে আঁধার
নব জীবনের রবি আঁকিবে নূতন ছবি
পূরবে আমার।

শ্রীসুকুমারী দেবী, গোবরডাঙ্গা।

কৃষ্ণসখা আশ ও অভয়চরণ সেন।

(সংগ্রহ)

উপরে যে দুই মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইল তাঁহাদের জীবন চরিত ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের সম্পূর্ণ জীবনী যদিও পাওয়া যায় নাই, তথাপি মনে হয় সমগ্র জীবনীতে প্রকাশ যোগ্য বিষয়ও হয় ত না থাকিতে পারে; তবে উহাঁদিগকে মহাত্মা বলিলাম কেন? যে লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব তাঁহাদের জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মহত্ত্বের পরিচয় আছে। যাঁহার জীবনে কোন উচ্চতা দেখা যায়, তিনি মহৎ ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহাকে মহাত্মা বলা অসঙ্গত নহে। অগ্রে কৃষ্ণসখা আশের বিষয় বলিব।

খাঁটুরা স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশের বংশেই অনুমান ৯০ নব্বুই বৎসর পূর্ব্বে

কৃষ্ণসখা আশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অন্যূন বিগত ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। আমাদের ধারণা ছিল, খাঁটুরা দত্ত পরিবারেই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণসখা আশ নিয়মিতরূপে যোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং বরাবর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে বহু পূর্ব্বেই কুশদহস্থ অর্দ্ধশিক্ষিত তাম্বুলী জাতীয় এই মহাত্মার জীবনে তাৎকালিক জ্ঞানালোক পতিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত বলেন, "আমার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন আমি সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণসখা আশের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। পুলের উপর দিয়া গাড়িচলার পরিবর্ত্তে শুনিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় জলের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়, একথা শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছিল। তাই কৃষ্ণসখা আশের সহিত বরাহনগরে আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী আসিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গেই বড়বাজারে চিনির গদিতে পিতার নিকট আসিবার সময় তিনি আমাকে লইয়া এক বাড়ীর তেতলায় উঠিলেন। সেখানে অনেকলোক বসিয়াছিলেন এবং বড় বড় ঝাড় লণ্ঠনে আলোকপূর্ণ যেন "দেবসভা" বলিয়া আমার মনে হইল। আমি অবাক হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম। আরও দেখিলাম মধ্যস্থলে লাল কাপড় দিয়া ঘেরা; তাহার মধ্যে যাঁহারা বসিয়াছেন, তাঁহাদের এমন সাজ পোষাক, মাথায় তাজ, যেন দেবতার ন্যায় মনে হইল, ইচ্ছা হইল, আহা! ঐ স্থানে আমি একবার যাইতে পারি। তাহার পর সভাভঙ্গ হইলে আমরাও চলিয়া আসিলাম।" কি আশ্চর্য্য! এই ঘটনার পরিণামে সেই ক্ষেত্রমোহনকে বিধাতাপুরুষ সেই স্থানেই (ব্রাহ্মসমাজে) বসাইলেন!

অভয়চরণ সেন। ইনিও কৃষ্ণসখা আশের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি হইলেও ইহার জীবনের বিষয় যাহা জানিতে, পারা গিয়াছে, তাহা আরও ১০ বৎসর পরের ঘটনা। অভয়চরণ সেনও তেমন কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু যে সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ" "ধর্ম্মনীতি" "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইয়া জ্ঞান এবং সংস্কারের

আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, অভয়চরণ সেন সেই জ্ঞান ও ভাবে প্রণদিত হইয়া নিজ গ্রামের স্বজাতির কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা যেন তাঁহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! জ্ঞানের কি মহিমা! জ্ঞান যাহাকে স্পর্শ করে তাহারই ঐ দশা উপস্থিত হয়। তিনি ঐ জ্ঞানালোক সকলের নিকট প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ আশ এবং গোপালচন্দ্র আশ অনেক পরিমাণে অভয়চরণের ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কালে অভয়চরণের পুত্র সাহিত্যসেবী-বিত্তাব্যবসায়ী স্বর্গীয় অবলাকান্ত সেন পিতার এবং তাম্বুলী জাতির নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যদিও কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্যতা বশতঃ অবলাকান্ত জীবনের উচ্চ ভাব, সকল সময় স্থির রাখিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার জীবনে যে সকল দৃষ্টান্তের বিষয় ছিল, ঈশ্বর-ইচ্ছা হইলে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্থানীয় সংবাদ।

বালিকা বিদ্যালয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব দৃষ্টে তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদিও তখন কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আমরা জানি, সদিচ্ছামূলক কর্ম্ম-চেষ্টা কখনই নিস্ফল হয় না। ইতিমধ্যে আমরা ঐ কার্য্যে তিন জন ভদ্রলোকের অর্থ সাহায্য পাইবার আশা পাইয়াছি। আরও ২।৪ ব্যক্তির সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পাইলে আপাততঃ ক্ষুদ্র আকারেও একটী বালিকা স্কুলের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে। তথাপি আমরা ইচ্ছা করি, এমন ভদ্রগ্রামে ভাল করিয়াই একটী বালিকাস্কুল হউক। দেশহিতকর কোন সাধারণ কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের কথাই মনে হয়, কিন্তু তাঁহারা সে সকল কার্য্যে যদি চিরদিন উদাসীন থাকেন তবে সে দেশের উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া পড়ে।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ" কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ৭ম সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। অগ্রিম চাঁদা না পাইয়াও এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কাগজ পাঠাইতেছি, তাঁহারা যেন চাঁদা পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন, ইতি মধ্যে যাঁহাদের মণিঅর্ডার না পাইব, তাঁহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্তু কেহ ভিঃপি ফেরত দিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ)

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৭। [৭ম সংখ্যা।

সঙ্গীত।

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ধন্য দেব মহিমা তোমার, বুঝে সাধ্য কার।
পলকে প্রলয় হয়,—শ্মশানসম সংসার।
প্রকাশি জননীস্নেহ, রচিলে মানব দেহ,
করিলে তাহে প্রাণ সঞ্চার;
সাজাইলে নানাসাজে অপরূপ চমৎকার।
শেষে চিতানল জ্বেলে, নিজে তারে দিলে ফেলে,
পঞ্চভূতে মিশালে আবার;
আপন স্বরূপে জীবে করিলে হে প্রত্যাহার।
চিরদিন এই খেলা, ভাঙ্গ গড় দুটী বেলা,
নাহি মায়া মমতা বিকার;
অবোধ বালক মোরা করি তাই হাহাকার।
দেখে শুনে ভয়ে মরি, ওহে লীলাময় হরি,
দশ দিক হেরি অন্ধকার;
সুখ দুখ সব মিছা, তুমি মাত্র সার।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

জ্ঞান-নেত্রে নবীন-দর্শন।

এ বিশাল বিশ্বের নিত্য নবভাব দর্শন করিতে কে সক্ষম? প্রকৃতির বিচিত্র প্রণালী এবং অন্তর্জগতের নব নব ভাবের বিকাশ দর্শনে কে আনন্দিত? যাঁহার জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইয়াছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতির নিত্য নবভাব দর্শনে অধিকারী। জ্ঞানী ব্যক্তি সদানন্দময়, তাই জ্ঞানীর চক্ষু সদা অন্তরে বাহিরে নবভাবের বিকাশ দর্শনে আনন্দিত। জ্ঞানে আনন্দ উৎপন্ন করে কেন? জ্ঞান যথার্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ যে বস্তু যাহা, তাহাকে তাহাই বলিয়া বুঝিতে পারার নাম যথার্থ দৃষ্টি বা স্বরূপ দর্শন। সুতরাং স্বরূপ দর্শনে আনন্দ স্বাভাবিক—উহা ঐশ্বরিক নিয়ম। কিন্তু অজ্ঞানতা বা মিথ্যা দৃষ্টি, তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বিবেচনা করা,—রামকে শ্যাম জ্ঞান, দেহাত্মবুদ্ধি,—দেহকেই আমি জ্ঞান করার নাম অজ্ঞানতা, সুতরাং তাহাতেই দুঃখ। অজ্ঞানতাই সকল দুঃখের মূল। অজ্ঞানীর চক্ষু এই জগতে জগদীশ-লীলা বুঝিতে পারে না। সকলই জড়বৎ,—মোহের খেলা দেখে মাত্র। কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে এই জগৎ চৈতন্যময়, প্রাণময়, লীলাময়। এখানে সর্ব্বদা জীবন্ত খেলা হইতেছে,—ইহার মধ্যে কতভাব, কত রস-প্রবাহ; জ্ঞানী তাহা সদাপান করিতে সক্ষম।

জ্ঞানীর নিকট কালের বিচ্ছেদ নাই, সদা-নিত্যকাল, সদানন্দময়। তথাপি ভগবৎ লীলার ভাবে দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর কতই নবতত্ত্ব, নব নব ভাব জ্ঞানীর নিকট ঘোষণা করিতেছে। প্রতিক্ষণে সকলই নূতন হইয়া আসিতেছে। চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, ঘটনা, ক্রিয়া যাহা একটীর পর আর একটী আসিতেছে তাহা পরক্ষণেই নূতন হইয়া আসিতেছে। জ্ঞানে, ভাবে যিনি অনুপ্রাণিত, তাঁহার নিকট "নববর্ষ" নবতত্ত্ব দানের হেতু স্বরূপ; অন্যথা নববর্ষ বাহিক অনুষ্ঠান মাত্র। বাহ্য অনুষ্ঠানে আত্মার তৃপ্তি হয় না, তাই বলি, ভগবান্ আমাদিগকে জ্ঞান-নেত্র, নবীন-দৃষ্টি-শক্তি দান করুন। আমরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার নিত্য নবলীলা দর্শন করিতে করিতে যেন কৃতার্থ হইয়া যাই।

নববর্ষের প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময়, মঙ্গল লগনে।
হও অধিষ্ঠিত এ ক্ষুদ্র ভবনে।
ছোট বড় শিরে তোমার চরণে,
নমিছে দেবতা ভকতি শরণে।
　　করহে তাদের কামনা পূর্ণ।
প্রদানি হৃদয়ে মহাপ্রেম বল,
বিদূর অজ্ঞান-তমস সকল,
কর্ম্মক্ষেত্রে কভু না হয় বিফল,
উদ্যম উৎসাহ জাগে অবিরল
　　পাপ তাপ যত করহে চূর্ণ।
এ ব্রহ্মাণ্ড দেব পরীক্ষার স্থল,
শোকের অনল দহে অবিরল।
নাহি মানে হায়! দুর্ব্বল সবল
নরনারী যুবা স্থবির অচল,
　　অব্যাহতি নাহি পায়'যে কেহ।
সে ভীষণ কালে হয়ে আত্মহারা,
মানবের চিত্ত মগ্ন অন্ধ-কারা,
নিরুপায় অশ্রু বহে খরধারা,
নয়ন না হেরে ক্ষুদ্র বিন্দুতারা,
　　অসহায় পান্থ হারাইয়া গেহ।

ভিখারী সে আর্ত্ত চরণে তোমার;
দেখাও হে পথ করুণা আধার।
সম্মুখে অকূল সিন্ধু পারাবার
গর্জ্জিছে বিষম মহান হুঙ্কার।
　　আশঙ্কা কম্পিত হৃদয় প্রাণ।
তথা তুমি দেব পিতার সমান,
রক্ষা কর দীনে সাধিয়ে কল্যাণ;
অক্ষয় যেমন ভানুর কিরণ,
জলদে আবৃত হয় না কখন,
　　চিরদিন রহে সমশক্তিমান্।
সম্পদের ঘোর মোহের আগারে,
ঐশ্বর্য্য উন্মাদ নাহি গ্রাসে মোরে।
সুখের মদিরা অবশ না করে।
ধ্রুব লক্ষ্য তুমি থেকো হৃদি পরে
　　আজীবন সাথে চরম প্রার্থনা।
নববর্ষে দাও মধুময় আশা,
তার মাঝে রাখি তোমারি ভরসা,
নরনারী মাঝে তব ভালবাসা
পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পিপাসা
　　নববভাবে লভি নব সাধনা।

"মনোজবা" রচয়িত্রী—
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৩৩। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

মনুসংহিতা ৮।১৭

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

৩৪। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূযতে তু সঃ॥

মনুঃ ১১।২৩০

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে, সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

৩৫। অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেৎ॥

মনুঃ ১১।২৩২

কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে, বা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সে আর দ্বিতীয় বার তাহা করিবে না।

৩৬। যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥

মনুঃ ১১।২৩৮

যাহা দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম ও দুষ্কর তৎসমুদায়ই তপস্যাসাধ্য, তপস্যা দ্বারা সকলই জয় করা যায়।

৩৭। যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্‌মূর্ত্তিভির্জ্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥

মনুঃ ১১।২৪১

তপোধনেরা শরীর, মন, বাক্য দ্বারা যাহা কিছু পাপাচরণ করেন, তপস্যা দ্বারাই তৎসমুদায়ই শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়া থাকেন।

৩৮। অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমলক্রমঃ॥

যোগবাশিষ্টম্ ১।৯

সাধুরা, সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট মোক্ষ এবং তাহাই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৩৯। তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

যোগ, ২।২৮

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবনধারণ করে, কিন্তু যাঁহার মন ব্রহ্মমনন দ্বারা সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

৪০। ইতস্ততো দূরতরং বিহৃত্য প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে
বিবেকিলোকাশ্রয়সাধুবৃত্তরিক্তং হি রাত্রৌ ক উপৈতি নিদ্রাম্॥

যোগ ২।১৫৬

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিন ইতস্ততঃ দূরে ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে সাধুসঙ্গ ও সচ্চরিত্র পরিশূন্য গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারে?

৪১। স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে॥

যোগ ৪।৫৩

সুশাস্ত্র, গুরুবাক্য এবং আপনার অনুভব এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

৪২। ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েনাসাদ্যতে পদম্।

যোগ ৪।৫৭

শারীরিক ক্লেশ জন্য কাতরতা, অথবা তীর্থবাস, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। কেবল মনকে জয় করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শান্তিপ্রিয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড।

"শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে।"

(মথি, ৫; ৯।)

জন্ম ১৮৪১ খৃঃ ৯ই নবেম্বর, মঙ্গলবার।

মৃত্যু ১৯১০ খৃঃ ৬ই মে, শুক্রবার।

রাজ্যলাভ ১৯০১ খৃঃ ২২ শে জানুয়ারী।

দশ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ না হইতেই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ব্রিটিস দ্বীপ-পুঞ্জের এবং ব্রিটিস উপনিবেশ সমূহের অধীশ্বর, ভারত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহলোকের কার্য্য শেষ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

"রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উচ্চগৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন, জগতের সমস্ত লোক ইহা স্বীকার করিতেছেন।"

তিনি সকল রাজগণের সম্মিলন আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনে ভগবানের ঈঙ্গিত। এজন্য তিনিও তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন।

"রাজা এড্ওয়ার্ড অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। বিদেশী রাজাদিগের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিয়া ইউরোপ এবং আসিয়ার সমস্ত বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা মানবসমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া ইউরোপে প্রায় সমস্ত দেশের নরপতিদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করার পর রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের আর সমস্ত দেশের নরপতিদিগের সঙ্গে বন্ধুতা সংস্থাপনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে তাঁহারই যত্নে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ১৯০৩ সালে পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্ নগরে গমন করিয়া তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং তথা হইতে ইটালী গমন করিয়া রাজা ইমানুয়েল এবং রোমান কাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরু পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পোপ এড্ওয়ার্ডের সৌজন্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; ফরাসীদিগের সঙ্গে ইংরাজের আবহমান

কাল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল, এই শত্রুতানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য রাজা এডওয়ার্ড ১৯০৩ সালের মে মাসে প্যারিস নগরে গমন করেন। এডওয়ার্ডের ব্যবহারে ফরাসী জাতি এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে ১৯০৪ সালে সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরে সাহায্য করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধিদ্বারা দুই শতাধিক বৎসরের বিবাদ থামিয়া যায়। ১৯০৩ সালের আগষ্ট মাসে রাজা এড্ওয়ার্ড অষ্ট্রীয়ার রাজধানীতে গমন করিয়া তথাকার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং পর বৎসর আগষ্ট মাসে পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বন্ধুতা সুদৃঢ় করেন।

১৯০৪ সালে জুন মাসে রাজা এড্ওয়ার্ড আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র জার্ম্মানীর সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপোষে তাহা মীমাংসা করিবার জন্য এক সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে মরক্কো লইয়া ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছিল। রাজা এড্ওয়ার্ড এই যুদ্ধ নিবারণের জন্য দুইবার ফ্রান্সের সভাপতি লুবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা ঘোষণা করেন যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইহার পর জার্ম্মানী যুদ্ধ হইতে বিরত হন।

ইউরোপের অনেক রাজাই পারিবারিক সম্বন্ধে রাজা এড্ওয়ার্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় কন্যার সহিত নরওয়েের রাজা হাকনের বিবাহ হইয়াছে। জার্ম্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম তাঁহারই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র। তাঁহার ভগিনী এলিসের কন্যা রুশিয়ার সম্রাটের পত্নী। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ডিউক অফ্ এডিনবরার কন্যা রোমানিয়ার রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডের পত্নী। তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ্ কনটের এক কন্যা সুইডেনের রাজমহিষী। তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী বিয়াট্রিসের কন্যা স্পেনের রাজা আলফন্সোর পত্নী। তাঁহার এক শ্যালক গ্রীসের রাজা। তাঁহার শ্যালিকা রুশ সম্রাটের মাতা। ডেনমার্কের রাজা তাঁহার শ্যালক।

১৯০২ সালে বুয়ার যুদ্ধের অবসান হয় এবং ৩১শে মে সন্ধি স্থাপিত হয়। যে বুয়ারগণ ইংরাজের সঙ্গে মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজের রক্তে দক্ষিণ আফ্রিকা সিক্ত করিয়াছিল, রাজা এড্ওয়ার্ড সেই বুয়ারদিগকেই স্বায়ত্বশাসন

প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এবং আফ্রিকার চারিটী প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে এক মহারাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজা এডওয়ার্ড গরীব দুঃখীর পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি গৃহশূন্য দরিদ্র-দিগের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন। তিনি হাঁসপাতালে রোগীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজা এডওয়ার্ড ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরে যখন অভিষেক দরবার হয় তখন তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার পদানুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষ শাসন করিবেন।

১৯০৮ সালে নবেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবের দিনে তিনি ভারতবাসীকে এই আশ্বাস বচন শুনাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষেও ক্রমশঃ প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে এবং এই ঘোষণা-নুযায়ী ভারতে আংশিক ভাবে প্রতিনিধি প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা এডওয়ার্ড ভারতবাসীকে ভাল বাসিতেন, ভারতবাসীও তাঁহাকে ভক্তি করিত। এমন রাজার মৃত্যুতে ভারতবাসী যথার্থই ক্লেশ অনুভব করিতেছে।"

(সঞ্জীবনী)

পুনর্জ্জন্মবাদ।

মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয় তাহা জানিতে সকলেই অল্লাধিক ব্যগ্র। বিষয়টীও অত্যন্ত গুরুতর। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পর যে অবস্থা হয়, তাহা দর্শন করিয়া কেহই এ জগতে ফিরিয়া আসে না। বিধাতার এমন কোন বিধিও নাই। তবে এ সম্বন্ধে কাল্পনিক গল্প মানব সমাজে কিছু কিছু প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিলেন "বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে? কেহ বলে ভুত প্রেত নি হবি, কেহ বলে সা-লোক্য* পাবি" ইত্যাদি। সাধারণতঃ হিন্দুর

* সমান লোকে বাস।

বিশ্বাস মৃত্যুর পর এই জগতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এ প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই উদ্দেশ্য কিন্তু এ সুদীর্ঘ আলোচ্য বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব, পরন্তুপুনর্জন্ম বাদের প্রতিবাদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে, এখনও হইবে, কারণ যতদিন প্রকৃত সত্য অবধারণ না হয়, ততদিন তাহার বিষয় চিন্তা করিতে মানব সমাজ কখনই বিরত হইতে পারে না।

এই যে মানব-জন্ম আর মৃত্যু, ইহার মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন বস্তুটা জন্মায় এবং মরে। ফলতঃ যাহা জন্মায়, তাহাই মরে, আর যাহা জন্মায় না তাহা মরেও না। যাহা মরে তাহা নিত্যবস্তু নহে। যাহা মরণশীল তাহা অনিত্য বস্তু। এই তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আরো দেখা যায়, মানুষ নিত্যবস্তু, কি অনিত্যবস্তু, কিম্বা নিত্যানিত্য মিশ্র? মানুষ বলিলে কি বুঝায়? শরীর এবং আত্মা; কেবল শরীর মানুষ নহে, কেবল আত্মাও নহে, কেবল আত্মা যাহা তাহাই পরমাত্মা। শরীর অনিত্য, আত্মা নিত্য। আত্মা জন্মায়ও না মরেও না; শরীরই জন্মায় শরীরই মরে।

পুনঃ পুনঃ শরীর জন্মায় কেন? অর্থাৎ অজর অমর আত্মা কেন পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণ করে? শরীর এবং আত্মা ইহার মধ্যস্থলে আর একটী বস্তু আছে তাহা মন। মনের স্বরূপ সঙ্কল্প, বিকল্প, অথবা বাসনা। এই মনও ধ্বংসশীল বস্তু, অর্থাৎ মন নিত্য পদার্থ নহে। তবে শরীর গেলেই যে মন যায় তাহা নহে। মনের স্বরূপ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মনও বিদ্যমান থাকে, শরীর স্থূল ভূত, মন সূক্ষ্ম ভূত, সুতরাং শরীর গেলেও মন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে। মন বা বাসনা, আত্মাকে শরীর গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। কর্ম্মফল ভোগ এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন জন্য আত্মার পক্ষে শরীর ধারণ করা আবশ্যক হয়। ইহাই হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে একটী সন্দেহের বিষয় উপস্থিত হইতে পারে—শরীর গেলেও মন থাকে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মনের যে একটী প্রধান গুণ, স্মৃতি বা স্মরণ শক্তি, তাহাতে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না কেন? কিন্তু এ কথার উত্তরে এই যুক্তি আছে যে, বর্ত্তমান দেহ গেলে যেমন নূতন দেহ হয় তেমন নূতন মনেরও উৎপত্তি হয়, অথচপূর্ব্ব মনের স্বরূপ বাসনা, আত্মাতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে যুক্ত

থাকে, সুতরাং শরীরের সঙ্গে পূর্ব্বে মনের বিনাশে পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

এতক্ষণে আমরা দেখিলাম, শরীর, মন, আত্মা, এই তিনের মিলনে মানব জীবন। শরীর, মন, অনিত্য,—মরণশীল বস্তু, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর—অমর। শরীরই জন্মায় শরীরই মরে। মন শরীরের ন্যায় ধ্বংসশীল হইলেও স্থূল ভূত নহে। মন সূক্ষ্মভূত, সুতরাং অবিনশ্বর আত্মাতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু মনেরও বিনাশ আছে, অর্থাৎ বাসনা চিরকাল আত্মার সঙ্গে থাকে না। জ্ঞানে বাসনা ক্ষয় হয়। বাসনা নিবৃত্তি হইলে আর জন্ম হয় না। জ্ঞানেই মুক্তি লব্ধ হয়। ইহা একপক্ষের যুক্তি, অপর পক্ষ বারান্তরে আলোচ্য।

দুই বন্ধু।

শান্তিনগরে ভুলু ও ভবানীর নিবাস। ভুলুর পুরা নাম ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, ভবানী,—ভবানীচরণ দত্ত। এই নাম ধাম কাল্পনিক হইলেও আখ্যায়িকার মৌলিক ভাব সত্য মূলক। ভবানীচরণ আরও কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, কিন্তু ভোলানাথ এককমাত্র। সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ বর্ত্তমান নাই, সন্তানাদিও হয় নাই। উপজীবিকা ব্রহ্মোত্তর জমীর কিঞ্চিৎ আয় মাত্র। ভোলানাথ অনেকটা স্বাধীন প্রকৃতির, এজন্য চাকরীর প্রতি অনুরাগ নাই। ভোলানাথের স্ত্রীও অল্পে সন্তোষ ভাবাপন্না। সুতরাং ভোলানাথ গরীব হইলেও সংসারে বেশ শান্তিতে বাস করিতেন।

প্রথমেই বলা হইয়াছে ভবানীচরণ কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, আর আর সকলে বিদেশে চাকরী করেন, ভবানীচরণ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করেন। কোন্ দুরলক্ষ্য সূত্রে যে ভুলু এবং ভবানীর বন্ধুতা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাল্যকাল হইতে এই প্রণয়ের আরম্ভ হইয়া, এখন পরিণত বয়সে সে বন্ধুতা বিশেষ পবিত্র, মধুর ভাবে, পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভোলানাথের বাড়ীতেই সর্ব্বদা বসা উঠার স্থান সুতরাং এই বন্ধুতার মধ্যে

ভোলানাথের স্ত্রী বসুমতীও ছিলেন। ইঁহাদের এই বান্ধব-জীবন যে কেবল নিজেদের মধ্যে বদ্ধ ছিল, তাহা নহে প্রতিবাসীর বিপদাপদে যথাসাধ্য সাহায্য করা ইঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল।

ভোলানাথ কখন কখন খাজনাদি আদায়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়া ২।১দিন বাড়ী আসিতে না পারিলে, ভবানীচরণ যেমন প্রত্যহ ভোলানাথের বাড়ীতে আসিতেন, তখনও তেমনই আসিয়া বসুমতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

আজ ভোলানাথ বাড়ী নাই, সন্ধ্যার পর যথাসময়ে ভবানীচরণ আসিতেছেন না, বসুমতী নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানীচরণ আসিয়াই বলিলেন, বসু! (ভবানীচরণ বসুমতীকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় বসু বলিয়া ডাকিতেন। বসুমতীও ভবানীচরণকে বন্ধুদাদা বলিতেন) তাই ভবানীচরণ বলিলেন, "বসু! আজ একটা কাজে গিয়া এমন রৌদ্র লাগিয়াছে যে তজ্জন্য মাথা ধরিয়াছে।" বসুমতী একটী মাদুর পাতিয়া, একটি বালিস দিয়া বলিলেন "বন্ধুদাদা! তবে একটু বিশ্রাম কর।" ভবানীচরণ শয়ন করিলেন, বসুমতী নিকটে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ভবানীচরণ নিদ্রিত হইলেন। বসুমতী তখনও মৃদু মৃদু ভাবে মাথায় বাতাস করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে গৃহের অপর দিকে এক চোর প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহস্থ নিদ্রিত নহে। তখন সে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে ভোলানাথ বাড়ী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বসুমতীকে ডাকিতে লাগিলেন। বসুমতী দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঘরে বন্ধুদাদা ঘুমাইতেছেন, তাঁহার মাথা ধরিয়াছে।" ভোলানাথের আগমনে ভবানীচরণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ক্রমে ঘটনা যখন এ পর্য্যন্ত আসিল, তখন গৃহস্থিত চোর, এই অকৃত্রিম বন্ধুতার আদর্শ এই "আনন্দ-গৃহ" দর্শনে তাহার মনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। সে একেবারে সর্ব্ব-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা ঘরের মধ্যে এ ব্যক্তি কে বুঝিতে না পারিয়া ভবানীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

আগন্তুক। আমি চোর!

ভবানী। চোর কি রকম, তোমার অবয়বে তো ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হয়?

চোর। ভদ্রসন্তান কি চোর হয় না? সত্যই আমি চোর। তবে শুনুন। এই বলিয়া চোর বলিতে লাগিল "আমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে কিছু চুরি করিব বলিয়া প্রবেশ করি কিন্তু (বসুমতী ও ভবানীচরণকে লক্ষ্য করিয়া ভোলানাথের প্রতি বলিল) তাঁহাদিগকে জাগরিত দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী, সুতরাং নিদ্রিতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম। তৎপরে কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহাঁরা স্বামী, স্ত্রী নহেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে মন্দ ভাবের উদয় হইল। সুতরাং সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। তৎপরে যখন আপনি বাড়ী আসিলেন তখন আদ্যোপান্ত আপনাদের বন্ধুতার স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া আমার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে। আমার এখন আপনাদের নিকট কোন ভয় নাই। আমি যে কু-অভিপ্রায়ে আজ এখানে আসিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনারা যদি আমাকে চোর বলিয়া বিচারালয়ে দেন, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই; তবে আরও বলি শুনুন! (ভবানীচরণের প্রতি) আপনি আমাকে যে ভদ্রসন্তান বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও সত্য। আমার নাম উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমিও যৌবন-কালে এই বন্ধুতার পিপাসু হইয়া সংসারের কুটিল ব্যবহারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এখন আমার এই দশা হইয়াছে, কিন্তু আজ আঁপনাদিগকে দেখিয়া যেন কি এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা,—অতৃপ্ত বাসনা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। আপনারা কি এ অধমকে দয়া করিবেন? আজ হইতে আমি এ পথ পরিত্যাগ করিলাম, আপনারা কি আমাকে বন্ধুতার সাধনে গ্রহণ করিবেন?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া উমেশ নিস্তব্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণও এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া শুষ্ক নেত্রে থাকিতে পারিলেন না। তখন ভবানীচরণ বলিলেন, "বন্ধু! আমরা যে বন্ধুতা-ব্রত সাধনে ব্রতী, তুমি যখন আজ অনুতাপী হইয়া অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রত সাধনে ইচ্ছুক হইতেছ, তখন তোমাকে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। আজ হইতে তুমি আমাদের বন্ধু হইলে। আমাদের ব্রত সাধনের অপর নিয়ম এই যে; সৎপথে স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করা।" অতঃপর সকলের সম্মতিক্রমে

বসুমতী কিছু আহারীয় প্রস্তুত করিলেন এবং সকলে আহারাদি করিলে সে দিনকার কার্য্য শেষ হইল। ইহার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল।

একদা তিন বন্ধুতে ইচ্ছা করিয়া রাজারঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। তিন জনে তিনখানি শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। স্নানান্তে ভবানীচরণ যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু অগ্রে বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমেশ দেখিলেন যে, ভবানীচরণ ভ্রমক্রমে তাঁহার বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, সুতরাং উমেশ বলিলেন "বন্ধু! ও কাপড়খানা আমার।" ভবানী বস্ত্রের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বন্ধু! আমার ভুল হইয়াছে।" তৎপরে তিনি নিজের বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং যথা সময়ে সকলে বাড়ী আসিলেন।

যখন তিন বন্ধুতে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন ভবানীচরণ,উমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বন্ধু! আজ হইতে তোমাকে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া কিছু পৃথক্‌ভাবে থাকিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া উমেশ বজ্রাহতের ন্যায় কাতরভাবে বলিলেন "বন্ধু! আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে, আজ এমন নিদারুণ অনুজ্ঞা করিতেছ?" তাহাতে ভবানীচরণ বলিলেন "বন্ধু! তোমার অন্য কোন অপরাধ হয় নাই, কিন্তু আমাদের যে বন্ধুতার ব্রত সাধন, তাহা বড়ই কঠিন, ইহাতে "আমার" "তোমার" জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাই যতদিন তোমার ঐরূপ ধারণা থাকিবে ততদিন মাত্র পৃথকভাবে চলিতে হইবে। নচেৎ আমাদের মধ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।"

এ কথায় উমেশ বুঝিলেন যে, স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় তাঁহার সত্যই এই "আমার" "তোমার" জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু উমেশ ইহাও বুঝিলেন যে, বন্ধু ভবানীচরণের কথার কতদূর গভীর অর্থ, সুতরাং ঐকান্তিক সাধন দ্বারা এই আমিত্ব ভাব, উমেশ শীঘ্রই দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কুশদহ। (৫)

"বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ একসময় বঙ্গসাগরের অন্তর্গত ছিল। প্রমাণের জন্য লেখক গোবরডাঙ্গা, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কুশদ্বীপ প্রভৃতি জলময় স্থানবাচক শব্দের ও ভূগর্ভস্থ সমুদ্রজীবের কঙ্কালের

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক "গোবরডাঙ্গা" এই নামটীর ডাঙ্গা শব্দ দ্বারা স্বতঃই এইভাব মনে উদিত হয়। কালসহকারে এই স্থান স্তর পড়িয়া মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশকে এতদিন আমরা আরও বিস্তৃত দেখিতাম, যদি সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমাস্থ সমুদ্রের তীরের পর অতলস্পর্শ না থাকিত।

বরিশালের কামান সম্বন্ধে অনেকে অবগত আছেন। অতিশয় বৃষ্টি কিম্বা ঝড়ের পর এই বরিশালের কামানের শব্দ গোবরডাঙ্গা হইতে সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বরিশালের কামানের বিবরণ এখানে লিখিলে বোধ করি অতিরঞ্জিত হইবে না।

বরিশালের কামানের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। জনসাধারণের বিশ্বাস ঢাকার নবাব হোসেন সার সম্মানার্থে কোন অদৃশ্য হস্তদ্বারা এই কামানের শব্দ করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই একটী আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হইবে। সেইজন্য পৃথিবীর মধ্যে এইরূপ ভীষণ শব্দ হয়। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, সুন্দরবনের পরেই সমুদ্রের ধারে অতলস্পর্শ। ঝড় বা বৃষ্টির সময়ে সমুদ্রে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গদেশের তলদেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতের এই শব্দ গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রবণ করা যায়। বঙ্গদেশের তলদেশ ক্ষয় পাইতেছে যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে এই দেশ কালক্রমে বসিয়া "দ" পড়িয়া যাইতেও পারে। সুতরাং এই "দ" কুশদহ পরগণাকেও ছাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহা সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়।

গোবরডাঙ্গার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা জমীদারদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত লেখা উচিত, "গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের আদিপুরুষ শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়। ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত সারষা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ইছাপুরে আসিয়া "ন ঠাকুরের" বাড়ী অতিথি হন। গৃহস্বামী তাঁহার বিশেষ পরিচয়াদি লইয়া তাঁহার একটি কন্যার সহিত শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন। তাঁহার অগ্রজ এই সংবাদ শুনিয়া শ্যামরামকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ঐ গ্রামে একটি গন্ধবণিকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া ঐ বাটীতে পৃথক গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ, কনিষ্ঠ খেলারাম। এই খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অদৃষ্টশ্রী আজিও গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের অদৃষ্টকে উদ্ভাসিত রাখিয়াছে।

খেলারাম বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স দশ বার বৎসর, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ একদিন কোন কারণে তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইছাপুরে মাতুলালয়ে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিবার পর, একদা তাঁহার মামী ঠাকুরাণী কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করায় তিনি মনের দুঃখে সেই দিন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যশোহরের কালেক্টর মহোদয়ের সেরেস্তাদারের বাসায় গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া সেরেস্তাদারের পুত্রদিগের সহিত বাটীতে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টারির কাছারীতে সামান্য বেতনে মুহুরিগিরি চাকরী পাইলেন। কিছুদিন ঐ কার্য্য করিয়া এমন কার্য্যদক্ষ হইলেন যে, একদা সেরেস্তাদার মহাশয় পীড়িত হইলে অন্য কাহাকেও একটিনী না দিয়া খেলারামকেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। খেলারাম সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কালেক্টর সাহেবও তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেরেস্তাদার মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ঐ কাজটী স্থায়ী হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে কালেক্টর সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলী হইলেন ও খেলারামকেও সঙ্গে আনিলেন, এবং খেলারাম যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদেই নিযুক্ত রহিলেন। একদা খাজানাদি অনাদায় বশতঃ গোবরডাঙ্গা নিলাম হইবার ঘোষণা হওয়ায়, উক্ত সাহেব খেলারামকে কহিলেন, "খেলারাম! গোবরডাঙ্গা গ্রাম নিলামে বিক্রয় হইবে, তুমি খরিদ করিবে কি?" ইহা শুনিয়া খেলারাম কহিলেন—"আমি সামান্য বেতনে চাকরী করিতেছি, আমার অর্থ নাই, আমি কি করিয়া জমীদারী খরিদ করিব?" ইহা শুনিয়া সাহেব মহোদয় তাঁহাকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন। তাহাতে খেলারাম বলেন "হিন্দুশাস্ত্রে

কথিত আছে 'ঋণের টাকার সুদ না লইলে ঐ টাকা দানের মধ্যে পরিগণিত হয়।' সুতরাং আমি বিনা সুদে টাকা লইতে পারিব না।" তাহাতে কালেক্টর সাহেব বলেন "আচ্ছা তুমি সামর্থ্যানুযায়ী সুদ দিও।" গোবরডাঙ্গা নিলামে খেলারামের হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খেলারাম নিজ গ্রামে যাইয়া প্রথমে গন্ধবণিকের বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তৎপরে নিজের বাসভবন নির্ম্মাণ করান। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথকে উক্ত নিজ বাসভবন ও তিন সহস্র মূল্যের সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি তৎপরে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া ভট্টাচার্য্য পাড়ায় কাছারীবাটী প্রস্তুত করান। এবং মধ্যে মধ্যে ঐ কাছারীতে আসিয়া জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তখনও চাকরী পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপরে যমুনানদী তীরে প্রকাণ্ড বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া আরও কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ও মুরশিদাবাদে উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করেন। তাহার পর তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গোবরডাঙ্গায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

খেলারামের জন্ম হইলে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে খাঁটুরার জমীদারীর দুই আনা অংশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন সুতরাং প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে ঐ দুই আনা অংশ আদায় করা হইত। কালক্রমে অপর অংশীদারগণ খর্ব্ব হইলে সম্পূর্ণ স্বত্ব ঐ বংশেরই আয়ত্ত হইয়াছে।

এইরূপে অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ১৮১৭ সালে দেহত্যাগ করেন।" (কুশদ্বীপ কাহিনী)

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া।

স্নানের জন্ম ৩২ হইতে ৬০ তাপাংশ জল ব্যবহার করিলে তাহাকে শীতল স্নান কহে। আমরা সুস্থ শরীরে প্রত্যহ শরীরের শৈত্য করণার্থ শীতল জলে স্নান করিয়া থাকি। শৈত্যকারক ব্যতীত মনুষ্য শরীরে শীতল

জলের আরো অনেক প্রকার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিলে ইহা উত্তাপহারক, প্রদাহনাশক, সঙ্কোচক, স্পর্শহারক, বলকারক, উত্তেজক এবং অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধে মানবদেহে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিলে যে বিভিন্ন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

শীতল স্নান দ্বারা দেহের উত্তাপ লাঘব হয়। টাইফাস্ (Typhus Fever), টাইফয়েড্ (Typhoid Fever), হাম ও অন্যান্য জ্বররোগে যখন দৈহিক উত্তাপ এত অধিক হয় যে, রোগীর জীবনাশা থাকে না, তখন উত্তাপ লাঘব করিতে শীতল স্নান সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিবিধ প্রকারে এই শীতল স্নান ব্যবহৃত হয়। যথা—শীতল জলে সম্পূর্ণ স্নান; শরীরে অধিক পরিমাণে শীতল জল সেচন; শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদন; শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া তাহা দ্বারা গাত্রমার্জ্জন।

ডাক্তার রিঙ্গারের মতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার দ্বারা শীঘ্রই দেহের উত্তাপাধিক্যের হ্রাস হয়। এই প্রক্রিয়া যেরূপ ফলপ্রদ তদ্রূপ সহজসাধ্য। বরফজলে চারিখানি বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া অল্প নিঙ্গড়াইয়া লইবে। হস্ত, পদ, বক্ষ, উদর প্রভৃতি অঙ্গ সকল ক্রমশঃ এক একখানি ভিজা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিবে; অল্পক্ষণ পরে ঐ গুলি বরফজলে পুনরায় ভিজাইয়া, নিঙ্গড়াইয়া, যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিবে। এইরূপে বারম্বার বস্ত্রখণ্ড পরিবর্ত্তন করিবে। এই উপায়ে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০৬ হইতে ১০১ তাপাংশে বা তাহারও কম পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকেই জ্বর অবস্থায় শীতল স্নান ব্যবস্থা করিতে ভয় করেন। তাঁহাদের ধারণা যে, ইহা দ্বারা শ্বাসনলী-প্রদাহ বা ফুস্ফুস্-প্রদাহ হইতে পারে। কিন্তু শীতল স্নানদ্বারা ঐরূপ ঘটনা অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিবিধ বাহ্য-প্রদাহে শৈত্য দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার আর্ণট্ শত শত রোগীর প্রদাহিত স্থানে বরফ প্রদান করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। বাত, বসন্ত প্রভৃতি রোগে শরীরাভ্যন্তরস্থ অভ্যাগত বিষ, প্রদাহরূপে চর্ম্মপথে বাহির হয়। ইহাতে শৈত্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ; কারণ চর্ম্মের প্রদাহ হঠাৎ নিবারণ করিলে উক্ত বিষ অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতে প্রবেশ করিয়া অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

তাপপ্রদানে যেরূপ সমস্ত ভৌতিক পদার্থের কলেবর সম্প্রসারিত হয়, শৈত্য সংলগ্নে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে শৈত্য সংলগ্ন করিলে সেই স্থানের সঙ্কোচন হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, অবগাহন করিবার সময় অধিকক্ষণ জলে থাকিলে হস্তপদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হয়। বিবিধ রক্তস্রাবে রক্তরোধ করিতে শৈত্য প্রদানই প্রধান ঔষধ। ইহার কারণ এই যে, শৈত্যস্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করে। অস্ত্রোপচার করিবার পর রক্ত রোধার্থ সকল অস্ত্রচিকিৎসকই শীতল জল ব্যবহার করেন। দন্তমূল বা মুখাভ্যন্তর হইতে রক্তস্রাব হইলে বরফখণ্ড মুখে রাখিলে রক্তরোধ হয়। নাসিকা হইতে রক্তপাতে শীতল নস্যগ্রহণে প্রতীকার হয়। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবেও শৈত্যের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। রক্তবমন রোগে বরফ খাইলে সুফল দর্শে। প্রসবান্তে রক্তস্রাব হইলে যথেষ্ট বরফ খাইতে দিলে এবং নিম্নোদরে শীতল জলধারা প্রদান করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া রক্তস্রাব নিবারণ হয়। প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে, প্রসবান্তে ফল নির্গত না হইলে, অথবা গর্ভপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য রোগে শৈত্য মহোপকারক। ইহার সঙ্কোচন গুণবশতঃ রক্তাধিক্য নিবারিত হয়। শিশুদিগের কন্‌ভাল্‌সন্ (Convulsion) রোগে মস্তকে শীতল জল প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। উন্মাদ রোগীর মস্তকে বরফপূর্ণ থলি রাখিয়া দিলে দৌরাত্ম্য ও অস্থিরতা নিবারণ হইয়া সুনিদ্রা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ; (ডাক্তার) গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৭)

ঋষিকেশ।

আমরা ৩টার সময় কংখল হইতে ৭ মাইল পথ চলিয়া যখন লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এখানে আসিয়া দেখি, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ৪ জন বাঙালী, খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন গাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তথাকার লোকে বুঝিতেছে না, তথাপি বোধ হয় ভাবের আকর্ষণে

শ্রবণ করিতেছে। আমরা মন্দিরে কিছু ভোজ্য (বোধহয় খিচুড়ী) পাইয়া ভোজনান্তে পাকা ঘরের বারেন্দায় শয়ন করিয়া আনন্দচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। আরও অনেক যাত্রি তথায় ছিল। আমার একখানি কম্বল থাকা সত্ত্বেও পূর্ণানন্দ স্বামী এবং শিবানন্দ স্বামী একটু বিস্তৃত ভাবে শয্যা করিয়া তাহার মধ্যে আমাকে লইলেন। আমরা তিনজনে একত্রে শয়ন করিলাম। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহাদের যত্নের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৭ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে যাত্রাকালে বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "রাত্রে আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, আমরাও ঋষিকেশ যাইব, আপনাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করি। আমরা তথাকার অবস্থা অবগত নহি।" সাধুরা বলিলেন, "চলুন, ভাবনা কি ?"

প্রাতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা করিলাম। স্বচ্ছন্দে, আনন্দ মনে বেলা ১০টার মধ্যে ঋষিকেশ পৌঁছিলাম। হরিদ্বার হইতেই উচ্চ নীচ অসম পথে পর্ব্বতোপরি ক্রমেই আরোহণ এবং মধ্যে মধ্যে ঝরনার স্রোত অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতেই উন্নত গিরির গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ স্তব্ধ ও শান্তিযুক্ত হইতেছিল। এখন একেবারে উন্নত শিখর-পাদমূলের নিকটস্থ হইয়া আরো গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমরা প্রথমে গঙ্গাতীরস্থ একটী দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। একটু পরে গঙ্গায় স্নান করিয়া ছত্রে মাধুকরী করিলাম। গঙ্গার জল দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, ততোধিক স্নানাবগাহণে হইল। সেই সুনির্ম্মল সুশীতল সলিলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া যেমন শরীর শীতল হইল, তেমনি মনও প্রফুল্ল ও পবিত্রযুক্ত হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বারি আলোড়ন, স্পর্শসুখানুভব করিতে করিতে সাধকের সেই সঙ্গীতের ভাব আমার মনে আসিল, "কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি," সত্যই যিনি জলের এমন শৈত্য ও নির্ম্মলতা প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইল।

ছত্রে পক্কান্ন (রুটী, দাউল, বা খিচুড়ী) সাধারণতঃ পরমহংসদিগের জন্য, এবং ব্রহ্মচারী বা বৈষ্ণবদিগের জন্য আটা, দাউল, ঘৃত কাঁচা দ্রব্য প্রদত্ত হয়। আমাদের সঙ্গী বৈষ্ণবগণের জন্যও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা রুটী প্রস্তুতের অসুবিধা বশতঃ শিবানন্দ স্বামীর দ্বারা অনুরোধ করিয়া

তবে মাধুকরী পাইয়াছিলেন। আমরা আপাততঃ ছত্রের একটী ঘরে তিন জনে আশ্রয় লইলাম, আর একটী ঘরে বৈষ্ণবগণ রহিলেন। তখন ছত্রে যথেষ্ট ঘর খালি ছিল, সাধুরা প্রায় ছত্রে থাকেন না, যাত্রিগণ ছত্রে থাকে।

স্বামীজিদিগের সঙ্গে একঘরে একাসনে অবস্থিতিকালে আমার প্রতি তাঁহাদের সস্নেহভাব দেখিয়া মনে হইল, এমন স্নেহ এবং যত্ন সাংসারিক সম্পর্কে মেলে না। তাঁহাদের জীবন যে অপরের আনন্দদানের জন্য তাহা বোধ হইল। তাহাতে মায়ার গন্ধ মাত্র নাই, কে কোথাকার মানুষ এখনি হয়তো আমরা কে কোথায় চলিয়া যাইব।

বিশ্রামাদির পর অপরাহ্ণে, আমরা গঙ্গাতীরস্থ সাধুদিগের আশ্রম সকল সাধারণভাবে দেখিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর বৈষ্ণব বাবাজীরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন পূর্ণানন্দ স্বামী আনন্দে বাল্যভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। খোল করতালের শব্দ শুনিয়া কতকগুলি নরনারী বালকবালিকা উপস্থিত হইল, কিন্তু বোধহয় কোন রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। ছত্রে একবেলা ভিক্ষা পাওয়া যায়, এবং সাধুগণ সাধারণতঃ একবার আহারেই অভ্যস্থ।

১৮ই রবিবার প্রাতে ও মধ্যাহ্নের কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া আমরা ৩টার পর "লছমনঝুলা" দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ববৎ ক্রমোচ্চ অসম পথে ৩ মাইল চলিয়া যেস্থানে গঙ্গোত্রি, বদরিকাশ্রম, ও কেদারনাথ প্রভৃতি গমণের পথে গঙ্গার পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপারে আসিতে সেতু পার হইতে হয়, ঐ সেতুর নামই "লছমনঝুলা"। শুনিলাম এই সেতু পূর্ব্বে সুদৃঢ় না থাকায় কত লোকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট হইতে উত্তম লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাত্রিগণের যাতায়াত কেমন সুগম, নিরাপদজনক হইয়াছে। এই সেতু বৃহৎ নহে, কেননা এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি আদৌ নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীরতা এবং উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উচ্চতাবশতঃ দৃশ্যটী অত্যন্ত ভয়ানক বোধহয়। গঙ্গার উভয় কুলের উন্নত পর্ব্বত-গাত্র হইতে সেতু সংলগ্ন হইয়াছে, মাঝখানে অতি নিম্নে গঙ্গা সুতরাং তাহাতে অত্যন্ত গুরু-গম্ভীরভাব অনুমিত হইতে লাগিল। হরিদ্বার হইতে মনে করিয়াছিলাম লছমনঝুলায় গিয়া "গঙ্গোত্রি" বা "গোমুখী গঙ্গার" দৃশ্য আরও দৃষ্ট হইবে,

কিন্তু এখানে উন্নত শিখরাচ্ছন্নতার মধ্যে আর কোন দূরস্থ দৃশ্য দৃষ্টই হয় না। অতি আনন্দচিত্তে, এক অনির্ব্বচনীয় চিন্তাযুক্ত মনে আমি সেতুমূলের একস্থানে বসিয়া রহিলাম, আর সকলে ইতস্ততঃ আশ্রমাদি দেখিয়া আসিলেন। তৎপরে যখন আমরা হৃষিকেশের ছত্রে ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী যুবক ছিলেন। ইনি অবস্থাপন্ন ভদ্রঘরের সন্তান, বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় বৃন্দাবনে থাকেন। বয়স ত্রিশের বেশী বোধ হয় না। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, বিনয় এবং ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি সারল্যে আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে আমি দেশে ফিরিবার কালে বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আসিতে পারি নাই। ১৯শে প্রাতেই বাবাজীরা আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজিদিগের সহিত আমার ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্বমত নিয়তই চলিয়া আসিতেছে। আজ রাত্রে শিবানন্দ স্বামী যাহা বলিলেন, তাহার সার এইরূপ,—"পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় কোন ভেদ নাই, অজ্ঞানী আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। অজ্ঞানতা দূর হইলেই, ঐ অভেদ ভাব বুঝিতে পারা যায়।" আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের ভাব বুঝিবার জন্য স্বভাবতঃ আমি যাহা কিছু বলিয়াছিলাম তাহার সার এইরূপ, পরমাত্মা ও জীবাত্মায়, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাতে স্বরূপগত এক, কিন্তু ব্যক্তিত্বে (Personality) ভিন্ন। পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতার মধ্যে একাত্ম রূপেই ছিল, তারপর জন্ম জন্য উপাধি ভিন্ন হইল। ফলতঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও পিতার মধ্যে বীজাকারে বা সম্ভাবনা রূপেও ভিন্নতা ছিল, নতুবা জন্ম সম্ভব হইত না। জীবাত্মা অপূর্ণ, পরমাত্মাপূর্ণ, তথাপি তাঁহার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনতিক্রমনীয় নিয়মে, ও অপার করুণায়,—সাধন দ্বারা, জীবাত্মা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতালাভের কোন শেষ অবস্থা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা, পূর্ণ, অসীম, সুতরাং পূর্ণতালাভ অর্থে অনন্ত উন্নতি। ইচ্ছা যোগে জীবাত্মা পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেমাদি লাভ করিয়া পূর্ণভাবাপন্ন হয়। পূর্ণভাব হইলে কামনা রহিত ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন কামনা থাকে না, তখনও কর্ম্ম থাকে; লোকহিতার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম হয়। আমাদের আজকার প্রসঙ্গ পূর্ণানন্দ

স্বামী স্থিরভাবে কেবল শুনিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্যে তেমন কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু ইহাতে যেন তাঁহার বিশেষ আনন্দের ভাব দেখা গেল।

এই আলোচনার পর প্রসন্নচিত্তে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাত্রি শেষে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন চিত্ত একান্ত শান্ত, কি যেন এক সুখস্পর্শ প্রাণে অনুমিত হইতেছিল। নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ উপাসনার ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর স্বামীজিরাও জাগিয়া উঠিলেন ও প্রভাত হইল।

(ক্রমশঃ)

তাম্বুলী সমাজ।

খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, বরাহনগর-বাসী কুশদহ তাম্বুলী শ্রেণীর সকলেই বোধ-হয় বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন যে, দিন দিন তাঁহাদের কন্যার বিবাহের পথ কেমন সঙ্কট হইতে সঙ্কটতর হইয়া আসিতেছে। ভাল পাত্র তো মেলেই না, কাজেই অপেক্ষাকৃত বাছিয়া গোছাইয়া যতদূর পাওয়া যায় তাহা হস্তগত করিতে সকলেই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা ও তাহার মূলভাব হইতে যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা হয় ত অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, অথবা কাজে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুত্র, কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ যে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা ঐ ব্যস্ততা প্রযুক্ত চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবার অবসর হয় না। তৎপরে যাঁহারা পুত্রের কিছু শিক্ষা দানে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, তাঁহারাও ঐ ব্যস্ততার তাড়নায় এবং প্রলোভনে পড়িয়া অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং ঐ ব্যস্ততার ভাব যাহাতে খর্ব্ব হয়, তাহার প্রতিকার করা প্রথম কর্ত্তব্য।

শিক্ষার বিস্তারেই যে সামাজিক উন্নতির দ্বার খুলিয়া যাইতেছে,—শিক্ষিত যুবকবৃন্দই যে ভবিষ্যতের আশা, এ কথা সত্য হইলেও কেবল বালকের শিক্ষায় দ্বারা সে উন্নতি প্রকৃত এবং স্থায়ী হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত বালিকাগণেরও শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হইতেছে। শিক্ষা অর্থে, এখানে ভাষা জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হইতেছে ; কেন না তদ্বারা বুদ্ধি, নীতি এবং জ্ঞান বিকাশেরও যে সাহায্য

হইতে পারে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? ইহার শিক্ষাই প্রাথমিক সরল, সহজ পথ। বালিকার শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে বালিকার বিবাহের অপকারিতার বিষয় কিছু কিছু লক্ষ্য পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, বালকগণ বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া যাহাতে শিক্ষানুরাগী হয় সেই উপায় করাই বিহিত। ইহা সত্য হইলেও বালিকাগণের শিক্ষা ও বিবাহের কাল বৃদ্ধি না করিতে না পারিলে প্রথম চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নহে। বালিকার বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইলে, পিতা মাতার উৎকণ্ঠা, অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিবে; তখন বালকের বিবাহের বয়সও সহজে বাড়িয়া চলিবে। অতএব সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে বালিকার শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতের ভাল মা প্রস্তুত করিবার পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। তখন আর তত কষ্ট করিতে হইবে না। ভাল মা হইলে সকল উন্নতি সাধন সহজ হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রই বা কি বলেন;—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। এই শাস্ত্রবাক্যই বা সকলে কেন ভুলিয়া যাইতেছেন?

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে খাঁটুরানিবাসী শ্রীযুক্ত রামকল্প আশ মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি। ইনি স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র আশের খুল্যতাত ছিলেন। এই আশ বংশ সাধারণতঃ শান্ত নিরীহ স্বভাব। রামকল্প আশ মহাশয়ের বয়স প্রায় আশীতি-বর্ষ হইয়াছিল। ইনি বাতরোগে অনেকদিন হইতে শয্যাগত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে পুত্রদ্বয়ের মধ্যে, যাহাতে বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ না ঘটে তজ্জন্য তিনি জীবিত কালেই তাহা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত ধীর প্রকৃতির মধ্যে ধর্ম্মভাব ছিল। ধর্ম্ম প্রসঙ্গে এবং ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তনাদি শ্রবণে তাঁহার অনুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ দেখা গিয়াছে। গোপনে সাত্ত্বিকভাবে দান ধর্ম্মও এই

বংশের স্বাভাবিক ভাব। তাঁহাতে সে ভাবেরও অভাব ছিল না। বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার বেলেটোলাস্থ স্বীয় ভবনে, তাঁহার শান্তিপ্রিয় আত্মা নশ্বর দেহের মমতা এবং সকল আত্মীয়ের আত্মীয়তা ছাড়িয়া, যিনি আত্মীয় হইতেও পরমাত্মায় তাঁহার আহ্বান পূর্ণ করিলেন। এখন তাঁহার জন্ম দুঃখ করিবার আর কি আছে? পরন্তু তাঁহার পুত্রগণ পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়া মনুষ্যত্ব উপার্জ্জনে সক্ষম হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল হইতে কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ও বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে হরিনারায়ণ রক্ষিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবং ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল হইতে শরৎবালা রক্ষিত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে। শ্রীমান্ কিশোরীমোহন, গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য পাড়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীমান্ হরিনারাণ, বরাহনগরবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র। কুমারী শরৎবালা, খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় ডাক্তার গনেশচন্দ্র রক্ষিতের কন্যা। ভগবান এই বালক বালিকাগণের জীবনে শিক্ষার সুফল দান করুন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী প্রমুখ খ্যাতনামা দেশহিতৈষী মহোদয়গণ, "হিন্দু ম্যারেজ রিফরম্ লীগ্" অর্থাৎ "হিন্দু বিবাহ সংস্কার সভা" হইতে জাতীয় সভা সমিতি সকলের সহিত তাম্বুলী সমাজের মত চাহিয়াছেন যে, আপনারা এই সমিতির সহিত যোগ দিয়া পুত্র কন্যার বিবাহের বয়স কত নির্দ্ধারিত করিবেন তাহা স্থির করুন। তাম্বুলী সমাজের পক্ষে ইহা একটী শুভযোগ বলিতে হইবে। উক্ত সমাজের হিতৈষী কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সমাজের ন্যায় পুত্রকন্যার শিক্ষাবিস্তার ও বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া এবং তাম্বুলী সমাজের বিভিন্ন মেলে বিবাহের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজ সংস্কার করিতে পারেন।

শারীরিক অসুস্থাদিতে "কুশদহ" বৈশাখসংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। (কুঃ সঃ)

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দাসের আক্ষেপ ও প্রার্থনা।

"তোমার কথা হেথা কেহত বলে না, করে স্বধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে স্বধু হলাহল।"—(রবীন্দ্রনাথ)

হে প্রভু পরমেশ্বর! চারিদিকে নরনারীর দশা কেন এমন হইল? শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম, যাহা কেবল তোমারই জন্য, যে মানব তোমাকে জানিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শোক দুঃখ মৃত্যুর অতীত হইবে; সদানন্দে তোমার কাজ করিয়া আরো আনন্দিত হইবে, সেই মানব-সাধারণ-নরনারী আমিত্ব প্রাধান্যে শরীরকে "আমি" এবং সাংসারিক পদার্থ "আমার" এই জ্ঞানে বদ্ধ হইয়া কেন এমন দুঃখের অধীন হইল? প্রভু! তুমি কেবল মানবাত্মাকেই আত্মজ্ঞান দান করিয়াছ, তাই মানুষ আত্মবোধে সক্ষম, তাই মানুষ আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে। কিন্তু জড়পদার্থের আত্মবোধ নাই, জড় আপনাকে আপনি জানে না, সে তোমাকেও জানিতে পারেনা। শরীর, মন, আত্মা এই তিনের সমষ্টি মানব। স্থূলদর্শী, "দেহাত্মবুদ্ধি"তে প্রথমে শরীরকেই "আমি" বোধ করে। এই অবস্থায় মানুষে কেবল আহার নিদ্রাদি শরীর-চেষ্টাই প্রধান লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উন্নত মানুষ, মনকে আমি বোধ করে। এ অবস্থায় বুদ্ধির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে উন্নত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ আত্মা এবং হে পরমাত্মা! তোমার ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। প্রভু! আমরা যে ভারতীয় আর্য্যঋষিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এ কথা কেন ভুলিব? আমরা তাঁহাদিগের এবং জগতের সকল সাধু মহাজনগণের পদানুসরণ করিয়া যাহাতে সারধন "আত্মজ্ঞান" বা "ব্রহ্মজ্ঞান" লাভ করিতে পারি, যাহাতে সকলে তোমাকে জানিতে পারে তুমি আমাদিগকে এমত আশীর্ব্বাদ কর।

অন্বেষণ।

দিনের শেষে সন্ধ্যা যবে
নাম্‌ল ধীরে ধীরে,
আমি তখন বসে ছিনু
শূন্য নদীর তীরে।

হতাশ-মনে হতাশ প্রাণে
সুদূরে ওই আকাশ পানে
নয়ন রেখে মনের দুখে
ভাস্‌ছি আঁখি নীরে!

এম্‌নি সময় মধুর সুরে
বাজ্‌ল বাঁশী কার?
মধুর রবে ঝঙ্কারিয়া
উঠ্‌ল চারি ধার!
আমি তখন নয়ন মেলে
নয়নের জল মুছে ফেলে
নদীর পারে বনের ধারে
দেখ্‌নু বারেবার!

তুমি সখা লুকিয়ে গেলে—
তবুও বাঁশী বাজে!
খুঁজে খুঁজে হ'লেম সারা—
সারা বনের মাঝে!
পেলাম না'ক তোমার দেখা,
কপালে এই ছিলরে লেখা—
ঘরের পানে আকুল প্রাণে
ফিরিনু ভরা সাঁঝে!

এম্‌নি ক'রে খুঁজে খুঁজে
নিরাশ হ'য়ে যাই!
অর্ঘ্য দিতে তোমার পায়ে
আমার কিছু নাই!
আঁখি-ঝারি ভাসিয়ে দিয়ে
ভাঙা বুকের ব্যথা নিয়ে,
তোমার সনে মিল্‌ব কবে
ভাব্‌ছি বসে' তাই!

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৪৩। সর্ব্বশক্তিরন্তরাত্মা সর্চ্চভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্থঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যোগবাশিষ্ঠ ১৩।১১

যে ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তরাত্মাস্বরূপ ও সর্ব্বান্তর্গত অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ জানিয়া স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন পান।

৪৪। অন্তঃসংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃসর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব!॥

যোগ ১৯।৫২

হে রাঘব, হৃদয়ে সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী ও বাসনাশূন্য হইয়া, বাহিরে যাবৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর।

৪৫। অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

যোগ ১৯।৫৩

ইনি বন্ধু, ইনি পর, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এ গণনা করে, কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জগতের সকলেই আত্মীয়।

৪৬। গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ॥

যোগ ১৪।২০

সুসমাহিতচিত্ত এবং অহঙ্কার-দোষ-বিবর্জ্জিত গৃহস্থের গৃহই বিজন বনভূমি।

৪৭। অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি॥

যোগ ২৪।২২

যাঁহার মুখ অন্তর্ম্মুখীন হইয়াছে, তিনি নিদ্রিত হউন, জাগ্রত থাকুন, গমনই করুন, অধ্যয়নই করুন ; পুর, জনপদ, গ্রাম, অরণ্যের ন্যায় দর্শন করেন।

৪৮। অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটম্।
সক্তস্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ।

যোগ ২৬।৩

অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসারী হইলেও মুক্ত, আর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল তপস্যা করিলেও মায়াবদ্ধ।

৪৯। আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সঃ।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯।৩৩

যিনি বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেও ক্ষমা করেন এবং যিনি নিত্য ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী ও উত্তম পুরুষ।

(ক্রমশঃ)

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস।

বৈশাখের কুশদহতে পুনর্জন্মবাদ প্রবন্ধের শেষে "অপর পক্ষ বারান্তরে আলোচ্য" যে প্রতিজ্ঞা ছিল, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সম্যক্ আলোচনায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধের স্থানাভাব বশতঃ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে চেষ্টা করা হইল। এ প্রবন্ধ পুনর্জন্মবাদের প্রতিবাদ মূলক নহে। এজন্য ইহার নাম "পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস," দেওয়া হইল। মত বিশ্বাসগুলি আমার হইলেও প্রকৃতপক্ষে "আমাদের" বলা যায়। কেন না, ইহা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের আলোক নহে। ইহার পশ্চাতে অনেক উচ্চ সাধকগণের আবির্ভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধকের ভাবও যে কিছু নাই তাহাও বলা যায় না। তবে "আমাদের" বিশ্বাস বলিলে একটী সম্প্রদায়ের বা মণ্ডলীর বুঝায়, ফলতঃ দেখা যায় এক সম্প্রদায়ের বা মণ্ডলীর মধ্যেও এ বিষয় বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে। এজন্য "আমার" বিশ্বাস বলাই নিরাপদ বিবেচিত হইল। অন্যথা ব্যক্তিগত 'আমিত্ব' প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু সত্যের একটী কণাও পরিত্যাজ্য বা অহিতকারী নহে।

আমার এই অর্দ্ধ শতাব্দীর জীবনকালে বিশেষতঃ বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, তাঁহার যে সকল করুণার পরিচয় পাইয়াছি;—বিবেক, বিশ্বাসের পথ পাইয়াও আবার কি জানি কেন, সময় সময় যে দিকে যাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহার ভিতর হইতেও যদি তিনি মঙ্গলে পরিণত না করিতেন, তবে কেবল আমার বুদ্ধি ও সাধন বলে আজ শান্তির পথ লাভ করা কখন সম্ভবপর হইত না। এইরূপে তাঁহার নিগূঢ় করুণার যাহা কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার হইয়াছে, যে মৃত্যুর পর আর এইরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে এই জগতে আমার জন্ম হইবে না। কেবল বিশ্বাসের কথা তত প্রামাণ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে জ্ঞানগত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব।

মৃত্যুর পর এই দেহ এবং জাগতিক অবস্থার সহিত আমার আত্মার যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হওয়া আবশ্যক। সে কিরূপ ভিন্নতা সম্ভব্য তাহা প্রথমে আলোচ্য।

অনিত্য দেহ এইখানে গেল, অমর আত্মা রহিল, (কিরূপে রহিল তাহা পরক্ষণেই প্রকাশ পাইবে) আত্মা জ্ঞানবস্তু,—ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, সুতরাং তাহা অশেষ, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তির শেষ হইল বলা একেবারেই অসম্ভব, পরন্তু আত্মার উন্নতি চাই। উন্নতিও সাধন ব্যতীত লব্ধ নহে। দেহ ভিন্ন সাধন কিরূপে সম্ভব? যাহা কেবল আত্মা তাহা পরমাত্মা। সর্ব্বকালে জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রিত। যখন স্থূল দেহধারী হইয়া আত্মা থাকে, তখন দেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মা থাকে না, কিন্তু আত্মশক্তির আশ্রয়ে দেহ বর্ত্তমান থাকে। আত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা পূর্ণ, যিনি পূর্ণ তাঁহার সাধনের প্রয়োজন নাই। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ হইলেও জীবাত্মা অপূর্ণ, অপূর্ণ পূর্ণতাকে চায়, এই আকাঙ্ক্ষার অবস্থার নাম সাধনকাল। পূর্ণ বস্তু এক অদ্বিতীয়, দুইটী পূর্ণ হয় না। অপূর্ণ সসীম, দেশকালের অধীন। যদি বল অদেহী আত্মা দেশ কালের অধীন হইবে কেন? দেহই ত দেশ কালের অধীন! তাহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা স্থূল দেহে অবস্থান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করে, এজন্য দেশকালের সংস্কার তাহার থাকে। পূর্ণজ্ঞান দেশ কালকে জানেন, কিন্তু দেশকালে বদ্ধ নহেন। ফলতঃ সাধনাবস্থায় দেহ, জগত বা জগমণ্ডলী, অর্থাৎ আমার ন্যায় দেহধারী আরো বহুজীবের বিদ্যমানতা আবশ্যক।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ গেলে আর দেহ থাকে না ইহা কে বলিল? দেহ ত একটী নয়। "স্থূল", "সূক্ষ্ম" এবং "কারণ" শরীর বা আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম দেহ যে কত আছে, তাহা বলা সহজ সাধ্য নহে। কেবল তাহা নয়, এ জগতে যত আত্মার সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ ঘটিয়াছে তাহারও পূর্ণতাসাধন চাই। এ জগতে কতটুকু উন্নতি হয়? সাধু মহাত্মাদিগের সহিত বা আত্মীয় সম্বন্ধে যে সকল আত্মার সহিত এ জগতে সংযোগ মাত্র হইয়াছিল যাহা কত অতৃপ্তভাবে বিচ্ছেদ হইয়াছে যাঁহা কেবল মোহাচ্ছন্ন ভাবে অবসান হইয়াছে তাহার সম্বন্ধ পবিত্র এবং পূর্ণতা সাধন কি হইবে না?

উন্নতিসাধন যদি কেবল এই জরা মরণশীল জগতেই বার বার ঘুরিয়া সাধন করিতে হয়, তবে ক্রমোন্নতির অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। এজন্য ক্রমোন্নতি অর্থে দেহ, মন, আত্মার সকল প্রকারেই উন্নতিশীলতার অবস্থা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ভগবানের অপার করুণায় ইহার কিছুই অসম্ভব মনে

হয় না। ক্রমোন্নতির জগত, এ জগতের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা জরা মরণশীল হইবে কিম্বা তথায় আত্মার সম্বন্ধ পার্থিব ভাবে বদ্ধ থাকিবে ইহাও বলা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক আত্মায় আত্মায় পবিত্র ঈশ্বরীয় সম্বন্ধই অনুভূত হইবে। পক্ষান্তরে এই জগতে ক্ষুধাতৃষ্ণা, জরা ব্যাধিশীল, ভৌতিক দেহে, বার বার জন্ম মরণরূপ চক্রে পরিবর্ত্তন,—একই বাল্য যৌবনাদি অবস্থায় বার বার পুনরুক্তির লীলা; এজগতে যে সকল পরীক্ষা অনিবার্য্য, বার বার তাহার মধ্যেই পড়িতে হইবে, এসকল স্বাভাবিক বোধহয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ লীলায় কথিত আছে "ভগবান পুনঃ পুনঃ একই লীলা করেন (বা করান) না,—বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর আর বৃন্দাবনে আসেন নাই।" যাহা হউক হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্বে "মুক্তিতত্ত্বে" বা "যোগতত্ত্বে" মুক্তাত্মার স্থূল দেহনিবৃত্তির বিষয় পরিস্ফুট আছে।

সূক্ষ্মদেহ বস্তুটা কি এ তত্ত্ব যোগপথাবলম্বীর অবিদিত না হইলেও ইহা হয়ত অনেকের মনে দুর্ব্বোধ ব্যাপার হইতে পারে। এজন্য সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অন্তরেন্দ্রিয় রহিয়াছে, যেমন চক্ষের পশ্চাতে দর্শনেন্দ্রিয়। কেবল চক্ষের দ্বারাই তো দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয় না কিন্তু দর্শন শক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষের সাহায্যে স্থূল বস্তু দর্শন করে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ;—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শেন্দ্রিয়। ফলতঃ সমস্ত স্থূল অবয়বের পশ্চাতে সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ব আছে। দেহতত্ত্বও বিস্তৃত ব্যাপার সুতরাং একটু আভাস মাত্র দেওয়া হইল।

তৎপরে আর একটি আপত্তি এইখানে উঠিতে পারে; তাহা এই যে, উপরোক্ত স্থূলদেহ নিবৃত্ত-মত হইতে পারে তাঁহাদের সম্বন্ধে, যাঁহারা অজ্ঞান মোহময় জীবনের অবসানে, বিবেক, বৈরাগ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন বা দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব, ইহ জীবনে কেবল আহার নিদ্রাদির বশীভূত হইয়া পাশবভাবে নানা পাপাচার করিতে করিতেই যাহাদের জীবনাবসান হইল তাহারাও কি, আর স্থূলদেহে না আসিয়া ঐরূপ সূক্ষ্মদেহে উন্নতির সোপানে উঠিবে? তাহার উত্তর—

ঐই যে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ ইহজগতে কাজ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কোন সময় এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন "কর্ম্ম, অনিত্য মায়ার খেলা

মাত্র" বস্তুতঃ দেখা যায়, আজকার কর্ম্ম কা'ল থাকে না, পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মসকল আজ কোথায়? প্রবাহের ন্যায় কর্ম্ম আসিতেছে আর চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহা অস্থায়ী তাহাই অনিত্য। আর এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন, "কর্ম্মই আমার গুরু, কর্ম্মই ব্রহ্ম!" ইহাতে দেখা যায় কর্ম্মের বাহ্য সংযোগ বিয়োগ প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে বটে কিন্তু তাহার ভিতরকার ভাব (কাহারও পক্ষে অল্প বা অধিক হউক) আত্মায় সংগৃহীত হইতেছে, তাহাকেই জ্ঞানের বীজ বলা যায়। এই সম্বন্ধে দুই একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

অজ্ঞানতার মূল কি এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে—দেহকেই "আমি" এবং তৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু "আমার" বলিয়া তাহাতে আসক্ত এবং অভিমানযুক্ত থাকে ততক্ষণ বা ততকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানী পদবাচ্য। কিন্তু কর্ম্মজগত নিয়ত মানুষের অভিমান এবং আসক্তিতে আঘাত করিতেছে। মানবাত্মার গঠন এমনই যে, সে অনিত্য লইয়া চিরকাল থাকিতে পারিবে না। মৃত্যু পুনঃ পুনঃ মানবের কাল্পনিক ঐহিক-সুখ-রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে। প্রতিবাসীর প্রিয় বিয়োগ দেখিয়া যে চিন্তা সাধারণভাবে ভাসা ভাসা রকমে ছিল, তাহা নিজ প্রিয় (স্ত্রী পুত্রাদির) বিয়োগে আরো গভীর হইল; তৎপরে যখন নিজ দেহ পর্য্যন্ত গেল, তখন কি আত্মার একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হয় না? মায়া বা কামনার মূল দেহ, সেই দেহই যখন গেল তখন কি মানবাত্মার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না? যদি বল "কেবল দেহ নাশেই কি জ্ঞান লাভ হয়? এজগতে কত লোকের প্রিয় বিয়োগ হইতেছে তাহাতেও ত তাহাদের জ্ঞান হইতে দেখা যায় না।" জ্ঞান যে অতি সুদুর্লভ বস্তু, সে যে বহু তপস্যার লব্ধধন তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃত্যুতে দিব্য পরিপক জ্ঞানলাভ নাও হইতে পারে, কিন্তু নিত্যানিত্য বিবেকই যে জ্ঞানের প্রথমাবস্থা ইহা সত্য। যে অবস্থায় মানুষ নিত্য বস্তু কি, আর অনিত্য বস্তুই বা কি, ইহার বিচার করিতে অবকাশ পায়, যদ্দারা নিত্য বস্তুর আভাস মাত্রও চিত্তে প্রতিফলিত হয়, সেই অবস্থাও জ্ঞানলাভের অনুকূলে যায়। তৎপরে সাধন, সৎসঙ্গ, ধর্ম্মের আদর্শদর্শন এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপায় ক্রমোন্নতি হয়।

মানুষ সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা আপনার দেহকেই অধিক ভালবাসে সুতরাং সেই দেহ নাশ বা মৃত্যু যে একটী বিশেষ অবস্থা, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। জ্ঞানীগণ তাই মৃত্যুকে প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন। অজ্ঞানীর নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা কোন কোন স্থলে ভয়াবহ হইলেও শেষাবস্থা ভয়ানক থাকে না। যাহা হউক মৃত্যু, মানবাত্মার পরিবর্ত্তনের হেতু তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যুর পর আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতেই আসিতে হয়, এই মতের একটী প্রধান যুক্তি কর্ম্মফলবাদ। অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের স্থান এই পৃথিবী, সুতরাং দেহধারী হইয়া এখানে না আসিলে কর্ম্মের ফলভোগ কিরূপে হইতে পারে। এখন এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আজকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব।

একথা কে না স্বীকার করিবেন যে, সকল মানুষই অল্পাধিক পাপী। মানুষের পক্ষে ইহা নিতান্তই অসম্ভব যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেহ নিষ্পাপ থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ভগবান পূর্ণ ন্যায়বান, তিনি কাহারও একটী পাপ উপেক্ষা করিতে পারেন না। তবে পাপের দণ্ড ভোগের শেষ কোথায়? এই জন্যই বুঝি বা এদেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে কত শত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে তবে যদি মুক্তি হয়। মুক্তির আশা যেন মানুষের সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। নিরাশায় অঙ্গ ঢালিয়া সংসার স্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে বরং ভক্ত বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হরিনামে অচিরে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, এ বিশ্বাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে বা ভক্তির বিধানে উজ্জ্বল হইয়াছে।

তৎপরে কোন কোন সম্প্রদায় বা সাধক শ্রেণীর মধ্যে সাধনের বল এবং পুরুষকার অধিক মাত্রায় স্বীকৃত হইলেও অবশেষে ভগবৎ কৃপা ভিন্ন যে মুক্তি হইতে পারে না, একথা বোধ হয় কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাত্মা বুদ্ধও ছয় বৎসরকাল কঠোর সাধনার পর যখন অবসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি স্বভাবের উপর, (আত্মশক্তির অতীতাবস্থার উপর), আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। মানুষ যে কেবল জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলেই মুক্তিলাভ করিবে তাহা কখন সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে শত সহস্র বৎসর দুষ্কর্ম্মের ফল, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের পাপের সীমা আছে, ঈশ্বরের করুণার শেষ নাই।

ঈশ্বর যেমন ন্যায়বান, দণ্ডদাতা-বিচারপতি রাজা, তেমনি, দয়াল করুণাসিন্ধু ক্ষমাশীল ভক্তবৎসল। কর্ম্মফল অনিবার্য্য ইহা সত্য হইলেও অপরাধের ক্ষমা আছে ইহাও সত্য। মানুষ যখন অনুতাপী হয় তখন ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। পাপ বোধ হইতে অনুতাপের উদয় হয়। মানুষের মধ্যে নিত্য ও অনিত্য বস্তু রহিয়াছে, মৃত্যুর দ্বারা যখন অনিত্যত্বের জ্ঞান বা বিষয়বৈরাগ্য উজ্জ্বল হয়, তখন অভিমান অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থায় পাপ বোধ জন্মিয়া থাকে। ক্ষমার শাস্ত্র, মহা শাস্ত্র। শত অপরাধী হইলেও যখন সে ক্ষমার প্রার্থী হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব পাপ সমস্তই মুছিয়া যায়। জগাই মাধাই অশেষ অপরাধী ছিল, কিন্তু অনুতাপী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। মানুষ মানুষের নিকট যে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে ঈশ্বরের ক্ষমা কত শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বজগৎ ও মানব মণ্ডলীর সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং পিতা, তিনি জানেন তাঁহার সন্তানগণ কতক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। মানব মাত্রেই অপূর্ণ। অপূর্ণ মানবে পাপ ত্রুটী অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দয়াল পিতা পূর্ণস্বরূপ, মানব আত্মাকে আত্মদান করিয়া মুক্তির পথে,—অনন্ত উন্নতির পথে লইবার ব্যবস্থা যদি তিনি স্বয়ং না করিতেন তবে মানবের মুক্তি কোন কালে সম্ভবপর হইত না। হে মানব! সেই দয়াল পিতার অনুগত হও। তখন করতলস্থ আমলকবৎ মুক্তি দৃষ্ট হইবে।

আমরা এতদূরে আসিয়া দেখিলাম, মৃত্যুতে স্থূলদেহ গেলেও আত্মা সূক্ষ্ম দেহে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম-জগ-মণ্ডলীর সহিত উন্নত হইবে ইহা অসম্ভব নহে। যাহারা ইহজগতে মায়া-মোহাচ্ছন্নাবস্থায় নানাবিধ পাপ করিতে করিতেও দেহত্যাগ করিতেছে, তাহাদের দেহনাশই মোহনিদ্রাভঙ্গের হেতু হইয়া যথাসম্ভব উন্নতিপথে গতি হওয়াও অসম্ভব নহে। বারম্বার জন্মমরণরূপচক্রে এই জগতেই ঘুরিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানের উন্নতি হয় নচেৎ আর কোন উপায়ে হয় না, তাহা নহে; অনুতাপীও ক্ষমা প্রাপ্তিতে দুষ্কৃত দূরে সক্ষম হয়। কেবল সাধন ও পুরুষকারেই মুক্তি লব্ধ, ভগবৎ কৃপার কোন প্রয়োজন হয় না তাহা নহে; কিন্তু কৃপা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় না। পক্ষান্তরে পুনঃ পুনঃ এই জগতে জন্মমরণ দ্বারা তবে মুক্তি হয়—এই মতে, বার বার বাল্য যৌবনাদি একই অবস্থাভোগে ঈশ্বরের অনন্ত উন্নতিশীলতায় কিছু থর্ব্বভাব উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দয়া, করুণা এবং ক্ষমার পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের প্রাধান্য

স্বীকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিতত্ত্বে কর্ম্মের গরিমা একেবারে অস্বীকৃত হইয়া, কৃপাই সিদ্ধির উপায় স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং আমার নিকট ঈশ্বরস্বরূপের সহিত, সাধনশীলতার সহিত, "অনন্ত ক্রমোন্নতির" মত প্রিয় এবং সঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই জগতেই জন্মান্তরবাদ কাল্পনিক, বুদ্ধির বিচার বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা একান্ত প্রাচীনবাদী তাঁহাদের যদি এ মত অপ্রিয় বোধ হয় তবে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র এবং গুরুতে শ্রদ্ধা রাখিয়াও স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতের পক্ষপাতী তাহাদের চিন্তাপথে যদি কোন ভাবের সঞ্চার হয় এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ লিখিত হইল। অবশেষে এই প্রবন্ধে আর একটি তত্ত্ব চাপা রহিল তাহা এই যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহে উন্নতি সম্ভব হইলেও এই বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে সকল মানুষ কিরূপ অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্ম আছে কি না, যদি না থাকে তবে মানবের এমন বিভিন্ন অবস্থা কি জন্য হয়? এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচ্য।

কুশদহ। (৬)

খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদারতা—গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা গ্রামে রতন সেন নামক এক ব্যক্তি নিজ বাটীর একটী গৃহে কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত গোপনে জুয়াখেলা করিতেন। এই সংবাদ গোবরডাঙ্গার জমীদার খেলারাম বাবু কোন লোকের মুখে শুনিয়া রতন সেনকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুই জন পাইক পাঠাইয়া দেন। রতন সেন সে সময়ে যাইতে অস্বীকার করায় পাইকদ্বয় বলপূর্ব্বক রতনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রতন সেন ক্রোধে অধীর হইয়া পাইকদ্বয়কে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহারা রতনের সমস্ত বিবরণ জমীদারের নিকট বলিল। খেলারাম বাবু এই ঘটনায় নিজেকে অবমানিত মনে করিয়া চারি জন উপযুক্ত লাঠিয়ালকে হুকুম দিলেন যে "এই দণ্ডে রতন সেনকে আমার নিকট হাজির কর" আজ্ঞামাত্র লাঠিয়ালেরা রতন সেনের বাটীতে যাইয়া জমীদারের হুকুম জানাইল। রতন সেন একখানি তরবারি আনিয়া তাহাদিগকে বলিল "যে আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে কাটিব।" লাঠিয়ালেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জমীদারের নিকট সমস্ত

বিবরণ বলিলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া সামান্য একটী লোক দ্বারা ঐ পত্রখানি রতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাইবামাত্র রতন সেন জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন! জমীদার বাবুকে কিছু টাকা প্রণামী দিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় খেলারাম বাবু বলিলেন "কি রতন; এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" এই কথা শুনিয়া রতন নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল "রতন কি তার কোন উপায় স্থির না করিয়া আসিয়াছে?" এই বলিয়া রতন জামার মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ভোঁজালে বাহির করিয়া বলিল "আপনার হুকুম দিবার পূর্ব্বেই আমি ভোঁজালে দ্বারা নিজে আত্মহত্যা করিব।" খেলারাম বাবু বলিলেন "কেমন তোমার ভোঁজালে দেখি।" রতন বিনা বাক্যব্যয়ে ভোঁজালে খানি জমীদারের হস্তে দিলেন। তখন খেলারাম বাবু বলিলেন "এইবার তোমাকে কে রক্ষা করে?" রতন তখন বলিলেন "এখনও আমার দুই খানি হাত আছে!" রতনের এই কথা শুনিয়া খেলারাম বাবু রতনের সাহসের প্রশংসা করিয়া তাহাকে ভোঁজালে খানি দিলেন এবং "জুয়াখেলায় লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়" এই উপদেশ দিয়া রতনকে ছাড়িয়া দিলেন। রতনও জমীদারের নিকট স্বীকার করিল যে আর সে জুয়াখেলা করিবে না।

ইহা কি খেলারাম বাবুর কম উদারতার পরিচয়! যে খেলারাম বাবু কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি ইচ্ছা করিলে রতনের এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় সাহসী ও মানী ব্যক্তির হৃদয় উপলব্ধ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।

খেলারাম বাবুর দুই স্ত্রী—শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর গর্ভে কালীপ্রসন্ন ও শ্রীমতী আনন্দময়ীর গর্ভে বৈদ্যনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর জন্ম সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল;—

খেলারাম বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সন্তান না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণা অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে কালীমাতার একটী ঔষধ ধারণ করিতে বলেন। এই ঔষধ ধারণের ফলে একটী পুত্র

সন্তান লাভ করিলেন সেই পুত্রের নাম সেই জন্য কালীপ্রসন্ন রাখিলেন। এবং কালীমাতার প্রসাদে পুত্ররত্ন লাভ করায় ১২২৯ বঙ্গাব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কালীমন্দির স্থাপন করেন। এই কালী বাড়ীর নাম প্রসন্নময়ী বা আনন্দময়ীর বাড়ী রাখা হইল।

এই জমীদার বংশের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের একটী বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের বংশাবলীর পরিচয়।

কাক
ধাঁধু বা সাধু (মুকুট খ্যাত)
জলাশয়
সুরেশ্বর বা প্রাণেশ্বর
বাণেশ্বর
গুঁই
মাধবার্য্য
কোলাহল
উৎসাহ (বল্লালকৃত প্রথম কুলীন)
মহাদেব (খড়দহ মেল)
আয়িত (ফুলেমেল)
ঈশ্বর
বিশ্বেশ্বর
গঙ্গা
গোবিন্দ
ভব
ধৃত
কৃষ্ণ
মহেশ্বর
বসু
বল
হরি ওঝা
দিগম্বর
যোগেশ্বর
কামদেব
মুকুন্দ
শঙ্কর
জানকীনাথ
রুক্মিনী
শত্রুঘ্ন
কমলা
ত্রিবিক্রম
অনন্ত
বলভদ্র
রামভদ্র
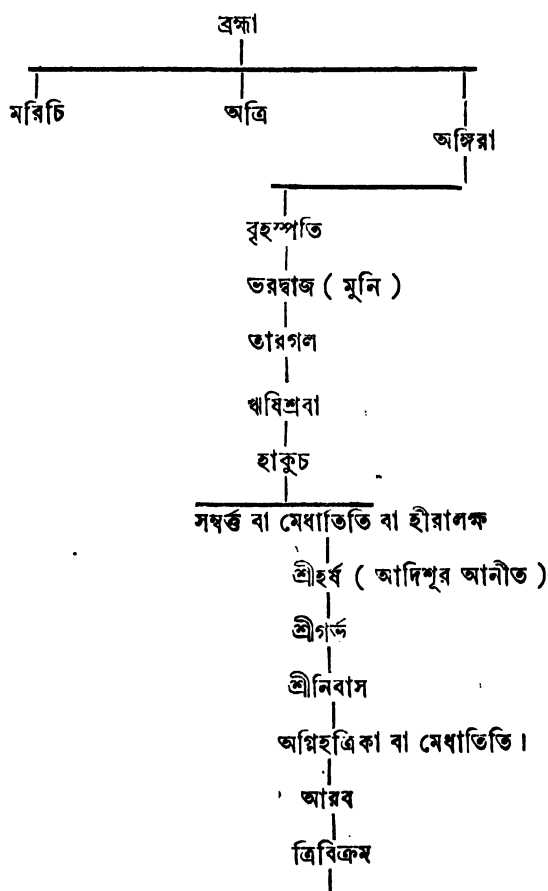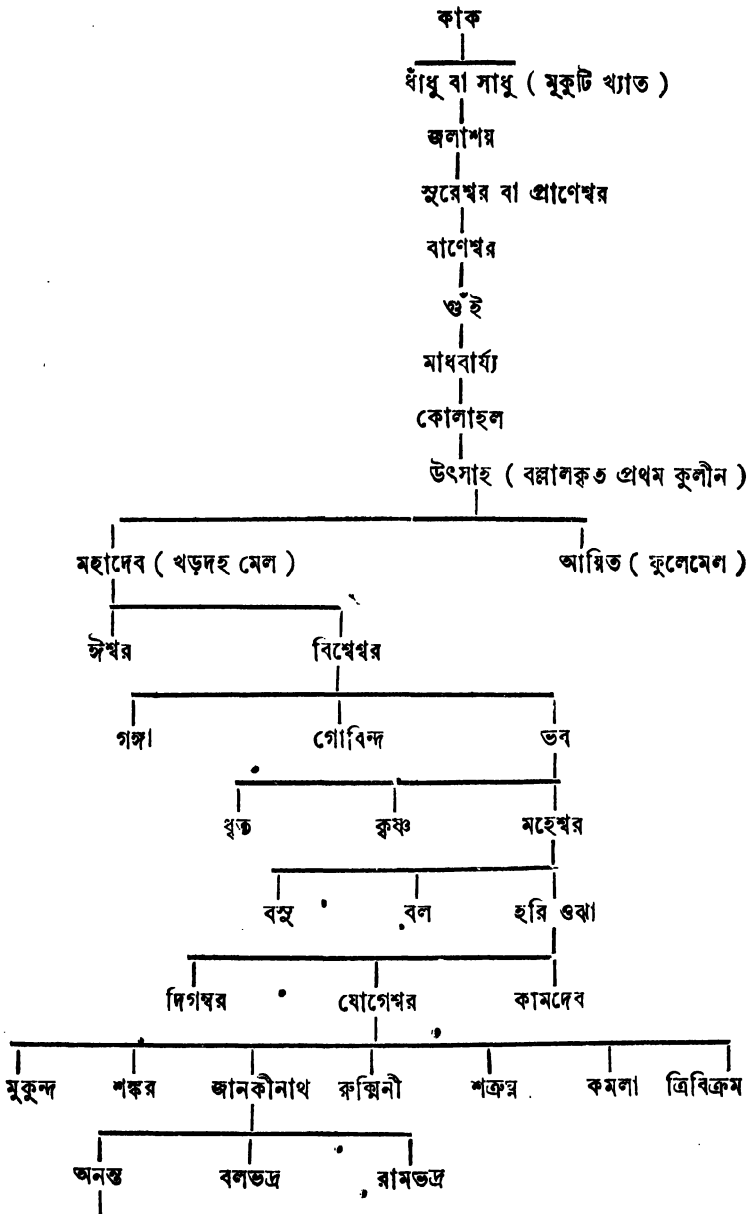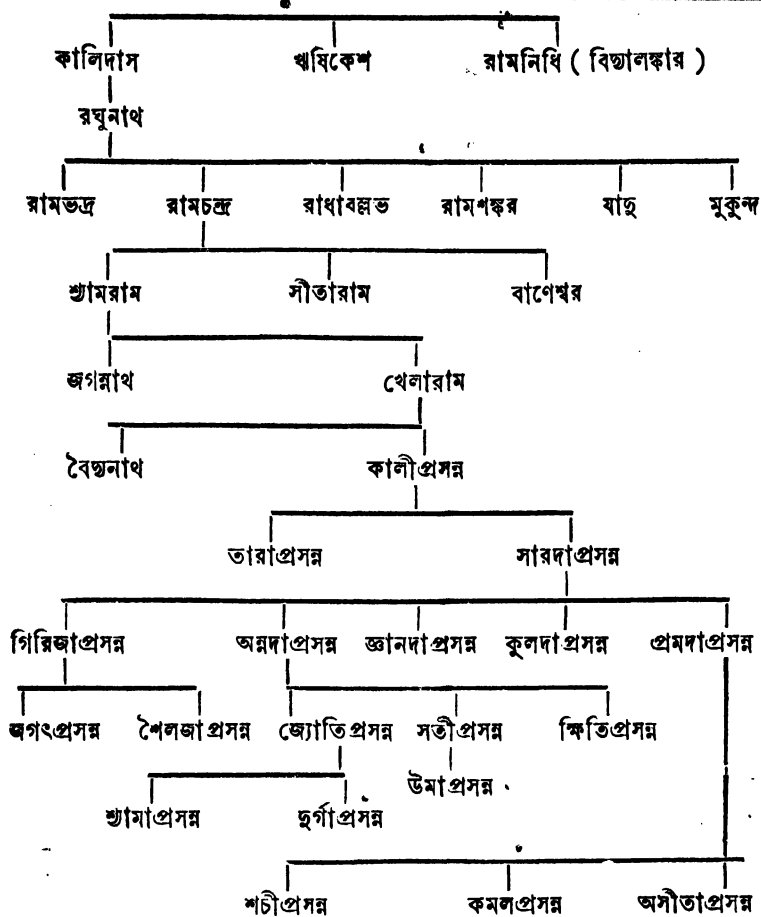
প্রসন্নময়ী অর্থাৎ কালীমাতার প্রসাদে কালীপ্রসন্ন বাবুর জন্ম হওয়ায় সেই হইতে তাঁহার বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির নামের শেষে "প্রসন্ন" এই কথা সংযুক্ত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈত্যদ্বারা স্থানীক স্পর্শলোপ করিয়া বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রচিকিৎসা করা হইয়া থাকে। শৈত্য প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করিলে অস্ত্রের ক্লেশ অনুভব হয় না, রক্তপাত কম হয়; প্রদাহাদিও তাদৃশ হইতে পারে না। ক্লোরকর্ম প্রভৃতি ব্যাপ্ত স্পর্শহারকে যে সকল ভয় আছে, ইহাতে তাহা নাই। শরীরের যে কোনও স্থানে কিছুক্ষণ বরফখণ্ড ধরিয়া রাখিলে ঐ স্থানের স্পর্শলোপ হইয়া থাকে। বরফচূর্ণ ২ ভাগে সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রমধ্যে পুটলিকরতঃ শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে ঐ স্থানের স্পর্শলোপ হয়। যদি ঐ স্থানে প্রদাহ থাকে তবে ৮।১০ মিনিটকাল সময় লাগে, কিন্তু প্রদাহ না থাকিলে ২ মিনিটের মধ্যে স্পর্শলোপ হইয়া থাকে। ডাক্তার জেমস্ আর্ণট্ এই প্রকরণ সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। এই উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হয়। স্পর্শলোপ হইলে আর অধিককাল উক্ত স্থানে শৈত্য প্রদান করা উচিত নহে। অত্যাধিক সময় ও অত্যাধিক পরিমাণে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রযুক্ত স্থানের টিসু সকলের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ ঐ স্থান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

শীতল জলে স্নান করিলে শরীর সবল হয়। অবগাহন সময়ে দেহ পবিত্র ও মন প্রফুল্ল বোধ করিলেই আর জলে থাকা উচিত নহে। এতদতিরিক্ত সময় জলে থাকিলে বিপরীত ক্রিয়া দর্শায়। মোটামুট বুঝিতে গেলে হস্ত পদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই জল হইতে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বিধি পূর্ব্বক শীতল স্নানের ফল শীঘ্রই প্রকাশ পায়। ইহাতে শরীরের ভার বৃদ্ধি, দেহের লাবণ্য ও বর্ণ পরিস্কৃত, পেসী সকল সুদৃঢ় এবং স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য দূর হয়। অতি শিশু, অতি বৃদ্ধ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির শীতল স্নান হিতকর নহে। তাহাদের পক্ষে শীতল জলে গাত্র মার্জ্জন (cold sponging) বিশেষ উপকারী। অল্পক্ষণের জন্য শরীরে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু শৈত্য প্রয়োগ অপসৃত হইলে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া

শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক অপেক্ষাও ভাল হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Reaction অবস্থা বলে। অচৈতন্য রোগীর মুখে সজোরে শীতল জলের ছাট দিলে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করে। সুরাপান দ্বারা অভিভূত ব্যক্তির, অথবা অহিফেনাদি বিষ ভোক্তীর এই প্রকারে অনেক সময় চৈতন্য সম্পাদিত হয়। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ হইলে শৈত্য প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। একটী পাত্রে গরম জল ও অপরটীতে শীতল জল রাখিয়া শিশুকে অল্পক্ষণের জন্য উষ্ণজলে রাখিবে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই শীতল জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিবে। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিবে। শীতল জল লাগিবা মাত্র শিশু হাঁপাইয়া উঠে ও শ্বাসগ্রহণ করিতে থাকে। শৈত্য প্রয়োগই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পরে জলের শৈত্য কমিয়া যায়, এই জন্য গরম জলের আবশ্যক হয়; নতুবা এ স্থলে উহার কোন উপকারিতা নাই। ভিয়েনা ও বার্লিন নগরস্থ চিকিৎসালয়ে ওলাউঠা রোগে কেবলমাত্র বরফ খাইতে দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা পিপাসা দমন হয় এবং শীঘ্রই পুনরুত্তেজন প্রকাশ পায়। রস্‌সাহেব কৃত ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিসূচিকা রোগ চিকিৎসার তালিকা দৃষ্টে জানা যায় শুদ্ধ বরফ বা শীতল জল দ্বারা ঐ রোগের চিকিৎসা করিয়া মৃত্যুর হার অনেক কম হইয়াছে।

শরীরে অধিকক্ষণ শৈত্যপ্রয়োগ করিলে সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ উপস্থিত হয়; ইহার আর পুনরুত্তেজন হয় না। এই অবসাদন ক্রিয়া দ্বারা জীবনী শক্তি নষ্ট হয়, শরীরে আলস্য বোধ হয় এবং শীঘ্রই নিদ্রাবেশ হয়। কখন কখন ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। উত্তেজনা দমন করিবার জন্য শৈত্য প্রয়োগ করিতে হইলে অত্যবসাদন না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির জীবনী শক্তি স্বাভাবিক ক্ষীণ থাকে, এ জন্য তাহাদের বিশেষ সাবধানে শৈত্য প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার,
গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৮)

১৯শে কার্ত্তিক সোমবার সমস্ত দিন নিয়মিত কার্য্যের ভিতর দিয়া ঋষিকেশের আনন্দভাব সম্ভোগ করিলাম। রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া বসিলাম স্বামীজিরা তখনও নিদ্রিত আছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে আমার প্রাণে কি এক ভাবের স্রোত আসিতে লাগিল। তাৎকালিক অবস্থার বিষয় যাহা "ডায়েরী"তে লেখাছিল তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি, "ধন্য ঋষিকেশ! ধন্য হইলাম, আজ তত্ত্বের প্রকাশ হইল, ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হইল, অদ্বৈতবাদের'ও মীমাংসা হইল। আজ নূতন দৃষ্টি লাভ হইল। পরিপূর্ণ আনন্দ! পরিপূর্ণ আনন্দ!"

স্পষ্ট বুঝিলাম ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটী অবস্থা আছে, অপরের মুখে শোনা জ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অতিশয় প্রভেদ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা সাধকের হইলে, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজর, অশোক, অভয়, অমরত্ব ভাব হয়। তাঁহাকে পাইলে পাইবার অবশেষ কিছুই থাকে না। অমৃত পান করিলে জলের পিপাসা হয় না। তখন জ্ঞান এতদূর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, তাহাতে পরিষ্কার বুঝিলাম, এ সংসারে ভয় ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, যাহা হয় তাহা কেবল মোহ মাত্র। সে হৃদয়ানন্দদায়িনী জ্ঞানের নিকট একটিও দুঃখের অভিযোগ টিকে না। তৎপরে ইহাও বুঝিলাম, স্বামী শঙ্কর-পন্থি পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক আবিলতা সত্বেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি আদর্শ আছে। সেটা ঐ অজর, অমর, ভাব।

তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনন্ত উন্নতির বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, "ব্রহ্ম কি সসীম স্থূল বস্তু যে, তাঁহা পাইলে, তাঁহার প্রাপ্তির সমস্ত শেষ হইয়া গেল? ব্রহ্ম অনন্ত সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও অনন্তকালে হইবে।" এই প্রকার একটা মত লইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট তাঁহাদের মধ্যে যেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির স্পষ্ট আদর্শের অভাব বোধ হয়। এই সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একটী প্রার্থনার কথা আমার মনে আসিল। তিনি একটী প্রার্থনায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভাব আছে। "হে ভগবান! কেবলই কি, সাধন করিব, সিদ্ধির কি কোন অবস্থা নাই? যে অবস্থায় পাপ অসম্ভব হয়ে যাবে।" ইত্যাদি।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা পূর্ণ ভাবাপন্ন, সাম্যাবস্থা, সংসারাসক্তির অতীত ভাব। অপূর্ণ, আসক্তভাব, আর পূর্ণ অনাসক্তভাব, এইখানে ইহার প্রভেদ।

এতদিন সাধনক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্ব ও ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, আজ যেন তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, এমন কত কথা কতবার আলোচনা করিয়াও যাহার গুরুত্ব এমন অনুভব করি নাই। আজ সেই অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজর, অশোক, অভয় অবস্থা অন্তরে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"

(যে সময়ে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয় তখনই জীব অমর হয়) এই শ্রুতির সহিত হৃদয়ের ভাবের সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়া গেল। ডায়েরীতে শেষ কথা লেখা ছিল "ধন্য হলাম, ঋষিকেশ আশা সার্থক হইল।"

২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার। চলিয়া আসিবার একটী সুযোগ হইল, এবং মনে এই ভাবও আসিল যে, "উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে তথায় আর থাকিতে নাই।" এদিকে স্বামীজিরাও বলিলেন, "আপনার যাইবার এমন সুযোগ হইতেছে, আপনি কি যাইবেন?" আমি বলিলাম, আপনাদের সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু উপস্থিত আমার যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। তখন তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলাম, তাঁহারাও গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বিদায় দিলেন।

এই দিবস একটী যুবক এক্কা গাড়িতে ঋষিকেশ হইতে হরিদ্বার আসিতেছিল, ঐ যুবক আমার পূর্ব্ব পরিচিত কোন বন্ধুর ভ্রাতষ্পুত্র, সুতরাং তিনি আমাকে তাঁহার গাড়িতে আসিতে অনুরোধ করিলেন, ইহাই আমার আসিবার সুযোগ। প্রাতেঃ আমাদের গাড়ি ছাড়িল, বেলা ৯টার পর লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়া আমি ঐ গাড়ি ও সঙ্গ ছাড়িয়া দিলাম। তখন আমার সে অবস্থায় আসিতে আর ইচ্ছা হইল না।

নির্ম্মল স্রোতস্বতী ঝরনায় স্নান, মন্দিরে ভোজন এবং বিশ্রাম করিয়া, আপন ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া সন্ধ্যার সময় কংখল সেবাশ্রমে আসিলাম।

সেবাশ্রমে রাত্রিকালের ধ্যানে মনে হইল, জ্ঞানে যেমন অভেদভাবে ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভূত হয়, তেমন ভক্তিতেও ভগবানের দাস হইয়া, তাঁহাতে একান্তমুগ্ধভাবেও যোগ উপস্থিত হয়। ফলতঃ ভক্তির সরস সাধন ভজন,

ভগবত গুণানুকীর্ত্তন ও দাস্যভাবে সেবা (নরসেবা) পরমসুখকর অবস্থা; জ্ঞান ও ভক্তি একত্রে সাধন করিতে হইবে।

২১শে কার্ত্তিক বুধবার। কেবলমাত্র খুলনা হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র পাইলাম। মেয়েটী আসার সংবাদ স্ত্রীকে সহসা না জানাইয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য শিবনাথ ও জনার্দ্দনকে পত্র লিখিয়া ঋষিকেশ গিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; স্ত্রীর আজকার পত্রে বুঝিলাম তিনি তখন পর্য্যন্ত ঐ সংবাদ পান নাই; কিন্তু শিবনাথের কোন পত্র না পাইয়া ভাবিলাম তাইত! একটী জীব ভগবানের ঘরে আসিল, সে পক্ষে আমার অবহেলা করা কি উচিত? কিন্তু কি করিব? আমি যে এখন ১২০০ শত মাইলের অধিক দূরে আছি; ইচ্ছা করিলেই ২।৪ দিনে দেশে পৌঁছিতে পারি না। যাহা হউক ব্যস্ত হইলে কি হইবে, দেখা যাক্ ভগবান্ কি করেন। এই ভাবিয়া ইতিমধ্যে ধাঁ করিয়া একবার ডেরাডুন দেখিয়া আসা স্থির করিয়া, আহারান্তে ডেরাডুন যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে বেলা ৪টার পর ট্রেণ ছাড়িল। অল্প দূর গিয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া একটী ছোট সুড়ঙ্গের অন্ধকার পথে ট্রেণ চলিয়া গেল। তারপর পর্ব্বতোপরি বনাবৃত দৃশ্যের মধ্যে উত্তরাভিমুখে চলিলাম। কদাচ এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ও ষ্টেশন দৃষ্ট হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় ট্রেণ ডেরাডুন ষ্টেশনে পৌঁছিল, অল্প অল্প অন্ধকার অনুভূত হইল। ট্রেণযাত্রী জনৈক ঐ দেশীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালী বাবুরা করণপুরা থাকেন। করণপুরা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে; একার ভাড়া ॥০ আনা; কিন্তু আমার নিকট ॥০ আনা না থাকায়, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "মহারাজ! আজ রাত্রে আপনি মহান্ত মহারাজের গুরুদরবারায় থাকুন।" এমন কি তিনি আমাকে গুরুদরবারায় রাখিয়া এক ব্যক্তিকে কি বলিয়া গেলেন। এই ঘটনা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তারপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে একটী ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। ঘরটী ছোট কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর জোড়া সতরঞ্চ ও একখানি পুরু গালিছা পাতা ছিল। তদুপরে আর একখানা কম্বল পাতিয়া দিয়া আমার আসন এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষণ পরে কিছু খাদ্য (পুরী তরকারী ইত্যাদি) ও জল

আনিয়া দিল। সে ঘরে আর একটী সাধু ছিলেন, তাঁর বয়স বেশী নহে। যাহা হউক তাঁহার সঙ্গে বেশী কিছু কথা হইল না। আমি আহার করিয়া একটু পরে শয়ন করিলাম এবং সুনিদ্রা হইল। এখানে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল।

২২শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। প্রাতে করণপুরা চলিয়া গেলাম। প্রথমে আমার দেশস্থ আত্মীয়ের সন্ধান লইলাম, তাঁহার সহিত দেখা হইল না, তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার বাসা দেখিয়া, তৎপরে ব্রাহ্মবন্ধু ঈশানচন্দ্র দেবের বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল তিনি অতি সাধু প্রকৃতির সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি এত দূরে থাকিলে চলিবে না এখানে আসুন।"

আমি গুরুদরবারায় চলিয়া আসিলাম। স্নান আহার করিয়া উপরের গৃহে গিয়া মহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আপনার এখানে আমি সচ্ছন্দে ছিলাম, কিন্তু আমি বাঙালী, করণপুরাতে বাঙালী বন্ধুগণ আছেন, আমি যে কয়েকদিন থাকিব, তথায় থাকি এইরূপ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই আমি যাইতেছি। মহান্তজীর বয়স ৩৫ পঁয়ত্রিশের বেশী বোধ হইল না, অতি সুন্দর রাজকুমার তুল্য, অথচ শান্ত মূর্ত্তি। ইঁহারা চিরকুমার থাকেন, সুতরাং বিষয়-বিরাগী, কিন্তু ইঁহাদের রাজার ন্যায় সম্পদ ঐশ্বর্য্য, তথাপি তাঁহাতে কোন বিলাসিতার চিহ্ন লক্ষিত হইল না। পরিষ্কার সাত্ত্বিক ভাবের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উত্তমাসনে বসিয়া আছেন, আমার কথা শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, (হিন্দিভাষায়) "আপনি আর কতদূরে যাইবেন ?" আমি বলিলাম প্রভুজীর ইচ্ছা হইলে আমি 'অমৃতসর-গুরুদরবারা' দর্শন করিয়া, লাহোর হইয়া ফিরিব ইচ্ছা আছে। এই বলিয়া আমি মহান্ত মহারাজকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। আপনার কম্বলাসন লইয়া বাহির হইব, এমত সময় আমার পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিয়া, একটী কাগজের মোড়ক আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "মহান্ত মহারাজ আপনার জন্য ইহা দিয়াছেন।" আমি গ্রহণ করিয়া, পরে খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে ২৲ টাকা রাহয়াছে।

বেলা ৪টার মধ্যে করণপুরা চলিয়া আসিলাম। আমার দেশস্থ শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলাম। তিনিও সহসা আমাকে পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন, এবং নিজের

জীবনী সম্বন্ধে আমাকে অনেক গোপনীয় বার্ত্তা যেভাবে জানাইলেন, দুঃখের বিষয় তাহাতে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। পরদিন তিনি তাঁহার জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধুর সহিত হস্তী পৃষ্ঠে আমাকে লইয়া বেড়াইলেন, এবং এক মধ্যাহ্নে ভোজন করাইলেন। অধিকন্তু তিনি লাহোর যাত্রা কালীন, সপ্রেমে অনুরোধ করিলেন যেন, লাহোর গিয়া আমি তাঁহারই বাসায় যাই। সে জন্য তিনি তাঁহার লাহোরের ঠিকানা, আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি এখানে ঈশান বাবুর বাড়ী অতিথি হইয়া রহিলাম।

অতঃপর ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শের একবেলা ডেরাহূন রহিলাম। শুনিলাম ডেরাহূনের প্রকৃত নাম "দ্রোণাশ্রম," অর্থাৎ দ্রোণকা ডেরা। মুসুরী পর্ব্বতের ৭ মাইল নিম্নে রাজপুরা; রাজপুরা হইতে সমতল সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ৭ মাইল ডেরাহূন। এমন বিস্তৃত সমতল ভুমি দেখিয়া ইহাকে সহজেই দ্রোণ-ভুমি বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বিশেষতঃ এখানকার বায়ু অতিশয় বিশুদ্ধ। এখন এখানে গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান সেনানিবাস। আমি একদিন প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়া আমার এমন মনের অবস্থা হইয়াছিল যে অনন্যমনা হইয়া মুসুরী পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইতে ছিলাম, সে মধুময় বায়ুর আকর্ষণ আর ছাড়িতে পারি না, এমন সময় জনৈক ব্যক্তির কথায় বুঝিলাম যে, এ সময় ল্যাণ্ডোরাতে (মুসুরী পাহাড়ের একটী স্থানের নাম ল্যাণ্ডোরা) অত্যন্ত শীত। এত অল্প শীতবস্ত্র লইয়া তথায় আমার যাওয়া উচিত নহে।

ঈশান বাবুর বাড়ী পারিবারিক উপাসনা হইল। তাঁহার ছোট ছেলেমেয়েরা আমার নিকট গল্প শুনিয়া শুনিয়া আমার বাধ্য হইয়া পড়িল। আমি বেড়াইয়া আসিলে একটী ছোট ছেলে বলিত "মা! সাধু আসিয়াছেন।" প্রাচীন, ব্রাহ্মবন্ধু হরিনাথ দাস মহাশয় অতি শ্রদ্ধেয় মহৎ ব্যক্তি। তাঁহার বাসায় এক দিবস রাত্রিতে তিনি এবং তাঁহার দুই পুত্রের সহিত মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনা এবং আহারাদি করিলাম।

২৫শে—রবিবার প্রাতে ঈশানবাবুর বাড়ী সামাজিক উপাসনা হইল, তাহাতে বন্ধুবর সুরেন্দ্রবাবু ও মুকুন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি উপাসনার কার্য্য করি। উপদেশের ভাব এইরূপ ছিল—"ব্রহ্মসমাজেও কতকগুলি 'কুমার সন্ন্যাসীর' প্রয়োজন আছে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেশীয় ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান-

সহ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহারা এই জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন। আর কতকগুলি আদর্শ গৃহস্থ হইবেন, তাঁহারা সংসারধর্ম্ম করিয়া অনাসক্ত হইবেন, তবে আবার ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে।"

আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, আমি যখন টিকিট করিতেছি তখন সুরেন্দ্রবাবু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে আমার নিকট পাথেয় আছে কিনা, আমি বলিলাম আমার টিকিটের দাম আছে। ২—৪৫ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল। সন্ধ্যার সময় কংখল সেবাশ্রমে আসিলাম। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

রেণুকণা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। মূল্য আট আনা। ভেলুপুরা বেণারস সিটি গ্রন্থকর্ত্তার নিকট প্রাপ্তব্য। কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইয়াছে। একটি পারিবারিক ঘটনামূলক গল্প ও কয়েকটি শোকগাথা লইয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই—সুছায়া একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহাকে কে যেন "নানা বর্ণের মণিমাণিক্য বিভূষিত একখানি বিপণির ভিতর লইয়া গিয়াছে।" সেখানে অনেক সুন্দর 'পুত্তলিকা' ছিল; দর্শকগণ যথাক্রমে এক একটি করিয়া পাইলেন এবং সর্ব্বশেষ পুত্তলিকাটি সুছায়ার প্রাপ্য হইল। কিন্তু অপর একটি বালিকা সেই সুন্দর পুত্তলিকাটি হাত পাতিয়া চাহিল; সুছায়া কোনমতেই ইহা বালিকাটিকে দিতে পারিল না। একান্তভাবে চাহিয়া চাহিয়া না পাইয়া বালিকা খুব কাঁদিতে লাগিল। সুছায়া বিষম সঙ্কটে পড়িল—এমন সময় সুছায়ার মাতা আসিয়া "আচ্ছা আমাকে দাও, তোমাদের কেহই লইবে না" বলিয়া, সুছায়ার নিকট হইতে যেমন লইতে যাইবেন অমনি "স্বর্ণপুত্তলিটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল।" ইহার কিছুদিন পরে সুছায়ার শিশু কন্যাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা কোন মতেই বাঁচাইতে পারিল না।

পুস্তক খানি পাঠ করিয়া তেমন তৃপ্তি পাইলাম না। লেখিকা চাতুর্য্যের সহিত গল্পটি লিখিতে পারেন নাই এবং চরিত্রগুলিও ভালরূপে পরিস্ফুট হয়

নাই। কেবল অম্বার স্বার্থত্যাগ ও সুছায়ার মাতৃস্নেহ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুছায়ার এই কথাগুলি পাঠ করিলে যথার্থই মনে দুঃখ হয়—"ওগো কাকা বাবু! আমার কণা কেন এমন হয়েছে? আমি তাকে চাই আর কিছু নয়।" লেখিকার ভাষা ভাল।

কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে হৃদয়ের দুঃখের সহিত এইগুলি লেখা হইয়াছে। অতএব ইহার উপর সমালোচনা চলে না। "জাহ্নবী তীরে" কবিতাটি 'চলনসই'। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।　　　　বঃ

স্থানীয় সংবাদ।

পরীক্ষার ফল—আমরা গত বারে ম্যাট্রিকুলেসান্ পরীক্ষোত্তীর্ণ আর একটী ছাত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, সেটী খাঁটুরা এবং কলিকাতা কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজরাজ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখমলাল দত্ত, ওরিএণ্টেল-সেমিনারী হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন হয়দারপুর এবং কলিকাতা রাজবল্লভপাড়া নিবাসী পরলোকগত দুর্গাচরণ দের পুত্র শ্রীমান্ নিতাইহরি দে, পাটনা কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বিগত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিচারে দণ্ড।—বিগত ৬ই মে বারাসাতের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর এজলাসে একটী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে। মোকদ্দমার বিষয় এইরূপ ছিল,—বিগত চৈত্র মাসে গৈপুর ওলাবিবিতলার মেলার সময় স্থানীয় জমিদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মৈত্র হস্তী পৃষ্ঠে মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া গৈপুরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে লোক মেলায় তোলা তুলিতেছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দেন এবং চারুবাবুর প্রতি অপমান সূচক শব্দ প্রয়োগ করেন, এই মর্ম্মে বারাসাতের ফৌজদারী আদালতে নালিশ হয়। কুঞ্জবাবুর বিচারে কেশব বাবুর ১৲ একটাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ বাধিলে পূর্ব্বে গিরিজাপ্রসন্ন বাবু নিজে কষ্ট স্বীকার

করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতেন, এক্ষণে তাঁহার কর্ম্মচারীর কার্য্য এমত হইতে চলিল কেন ?

রাস্তার দুর্গতি—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর দিক দিয়া যে কাঁচা রাস্তা গৈপুর, ইছাপুর গিয়াছে, এখন ঐ রাস্তায় বহুলোকের ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহাতে কিঞ্চিৎ খাবরা দিবার মিউনিসিপালিটীর কি সুবিধা হইল না ? এই বর্ষার কাদায়, তাড়াতাড়ি ট্রেণ ধরিতে এবং রাত্রিকালে জুতা খুলিয়া ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত যে কি দুর্গতি জনক তাহা সহজেই অনুমেয়। এ সম্বন্ধে আমারা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান ও কমিসনার মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয়—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ খাঁটুরা দত্তবাটীতে "তাম্বুলী সমাজের" এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র পাল, বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাহাতে প্রায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয় যে, শীঘ্রই একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রামের কয়েকটী খ্যাতনামা উপযুক্ত ব্যক্তি ইহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই একটী বালিকাবিদ্যালয় আপততঃ খাঁটুরা দত্তবাটীতে খোলা হইবে, এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে ভবিষ্যতে প্রসারিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা হইবে।

উপাধিলাভ—সময়ের ফল ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহার স্বাদগ্রহণ করিতে হয়, না করিলে মনে একটা আক্ষেপ থাকে। এবার নবীন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে সম্মান কুশদহবাসীর নিকট আছে, ইহাতে তাহার যে কিছু আধিক্য হইবে তাহা বোধ হয় না। তথাপি তিনি যে, রাজসম্মান লাভ করিলেন, ইহা কুশদহবাসীর পক্ষে কর্ণ-সুখ-কর হইল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

ভক্ত-পূজা।

মানুষ যে কেবল ভগবানকে ডাকে তাহা নহে, ভগবানও মানুষকে নিয়ত ডাকিতেছেন।

"যে তোমারে ডাকেনা হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।"

যিনি ভগবানের ডাক শুনিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়াছেন,—তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে দেহ, মন, আত্মা সমার্পণ করিয়াছেন তাঁহার চরণে আমি শত সহস্র প্রণাম করি।

কথিত আছে,—একদা নারদঋষি ভগবান্ সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি উপাসনা করিতেছেন। নারদ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতদিন জানিতাম বিশ্বজগত ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবান্ কেবল তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনিও অন্যের উপাসনা করিতেছেন, তবে কি তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ কেহ আছেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন নারদের ভগবত সন্দর্শন হইল তখন তিনি নিবেদন করিলেন প্রভু! আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম, এতদিন জানিতাম সমস্ত ভক্তগণই আপনার পূজা-উপাসনা করেন, আপনি কেবলমাত্র তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু আজ দেখিতেছি আপনারও উপাস্য আছেন। আপনি যে কাহার উপাসনা করেন তাহা বুঝিলাম না। ভগবান্ ঈষদ্ধাস্তে নারদবাক্যের উত্তর করিলেন নারদ! আমিও বড় আশ্চর্য্য হইলাম যে, তুমি এত দিনেও এ বিষয় জানিতে পার নাই। আমি তো চিরদিনই উপাসনা করি। কথার সুযোগ পাইয়া নারদ বলিলেন ঠাকুর! আপনি কাহার উপাসনা করেন? শ্রীভগবান্ প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে নারদের দিকে

অবলোকন করিয়া বলিলেন নারদ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবে। নারদ চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য যোগী, ঋষি, ভক্ত; তাহার মধ্যে নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নারদ ভক্তিবিগলিত চিত্তে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতে করিতে ভগবদুক্তি শুনিলেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ নারদ ন মে ভক্তাশ্চতে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

হে নারদ! যাহারা আমার ভক্ত বলে তাহারা আমার ভক্ত নহে, আমার ভক্তদের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

ইহা শুনিয়া নারদ আনন্দে গদ গদ হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানও গাইলেন

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

দাস—

অঞ্জলি।

আমি যে চাহি—হে জীবন-স্বামী,
তোমারে ধরিয়া থাকিতে,
আমি যে চাহি—সারা নিশি দিন
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে;
তুমি যে সদা নিমেষের তরে
দেখা দিয়ে যাও চলিয়া,—
কত যে খুঁজি, নাহি পাই দেখা
আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া।
শূন্য হৃদয় হের যদি মোর
—ভরে দাও প্রেম-সুধাতে,
নির্ম্মল কর মলিন মরম
তোমার পুণ্য-আভাতে।

কল্যাণ-গীতি হউক ধ্বনিত
　　হৃদয়-তন্ত্রী মথিয়া ;
পাপের স্মৃতি দূরে যাক্ চলে
　　তব পূত নাম শুনিয়া।
মঙ্গলময় নাম-সুধা পানে
　　উঠুক্ চিত্ত ভরিয়া ;
ভকতি-হীনে দাও নব-প্রাণ
　　কৃপা-বারি তব সিঞ্চিয়া।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৫০। ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১।২৫।২৬

অদৃশ্য বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না, দৃশ্য বস্তুও বিনষ্ট হয়। অতএব যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করেন? সেই চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর উর্দ্ধে পরিপূর্ণ, অধোতে পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের ইহাই লক্ষণ জানিবে।

৫১। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২।২।৩৭

যাঁহারা ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া পরমাত্মার কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁহারা আপনাদের বিষয়কলুষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণারবিন্দ লাভ করেন।

৫২। অতএব শনৈশ্চিত্তং স প্রসক্তমসতাং পথি।

ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েৎ বশম্॥ ভাঃ ৩।২৭।৫

অতএব গাঢ়ভক্তিযোগে ও বৈরাগ্যসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত-চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিবেক।

৫৩। যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।

আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি॥ ভাঃ ৪।৮।৩৩

ঈশ্বর যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা সুখদুঃখের মধ্যে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে।

৫৪। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণো মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভাঃ ৫।১৮।১২

যাঁহার ভগবানেতে অকিঞ্চন ভক্তি আছে, সমুদায় দেবগুণ আসিয়া তাঁহাতে অধিবাস করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়, কেন না মনোরথযোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবমান।

৫৫। তৈস্তান্যধানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।

নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ভাঃ ৬।২।১৭

সাধকগণ তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না, তাহা কেবল ঈশ্বরের পদ-সেবাতেই পবিত্র হইয়া থাকে।

৫৬। যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে। ভাঃ ৯।৪।৬৫

যাহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক, পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?

৫৭। ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা। ভাঃ ৯।৪।৬৬

যে সকল সমদর্শী সাধু আমাতে নিবদ্ধহৃদয়, তাহারা সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমায় ভক্তি দ্বারা বশীভূত করে।

৫৮। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। ভাঃ ৯।৪।৬৮

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমাব্যতীত তাহারা আর কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদিগের ব্যতীত কিছু জানি না।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্বজন্ম আছে কি না?

'কুশদহ'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে "পূর্ব্বজন্ম আছে কি না? এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচ্য" যে প্রতিজ্ঞা ছিল, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

ঐ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বর্ত্তমান জন্মের পর এই পৃথিবীতে আর এইরূপ স্থূলদেহে জন্ম না হইয়া সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি হইতে পারে। তাহাতে স্বতঃই একথা বলা হইয়াছে যে, এই জগতে এইরূপ স্থূলদেহে পূর্ব্বজন্মও ছিল না। কেন না, এ জন্মের পর যদি আর জন্ম না হয়, তবে পূর্ব্বে আরও জন্ম ছিল তাহা বলা চলে না। তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মই যে পর জন্ম নহে তাহা কে বলিল? এই জগতে একাধিকবার জন্ম স্বীকৃত হইলে ততোধিকবার জন্ম হয় নচেৎ হয় না। সুতরাং পুনর্জন্ম অস্বীকারের সহিত পূর্ব্বজন্ম অস্বীকৃত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহা হইলে এই বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে মানবাত্মার বা মানবজন্মের কীদৃশ অবস্থা ছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উপস্থিত হইতে পারে। এবং তাহার সঙ্গে এ প্রশ্নও আসিতে পারে যে, যদি পূর্ব্বজন্ম না থাকে, তবে মানুষের একই জন্মে এত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় কেন? তাহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে,—

আমরা মানবমণ্ডলী ছাড়িয়া যদি উদ্ভিদরাজ্যে বৃক্ষলতার বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব একটী গাছে যত পাতা কিম্বা ফল পুষ্প হয়, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটী একরকমের নহে। একটীর সঙ্গে অপরটীর

কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। এ ভেদ হয় কেন? বৃক্ষলতা কি পাপপুণ্য কর্ম্মফলের অধীন যে, কোনোটা পুণ্যফলে সুপুষ্ট, সুপক্ক আর কোনোটা পাপের ফলে কাণা কুঁজ অকালপক্ক হইল? অবশ্য একথা কেহই বলিবেন না যে, তাহারা ঐ নিয়মাধীনে হয়। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, বৈজিক দোষগুণে মৃত্তিকার রস, জল, বায়ু, তাপ, তেজ আকর্ষণের তারতম্যে ঐরূপ হয়। তবে মানবদেহ উৎপত্তি সম্বন্ধেও যখন ঐ প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান দেখা যায়, তখন তাহাও ঐরূপ বিচিত্র হইবে না কেন?

পাঞ্চভৌতিক উপাদানেই দেহের গঠন হয় একথা সত্য হইলেও কতকটা জল, মাটী, তাপ, তেজ, বায়ু মানবী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ হয় না। ভুক্ত বস্তুর ভিতর দিয়া পাঞ্চভৌতিক উপাদানে, শুক্র শোণিত যোগেই দেহের উৎপত্তি হয়। শুক্র শোণিতের ক্রিয়াপ্রণালী এক হইয়াও অসংখ্য মানব প্রবাহে প্রবাহিত, অথচ প্রত্যেকটী ভিন্ন, এজন্য একাত্মজ, এক ক্ষেত্রজ পাঁচ ভ্রাতা পাঁচ প্রকারের হয়। তাহার আরও এক কারণ, জন্মকালের অবস্থা, সময়, এবং সৌরজগতের গতি পার্থক্যে প্রত্যেকের দেহ, মন ভিন্ন হইয়া যায়। যাঁহারা এ সকলের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু নন, তাঁহারা বিনা চিন্তায় বিনা বিচারে গতানুগতিক ভাবে প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাস করিয়াই চলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, যে মানুষ নিজেই নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন না, কার্য্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, মানুষ কেবল নিজের জন্য নিজে নহে। প্রত্যেকেই বহুর ফলস্বরূপ। প্রত্যেকটী বহুর সঙ্গে ভালমন্দ সুখদুঃখে জড়িত। একে যেমন অপরের সদ্বিষয় লাভে উপকৃত, তেমন পাপ অপরাধের জন্যও প্রপীড়িত। দেহ, মন, প্রকৃতি ইহার কিছুই আকস্মিক নহে,' সকলই বংশ পরম্পরাগত ধারাবাহিক। সুতরাং যে যেমন ক্ষেত্র হইতে এই স্থূল দেহ এবং মন প্রাপ্ত হয়, সে তেমনই হয়। কেবল তাহা নহে সমাজ, সঙ্গ, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে একটীকে আর একটী হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। সৃষ্টি শক্তিও অনন্ত-মুখী, বিচিত্রতাই তাহার কার্য্য এবং সৌন্দর্য্য। তজ্জন্যও একটী অপরটীর মত হয় না।

এখানে অনেকের মনে এক গভীর সন্দেহ উঠিতে পারে তাহা এই যে, তবে কি সকলই স্বভাবের খেলা, এখানে পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদ নাই? উদ্ভিদ রাজ্য ও মানবরাজ্যে একই নিয়ম?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধের যথাস্থানে দেওয়া হইবে। এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্ব কর্ম্মফল ব্যতীত বর্ত্তমান জন্মে যে সকল কারণে একটীর সঙ্গে অপরটীর প্রভেদ ঘটে তাহা বোধহয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় উত্তর এই যে, পূর্ব্ব জন্ম না থাকিলে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে আত্মা এবং দেহের কি অবস্থা ছিল তাহা অগ্রে আলোচ্য।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণাপূর্ণ অনুসন্ধানে একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই মানবদেহ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। আদিমাবস্থার কোন কোন জন্তুর অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নাই। বর্ত্তমানে এমন অনেক জীব আছে যাহারা পূর্ব্বে ছিল না। আর ক্রমোন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এক আকার হইতে ক্রমে অন্য আকারে যাহারা পরিণত হইয়াছে, তাহাদের ছোট বড় ভেদ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন বিষয়ও অতি আশ্চর্য্যজনক। কুম্ভীর হইতে হস্তীর পরিণাম কে সহসা ভাবিতে পারে? আর অনেকের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। বিড়াল এবং বাঘের সাদৃশ্য প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। অতএব আমরা চারিদিকে যে অসংখ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ সকল দেখিতেছি, তাহারা অকারণ সম্ভূত নহে। তাহারাও মানবদেহের অংশ বিশেষ।

এই যে জীবপ্রবাহ যাহা দেখিয়া এদেশের সাধকগণ বলিলেন, চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে এই মানবজন্ম হয়। একথার ভিতর সত্য আছে। চুরাশী লক্ষ হউক বা চুরাশী কোটী হউক একথা সত্য যে, সহসা মানবদেহ-মনের উপাদান প্রস্তুত হয় নাই। মানবদেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে যে বহু কোটী বৎসর লাগিয়াছে তাহা সত্য। তথাপি অপর সকল প্রাণীর সঙ্গে মানবের একটা অতিশয় প্রভেদ দেখা যায়, তাহা আত্মার প্রভেদ। অর্থাৎ অপর সকল জীবের দেহ আছে, চেতনা আছে, তদূর্দ্ধে মন আছে, তারপর কিছু কিছু বুদ্ধির বিকাশ আছে এমন কি স্নেহ মমতা, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যুপকারের ভাব পর্য্যন্তও কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু আত্মা নাই। আত্মা মানে এখানে

যে জ্ঞান, বিবেক দ্বারা আপনার স্রষ্টাকে বুঝিতে পারে, এবং তজ্জন্য আপনার ব্যক্তিত্বের দায়ীত্ব বোধ করিতে পারে। দায়ীত্ববোধ বা পাপপুণ্যের জ্ঞান অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। আর একটা গভীর প্রভেদ এই যে, অন্যান্য সমস্ত জীবের উন্নতি সীমাবদ্ধ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কিন্তু মানবাত্মার উন্নতি এ শ্রেণীর নহে। বাইবেল শাস্ত্রে কথিত আছে, ঈশ্বর আর আর সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষে আপনার সাদৃশ্যে মানবের সৃষ্টি করিলেন। একথার ভিতরও বিলক্ষণ সত্য আছে। অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি পরমাত্মা নিজ সাদৃশ্যেই করিয়াছেন, নতুবা মানবাত্মা কখনই পরমাত্মার ভাব বুঝিতে পারিত না। অতএব এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানবের যে পার্থক্য তাহা বুঝিলাম। আর সে পার্থক্য যে আত্মা সম্বন্ধে তাহাও সত্য। সুতরাং অন্যান্য জীবদেহের উপাদান হইতে মানবদেহের উপাদান লইয়া এই মানব জন্ম হয় বটে, কিন্তু দেহের পরিণতি আত্মা হইতে পারে না। আত্মা কেবল পরমাত্মা-জাত। তাহা আত্মার স্বভাব দেখিয়া যোগী ঋষি ধর্ম্মাত্মাগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা উচিত, আত্মা পশুপক্ষী দেহের পরিণাম ফল নহে। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও মানবদেহে তাহার আর কোন জন্ম ছিল না, তবে মানবাত্মা কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থানে ছিল, এবং এমন কি কারণ উপস্থিত হয় যে তজ্জন্য সে সহসা মানবদেহে এই বর্ত্তমান জন্ম পরিগ্রহ করে।

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, জগদীশ্বর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। যেরূপেই হউক তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে এই সৌরজগতে বাস করি, এমন আরও কত কোটী কোটী জগত থাকিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যখন এই সৃষ্টি ছিল না তখনও তিনি আপনাতে আপনি ছিলেন, এখনও তদ্রূপে আছেন। সৃষ্টি থাকিলে বা না থাকিলেও তিনি থাকেন। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি। এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা সমালোচনার এস্থান নহে। তবে একথার মধ্যে প্রধান আপত্তিজনক কথা এই যে, দুইটী অনাদি হয় না। জগত তাঁহার আশ্রিত, তিনি জগতের আশ্রিত নহেন। আর ঐ কথায় যাহা সত্য আছে, তাহা এই যে, যাহার মূলে যাহা নাই, তাহা হইতে কখন তাহার প্রকাশ হয় না। যেমন

আম গাছে জাম হয় না, মহিষের মেষশাবক হয় না। পক্ষান্তরে ঐ ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই সময়ে বৃক্ষের বিকাশ হয়। যাহার সন্তান সম্ভাবনা থাকে তাহারই হয় কিন্তু সকলের তো হয় না। অনন্ত ঈশ্বরের, পূর্ণতার মধ্যে বীজাকারে হউক বা সম্ভাবনা রূপেই হউক অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির মূল ছিল বলিয়াই যথাসময়ে তাহার প্রকাশ হইয়াছে, এখনও হইতেছে। অতএব এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল এই যে, বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে জন্ম না থাকিলেও আত্মা পরমাত্মার মধ্যে অব্যক্তভাবে অথচ বীজাকারে বা সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান থাকে; তৎপরে তাঁহার অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাশক্তির বিধানে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে যাহা অসংখ্য পশুপক্ষী প্রাণীপুঞ্জের দেহের পরিণতি ফল মানবদেহের উপাদানের উপযোগী হইয়া, অসংখ্য মানববংশাবলীর সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই দেহ, মন প্রকৃতির গঠন হইয়া থাকে। সুতরাং এই দেহ মনের বিভিন্নতা হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিচিত্রতা, দেহ মন, প্রকৃতিতে কিন্তু আত্মাতে নহে, আত্মা সমস্তই এক। এ সম্বন্ধে ও পাপপুণ্যের বিচার এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরের জন্য রহিল; আশা করি তজ্জন্য পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্ম। শ্রীমচ্চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ খানি অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়া এক্ষণে ইহার চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে।

বিগত পাঁচশত বৎসর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনাদর্শ ও ধর্ম্ম এত বিকৃত হইয়াছে যে, সাধারণ বৈষ্ণব সমাজ দেখিয়া তাঁহার জীবনের উচ্চভাব ও ধর্ম্ম প্রায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ভক্তিভাজন গ্রন্থকার সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়া মহাপুরুষের জীবনের যে সুবিমল ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য আমাদের প্রিয়তম আদরের ধন এজন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ বঙ্গীয় যুবকগণ এই ভক্তিতত্ত্ব পাঠ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সুমিষ্ট ভক্তি-

সুধারস পান করুন ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রন্থখানি বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে সন্ধান করিলে এই পুস্তক পাওয়া যায়। এত বড় গ্রন্থের মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যে সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জনসমূহের জ্ঞান ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; বর্ত্তমানকালের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।" তাই আমরা ঐ গ্রন্থের প্রথমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা।

"ইংরাজি ১২০৩ সালে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি যখন কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই হিন্দু রাজত্বের সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। ভীরু স্বভাব লক্ষ্মণেয় শূরসেন যবন সেনাপতির সমাগমবার্ত্তা যাই শুনিলেন, অমনি পশ্চাদদ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই সেন বংশীয় রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত, ইহার উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাজা বল্লালসেন একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক বৃহৎ দীঘী খনন করেন। ইহা বল্লাল দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। দীঘী ও বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু বর্ত্তমান আছে। দীঘীর উত্তর দিকে বল্লালের ঢিবি নামে একটি উচ্চস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মৃত্তিকাগর্ভে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন সকল বর্ত্তমান ছিল।

পুরাতন নবদ্বীপ এখন আর নাই, গঙ্গার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী বহমানা ছিল এই দুই নদী গোয়ালপাড়া নামক গ্রামের নিকট গিয়া মিলিত হয়। কিছু দিনান্তে ভাগীরথীস্রোত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করত বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর মধ্যে গিয়া পড়ে। গঙ্গার স্রোতে নগরের উত্তর দিক্ ভগ্ন হওয়াতে অধিবাসিগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া বাস করেন, এই স্থান এখন নবদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহা একটি সামান্য পল্লীর ন্যায় ছিল। পরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক জন যোগী এখানে আসিয়া এক দেবীর ঘট স্থাপন করেন। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গঙ্গাস্নান করিবার মানসে নানা স্থান হইতে লোক সকল আসিয়া এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এক্ষণে নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বদিকে নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। কিন্তু নবদ্বীপকে একটি গণ্ডগ্রাম ভিন্ন এখন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

* * * বঙ্গীয় সমাজ অতি আধুনিক সমাজ, পূর্ব্বে এ দেশে সাঁওতাল ধাঙ্গড় কোল্ প্রভৃতিরই বসবাস ছিল। আর্য্যগণ কিরূপে এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলেন, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি কি প্রণালীতে হইল, তাহা ঠিক করা যায় না। বোধ হয় রাজা আদিসুরের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে দেশীয় আদিম অসভ্য এবং আর্য্য বংশের সম্মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং তাহারাই হিন্দুরাজত্বের কালে, ক্রমে ভদ্র বঙ্গীয় সমাজ সংগঠন করিয়াছে। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে সামাজিক উন্নতির স্রোত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। এখন ইহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসমাজে এখন এক মহা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে কালের সঙ্গে এখন আর কিছুরই প্রায় ঐক্য দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সামাজিক অবস্থা অবশ্য কতক পরিমাণে তখন ভাল ছিল। কায়স্থেরা পার্সিবিদ্যা শিখিয়া নবাব-সংসারে রাজকর্ম্ম করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা টোলধারী তাঁহাদের মধ্যেই শাস্ত্রচর্চ্চা অধিক ছিল, তদ্ব্যতীত গুরুপুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন, অপর ব্রাহ্মণগণ পাঁচ রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাঙ্গালা ভাষার তখন জন্ম হয় নাই, প্রাকৃত গ্রাম্য ভাষা পার্সি এবং উর্দ্দুর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার প্রচলিত ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা কার্য্য চলিত। অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র লোকই মূর্খ ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্র ধর্ম্ম এ সমস্ত অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণেরা আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তখনকার স্ত্রী পুরুষদিগের শরীর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং মন অত্যন্ত শাদা

গিয়ে ছিল। পুরুষেরা খুব খাইতে পারিত, নিমন্ত্রণে গিয়া কেহ কেহ হয়ত এক বগুনা ডালই খাইয়া ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। দাড়ি গোঁফ রাখার প্রথা ছিল না, কিন্তু সকলের মাথায় টিকি শোভা পাইত। ঘাড় কামান, থরকাটা, জুল্পি এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভাল বাসিত। জুতা পায় দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন। আহারের মধ্যে মোটা চাউল, পরিধান দেশীয় সূতার স্থূল বসন। চাকুরে লোকেরা অপেক্ষাকৃত সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনেরা এখনকার মত পাড়ওয়ালা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরা, বার্ণিষযুক্ত বুট পায়, গোঁফে কলপ মাখান সুখপ্রিয় বাবু ছিলেন না, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; পাড়াপ্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে থাকিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। বাশূলী ও বিষহরির পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গান, ঢাকের বাদ্য, ভেড়ার ঢুঁ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি আমোদের বিষয় ছিল। যণ্ডাগোচের ভদ্রলোকেরা খুব পাঁঠা মহিষ ভেড়া বলিদান করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা মোটা মোটা রূপার গহনা এবং নিজহাতে কাটা সূতার কাপড় পরিতেন। সমস্ত দিন ভাতরাঁধা, ধানভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা তৈয়ার করা, শিকে বুনান, এই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। পুরুষদের শাসনে স্ত্রীলোকেরা কাঁপিত, ঘোমটা একটু কম কিম্বা কথা একটু উচ্চ হইলে তাহার নিন্দা বাহির হইত। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চরিত্র সাধারণতঃ বিনম্র ধর্ম্মভীত ছিল। তখন সুখবিলাসের প্রতি লোকের এত দৃষ্টি পড়ে নাই।

* * * ব্রাহ্মণদের ভয়ানক প্রতাপ ছিল, তাহাতেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে বাধ্য করিত। গুরুপুরোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচার চলিত না, কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে বাপান্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইত না। তখন শূদ্র-দিগের পক্ষে সঙ্কটের কাল ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র বসিতেও পাইতেন না।

ধর্ম্মের নিয়ম অনেকে পালন করিত, কিন্তু কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা করিতে পারিতেন না। দুই পাঁচজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমুদয় স্ত্রীপুরুষ স্বার্থকামনায় এবং ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা

না জানিয়া তাহারা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সংসার বাসনা চরিতার্থ করিত। নিষ্পাপ হইয়া ভগবানের পদারবিন্দ লাভ করিব, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিব, চিন্তা বাক্য কার্য্য পবিত্র হইবে, ইন্দ্রিয়গণ বশে থাকিবে, ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তি অনুরাগ বিকসিত হইবে, এ সকল মহৎভাব তখন ছিল না, এক্ষণেও সাধারণতঃ তাহা নাই। সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া, সর্পভয়ে বিষহরির গান শুনা, ধন পরমায়ু বৃদ্ধি এবং সন্তানাদি লাভ, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থের জন্য দেবতা বিশেষকে মানস করিয়া পূজা ভোগ বলিদান দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত অন্য অভাববোধ ছিল না, সুতরাং ঠাকুরের অন্য কোন গুণ কেহ দেখিতে পাইত না।

* * * অধিকাংশ ভদ্রলোক শাক্ত ছিল, অল্প দুই পাঁচ জন বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু সমাজ মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইত না। জ্ঞানী হিন্দু দুই এক জন গীতা ভগবত পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ ভাবার্থ কেহ প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। * * * প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেহ কোন নিয়মের অন্যথাচারণ করিলে তজ্জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রচারিত ছিল। ভিতরে ভিতরে অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙ্গিতেন, প্রকাশ হইলেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্নভোজন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, সাক্ষ্যদান শূদ্রের দান প্রতিগ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ, কিন্তু বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ সকল কার্য্যে বিশেষ আপত্তি থাকিত না। মিথ্যা কথা বলিলে নরক হয়, কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহা বলিবে। অন্যায় উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ যদি দেবদেবীর পূজায়, ব্রাহ্মণ ভোজনে, কিংবা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করা যায়, তবে তাহাতে আর দোষ স্পর্শে না। * * * একবার কোন বিশেষ পর্ব্বে, বা চুড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া কিংবা গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর পাপ পুণ্যের জমা খরচ কাটিয়া দেখ, পুণ্য চিরকাল ফাজিল দাঁড়াইবে। একবার গঙ্গায় অবগাহন করিলে যদি কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয় তবে তুমি কত পাপ করিবে? এ প্রকার পুণ্যকার্য্য শত শত ছিল, যাহা অতি সহজে লোকে সম্পন্ন করিতে

পারিত। * * * এমন অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ আসিয়া বলে যে সংসার বাসনা ছাড়িয়া বৈরাগী হও, চরিত্রকে পবিত্র কর, প্রেমভক্তিতে মাত, সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে যে নিতান্ত উপেক্ষিত অপদস্থ হইতে হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা চৈতন্যের সময় ঠিক এইরূপ ছিল। বামাচারী ভক্তিবিরোধী শাক্তগণ এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। তাঁহাদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুরাপূর্ণ নর-কপাল, গাত্রে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী; যখন মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবার্থ ভৈরবীচক্রে তাঁহারা উপবেশন করিতেন, তখনকার ভীমমূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প হইত। সুরাপান করিয়া ইহারা রাক্ষসের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, আমরা সুরাকে গঙ্গাজল, এবং মাংসকে জবাফুল করিতে পারি। তাঁহাদিগকে আর আর সকলে সিদ্ধপুরুষ বলিত। শক্তি উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষণ্ডামার্ক তাহারা নেশার ঝোঁকে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একটা ধরিয়া টানাটানি করিত। বামাচারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিতে না।

এদিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব, জাত্যভিমান, মায়াবাদের কঠোর ধর্ম্মমত, তার্কিকতা, অসার ধর্ম্মাভিমান; অপরদিকে ধর্ম্মযাজকদিগের কপট ব্যবহার, স্বার্থপরতা, বামাচারিদিগের পঞ্চমকার, এবং সাধারণ লোকের সাংসারিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তি বিহীনতা, ইহারই মধ্যে ভক্তিভাজন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সে সময়ে নবদ্বীপে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যে কয়জন লোক ছিলেন তাহার মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য প্রধান। নিবাস ইঁহার শান্তিপুরে, কিন্তু নবদ্বীপেও মাঝে মাঝে তিনি থাকিতেন। আর শ্রীহট্ট প্রদেশের শ্রীবাস এবং শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব এবং মুরারি গুপ্ত। এই চারিজন এবং চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; এই কয় ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হরিভক্তি যে তখন একেবারে ছিল না তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির প্রথম প্রবর্ত্তক, গীতা ও ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা সকল তাঁহারই মুখবিনির্গত। অর্জ্জুন ও উদ্ধবের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা অতি মনোহর। পূর্ব্বকালে ব্যাস, নারদ,

যুধিষ্ঠির অম্বরীষাদি দেবর্ষিরাজর্ষিগণের ও ধ্রুব প্রহ্লাদের এবং পরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মাধবাচার্য্য এবং রামানুজ সম্প্রদায়ে যে ভক্তিভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এ সময় বঙ্গদেশেও দেখা যাইত। কয়েকজন বৈষ্ণব, শাক্তদিগের ভয়ে অতি সংগোপনে গভীর রজনীকালে কখন শ্রীবাসগৃহে, কখন বা অদ্বৈতের সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া অভক্ত শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করিত, ভয় দেখাইত, অভিশাপ দিত এবং তাহাদের সাধন ভজনকে দেশের অমঙ্গলের কারণ মনে করিত। যবন হরিদাস সেই সময়ের লোক। তাঁহাদিগের উপর শাক্তেরা ভয়ানক উৎপাত করিত। শক্তি উপাসকদিগের দল বল বেশী ছিল, তাহাদের ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না। লোকের দুর্ম্মতি ধর্ম্মভ্রষ্টতা কপটাচার দেখিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন যে "হায়! ভগবান্ ভক্তি দিয়া জীবগণকে কবে উদ্ধার করিবেন? কবে তিনি অবতীর্ণ হইবেন?" অদ্বৈত একদিন মনের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাস করিয়াছিলেন। এমন সময় সেই লুপ্তপ্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

ঘোর অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবনের ন্যায় চৈতন্যের জীবনরূপ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে প্লাবিত করিল। ভূতভাবন ভগবান্ যেমন পৃথিবীকে ফল শস্য জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্য সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ধরাতলস্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাষ্প নিষ্কর্ষণ পুর্ব্বক তাহাকে মেঘরূপে পরিণত করত সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন, তেমনি তিনি পাপীর গতি হইয়া আবার যথা সময়ে মনুষ্যকৃত রাশি রাশি পাপ দুর্গন্ধের মধ্য হইতে স্বীয় পুণ্যবলে ভক্ত মহাপুরুষদিগকে উৎপাদন করত ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া দেন। তাঁহার ভক্ত তাঁহার কৃপাবলে নির্ম্মল ভক্তিবারি বর্ষণ পূর্ব্বক জীবদিগের হৃদয়োদ্যান হইতে নানাবিধ ভাব কুসুম এবং পুণ্যফল বিকাশ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল চরণে পুনরায় তাহা উপহাররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব এই প্রেমের উদ্যান হইতে যে এক অপূর্ব্ব পুষ্পস্তবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আঘ্রাণ এখনও সমাজকে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়ে ভক্তি সমুদ্র প্রভূত বেগে উদ্বেলিত হইল, এবং তাহার এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া কঠোর কুতার্কিক পাষণ্ড বিষয়ী বামাচারী মদ্যপায়ী সকলকে সবলে আঘাত করিল। একা গৌরাঙ্গের

ভক্তি প্রস্রবণ হইতে শত শত ভক্তিনদী সংরচিত হইয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মের আসুরিক আচার ব্যবহার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জ্ঞানগর্ব্বে, কঠোর কুতর্কে অপর সাধারণ নরনারীর হৃদয়ও শুষ্ক নীরস্ হইয়া গিয়াছিল; বিনয় ভক্তি প্রেমোন্মত্ততা সদাচার বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা মুক্তির জন্য সরল ব্যাকুলতা পিপাসার কোন চিহ্ন দেখা যাইত না; সেইকালে বহুল প্রতিকুলতার মধ্যে ভক্তচুড়ামণি গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান দীন দুঃখী সাধারণ নরনারীর তৃষিত প্রাণ ভক্তিরসে শীতল করিলেন।"

হিমালয় ভ্রমণ। (৯)

সেবাশ্রমে আসিয়া আমার নামের কয়েকখানি পত্র পাইলাম। তন্মধ্যে শ্রীমান্ শিবনাথ কর্ম্মকারের পত্রখানি অত্যন্ত সদ্ভাবপূর্ণ ছিল। "মেয়েটী তাহার বাড়ী আছে, তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই," এইরূপ লেখা ছিল।

২৬শে কার্ত্তিক। খুল্না হইতে স্ত্রীর একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে বুঝিলাম তিনি এ পর্য্যন্ত গোবরডাঙ্গার এ সমস্ত সংবাদ কিছুই পান নাই। খুলনায় যাঁহার গৃহে আমার স্ত্রী আছেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ এক পত্র ও স্ত্রীকে এক পত্র লিখিলাম, এবং দুই টাকা মণিঅর্ডার করিলাম এইজন্য যে, আমার স্ত্রী গোবরডাঙ্গায় আসিয়া যেন মেয়েটিকে খুলনায় লইয়া যান। আমি যত শীঘ্র পারি যাইতেছি।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন কি করা কর্ত্তব্য! আর ত এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখন পঞ্জাব হইয়া যাইব, কি বরাবর দেশাভিমুখে যাত্রা করিব? আজ সেবাশ্রমে আর একটী ঘটনা ঘটিল। উত্তর-কাশী হইতে পরমহংস মহাশয়ের শিষ্য তুরিয়ানন্দ স্বামী (হরিমহারাজ) আসিলেন। একদিন তাঁহার সঙ্গকরা উচিত মনে করিয়া আমার যাত্রা এক দিনের জন্য স্থগিত রাখিলাম।

তুরিয়ানন্দস্বামী রাত্রে আমার গান শুনিলেন এবং কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম "উত্তর-কাশী অতি মনোরম্য স্থান, সাধন ভজনের বিশেষ অনুকূল। তথাকার জল বাতাস আরও সুশীতল। হরিদ্বার হইতে ১০০ মাইল উত্তরে পর্ব্বতোপরি উত্তর-কাশী অবস্থিত।

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার। সঙ্গের জিনিষপত্র আরো কমাইয়া ফেলিলাম। একটি ছোট ট্রাঙ্ক ছিল তাহা সেবাশ্রমে কেহই লইলেন না সুতরাং এমনি রাখিয়া দিলাম যাঁহার দরকার হয় লইবেন। জুতা দুই জোড়ার মধ্যে চটী জোড়াও ফেলিয়া দিলাম কেবল কম্বলে দুই খানা গৈরিক কাপড় ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকাদি মাত্র রহিল আর একটি লোটা।

বিদায়কালীন তুরিয়ানন্দ স্বামী আমাকে কিছু ফল উপহার দিলেন, আমার তাহা তত প্রয়োজনীয় মনে না হইলেও সাধুর দান গ্রহণ করিলাম। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনার আর সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কেবল হাতে একটি কিছু থাকা আবশ্যক," এই বলিয়া সেবাশ্রম হইতে একগাছি বে-ওয়ারিস যষ্ঠী (পার্ব্বত্য লতা জাতীয়) আমার হাতে দিলেন। তাহাতে আমার মনে হইল ইহা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর হইবে, বাস্তবিক সময়ে সময়ে উহা আমার যেন কিছু 'বল' আনিয়া দিয়াছিল।

যাত্রাকালীন গোবরডাঙ্গা হইতে বন্ধুবর জনার্দ্দনের পত্রের উত্তর আসিল, "যাঁর জিনিস তিনি লইয়া গিয়াছেন, আপনার আর কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আপনার যাহা মনোবাঞ্ছা আছে তাহা পূর্ণ করিয়া আসুন।" অর্থাৎ আমার পত্রে শিবনাথ জানিতে পারিয়াছিল, যে আমার স্ত্রী খুলনায় আছেন সুতরাং সে যেমন আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল তদ্রূপ তাঁহাকেও এইরূপ এক পত্র লেখে যে "আপনার কন্যাকে পাড়ায় রাখিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে আমার বাড়ী আমার মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মতই আছে, আপনার কোন ভাবনা নাই।" কন্যার মাতা এই সংবাদ পাইবামাত্র বহুদিনের "হারানিধি" সন্তান আসিয়া এইরূপ অবস্থায় আছে শুনিয়াই খুলনা হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া তাহাকে লইয়া পুনরায় খুলনায় গিয়াছেন। আমি জনার্দ্দনের পত্র পাইয়া যেমন নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত হইলাম তেমন ইহাতে আমার পঞ্জাব ভ্রমণে ভগবানের ইচ্ছার সায় পাইলাম। সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

কঙ্খল, ঋষিকেশ ও দেরাদুন, সর্ব্বশুদ্ধ এখানে আমি ২৪ দিন কাটাইয়া আজ সেবাশ্রমের আনন্দজনক বিদায় গ্রহণ করিলাম।　　(ক্রমশঃ)

প্রধান ঘৃত ব্যবসায়ীগণের বিপদ।

সহরে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে, কলিকাতা-মিউনিসিপাল-আইনে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। প্রত্যহ সহরে দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি সহস্রাধিক মণ বিক্রয় হয়। বোধহয় সকলেই জানেন খাঁটী জিনিষ পাওয়া কত কঠিন। এরূপ অবস্থায় মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ২।১টী ভেজাল খাদ্য বিক্রেতার জরিমানার কথা যাহা শোনা যায়, তাহাতে সাধারণের মনে ঐ আইনের সজীবতা প্রমাণ করে।

এই দণ্ডবিধানের মধ্যে সময় সময় যে সকল ঘৃত বিক্রেতার নাম দেখা যায়, তাহার মধ্যে বড়বাজার এবং হাটখোলার প্রধান ঘৃত ব্যবসায়ীদিগের ২।১ জনের নাম দেখা গিয়াছে। সহরের সকল স্থানেই ঘৃত বিক্রেতা বহু দোকানদার আছে কিন্তু প্রধান ঘৃত বিক্রেতা বা আড়তদার কয়েকজন মাত্র। তাঁহাদের এই ব্যবসায় কলিকাতায় বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই শ্রেণীর ঘৃত ব্যবসায়ী বড়বাজারের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, এবং হাটখোলার পরলোকগত মহানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্তের নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃত প্রণালী ও বর্ত্তমান বিপদের কথা হয় ত অনেকেই অবগত নহেন, সুতরাং সাধারণের অবগতির জন্য তৎসম্বন্ধে দুএক কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তাঁহাদের এই সহরে এমন কোন কারখানা নাই, যে তথায় ঘৃত গালাই বা অন্য কোনরূপ প্রস্তুতির কার্য্য হয়। এখানে কেবলমাত্র বিক্রয়ের স্থান বড় বড় দোকান বা আড়ৎ আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানে স্থানে ইঁহাদের মোকাম আছে। তথায় এক একটি পুরাতন বিশ্বাসী ভদ্র কর্ম্মচারী বা মূলধনীর অন্যতম অংশীদার নিজেই থাকিয়া ঘৃত খরিদ করেন। প্রত্যেক মোকামের গঞ্জে বা বাজারে তাঁহাদের এক একটি কারখানাবাটী আছে। তথায় দৈনিক নানা পল্লীবাসী ব্যাপারিগণ, পল্লী সকল হইতে প্রত্যেকে ২।৫।১০/• মণ করিয়া ঘৃত আমদানি করে। প্রতি মোকামে ২।৪টি খরিদদারের কারখানা থাকে। সকলেই বাজার দরে ঐ সকল ঘৃত কিছু কিছু খরিদ করেন। খরিদের সময় কাঁচা ঘৃত খরিদ করিতে হয়, তৎপরে তাওয়াই করিয়া তাহা হইতে 'মাটা'

(জলীয় এবং মলিন অংশ) বাহির করিয়া খাঁটী ঘৃত টিনের কানেস্তা বা মাটীর মট্‌কিতে (মট্‌কির ঘৃত বর্ত্তমানে ২।৪টি স্থানে হয় মাত্র) ভর্ত্তি করা হয়। তৎপরে ২।৫ দিনের মধ্যে ঘৃত জমিয়া গেলে, রেলে চালান দেওয়া হয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন মোকামের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া বিশেষ অবগত আছি যে, ইঁহাদের ঘৃত প্রস্তুত প্রণালীতে কৃত্রিমতা নাই। তবে তাঁহারা কদাচ দণ্ডবিধানের মধ্যে পড়িয়াছেন কেন? তাহাই ইঁহাদের বর্ত্তমান 'বিপদ'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইঁহারা মোকামে যে সকল ঘৃত খরিদ করেন তাহা দৈনিক বহু লোকের দ্বারা আমদানি হয়। খরিদের সময় তাঁহাদের চির অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষা এই যে—স্বাদ ও সৌগন্ধ গ্রহণ করিয়াই ভাল মন্দ নির্ণয় করেন। তা ছাড়া 'কেমিকেল যন্ত্র' তাঁহাদের নিকট কোনকালে থাকে না এবং তদ্রূপ উপায়ে শত শত জনের নিকট ঘৃত খরিদ করা সম্ভবপর নহে। কাজেই চক্ষু, নাসিকা, এবং জিহ্বা যন্ত্রই ইঁহাদের অবলম্বনীয়। এই যন্ত্রে যদি কখন কোন পদ (কোন ব্যাপারির ঘৃত) সন্দেহজনক হয় তাহা তাঁহারা খরিদ না করিয়া ব্যাপারিকে মৌখিক ভয় দেখাইয়া বিদায় করিয়া দেন। কেননা, তথায় এই কলিকাতা-মিউনিসিপাল-আইনের ন্যায় তদ্রূপ কোন আইন নাই। তৎপরে সেই ঘৃত আর কোথায় বিক্রয় করে তাহাও তাঁহাদের জানিবার কোন সুবিধা নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে কি করিলে তাঁহাদের এই ঘৃত খরিদের পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, এবং তাঁহাদের এই 'কলঙ্ক-বিপদ' দূরীকরণে সক্ষম হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইহা স্থির করিয়াছেন যে, পশ্চিম প্রদেশে যে সকল স্থানে তাঁহাদের মোকাম আছে, সেই সেই প্রদেশে যাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় তজ্জন্য তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া পাঠাইবেন।

কুশদহ (৭)

কালীপ্রসন্ন বাবু—খেলারাম বাবু যে বিষয়-বৃক্ষবীজ রোপণ করেন, কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার মূলদেশে জল সিঞ্চন দ্বারা বৰ্দ্ধিত করেন এবং সারদাপ্রসন্ন বাবুর সময়ে তাহা ফুল-ফলে শোভিত হয়। ইংরাজী ১৮২২ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয় এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে বৈদ্যনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বৈদ্যনাথ বাবুর মাতা বার্ষিক ৪৮০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ৺ কাশীধামে বাস করেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকাল হইতে দুৰ্দ্দান্ত ছিলেন; নিজের জেদ্ বজায় রাখিতে কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না; সেই জন্যই তিনি বিষয় সম্পত্তি বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু লাটুবাবুদিগের খুলনা জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়া মধুদিয়া পরগণা জমীদারী ছিল, কিন্তু তথাকার প্রজারা অত্যন্ত দুৰ্দ্দান্ত বলিয়া তাঁহারা উক্ত জমীদারী বশে আনিতে না পারায় উহা কালীপ্রসন্ন বাবুকে ইজারা দেন। কালীপ্রসন্নবাবু অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া উক্ত পরগণা শাসন করেন। এই দাঙ্গার জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুকে ২৪ ঘণ্টা জেলে থাকিতে হইয়াছিল, এবং গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ীর কুঞ্জবাবুর পিতামহ এই সময়ে মোকৰ্দ্দমার তদ্বির করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া আনেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮৪৪ খৃঃ অঃ প্রাণত্যাগ করেন। কালীপ্রসন্নবাবুর সময়ে কুশদহতে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, অন্যটি "মহামারীর" সূত্রপাত।

১। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেভারেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিসনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। তৎপরে হেয়ার স্কুল তৎপরে হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার তত সুবিধা না হওয়ায় মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃঃ অঃ উক্ত বিষয়ে গভর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া একখানি পত্র লিখেন। এই আবেদন পত্রের ফলে ১৮৩৫ সালের ৭ই মে দিবসে এই স্থিরীকৃত হয় যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কৰ্ত্তব্য। এই ইংরাজী শিক্ষার তরঙ্গ কালীপ্রসন্ন বাবুর সময়ে প্রথম কুশদহতে প্রবেশ করে।

কালীপ্রসন্ন বাবু নিজ পুত্র সারদাপ্রসন্নকে "শীল" সাহেব নামক একজন ইংরাজ শিক্ষক দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২। কুশদহতে যে বিষম মহামারী হইয়াছিল তাহা প্রথমে যশোহর জেলার অন্তর্গত গদখালি নামক গ্রামে আরম্ভ হয়। গদখালির এই মহামারী সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোকের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

গদখালি গ্রামের প্রান্তভাগে দুইজন সিদ্ধ গোঁসাই বাস করিতেন। একজনকে বড় গোঁসাই অন্য জনকে ছোট গোঁসাই বলিত। বড় গোঁসাইএর দেহত্যাগের সময় হইলে ছোট গোঁসাইকে তিনি বলিলেন যেন তাঁহার দেহ সেইস্থানে সমাধি করা হয়। বড় গোঁসাইয়ের কথামত ছোট গোঁসাই, তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহকে সেইস্থানে পুঁতিয়া রাখিলেন। তৎপরে ছোট গোঁসাইয়ের কালপূর্ণ হইয়া আসিলে তিনি গদখালির তাৎকালিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহার দেহ বড় গোঁসাইয়ের পার্শ্বে সমাধি করিতে অনুরোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য লোকে তাঁহার দেহকে পুড়াইতে লাগিলেন। তখন শীতকাল। বাতাস উত্তর দিকে প্রবাহিত হইলেও সেই চিতাধুম শ্মশানের উত্তর দিকস্থ গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া গ্রামকে আচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হইতে কয়েকমাসের মধ্যে শ্মশানে পরিণত করিল, এই মহামারী যে বৎসর কালীপ্রসন্ন বাবু দেহত্যাগ করেন সেই বৎসর কুশদহতে প্রবেশ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

সম্বর্দ্ধনা।

(স্থানীয় বিষয়।)

বিগত ২৫শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্নে, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল আফিসে গ্রামবাসীগণ এক সভা করিয়া, স্থানীয় জমিদার বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই সভা আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বি, এল মহাশয়

প্রধান উদ্‌যোগী হইলেও, দেশের গণ্য মান্য ও মধ্যবিৎ বহুলোক সমাগত হইয়া গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও স্বাভাবিক বিনয় ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সহসা এ ঘটনা কেন ঘটিল? ইহা কি কেবল মানুষের দ্বারা মান-সম্মান আদান-প্রদানের একটি সাংসারিক খেলামাত্র? ইহার ভিতর কি কিছুই ঐশ্বরীক ক্রিয়া নাই? আমরা এমত কথা কখনই বলিতে পারিব না, আমাদের বিশ্বাস অন্য রকম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুশদহবাসীর নিকট গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে প্রকার সম্মান আছে, এমন কি তাঁহার উর্দ্ধতম পুরুষ পর্য্যন্ত এদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট কত উচ্চ ভক্তি ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, তাহা একটি বিগত ঘটনার উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার হইবে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবু, সারদাপ্রসন্ন বাবুর অন্নপ্রাশনে গ্রামস্থ তাম্বুলী শ্রেণীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা সকলেই এই অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য কিছু কিছু যৌতুক স্বরূপ, প্রণামী দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজে দাঁড়াইয়া সকলকে যত্ন ও সমাদরপূর্ব্বক পান ভোজনে পরিতোষ অন্তে সর্ব্বসমক্ষে বলেন, "তোমরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছ, তোমরা আমার 'রাজা' প্রজা। আজ আনন্দের দিনে তোমাদের নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" এ কথায় সকলে সত্রস্তে করযোড়ে বলিলেন, আপনি আমাদের ভূস্বামী 'রাজা' বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের দেবতার স্থানীয়। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমাদের সকল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিব।" তখন কালীপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "তোমাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আজ তোমরা যে যাহা 'নবকুমার'কে যৌতুক দিয়াছ তাহা তোমাদের প্রত্যেকের খাজনার সহিত 'বার' হইবে। অর্থাৎ যাহার যত বার্ষিক খাজনা আছে, তাহার সঙ্গে ঐ যৌতুকের সংখ্যা যোগ হইয়া, উহাই তোমাদের বরাবরের খাজনা ধার্য্য হইল।" বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব কেমন বিসদৃশ তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তখনকার সময়ে ঐ সকল 'নেহাৎ সরল' লোকের নিকট, প্রস্তাব মাত্রেই শিরোধার্য্য হইয়া গেল। গোবরডাঙ্গার ভিটা জমীর খাজনা যে এত অধিক, তাহার কারণ আমরা এইরূপ শ্রুত আছি। যাহা হউক এক্ষণে বক্তব্য এই

যে, দেশের নিকট যাঁহার সম্মান এইরূপ, যাহারা চলিত কথায় প্রায়ই যাঁহাকে 'রাজা' শব্দে সম্বোধন করে, তাঁহার প্রতি লৌকিক সম্বর্দ্ধনা আর অধিক কি গৌরবের হেতু হইতে পারে? তাই আমাদের বিশ্বাস এটি লৌকিক ব্যাপার নহে। কিন্তু এ বিধাতার ঈঙ্গিত; ভগবান্ এই ঘটনাচ্ছলে গ্রামবাসীর হৃদয় বেদনা আজ গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহাকে দায়ীত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতেছেন। তিনি দেশের প্রতি উদাসীন থাকিতে যেন না পারেন। কিসে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে, কিসে দেশের মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে, কিসে নিরুৎসাহী প্রাণে (দেশের রাজার প্রাণে দেশহিতৈষণা দেখিয়া) উৎসাহ জাগিবে, এই ব্রতে তিনি এখন হইতে আত্ম নিয়োগ করুন, এই আশীষবাণী বলিয়া ভগবান্ তাঁহার মস্তকে সম্মানের মুকুট পরাইয়া দিয়া আরো উন্নত করিয়া ধরিলেন।

এই যে সে দিন গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের "স্মৃতি রক্ষা" (Memorial) ফণ্ডে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, ইহাও এখন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের বিষয় হইয়াছে, কেননা, এখন আর তিনি সাধারণ কাজে আত্মগোপন রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সঙ্গে দেশের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য ভার বৃদ্ধি হইল, তাহা কি তিনি অনুভব করিতেছেন না?

গিরিজাপ্রসন্ন বাবু মনে না করেন যে, আমরা তাঁহাকে এখন উপদেশ দিতে বসিলাম। কিন্তু আমাদের যাহা বিশ্বাস, আমরা তাঁহার প্রতি দেশের জন্য যে দাবী পোষণ করি, তাহা বেদনার সুরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরন্তু শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর আহ্বান-পত্র পাইয়াও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলাম। সম্ভবতঃ সভায় আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, এই ভাবেই প্রকাশ হইত।

স্থানীয় সংবাদ।

বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভে—আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১১ই আষাঢ় পূর্ব্ব প্রস্তাবিত খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ

হইয়াছে। প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্‌যোগে দত্ত-বাটীতে এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে জমীদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সভাপতি হইয়া এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপস্থিত ঐকজন শিক্ষক, একটি পরিচারিকা দ্বারা কার্য্য চালাইয়াও মাসিক ১০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। স্কুলের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করা গ্রামবাসীগণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু যে গ্রামে একটি বালক-বিদ্যালয়ের অবস্থাই সন্তোষজনক নহে, এবং যাঁহাদের অধিকাংশেই বালিকার লেখাপড়ার আবশ্যকতা বোধ করেন না, সেখানে আর্থিক অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়; তবে কি স্কুল চলিবে না? আমরা তাহা বলি না, কেন না যেখানে প্রারম্ভেই ছাত্রী সংখ্যা ৩০।৩৫টি হইয়াছে, সেখানে সহজেই বোঝা যাইতেছে উহার প্রয়োজন আছে। যাহার প্রয়োজন আছে, তাহার প্রাণ থাকা স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠাতৃগণ ধরিয়া থাকুন, চেষ্টা করুন, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের জন্য বিদ্যমান আছে।

মনোমালিন্য—ইতিপূর্ব্বে গৈপুর নিবাসী বনগ্রাম স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত জমীদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর বৈষয়িক ঘটনায় মনোমালিন্য ঘটিয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে; এমন কি, তাহা আইন আদালতের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। দেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে উহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। এ ঘটনায় দেশের লোক বিশেষ দুঃখিত। আমাদের বোধ হয় চারুবাবুর মত লোকের এরূপ বিবাদে লিপ্ত থাকা ভাল নয়। কেন না তিনি শিক্ষাবিভাগীয় শিক্ষিত ব্যক্তি।

যমুনার ঘাট—বিগত বর্ষে আমরা যমুনার ঘাটগুলি পরিষ্কার করা সম্বন্ধে গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর নিকট অনেক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া, এক সময় গভর্ণমেণ্ট নমিনেটিকেল্ কমিসনার, ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঘাট পরিষ্কারের আশ্বাসবাণী পাইয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্য হইতে দেখা গেল না।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দয়ার বিচার।

(প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩১৭।)

[মিশ্র ইমন্‌কল্যাণ—জলদ একতালা।]

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকাস্মৃতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ"

তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;

আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর !

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। } শ্রীরজনীকান্ত সেন।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৫৯। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

গীতা ২।৪৭

তোমার কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্ম্মের ফল-কামনায় যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়, এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

৬০। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

গীতা ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয় তাহাকে যোগ বলা যায়।

৬১। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

গীতা ২।৫৫

হে পার্থ, যখন মনুষ্য মনের সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে স্বয়ং পরিতুষ্ট হয়েন, তখন তাঁহাকে সমাহিত বলা যায়।

৬২। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

গীতা ৪।৩৮

ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং কালসহকারে উহা আত্মাতে লাভ করেন।

৬৩। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

গীতা ৪।৩৯

শ্রদ্ধাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

৬৪। যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

গীতা ৫।৭

যোগী শুদ্ধচিত্ত বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বভূত সহ একাত্মা হইয়া কার্য্য করিয়াও তাহাতে আসিক্ত হয়েন না।

৬৫। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

গীতা ৫।১০

যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, সে তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মফল।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ের "কুশদহ"তে পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া "কর্ম্মফল" প্রবন্ধের প্রারম্ভেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার পূর্ব্বজন্ম নাই পরজন্ম নাই, স্বভাবে জন্মে স্বভাবে মরে, স্বভাবতঃ কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান, তবে তাহার কর্ম্মফল আলোচনায় প্রয়োজন কি ?

আমরা জানি জন্মান্তর-বাদীর মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি জন্মান্তর-বাদ খণ্ডন করিয়া এই স্বভাবিক 'মত' সাধারণে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে জন্য আমাদের কোন দুঃখ বা অকৃতকার্য্যতার বিষয় নাই। সত্য মাত্র প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এ আলোচনায় যদি কোন সত্য থাকে, যদি তাহা একজনের মনেও সায় দিয়া থাকে, তবে ঐ প্রবন্ধের অবশিষ্ট উত্তর এই 'কর্ম্মফল' আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে বোধ হয় একথা একপ্রকার স্থির হইয়াগিয়াছে যে, বর্ত্তমান জন্মের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি অসম্ভব নয়, তজ্জন্য জন্ম মৃত্যু চক্রে এই জগতেই বারম্বার ঘুরিতে হয় না। এখানে জন্মান্তর-বাদীর সহিত এইটুকু পার্থক্য হইল যে, এজগতে এরূপ স্থূল দেহে জন্ম হয় না; কিন্তু পরলোক অস্বীকৃত হইল না। দ্বিতীয় কথা—পূর্ব্বজন্ম না থাকিলেও মানব জীবনের বৈচিত্রতা দেখিয়া পূর্ব্বে যে কিছু ছিল না তাহা মনে হইতে পারে না। আমাদের মতেও বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে দেহ এবং আত্মা ছিল না তাহা বলি নাই; এখানেও কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, মানবদেহের উপাদান আগে পশু পক্ষীর দেহে ছিল আর আত্মা পরমাত্মায় ছিল।

এইখানে আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের স্বীকৃত আর একটী কথার উত্তর দিয়া রাখিতে চাই, তাহা এই যে, প্রত্যেক মানবে যে ভিন্নতা দেখা যায় তাহা দেহ মন বা দেহ মনের সমষ্টি যাহাকে প্রকৃতি বলা যায়, সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে, কিন্তু আত্মায় আত্মায় কোন ভেদ নাই, সকল আত্মাই অভেদ ভাবে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সকল আত্মাই প্রকৃতি জড়িত, সুতরাং অজ্ঞান দৃষ্টিতে ভেদযুক্ত বোধ হয় মাত্র। প্রকৃতি-মুক্ত উচ্চ জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে মূলে কোন পার্থক্য

দেখা যায় না। এমন কি দেশ ভেদে, কালভেদেও জ্ঞানীগণের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের ঐক্য দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সকল আত্মাই যে অভেদ তাহা দিব্য-জ্ঞান সম্মত-সত্য। তৎপরে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে-কথা, এইখানে আরও একটু পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

মানবদেহ, ইতর প্রাণীর উন্নত অবস্থার পরিণতি হইলেও মানবদেহ উৎপত্তির সঙ্গে তাহাতে পরমাত্মা জাত আত্মার সন্নিবেশ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেননা অপর প্রাণীর সহিত মানবাত্মার যে পার্থক্য তাহাও পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। আদিম অবস্থার মানুষ বন-মানুষ বা তাহা হইতে কিছু উন্নত, যাহা অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে দেখা যায়। তৎপরে মানব সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু যুগ যুগান্তর হইতে মানুষ মানুষেরই সন্তান, অথচ এখনও পশুপক্ষী দেহের পরিণতি আদিম মানুষ জন্মাইতেছে না তাহা বলা চলে না। পরন্তু যে লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্ব্বেও মানবের জন্ম ছিল এখানে সে লক্ষণ অক্ষুন্ন থাকিতেছে। পার্থক্য এইটুকু যে ব্যক্তিগত ভাবে ছিল না কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি মানুষ বংশ পরম্পরা-গত একের পাপ-পুণ্য কর্ম্মফল অন্যেও ভোগী হয়? নিশ্চয়ই হয়। আর ইহাতে ভগবানের কোন পক্ষপাত নাই, কেন না মানুষ যেমন পুরুষানুক্রমের পাপ, ক্রটী-দুর্ব্বলতার ভাগী হয়, তেমন জ্ঞান, ধর্ম্ম, সদ্গুণেরও উত্তরাধিকারী হয়। এমন কি শারীরিক রূপ, গুণ, এবং ব্যাধিও সংক্রমিত হয়। ইহা সত্য বলিয়া ধারণা হইলে, মানব জীবনের দায়ীত্ব কত গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, আমার পাপ কেবল আমার ভোগের বিষয় নহে, কিন্তু সমস্ত বংশের জন্য। পক্ষান্তরে পুণ্য পবিত্রতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বংশানুক্রমে চরিত্রের আদর্শ যদি রাখিয়া যাইতে পারা যায়, তাহা কত আনন্দদায়ক। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম না হইলেও বংশগত পাপ পুণ্যের সূত্র প্রকৃতিরূপে আমাদের বর্ত্তমান জন্মের সঙ্গেও অলক্ষিতে আসিয়া থাকে।

এখন আর একটি কথার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাঁহারা এজগতে আত্মিক জীবন লাভ করিয়া—ভগবানের কৃপায় আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি লাভ করেন। পাপাসক্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হইয়া ক্রমে উন্নত

সোপানে আরোহণ করিবে। সুতরাং উভয় শ্রেণীর পরিণাম উত্তমগতি হইলেও মৃত্যুর পর যে একই অবস্থা হয় না, তাহার আভাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রস্তাব ততোধিক পরিষ্কার হয় নাই, এজন্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে।

একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে জ্ঞানবস্তুকে বর্ণনার সময় "জ্যোতিঃ" "আলোক" বলা হয় বটে, কিন্তু তাহা চন্দ্র সূর্য্যের আলোক বা জ্যোতিঃ নহে। জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারেন। জ্ঞানীর মৃত্যুতে যখন তাঁহার নিকট চন্দ্র সূর্য্যের আলোক অপসারিত হয়, তৎপূর্ব্ব হইতে তাঁহার অন্তর-চক্ষুর সম্মুখে জ্ঞানের আলোক আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সুতরাং মৃত্যুতে তাঁহাকে অন্ধকার দেখিতে হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী যখন এই চন্দ্র সূর্য্যের আলোক ব্যতীত আর কোন আলোক দেখে নাই, তখন তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তো দেখিতে হইবেই। আত্মা, ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া ক্রমাগত অস্থির হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতে থাকে, কেন না আত্মা অন্ধকার চায় না আলোকই তাহার স্বভাব। যে মানব এ জগতে স্বভাবের পথে না চলিয়া ক্রমাগত অস্বভাবের পথে—পাপ-পথে চলিয়াছে, তাহার পর তাহার কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুমেয়। অসহায় অবস্থায় পাপের স্মৃতি মাত্র অবলম্বন লইয়া অবস্থান করা, ইহাই তো কারাগার যন্ত্রনা। কিন্তু এই অন্ধকারে পড়িয়া আত্মা যখন ক্লেশে কাতর হইয়া, অজ্ঞানতার মূল—"আমি আমার" জ্ঞানের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই অন্ধকার হইতেই প্রকৃত আমার 'আমিকে' ডাকিতে থাকে—কোথায় দয়াল! তুমি কোথায়! তখন তাহার কাতর-প্রার্থনায় ভগবান্ অল্পে অল্পে তাহার নিকট প্রকাশ হন, একটু একটু করিয়া জ্ঞানের আলোক দান করেন। সেই জ্ঞানালোকে সূক্ষ্ম দেহস্থ আত্মা, সূক্ষ্ম-আত্মিক জগত দেখিতে পায় এবং অন্যান্য আত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহার সদ্গতি হয়।

পাপের পরিণাম যে ভীষণ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। পরন্তু পাপ যে কেবল পরিণামের দণ্ডদায়ক তাহা নহে। যাঁহারা বর্ত্তমান পাপ পুণ্যের ভেদ বুঝিয়াছেন ;—ধর্ম্ম কত উপাদেয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কত সৌভাগ্যবান, পক্ষান্তরে পাপ কত তীব্র, পাপী কেমন কৃপা পাত্র, তাহা তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন।

অন্যথা অজ্ঞানীর নিকট সহস্র "কুম্ভীপাক নরক" বা "সপ্তম সর্গের" ভয়, প্রলোভনের বিষয় বর্ণিত হইলেও বিশেষ কোন ফল ফলে না। ভয়ে বা প্রলোভনে ধর্ম্ম করা, আর প্রেমে প্রেমাস্পদকে চাওয়া সামান্য প্রভেদ নহে। যাহা হউক এখন শেষ সার কথা এই যে, বিশ্বাসের মধ্যে "ঈশ্বর-বিশ্বাস" একমাত্র সার বস্তু। আর আর সকল বিশ্বাসই আনুসঙ্গিক বিশ্বাস। মঙ্গলময় ঈশ্বরে যাঁহার খাটী বিশ্বাস আছে, তিনি জানেন যে পূর্ব্বাপর জন্মের গতি যাহাই হউক তাহা মঙ্গলজনক হইবেই। এই বিশ্বাসে সাধক নিশ্চিন্ত। দাস-লেখক এইখানে পাঠকপাঠিকার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছে।

আহ্বান।

ওরে, মান কুড়াইয়ে কি হবে?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর্ তুই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে?
দেরে দেরে লাজ ভাসা'য়ে,
আজ সাজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল্ ফুল-আঙিয়া—
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যায় ভাঙিয়া।
আয় বুকে বল বাঁধিয়া,
আজ ডাকে তোরে চিরসাথী তোর
বুকফাটা দুঃখে কাঁদিয়া।
কে ওই করুণা যাচে রে!
প্রাণের ভিতরে পুড়িয়া গিয়াছে,
চল্ চল্ ওর কাছে রে!

জীবনে বরিষ অমিয়া—
সকলের কাছে মহিমার মাঝে
ফলভরে থাক’ নম্রিয়া।
সমস্ত যাও সহিয়া,
শত অবজ্ঞা শত বিদ্রূপ
যাও নতশিরে বহিয়া।
মিছে, মান কুড়াইয়ে কি হবে?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর্ তাই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাজারিবাগের পথে।

কোনরকমে আহার করিয়া তিন জনে হাওড়া ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদিগকে হাজারিবাগ রোড্ ষ্টেসনের টিকিট কিনিতে হইল। দশ ঘণ্টাকাল বৈচিত্রহীন বাষ্পীয়যানে বাস করিয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় হাজারিবাগ রোড্ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তখনও সে রাস্তায় মোটরগাড়ী (motor car) চলিত না। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা তখনই দুই খানি পুস্‌পুস্ ভাড়া করিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে কেবল আঁকা বাঁকা পাথুরে রাস্তা, কেবল চড়াই ও উৎরাই, তাহাতে আবার “পুস্‌পুস্” নামক ঠেলাগাড়ীতে যাওয়া, তাহাতে নিদ্রা হইবার কোন রকম উপায়ই ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কি করি চলিতে চলিতে কবির “বিঘোরে বিহারে চ'ড়নু এক্কা”র সহিত পুস্‌পুসের সাদৃশ্য কল্পনা করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রে অল্প নিদ্রা আসিল। কিন্তু হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিকটু উৎসাহ সূচক কুলিদের হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিলাম। এখনও এ প্রদেশে ব্যাঘ্রের উৎপাত মধ্যে মধ্যে হয়। রাত্রে কুলিরা এইরূপ শব্দ করিয়া ব্যাঘ্রকে দূরে রাখে। ক্রমে পাখীদের জাগরণকাল নিকটবর্ত্তী হইল। পর্ব্বত সন্নিকটস্থ জঙ্গলে পাখীদের

গৌরব চিরকালই অধিক। শকুনি সকল যেন একটা দীর্ঘকাল রজ্জুর আকারে পাণ্ডুবর্ণ আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখনও নভপটে সূর্য্য উঠে নাই। ক্রমে আকাশের সীমাপ্রান্ত হইতে জলভরা ক্ষেত্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিল। শিশির স্নাত বৃক্ষগুলি সূর্য্যকিরণ পতনে সমুজ্জ্বল হইল। কিছুক্ষণ পরে আমরা 'বগোদরা' পৌঁছিলাম। সেখানে একটি ডাক-বাংলা আছে। বাজারের ভিতর দিয়া আমাদের দ্বিচক্রযান পুস্‌পুস্‌ চলিতে লাগিল। এই দূর দেশেও মাড়োয়ারীদিগের দোকান দৃষ্ট হইল। আমরা সেখানে আর না নামিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এতদ্দেশীয় অনেক লোককে চক্ষুরোগ-গ্রস্ত দেখিলাম। এতদ্দেশের ধূলায় প্রস্তর বাহুল্য থাকায় গ্রীষ্মকালে চোখ উঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়।

যখন বেলা সাড়ে নয়টা তখন কতিপয় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন অভিলাষী বাঙালী বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাস্তাঘাটের অজ্ঞতাহেতু আমরা বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই; অপরিচিত হইলেও তাহাদের নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিয়া পান করিলাম। জলযোগের পর, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এই বিজন পথে চলিতে চলিতে একটি শিলারাশির পাদদেশে এক বৃহৎ উচ্চমুখী দেবালয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। দেবালয়ের বৃহৎ চত্বর প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; কিন্তু তখন বেলা এগারটা, সুতরাং জঠরানলের প্রকোপ, সেই দেবালয় দর্শন লালসা অপেক্ষা অধিক হইল। কাজেই আমরা আর অপেক্ষা করিলাম না। ইহার পর 'ভেন্সোরা' নামক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরেই এই জঙ্গল দেখিয়া আতঙ্ক হয়, রাত্রের বিভীষিকা সহজেই অনুমেয়। পথে মধ্যে মধ্যে বাঘ মারিবার মাচান্‌ দৃষ্ট হয়। এই জঙ্গলের পরেই টাটিঝরিয়ার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। দূরে বড় বড় শালবৃক্ষ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—পরে বৃক্ষ° সমুদ্র তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়াছে।

বারটার সময় 'টাটিঝরিয়া' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানকার ডাক-বাংলায় স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় যাত্রা করা গেল। তখন বেলা প্রায় দেড়টা। সন্নিকটবর্ত্তী 'কোদারমা' নামক স্থানে বৃহৎ অভ্রখনি থাকায় রাস্তাগুলিতে অভ্রকণা সকল রজত খণ্ডের ন্যায় সূর্য্যকিরণে চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল।

টাটিঝরিয়ার পর হইতে নৈসর্গিক দৃশ্য অতি সুন্দর। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের ধারে অল্প জল বিশিষ্ট ছোট ছোট ঝরণা দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার ফেণিল তরঙ্গ-তাড়নে প্রস্তরখণ্ড সমূহ বিক্ষোভিত হইতেছিল। দূরে ক্ষেত্রের ধারে ছোট ছোট মেঘে ঢাকা গ্রামগুলি ছবির মত দেখাইতেছিল; এবং ক্ষেত্রের ক্রমোচ্চ আলগুলি ঠিক সিঁড়ির মত বোধ হইতেছিল। তখন বর্ষাকাল। সমুদয় মকাই ক্ষেত্রগুলি জলে ভাসিতেছিল। আমরা একটি ঝরণায় স্নিগ্ধ বারি পান করিলাম। সেই জলের স্নিগ্ধতা বর্ণনা করা যায় না, কেবল সম্ভোগ করা যায়।

অভাবই মনুষ্যকে অসুখী করে। পুস্পুসের কুলিদিগের অর্দ্ধনগ্ন সরলতা শ্রীযুক্ত বপু দেখিয়া আমাদের পাশ্চাত্যাভিমানী সভ্য লোক অপেক্ষা অধিক সুখী মনে করিলাম। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম ও বিলাসিতার ছায়ায় তাহারা আশ্রয় লইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ কি হিন্দুসমাজের ইহাদের জন্য করিবার কি কিছুই নাই? ইহাদের মধ্যে এখনও পার্ব্বতীয় আদিম জাতিদিগের ন্যায় কাউয়া, চন্দনা প্রভৃতি পক্ষী ও পশুবাচক নাম প্রচলিত আছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাদদেশ দিয়া আমাদের গাড়ী সশব্দে চলিতে লাগিল। ধরণীর উষ্ণশ্বাসে কুলিদের স্বেদধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্য-দগ্ধ বৃক্ষান্তরাল হইতে ঘুঘুর দূরাগত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ৪টার সময় 'মেরু' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখন হইতে রাস্তায় ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের সমাগম দেখিতে পাইলাম। চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ পরে মৃদুগুঞ্জন সদৃশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, অদূরে গোচারণ ক্ষেত্রে অনেক গরু চরিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের গলায় নানাবিধ লৌহপিত্তলের ঘণ্টা বাঁধা রহিয়াছে। কাহারও কাহারও বা গলায় কাষ্ঠের একপ্রকার কচ্ছপের মুখের ন্যায় যন্ত্র বাঁধা আছে। রাখালেরা ইহা দ্বারা বিপথগামী পশুগণকে শব্দ দ্বারা অনুসরণ করিতে পারে। দূর হইতে ইহাই আমাদের অভিনব গুঞ্জনবৎ শব্দ প্রতীয়মান হইয়াছিল।

বেলা পড়িতে লাগিল। দীপ্ত সূর্য্য মধ্য গগন হইতে সীমাপ্রান্তে উপনীত হইল—সিন্দূর রাগরঞ্জিত গগনে পক্ষিগণ তাহাদের দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া

নিজ নিজ আবাসাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল— ক্রমে ম্লানপ্রভ আলোক-চ্ছায়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের আবির্ভাব হইল। হাজারিবাগে যাইয়া ধূসর আকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব প্রত্যাশা করি নাই। রজনীর অন্ধকারের সহিত আমরা হাজারিবাগে পৌঁছিলাম। আমাদের গন্তব্য স্থান সহরের বাহিরে থাকায় বাড়িতে পৌঁছিতে কিছু দেরি হইল। নিদ্রান্তে পর দিন প্রাতে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। হাজারিবাগের পথের কথা অন্তত বেদনার দরুণ কখনও ভুলিতে পারিব না।

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত।

ভেজাল খাদ্য।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে সকল বিষয়েই ভেজাল চলিতেছে। ধর্ম্মে ভেজাল, সমাজে ভেজাল, আচারে ভেজাল, ব্যবসায়ে ভেজাল —এইরূপ ভেজালে ভেজালে দেশটা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল যে,কোন কোন ব্যবসায়ী খাদ্য দ্রব্যে বিষম অনিষ্টকর ভেজাল দিয়া দেশের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই কি ইহার কারণ নহে? পূর্ব্বে লোকের ধর্ম্মভয় ছিল সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইতে তাহারা ভীত হইত। যাহা দেবতাকে দিতে হইবে, যাহা ব্রাহ্মণে খাইবে, তাহাতে কোন অখাদ্য দ্রব্য ভেজাল দিলে নিজের অমঙ্গল ঘটিবে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ এই বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিতে পারেন, কিন্তু এই বিশ্বাসের ফলে তখন লোকে এই পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিত। আজকাল জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের এই কুসংস্কার দূর হইয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা অশেষ দুঃখ ও কষ্টভোগ করিতে বসিয়াছি। বাজারে খাঁটি দ্রব্য প্রায় মিলে না, যাহা পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। কৃত্রিম জিনিষই সুলভ দেখা যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানহীন। অজ্ঞানতা বশতই হউক অথবা অর্থাভাবেই হউক তাহারা ঐ সকল বিষ খাইয়া বহুবিধ পীড়া ভোগ করিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কোন পল্লীতে অম্লরোগ ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন

১০০ জনের মধ্যে ৭৫ জন অল্পাধিক অম্ল রোগাক্রান্ত। চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখুন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা পরিপাক-বিকার নাই এমন একটি লোক খুঁজিয়া মিলিবে না। বাজারের ভেজাল খাদ্য খাওয়াই এই সকল রোগের একটি প্রধান কারণ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশত একান্ত অসার বিলাসিতায় অযথা ব্যয় করিয়া শরীর রক্ষাকল্পে কার্পণ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই চারি পয়সা সস্তার জন্য বাজারের জঘন্য ভেজাল খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করি; কিন্তু ইহা দ্বারা যে আমাদের লাভের গুড় পিপীলিকায় খাইতেছে, তাহা এক বারও চিন্তা করি না। মহাত্মা সুশ্রুত বলিয়াছেন "তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যম্।" আহার হইতেই বল, আরোগ্য বর্ণ ও ইন্দ্রিয়প্রসন্নতা জন্মে। আহারের বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে।

সম্প্রতি 'বেরী বেরী' নামে এক নূতন রোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে। এই রোগে জ্বর, পদস্ফীতি ও অত্যধিক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া হঠাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই অভিনব রোগের নিদান সম্বন্ধে চিকিৎসক-মণ্ডলীর মধ্যে মতের বিলক্ষণ অনৈক্য দেখা যায়, কিন্তু অনেক প্রবীন ডাক্তার বলেন যে, ভেজাল তৈল খাইয়া লোকে এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। শুনিতে পাই, আজকাল অনেক ব্যবসায়ী সর্ষপের সহিত শেয়ারগোজা, পচা বাদাম প্রভৃতি ভাঙিয়া খাঁটি সর্ষপ তৈল বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ভেজাল তৈলের সহিত 'বেরী বেরী' রোগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে স্বাস্থ্যের ঘোর অনিষ্টকর তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ঘৃত আমাদের পরম হিতকর ও পুষ্টিকর খাদ্য, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে ঘৃতকে স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ ও বলবর্দ্ধক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ ঋণ করিয়াও যে ঘৃত খাইতে উপদেশ দিয়াছেন, আজ সেই পরম কল্যাণকর রসায়ন চর্ব্বি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত। বাজারের এই দূষিত ঘৃতে ভাজা লুচি কচুরি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। অজ্ঞ বালকেরা এবং অপরিণামদর্শী যুবকগণ প্রত্যহ এই অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইয়া থাকেন। অগ্নিবলের আধিক্য হেতু সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপকারিতা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু সময়ে ইহার কুফল নিশ্চয় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দুগ্ধ আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই নিত্য পানীয়। ইহার ন্যায় জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধক খাদ্য অল্পই দৃষ্ট হয়। দেহের পুষ্টির জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, দুগ্ধে সে সমুদয় বর্ত্তমান আছে। কলিকাতায় বা অপরাপর সহরে যে দুগ্ধ সরবরাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ বহুলতা দৃষ্ট হয়। খাঁটি দুগ্ধ মিলান বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীগণ দুগ্ধের সর বা মাখন তুলিয়া লইয়া অথবা দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। দুগ্ধে জল মিশাইলে তাহার পুষ্টিকরী শক্তি নষ্ট হয় এবং নানা স্থানের দূষিত জল মিশ্রিত করায় দুগ্ধ দূষিত হয়; দূষিত দুগ্ধ হইতে অনেক সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। দুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। দূষিত দুগ্ধ পানে শিশুর যকৃৎ পীড়া জন্মিয়া থাকে। আজ প্রতি সহরে শিশুর মৃত্যু হার এত বাড়িতেছে, দূষিত দুগ্ধ পানই তাহার প্রধান কারণ। আশা করি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশবাসিগণ সতর্ক হইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ডাক্তার) গোবরডাঙ্গা।

কুশদহ। (৮)

সারদাপ্রসন্ন বাবু—১৮৩৪ সালে সারদাপ্রসন্ন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। সারদা-প্রসন্ন বাবুর বিবরণ আমরা "কুশদ্বীপ কাহিনী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কালীপ্রসন্ন বাবুর দুই পুত্র—সারদাপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। এই পুত্রদ্বয় নাবালক থাকায় মৃত্যু কালে কালীপ্রসন্ন বাবু এক উইল করিয়া যান, তাহাতে সারদাপ্রসন্নের মাতা বিমলা দেবীকে ও তারাপ্রসন্নের মাতা শ্যামাসুন্দরীকে আপনার বিষয় সম্পত্তির এক্‌জিকিউট্রিক্স এবং কলিকাতার খ্যাতনামা আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দে (যাঁহাদিগকে লোকে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু বলিত) ইহাদিগকে এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান। কালীপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে তারাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হয়। তারাপ্রসন্ন বাবুর সন্তান সন্ততি না থাকায় সারদাপ্রসন্ন বাবুই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তারাপ্রসন্নের মাতা সারদাবাবুকে নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে দেন নাই। অবশেষে তারাপ্রসন্নের মাতা বার্ষিক চৌদ্দ হাজার টাকা মুনফা লইয়া কাশীতে বাস

করেন। তাঁহার সৎকার্য্যের জন্য কাশীর লোকে তাঁহাকে "গোবরডাঙ্গার রাণী" বলিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সারদাপ্রসন্ন বাবুর বাল্যকালে শীলসাহেব নামক এক জন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি বরাবর সারদা বাবুকে পড়াইতেন। যখন তারাপ্রসন্ন বাবুর মাতার সঙ্গে সারদাপ্রসন্ন বাবুর দাঙ্গা হয়, তখন ঐ সাহেব চাকরি ছাড়িয়া দেন। সাহেব কর্ম্ম ছাড়িলে পর বরাহনগরের মুরারিমোহন শীল ইঁহার গৃহ-শিক্ষক হন। সারদাপ্রসন্ন বাবু ইংরাজীতে বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলেও তিনি নিজ জাতীয় ধর্ম্মত্যাগ করেন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক ও শ্রাদ্ধ শান্তি এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। জমিদারী কার্য্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তিনি নিজ চেষ্টায় জমীদারীর আয় ২০।২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেন।

সারদাপ্রসন্ন বাবুর দ্বারা দেশের সমূহ উপকার হয়। গোবরডাঙ্গায় যে সকল বড় বড় রাস্তা ঘাট দেখা যায়, তাহা তঁাহার চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে নির্ম্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইনি প্রতিদিন ৫।৭ হাজার লোককে অন্নদান করিতেন। এবং এইরূপ অন্নদান ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আতিথেয়তা এত দূর ছিল যে, তাঁহার সময়ে গোবরডাঙ্গার বাজারে কাহাকেও রাঁধিবার জন্য হাঁড়ি কাঠ কিনিতে হইত না। গ্রামে বা বাজারে আগুন লাগিলে তিনি তাহাদিগের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। যে যে সদ্গুণ থাকিলে লোকরঞ্জক হওয়া যায়, তাঁহার সে সমুদয় সদ্গুণই ছিল। তিনি একজন আদর্শ জমীদার ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে গোবরডাঙ্গার বর্ত্তমান ইংরাজী বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন, একটী চতুষ্পাঠীতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি যমুনা নদীর উপর একটী সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১২৭৫ সালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ বাত্যা হয় তাহাতে অনেকেই গৃহহীন ও নিঃস্ব হইয়া যায়, কিন্তু সারদাপ্রসন্ন বাবুর অনুগ্রহে সে সময়ে গোবরডাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকে কোন কষ্ট অনুভব করিতে পারে নাই। তাঁহার এই দানশীলতা ও পরোপকারিতা গুণ দেখিয়া তদানীন্তন স্কুল ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেব তাঁহার এডুকেশন রিপোর্টে লেখেন যে, সারদা বাবু বিগত ভীষণ বাত্যায় যেরূপ অর্থ

ব্যয় ও কায়িক শ্রম করিয়া প্রজাপুঞ্জের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যদি তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করিবার মানস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করিতে হইত। (কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নূতন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই উপাধি গভর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দিয়াছেন)। সারদাপ্রসন্ন বাবুর বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে দু'একটী উল্লেখ করিতেছি।

"একজন ব্রাহ্মণ সারদাপ্রসন্ন বাবুর পিতার নিকট ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। অনেকদিন যাবৎ কিছুতেই ঐ টাকা আদায় না হওয়ায় দ্বারবানেরা ব্রাহ্মণকে একদিন দুপুর বেলায় জমিদারী কাছারীতে ধরিয়া লইয়া আইসে। সারদাবাবু তখন বৈঠকখানায় ছিলেন। মুন্সী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পোষাক পরিচ্ছদ ও মুখশ্রী দেখিয়া, বিশেষতঃ অনাহারী অবস্থায় দুপুর বেলা তাঁহাকে আনা হইয়াছে বলিয়া সারদাবাবু আমলাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে অগ্রে ভোজন করাইতে বলিলেন। আহারের পর ব্রাহ্মণ যখন সারদাবাবুর নিকট আনীত হইল, তখন তিনি ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। এবং সমুদায় আমলাদিগের সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের পাঁচহাজার টাকার খৎ ছিড়িয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে আর দেনা দিতে হইবে না বলিলেন। অধিকন্তু উঁহাকে পাঁচ টাকা পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।"

পল্লীস্থ কোন নিঃস্ব ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ পাইলে সারদাপ্রসন্ন বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধ, ডাক্তার ও পথ্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে নিজেও রাত্রি দু'প্রহর পর্য্যন্ত পীড়িতের বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। "একবার গৈপুরের মাধব বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের উরুস্তম্ভ পীড়া হয়। পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বরফ ও মাংস ব্যবহার করিতে বলে। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা বড় মন্দ ছিল, বরফ ও মাংস যোগাইবার ক্ষমতা ছিল না। বাড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্র ১০।১২ বৎসরের বালক, পিতার এরূপ সাংঘাতিক পীড়া ও চিকিৎসার অক্ষমতার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইতেছিল। সারদাপ্রসন্ন বাবু উপর হইতে দৈব ঘটনায় তাহা দেখিতে পান। এবং বালকটীর নিকট তাহাদের

অবস্থা ও তাহার পিতার পীড়ার বিবরণ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পিতার জন্য কলিকাতা হইতে বরফ ও মাংস আনিবার ডাক বসাইয়া দিলেন (তখন রেল হয় নাই)। যতদিন মাধব বাড়ুয্যে জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহাকে বরফ ও মাংস যোগাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে বাঁচিতে হয় নাই। ঐ উরুস্তম্ভ পীড়াতেই সত্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।"

দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সারদাপ্রসন্ন বাবু অপরিণত বয়সে ১৮৬৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধুনী" কাব্যে এক স্থানে সারদাপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"দেখিব গোবরডাঙ্গা সারদাপ্রসন্ন, ধনশালী তমোহীন বন্ধুতা-সম্পন্ন ;

পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী, স্বভাবে সাবিত্রী কিংবা সীতা বিম্বাধরী"

দীনবন্ধু বাবু তাঁহার "বিয়ে পাগলা বুড়ো নামক পুস্তকখানি সারদাপ্রসন্ন বাবুর নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উপর অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন। সারদাপ্রসন্ন বাবুর একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, বিয়েপাগলা ছিল, সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত পুস্তক রচিত হইয়াছিল। (ক্রমশ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক।

হিমালয় ভ্রমণ।

(পরিশিষ্ট)

এতদূরে আমার হিমালয় ভ্রমণ একপ্রকার শেষ হইল। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে, আমার ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য দুটী স্থান। তাহার অন্যতম, পঞ্চনদ ক্ষেত্রে, গুরু নানক-তীর্থ "অমৃতসর" এখনও বাকি আছে। ইতিমধ্যে যে এক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল,—যেপ্রকার কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে, ঐ সাধ বুঝি পূর্ণ হইল না। কিন্তু বিধাতার করুণায় সকলই অনুকূল হইয়া গেল ; সুতরাং তাহাতে আজ আমার কি প্রকার আনন্দ হইল তাহা পাঠক পাঠিকাগণ অনুভব করুন।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, (সে কথাও প্রথমে বলা হইয়াছে)

কেবল একজন লোক নিজের বিশ্বাস মতে নিঃসম্বলে—স্বাধীনভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে মাত্র ; তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে এবং তত্তৎ স্থানের বিবরণসহ বর্ণনাটী যে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা আশা করা যায় না। শরণাগতের সঙ্গে ভগবানের যে 'খেলা' তাহার বর্ণনা বিশ্বাসী ভক্তের সদা স্পৃহনীয় হইলেও একাধিকবার এ দীর্ঘ-বর্ণনা সাধারণ পত্রিকায় আর কেন ? এই মনে করিয়া এইখানে এ প্রবন্ধ শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যে বন্ধুর আদেশের ভিতর দিয়া ভগবান্ ইহা প্রকাশ করাইলেন (অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস) তিনি পুনরায় বলিলেন "তাহা উচিত নহে।" অর্থাৎ উভয় স্থানের নাম করিয়া যে বর্ণনার কথা প্রথমে স্বীকার করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ করা আবশ্যক। এইজন্য আমার "অমৃতসর" দর্শন এবং যাওয়া আসার পথে যে সকল স্থানে ও বিষয়ে, ভগবানের মহিমা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা "হিমালয় ভ্রমণ (পরিশিষ্ট)" রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ণনা যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবেই করিতে চেষ্টা করিব। আশাকরি পাঠক পাঠিকাগণের তজ্জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার হরিদ্বার হইতে বেলা ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। অমৃতসর যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঘটনা আমাকে যেন আরো কিছুর মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে চাহে। সঙ্গে ট্রেণ ভাড়া অল্প থাকায় আজ রুড়্‌কি পর্য্যন্ত টিকিট করিলাম, এবং বেলা প্রায় ১২টার সময় রুড়্‌কি ষ্টেশন হইতে ভিতরে আসিলাম। অসময় হইয়াছে, বিশেষ এখানে কেহই পরিচিত নাই। একটী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সাম্‌নে চাকর ছিল, তাহার নিকট জানিলাম এ বামাচরণ বাবুর বাড়ী ; তিনি এখন মিরাট গিয়াছেন, বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা আছেন মাত্র। আরো জানিলাম এ সহরে বাঙালী ২।৩ জন আছেন এখন সকলেই কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। আমি বামাচরণ বাবুর বাড়ী স্নান করিয়া চাকরের নিকট আমার আসন রাখিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলাম।

"রুড়্‌কি ব্রীজ" অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গার ক্যানাল আসিয়া এখানে একটী পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী অগভীর নদী থাকায় তাহার উপর দিয়া সেতুযোগে ক্যানাল লইয়া যাইতে হইয়াছে। সেতু বা ব্রীজ্ প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। তলদেশ ও দুইপার্শ্ব খিলানের গাথ্‌নি অতি আশ্চর্য্যজনক এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ। তৎপরে খুব খোলা জায়গায় রুড়্‌কি কলেজের সম্মুখে গিয়া পড়িলাম, কিন্তু ভিতরে যাইতে আর ইচ্ছা হইল না, কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া

একটি উদ্যান বাটিকার দ্বারে লেখা দেখিলাম R. P. Mission, বুঝিলাম খৃষ্টীয় মিশন। ভিতরে গেলাম তখন স্কুলের কার্য্য হইতেছে দেখিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় একটি শুভ্র শ্মশ্রুধারী মিষ্টভাষী ভদ্রলোক (হিন্দুস্থানী বোধ হইল) আসিয়া আমার আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ভাব বুঝিয়া একটা ঘরে বসিতে দিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলেন। তৎপরে আসিয়া আলাপ করিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ দাস। এখানে একটী অনাথ আশ্রম এবং বালক-বালিকা-স্কুল আছে। নারায়ণদাস বেশ সদালাপী, আমাকে কথাবার্ত্তায় এবং জল—(বোধ হয় কিছু খাদ্যও ছিল) পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম ও একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। যখন সহরে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে।

বামাচরণ বাবুর বাড়ী হইতে আমার আসন লইয়া বাবু শ্যামাচরণ সুরের বাসায় গেলাম ও তথা হইতে হেমবাবুর বাসায় আসিলাম। এখানে রাত্রিতে ভগবানের নামগান হইল। দিনের বেলায় আমার আহার হয় নাই শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। আহার করিয়া শ্যামবাবুর সদর ঘরে আসিয়া রাত্রে শয়ন করিলাম।

২৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। প্রাতে স্নানাদি করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া যখন বামাচরণ বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ আমার পশ্চাতে বামাচরণ বাবুর চাকর আসিয়া আমার হাতে একটী সিকি দিয়া বলিল, "মহারাজ! কাল মাইজীর বাড়ী আপনার আহার হয় নাই, ইহা আপনার জন্য তিনি দিয়াছেন।" আমি মনে করিলাম যদি ইহা না লই তবে বৃদ্ধা মনে ও সংস্কারে আঘাত পাইবেন। বোধ হয় তিনি আমাকে হিন্দুস্থানী সাধু মনে করিয়াছিলেন।

শ্যামবাবুর বাড়ী আহার করিয়া বেলা ১০টার পর ষ্টেশনে আসিলাম, সাহারাণপুরের টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। বেলা ৪টার পর সাহারাণপুর পৌঁছিয়া, ষ্টেশনে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে সাধুদিগের থাকিবার স্থান কোথায় পাওয়া যাইবে, সে ব্যক্তি বলিল "মহারাজ! বাবু গঙ্গারামের বাগিচায় চলে যান।" ষ্টেশনের নিকটেই বাবু গঙ্গারামের বাগিচায় আসিয়া দেখিলাম, বাগিচা মানে বাড়ী; স্থানটা অনেক যায়গা লইয়া একটা পল্লীর

মত। কতকগুলা বাড়ী ঘর বসতি আছে, কিছু কিছু শস্য ক্ষেত্রেও আছে, তাহার মধ্যে বাবু গঙ্গারামের ছোটখাট পাকা বাড়ী। অনেক লোকজন বালক বালিকা ও গো, মহিষ লইয়া—একটা বড় পরিবার বোধ হইল। বাবু গঙ্গারাম তখন বাড়ী ছিলেন না। তিনি রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার। আমি তাহার গৃহে অতিথি হইলাম।

আজ আমি এই প্রথমে পঞ্জাবী গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইয়া এখানে একটু বিশেষত্ব দেখিলাম। ইহারা যে এরূপ সাধুসেবা প্রিয় তাহা আমি আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। গুরু নানকের ধর্ম্মের প্রভাবে সাধুভক্তি এই জাতির অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। আমি আহারাদি করিয়া শুইয়াছি তখনও নিদ্রা আসে নাই, হটাৎ দেখি আমার কে যেন পা টিপিয়া দিতেছে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি, সুন্দর সুন্দর ৩টী বালক, "মহারাজ সেবা করে, সেবা করে" বলিতেছে—তখন বুঝিলাম তাহারা গৃহস্বামীর পুত্রগণ। তাহাদের শিক্ষাই এই যে, গৃহে সাধু শান্ত আসিলে তাঁহাদের পদসেবা করিতে হয়। অতঃপর আমি তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া গল্প শুনাইলাম এবং তাহারা আমার নিকট বাংলা বর্ণমালা লিখিয়া লইয়াছিল।

৩০শে কার্ত্তিক। প্রাতে বাবু গঙ্গারামের সঙ্গে আলাপ হইল। তৎপরে স্নানাদির কার্য্য শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান অন্তে সহরের মধ্যে চলিয়া গেলাম। বঙ্কিমবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি অনেক সৎপ্রসঙ্গ করিয়া শেষ এক সাধুর কথা বলিলেন যে, তিনি সাধন দ্বারা এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বজীবে তাহার একান্ত সমবেদনা অনুভব হইত। একদা তিনি দেখিলেন এক গাড়োয়ান গোরুর পীঠে দুই ঘা চাবুক মারিল, সাধু তাহাতে নিজদেহে ব্যথার ভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে তাঁহার পীঠের কাপড় তুলিয়া দেখিতে বলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার পীঠে দুইটী চাবুকের দাগ পড়িয়াছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিমবাবু যেন এ ঘটনা সচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলেন, এবং উক্ত সাধু বোধ হয় তাঁহার গুরু ছিলেন। অতঃপর শেষ কথা হইল, আগামী কল্য প্রাতে যেন তাঁহার বাড়ী আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করি, আর আমার সঙ্গীত শুনাইবার অভিপ্রায়

বুঝিয়া বলেন প্রাতেই সঙ্গীত হইবে। এখানে নৈনিতাল সন্নিহিত ভীমতাল আশ্রমস্থ সোহহং স্বামী'র (ভূতপূর্ব্ব সার্কাসের প্রফেসর শ্যামাকান্ত চাটুয্যের) এক শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহারাণপুরে আরও ২।৪টী বাঙালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

১লা অগ্রহায়ণ। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বেলা ২টার সময় সাহারাণপুর ছাড়িলাম। যাত্রাকালীন ষ্টেশন সন্নিহিত কারখানায় বাবু গঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে তিনি বলিয়াছিলেন। আমি আজ অম্বালা পর্য্যন্ত যাইতে চাই শুনিয়া তিনি একখানি টিকিট করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "অম্বালা বাবু মুক্কাসিংএর গুরু দরবারায় থাকিবেন।"

(ক্রমশঃ)

দুঃখ।

ওহে দুঃখ তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
অতি নিদারুণ তুমি ভবের মাঝারে,
পাষাণ সমান তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
তথাপি করিনা ভয় আমি তো তোমারে

ভীষণ ভ্রূকুটি করি যার পানে চাও,
তব কোপানলে ভস্ম করি সেই ক্ষণে
অতুল বিভব রাশি, জনমের মতো
রাখো সেই অভাগার মরণ-জীবনে।

যেখানে নির্দ্দয়, তুমি কর পদার্পণ,
স্বর্গের মাধুরী যদি তার কাছে হারে,
তাহ'লেও মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হ'য়ে যায় ;
সাজাইয়া ধ্বংস-রাশি নষ্ট কর তারে।

সুখ যথা মন-সুখে করেন বসতি
অটল অচল সম অনন্তের তরে,—
একবার তব দৃষ্টি পড়িলে তথায়,
আকাশ-কুসুম-সম ভাঙে হু হু করে'।

শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা অন্নপূর্ণা সদা
দীন হীন দরিদ্রের বসতি অন্তর,
এমন সুখদ স্থানে তোমার কৃপায়
দুর্ভিক্ষের ভীম দৃশ্য উঠে নিরন্তর।

সাহসী নির্ভীক বীর, প্রতিজ্ঞা পালনে
নিজ প্রাণ তুচ্ছ মানি দেয় জলাঞ্জলি ;
এহেন বীরেশ উড়ে আবর্জ্জনা মতো
সহিতে নারিয়া তব ভীম-শরাবলী।

ধার্ম্মিক প্রধান, যাঁর ধর্ম্মে রত মন,
পরদ্বেষ পাপকার্য্য পৃথিবীতে যতো
স্পর্শিতে যাঁহার অঙ্গ নারে কদাচন,
সেও ছাড়ে নিজ-পথ কণ্টকের মতো।

এহেন ভীষণ তুমি শার্দ্দূল-বিজয়ী
তব উপক্রমে ভাঙে সুখ সাধ যত,—
শূন্যে অট্টালিকা সম, কটাক্ষ সন্ধানে ;
তোমার তাড়নে কাঁপে সবাই সতত।

কে বলে গরল 'সেঁকো' অতি ভয়ঙ্কর,
যাহার পরশে হয় বিলুপ্ত চেতন,
একেবারে খুলে যায় ভবের শৃঙ্খল
জ্বালিয়া হৃদয়-মাঝে আক্ষেপ-জ্বলন।

কিন্তু তব ভীম শ্বাস স্পর্শে তনু যার,
চির দিন কাঁদে সেই এ ভব-ভবনে ;
তাহার সুতীব্র জ্বালা থামেনা কখন
আলিঙ্গন করে তোমা সজল নয়নে।

যদিও মূরতি তব অতীব ভীষণ,
তথাপি হৃদয় মম নহে বিচলিত,
চির সখা তুমি মোর শৈশব যৌবনে,
তাই সদা তোমা হেরি হই আনন্দিত।

অভ্যাসে গরল হয় অমৃত সমান,
শ্বাপদে মানবে হয় অক্ষয় প্রণয়,
তবে তোমা সনে মোর সুদৃঢ় সদ্ভাব
কেন না হইবে ভবে ?—হ'য়েছে নিশ্চয় !

শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গী তুমি দুঃখ মোর,
কৈশোরের বন্ধু তুমি বিধির বিধানে,
তবে এ যৌবন কালে ভ্রূকুটি বিস্তারে
কেন মিছে ভয় মোরে দেখাও বয়ানে ?

এস এস প্রিয় বন্ধো, তুমি মোর সখা,
আজীবন তব সনে রহিব জড়িয়া ;
কেবলে তোমায় দুঃখ অতি নিরদয়,
তুমি যে আমার সঙ্গে রয়ে'ছ মিশিয়া !

উঠুক্ সহাস্য-মুখে তব নিন্দা-ধ্বনি,
গাহুক কল্পনা-কবি তব নিন্দা গান ;
জগত বিপক্ষ হ'লে তবুও বলিব—
"অন্ধের নয়ন দুঃখ শীতলিতে প্রাণ।"

তুমি মোর চির সখা চির দিন থাকো
আমারে ঘেরিয়া, দূরে যেওনা কখন।
জগদীশ-পদে সদা করি এ প্রার্থনা
সহাস্যে তোমারে পারি করিতে বরণ।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সংগ্রহ।

মার্কিনের বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ এক বিরাট সভায় বহু পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন;—তুঁতে জলের দূষিত বীজাণু বিনষ্ট করে। টাইফয়েড্ জ্বর, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সকল দূষিত জলস্থ বীজাণুর দ্বারাই হইয়া থাকে। তুঁতে দ্বারা শোধিত জল পান করিলে ঐ সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। জলকে সিদ্ধ করিয়া অত্যন্ত উষ্ণ করিলেও যে সকল বীজাণু মরেনা, তুঁতে দ্বারা তাহারা মরিয়া যায়। জলে এরূপ পরিমাণে তুঁতে মিশ্রিত করিতে হয়, যাহাতে বর্ণ বা আস্বাদের কোনো ব্যতিক্রম না ঘটে। আমেরিকার সায়েণ্টিফিক্ পত্রে লিখিত হইয়াছে, এক শত মণ জলে সওয়া তিন তোলা বা প্রতি আড়াই হাজার মণ জলে একসের পরিমিত তুঁতে ব্যবহার করিতে হয়। পল্লীগ্রামের দূষিত জলপান করিয়া যাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা পানীয় জলে ঐ পরিমাণ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া তৎপরে সেই জল ছাকিয়া পান করিতে পারেন। তুঁতে মিশ্রিত করিবার তিন চারি ঘণ্টা পরেই জলের দূষিত বীজাণু মরিয়া যায়।

সিহোরের প্রবাসী ডাক্তার মিঃ উইলিয়াম এফ্, ব্রেণ, আই-এম্ এস্, সর্প-দংশনের এক নূতন চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই নবপ্রণালীর চিকিৎসার কথা 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে,—"একটি কাচের গ্লাসে করিয়া কিঞ্চিৎ স্পিরীট্ রাখিয়া, তাহাতে কার্পাসের তুলা ভিজাইয়া যে স্থানে সর্পে দংশন করিয়াছে, সেই ক্ষত স্থানের উপরে ঐ গ্লাসটি রাখিয়া স্পিরীট্ সংযুক্ত কার্পাস

তুলায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও। তুলা পুড়িয়া গ্লাসের মধ্য দেশে বায়ুশূন্য হইলে দেখা যাইবে যে, গ্লাসে বিষাক্ত রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বায়ুশূন্যতার প্রাবল্য বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না দেখা যায় যে, ক্ষত স্থানের চর্ম্ম ঐ গ্লাসে আঁটিয়া লাগিয়া যায়।" যে স্থান সর্পদষ্ট হইলে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিবার উপায় থাকে না, তিনি সেইরূপ স্থানে এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। যাঁহারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের দেশে 'মাল' বৈদ্যগণ এবং ওঝাগণ দংশন কঠিন জ্ঞান করিলে, 'অনল-বাণ' প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাতে তুলার সলিতা ঘৃতে ভিজাইয়া কলার পাতার উপরে করিয়া ক্ষত স্থানে রাখিয়া ঐ সলিতা জ্বালিয়া দেয়। বোধ হয়, ডাক্তার উইলিয়ামের চিকিৎসার সহিত ঐ চিকিৎসার বিজ্ঞান-সঙ্গত কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

স্থানীয় সংবাদ।

পীড়িত শরৎচন্দ্র—খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রক্ষিতের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র রক্ষিত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাহাতে আমরা চিন্তিত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, শরৎ বাবু এই সময় তাঁহার পিতৃকীর্ত্তি ডাক্তার খানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটী ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি দ্বারা উহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, নতুবা ঐ কার্য্য স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার ব্যবসায়ী শ্রেণী, কোন কোন সৎকার্য্য করিয়াও তাহাকে স্থায়ী করিতে পারেন নাই, প্রায় এক পুরুষেই তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, সুব্যবস্থার গুণে জগতে কত কত সৎকীর্ত্তি সুদীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইয়াছে।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

প্রার্থনা।

গাও কণ্ঠ, বাজ বীণা, মিলি সম-স্বরে,
ঈশ-ইচ্ছা, জীব-ইচ্ছা মিলে যে প্রকারে।

হে সর্ব্বগত সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা বিশ্বপতি ভগবন্! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি যে তোমার অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল নরনারী তো তোমার করুণা অনুভব করিতেছে না, বরং তোমার করুণায় এবং তোমার স্বরূপে স্থির-বিশ্বাসের অভাবে কি প্রকার অশান্তি জ্বালা অনুভব করিতেছে তাহা তো আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। প্রভু! আমরা যে তোমার করুণা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম; তাই কি চারিদিকে অবিশ্বাস অশান্তি দেখিয়া আমরা এরূপ ব্যথিত? অতঃপর বিশ্বাস সূত্রের সাক্ষ্যদান করিতে—তোমার করুণার সমাচার ঘোষণা করিতে তুমি যে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছ ইহা যদি কল্পনা না হয়, এবং তাহার উপায় বিধান ও তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ একমাত্র তোমার করুণাতেই হইতেছে এ সকল আমরা স্পষ্টরূপে দেখিয়া, সভয়ে অতি কাতরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যে অভিপ্রায়ে যে ভাবে, তোমার মহিমার কথা বলাইতে চাও, আমরাও যেন ঠিক সেই ভাবে সেই অভিপ্রায়টীই প্রকাশ করিতে পারি। কেন না এ পথে প্রধান দুইটী বাধা দেখিয়া সম্প্রতি বড় ভীত হইয়াছি। একটা বাধা নিজের আমিত্ব, দ্বিতীয়টী লোকরঞ্জন স্পৃহা। তুমি কৃপা করিয়া আশু এই বাধাবিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া তোমার মহিমা প্রকাশ করিতে সক্ষম কর। আমরা যেন তোমার আদেশ বিকৃত না করি, এবং লোকরঞ্জন স্পৃহায় সাংসারিক বুদ্ধির অধীন হইয়া তোমার সত্যকে যেন খর্ব্ব না

করি। এই কার্য্যে যখন প্রথম হইতেই তোমার করুণা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় কি ব্যর্থ হইবে? ইহা তো কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে এই 'কুশদহ' পত্র প্রকাশ করাইলে ইহাতে তোমার শুভ-ইচ্ছা যাহা, তাহাই পূর্ণ হউক; আমরা যেন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য সাধন করিয়া, তোমার মহিমা দর্শন করিতে করিতে কৃতার্থ হই।

সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

বিশ্বাসী হও ওরে মন, সকল অভাব যাবে দূরে।
হয় আশার বায়ু প্রবাহিত সদা বিশ্বাসীর অন্তরে।
জাননা বিশ্বাসের বলে, অটল পর্ব্বত টলে,
অনায়াসে শিলাভাসে গভীর সাগর নীরে।
যে হয় বিশ্বাসী সন্তান, মানে না কোন ব্যবধান,
(সে যে) প্রাণ-মন্দিরে, প্রাণেশ্বরে দেখে সদানন্দ ভরে।
বিশ্বাস হলে সঞ্চার, রহে না পাপ ব্যভিচার,
মায়ের কোলে শিশু ছেলে আনন্দে বিরাজ করে।

(বিধান-সঙ্গীত)

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৬৬। শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যস্য দিব্যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥

মহাভারত—আদিপর্ব্ব ১।২৫৫

জ্ঞানীরা যাঁহার পবিত্র কার্য্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য ধ্রুব জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম।

৬৭। নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে।

আদি ৭৪।১০৪

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই, ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

৬৮। তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।
স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তো দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্॥

আদি ৯০।২২

সাধুলোকেরা বলেন—তপস্যা দান, শম, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা, সরলতা ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া এই সপ্তবিধ গুণ মনুষ্যের স্বর্গলোকে যাইবার শ্রেষ্ঠদ্বার।

৬৯। এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তৃহিতামচরেৎ॥

আদি ১৬০।৪

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও স্বামীর হিতসাধন করিবে, ইহলোকে নারীগণের ইহাই শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম।

৭০। ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি॥

বনপর্ব্ব ২৯।৩৬

যিনি জানেন যে, ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন।

৭১। ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
ইহ সম্মানমৃচ্ছন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্॥

বন ২৯।৪২।৪৩

জ্ঞানী ব্যক্তির সতত ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যখন মনুষ্য সকলকে ক্ষমা করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই ইহলোক ও ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই পরলোক। তাঁহারা ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন।

৭২। যৎকল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ॥

বন ২০৬।৪৪

যাহা কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচরণ করিবেক না, সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

৭৩। যথাদিত্যং সমুদ্যন্ বৈ তমঃ পূর্ব্বং ব্যপোহতি।
এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

বন ২০৬।৫৬

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ পাপ করিয়া কল্যাণ আচরণ করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট-বাদ।

প্রায় সকল লোকই অদৃষ্টবাদী। কিন্তু অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাস সকলের সমান দেখা যায় না। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মুখে বলেন "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে" অথচ এ বিশ্বাসে তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ওরূপ একটা 'মত' মুখের কথায় থাকিলে কিছু আসে যায় না, উহার ফল বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। যাঁহারা স্বভাবতঃ বিশ্বাসী, নির্ভরশীল তাঁহারা যে ভাবেই হউক অদৃষ্টবাদের সুফল অনেকটা লাভ করিতে পারেন। এজন্য অদৃষ্টবাদের সঙ্গে বিশ্বাসের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ বলা যায়। যেখানে জ্ঞান অপেক্ষা বিশ্বাসের ভাব অধিক, সেখানে অদৃষ্টবাদের ভাবও অধিক। জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টবাদের ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; তাই শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশে এখন 'যা'তা' একটা অদৃষ্ট-বাদে ঠিক বিশ্বাসী নহেন। অতএব এই মতভেদ ভাবভেদের মধ্যে অদৃষ্টবাদের সুফল আমরা কি লাভ করিতে পারি তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টকে প্রাক্তন বা ভাগ্য বলেন, যাহা পূর্ব্বজন্মের

কর্ম্মফলে হয়, এ প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্ব প্রবন্ধে হইয়াছে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, অদৃষ্ট শব্দের সহজ অর্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর বা জ্ঞানের অতীত, আমরা কিরূপে সেই অ দৃষ্ট অজ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে বা জীবন-পথে চলিতে পারি, এবং সেই অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু বাস্তবিক কি পদার্থ তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

যাহা দৃষ্টির অগোচর তাহাই অ-দৃষ্ট। দেখা যায় না, জানা যায় না, বুঝা যায় না এমন কতই অসীম-বিষয় আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, জানিতে পারি, বুঝিতে পারি, এমন বিষয় কত অল্প, অথচ নিয়ত আমাদিগকে না দেখা, না জানা, না বুঝা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হয়। প্রতি নিয়তই আমাদিগকে অ-দৃষ্টের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইতেছে। সুতরাং সেই অদৃষ্ট বস্তু কি? আমরা কোন্ অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করি তাহা প্রথমতঃ দেখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু আমাদিগকে কোনও নির্ভরশীলতা নিশ্চিন্ততা দিতে পারে কি না তাহাও দেখা আবশ্যক।

আমরা সহজজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারি যে, আমাদের জ্ঞান কত অল্প—আমরা কতটুকু বুঝি, কিবা জানি; অথচ আমাদের এই অল্প জ্ঞানও প্রকাশ পাইত না যদি ইহার মুল অনন্তজ্ঞান না হইত। যদি আমরা অনন্ত জ্ঞানের আশ্রিত না হইতাম, তবে আমাদের স্থিতিরও সম্ভাবনা ছিল না। বোধ হয় এখন বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না যে, এ অনন্ত জ্ঞান বস্তু ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা অল্প জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও অনন্ত জ্ঞানময় ভগবানের আশ্রিত হইয়া, তাঁহার দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমাদের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকলই তিনি জানিতেছেন, দেখিতেছেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই অসীম জ্ঞানময়—করুণাময়, পরমদয়াল পিতার হাতে আছি। আমরা আমাদিগকে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমাদের ভালমন্দ, আমরা কি বুঝি, কি বা জানিতে পারি কিন্তু তিনিই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতেছেন, তিনিই আমাদের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিতেছেন। আমরা যতক্ষণ বাসনা বিকারে জড়িত থাকি, তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের

ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলি, ততক্ষণ কিছুতেই সুস্থির—নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইতে পারি না; অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত হই না। কিন্তু অদৃষ্ট অর্থে সেই অনন্ত জ্ঞানময়-পুরুষের উপর যখন নির্ভর করিতে পারি তখন নিশ্চিন্ত হই।

এখানে এই এক প্রশ্ন আসিতে পারে যে, আমরা ভগবানের উপর নির্ভর করিলেও কর্ম্মফল জনিত দুঃখ হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারি? উত্তর। কর্ম্মইতো সজীবতার লক্ষণ, যেখানে জীবন আছে সেখানে কর্ম্মও আছে। ফলভোগী হইব বলিয়াই পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে সন্তানরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মে এবং তাহার ফলভোগে আমাদের কোনও দুঃখের কারণ নাই কিন্তু কর্ম্মফল অর্থে এখানে যাহা নিজ-বাসনাকৃত কর্ম্ম, যাহা ঈশ্বর-ইচ্ছা না বুঝিয়া কর্ম্ম করা হয়, যাহাকে অকর্ম্ম বলে, তাহার ফল ততদিন ভোগ করিতেই হয়, যতদিন তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া—তাঁহার অধীন হইয়া কর্ম্ম না করা হইবে। যখন তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করা যায়, তখন তিনিই আমাদিগকে বিগত অকর্ম্ম-পাপ, ক্ষমা করিয়া বর্ত্তমান অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। বালক যখন পিতার হাত ধরিয়া চলে, তখন সে হাত ছাড়িয়া দিতেও পারে, কিন্তু পিতা যখন বালকের হাত ধরিয়া লইয়া যান তখন বালক নিরাপদে চলে। অতএব এখন বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক অজ্ঞাত মুহূর্ত্ত একমাত্র অনন্ত অজ্ঞাত ভবিষ্যৎকালের অংশ মাত্র; সেই কালের নিয়ন্তা যখন একমাত্র অনন্ত জ্ঞানময় ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নন, তখন অনন্ত জ্ঞানময় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর অজ্ঞাত অ-দৃষ্ট অবস্থায় নির্ভর করা প্রায় একই কথা। সুতরাং যাঁহারা অদৃষ্টের প্রতি এই ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই তাঁহারা কি অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকার আচ্ছন্ন অবস্থার কল্পনা লইয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? কখনই না।

শিক্ষিত শ্রেণীর যাঁহারা বলেন অদৃষ্ট বলিয়া এমন কোন অবস্থা থাকিতে পারে না, যাহা বিনা কারণে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলই কার্য্য কারণ সম্ভূত। কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। সুতরাং অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অজ্ঞতা মাত্র। তাঁহাদের এ কথায় আপত্তি করিয়া কেহ কেহ বলেন, "সকল বিষয় যদি এই বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র চেষ্টার ফলেই

হয়, তবে যেখানে দেখা যায় শত চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাবুদ্ধি স্বত্ত্বেও কেহ অন্ন সংস্থানে অপারক, আর কেহ বিনা চেষ্টায় লক্ষপতি হয় ইহার কারণ কি ?"

আমরা এখানে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রথমোক্ত 'মত' সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও নির্ভর-শীল চেষ্টার পক্ষপাতি, অর্থাৎ চেষ্টা বা পুরুষকার প্রয়োগ করিব বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ রূপে অনন্ত জ্ঞানময় বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া করিব। তৎপরে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, বিনা চেষ্টা বা যথেষ্ট চেষ্টা না করিয়াও সহসা প্রচুর ফল লাভের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে "পুর্নজন্ম" ও "কর্ম্মফল" প্রবন্ধে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। অর্থাৎ "মানুষ কেবল নিজের জন্য নিজে নহে। প্রত্যেকেই বহুর ফল স্বরূপ। প্রত্যেকটী বহুর সঙ্গে ভাল মন্দে, সুখ দুঃখে জড়িত। একে যেমন অপরের সদ্বিষয় লাভে উপকৃত তেমন পাপ অপরাধের জন্যও প্রপীড়িত।" সুতরাং একের সৌভাগ্য অপরে সংক্রমিত হইবে না কেন ? তেমন আর দশের ভারে ভারাক্রান্ত একও কখন কখন ক্ষতিগ্রস্ত। তবে ব্যক্তিগত দোষগুণ যে একেবারেই ব্যর্থ হয় তাহা নহে। যেমন একব্যক্তি কিছুই উপার্জ্জন না করিয়াও উত্তরাধিকারী সূত্রে লক্ষপতি হইয়াও যদি সে ধন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে তাহার যোগ্যতা না থাকে, তবে বিনা ক্লেশে ফল লাভ করিয়াও তিনি সফল হইতে পারেন না। যাহা হউক ইহার মধ্যে সার কথা এই যে সুখ দুঃখ, সুকৃতি দুষ্কৃতি বা সৌভাগ্য এবং দুরাদৃষ্ট সকলের পক্ষে একই বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। একে যে বস্তু লাভের জন্য লালায়িত, অন্যে তাহা ত্যাগের জন্য ব্যাকুল। একে যে সুখে মগ্ন, অন্যে সে সুখ ত্যাগে সদাসুখী। সুখ দুঃখের প্রকৃত কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানীর নিকট সকল অবস্থাই সুখকর, অজ্ঞানীর পক্ষে সকল অবস্থাই অশান্তির হেতু হয়। যে জ্ঞানের বিমলানন্দের সংবাদ জানে না, তাহার নিকট সম্পদ ও পার্থিব সুখই কিছুকালের জন্য শ্রেষ্ঠ সুখ বিবেচিত হয়। কিন্তু সুম্রাটকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও বলিবেন বিষয় সুখে প্রাণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না। প্রাণ আরও কোন অজ্ঞাত—অ-দৃষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষা। অতএব বাহ্যিক কোন অবস্থাকে বাস্তবিক সুকৃতি বা দুরাদৃষ্টের ফল স্বরূপ বলা যায় না, উহা প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষে আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ত হইয়াই থাকে। অজ্ঞানী তাহার ভিতর

হইতে সুখ দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। বিধাতা কেবল মানবের জন্য সুখ বা আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা প্রাপ্তির সহজ-সরল পথ "ঈশ্বর-বিশ্বাস"। ভগবানের কৃপায় সকল মানুষ তাঁহাতে বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল হউন ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা।

মাৎসর্য্য।

বরষায় ধরাখানি হলে রসবতী
শিখিগণ নাচে গায় করিয়া আরতি,
মুঞ্জরিলে তরুবর অলিগায় গান,
গগনে হাসিলে রবি ধরা পায় প্রাণ।

অখিল জগতে যদি কখন কোথায়
একটি আনন্দ রেখা হাসিয়া লুকায়,
তবে তার অগণন লহরী কম্পন
হাসায় নাচায় বিশ্বে মধুর মোহন।

এক প্রেম সূত্রে বাঁধা বিশ্বচরাচর,
একের আনন্দে হাসে সকলে অপর,
তবে কেন মানবের হৃদয়েতে হায়,
পর সুখে সুখ বিনা দুঃখ দেখা যায়!

প্রেমময় বিশ্বপানে ফিরালে নয়ন
হৃদয়ে নীচতা অত থাকেনা কখন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রশ্ন-উত্তর।

প্রশ্ন। আপনি কি কাজ করেন?

উত্তর। আমি অর্থ বিনিময়ের জন্য কোনও ব্যক্তির বা কোম্পানির কাজ করি না।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি কোন ব্যবসা করেন?

উত্তর। অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে আমি কোনরূপ ব্যবসা করি না।

প্রশ্ন। আপনার বুঝি বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহা দ্বারাই আপনার সংসার নির্ব্বাহ হয়?

উত্তর। এক্ষণে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তি নাই।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি সন্ন্যাসী?

উত্তর। আমি সংসার এবং সমাজ ত্যাগী সন্ন্যাসী নহি।

প্রশ্ন। ওঃ বুঝেছি, আপনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ান; আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?

উত্তর। আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে কোন সম্প্রদায়ের বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। আপনি যখন সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, তখন আপনার একটা সমাজ আছেই, সে সমাজ আপনার কোন্ সমাজ?

উত্তর। যে সমাজ বা মণ্ডলীর সহিত আমার উদ্দেশ্য এবং ভাবের অধিকাংশ মিল আছে, তাহাই আমার সমাজ হইলেও, আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে এক সমাজের বলিতে পারি না, কেন না, জগতের কত কত জন-মণ্ডলীর সহিত আমার ভাবের ও উদ্দেশ্যের মিল আছে, সুতরাং সেই বাস্তবিক বিশ্ব-সমাজকে অস্বীকার করিয়া একটী সমাজের নামে আমার পরিচয় দিলে অসত্য বলা হয়।

প্রশ্ন। যে সমাজ আপনারই ন্যায় জগতের সকল মানবের মধ্যে আপনার ভাব ও উদ্দেশ্যের ঐক্যতা দেখিয়া সকলকেই আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, এমত সমাজের সহিত আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি কি?

উত্তর। এক সমাজ-মধ্যেও যখন সকলের উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্যতা দেখা যায় না, এমন কি বিপরীত ভাবের ব্যক্তির সহিত এক সমাজের নামে পরিচয় দিতে হয়; পক্ষান্তরে আমার উদ্দেশ্য ও ভাবের মিল জগতের

সকল সমাজের মধ্যেও আছে, ইহা আমি যখন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি তখন হইতে আমাকে (আমার নাম একটী ধর্ম্ম-সমাজের নামে পরিচিত থাকিলেও) কোনও এক সমাজের নামে পরিচিত করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

প্রশ্ন। আপনার নাম কি ?

উত্তর। আমার নামের সঙ্গে বোধ হয় আমার জাতি জানাই আপনার প্রধান উদ্দেশ্য ?

প্রশ্ন। কতকটা তাহা বটে।

উত্তর। আমার দেহ, প্রচলিত জাতি-সংস্কার অনুসারে যে জাতি হইতে উৎপন্ন, বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমি তাহার পরিচয় দিতে অপ্রস্তুত নহি, এবং সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে আমি প্রধানতঃ চারিটী ভাবের (আত্মিক, মানসিক, শারীরিক, এবং অতি স্থূলদর্শী) ভেদ স্বীকার করিয়াও উহাকে জাতি বা বর্ণ এবং তাহা জন্মগত বা বংশগত রূপে স্বীকার করি না। অতএব আপনি যে ভাবে আমার জাতি নির্ণয় করিতে চাহিতেছেন, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, সুতরাং অপ্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। আপনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী ?

উত্তর। ব্রহ্ম অনন্ত-অসীম, তাঁহার জ্ঞানও অশেষ, তাঁহার জ্ঞানের কতটুকু আমি লাভ করিয়াছি তাহা ঠিক করিতে পারি না, সুতরাং সে অর্থে আমি আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিতে পারি না। আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষী মাত্র।

প্রশ্ন। আপনি যে প্রকার স্বাধীনতা এবং উদারতার কথা বলিতেছেন, তবে কি আপনি কোনও সমাজ এবং সাধু ভক্তের নিকট উপকৃত নহেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করেন না ?

উত্তর। আমি জগতের সকল সাধু-ভক্ত মহাজনকেই ভক্তি করি, বিশেষ বিশেষ ভাবের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেও ভক্তি করি, কেবল এক ভগবান্ ভিন্ন কোন সমাজ বা ব্যক্তির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহি।

প্রশ্ন। আপনার কথাগুলি শুনিতে মন্দ নয়, আচ্ছা মহাশয়! আর একদিন অনুগ্রহ করে দর্শন দিবেন, আরও অনেক প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আজ একটু কাজের জন্য ব্যস্ত আছি।

উত্তর। যে আজ্ঞা, নমস্কার। কশ্চিৎ "ব্রহ্মজ্ঞান" আকাঙ্ক্ষী।

হিমালয় ভ্রমণ। (পরিশিষ্ট)

২

অম্বালা পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ষ্টেশন হইতে বাবু মুক্তাসিংএর গুরুদরবারা উদ্দেশে চলিতে চলিতে একটু অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে যাইতে একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হইল। সে ব্যক্তি বলিল "আজ আপনি এই নিকটেই কালীবাড়িতে থাকিতে পারেন, মুক্তাসিংএর দরবারা আরও বাহির পথে দূরে আছে এ অন্ধকারে যাইতে আপনার কষ্ট হইবে।" সুতরাং আমি কালীবাড়ি গেলাম।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বাঙালীর দ্বারায় কালীবাড়ি স্থাপিত হইয়াছে, এখানে সহসা কোন ভদ্রলোক আসিলে, এমন কি সপরিবারেও থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হন। তবে সাধু সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে এ সকল স্থান উপযুক্ত নহে; তাঁহাদের প্রয়োজনও হয় না, কেননা সে জন্য 'ছত্র', 'মঠ' বা আশ্রম সকল যথেষ্ট। যাহা হউক আমি এক রাত্রির জন্য কালীবাড়ি রহিলাম। ইতিমধ্যে একব্যক্তি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে আমি বলি, আমি যে বাঙালী তাহাতো বুঝিয়াছেন, তারপর আমার নাম জিজ্ঞাসার বোধ হয় আমার জাতি জানাই আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি ওরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলা অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। সুতরাং তাহা জানিয়া আমার সম্বন্ধে আপনাদের কোন ফল নাই; এই কথার মধ্যে আর একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করা অন্যায়," তখন পূর্ব্ব প্রশ্ন কর্ত্তা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ! আমার অন্যায় হইয়াছে।" তাঁহাকে আমি বলিলাম; না মহাশয়! এ আর আপনার অন্যায় কি, আমিতো সন্ন্যাসী সাধু নহি। যাহা হউক অবশেষে তাঁহাদের সঙ্গে কিছু ভাল কথাবার্ত্তা হইল।

২রা অগ্রহায়ণ, প্রাতে কালীবাড়ি আসন রাখিয়া মুক্তাসিংএর গুরুদরবারার অনুসন্ধানে গেলাম। অল্প দূরে গিয়াই তাহা পাইলাম। দরবারার দ্বার দেশে একটী যুবক সাধু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার প্রথমে আলাপ হইল। তিনি আমার সঙ্গে আসিলেন এবং কালীবাড়ি হইতে আমার আসন লইয়া পুনরায় দরবারায় গেলাম।

শিখদিগের গুরুদরবারা প্রায় হিন্দুর ঠাকুরবাড়ি তুল্য, তবে এখানে কোন দেবমূর্ত্তি নাই এবং সাধুদিগের জাতিভেদ নাই। সাধু মাত্রেই যিনি ইচ্ছা ও সাহস করিয়া যাইতে পারেন তিনিই স্থান পাইয়া থাকেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে যুবক সন্ন্যাসী সাধুর পরিচয় এই পাইলাম যে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে থাকেন ও এই প্রদেশে ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন। তারপর কেন জানি না, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে একটু সৌহৃদ্য ভাব উপস্থিত হইল। তিনি আমার প্রতি নিতান্ত আনুগত্য ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহার 'মতে' ও ভাবে বুঝিলাম তিনি অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা তেজস্বী, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে এক-আধটু কথাবার্ত্তা হইল তাহা প্রায় অদ্বৈতবাদ মূলক কিন্তু তাঁহার অন্যান্য অনেক কথায় আমার বেশ তৃপ্তি বোধ হইল। দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে কোন সম্বল নাই, গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটি গৈরিক্ আলখেল্লা ও ২।১ খান কৌপীন বস্ত্রখণ্ড মাত্র। নিঃসঙ্গভাবে বিচরণ করেন। প্রাচীন দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশভূষা, ভেক-চিহ্ন এবং কপটতার প্রাবল্য দেখিয়া তিনি দুঃখিত এবং ঐ সকলের বিরোধী। তাঁহার মতে ধর্ম্ম সাধনের জন্য ঐ সকল কিছুরই আবশ্যক নাই। প্রাণের অনুরাগই প্রধান সহায়। তিনি অন্ধ গুরু-বাদ বোধ হয় মানেন না, পরমহংস সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরও সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে; এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে স্নান আহারান্তে বসিয়া কথাবার্ত্তার মধ্যে বলিলেন, "এক সাধুর কথা আমি অনেকদিন হইতে শুনিয়াছি, সে স্থানের নিকট দিয়াও কতবার গিয়াছি কিন্তু কখন তাঁহাকে দেখি নাই, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে উভয়ে যাওয়া যায়।" (অবশ্য আমাদের সকল কথাই হিন্দি ভাষায় হইয়াছিল।) আমি বলিলাম, কতদূর যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন, "এখান হইতে চলিয়া গেলে আজ রাত্রে এক গ্রামে থাকিয়া আগামী কল্য বেলা দুই প্রহরের মধ্যে তথায় পৌছিতে পারা যাইবে। আর অল্প দূর ট্রেণে গেলে কল্য ৮।৯টার সময় পৌছিতে পারা যায়, কিন্তু ট্রেণে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম, আমার নিকট কিছু রেলভাড়া আছে চলুন, কতকটা ট্রেণেই যাওয়া যাকৃ। এই বলিয়া যেমন সঙ্কল্প অমনি যাত্রা করা হইল। কিন্তু মনে হইল বাবু গঙ্গারাম, মুক্তাসিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, বিশেষতঃ,

তাঁহার আশ্রমে রহিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া সাধু বলিলেন, "বাজারে তাঁহার দোকানে, তিনি এক্ষণে বোধ হয় আছেন।" আমরা বাবু মুক্তাসিংএর দোকানে গিয়া, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, সাহারাণপুরে বাবু গঙ্গারাম আপনার দরবারায় থাকিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি আজ আপনার দরবারায় ছিলাম, এক্ষণে এক মহারাজের সহিত আর এক মহাত্মার দর্শনে যাইতেছি। বাবু মুক্তাসিং প্রবীণ শান্তমূর্ত্তি পুরুষ। তিনি বলিলেন, "আজ আমাদের দরবারায়, দরবার অর্থাৎ সভা হইবে, আপনি থাকিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিয়াছি, সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। তখন তিনি একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতর হইতে একটী টাকা আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

আমরা ষ্টেশনে আসিয়া যথা সময়ে ট্রেণে উঠিলাম। কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সারাণ্ডী ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ হইতে গ্রামাভিমুখে চলিয়া এক গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়িতে রাত্রি যাপন করিলাম। গৃহস্বামী সামান্য অবস্থাপন্ন হইয়াও আমাদিগকে খুব যত্নে আহার ও শয্যা দিলেন। বোধ হইল, আমার সঙ্গী সাধুর সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বেও পরিচয় ছিল।

৩রা অগ্রহায়ণ প্রাতে চলিয়া আমরা বেলা ৯টার মধ্যে 'বাধৌচি' গ্রামে সাধুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কিছু দূরে দূরে এক এক ঘর বসতির চারিদিকে ক্ষেত্র সকল। মধ্যে মধ্যে এক একটা কূপ, তাহা হইতে মহিষের দ্বারা চালিত এক প্রকার কাঠের যন্ত্রে শত শত কলস জল উঠিয়া ক্ষেত্র সকল অভিষিক্ত হইতেছে। এ প্রদেশে চাষ কার্য্যে বৃষ্টির জলের জন্য প্রায় নির্ভর করিতে হয় না। ঐ গ্রামের এক প্রান্তে আশ্রম; আশ্রমের পর কেবল জঙ্গল, কিন্তু এ নিবিড় বন-জঙ্গল নহে, ছোট ছোট গাছে এক প্রকার 'ঝাঁটি-জঙ্গল' বলে। এক একটি ঝোপের চারিধার এমন পরিষ্কার, বোধ হয় এক্ষণেই কেহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহা স্বাভাবিক। এমত অসংখ্য জঙ্গল শ্রেণীতে শুনিলাম ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই বন। এই স্থান পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। আরও শোনা গেল পাতিয়ালা মহারাজা এবং ঐ স্থানের জনমণ্ডলী সাধুর প্রভাব অনুভব করেন। এই জঙ্গলে কোন ইংরাজ শিকারী আসিয়া বন্দুক চালাইয়া জীব হিংসা করিবার হুকুম নাই।

তারপর আমরা যাঁহাকে দেখিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া এতদূরে আসিলাম, তিনি কখন আশ্রমে থাকেন না। আশ্রমের বাহিরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পর্ণ-কুটীর আছে, তাঁহার যখন যেটায় ইচ্ছা থাকেন। জঙ্গলের অনতিদূরেই তিনি তখন আছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে যাহা দেখিলাম, তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তির বিষয় কিছুই মিলিল না। তিনিতো উলঙ্গ এবং দেখিতেও সুন্দর-সুশ্রী নহেন। তারপর আমরা একটু নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভয়ানক ধমক দিয়া "আরে, চলি যা, চলি যা" বলিয়া উঠিলেন। আমরা সাধুবাক্য শোনাই কর্ত্তব্য জ্ঞানে তখন আশ্রমে আসিলাম। আশ্রমটী অতি সুন্দর মনোরম বোধ হইল। প্রশস্ত প্রাঙ্গন মধ্যে রোপিত এক একটী বকুল, আম্র, নিম্ব বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত এবং ছায়াযুক্ত। বৃক্ষমূলে বেদীগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তথায় বসিয়া সাধন ভজনের পক্ষে অতি অনুকূল স্থান। আমি একটী বৃক্ষতলে স্থান করিয়া লইলাম। আশ্রমে আর একটী প্রশস্ত পাকাগৃহ মধ্যে একদিকে রন্ধনাদি হয়, অপর দিকে রাত্রে অনেকেই শয়ন করিয়া থাকে। আমরাও রাত্রে ঘরের ভিতর ছিলাম। প্রতিদিন অনেক নরনারী সাধুজীকে দর্শন করিতে আসেন। অনেক ভোজ্য দ্রব্যাদিও আসিতে দেখা গেল। আশ্রমে অনেক লোক আহার করে। একজন 'সেবক' আছেন তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় ত্রৈলঙ্গী বলিয়া বোধ হইল, তিনিও সন্ন্যাসী সাধু নাম রাড্ডু মলজী। ক্ষুধা পাইলে সাধু জঙ্গল হইতে "আরে অন্নপাণি লায়" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। প্রাতে একবার ভোজ্য পাঠাইতে হয় আর যখন ইচ্ছা ডাকিলে পাঠান হয়। অনেকগুলি 'কলসী জলপূর্ণ করা থাকে তাঁহার ইচ্ছা মত ব্যবহার করেন। আশ্রম মধ্যে একটী পাকা ইঁদারা আছে তাহার জল অতি উত্তম বোধ হইল। এই স্থানটীতে তখন অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম বোধ না হওয়ায় অতিশয় আরাম বোধ হইতে লাগিল। বনমধ্যে পাখী সকল এবং ময়ুর দেখা গেল।

আমারা স্নানাহার এবং বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সাধুজীকে দেখিতে গেলাম। তখন আরও কতকগুলি নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একস্থানে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সাধু নেতা

স্বরূপ ছিলেন দেখা গেল। আমরা প্রথমে সাধুজীকে একটী কুটীরে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী সাধু কিছু পশ্চাতে ছিলেন। আমি যেমন একটু অগ্রসর হইয়া নিকটে গিয়াছি; অমনি "কো হ্যায় রে, কো হ্যায় রে" বলিতে বলিতে যষ্টী লইয়া মারিতে আসিলেন, আমরা সটান প্রস্থান করিয়া আশ্রমে আসিয়া রক্ষা পাইলাম। পরে অপরদিকে দর্শকদিগের নিকট কি একটা গোলযোগ হইতে লাগিল। শুনিলাম, সেই যাত্রিদলের নেতা সাধুকে মারিতে গিয়া ছিলেন, তখন তিনি বলেন "মারো মহারাজ, এবি আপ্‌কাই অঙ্গ হ্যায়" ইহা শুনিয়া একেবারে অনেক দূর জঙ্গল মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমরা আশ্রমে আসিয়া তাঁহার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। তারপর দেখি আশ্রমের ভিতর আর এক উলঙ্গ সাধু রহিয়াছেন। তাঁহার ভাব স্বভাব মহাত্মাজী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইঁহার বয়স বোধ হয় ত্রিশের বেশী নয়, দেহখানি বেশ সুস্থ সবল, কান্তি শ্রীও মন্দনয়, কিন্তু তিনি মৌনী। নিতান্ত শান্ত শিষ্টভাব। আপন মনেই কখন হাস্য করেন কখন গাম্ভীর্য্যভাবে যা'তা' একটা কাজ লইয়া থাকেন। ডাকিয়া আহারীয় দিলে খান নচেৎ পড়িয়াই থাকেন। রাত্রিতে একখানি বালাপোষ দেওয়া হয়, কখন গায়ে দেন কখন তাহা যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে। শুনিলাম প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি এই আশ্রমে আছেন।

রাত্রিকালে আশ্রমে অনেক লোক থাকিতে দেখিলাম। সকলেরই আহার হইল। আমার সঙ্গী সাধুর সহিত রাড্ডুমলজীর কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল।

৪ঠা অগ্রহায়ণ। আমার সঙ্গী সাধুজী আমাকে অতি প্রত্যুষে ডাকিয়া বলিতেছেন, "চলিয়ে মহারাজ!" অর্থাৎ তিনি আজই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহেন কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল এতদূরে আসিলাম, সাধুর ভাবতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এখনই চলিয়া যাইব? কেমন অতৃপ্ত, অনিচ্ছার ভাব মনে হওয়ায় বলিলাম, মহারাজ! হামারা আভি যানেকো ইচ্ছা নেহি হোতা। সাধু বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছি বাৎ হ্যায়, ইয়া সাধুকী মৌজ্‌ হ্যায়, আপ্‌ রহিয়ে ম্যায়নে, চলোঙ্গে।" প্রান্তে আমি তাঁহাকে কতকদূর অগ্রসর করিয়া কিঞ্চিৎ ট্রেণ ভাড়া দিয়া বিদায় লইলাম, তিনি আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। আশ্রমে আসিয়া রাড্ডুমলজীকে সম্মুখে পাইলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া

বলিলেন, "তুম্ কুছ্ দিনা ঠিয়া রহো, ও মহারাজ আবি চঞ্চল হ্যায়।" আমি তখন একটু কাতর ভাবে তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ! আপ্‌কা কৃপা বেগর এ মহারাজকো মহিমা হাম্‌নে বুঝনে সক্তা নেহি; আপ্ বাতায়ে উন্‌কো ক্যা স্বভাব হ্যায়। তাহাতে রাড্ডুমলজী বলিলেন, "রহো রহো উন্‌কো লীলা দেখো! উন্‌নে বালক স্বভাব হ্যায়, যব্ য্যায়সা মউজ (ইচ্ছা) ত্যায়সা করতা হয়।" আমি এই দিন এখানে থাকিয়া একবার জঙ্গলের দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম, যতই যাই ততই যাইতে ইচ্ছা হয়। পাখী সকল নির্ভয়ে সানন্দে ডাকিতেছে, হরিণও ২।১টী দেখিলাম। পিপীলিকা এবং পাখী সকলের জন্য প্রাতে জঙ্গলের কতক দূর পর্য্যন্ত আটা, চিনি, শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

আশ্রমে যখন যাহা যেমন আসে সেই মতই খাদ্য প্রস্তুত হয়, বিশেষতঃ এ প্রদেশের লোকে সাধারণতঃ খুব মোটা খায় কিন্তু আমি বাঙালী, এজন্য রাড্ডুমলজী আমার আহারের একটু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বোধ হইল, অর্থাৎ গমের আটার রুটী পাইয়াছিলাম। এইরূপে সামান্য সামান্য বিষয়েও ভগবানের করুণা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পরন্তু এই বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তখন যাহা বুঝি নাই এখন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

ঐদিন রাড্ডুমলজী আমাকে একটী টাকা দিয়া বলিলেন "ইস্‌কো রাখো, তুমারা আস্তে আয়া হ্যায়।" আমি এই সন্ন্যাসীর অযাচিত দানের জন্য অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহাত্মার কোন প্রসন্ন ভাব লাভ করিতে পারিলাম না। এদিনও অপরাহ্নে একবার শুনিলাম জঙ্গলের মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "রাড্ডুমলজী, রাড্ডুমলজী, পত্তি তোড়।" অর্থাৎ ইক্ষু ক্ষেত্রে পাতা ভাঙ্গিতে বলিতেছেন। তাঁহার সকল কথার উত্তরে রাড্ডুমলজী বলিতেন, "সত্য বচন মহারাজ।" পাতা ভাঙ্গার কারণ কি, আমি রাড্ডুমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "বোধ হয় শীঘ্র অনেক লোক আসিবে, গো মহিষের আহার আবশ্যক হইবে তাই একার্য্য করিচ্ছে বলিলেন, উঁহার কোন কথা অর্থ হীন হয় না।" কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি একটা ইক্ষুক্ষেত্রের নিকট বসিয়া তাহার শুষ্ক পত্র ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, তখন আমি একটু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম, তখন মূর্ত্তি বেশ প্রশান্ত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর কোন কথাই শোনা গেল না, কেবল মধ্যে মধ্যে "আউর তোড়, আউর তোড়" বলিয়াছিলেন। প্রায় সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত এই কার্য্য হইল আমি কিছু আগেই চলিয়া আসিলাম। রাত্রি শেষে নিদ্রাভঙ্গের পর, স্থির ভাবে সাধুর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মনে এই ভাব হইল, উনি আমাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা লৌকিকভাবে কত মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়া আছি; উনি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ রহিত। কোন মনুষ্য, জীব বা বিষয় হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না, উহাঁকে বুঝা আমাদের এ বুদ্ধির ঠিক সাধ্য বিষয় নহে। এরূপ একটী অলৌকিক উজ্জ্বল চরিত্রের আদর্শ আমার মনে প্রকাশিত হইয়া, মনের বিষাদ ভাব চলিয়া গেল এবং অত্যন্ত আনন্দ হইল। ইহাতে বুঝিলাম এক্ষণে আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, এতদাপেক্ষা অধিক চেষ্টায় এ সময় নয়।

৫ই অগ্রহায়ণ—প্রাতে উঠিয়া রাড্ড্মলজীকে জানাইলাম অদ্যই আমি যাইব। তিনি বলিলেন, "আউর নেহি রহোগে? আচ্ছা! থোড়া ভোজন কর্‌কে চলো।" ঠিক যেন দেশীভাব। আমি স্নান করিয়া কিছু আহার করিলাম। সাধুজীকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাদৌচি-আশ্রম হইতে যাত্রা করিলাম। একব্যক্তি আমাকে কতক দূর রাখিয়া গেল, আমি তাহাকে বিদায় দিয়া একাই ষ্টেশনে বেলা ১১টার পর আসিলাম। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া ট্রেণের সময় হইলে, আমি লুধিয়ানার টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। (ক্রমশঃ)

প্রহেলিকা।

মরিয়া তবু অমর হয় কেবা?
পরের লাগি' পরাণ দেয় যেবা।
কাঁদিয়া ফিরে' কাঁদিতে চায় কে?
পিরীতি-রীতি যেবা জানিয়াছে।
হারিয়া তবু জয়ের যশ কার?
প্রণয় মাঝে বিনয় আছে যার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কুশদহ। (৯)

সারদাপ্রসন্ন বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামের সহিত, গুণগ্রাহিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যার প্রতিও বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বিখ্যাত মহাম্মদ খাঁ সেতার এবং বীণ (বীণা) বাদনে যেমন উৎকৃষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় পাখওয়াজ (মৃদঙ্গ) বাদ্যে সুনিপুণ ছিলেন। ইহাঁরা সারদাপ্রসন্ন বাবুর নিকট বরাবর সম্মান ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু (সেজবাবু) বাল্যকালে মহাম্মদ খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সারদাপ্রসন্ন বাবুর সংসারে হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক স্বসম্পর্কীয় এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লেখাপড়ায় তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি অনেক গান রচনা করিয়া তাৎকালিক গ্রাম্যঘটনার আন্দোলন করিতেন। তখন ব্যক্তিবিশেষের নামে বা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছড়া ও গান বাঁধিয়া প্রকাশ করা একটা প্রথা ছিল।

বাবুপাড়া—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবুর সময় হইতেই তাঁহার জামাতাগণ ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের বসবাসে জমিদার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী পল্লী হইয়াছে, তাহাকে সাধারণে 'বাবুপাড়া' বলিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য গুণগ্রামের সহিত, এমারতী কার্য্যে তাঁহার (Engeneering Head) স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। তাঁহার নিজ বাটীর নির্ম্মাণকার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; সচরাচর যে সকল স্থানে কাষ্ঠের ব্যবহার করা হয়, তিনি সেখানে খিলান দ্বারা সে কার্য্য সৌষ্ঠব করিতেন। আমরা পুরাতন রাজমিস্ত্রীদিগের মুখে এ বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছি। স্বর্গীয় হরিশ বাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথও বহুগুণের আধার সজ্জন, সুশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি কালীপ্রসন্ন বাবুর ভাগিনেয় অর্থাৎ সারদাপ্রসন্ন বাবুর পিতৃস্বস্রীয় (পিসতুত ভাই) ছিলেন। ইহার সরল অমায়িকতার বিষয় উল্লেখ যোগ্য। সাধারণের প্রতি তাঁহার স্নেহ, সহানুভূতি চির দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিছু কাল তিনি চিনির কারখানা করিয়া কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের সেই শ্রদ্ধা ভক্তি আরও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বর্ত্তমান

বিহারীলালও পিতৃ ভাবের অধিকারী হইয়াছেন। তৎকনিষ্ঠ সুশিক্ষিত বাবু কিশোরীলালের জীবনে ইতিমধ্যেই যে বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,—তাঁহার প্রাণে ভগবান্ যে জনহিতৈষণার ভাব (Public spirit) দিয়াছেন তাহা তিনি দেশের সেবায় নিয়োগ করুন ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা।

গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বংশ—জলেশ্বরের সন্নিহিত চণ্ডীগড় নামক স্থানে গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাস ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ও স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি ছিলেন। নানা কারণে তাহার চণ্ডীগড়ে বাসের অনিচ্ছা হওয়ার পর, স্বর্গীয় খেলারাম মুখোপাধ্যায় যখন সেরেস্তাদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও গোবরডাঙ্গার জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন তৎকালে কোন সূত্রে খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়, তৎপরে তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গোকুলচন্দ্র আত্মীয় স্বজনের সহিত গোবরডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই হইতে গোবরডাঙ্গায় চাটুয্যে পাড়ার আরম্ভ।

গোকুলচন্দ্রের তিন পুত্র তারাচাঁদ, জয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া শিবনারায়ণকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতায় তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করিয়া বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সৎকার্য্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হাবড়া ও গোবরডাঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কয়েক মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপি তাহা "শিবনারায়ণ চাটুয্যের রাস্তা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। তৎপুত্র চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া ২৪ পরগণা-কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া, শেষ সরকারি উকিল নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ভবানীপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং ঈশ্বরকৃপায় বহু পুত্র পৌত্রে ও ধনে, মানে পরিবেষ্টিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ভবানীপুরে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহার জনৈক পৌত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বিলাসিতা এবং অসদৃষ্টান্তের পথ হইতে নীরব শান্ত জীবনে, সুখে দুঃখে ভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন। 'চন্দ্রনাথ চাটুয্যের লেন' নামে ভবানীপুর মিউনিসিপালিটীর একটী সদর রাস্তা তাঁহার স্মরণার্থে বিদ্যমান রহিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচাঁদ, খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারী প্রতিষ্ঠায়

অনেক সহায়তা করিয়া উক্ত জমিদারীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। এই হইতে চাটুয্যে বংশে দেওয়ানজী নাম উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে।

তারাচাঁদের অন্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। তখনকার জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত লোকে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্সে একটী মাত্র টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবু চিরুলিয়া পরগণায় তাঁহার বৃত্তির জন্য অনেক ভূমি দান করেন। কিন্তু রাধামোহন এমন ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন যে, ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি তাঁহার অপর ভ্রাতাকেও অংশ দিয়াছিলেন।

রাধামোহনের কনিষ্ঠ রাধানাথ, চন্দ্রনাথের সমধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় আসিয়া ওকালতি পরীক্ষা দেন, কিন্তু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া সরকার হইতে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। রাধানাথ বাবু অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, ঐ সময় একদা গোবরডাঙ্গার ধনাঢ্য উমাচরণ দত্তের বাড়ী ডাকাতি পড়ে। তিনি রাত্রিকালে ডাকাতদিগের "রে রে রে রে হৈ" শব্দ শুনিয়া একগাছি 'রুল' মাত্র হস্তে লইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হন। ডাকাতদিগের কাহাকে কাহাকে চিনিতে পারিয়া বলেন "বেটারা আমার প্রজা হয়ে আমার গ্রামে ডাকাতি কুরতে এসেছিস?" কিন্তু তখন, তাহারা উন্মত্তপ্রায়, সুতরাং তাহাদের একজন মুন্‌সেফ বাবুর হাতে সড়কি বিদ্ধ করিয়া বলে "স'র ঠাকুর এখন।" তিনি আহত হস্তে রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন জমিদার বাড়ী হইতে 'বক্তার' নামক হাতী সহ অনেক লোক ও লঠিয়ালগণ আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে ডাকাতরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

রাধামোহনের মৃত্যুর পর রাধানাথ মুন্‌সেফ-পদ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন। তখন হয়দারপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার হবিবল হোসেন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত তখন হবিবলের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে অনেক কথা কিম্বদন্তী আছে, আদালতে সাক্ষ্য দিবার ভয়ে দেশের নিরীহ ভদ্রলোক অনেকেই স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক রাধানাথের অন্তে তৎপুত্র যোগেন্দ্র-

রাধও দীর্ঘজীবী হন নাই। পুনরায় রাধামোহনের উপযুক্ত পুত্র রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় ঐ দেওয়ানী পদে দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করিয়াছেন (এই সংবাদ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কুশদহতে উল্লিখিত হইয়াছিল।) তৎকনিষ্ঠ সহোদর সদাশয় কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সবডেপুটীর কর্ম্ম করিয়া, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বসিরহাট মহকুমায় ওকালতী কার্য্যে এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া চরিত্রগুণে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন এবং যশস্বী হইয়াছেন। তৎপুত্রও পিতৃপদানুসরণের আয়োজন করিতেছেন। কুঞ্জ বাবুর অবসর প্রাপ্ত জীবনে নিজ জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য আছে তাহা সাধনে তৎপর দেখিতে দেশের সরল সহৃদয় ব্যক্তিগণ আশা করিতেছেন।

স্বর্গীয় রাসবিহারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বিজয়বিহারী বি, এ পাশ করিয়া সবডেপুটী ও অন্যান্য সরকারী কার্য্য করেন। এক সময় তিনি দেশহিতৈষণার ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি National Echo (ন্যাসান্যাল একো) ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, প্রায় দুই বৎসর কাল সৎসাহসের সহিত তাহার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া বর্ত্তমানে হাইকোর্টে এবং ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন।

জয়নারায়ণের তিনপুত্র হরমোহন, কালীমোহন, উত্তমচন্দ্র। হরমোহন নড়ালের বিখ্যাত জমীদার রতন রায়ের সময়ের লোক, তিনি তাঁহার জমীদারীর নায়েবী পদে নিযুক্ত থাকিয়া "কঞ্চিমারা নায়েব" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার কাছারী বাড়িতে অন্নদান অবারিত ছিল। দেওয়ানজী বাড়িতে দুর্গোৎসব তাঁহারই দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

তৎপুত্র স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বা পুরন্দার চট্টোপাধ্যায় বারমাস বাড়ী থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন, এবং তৎসঙ্গে প্রতিবাসীর বিপদাপদে সাহায্য এবং রোগীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করা, তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। তিনিও তেমন দীর্ঘজীবি হন নাই। উত্তমচন্দ্র প্রথমে বাদুড়িয়া সবরেজেষ্টারির কার্য্য করেন, তৎপরে স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে 'জায়নিশি' পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কালীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজরাজ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে দীর্ঘকাল সুবিখ্যাত

রামগোপাল ঘোষের কার্য্যে অংশীদার ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি প্রায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়াছিলেন। তৎপুত্র বর্ত্তমান যতীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছেলে ছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভেই মাত্র ১৫৲ টাকা সম্বল লইয়া বাড়ি হইতে একাকী কলিকাতায় আসিয়া স্বাবলম্বীর পন্থানুসরণ করেন। নিজ চেষ্টায় অবিশ্রান্ত দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া উদ্ভিদ্ তত্ত্বের-সাক্ষাৎ ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় কি এক দৈব প্রতিভাবলে আজ পঞ্চাশ সহস্রাধিক মুদ্রার বিষয় সম্পত্তি করিয়া স্বাধীন-জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর যাহারা দাসত্ব বা চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া জীবনের সকল উদ্যম ও স্বাধীনবৃত্তি নষ্ট করাকে পছন্দ করেন না, এমন কতকগুলিকে বিনা বেতনে কার্য্যকরী উদ্ভিদ্ তত্ত্বের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। (তাঁহার বিবরণ 'কুশদহ'র সংবাদ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।) যতীন্দ্রনাথের সন্তানাদি হয় নাই, ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে তাঁহার অর্থ, সামর্থ্য দেশের সেবায় নিযুক্ত করিতে দেখিলে দেশ যে আনন্দিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্বর্গীয় কালীমোহনের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় চন্দ্রভূষণও প্রৌঢ়াবস্থার প্রারম্ভেই পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিয়া, সর্ব্বত্রই চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

(সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহিত।)

এ অভদ্রতা কেন ?

বর্ত্তমানে, লেখাপড়া জানা যে সকল বঙ্গীয় যুবকগণের চরিত্রে ভদ্রতা, সভ্যতা,—সংযত বাক্যাদির অত্যন্ত অভাব দেখা যায় তাহার কারণ কি ? অল্পক্ষণের জন্য রেলগাড়িতে যাইতে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে যে, কোন যুবকের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটান গেল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অধিকাংশ দিনে এইরূপই ঘটে যে, তাহাদের অসার চিৎকার, কুরুচিপূর্ণ সমালোচনাতে কর্ণ বধির হয়।

সম্প্রতি বিরাটী ষ্টেশনমাষ্টারকে, কতকগুলি ভদ্রলোক 'মামা' বলিয়া ব্যঙ্গ করায় কত গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে—এমন কি, ষ্টেশনে পুলিষ মোতাএন

করিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কয়েক জনের বারাশাত কোর্টে জরিমানা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, একথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাই আমরা বলি এ অভদ্রতা করা কেন?—আমাদের বিশ্বাস বিস্তৃত বঙ্গের যুবকগণের চরিত্রে যে এমন চপলতা—অশ্লীলতা ঘটিতেছে, ইহার অন্যান্য কারণ সত্বেও একটী প্রধান কারণ বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটার। যিনি যতই যুক্তি দেখান, যতই তর্ক করুন না কেন, যাঁহারা চরিত্র বলিয়া একটা জিনিষের আদর বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ থিয়েটারের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। যাহারা তরল মতি তাহারা যে থিয়েটার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে শিথিল চরিত্র হইয়া যায় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে পাপের প্রতি ঘৃণা নাই, যাহাদের হইতে মানুষ দূরে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যকে ভদ্র সমাজে ভদ্র লোকের সঙ্গে, এখন তো শত শত স্ত্রী পরিবারের সমক্ষে পর্য্যন্ত, সুসাজে সাজাইয়া তাহাদের গুণ গরিমা দেখান হইতেছে; ইহাতে কি বুঝায়? বলত, ইহা কোন্ উচ্চ নীতির পরিচয়? আমরা একান্ত মর্ম্মাহত হই যে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সেবক—যাঁহাদের নাম সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত, যাঁহারা সংবাদ পত্রের সম্পাদক, তেমন ব্যক্তিরও কেহ কেহ এই 'বিষময়' বিষয়ের পক্ষ সমর্থক। তাঁহাদের যে কি চমৎকার 'মত' তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, যাহারা খারাপ হইবে তাহারা থিয়েটার না থাকিলেও খারাপ হইবেই। এই কি যুক্তি? থিয়েটার না থাকিলেও হইবে, তবে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, স্বার্থ সাধন করিতে বিরত থাকা যায় কেন? এই কি যুক্তি নাকি? অভিনয়ের আমরা কোন দিন বিরোধী নহি এ সংসার ভগবানের অভিনয় ক্ষেত্র। ধর্ম্মাভিনয় অতি উচ্চ-মহৎ-কঠিন কার্য্য; পবিত্র আমোদ সময় সময় মানব সমাজের প্রয়োজনীয় কিন্তু অপবিত্র সংশ্লিষ্ট, পাপের প্রশ্রয়দান চিরদিন বর্জ্জনীয়। ভদ্র বালক-যুবকগণের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভিনয় হইলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতেও পারে। বারাঙ্গনা সংসৃষ্ট থিয়েটারে দেশের নীতি চরিত্র উৎসন্ন যাইতেছে, তথাপি লোকের চৈতন্য নাই।

স্থানীয় সংবাদ।

মৃত্যু।—সম্প্রতি খাঁটুরা নিবাসী ডাক্তার হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সজ্জন, বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। খাঁটুরা গ্রামে অনেকের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন এবং প্রতিবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। ভগবান্ ইহার আত্মার মঙ্গল করুন।

অবৈতনিক শিক্ষা।—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাটীর মিঃ জে,চাটার্জি,ভূতপূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা মহারাজের গার্ডন সুপারিটেণ্ডেণ্ট, এক্ষণে কলিকাতা (শ্যামবাজার) ১৮৮নং অপার সারকুলার রোডে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেশের হিতার্থে কতকগুলি ছাত্রকে বিনাবেতনে 'ইকনমি বটানি' (আয়কর উদ্ভিদ্ তত্ত্বের) শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। শিক্ষার্থীগণ সচেষ্ট হউন। পত্র লেখালেখি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে।

দান।—স্বর্গীয় সপ্তম এড্ওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষা ফণ্ডে জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—যদিও দাতার নাম প্রকাশে তাঁহার সবিশেষ আপত্তি আছে, তথাপি এ কথা উল্লেখ না করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অকৃজ্ঞতার বিষয় মনে করিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত মাসে প্রকাশকের শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন ও অর্থাভাবে 'কুশদহ' বাহির করিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া পরবশ হইয়া কুশদহর মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে ২০৲ কুড়ি টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য আর অধিক কি বলিব, ভগবান্ দাতার হৃদয়-কমল আরও বিকশিত করুন।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

বর্ষ শেষ।

ভগবানের করুণায় "কুশদহ" পত্রের আর একটি বৎসর পূর্ণ হইল। কার্য্য ক্ষেত্রে যখনই বাধা বিঘ্নে পড়িয়াছি, তখনই তাহা হইতে একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার আর কোন সম্বল নাই, কেবল একবিন্দু 'বিশ্বাস' মাত্র সম্বল; এ বিশ্বাসও তাঁহারই দেওয়া, এ কাজে তিনিই আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, সুতরাং বাধাবিঘ্নের সময় এই মনে হইয়াছে যে, তিনিই ইহার উপায় করিবেন। এ বিশ্বাস কোন দিন আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তবে, তাঁহার করুণা ও বিশ্বাস যে যন্ত্রের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছে সে যন্ত্র অপূর্ণ; তাহার ত্রুটি দুর্ব্বলতায় কাজে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। এ কাজে বিধাতার আর যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, ইহা দ্বারা প্রথমতঃ আমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় তাহা তাঁহারই কৃপায় অগ্রেই বুঝিয়াছি। তিনি আমাকে এই উপলক্ষে সত্যের দিকে, জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

যাঁহারা একাজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যেমন আমার হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতেছি, আবার যাঁহারা প্রায় সারা বৎসর কাগজ লইয়া ভিঃপিঃ ফেরত দিয়াছেন, তাঁহারাও তেমনি আমার শিক্ষাদাতা। ভগবান সকলেরই মঙ্গল করুন এবং আগামী বর্ষের কাজের জন্য আমাকে নববল দান করুন।

দাস—

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অদ্ভুত রুচি।—প্রধানতঃ দুই তিন খানি বাঙালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অদ্ভুত রুচি আমরা নিয়তই দেখিয়া আসিতেছি; প্রায়ই তাহাতে দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি মূলক কদর্য্য ছবি সকল প্রকাশিত করিয়া জঘন্যভাবে উপহাস করা হয়। তাহার পাঠকগণও তাহাতে বড়ই আমোদ উপভোগ

করেন। কিন্তু ঐ সকল কুরুচিপূর্ণ ব্যাঙ্গোক্তি পাঠ করিয়া দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে যে কি অপরাধ ঘটে, জাতিয় ভাব সম্বন্ধে কি ক্ষতি হয়, তাহা তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশে বিচার করিয়া দেখেন না। সম্পাদকগণ মনে করেন যেন তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া কত ভাল কাজই করিতেছেন! সম্প্রতি একখানি ঐ শ্রেণীর কাগজে দেশের শ্রদ্ধাস্পদ কোন ব্যক্তিকে "আবহাওয়ার কুঁকড়ো কবি" বলিয়া একখানি ছবি বাহির করা হইয়াছে। দেশের মনস্বীগণ ঐ সকল কাগজের রুচি সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহা ঐ "রসময়" সম্পাদকগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন না, দেখিলে লজ্জিত হইতেন। বিদেশীগণ আমাদের ভাব দেখিয়া আমাদের মহত্ত্ব কত তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। ঐ সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মনে করেন ঐরূপে সমাজের খুব শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের সাম্‌নে আরো যে সকল ভদ্র সংবাদপত্রগুলি রহিয়াছে, তাঁহারা কি দেশের লোকের অন্যায় অবিবেচনার প্রতিবাদ করেন না? কই তাঁহারা ত কখন পঞ্চানন্দ কিম্বা ষড়ানন্দ, গাধা, ভেড়া, লাঙ্গুল মূর্ত্তিতে (কি লজ্জার বিষয়) কাগজের কলেবর কলঙ্কিত করিয়া এমন অদ্ভুত রুচির পরিচয় দেন না? ইহা দেখিয়াও কি প্রথমোক্ত সম্পাদক মহাশয়গণের লজ্জা হয় না? আমরা কোন কোন বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ঐ সকল বিষয় ভাল ভাল কাগজে প্রতিবাদ করেন না কেন? তাহাতে তাঁহারা বলেন "ও জিনিষে কি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে আছে?"

থিয়েটার প্রচারের নূতন পন্থা।—এ পর্য্যন্ত বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলি দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। থিয়েটার হইতে দুইখানি মাসিকপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে অভিনেত্রীদিগের ছবি দেওয়া হইয়াছে; আমরা এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য কি? এতদিন সুদূর পল্লীর যাহারা ঐরূপ বিষময় থিয়েটারের বিষয় মনে স্থান দিবার তত অবকাশ পায় নাই, এখন এই মাসিকপত্রের প্রসাদে ঘরে বসিয়া তাহারা অভিনেত্রীদিগের রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে। এবং কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ পুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়া হৃদয়

মন এবং অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। আর সহরের ত কথাই নাই। দেশহিতৈষী সম্পাদকগণের এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নহে।

রুচি।—যে সকল সম্পাদক, কবি, এবং লেখকগণ চিরদিন বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের যশোগান কণ্ঠ নিযুক্ত রাখিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে "বিদ্যাবিনোদ" প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আছেন। আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাঁহারা কি সূত্রে ঐ সকল থিয়েটারের ভক্ত এবং পক্ষপাতী হইলেন। বারাঙ্গনা থিয়েটার দেখাই যে কত লোকের অধঃপতনের কারণ, এ কথা কি তাঁহারা অবগত নহেন? যাঁহারা বাহিরে এত গণ্যমান্য, তাঁহারা ঐরূপ বিষয়ের সহিত কোন্ রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারে মিশেন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অথবা এই কথাই মনে হয়, তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি প্রভৃতি বহুগুণের আধার হইয়াও "লবণ শূন্য ব্যঞ্জনের" ন্যায় হইতে পার। থিয়েটার দ্বারা দেশের যে মহা অনিষ্ট হইতেছে তাহা কি তাঁহারা কিছুতেই বুঝিবেন না?

বিদ্বেষ প্রচার।—বিগত ২১ শে আশ্বিনের বসুমতী পত্রে "দায়ে পড়ে বিয়ে" হেডিংএ একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার ভাষায় ব্রাহ্মসমাজের নামে অতি কুৎসিত কল্পনা মূলক গল্প সাজাইয়া স্পষ্টরূপে বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সমাজের নিন্দা শুনিয়া সেই ধর্ম্মের প্রতিও লোকের আস্থা চলিয়া যায়। আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি উহার উদ্দেশ্য কি? ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা কুৎসা শুনিলে তাঁহাদের পাঠকগণ কি সুখী হন, তাই মাঝে মাঝে ওরূপ লেখা দুই একটা না দিলে চলে না? কিন্তু কোনও ব্যক্তি বা সমাজের অযথা নিন্দা করিলে যে নিজের অপরাধ ও জনসমাজের অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা কি ভাবিয়া দেখেন না? সহযোগী মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন। তিনি কি জানেন না যে, তাঁহার ধর্ম্ম কত উদার ও বিশ্বজনীন। যাঁহারা এতবড় মহাত্মার ধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা অপর ধর্ম্মের বা সমাজের নিন্দা বিদ্বেষ প্রচারে লজ্জিত হন না? পরমহংস মহাশয়ের শ্রদ্ধেয়

সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলে ভাল হয়! আর যদি তাঁহারা এ বিষয়ে নির্ব্বাক থাকেন, তাহা হইলে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে তাঁহারাও এই বিদ্বেষ প্রচারে আন্তরিক দুঃখিত নহেন।

এরূপ কুৎসিত ভাবে কোনও ধর্ম্ম সমাজকে সাধারণের চক্ষে হীন আদর্শে প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করা কি প্রকার প্রবৃত্তির কাজ? জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সকল বিষয়েই বিদ্বেষ, বিদ্বেষে বিদ্বেষে দেশটা ছারখার হইল তবু কি এদেশ হইতে এ ভাব দূর হইবে না?

দুর্গোৎসব।

আজ ২৩শে আশ্বিন, সপ্তমী পূজা। আজ প্রাণ কেন এমন করছে! কি এক ধর্ম্মোৎসাহ প্রাণে উদয় হচ্ছে! এ কি সংস্কারবশতঃ এমন হচ্ছে! কতকটা তা হতেও পারে। যে দেশে, যে মাটিতে জন্ম, আজন্ম দুর্গোৎসবের সংস্কার হাড়ে হাড়ে গাঁথা; ঢাকের বাজনা, লোকের ভিড়, বালক বালিকার সুবেশ—উৎফুল্ল মুখশ্রী, চারি দিকে জম্‌জমাট ভাব, প্রাণে কি এক আনন্দের সমাচার আনিয়া দিতেছে। কিন্তু এ যে কেবলই সংস্কারের জন্য হচ্ছে তাহাও বোধ হয় না। এর ভিতর দিয়া কি যে এক আনন্দের ভাব প্রাণে আসিতেছে! কি এক সুখস্পর্শ যেন প্রাণে অনুভূত হইতেছে। সংস্কারবশতঃ কি আনন্দ হয় না? এমন কি, কত অসার বিষয়ের স্মরণেও তো আনন্দ হয়, কত অপবিত্র আমোদের জন্য বন্ধুসম্মিলনের কথা মনে হলেও ত কত শত লোকের আনন্দ বোধ হয়? ছিঃ ছিঃ সে আনন্দ-স্মৃতির সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করিতেও ঘৃণা হয়। এ যে কার আবির্ভাবের জন্য আনন্দ! যাঁর স্বরূপ ঠিক্ বলা যায় না, এ বুঝি তাঁর আবির্ভাবের আনন্দ। কে যেন আসছেন—কে যেন এসেছেন। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে মাতৃভাবে এ আবির্ভাব বটে। তিনি কি মা? পিতা নহেন? তা কেন, পিতাও বটে, বন্ধুও বটে, দয়ালও বটে, প্রভুও বটে, মাও বটে; কিন্তু আজ মাতৃভাবে দেখা দিবার দিন। বহুকাল হইতে আজকার দিনে অসংখ্য মা, মা, বলে ডেকে ডেকে, মা রূপে দেখে দেখে, আজকার দিনে তিনি

পাকা মা হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা তাঁহাকে মা বলতে একজন, পিতা বলতে আর একজন মনে করে তারা বড় কৃপাপাত্র। মুখে অনেকে বলতে পারেন "সকল ভাবেই সেই একজন"। বলা সহজ, ভাবের ঘরে ভাবা বড় কঠিন। ওখানে ভেদভাব থাকৃলে বাহিরে মানব-ব্যবহারে তা ধরা পড়ে। যিনি সকল ভাবে এককেই বুঝেছেন, এককেই দৃঢ় করে ধরেছেন, তিনি সকল মানুষকেও একভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন।

আজই কি কেবল মার আসবার দিন! আর কোন দিন কি তিনি আসেন না? আসেন বৈকি। রোজ আসেন, সর্ব্বক্ষণ আসেন, আসেন আবার কি? যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান "অন্তরীক্ষ নহে শূণ্য তাঁহার সত্তায় পূর্ণ" তাঁহার আবার আসা যাওয়া কি? তাঁর আসা যাওয়া নাই সত্য, কিন্তু উহাত জ্ঞানগত অনুমানের কথা, সে পাকা ভক্তি বিশ্বাস-চক্ষু আমাদের কই? সে চক্ষুর নিকট আসা যাওয়া নাই। কিন্তু কত সময় আমরা তাঁহাকে ডাকিলাম, তাঁর পূজা আরাধনা করিলাম, তবু হয়ত তাঁর দর্শনের নাম গন্ধও পাইলাম না; আবার কখন না ডাকিতে তিনি আসিয়া উপস্থিত, অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয় পূর্ণ। আজকার দিন সেই দিন। আজ না ডাকিলেও তিনি আসেন। ভক্ত তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু তুমি ডা'ক আর না ডা'ক আজ তিনি আসিবেনই। ভক্তগণ জল জমাইয়া বরফ করে রেখে গেছেন। আজ তাঁর আবির্ভাবের জমাট ভাব এমন হয়ে আছে যে, তুমি যদি তাঁর ভাব নাও বোঝ, তবু তোমার প্রাণে আনন্দের ধাক্কা লাগিতেছে। এমনি এ দেশের মাটীর গুণ যে, সাধারণ মুসলমানগণ, যাহারা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধে বলে "ক্যা, খোদা আওরাৎ (স্ত্রীলোক) হ্যায়?" সেই মুসলমানের প্রাণেও আজ আনন্দের ধাক্কা লাগিতেছে।

আজ কি সকলেরই আনন্দের দিন! ঐ যে কত পুত্রহীনা মাতা; বৃদ্ধ পিতা; হৃদয়ের ধন হারাইয়া, কত যুবতী পতিকে লইয়া গত বৎসর এমন দিনেও কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কিন্তু আজ সে হৃদয় অন্ধকার। কত নরনারী যে আজ কাঁদিতেছেন? হাঁ। এ দৃশ্য সত্য, কিন্তু আজকার কান্নাও যেন কেমন একটু আর এক রকমের, অন্য দিন যেখানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয় অবসন্ন, হতাশ, মুহ্যমান, আজ সেখানে কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় যেন তেমন শূন্য নয়, তেমন অবসন্ন নয়। বুঝি আর না বুঝি, কান্নার পর হৃদয়ে কার যেন আবির্ভাব—কার

সত্তায়, যেন হৃদয় অত খালি নহে। কে যেন জোর করে কান্না ভুলায়ে দিচ্ছেন! এ যে মার আগমণের ফল তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আজ কি সকলেই মাকে দেখিতেছেন? কই তাত বোধ হয় না, ঐ যে অসংখ্য অতি কৃপাপাত্র নরাকার জীব, পূজার নামে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে ভক্ত যেমন ভক্তির উদ্বোধন করিতেছেন, তাহারা তেমনই কুপ্রবৃত্তির উদ্বোধন করিতেছে। ভক্ত যেমন ভক্তি স্রোতে ভাসিতে উৎসুক, উহারা তেমন পাপ স্রোতে ভাসিতে চলিয়াছে, এ কি দৃশ্য! বিষয়টাতে সাদৃশ্য আছে, উভয়েই আনন্দের প্রার্থী কিন্তু ভাবে স্বর্গ নরক প্রভেদ, ঐ অন্ধদিগের চক্ষু খুলে যাক্ তখনই বুঝিবে, তাহারা কি নিকৃষ্ট ঘৃণিত জঘন্য সুখের প্রত্যাশী। পূজা ফুরাইল, আমোদ আহ্লাদও ফুরাইল, তার পর কেবল অবসাদ, হৃদয় গ্লানি, হয়ত দেহে নূতন রোগের আবির্ভাব। অনন্ত জগতের উহারা এমনই সোপানে দাঁড়াইয়া আছে,—কুসঙ্গরূপ বন্ধনে এমনই হৃদয় বদ্ধ,

"চারি দিকে হের ঘিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে—
আমি ছাড়াতে চাই ছাড়ে না কেন গো, ভুলায়ে রাখে মায়ায় হে—"

এ সঙ্গীতের ভাব তাহাদের প্রাণে কখন কখন নিশ্চয়ই হয়? কিন্তু হায়! দেহ-হাটের কোলাহলে তাহা শুনিয়াও শোনে না, যদি বা শোনে—ঐ কোলাহল জন্য এত দূরাগত ভাবে অস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় যে, তাহার অর্থ বোধ হয় না। তাই নিরাশায় প্রবৃত্তি বসে আবার মোহ নিদ্রায় স্বপ্ন খেলায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতেছে।

সহরেও আজ অষ্টমীর দিন বার বার কি বীভৎস দৃশ্যই দেখিলাম। যাহারা ছাগ মহিষের রক্ত মাখিয়া মাতামাতি করিতেছে তাহাদের দশা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তাহারা জানে না যে, কি নৃশংস ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া হৃদয়ের কি দুর্গতি করিতেছে। এমন কি ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত এই কুশিক্ষায় নির্দ্দয় কাণ্ডে অভ্যস্ত হইতেছে। যাহারা অন্ধ, তাহারা ইহাকে ধর্ম্ম মনে করে। ধর্ম্মের নামে জীবহত্যা করিয়া মনে করে এই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। যদিও বহুল পরিমাণে এখন লোকে বুঝিয়াছে যে বলিদান—জীবহত্যা ধর্ম্ম নহে। তবুও বহু দিনের কুসংস্কারে হৃদয় এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে সকলে বুঝিয়াও বুঝে না, যেন তেমন নিঃসংশয় নহে।

অনেকে মনে করে বলিদান শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র রবারের মত যেদিকে টান সেইদিকেই যায়। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? না। কিন্তু আক্ষরিক শাস্ত্রের নিকট যাইবার আগে, হৃদয়ে বিবেক-শাস্ত্রের নিকট যাও, তখন সত্য শাস্ত্র বুঝিবে নচেৎ শাস্ত্র অন্ধকারে ঢাকা। বলিদান সম্বন্ধে বিবেক-শাস্ত্র কি বলে বুঝে দেখ।

তারপর আর এক শ্রেণীর লোকে বলেন,—"যাহারা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে পূজা-উপাসনা করিতে পারে না তাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবে পূজার সঙ্গে মাংসাহার ভালবাসে, সেখানে বৃথা মাংস ভক্ষণ না করিয়া দেবীকে তাহা উপহার দিয়া শেষে প্রসাদ পায় তাহা বরং ভাল। এ যুক্তিও বিবেক শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইলে অনেকেই বুঝিবেন যে ইহা কত অসার কথা। কারণ নিরামিষ ও আমিষ উভয়বিধ খাদ্যই জনসমাজে প্রচলিত আছে, যাহার যে মত রুচি বা প্রয়োজন জ্ঞান, সে সেই মত আহার করে। যাহারা মাংস ভক্ষণ করে তাহারাও তাহা খাদ্য জ্ঞানে খায়, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, যাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ব্যাপার তাহার মধ্যে এ বীভৎস কাণ্ডের স্থান দান করা, এ কি ভাব, কোন্ যুক্তি সঙ্গত? ঈশ্বরোপাসনায় সকলে সমান অধিকারী নহে, ইহা সত্য, তার জন্য কি তুমি উপাসনার ঘর কলুষিত করিবে? পূজার আদর্শ ছোট করিবে? উপাসনার আদর্শ চিরদিন পবিত্র ও উচ্চ রাখিতে হইবে। যে যতদূর গ্রহণ করিতে পারে ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিবে। আদর্শ কখনই মলিন করিতে পার না। জীব-হত্যা ধর্ম্মের কোন্ উচ্চ আদর্শ ব'লতো? বলিদানের যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তাহা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ঈশ্বর-চরণে ক্রমে ক্রমে নিজের সকল প্রকার আমিত্ব বলিদান করিতে হইবে। আত্ম-বলিদান মহিষ বলি অপেক্ষা অনেক কঠিন ব্যাপার।

তারপর নবমীও গেল; কত বাড়ী নাচগান পানভোজনের ধূমধাম তাহাও ফুরাইল। দশমীর ব্যাপারও গেল। এখন সাধক তুমি কোথায়? তুমি কি নিত্য-দেবীকে নিত্য-প্রভুকে ধরেছ? তা যদি ধরে থা'ক, তোমার চরণে আজ আমার প্রণাম। বিজয়ার পর যাহার সমস্ত ফুরাইল তোমার অবস্থা তাহাদের মত নয়, তোমার ঠাকুরের বিজয়া নাই। তোমার ঠাকুর প্রতিদিনের ঠাকুর। প্রতিদিন তুমি তাঁর কথা শুনিতে পাও, প্রতিদিন তাঁর কথা না শুনিলে তোমার চলে না, তুমি তাঁর কথা শুনিয়াই সকল কাজ কর। তুমি তাঁর কথা

জানিয়াই চিরকালের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হইয়া, তাঁর চরণাশ্রয় করিয়াছ। তবে ভাই! তুমি ঐ কোটী কোটী কৃপাপাত্র, যাহারা তিন দিনের পূজার বাহ্য আমোদে কত কদাচারে কাটাইল তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর। আর এ দাসের মস্তকে পদধূলি দাও। দেবীর জয় হউক।

উপাস্য সসীম কি অসীম?

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের মত এই যে, অনন্তের উপাসনা হয় না। উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্যকে ছোট করিয়া আনিতেই হইবে। যাহাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, যাহার কিছুই বোঝা যায় না, তাহার উপাসনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, বা অন্য দেব দেবীর মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইবে। এই মতাবলম্বীগণের মধ্যে শ্রীমতী এনিবেশান্ত একজন প্রধানা।

এই মতে কতখানি সত্য আছে এবং কতখানি মিথ্যা—ভ্রান্তি আছে তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ উপাস্যের স্বরূপ কি, উপাস্য সসীম কি অসীম তাহার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা হইবে।

যাহারা উপরোক্ত মতের পক্ষপাতী আমার মনে হয়, তাঁহারা কথাটা তেমন পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন নাই, কিন্তু কথাটার ভিতর সত্য আছে। তাঁহারা যে বলেন অনন্তের উপাসনা হয় না, তাঁহাদের কথাটার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে, অজ্ঞেয়ের উপাসনা হয় না। বস্তুতঃ যিনি অজ্ঞেয়, যাঁহার কিছুই জানি না কিছুই বুঝি না তাঁহার আবার উপাসনা কি? যে বস্তু সৎ কি অসৎ, ভাল কি মন্দ, মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা জানি না, তাহার উপাসনা করিব কিরূপে? সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তুর উপাসনা হয় না। আবার উপাস্য যদি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয় হয় তাহারও উপাসনা হয় না। যে বস্তুকে আমি সমস্তই জানিতেছি, সমস্তই দেখিতেছি, সমস্তই বুঝিতেছি ইহার অধিক আর কিছুই নাই এমন বস্তুরও উপাসনা হয় না।

যাহারা সাকার মূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, প্রতিমা যখন প্রস্তুত হয় তখন তাহাতে দেবতা থাকেন না, যখন

তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইল, তখন তাহার ভিতর দেবতার আবির্ভাব হইল। কিন্তু সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতে দেবতা ছিলেন, কেননা দেবতা সর্ব্বব্যাপী। এবং প্রতিমায় আবির্ভূত দেবতাও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ইহাই অনন্তের বীজ, যাঁহারা সরল অকপট সাধক তাঁহারা এই প্রকার উপাসনায়ও অগ্রসর হন, যদিও তাঁহাদের কল্পিত মূর্ত্তি, মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অন্তরায়, তথাপি ঐ যে অনন্তের বীজ যেখানে রহিয়াছে সেখানে উপাসনা যদি সরল হয়, অকপট হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হয় না। আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন প্রতিমাই দেবতা ইহার অতীত আর কিছু নাই, এই ত যাহা দেখিতেছি এই উপাস্য, তাঁহাদের উপাসনা কোন ফলপ্রদ হয় না। উপাসনা অনন্তেরই হয়, অজ্ঞেয়ের হয় না। অনন্ত এক হিসাবে অজ্ঞেয় হইলেও ইহা সত্য নয় যে, অনন্তের বিষয় মানুষ কিছুই জানিতে পারে না। বিশ্বাসী ভক্ত বলিতেছেন,—

"(আমি) চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই।
দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই;
তাহার ভিতরে, মৃদুমধুস্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই।
আঁধারে নামিয়া, আঁধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই;
আছেন জননী, এইমাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।"

আছেন জননী, এইমাত্র জানি, এই ত আমি কিছু জানি। তিনি আছেন আমি জানি, ইহাই অনন্তকে জানিবার সোপান। তিনি স্রষ্টা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পরম পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তিনি পরম জননী, এইরূপেই তাঁহাকে জানা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। তাঁহাকে জানার কোনকালে শেষ নাই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের শেষ নাই, শেষ নাই তাইত তিনি উপাস্য। যদি শেষ হইতেন, তবে ত উপাস্য হইতে পারিতেন না। যাহার সমস্ত জানিয়াছি তাহার আর প্রয়োজন কি? যাহাকে জানি অথচ জানি না, তিনিই প্রকৃত উপাস্য। এ সম্বন্ধে ভক্ত কি বলিতেছেন,—

"অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর ?
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে ?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার ?
যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো দূরে রবে তুমি ;
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত,
ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

এ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

তলবকারোপনিষৎ। ১০।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না ; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

অতএব উপাস্যে জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। তেমন বস্তুরই উপাসনা হয়। উপাস্য প্রকৃত পক্ষে চিরদিন অসীম অনন্ত পদার্থ কিন্তু যেটুকু স্বরূপ আমি বুঝিতেছি তাহা আমার আয়ত্ত সুতরাং অসীম হইয়াও যেন সসীম। অথচ উপাস্য যে অসীম এ জ্ঞান সর্ব্বক্ষণই থাকা আবশ্যক। উপাস্য সসীম হইলেই আর তিনি উপাস্য থাকেন না।

এই ভাব মানবীয় প্রেম সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। মানুষ মানুষকে যে ভালবাসে তাহাও অনন্তকেই ভালবাসে। আমরা যে শিশুকে ভালবাসি, আমরা ত জানি শিশু কত ক্ষুদ্র, শিশুর ত কোন জ্ঞান নাই, শিশু যা তা মুখে দিতে যায়, এই দেখে কি আমরা শিশুকে ভালবাসিতে পারি ? তা যদি হইত তবে আমরা তাহাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। শিশুকে দেখিলেই যে কেমন একটা আনন্দের ভাব আসে, কেমন একটা আকর্ষণ হয়, তা ঐ যতটুকু দেখিতেছি তাহার প্রতি নির্ভর করে না, যাহা দেখিতেছি তাহা ছাড়া শিশুতে আরো এমন কিছু আছে, যাহা বুঝি নাই, কিন্তু যেন বুঝিবার চেষ্টা আসে, সেই বস্তুকেই

ভালবাসি। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাতে যদি এ ভাব হয় যে, যাহা পরস্পরকে জানা হইয়াছে তাহা ছাড়া আর কিছু বুঝিবার বিষয় নাই, তবে সেখানে দয়া থাকিতে পারে, আসক্তি থাকিতে পারে, ব্যাবহারিক কার্য্যাদিও থাকিতে পারে কিন্তু প্রেম থাকিতে পারে না। যেখানে এই ভাব আছে, যাহা বুঝা হইয়াছে, তাহা শেষ নয় কিন্তু এখনও পরস্পরকে লাভ করিবার বাকী আছে, সেইখানেই প্রেম আছে। সাধুভক্ত সম্বন্ধেও যদি মনে হয়, অমুক সাধুর বিষয় যাহা বুঝিয়াছি ঐ পর্য্যন্ত, আর উহাঁতে অধিক কিছু বুঝিবার বিষয় নাই, তবে সেখানেও ভক্তি থাকে না। যেখানে আরো বুঝিবার, জানিবার আছে সেই খানেই ভক্তি আছে। এতএব বিশ্বাস নির্ভর প্রেম ভক্তি সকলই অসীমকেই আশ্রয় করিয়া আছে। অসীমই প্রকৃত উপাস্য।

—জনৈক পণ্ডিতের বক্তৃতার ভাব অবলম্বনে লিখিত।

মহাপুরুষ মোহম্মদের আকৃতি ও প্রকৃতি।

শ্রীমোহম্মদ গৌরবর্ণ মধ্যমাকার পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ললাট প্রসারিত ও উভয় ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম ছিল, উহা পরস্পর সংযুক্ত ছিল না; মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান ছিল। তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও উন্নত ছিল, তাহা হইতে এক জ্যোতি প্রকাশ পাইত। তাঁহার কপোল যুগল কোমল, সমতল ও বদন প্রসারিত ছিল; দন্ত শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল, এবং উপরের পংক্তির সম্মুখস্থ দশনদ্বয়ের মধ্যে অল্প ব্যবধান ছিল। শ্মশ্রু ও মস্তকের কেশরাশির মধ্যে কুড়িটী কেশ শুভ্র দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশ সরল ছিল না, অনধিক বক্র ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইত। * * তাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ছিল, এবং বক্ষ হইতে নাভিতল পর্য্যন্ত রোমাবলীর একটী সূক্ষ্ম রেখা ছিল। স্কন্ধ, কফোণি, (কনুই) ও জঙ্ঘার অস্থি স্থূল ছিল। করদ্বয় দীর্ঘ এবং করতল ও পদতল মাংসল এবং কোমল ছিল। তাঁহার শরীর সুগঠিত উজ্জ্বল ও সৌম্য ছিল। যখন তিনি মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে একপ্রকার তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ পাইত, এবং যখন কথা কহিতেন তখন কোমলতা ও সৌন্দর্য্য বোধ হইত। যে ব্যক্তি দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিত, সে শোভা ও

নূতনত্ব লাভ করিত, এবং যে নিকটে আসিয়া দর্শন করিত সরসতা ও মিষ্টতা প্রাপ্ত হইত।

হজরত মোহম্মদ কাপাস-সূত্রের একটি খর্ব্ব কামিজ ব্যবহার করিতেন। কেহ তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিয়াছিল, তিনি তাহা একবার মাত্র অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে কেনান দেশীয় একটি জোব্বা এবং এক জোড়া মোজা উপহার দিয়াছিল, তিনি সে সকল জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত, পরিসরে সার্দ্ধ দ্বিহস্ত পরিমাণ তাঁহার এক উত্তরীয় বস্ত্র ছিল, তিনি উহা স্কন্ধে ধারণ করিতেন। তাঁহার অন্য একপ্রকার পরিচ্ছদ ছিল, কোন স্থান হইতে কোন দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উহা পরিতেন। তিনি রজত অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে ধারণ করিতেন। সেই অঙ্গুরীয়ে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপরে "মোহম্মদ রসুল আল্লা" এই তিনটি পদ তিন পংক্তিতে অঙ্কিত ছিল। তদ্দ্বারা তিনি পত্রাদির উপরে মোহর করিতেন।

হজরত খোর্ম্মাবল্কলের তন্তুনির্ম্মিত রজ্জুর ছাউনি খট্টার উপরে শয়ন করিতেন, অনেক সময় তাহাতে কোন আচ্ছাদন বা শয্যা বিস্তৃত হইত না। একদিন তাঁহার প্রচারবন্ধু ওমর তদবস্থায় তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর, তুমি কেন কাঁদিতেছ?" ওমর বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরের নিকটে সম্রাট্ অপেক্ষাও গৌরবান্বিত, তাঁহারা কত পার্থিব সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, হায়! আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত হইয়া এই দুরবস্থায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" তখন হজরত বলিলেন "ওমর, তাঁহাদের জন্য পৃথিবী ও আমাদের জন্য স্বর্গলোক ইহা তুমি কি ইচ্ছা কর না?" হজরত পরলোকে গমন করিলে আয়শা দেবী একটি ইজার ও কম্বল বাহির করিয়া বলেন যে, "মৃত্যুর সময়ে এই ইজার ও কম্বলমাত্র তাঁহার দেহে জড়িত ছিল।"

তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কখনও অধীর হইতেন না, বরং যখন অধিকতর ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইতেন তখন জমজমের জলপানে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও সন্তোষ কোরাণের বিধি অনুযায়ী ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকিত। যে কার্য্য ঈশ্বরাভিপ্রেত না হইত তিনি তাহাতে ঔদাসীন্য

প্রকাশ করিতেন। পৌরুষ ও বদান্যতা বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বারে আসিয়া বঞ্চিত হইত না। কিছু না থাকিলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়া প্রার্থীর মনোরঞ্জন করিতেন। কথা দ্রুত বলিতেন না, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বাক্য সমাপ্ত করিতেন। যদি কোন মূর্খ দরিদ্র লোক ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিত, অধৈর্য্য হইয়া তার স্বরে কথা কহিত, তিনি অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতেন না। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল, যে ব্যক্তি তাঁহার সহবাসাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে বসিত, সে শীঘ্র উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধীর স্বভাব ছিলেন; লোকের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত তিনি কথনও কাহাকে স্বহস্তে উৎপীড়ন করেন নাই। কি ধনী কি দরিদ্র কি অধীন কি স্বাধীন সকল লোকের নিমন্ত্রণ ও উপহার গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সদ্‌কা (ধর্ম্মার্থ দীন-দুঃখীদিগকে দান) স্বরূপ দান করিলে গ্রহণ করিতেন না। প্রাপ্ত উপহারের বিনিময়ে তিনি তদনুরূপ দ্রব্য বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিতেন।

তিনি স্বয়ং পশুযূথকে ঘাস খাওয়াইতেন, উষ্ট্র বন্ধন করিতেন, গৃহ ঝাঁট দিতেন, ছাগ মেষ দোহন করিতেন, ভৃত্যের সঙ্গে একত্র ভোজনে রত হইতেন, গোধুম চূর্ণ করিতে দাস পরিশ্রান্ত হইলে স্বয়ং যাঁতা যন্ত্র ঘুরাইয়া তাহার সাহায্য করিতেন, এবং বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। ধনী দরিদ্র ভদ্রাভদ্র সকল লোককে সেলাম করিতেন, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রথমতঃ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে প্রভু ও দাস, শ্বেতকায় ও কৃষ্টাঙ্গ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের প্রভেদ করিতেন না। সামান্য শ্রেণীর কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। দিবসের অন্ন রাত্রির জন্য এবং রাত্রির অন্ন পরদিনের জন্য রক্ষা করিতেন না।

তিনি যথন সৈন্যসহ যাত্রা করিতেন তথন কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের বিজয়পতাকা সঙ্গে বহন করিয়া চলিতেন, সেই পতাকায় "লা এলাহ এল্লেল্লাহ মোহম্মদ রসুলাল্লা" অর্থাৎ "সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" এই বচন অঙ্কিত থাকিত।

তিনি স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদের সন্তোষবিধান

এবং সর্ব্বদা কুশল কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বিদেশে যাত্রা করিলে বা পীড়িত হইলে যাইয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, এবং তাঁহার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন। কোন মোসলমানের মৃত্যু হইলে "নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের জন্য, নিশ্চয় আমরা তাঁহার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী" এই প্রবচনটি পড়িতেন, এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপাসনান্তে তাহার সম্বন্ধে কুশল প্রার্থনা করিতেন। লোকের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতেন, সকল অবস্থায় প্রতিবেশীর তত্ত্ব লইতেন। কোন ধার্ম্মিক মোসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অগ্রেই তিনি তাঁহাকে সেলাম করিতেন। লোকের ক্ষমা প্রার্থনা ও ত্রুটি স্বীকারকে উপেক্ষা করিতেন না। অতিথি অভ্যাগতকে ভালবাসিতেন ও ভোজন করাইতেন। যখন তিনি কোন পশুর উপর আরোহণ করিয়া কোথাও যাত্রা করিতেন তখন কোন পদাতিককে সঙ্গে লইতেন না, আরোহী হইলে সঙ্গে লইতেন; সঙ্গীর বাহন না থাকিলে, আপনার নিকট হইতে বাহন দিতেন, দৈবাৎ তাহার অভাব হইলে, পদাতিককে অগ্রে প্রেরণ করিতেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিত, সেই লোক দাসদাসী হইলেও তিনিও তাহার সেবা করিতেন। প্রধান ধর্ম্মবন্ধুদিগের অধিকাংশ কার্য্যে তিনি স্বয়ং যোগদান করিতেন। তিনি যে সভাতে বা সমাজে উপস্থিত হইতেন সামান্য শূন্য আসনে যাইয়া বসিতেন, উচ্চ স্থান ও উচ্চ আসনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। উঠিতে বসিতে ঈশ্বরের নাম করিতেন। যে ব্যক্তি অপকার করিত তিনি তাহার উপকার করিতেন। দুঃখী দীনহীনের প্রতি একান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কখনও তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। হজরত স্বীয় জীর্ণ পাদুকা ও বস্ত্র স্বহস্তে শিলাই করিতেন তিনি অনেক সময় কাবা মন্দিরের অভিমুখে মুখ করিয়া বসিতেন।*

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন কৃত,
"মোহম্মদ চরিত" হইতে।

* অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ দেখিয়া মহাপুরুষ মোহম্মদকে চেনা যায় না। (কুঃ সঃ)

তটিনী।

১

কুল কুল রবে তুমি সদা বহে যাও।
অবিশ্রামে বহ কভু ক্লান্ত নাহি হও॥
সদা সময়ের সহ, বহ তুমি অহরহ,
বহে যাও পুনঃ ফিরে পিছে নাহি চাও।
তীব্র গতি কভু ধীরে এঁকে বেঁকে ধাও॥

২

পর্ব্বতে জন্মিয়া তুমি মেশো গো সাগরে।
সুখী হও আলিঙ্গিয়া সাগর সখারে॥
বিশ্বের অভাব পুরি, করি বিতরণ বারি,
বাঞ্ছা তব সুখী হতে পতি সহবাসে।
তাই ধাও কুলনাদে সাগর উদ্দেশে॥

৩

বন উপবন মরু নগর প্রান্তর।
শোভে তব তীরে দেখি কতই সুন্দর॥
কোকিল কুজন শুনি, বাড়াইয়া কলধ্বনি,
সে সুন্দর শোভা মাঝে প্রফুল্ল হইয়া।
দ্বিগুণ উৎসাহে তুমি যাও গো ধাইয়া॥

৪

চাঁদের কিরণে খেলে চকোরা চকোরী।
জ্যোছনা আলোকে বহ তুলিয়া লহরী॥
সদা সুমন্দ পবনে, বহ প্রফুল্লিত মনে,
চাঁদের আলোকে দিক বেড়ায় হাঁসিয়া।
খেলিয়া তাহার মাঝে যাও গো ভাসিয়া॥

৫

চাঁদের আলোক প্রতিফলিত হইয়া।
খেলে তব হৃদি মাঝে নাচিয়া নাচিয়া ॥
তব মৃদু উর্ম্মিমালা, চাঁদে লয়ে করে খেলা,
দেখায় সহস্র চাঁদ নির্ম্মল সলিলে।
যাহা এক হেরি মোরা এ নভোমণ্ডলে ॥

৬

নিচু বিনা উচু দিকে কভু নাহি ধাও।
নিচু হোতে সদা তুমি মানবে শিখাও ॥
বক্ষে পরি উর্ম্মিমালা, খেল তুমি কত খেলা,
ভুলাও মানবগণে খেলিতে তথায়।
অভাগা মানব তথা খেলিবারে ধায় ॥

শ্রীসুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺কাশীধাম।

কুশদহ। (১০)

গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ।—গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ অতি প্রাচীন। এই বংশের আদি পুরুষের নাম রাঘবেন্দ্র। সাতক্ষীরার নিকট বুড়ন পরগণার অন্তর্গত কুল্লো নামক স্থানে ইঁহার প্রথম বসতি। আনুমানিক দশ শত সালের প্রথমে অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্বকালে ইছাপুরের তাৎকালিক জমিদার, চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা রাঘবেন্দ্র গোবরডাঙ্গায় আনীত হন্। সিদ্ধান্তবাগীশ রাঘবেন্দ্রকে বাস করিবার জন্য ৫৫ বিঘা জমি দান করেন। মূল পুরুষ রাঘবেন্দ্র হইতে এখন গোবরডাঙ্গায় ১৩।১৪ ঘর হইয়াছে। রাঘবেন্দ্রের রামজীবন, রামভদ্র ও রামনারায়ণ নামে তিন পুত্র ছিলেন। হরদেব, মহাদেব, জানকীনাথ এবং হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রামজীবনের শাখা। পতিরাম, যোগীন্দ্র, শ্রীশ, জনার্দ্দন নকুলেশ্বর, নগেন্দ্র এবং মন্মথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রামভদ্রের বংশধর। রামনারায়ণের বংশধর এক মাত্র কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বর্ত্তমান আছেন। পূর্ব্বকালে এই বংশে অনেক

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সকলেরই টোল চতুষ্পাঠী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া ঐ সকল টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

রামজীবনের প্রপৌত্র কালীশঙ্কর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। স্বর্গীয় খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন গোবরডাঙ্গার জমিদার হন তখন তিনি কালীশঙ্করের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ কুল পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তদবধি কালীশঙ্করের বংশধরেরা সসম্মানে জমিদার বাবুদিগের পৌরহিত্য করিতেছেন। যমুনানদীর ভট্টাচার্য্যপাড়ার বাঁধা ঘাট কালীশঙ্করের সহোদর রাধাকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ১২২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীশঙ্করের দুই পুত্র, চন্দ্রশেখর ও মাধব। চন্দ্রশেখর পিতার ন্যায় পণ্ডিত ও সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মহাদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতৃ পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। তিনিই এখন এই পণ্ডিত বংশের মান রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দুই সংসার; প্রথম পক্ষের পুত্র সুরনাথ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" ও "জন্মএয়োস্ত্রী" নামক পুস্তকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে; সুরনাথ যৌবনকালেই দুইটি শিশু পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের চারি পুত্র, সকলেই সুশীল ও সচ্চরিত্র।

মাধবের পুত্র স্বর্গীয় হরদেব শিরোমণি এতদ্দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিল এবং বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কালীশঙ্করের অপর ভ্রাতার নাম রামধন। রামধনের পুত্র অমরচাঁদ এবং পৌত্র শরৎ ও হরি। শরৎ সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া জীবনের অধিকাংশ কাল মুঙ্গেরে সসম্মানে কাটাইয়া অমরধামে গিয়াছেন। হরিবাবু স্থানীয় মিউনিসিপাল আপিসে কর্ম্ম করেন। তিনি নির্ব্বিরোধী এবং সৎকার্য্যে উদ্‌যোগী।

রামভদ্রের পুত্র রামচন্দ্র ও রামরাম। রামচন্দ্রের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে সম্মানের সহিত দেওয়ানজী বাবুদিগের পৌরহিত্য করিতেছেন। রামচন্দ্রের প্রপৌত্র রামগোপাল চূড়ামণি যশঃ অর্থ ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র পতিরাম ও বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান আছেন।

রামরামের পুত্র শ্যাম ও গঙ্গাধর। শ্যামের পুত্র রামলোচন ও শ্রীধর।

রামলোচন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহিম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকতা করিয়া কাশীধামে অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। রাম লোচনের প্রপৌত্র কুঞ্জলালের কথা সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ইনি খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। ভিক্ষা করিয়া দুর্গোৎসব করিতেন এবং যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ও কাঙালী ভোজন করাইতেন। ইঁহার মৃত্যুতে পাড়ার সে আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

গঙ্গাধরের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের মধ্যে উমাচরণ, পূর্ণচন্দ্র, জনার্দ্দন ও রসরাজের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উমাচরণ ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধরের পৌত্র। ইনি বড়ই সরল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তৎপুত্র সাধুপ্রকৃতি রসরাজ নিজ চেষ্টা অধ্যবসায় দ্বারা লাহোর মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইয়াছিলেন। বংশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করেন।* পূর্ণচন্দ্র গঙ্গাধরের প্রপৌত্র। ইনি বড়ই পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও গঙ্গাধরের প্রপৌত্র। ইনি সজ্জন সরলহৃদয় ও দয়ালু।

রামনারায়ণের পৌত্র রামগোবিন্দ, সার্ব্বভৌম, নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছয় পুত্র। তৃতীয় পুত্র কাশীনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নৈহাটীতে তাঁহার টোল ছিল। মধ্যম কালীপ্রাসাদ ব্যতীত অপর পাঁচ ভ্রাতাই অপুত্রক। কালীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণমোহন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজকাল অল্পই দেখা যায়। ইনি নিজের

---

* রসরাজ পল্লীগ্রামের সংকীর্ণ ভাব হইতে বিদেশে থাকিয়া উদারশিক্ষায় মন এবং সংস্কারের উন্নতি সাধনে সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকৃতি সরল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। লাহোরে তিনি এমন একটি মহদন্তঃকরণ-বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি রসরাজের সঙ্কট পীড়ার সময় তাঁহাকে দেখিতে লাহোর হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। আমরা বলি কেবল বংশের দুর্ভাগ্য নহে, দেশেরও বিশেষ দুর্ভাগ্য যে অকালে রসরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অথবা ঐ শ্রেণীর স্বর্গীয় দূতেরা অল্প সময়ের মধ্যেই ইহ জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া সুন্দর জীবনাদর্শ রাখিয়া চলিয়া যান। স্বর্গীয় দূতের লক্ষণ এই যে আর সকলকে মানুষ ভুলিয়া যায়, উহাঁদিগকে জন সমাজ ভুলিতে পারে না। (কুঃ সঃ)

অবস্থায় সদানন্দ থাকিতেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ এবং শাস্ত্রালোচনা করিয়া কালাতিপাত করিতেন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র মহানন্দ ও কেশবচন্দ্র। উভয়েই দেবোপম চরিত্রবান্ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক। মহানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিঃশত্রু ছিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই মহাত্মা অকালে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনটী পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন *। কেশববাবু সংসারে থাকিয়াও যোগী। ইনি দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত ২৪ পরগণা জজ আদালতের পেসকারী ও রেকর্ডকিপারী চাকুরি করিয়া পেনসন গ্রহণ করতঃ অধুনা বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী কপূর C. S. I, মহোদয়ের ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন।

(ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত)

হিমালয় ভ্রমণ। (পরিশিষ্ট)

শেষ।

বেলা প্রায় ৩টার পর লুধিয়ানা পৌঁছিলাম। প্রথমে একটী ছত্রে গিয়া বিশ্রাম ও কিছু আহার করিয়া,তৎপরে সহরের ভিতর যাইয়া এক বাঙালী বাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিলাম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার নাম ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অতি সজ্জন, সাধু-ভক্ত ব্যক্তি। তাঁহার বাসায় আরও একটী বাঙালী গৃহস্থ ভদ্রলোককে দেখিলাম, তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে দেশাভিমুখে চলিয়াছেন। তিনি অনেক তীর্থের গল্প করিলেন, কিন্তু সকলই বাহিক ভাবের কথা বলিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকট বিশ্বাস ভক্তির, কথা কিছু পাইলাম না।

৬ই অগ্রহায়ণ প্রাতেই লুধিয়ানা ছাড়িলাম। মধ্য পথে 'জলন্ধর' এবং

---

* স্বর্গীয় মহানন্দ ভট্টাচার্য্য :মহাশয়ের পুত্র আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সোদর -প্রতিম ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পদ পসারে ধনে ধান্যে তেমন উন্নতি করিতে না পারিলেও, পিতৃ পিতৃব্যের সর্ব্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ 'ধর্ম্মপ্রকৃতি' লাভে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার ধর্ম্মভাবে তরঙ্গ নাই, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক। (কুঃ সঃ)

'জ্বালামুখী' তীর্থ দর্শনীয় ছিল, কিন্তু আমি আর তথায় না নামিয়া একেবারে অমৃতসর পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১২টা হইয়া গেল। একাওয়ালা আমাকে গুরুদরবারার নিকট নামাইয়া দিল। আমি তথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক্ষণে গুরুভাণ্ডারায় গেলে, আহার মিলিতে পারে। আমি অমৃতসরোবর দেখিতে পাইলাম। প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে যে অত্যুন্নত স্বুবর্ণ মণ্ডিত মন্দির, তাহারই নাম গুরুদরবারা। অমৃত সরোবরের চারিধার শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত চত্বর, এবং চতুর্দ্দিকে বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী। শুনিলাম এখানে লক্ষ যাত্রী আসিলেও আশ্রয়ের অভাব হইবে না, এই আদর্শে ঐ অট্টালিকা শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়, শুনিলাম, এক্ষণে ঐ স্থানে সাংসারিক ভাবে নানাবিধ আয়কর বিষয়ে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু গুরু নানকের মহিমায় সহরের চতুর্দ্দিকে এত ছত্র, এবং আখেড়া, (আশ্রম) আছে যে, লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং সাধু সান্ত নিঃশব্দে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সরোবরের একদিকে দরবারা, ও চাতালের সহিত বৃহৎ সেতু সংযুক্ত। উহা যথেষ্ট পরিসর। আমি এক্ষণে মন্দিরে না যাইয়া গুরু ভাণ্ডারায় গেলাম। সেখানে প্রকাণ্ড ইঁদারা হইতে কপিকলে জলরাশি উত্থিত হইতেছে, এবং শত শত লোকে স্নানাদি করিতেছে। আমি স্নান করিয়া সাধুদিগের সহিত গুরুভাণ্ডারায় ভোজন করিলাম। তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় ২টার পর বাহিরে আসিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনের যে অবস্থা হইয়াছিল এখন তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। দেখিলাম নরনারীতে মন্দির পরিপূর্ণ জমাট ভাব। শুনিলাম ভজন্, সারঙ্গীর স্বুরে (এখন তাহার সহিত হারমোনিয়মও ব্যবহৃত হইতেছে) ও মৃদঙ্গের (পাখোয়াজের) তালে সে যে কি ধ্বনি, কেন জানি না শ্রবণ মাত্রে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। সঙ্গীতের ভাষা সকলই যে বুঝিতেছিলাম তাহা নহে, কিন্তু তাহার উদার বিশ্বজনীন ভাবের শক্তিতে আমার মনকে কোথায় যেন লইয়া যাইতে লাগিল।

মন্দিরের ত্রিতল অবধি নরনারীতে পরিপূর্ণ। সাধারণতঃ উপরে স্ত্রীলোক-দিগের স্থান কিন্তু এখানে স্ত্রী পুরুষের ভেদও সঙ্কোচ ভাব নাই, কি এক মহা-পবিত্রতা যেন সকলকে সংযত করিতেছে। তৎপরে শুনিলাম এবং দুই দিনে

দেখিলাম এইরূপ জমাট ভাব প্রত্যহ। ভজন সর্ব্বক্ষণ চলিয়াছে, কেবল রাত্রি ১০ টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। ভোর ৪ টার পর হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত খুব জমাটভাব চলে। তার পর দল পরিবর্ত্তন হইয়া ভজন চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণ "গ্রন্থসাহেব" (শিখধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠ হয়। আমি অনেকক্ষণ ভজন শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। তথায়ও চারিদিকে দলে দলে ভজন করিতেছেন। কোথাও ভক্তগণ মিলিয়া সৎপ্রসঙ্গ (সঙ্গত) চলিয়াছে কোথাও সাধু সান্তগণ বসিয়া জপ করিতেছেন, ফলে এমন ধর্ম্মের ব্যাপার বোধ হয় আমি আর কোথাও দেখি নাই। কোন সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই, ভেদাভেদ নাই, (কেবল ভিতরে জুতা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ) আপন ভাবে বিচরণ কর আর ভজন শোন। মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ 'কড়াপ্রসাদ' (মোহন-ভোগ) সকলকে বিতরণ করিতেছেন। শত শত অন্ধ আতুরও শান্তভাবে বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ তাহাদিগের মধ্যে, রুটী, চানা (ছোলা) বণ্টন করিতেছেন।

আমি বাহিরে আসিলে একটু পরেই একটী সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। কি জানি কেন, অল্পক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্টতা ভাব আসিয়া গেল যে, কথায় কথায় আমার জীবনের অনেক গুঢ় কথাও তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তোষভাব প্রকাশ করিয়া, আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে বলিলেন, আপনি কল্য বেলা ৯টার সময় ঠিক এই স্থানে আসিবেন, আমি এক গৃহস্থ বাড়ি আহারের বন্দবস্ত করিয়া দিব তাহাতে আপনার আর কোন কষ্ট হইবে না। থাকিবার জন্য নিকটেই একটি ছত্রের ঠিকানা বলিয়া দিলেন। আমি বেলা থাকিতে সেই ছত্র-বাড়িতে গেলাম, সেখানে কেবল একজন দারবান বাড়ি রক্ষক আছে, সে আমাকে দ্বিতলে একঘর দেখাইয়া দিল, আমি সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। তখন এই প্রকাণ্ড বাড়ী প্রায় খালি ছিল। সেখানে থাকিয়া আমার কোনই অসুবিধা হইল না।

৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ভোর ভোর উঠিয়া মন্দিরে গিয়া মনে হইল একি ব্রহ্মসমাজের ১১ই মাঘ? মন্দির পরিপূর্ণ, ভিতরে দ্বারদেশের নিকট কোন রকমে বসিলাম। ভোরের ভজন-সঙ্গীত ধ্বনিতে আমার মন যে কোথায় ভাবরাজ্যে চলিয়া গেল, তাহা আর এখন বলিতে পারি না। যখন সূর্য্যরশ্মি

মন্দির-দ্বারে প্রবেশ চেষ্টা করিতেছিল, তখন মন যেন বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেরূপ অতুলানন্দ আমি জীবনে অল্পই ভোগ করিয়াছি।

তার পর বাসায় আসিয়া স্নানাদি করিয়া আবার মন্দিরে গেলাম। ৯টার সময় সেই স্থানে যাইবামাত্র ঐ সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাকে এক গৃহস্থ হালয়াইয়ের দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন "এই মহারাজ যে কয়দিন এখানে থাকেন তুমি ইঁহাকে ভোজন করাইও।" এই বলিয়া তিনি আর একবাড়ি আহারের জন্য চলিয়া গেলেন।

হালয়াই, "আইয়ে মহারাজ আইয়ে মহারাজ," বলিয়া আমাকে দোকানের উপরে উঠাইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তিনি গৃহ হইতে আনিত উত্তম রুটী ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য আমাকে ভোজন করাইলেন। তৎপরে কথা হইল বেলা ১টার পর তিনি আমার সঙ্গে বাহির হইয়া, এখানে যে সকল বিশেষ দর্শনীয় বিষয় আছে, তাহা আমাকে দেখাইবেন।

যথা সময়ে আমরা বাহির হইয়া কতকটা ঘুরিয়া আসিলাম। যাহা যাহা দেখিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে গুরু রামদাস, অর্জ্জুনদাস, গুরু গোবিন্দ সিংহের স্মৃতিচিহ্ন এক একটী ছোট ছোট মন্দিরের ন্যায় স্থান গুলির কথা স্মরণ আছে। গুরু নানাকের পর ক্রমে ক্রমে যে দশজন গুরু ছিলেন ইঁহারা তাঁহাদের মধ্যের, গুরু গোবিন্দ সিংহ শেষ গুরু; ইনি শিখ খালসা সৈন্য প্রস্তুত করিয়া দিল্লীর বাদসার সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। কারণ ইঁহার পিতা যিনি নবম গুরু ছিলেন তাঁহাকে বাদ্‌সা হত্যা করিয়াছিলেন। চতুর্থ গুরু রামদাস, ইনি অমৃত সরোবর এবং গুরুদরবারার নির্ম্মান আরম্ভ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তি গুরুতে সম্পন্ন হয়। এইরূপে দুই দিন পর্য্যন্ত অমৃতসরে আনন্দ উপভোগ করিয়া লাহোর যাত্রা করি। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন আরো একদিন অমৃতসর হইয়া দিল্লী, বৃন্দাবন, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, গাজীপুর মুঙ্গের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া ৮ই পৌষ কংগ্রেসের সময় থিইষ্টীক কন্‌ফারেন্সের অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদিগের সভার অধিবেশনের প্রথম দিনে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

স্থানীয় সংবাদ।

গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়।

গোবরডাঙ্গা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি আমরা অদ্যাপি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছি কি না তাহা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়; বোধ হয় পারি নাই। গোবরডাঙ্গা স্কুল যদি না হইত আমরা ঐ গ্রাম সমুহের এমন কি ও প্রদেশের অবস্থা আজ অন্য প্রকার দেখিতাম।

ইতিপূর্ব্বে জমিদার বাবুদিগের মাসিক সাহায্য ৫৫৲ টাকা, গভর্ণমেণ্ট সাহায্য ৫৫৲ টাকা, এবং ছাত্র বেতনে স্কুল চলিয়া আসিতেছিল। তারপর মধ্যে বাবুদের সাহায্য এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কমিয়া যায়, ও নানা কারণে স্কুলের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে বিগত মাঘ মাসের "কুশদহ" পত্রে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বনগ্রাম-সহযোগী পল্লিবার্ত্তায় প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত হয় যে—"গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে! বর্ত্তমান সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম বক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সকলেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে উদাসীন। কেবলমাত্র গোবরডাঙ্গার বাবুদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয় চলিতেছে। ইহার উপর যদি দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয় তবে অচিরাৎ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইবে। আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন।" আমরাও তখন স্কুল সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছিলাম। সুতরাং ঐ লেখা উপলক্ষ করিয়াই অগ্রহায়ণের কুশদহর স্থানীয় সংবাদ স্তম্ভে, আগে পত্র প্রেরক মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, আমাদের মন্তব্য এইরূপে প্রকাশিত হয়। "পত্র প্রেরক মহাশয় কথাটি উল্লেখ করিয়া ভালই করিয়াছেন, 'কিন্তু, আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন।' এই মন্তব্যটী উল্টা বলা হইয়াছে। কারণ বাবুদের অগ্রে এমত কিছু যত্নবান হওয়া আবশ্যক যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্নবান হন। বড়বাবু ইচ্ছা করিলে দেশের

কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী স্কুল কমিটা গঠন করিয়া বিবিধ উপায়ে শীঘ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন। অবশ্য একাজে অর্থের প্রয়োজন, তাহাও তিনি একটু চেষ্টা করিলে যাহা হইবে, আর কাহার দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। (অগ্রহায়ণের 'কুশদহ' দ্রষ্টব্য)

শ্রদ্ধেয় বরদা পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার প্রবন্ধে সুমিষ্ট রস-ভঙ্গিমায় স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা ও অভাব বর্ণনা করিয়া বলেন "গোবরডাঙ্গা স্কুলের সন্তান সন্ততি ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার, স্কুলমাষ্টার কেরাণী, নায়েব, গোমস্তা, মার্চেণ্ট আর কতই বা বলিব অসংখ্য বর্ত্তমান, কিন্তু কখন এক পয়সার মিছিরি দিয়াও জননীর কুশল জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা বিপন্না জননী অদ্যাপি 'হাঁটকুড়ীর' মত তাঁহার পিতৃকুলের মুখপানে চাহিয়া আছেন। মাননীয় 'কুশদহ' সম্পাদক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন "কাহাকেও কিছু না বলাতে স্কুলের সন্তানদিগের কিছু অভিমান হইয়াছে, মাননীয় জমীদার মহাশয়গণ আহ্বান করিলে তাঁহারা সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন, দেশের লোকের মনের ভাব এমন হইলে বাবুরাও সানন্দে সকলকে আহ্বান করিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি।"

আজ আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৭শে আশ্বিন অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল গৃহে স্কুলের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশে মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু এই সভায় গিরিজা প্রসন্ন বাবু উপস্থিত ছিলেন না। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দেওয়ানজী বাড়ির শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় (উকিল) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এক সারগর্ভ বক্তৃতায় এই ভাব প্রকাশ করেন যে, "ইংরাজী ১৮৪৭।৪৮ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়া এ পর্য্যন্ত দেশের কি উপকার হইয়াছে তাহা একবার সকলে ভাবুন। তৎকালে এ প্রদেশে বারাশত ও রাণাঘাট ব্যতিত উচ্চ বিদ্যালয় আর ছিল না। এ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবু ও তাঁহার পুত্রগণের সাহায্যে স্কুল চলিয়া আসিতেছে। এ জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট কতদূর ধন্যবাদের পাত্র তাহাও আপনারা ভাবিয়া দেখুন। এক্ষণে ইউনির্ভাসিটীর নূতন নিয়মানুসারে স্কুলগৃহের সম্পূর্ণ সংস্কার, লাইব্রেরী, শিক্ষক নিযুক্ত, ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করা

নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার কটার প্রয়োজন। জমিদার বাবুদিগের সাহায্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না, এখন সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমাদের অযত্নে স্কুলটী যদি উঠিয়া যায় তবে তাহা কি শোচনীয় ও দুঃখের বিষয় হইবে।" তৎপরে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় (এডিটার৹) মহাশয় বিশদ রূপে স্কুলের উপকারিতা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে কুঞ্জবাবু চাঁদার বহি লইয়া সকলের নিকট দেওয়ায় প্রথমে গৈপুর নিবাসী,—মোরেলগঞ্জ ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র বাবুর নামে এককালীন ৫০০৲ শত টাকা দান স্বাক্ষর করিলেন; তখন সকলের মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার হইল। আমরা বলি, বিধাতার খেলাই এইরূপ, তিনি কোন্ সূত্র ধরিয়া কাহার দ্বারা কি কাজ করান দেখিয়া আমরা অবাক হই। তৎপরে সকলে ইচ্ছামত চাঁদা সাক্ষর করিলেন।

শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র " সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গৈপুর	৫০০৲
" গণেশচন্দ্র আশ,	হয়দারপুর	২০০৲
" শরৎচন্দ্র রক্ষিত	খাঁটুরা	১০০৲
" কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	গোবরডাঙ্গা	৫০৲

তৎপরে ১০৲, ৫৲ টাকা অনেকেই সাক্ষর করেন, এক্ষণেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত ১০,০০৲ এক হাজার টাকার অধিক হইয়াছে।

তৎপরে বড়ই মঙ্গলের বিষয় যে স্কুল পরিচালনা এবং উন্নতি বিধান জন্য একটী কমিটি গঠনও হইয়াছে,—

রায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর জমিদার সভাপতি।
　" জ্যোতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়　　সম্পাদক।
　" ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র　　সহকারী　"
　" কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, অডিটার (হিসাব পরিদর্শক)।　,
　" হরিশ্চন্দ্র বল ম্যানেজার-সহকারী　"

ডাক্তার কেশব বাবু, শশী বাবু, অম্বিকা বাবু এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আজকার কথা শেষ করিতে চাই। আশা করি তাহাতে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। প্রথমতঃ আমাদের মনে হয় এই এককালীন দান ব্যাপারে জমিদার বাবুদিগেরও একটা বিশেষ দান থাকা উচিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সকল সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা মাসিক প্রায় ৭৫৲ টাকা দিতেছেন, এখনও অবশিষ্ট সকল অভাব তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আমরা এ কথা স্বীকার করিয়াও বলি, এখন যখন কমিটী গঠন করিয়া দেশের লোকের হাতে স্কুলের ভার দেওয়া হইল, তখন দেশের লোকও কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিবেন না কেন? অবশ্যই দিবেন! এই যে এককালীন দান পাওয়া গেল, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতেই কি স্কুল চলিবে? স্কুলের প্রকৃত উন্নতি এবং স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে, জমিদার বাবুদিগের সাহায্য সত্ত্বেও সাধারণের মাসিক চাঁদার একান্ত আবশ্যক।

তৎপরে স্কুল পরিচালনার জন্য যিনি যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, যিনি বুক দিয়া কাজ করিবেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। আমরা শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু এবং পতিরাম বাবুকেই সেইরূপ লক্ষ্য করি। আর কিশোরী বাবুকে কেবল সাধারণ সভ্যের পদে রাখা আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যভার (Active Part) দেওয়া আবশ্যক। ধনাধ্যক্ষ কে হইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" যেন না হয়।

বিলাতযাত্রা।—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বংশের স্বর্গীয় কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, মইনপুরীর উকিল শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, সিটিকলেজের প্রেফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বিগত ২৮শে অক্টোবর ব্যবহারিক বিজ্ঞান (ইকনমিক্ সায়েন্স) শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার শুভ ইচ্ছার সহায় হউন।

স্বাবলম্বন।

আমরা আহ্লাদের সহিত নিম্ন লিখিত সংবাদটী পত্রস্থ করিতেছি যে, কুশদহর অন্তর্গত গাইঘাটা থানার নিকট নগরউখড়া গ্রামে বাবু রামদয়াল বিশ্বাস, আপাততঃ শতাধিক বিঘা জমি লইয়া বিগত বর্ষ হইতে কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, একটী সদ্ভাবে প্রণোদিত হইয়া রামদয়াল বাবু এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকে চাষ কাজ করিয়া চাকুরী অপেক্ষা সুখের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন কি না তাহা পরীক্ষা করা। প্রথম বৎসরে তিনি জমীর সার দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য, নূতন প্রণালীতে চালাইয়া লাভবান হইতে পারেন নাই, কিন্তু সেজন্য তিনি নিরুৎসাহিত নহেন। কেন না, প্রথমে কোন অভিনব পথ প্রদর্শন করিতে হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরীর দুর্গতি বুঝিয়াও শক্তি সামর্থের অভাবে চাকুরী ভিন্ন গতি নাই মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের জীবিকার জন্য অন্য উপায় আছে, হাতে দশটাকা মূলধনও আছে, তাঁহারা যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রথম বাধা বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিবার জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারেন তবে তাহাতে লাভবান হইবার পক্ষে সন্দেহ নাই। রামদয়াল বাবুর কলিকাতা বেলগেছিয়ায় পাটের আড়ৎ আছে, ঈশ্বর কৃপায় কিছু মূলধনও আছে, চাষ কাজে একটী উপযুক্ত সহকারীও পাইয়াছেন এখন দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে পারিলে সফলতা লাভে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

রাণাঘাট-সবডিভিসানাল অফিসার মহোদয় রামদয়াল বাবুর একার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট বিশেষ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ কাজে দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

মৃত্যু।—আমরা অতীব দুঃখিতভাবে প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গা এবং কলিকাতা জরিপস্ লেন নিবাসী, বড়বাজার চিনিপটীর পরলোকগত

রামকৃষ্ণ রক্ষিতের কারমের অংশীদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। তিনি বহুকাল হইতে শিরঃপীড়া ভোগ করিয়া, ইদানীং ৩৪ বৎসর হইতে অন্যান্য রোগে একবারে কার্য্য পরিদর্শনে অক্ষম হইয়া পড়েন। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরী ও পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়াও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আর হইল না। তাহার উপর বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের মৃত্যুতে, তাঁহার যাহা কিছু বল সামর্থ্য ছিল তাহা চলিয়া যায়। তৎপরে, বিগত ১২ই কার্ত্তিক সংসারের সকল শোক মোহ ভুলিয়া, "ধনে সুখ নাই, জনে সুখ নাই, মান সম্ভ্রমেও হৃদয় বেদনা দূর হয় না", এই সকল মহাবাক্যের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিত্রতাপূর্ণ, অনেক শিক্ষনীয় বিষয় তাহার মধ্যে আছে। আমরা বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ অমরধামে তাঁহার আত্মার সদগতি করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।*

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।

আমরা কুশদহের বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদির এক্ষণে কেবল প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। আগামী বর্ষে ক্রমে ক্রমে সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সাপ্তাহিক। ১। Unity and the Minister, ২। বঙ্গবাসী, ৩। বসুমতী, ৪। সঞ্জীবনী, ৫। এডুকেশন গেজেট, ৬। কল্যাণী, ৭। পল্লীবার্ত্তা, ৮। প্রসূন।

পাক্ষিক।—৯। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১০। তত্ত্বকৌমুদী।

মাসিক।—১১। তত্ত্ববোধিনী, ১২। বামাবোধিনী, ১৩। নব্যভারত, ১৪। মহাজন বন্ধু, ১৫। যুবক, ১৬। বিধানপ্রকাশ, ১৭। মুকুল, ১৮। দেবালয়, ১৯। তিলি বান্ধব, ২০। সুপ্রভাত, ২১। Calcutta University Magazine, ২২। সমাজ, ২৩। তাম্বুলী সমাজ, ২৪। প্রকৃতি, ২৫। অর্চ্চনা, ২৬। ভারতী, ২৭। ভারত মহিলা (ঢাকা), ২৮। প্রচার, ২৯। গৃহস্থ, ৩০। বাণী, ৩১। অলৌকিক রহস্য, ৩২। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (ত্রৈমাসিক)

---

* নানা কারণে, কুশদহ বাহির হইতে কালবিলম্ব হওয়ায় কার্ত্তিক মাসের ঘটনা, উক্ত সংবাদটী আশ্বিনের কাগজে দেওয়া হইল।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

কুশদহ

স্থানীয়

মাসিক পত্র ও সমালোচন

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

সন ১৩১৮ সাল

তৃতীয় বর্ষ।

কুশদহ কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম এক টাকা।

কুশদহর তৃতীয় বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত স্বামী রামানন্দ ভারতী।

KUNTALINE PRESS.

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হয়ে,
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। বৈশাখ, ১৩১৮। ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা সঙ্গীত

ভৈরবী-বিভাস।—এক্‌তালা।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে।

নববর্ষ

জগতে নূতন কিছুই নাই, সকলই পুরাতন। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যে গাছ ফুলে ফলে সুশোভিত, বীজ রেখে সে অন্তর্হিত হয়। এক যায় আবার আসে, তার মূলে একই পরমাণুর ক্রিয়া মাত্র. এ কথা আগে জ্ঞান-শাস্ত্রেছিল। তার পর যখন ভক্তি শাস্ত্র এলেন, তিনি বল্লেন, কেবল পুরাতন নিয়ে আমার দিন চলে না। আরো কিছু নূতন চাই। নূতন চোখ চাই, নূতন মন চাই, নূতন জীবন চাই। প্রতিক্ষণে বিশ্বময় যে নূতন দৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে তা দেখ্‌তে হবে। একি কেবল ভাবের কথা? না, সত্য।

এ জীবনে কতবার পড়ে গেলাম, নিরাশা এলো, অবিশ্বাস এলো, অন্ধকারে পড়লাম, আবার কোথা হ'তে নূতন বল এলো নূতন ভাব এলো, তাই নব-জীবন লাভ করা সম্ভব হো'ল। সেই একই অনাদি-অনন্ত-অপরিবর্ত্তনীয় মহামহিমান্বিত পরম-পুরুষ পরমেশ্বরই তো এ জগতে নিত্য অভিব্যক্ত হ'চ্চেন। জড়ে প্রকাশ হ'চ্চেন, চেতনে হ'চ্চেন। তবে কেন আমরা তা নবীন চোখে নূতন ভাবে দেখব না? এখন যেমন করে তাঁকে পেলাম এর চেয়ে আবার কত বেশী করে! নিকট করে! সরস করে তাঁকে পেতে চাই। প্রতিদিনের জীবন কি নূতন সমাচার দেবেনা? নূতন হ'তে নূতনতর, নূতনতম তাঁর বাণী কি শুন্‌ব না? তা না হ'লে কি সেই একই পুরাতন নিয়ে এ সুদীর্ঘ জীবনপথে চলা যায়? দুদিনে যদি জগতটা সমস্ত পুরাতন হ'য়ে যায়, জীবন নীরস হ'য়ে যায়, তা হ'লে তো মৃত্যু এসে গেল। ইহ জগতের যে টুকু জীবন তাই কি শেষ? তাতো নয়। পরজীবনে আরো সূক্ষ্ম জগত আছে, কত রকমের নূতন জীবন আছে, অনন্ত উন্নতি আছে।

এই যে আজ নববর্ষ, আজকার দিন কেমন নব জীবনের সমাচার দিচ্চে। "নববর্ষ" এই শব্দ কেমন একটা নূতন ভাব এনে দিচ্চে। আজ যেন সেই চির নূতন প্রেমময়ের পূজা করিতে পারি। যিনি আমাদের কাছে নিত্য নূতন অন্নজল, নূতন স্বাস্থ্য এবং নূতন জ্ঞান বুদ্ধি পাঠাচ্ছেন, আমরা তাঁর কাছে নবজীবন লাভের জন্য, নব উৎসাহে সেবার জন্য,—যেন বল ভিক্ষা করিতে পারি। আজ আমাদের জীবন যেন নূতন হ'য়ে যায়। নববিধানবাদী।

বিবিধ মন্তব্য

(বিগত কয়েক মাসের 'কুশদহ' বাহির না হওয়ায় তৎ সাময়িক ঘটনার প্রতি কয়েকটি মন্তব্য রহিল।)

বেলুড় মঠে মেলা—বিগত ২১শে ফাল্গুন বেলুড় মঠে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের অষ্টসপ্ততিতম জন্মোৎসব হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তথায় যে মেলা হয় তাহাতে প্রতিবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা একদিকে অবশ্য আনন্দের বিষয়, কেননা ইনিও বর্ত্তমান যুগের একজন প্রেরিত মহাপুরুষ। যাঁহারা সমাজ সংস্কার মূলক ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত, তাঁহারা তবুও "হিন্দুসাধক" "ভক্ত" বা "যুগাবতার ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব" এই ভাবেও তাঁহাতে আস্থাবান্। কিন্তু তাঁহার সাধিত ধর্ম্ম, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত "হিন্দুধর্ম্ম" কে কি রকমে বুঝিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এই জন্য আর এক দিকে মেলা ক্ষেত্রে কেবল লোকের ভিড় দেখিয়াই তৃপ্ত হইবার বিষয় নহে। মহাত্মা-দিগের আবির্ভাব, ও তিরোভাব উপলক্ষে কত স্থানে মেলা হয়, তাহাতেও বহুলোকের ভিড় হয় কিন্তু উত্তর কালে মূলভাবের গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা চলিয়া গিয়াছে।

জাতীয় নামের পরিবর্ত্তন—বিগত ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ সর্ব্বত্র লোক সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। এবার এই তালিকায় অনেকে আপন আপন জাতীয় প্রচলিত নামের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে সচেষ্ট। সাধারণ-মানুষ মাত্রেই সকল বিষয়ে আগে সহজ পথটাই অন্বেষণ করে। কিন্তু প্রকৃতির গঠন এমনই যে বিনা সাধনে—বিনা পরিশ্রমে, কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত কোন উন্নতি সাধিত হয় না। তাই আমরা বলি যাঁহারা আপন আপন শ্রেণীর উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক, তাঁহারা কি এতটুকু ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে উন্নতির বিঘ্নকর যে সকল বিষয় সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে, কেবল ভাল নাম লইয়া অধিক কি লাভ হইবে? কাজে এবং গুণে যে জাতি বড় হয় তাহাকে চিরদিন পড়িয়া থাকিতে হয় না।

বিফল প্রযত্ন—হিন্দু সমাজের মধ্যে কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি, ইচ্ছা, ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বঙ্গের সাহাজাতি 'বৈশ্য' বর্ণে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়া কাশীর হিন্দু সমাজ দ্বারা বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। কোন কোন সংবাদ পত্রে এইরূপ প্রকাশ যে, অর্থব্যয় করিয়া কাশীর পণ্ডিতের দ্বারা তাঁহারা যে শাস্ত্র সঙ্গত "বৈশ্য" এইরূপ প্রমাণ লেখাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কি জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পন্থা? শুনিতে পাওয়া যায় এ বিষয়ে নাকি নমঃশূদ্র দিগের চেষ্টা প্রশংসনীয়; তাঁহারা আগেই সমাজে একটা বড় স্থান লাভের জন্য তত ব্যস্ত নহেন কিন্তু সমাজ সংস্কারে যত্নদূর সচেষ্ট।

বিবাহ বিধি—১৮৭২ সালের ৩ আইন কি, যাঁহারা সবিশেষ অবগত নহেন তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজের পৌত্তলিকতা শূন্য অসবর্ণ বিবাহ যখন হিন্দু সমাজ অনুমোদিত উত্তরাধিকারীত্বে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা দাড়াইল, তখন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগত অনুষ্ঠানকে নিরাপদ করিতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ করেন। আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্রগণ এই আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে এক প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন যে, "আমরা যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নহি, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের জন্য আমাদের বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক।" তখন গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট পৃথক আইন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঐ আইনের একটি ধারায় এই কথা যুক্ত করিলেন "যাহারা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করে না তাহাদের জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হইল।"

বিবাহ বিধি সংশোধন—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৩ আইনের আপত্তি জনক ধারাটি বদলাইবার আকাঙ্ক্ষায় সংশোধন প্রস্তাব করিয়া এক পাণ্ডুলিপি বড়লাট সভায় পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি কোন ধর্ম্ম মানিনা" এই কথাটি আইন হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক। কেননা এমন অনেকে আছেন যে তাঁহারা হিন্দুর অনেক আচার মানিয়া চলেন, এবং

হিন্দুসমাজের উন্নতিকামী, তাঁহারা "হিন্দু" বলিয়া লিখিবেন না কেন? যিনি যে ধর্ম্ম শিখাইতে চাহেন তিনি তাহা শিখাইবার অধিকার পাউন।" বস্তুত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন অনেক পরীক্ষা সহ্য করিয়া আইন পাশ করাইয়াছিলেন, তখন সমাজের এরূপ অবস্থা ছিল না। এতদিনে সকল সমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতেই এখন ঐ ধারা বদলাইবার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সহযোগী 'বঙ্গবাসী' বিগত ২৭শে ফাল্গুনের কাগজে দুই কলম এক প্রবন্ধে তাঁহার চির অভ্যস্থ সংকীর্ণভাবের আবেষ্টনে ভূপেন্দ্র বাবুকে এবং সহযোগীর মতে যাহারা 'অহিন্দু' তাহাদের প্রতি যাহাতে সাধারণের ভেদ ভাব জন্মায় এমত ভাবে ও ভাষায় সমালোচনা করিয়া "হে ইংরাজরাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। সহযোগী কি মনে করেন, হাতের আড়ালে সূর্য্যের প্রকাশ ঢাকিয়া রাখিবেন?

সমাজ সংস্কারের আন্দোলন—আজকাল সমাজ সংগঠনে এবং সংরক্ষণে মহা আন্দোলন চলিয়াছে। বস্তুত কোন্ স্মরণাতীতকালে মানব সমাজ গঠন আরম্ভ হইয়াছে তাহা কে জানে? যাহা জানা যায় তাহাতে ভাঙা আর গড়ার কাজই দেখা যায়। ভাঙা গড়া সৃষ্টির কাজ। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পঞ্চাশ ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হিন্দুসমাজের মধ্যে যে জীবন্ত সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহা সমস্ত দেশে প্রবিষ্ট হইয়া দিন দিন সমাজের আকার বদলাইয়া যাইতেছে। একদল লোক সমস্ত ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান, আর একদল ঠিক যেখানকার সেইখানেই সমাজকে টানিয়া রাখিতে চান। নব্য শিক্ষিত বিকৃতমস্তিষ্ক দিগের উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করাই তাঁহাদের চেষ্টা। সংস্কার আসে সংশোধনের জন্য অর্থাৎ ভাঙা কিনা গড়িবার জন্য। যতটুকুই হউক কিছু ভেঙে যে কিছু গড়িয়াছে, তাঁকে অস্বীকার করিয়া রক্ষণশীলদল বলিতেছেন ও কিছুই নয়, ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সংস্কারের মধ্যে রক্ষণশীলতার যে কিছু প্রয়োজন নাই, কাজ নাই, তা নয়, ভাঙা গড়ার মধ্যে ঐ যে বাধা পায়, তার দ্বারাই গঠন, সামঞ্জস্যের দিকে যায়। কিন্তু দলের মধ্যে বিদ্বেষ পোষনকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। সময়োপযোগী সমাজের আকার পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রাচীনের জীবনগত যেটা উচ্চ ধর্ম্মভাব এ দেশে আছে, তাহার বিশেষত্বে

লক্ষ্য রাখা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পত্রান্তর হইতে নিম্নে তদ্রূপ একটু আভাস দেওয়া গেল,—

"এখনকার লোকে জানে জগতে যত প্রকার জীব আছে তন্মধ্যে মনুষ্য জাতি বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমি এক জাতীয় জীবের অস্তিত্ব অবগত আছি, তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্য অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ। সেই সকল জীব দেব যোনিতে জাত বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মনুষ্য সেই জাতীয় জীবের সাহায্য পাইলে সেই আগন্তুক সাহায্যকে 'দৈববল' বলিয়া থাকে। একথা কেবল কাগজ কলমগত নহে। এখনও এদেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা দেব জাতির সন্ধান রাখেন।"

(ত্রিশূল, ২রা চৈত্র। " ব্রাহ্মণ সভার উচ্চাঙ্গ।")

ভৌতিক গল্পের ফল—আজকাল বাংলা সাহিত্যে, কি পুস্তকে কি মাসিকে, এমন কি সাপ্তাহিক পত্রেও অনেক ভৌতিক গল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। ঘটনা সত্য হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা জন সমাজে ভূতের ভয়টা সত্য সত্যই জন্মিয়া থাকে। অসংখ্য লোক জীবনে কখনো "ভয়ানক ভূত" দেখিল না, অথচ তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে না পারিয়া মহাভীরুতা পোষণ করে, আর এমন মহাসত্য যে ভগবান্ তাঁহার অস্তিত্বে পরিস্কার বিশ্বাস করিয়া ভবভয় ত্যাগ করিতে পারে না। হায় রে মানব জীবন!! একদিকে যেমন মিথ্যা বস্তুর বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পার না, অন্য দিকে তেমন সত্য বস্তুতেও স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না।

অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম

অনেকে বলেন 'হিন্দুধর্ম্মই জগতের আদি ধর্ম্ম; আর আর যত ধর্ম্ম সকলই তাহার পরে হইয়াছে। এমন কি হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে যে সকল বৈদেশিক ধর্ম্ম আছে তাহাও হিন্দুধর্ম্মের ছায়া মাত্র। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং সার সত্য সনাতন ধর্ম্ম। জগতে কত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, ক্রমে তাহার পতনও হইল কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কেহ কিছুই করিতে পারে নাই, চিরদিন অক্ষয়রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত কথাগুলির সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বেদ তাহার সাক্ষী। কিন্তু বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম জিনিষটা কি? তাহা কি দেশ কালে বদ্ধ? হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ কি কোন এক কালেই শেষ হইয়া গিয়াছে? তাহার সমস্ত পূর্ণতা কি একদেশেই হইয়া গিয়াছে, এখন আর কোন উন্নতির বা সংস্কারের প্রয়োজন নাই! কাহার কাহার হয়ত এরূপ ধারণা থাকিতে পারে যে, নিত্য সনাতনধর্ম্ম যাহা. তাহা এককালেই প্রকাশ পায়, কিন্তু নিত্য নিত্য তাহা জন্মায় না। যাহা পরিবর্ত্তশীল, তাহা বাহিরের বিষয়, তাহাতে মূল ধর্ম্মের কিছু আসে যায় না। যুগভেদে সত্যধর্ম্ম কখন প্রকাশ পায় কখন কখন আপন স্বরূপে লুক্কাইত থাকে। ইহা ব্যক্তিগত জীবনেও হয়, এবং দেশে কালে সমাজগত ভাবেও হয়।

বিজ্ঞ সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্মের দুইটি দিক আছে, একটি অন্তরঙ্গ বা অধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিক, আর এক বাহিরঙ্গ বা অনুষ্ঠানের দিক। প্রথমত জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মানবাত্মার কোন কোন সত্যের জ্ঞান আদিকালে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে এখনও তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই,—যেমন ঈশ্বর জ্ঞানময় চৈতন্য স্বরূপ এই সত্য উপনিষদ্-যুগে প্রকাশিত হইয়া তাহার সাধন প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর শান্ত, দাস্য সখ্যাদি ভাবগুলি যাহা ভগবানের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ বাচক—যাহা অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক বিষয়, তাহা এক কালে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব ইহা সত্য যে, ধর্ম্ম বিকাশের কোন কালে শেষ নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল এমন সাক্ষ্য দেয় না যে ধর্ম্ম একই অবস্থায় চির দিন ছিল বা থাকিবে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরই কেবল অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহার শক্তি ও ভাব মানবাত্মায়, যাহা ক্রমবিকাশ হইতেছে তাহারই নাম ধর্ম্ম, সে বিকাশ বা ধর্ম্মের শেষ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেন তাঁহারাই এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের বিরোধ কল্পনা করেন। এবং আপন আপন কল্পিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্য সেইরূপ বিরোধ ভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম্মই কোন ধর্ম্মকে ছাড়িয়া উৎপন্ন হয় নাই। বিশ্বব্যাপী একই ধর্ম্ম-ধারা যুগে যুগে দেশে

দেশে প্রবাহিত হইতেছে, এবং যখনই ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী সময়ে আবার নূতন ভাবে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার সংস্কার সাধন এবং অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আদিধর্ম্ম হইলেও যুগে যুগে তাহা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া সামঞ্জস্যের দিকেই আসিয়াছে। সাময়িক নূতন সংস্কারের সঙ্গে যে পুরাতনের বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা ক্রমে সন্ধি স্থাপনের নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ নব সংস্কার পুরাতনকে উন্নতির দিকে—সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন হিন্দুধর্ম্ম হইতে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাঁহারা ভুল করেন। পুরাতন হিন্দুধর্ম্মকে সংস্কার করিয়া দেশ কালের উপযোগী আকার দিতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিলে এ কথা অতি সহজেই স্বীকার করিতে পারা যায় যে, যে সময় হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল তখনই দেশীয় লোকের মধ্যেই ধর্ম্ম এবং সামাজের সংস্কার উপস্থিত হইয়া সমাজ ও সংসারমুখীন ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতরণ হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের মূল ইংরাজী শিক্ষা ও শাসন প্রণালী, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনকে যথাস্থানে স্থাপিত রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ধর্ম্মের আবেষ্টনে এই নব সংস্কার জাতীয় ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম হয় তাহার জন্য যে বিধান, তাহা কি বিধাতার করুণা নহে। অবশ্য হিন্দু সমাজও যে আপনার কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে মানবীয় ভ্রম ভ্রান্তি স্বত্বেও একটা সার্থকতা সাধন করিতেছে। বিস্তৃত হিন্দু সমাজকে নব আকার দান করিয়া দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহাতে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজই যদি থাকিয়া যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? নামে কি আসে যায়? অতএব ধর্ম্ম আধুনিক হইলেই যে তাহা প্রাচীন হইতে অশ্রেষ্ঠ তাহা সত্য নহে। প্রাচীনকে ছাড়িয়া নবীনের কখন উদয়ই হইতে পারে না, পূর্ব্বের সহিত পরের সম্পূর্ণ যোগ থাকে। নূতন, পুরাতনেরই ক্রমবিকাশ মাত্র। অথবা আদিকে মেঘমুক্ত করিয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে. আদি হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নবীনের উদয় নয় কি?

বাসনা

তব প্রেম মাঝে এ হিয়া হারিয়ে যাক্
আর যেন কভু নাহি উঠে প্রভু,
চিরতরে ডুবে থাক্।
হ'য়ে যাক্ এই নয়ন অন্ধ,
হউক এ মোর শ্রবণ বন্ধ,
যেন বাহিরের কিছু দেখিতে না পাই,—
না শুনি কাহারো ডাক্।
ঘুচে যাক্ সব অনুভূতি মোর,
যাক্ 'আমি' ও 'আমার' এই মোহ-ঘোর,
প্রাণ-মাঝে শুধু বাজুক্ গোপনে
তব আরতির শাঁখ্।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

কুশদহ বৃত্তান্ত (১১)

ইতিপূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা দেওয়ানজী বংশাবলীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পৌত্রাদিগণ কলিকাতায় ভবানীপুরে অদ্যাপি বসবাস করিতেছেন। সুতরাং ঐ বংশের অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইল;—

স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভবানীপুরের বাড়ীতে অবস্থিতি কালীন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করেন। এবং "তত্বানুসন্ধান" নামক বেদান্ত বিষয়ক একখানি ও "শিবোদয়" নামক আর একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে বিতরণ করেন। তাৎকালীন পণ্ডিত সমাজে তাঁহা প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিনি শেষ জীবনে কাশীবাস করিয়া তথায় দেহত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথও চল্লিশ বৎসর ওকালতি কর্ম্মে সসম্মানে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর কালে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে করিতে কাশীধামেই ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনিও "গায়ত্র্যাপরমোপাসনা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে বিতরণ করেন।

চন্দ্রনাথের ছয় পুত্র :—সারদাপ্রসাদ, বরদাপ্রসাদ, জ্ঞানদাপ্রসাদ, অন্নদা প্রসাদ, কুলদাপ্রসাদ, ও ক্ষীরোদাপ্রসাদ।

জ্যেষ্ঠ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলিপুর জজ আদালতের সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে পেন্সান্ লইয়া কাশীধামে সপরিবারে বাস করিতে ছেন। ইনি ধর্ম্মানুরাগী, সরল, শান্তপ্রকৃতি সম্পন্ন। ইহার দুই পুত্র :— উপেন্দ্র ও মনীন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ কাশীতেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা কার্য্য করেন, কনিষ্ঠ মনীন্দ্রনাথ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে চট্টগ্রাম হাইস্কুলের ২য় শিক্ষকের পদে থাকিয়া বি, এল, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উপেন্দ্র, মনীন্দ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

মধ্যম বরদাপ্রসাদ পিতৃপদানুসরণ করিয়া আলিপুর জজ আদালতে যশের সহিত ওকালতি কার্য্যান্তে এক্ষণে ইনিও সপরিবারে কাশীবাস করিতেছেন। ইঁহার এক পুত্র প্রমথনাথ স্বাধীনভাবে ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

তৃতীয় জ্ঞানদাপ্রসাদ ভবানীপুরের বাড়ীতে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়াদি দেখেন। ইঁহার তিন পুত্র :—সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। মধ্যম নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কলিকাতা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের Financial (আয় ব্যয়) বিভাগে কর্ম্ম করেন, (ইঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিবরণে কিছু উল্লিখিত হইয়াছে) কনিষ্ঠ দেবেন্দ্র নাথ কলিকাতায় General Post Office (জেনারল্ পোষ্টাফিসে) কর্ম্ম করেন।

চতুর্থ অন্নদাপ্রসাদ আলিপুর জজ আদালতে ওকালতিতে অল্পকাল মধ্যেই যশস্বী হইয়া ডায়মণ্ড হারবারে সরকারী উকীল নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুকাল বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটে এসিষ্ট্যাণ্ট লিগল মেম্বার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং সরলহৃদয়, উদারচেতা ও অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ইনি প্রৌঢ়াবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার তিন পুত্র :—হরিপ্রসন্ন,

কালীপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। জ্যেষ্ঠ হরিপ্রসন্ন কণ্ট্রাক্টরি কর্ম্ম করেন, মধ্যম কালীপ্রসন্ন সরকারী তারবিভাগে কর্ম্ম করেন, কনিষ্ঠ তারাপ্রসন্ন কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী পরলোকগত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন।

পঞ্চম পুত্র কুলদাপ্রসন্ন বাতব্যাধি রোগে কিছুকাল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়া মধ্য বয়সে পরলোক গমন করেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ ক্ষীরোদাপ্রসাদ মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাক্তার রূপে নানাস্থানে কর্ম্ম করেন। তৎকালে বেঙ্গল টেক্সট বুক কমিটির অনুমোদিত ডাঃ প্লেফেয়ার (Dr, Playfair) সাহেবের "মিড্ওয়াইফারি" (Midwifery) নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ তাঁহার "ধাত্রীবিদ্যা" পুস্তকখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পান এবং পুস্তকখানি মেডিকেল স্কুল সমূহের পাঠ্য পুস্তক হয়। ডাঃ বর্ণিও (Dr Burneyeor) সাহেবের "ক্লিনিক্যাল মেডিসিন (Clinical medicine) পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "চিকিৎসা সন্দর্ভ" নামে যে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে চিকিৎসা বিদ্যার্থীগণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইনি কিছুদিন পরে সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অধুনা বর্দ্ধমান রাজবাটীর চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন।

ক্ষীরোদ বাবু অতি নিরীহ, সজ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ঈশ্বরারাধনায় এবং শাস্ত্রানুশীলনে ইঁহার বেশ অনুরাগ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ ইনি "শিবপুরাণ সংহিতা" নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবু "থিওসফিকাল্ সোসাইটি" এবং আরও দুইটী আধ্যাত্মিক সভার সভ্য। ইঁহার তিন পুত্র :—বীরেশ্বর, আশুতোষ ও হরেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ বীরেশ্বর লক্ষ্ণৌতে ও, এণ্ড আর রেলওয়ে ম্যানেজার আপিষে কর্ম্ম করিতেছেন। আশুতোষের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় উপস্থিত পিতৃসন্নিধানেই থাকেন। কনিষ্ঠ হরেন্দ্রের এখনও পাঠ্যাবস্থা।

(শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।)

পরলোকগত

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিশ্বছবিতেই যে ভগবানের প্রকাশ, বা এ সংসার যে তাঁহার লীলাক্ষেত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? তন্মধ্যে মানব জীবনে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহা আরো পরিস্ফুট। প্রত্যেক জীবনেই তাঁহার মহিমা আছে। মানবের পক্ষে মানব জীবন-চরিত বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়। যিনি যতটা তাহা দেখেন, বুঝেন, তিনি ততই ধন্য হন।

আজ আমরা যে জীবনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, বিগত আশ্বিনের 'কুশদহতে' তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পত্রস্থ করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছি "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিত্রতাপূর্ণ, অনেক শিক্ষনীয় বিষয় তাহার মধ্যে আছে।" বিশেষতঃ তাহাতে ভগবানের করুণা দর্শন করাই প্রধান স্বার্থকতা; ভগবান ঐ বিষয়ে আমাদিগকে শুভ দৃষ্টি-শক্তি দান করুন।

রাখালচন্দ্রের পিতা, ফটীকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস, বনগ্রামের নিকট চাল্‌কি গ্রামে ছিল। জানি না, কি কারণে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা যখন ৮৷৯ বৎসরের, এবং একমাত্র পুত্র রাখালচন্দ্র যখন কয়েক মাসের মাত্র, তখন তিনি বয়সে প্রায় প্রাচীন হইয়াছিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা গ্রামে উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। এ অবস্থায় শিশুর লালন পালনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে কিরূপ নিরুপায় অবস্থায় পড়িলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কন্যার শ্বশ্রূ আলয় বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক তিনি শিশু পুত্রটিকে লইয়া গোবরডাঙ্গায় আসিলেন। গোবরডাঙ্গা গ্রামের তখন জাজ্বল্যমান অবস্থা, কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, এত বড় ব্রাহ্মণ পল্লীর মধ্যে কেহই এই শিশুর প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন না। যখন নিরাশায় কষ্টে সৃষ্টে ফটীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন গুলি কাটিতে লাগিল, তখন সহসা রামতারণ কুণ্ডুর মাতা ঠাকুরাণী স্নেহপরবশা হইয়া শিশুর ভার লইতে

চাহিলেন। ফটীকচন্দ্রও স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাঁহার হাতে শিশু পুত্রটিকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ক্রমে যখন রাখালচন্দ্র একটু বড় হইতে লাগিলেন, কাজেই তখন তাহাকে অন্ন প্রদান করা আবশ্যক হইল। ব্রাহ্মণ তনয়কে কিরূপে শূদ্রের অন্ন দেওয়া হইবে এই চিন্তা বৃদ্ধার মনে হওয়ায় তিনি ফটীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন এই কথা অনেকেই বলিলেন যে "বালককে অন্ন দেওয়ায় দোষ নাই, 'উপনয়ন' হইলে আর অন্ন দেওয়া হইবে না।" যাহা হউক এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, আর এক অবস্থার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ পিতা, এবং রামতারণের শোকে অসহায়ের আশ্রয় দায়িনী বৃদ্ধা জননী, একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জানি না তখন বালক রাখালচন্দ্রের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক তখন রামতারণের স্ত্রী "পূণ্যবৌ" রাখালচন্দ্রের আশ্রয় দায়িনী রহিলেন।

বলা বাহুল্য যে রাখালচন্দ্রের লেখা পড়া যাহা কিছু গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আরম্ভ এবং শেষ হইয়াছিল। কেন না, ইংরাজী স্কুলে পড়া তখন ঐ পল্লীগ্রামে তেমন সাধারণ হয় নাই। বিশেষতঃ রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষার জন্য যে কেহ কিছু ভাবিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন, অল্প বয়সেই লেখা পড়া শেষ করিয়া রাখালচন্দ্রের পক্ষে কিছু অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও যেন তাঁহার পক্ষে কোন ক্লেশ সাধ্য ব্যাপার হয় নাই।

সুবিখ্যাত হারাণচন্দ্র কুণ্ডুর বাটীর পার্শ্বে রামতারণ কুণ্ডুর বাটী, অথবা "পূণ্যবৌ" পরিবারের মধ্যে গণ্যা বলিয়াই হউক হারাণকুণ্ডুর বাটীতে অবাধে রাখালচন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হারাণচন্দ্রের অন্তে যখন একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তখন দপ্তরখানায় শিক্ষানবিশী মুহুরী, হইতে ক্রমে খাজাঞ্জির কাজে স্থায়ী কর্ম্মচারী হইয়া তৎপরে গিরিশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার সহকারী হইতে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা রাখালচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। এমন কি ঐরূপ সম্পর্কে তিনি বাড়ীর সকলের নিকট সম্বোধিত হইতেন।

তৎপরে যখন গিরিশ বাবু বিষয় কর্ম্মের সম্বন্ধে কলিকাতায় যাতায়াত এবং সময় সময় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কতকগুলি ভদ্র বেশধারী কপটভাষী অসৎ লোকের সংসর্গে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু অত্যন্ত সরল বিশ্বাসী দয়ালু ছিলেন, যে যাহা বলিত তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তদ্ভিন্ন স্বইচ্ছায় অনেক অনিয়মিত দানাদি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করাতে মূলধন পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতে লাগিল। যে গিরিশ বাবু ইতিপূর্ব্বে সুরাপায়ীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে এবং সংসর্গ দোষে তাঁহাতেও সেই দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিল। রাখালচন্দ্রও সকল বিষয়ে তাঁহার সহকারী, সুতরাং তিনিও ঐ দোষে লিপ্ত হইলেন। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজ মুখে শ্রুত আছি, এবং অন্য কারণেও জানি যে, গিরিশ বাবুর সম্পর্কীয় ভ্রাতা যদুনাথ কুণ্ডু এই দুষ্কার্য্যের পথ প্রদর্শক। যাহা হউক এইরূপে যখন গিরিশ বাবুর শোচনীয় অবস্থা হইতে লাগিল তখন তাহার শেষ অভিনয় দর্শন করিবার পূর্ব্বে রাখালচন্দ্র আশ্রয়, উপজীবিকা এবং আত্মীয়তা প্রভৃতির সকল মায়া কাটাইয়া এই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১২৭৫ সালের শেষ কিম্বা ৭৬ সালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। তখন অনুমান রাখাল বন্দোপাধ্যায়ের বয়স ২২।২৩ বৎসরের বেশী হইবে না। রাখলচন্দ্র তদ্রূপ শিক্ষা সংসর্গের মধ্যে থাকিয়াও স্বভাবত তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন।

এই অবস্থার পর তিনি চিনিপটী আসিয়া সুবিখ্যাত, সুদক্ষ ব্যবসায়ী দুর্গা চরণ দত্ত মহাশয়ের বিস্তৃত চিনির আড়তে মুহুরীআনা কাজে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বিচক্ষণ মুহুরী মধুসূদন ঘোষালের সমকক্ষ হওয়ায় শীঘ্রই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। (আগামী বারে সমাপ্য।)

স্থানীয় সংবাদ

সৎদৃষ্টান্ত—কুশদহবাসী তাম্বুলী সমাজে, সৎদৃষ্টান্ত মূলক একটি বিবাহ সংবাদ আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি। বালকের বয়স ১৯।২০ বৎসর, বালিকার বয়স ১০ বৎসর। ছেলেটি এফে পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেছে। এই বিবাহ সম্বন্ধে পাত্রের পিতা বলেন আমি পণ

কিছুই চাই না। কিন্তু বিবাহের পরে মেয়েটিকে কলিকাতা মহিলা-শিল্প স্কুলে লেখা পড়া ও শিল্প শিক্ষার জন্য ৩ বৎসর প্রেরণ করিতে হইবে. এদিকে ছেলেও ৩ বৎসরে ডাক্তারী পাস করিয়া তাহার পরে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিবে। বলা বাহুল্য বিবাহের পর বালিকার পিতা কন্যাকে উক্ত স্কুলে প্রেরণ করিতেছেন। তাম্বুলী সমাজের পক্ষে ইহা যথেষ্ট সৎদৃষ্টান্তের কথা। বালকের পিতা উক্ত সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি সুতরাং অন্যান্যে ও তাঁহার সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে সমাজের অনেকটা উন্নতি হইতে পারে।

খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়—সম্প্রতি আমরা খাঁটুরা বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০টি উপস্থিত দেখিলাম। প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্তই অধিকাংশের পাঠ্য। যাহা হউক এই স্কুলের বয়স এখনো একবৎসর হয় নাই, সুতরাং এখন ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। তবে স্কুলটির পর পর যাহাতে উন্নতি হয়. সকলে তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বালিকার শিক্ষা, শিক্ষয়িত্রী দ্বারা হওয়াই সঙ্গত। অগত্যা এমন শিক্ষক আবশ্যক. যিনি মেয়েদের প্রকৃতি বুঝেন।

বিবাদ নিষ্পত্তি—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এতদিন পর্য্যন্ত বনগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার, গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোবরডাঙ্গার জমীদার রায় বাহাদুর গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের জন্য মোকর্দ্দমা—বহুদিন হইল এক অদ্বিতীয় নিরাকার, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয় বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, মাতুলের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে অনেক অর্থব্যয় করেন। ১৩০০ সালে লক্ষ্মণ বাবু পরলোক গমন কালে ক্ষেত্র বাবুকে তাঁহার জমিদারী প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু কয়েক বৎসর মাত্র কার্য্য চালাইয়া, নানা অসুবিধা বশতঃ একজিকিউটার সিপ্ ছাড়িয়া দেন। ইতি-পূর্ব্বে লক্ষ্মণ বাবু ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে পিতৃস্মৃতি-মন্দির, "মঙ্গলালয়" নামক এক

বাড়ী দেশহিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী "মঙ্গলালয়" এবং ব্রহ্মমন্দিরাদি সমস্তই স্বামীর সম্পত্তি জ্ঞানে তাহা আপন অধিকারে স্থাপন করেন। তাহার পর এ পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলাইতে কোন যত্ন করিলেন না, এবং আপোষে ক্ষেত্রবাবুকে ব্রহ্ম-মন্দির ছাড়িয়া দিবার চেষ্টায় ক্ষেত্রবাবু বিফল প্রযত্ন হইয়া সম্প্রতি তিনি ব্রহ্মমন্দির প্রাপ্তির জন্য আলিপুর কোর্টে লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রী ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ক্ষেত্রবাবু আদালত জানিত করিয়া কিম্বা শালীস নিষ্পত্তি ব্যতিত মন্দির গ্রহণ করিতে সাহস করেন না। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এ ঘটনায় দুঃখিত, তাই এখনো আমরা বলি, মোকর্দ্দমায় অনর্থক অর্থব্যয় না করিয়া আপোষে এই বিষয় নিষ্পত্তি হইলে ভাল হইত।

প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা

মাসিক পত্র।

নব্যভারত—আমরা কুশদহর বিনিময়ে প্রায় প্রথম হইতে "নব্যভারত" প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত নব্যভারতের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন নব্যভারতের অষ্টাবিংশ বর্ষ শেষ হইল। এ সুদীর্ঘ কালে বহু চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা সুলেখকগণের লেখায় সত্যই "নব্যভারত" নামের সফলতা লাভ করিয়াছে। উদার ভাবে বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনার পথ প্রদর্শনে দেবী বাবু অগ্রণী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সত্য প্রকাশের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে তাঁহার সুহৃদবর্গের বা সমাজের নিকটেও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবে তাঁহার সমালোচনার মাত্রা কখনো কখনো অধিক হইয়া পড়ে। বিগত পৌষ ও মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অসাধারণত্ব" প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। যাহা হউক নব্যভারতের প্রবন্ধ গৌরব আজোও আধুনিক প্রকাশিত অনেক উচ্চ অঙ্গের মাসিকের তুলনায় অক্ষুণ্ণই আছে। নব্যভারত ২১০।৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ | ২য় সংখ্যা

গান

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে'।
সারা দিনটা করে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(আমার) খেলার সাথী যে যার মত, গিয়েছে চলে।
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউত আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।

৺রজনীকান্ত সেন।

বিবিধ মন্তব্য

জন সংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য—বিগত ১০ বৎসরে পূর্ব্ব বাঙ্গলার জন সংখ্যা শতকরা ১১·৪, কিন্তু পশ্চিম বাংলার মাত্র ৩·৮ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, "পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের সামাজিক নিয়মে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হারও অধিক।" এ কথা সত্য হইলেও আমাদের মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ কার্য্য-

কারিতায় অত্যন্ত উদ্যমশীল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে যেমন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, তেমনি উদ্যমবিহীন, অলস ও বিলাসীর সংখ্যাই অধিক। কত ধনশালী প্রাচীন বংশ এখন অবসন্ন-হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্যমশীলতা জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধক, আর উদ্যমবিহীন জীবন মৃতকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলত মানবের জীবনী-শক্তি যে কেবল বাহিরের অন্ন-জলেই বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, মানসিক শক্তিও জীবনী শক্তির সহায়।

বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। যে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। একত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা কেবল মাত্র ৬ জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও কত কম। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে এই প্রতি-যোগিতার দিনে অশিক্ষিত লোকের দ্বারা সকল কার্য্য সুচারুরূপে কথনই সম্পন্ন হইতে পারে না। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে,—কুসংস্কার দূর করিতে হইলে, শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কুসংস্কার বশত কুচিকিৎসায় শত শত লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয় তাহার প্রতিবিধানার্থেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। সমস্ত সভ্যদেশেই অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা ব্যতীত কথনই সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। তাই দেখা যাইতেছে এ দেশেও এই বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

মিঃ গোখলে ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিল—বিগত ১৬ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল মিঃ গোখলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক বিল উপস্থিত করেন। এই বিলের মর্ম্ম এই যে, মিউনিসিপালিটি কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া স্থান বিশেষে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রচলিত করিতে পারিবেন। ৬ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণের স্কুলে যাইতে হইবে। বালিকাগণের প্রতিও পরে এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। স্থল বিশেষে কমিটী এই আবশ্যকতা হইতেও কাহাকেও নিস্কৃতি দিতে পারিবেন। যে ছাত্রের অভিভাবকের মাসিক আয় ১০৲ টাকার কম তাহাকে বেতন দিতে হইবে না। অন্যের বেতন সম্বন্ধেও কমিটী বিবেচনা

করিতে পারিবেন ইত্যাদি।—তিনি এই বিল পেশ করিয়া বক্তৃতার মধ্যে বলেন,—"আমার রচিত এই বিলের উদ্দেশ্য এই যে, ক্রমে এই দেশে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে।" সমস্ত সভ্য দেশেই গভর্ণমেণ্ট জন সাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা প্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন। লোকের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করা এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে; মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করা,—তাহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" এই বিল সম্বন্ধে আমাদিগের একান্ত সহানুভূতি আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা।—বর্ত্তমান সময়ে কোনো কোনো কাগজ পত্রের লেখায় এবং গ্রন্থের ভাষায় দেখা যায় আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন যেন ঠিক হইতেছে না। আমাদের মতি গতি কেমন এক বিকৃত-ভাবে গড়িয়া যাইতেছে, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। কোনো দোষের উল্লেখ করিতে গেলেই যেন আগে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষই তার মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। আচ্ছা আমরা জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আপনারা (যাঁহারা কথায় কথায় শিক্ষিত শ্রেণীকে "বাবু" বলিয়া উপহাস করেন) বলিতে চান যে, ইংরাজী শিক্ষায় এদেশের অপকারই হইয়াছে? আমাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না? আমাদের যাহা ছিল তাহাই ভাল ছিল? অতএব "হে পাশ্চাত্য শিক্ষা! তুমি আর আমাদের মধ্যে আসিয়ো না, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।" আমরা বলি এখনো আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই আমাদের এই অবস্থা, পূর্ণতা লাভ করিলে আবার আমরা ঠিক আমরাই হইব।—তবে তাহার আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন নাই।—স্ত্রী শিক্ষা বলিলে এখানে বালিকা হইতে মহিলার বিদ্যাশিক্ষাই বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত, বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষার উপায় নাই। যেহেতু বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষায় সম্প্রদায় গত মতভেদ আছে। সরকারি স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা হইতেই পারে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রের জন্য বে-সরকারি স্কুল কলেজেও বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আসল কথা, বালক বালিকার ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান নিজ গৃহে; যদি পরিবারটি ধর্ম্ম পরিবার হয়, পিতা মাতার ধর্ম্মভাব থাকে, তবে তাহাদের পুত্র কন্যাতেও ধর্ম্মভাব সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি

পরিবার ধর্ম্মভাব শূন্য, কেবল সাংসারিকতায় পূর্ণ হয়, তবে 'বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-শূন্য শিক্ষাই যত অনিষ্টের মূল' কেবল একথা বলিলে চলিবে কেন? ফলতঃ স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা এবং সাধারণ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এখন কি স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বালকের পক্ষে যেমন তাহা সম্ভব নহে, বালিকার পক্ষেও ঠিক তাহাই। কিন্তু সহযোগী "বঙ্গবাসী" বলেন, (২রা বৈশাখের "বজেট বিদ্যা" প্রবন্ধে) "গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন কি সে বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থা আছে? কলিকাতায় বেথুন স্কুলে কি সে বিদ্যার ব্যবস্থা দেখিতে পাই? পড়া বিদ্যা না থাকিলেও আমাদের রমণীরা আদর্শে ও উপদেশে ধর্ম্ম শিক্ষার আদর্শ ছিলেন। * * * ভূপেন্দ্রনাথ সহরে বেথুন বিদ্যালয়ের মতন আরও কয়েকটি বিদ্যালয় বসাইতে চাহেন। এই সংকল্পে তিনি সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় একথা তুলিয়াছিলেন। "এক পাগলে রক্ষা নাই তিন পাগলের মেলা"। ভূপেন্দ্রনাথ ইহাকে সমাজ মঙ্গল-প্রদ বলিয়া মনে করিতে পারেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার আনন্দ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের ইহাতেই তো ভয় ও বিস্ময়। অধুনা স্কুল কলেজে পুরুষের কি উচ্চ, কি নিম্ন, কোন শিক্ষায়ই তো ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, রমণীরই বা কোন্ শিক্ষায় সে ব্যবস্থা আছে? এরূপ অবস্থায় বেথুন বিদ্যালয় বৃদ্ধির প্রস্তাবে যদি আমাদের আশঙ্কা হয় তাহা হইলে কি অস্বাভাবিক হইবে?" আমরা বলি না—না অস্বাভাবিক হইবে কেন? স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে যে ভয়ানক অস্বাভাবিক হইবে?

৩

সহযোগী ও টীকাকারের কুরুচি।—মাতৃজাতি, স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান সূচক ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করা, আমরা অত্যন্ত অপরাধের বিষয় মনে করি। কোনো ভদ্রলোকের এরূপ করা উচিত নহে। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, কোনো কোনো সম্পাদক বা লেখক এরূপ কুরুচির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। সহজে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, তবে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে অপরাধ নীরবে সহ্য করাও উচিত নহে। সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রকাশিত "ত্রিশূল" পত্রের ৯ই চৈত্রের "বিরাট মহিলা সভা" প্রবন্ধে ও ২৩শে চৈত্রের ঐরূপ আর এক প্রবন্ধে এবং ৩০শে চৈত্রের সংকলিত সংবাদে

টীকাকারের মন্তব্যের প্রথমেই মহিলাগণের প্রতি যেরূপ বিদ্রুপপূর্ণ ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত টীকাকার যে নিতান্ত তরলমতি ও অসারচিত্ত তাহা বেশ বুঝা যায়। বস্তুত এরূপ লেখা দ্বারা "ত্রিশূল" যে জন সমাজের অনিষ্টই করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা সহযোগীকে সাবধান ও সংযত হইতে অনুরোধ করি, তিনি তাহা শুনিবেন কি? 'ত্রিশূল' পত্র হিন্দু সমাজের নামে পরিচিত, হিন্দু সমাজ কি এতই অপদার্থ হইয়াছেন যে অক্লেশে স্ত্রীজাতির অবমাননা সহ্য করিতেছেন? হা ধিক্!

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ

এ বিশ্ব সংসার প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন-সম্ভূত বস্তু মাত্র। মানবগণ ইহার একতরের আরাধনায় নিমগ্ন। কেহ বা চিৎস্বরূপ পুরুষের আরাধনায় অন্তর্জাগতিক বৃত্তি গুলির প্রকৃষ্টতা সাধন করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শোভাময়ী প্রকৃতির আরাধনায় অন্তর্জগতে উপস্থিত হইতে যত্নবান হন। এবম্বিধ উপাসনায় অন্তর্জাগতিক উপাসকদিগের বহির্বৃত্তি সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। তাহাতে তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত হয়। কারণ প্রকৃত কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞানোন্মেষ অসম্ভব। বাহ্য প্রকৃতির প্রকৃত উপাসনা মানব মণ্ডলীকে অন্তর্জগতে লইয়া গিয়া তাহাদিগের আত্মকলুষ নষ্ট না করিলে অন্তর্জাগতিক চিৎপদার্থের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারা যায় না। কারণ আবিলতাময় হৃদয়ে ভগবানের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। নিরাকারের আকৃতি সাকারেই প্রতিবিম্বিত হয়—নিরাকারের পূর্ণ জ্ঞান সাকারোপাসনা হইতেই উদ্ভূত হয়—সেইজন্যই মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী দেবীর আবাহন, সেই জন্যই কর্ম্মের দ্বারা মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্ব বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের আসনোপযোগী করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ হৃদয়কেও বহির্জাগতিক উপাসনা বা প্রকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া আবিলতাহীন করিতে হয়, তাহা হইলেই অন্তর্জাগতিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে বাহ্যাড়ম্বর নিস্ফল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বহির্জগতের উপাসনা প্রবঞ্চনা মিশ্রিত হইয়াছে। অনেকে অপরিপক্ক হৃদয়কে পরিপক্ক রূপে প্রমাণিত করিতে যাইয়া বহুবিধ স্বভাব-তত্ত্বাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মন তৎসম্বন্ধে যতই অজ্ঞান থাকুক না কেন, তবুও তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। "নীহারমালা বিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি-সংবেষ্টিত-উপত্যকাভূমি-মধ্যস্থ-মৃদু-বীচিবিকম্পিত-সরোবরাদি পরিশোভিনী-কমলিনী বসন্তানীল-সন্তাড়িত হইয়া হেলিতেছে—দুলিতেছে। তুষারমণ্ডিত মহিধর-শীর্ষে নবোদিত-ভাস্করের ভাস্বর কিরণ নিপতিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" এইরূপ শ্রুতিসুখকর অভ্যস্ত ছন্দোবন্ধে অনেকেই পাঠকের মনপ্রাণ হরণ করিয়া নিজকে বহির্জাগতিক উপাসক রূপে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিতে চান। কিন্তু কয়জনের হৃদয় সেই মধু-মাসের মৃদু সমীরণ তুল্য ভাবানিলাঘাতে প্রকম্পিত হয়? কয়জনের হৃদয় পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি ভাস্কর-করতুল্য দীপ্তিশালী মহৎ গুণ সমূহে আলোকিত হয়? সুতরাং উক্তরূপ ভাষা-বিন্যাস তাহাদের বহির্জাগতিক উপাসনার প্রতারণা মাত্র। ফলত বহির্জগতের উপাসনার সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সংযোজিত হইয়া বহিঃপ্রেমেই মত্ত থাকে। ভাব বা ভাষার প্রতি তখন উপাসকের লক্ষ্য থাকে না। তখন তাহার ভাষা ও ভাব নীরবতা মাখান হয়। মন নীরব-প্রেমে মত্ত হইতে থাকে—তাহার কবিত্ব তখন অপরিস্ফুট এবং নীরব হইয়া যায়, অর্থাৎ সুচারু শব্দ বিন্যাসের সময় তখন আর থাকে না। বস্তুত যাহারা আজকাল বহির্জগতের উপাসনার ভান করিয়া থাকেন তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হয় না। তাহারা আত্মকলুষতা এবং বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন মাত্র এবং আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাহাদিগের অন্তরে এক প্রকার অসম্ভব কল্পনা বদ্ধমূল হয়। বহির্জগতের উপাসনায় ভাবের উৎপত্তি স্বাভাবিক, কাহারও বা সেই ভাব স্বার্থের তরঙ্গে ভাসমান হইয়া স্বকীয় জীবন-পথে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আত্মকলুষতার সৃজন করে; আর কাহারো বা সেই ভাব মহাভাবে লীন হইয়া অন্তর্জগতে বা চিন্ময় পুরুষোদ্দেশে ধাবিত হয়। বহির্জাগতিক উপাসনায় এত আত্মকলুষতা, এত প্রবঞ্চনা আছে বলিয়াই উহা আমাদিগকে এতদূর অবনতি-মার্গে স্থাপিত করিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে আধুনিক শিক্ষার সহিত পূর্ব্বতন কালের সেই তন্ময়তা, সেই নিঃস্বার্থপরতা, সেই বিশ্বপ্রেমের অনন্ত আদর্শের প্রয়োজন। বহির্জগতের উপাসনা ব্যতীত ঐ সমস্ত লাভ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শারদীয় সুনির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া যখন কৌমুদী রাশি

বর্ষণ করিতে থাকে, তখন দর্শকের মন ও বাহ্য প্রকৃতির যে কার্য্যারম্ভ হয় তাহাই তন্ময়তা। জড়জগতের সেই শোভা অন্তরেন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। এইরূপে যখন অন্তরেন্দ্রিয় সমূহ পরিমার্জ্জিত হয় তখন তাহা সেই মনোরম শোভাতে চিন্ময়ীশক্তির ও অপূর্ব্ব শিক্ষার মাহাত্ম্য, প্রীতি, ভক্তি ও প্রেম প্রণালীর দ্বারা বহির্গত করিয়া দেয়। তবে উপাসনার তারতম্য হেতু সকলে সেই শোভা, সেই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। একজন হয়ত সেই শারদীয় চাঁদিমার ঢল-ঢল ভাব দেখিয়া এক প্রকার অমানুষিক শিক্ষা এবং স্বর্গীয় প্রীতি ও ঈশ্বরের সেই উজ্জ্বল বিশ্ব-বিকশিত মোহন মূর্ত্তির আস্বাদ গ্রহণ করিল; —আর একজন হয়ত তাহাতে শিক্ষার বা আস্বাদের কোনো উপাদানই খুঁজিয়া পাইল না। কেহবা বিরহাতুর প্রাণে শারদীয় শোভাকে দুঃখময়ী বলিয়া কল্পনা করে; অপর কেহ বা সেই শোভা দেখিয়া স্বকীয় অভিষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হইল ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে,—উপাসনায় তন্ময়তা জন্মিলে শরৎকালীন শশধরের উদয়াস্ত দেখিয়া সুদর্শন নীতিচক্র চালিত অনন্ত বিশ্বের আদি অন্ত উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বস্তুত বহির্জগৎ অন্তর্জগতের পথ প্রদর্শক—বহির্জাগতিক উপাসনায় পূর্ণ জ্ঞান না জন্মিলে অন্তর্জাগতিক চিন্মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।

পক্ষান্তরে অন্তর্জাগতিক উপাসকগণের অনেকেই এমন কি বহির্জগতের সত্ত্বা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন। যদিও বা স্বীকার করেন তবুও বলেন আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিকে, মানসিক ও বাহ্য ভাবে, সূক্ষ্মে ও স্থূলে যত প্রভেদ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে তত প্রভেদ। তাঁহারা আধ্যাত্মিকের উপাসক, মানসিক বৃত্তির উন্নতি সাধন করাই তাঁহাদিগের লক্ষ্য, সূক্ষ্ম বিষয়েই তাঁহাদিগের আলোচ্য। তাঁহারা আধিভূত চাহেন না, বাহ্যভাব চাহেন না, তাঁহারা স্থূল চাহেন না। কিন্তু স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না অর্থাৎ বহির্জগৎ না পাইলে অন্তর্জগৎ পাওয়া যায় না।

বস্তুত বহির্জগৎ আমাদের গুরু, অন্তর্জগৎ আমাদের লক্ষ্য, অন্তর্জগৎ শান্তির শীতল ছায়া, বহির্জগৎ তাহার পথ-প্রদর্শক। অন্তর্জগতে মুক্ত প্রেম, বহির্জগতে প্রেমোন্মেষ। বহির্জগৎ আমাদিগকে অহরহ বুঝাইতেছে প্রকৃত শিক্ষাই আনন্দলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্তর্জগৎ কেবল আনন্দময়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দান

(১)

যখন কনভেণ্টে পড়িতে যাইতাম, সেখানকার সুসংযত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থিত শিক্ষাদান আমার বালিকা-হৃদয়কেও বিস্মিত করিয়াছিল। সেখানকার সেই উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনি-মধ্যে যেন আর একখানি জগৎ, আমাদের বাহিরের ধূলি-রৌদ্র-মলিন ঝঞ্ঝাবাত্যা-পীড়িত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রশান্ত শান্তি ও অচ্ছেদ্য প্রেমের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী যাঁহারা তাঁহারা যেন সে শান্তিরাজ্যের দেবতা। এমন নিঃস্বার্থ, পবিত্র, উৎসর্গিত-জীবন জগতে অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের ঘরেও এসব পুণ্য প্রতিমার আবির্ভাব আছে, কিন্তু তাঁহাদের উদারতা ও উৎসর্গ এমন বিশ্বব্যাপী হইতে সুযোগ ও সাহায্য পায়না তাই তাহা সীমাবদ্ধ।

আমি সেই মোটা 'ভেল্' পরা জপের মালা ও ক্রশ চিহ্ন ধারিণী গম্ভীর-বদনা 'নান'দের পানে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহাদের সর্ব্বত্যাগী অথচ সার্ব্বজনীন্ প্রেম আমার কাছে অনন্ত আকাশের মত রহস্যপূর্ণ ঠেকিত। তাহা আপনার গৌরবে আপনিই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আপনাকে লুকাইবার শত চেষ্টা তাহাকে শতরূপে শতদিক হইতে ব্যক্ত করিয়া তুলে, নিষ্কাম ধর্ম্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বণিক্-জাতির মধ্যে পাওয়া যেন স্বপ্নের মতন অসম্ভব বোধ হইত। ইঁহাদের মতন জগতের কাজে, আর্ত্তের সেবায়, অনাথের পালনে, শিশুর লালনে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতে আমার সমস্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে জোয়ারের জলের মতন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকিত। প্রতিদিন বাড়ি ফিরিবার সময় প্রতি-দিনের চেয়ে বেশি করিয়া শ্রদ্ধানুভব করিতাম।

আমার পিয়ানো শিক্ষয়িত্রী সিস্টার 'গ্রেস্' আমার নিকটে একটি জটিল রহস্যের মতন অবোধ্য ছিলেন। আমাদের তপস্বিনী উমার ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর তরুণ মুখখানি, ও যৌবনের পূর্ণ বিকশিত ঢল-ঢল লাবণ্য যদিও কঠোর তপস্যার উপবাস-ক্লেশে এবং বিশ্রী পরিচ্ছদ ও মাথার পুরু কাপড়ের চৌকা 'ভেলে'র দ্বারা যথেষ্ঠ পরিমাণে শ্রীহীন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল তবুও ভস্মে যেমন আগুনের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না তেমনি সেই পাদচুম্বিত

প্রকাণ্ড মোটা কাপড়ে ঐ দীর্ঘ 'ভেলে' তাঁহার সাধারণ দুর্লভ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যকে কোনমতেই লুকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইত না, তিনি নিজেও বোধ হয় সে কথা ভালরকমই জানিতেন সেই জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম গোলাপী ওষ্ঠ-প্রান্ত মধুর হাস্যচ্ছটায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই গভীর গাম্ভীর্য্য-দ্বারা তিনি তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে চাপিয়া ফেলিতেন; স্বল্পভাষায় যদি কোনদিন একটুখানি অসংযত হইবার উপক্রম করিত অমনি চকিত হইয়া উঠিয়া আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইতেন। এমনকি আমি যখন আমার প্রাত্যাহিক অভিনন্দন তোড়াটি তাঁহার হাতে দিয়া মাথা নীচু করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতাম 'সুপ্রভাত' জানাইবার সময় তাঁহার কণ্ঠে এমনি একটি মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিত,—তাঁহার কোমল হাতখানির স্পর্শ এমনি একটি অপ্রকাশ্য স্নেহে আমার অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত যে, আমি তাঁহার পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি না তুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি সেই সময় তাঁহার নীলকান্ত মণির মতন দুটি চোখ আমার চোখের প্রতিচ্ছায়ায় ঈষৎ কৃষ্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিত তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত সস্নেহে বলিতেন "আজ তুমি খুব সকাল সকাল এসেছ" আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম হৃদয়ের কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা কাহারো সম্মুখে প্রকাশ না করিয়া ফেলা তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা, যেন এখান হইতে তিনি নিজে এতটুকু কিছু লইতে চাহেন না অথচ নিজের সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা—সর্ব্বদাই যেন ব্যর্থ হইত। কোমলতা ও করুণা তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্যের ছায়াযুক্ত প্রশান্ত মুখে, কোমল কণ্ঠস্বরে ও ধীরশান্ত পদবিক্ষেপে ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার সঙ্গীতময় কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিও যেমন লাগিত তাঁহার স্নেহপূর্ণ "মাই চাইল্ড" "মাই গুড ডটার"ও তেমনি মিষ্ট লাগিত। একদিন আর থাকিতে পারিলামনা। অনিবার্য্য কৌতূহলে হঠাৎ আমার সঙ্গীত শিক্ষার অবকাশে বলিয়া ফেলিলাম "আপনার মত হইতে আমার বড় সাধ হয়" —সে ঘরে তখন কেহ উপস্থিত ছিল না, বোর্ডিংএর মেয়েরা ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল, আমি আর একটা নূতন গৎ শিখিবার জন্য তখনো ছুটি পাই নাই। তিনি যখন পিয়ানোর উপর আবার তাঁহার শুভ্র অঙ্গুলিগুলি স্পর্শ করিয়াছেন এমন সময় হঠাৎ আমি এই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু বলিয়াই বোধ হইল কথাটা বলা হয়তো উচিত হয় নাই

কেননা দেখিলাম এই কথা শুনিয়াই তিনি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। এত খানি চমকাইলেন যে, তাহা স্পষ্টই আমার সুগোচর হইল। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বাধা-প্রাপ্তের ন্যায় থমকিয়া থামিয়া গেলাম, লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম "আমায় ক্ষমা করুন এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা বোধ হয় আমার অন্যায় হইয়াছে।"

সিস্‌টার গ্রেস্ মুখ তুলিয়া সস্নেহে কহিলেন "উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চ হওয়াই উচিত মাই গার্ল্, সে জন্য তুমি লজ্জিত হইয়ো না।" আমি দেখিলাম তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ও স্বর কম্পিত হইতেছে, ভারি কষ্ট বোধ হইল, কিসে আমি তাঁহাকে আঘাত করিয়াছি বুঝিতে না পারিয়া আরো ব্যথিত হইলাম। আত্মসম্বরণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমাদের মধ্যকার ব্যবধান-সম্বন্ধ সব ভুলিয়া গিয়া সুগভীর বেদনার একমাত্র সহানুভূতিতে বিগলিতচিত্তা সখীর ন্যায় সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম "আমি কি আপনাকে না জানিয়া আজ বেদনা দিলাম ?"

তিনি এবার আমার পানে তাঁহার সেই নীলপদ্মের মতন চোখদুটি ফিরাইলেন, ঈষৎ ক্ষীণহাসি মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে কহিলেন, "না তুমি আমায় আঘাত দাও নাই তোমার কথায় আমার একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়াছিল মাত্র, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার উপলক্ষ হওয়াতে তুমি নিজেকে অপরাধিনী মনে করিয়াছ, আমি এ জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার বালিকা-হৃদয় আজ যে সংসার-বহির্ভূত ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট বোধ করিতেছে, তোমার মতন বয়সে একদিন আমিও সেই প্রকার আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তারপর সে আকর্ষণ কাটাইয়া সংসার যখন শত প্রলোভনের জাল পাতিয়া আমায় তাহার লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় আমার শুভ অবসরের বরেণ্য দেবতা আমায় সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শান্তিময় অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া আমি আমার প্রতি তাঁহার অসীম দয়ানুভব করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর এত দয়া কোনো ব্যক্তিকে এত সহজে করেন না। সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইলেও এখানে তাঁহার করুণা যেন পক্ষপাতপূর্ণ মনে হইতেছে।"

আমি এক সঙ্গে এতগুলা কথা তাঁহার মুখ হইতে আর কখনো শুনিনাই;

বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তাহা দেখিলেন, তাঁহার সেই স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গাম্ভীর্য্যের হাসি একটু হাসিয়া আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে কহিলেন "আমি স্বতন্ত্র করিয়া আর কাহাকেও কখনো ভালোবাসিবনা বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দাও নাই, তোমার আগ্রহ আমার দৃঢ় চেষ্টাকে আজকাল সর্ব্বদাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, আজ আমি তোমায় আমার গল্প শুনাইব ভাবিতেছি; শুনিয়া তুমিই বুঝিয়া দেখো আমার এই কঠোর নিয়মপূর্ণ জীবনের মাঝখানে তুমি বিদেশী বালিকা—তোমার অধিকার বিস্তৃত করা আমার পক্ষে কতখানি হানিকর। আমরা রোম্যান ক্যাথলিক, নিয়মভঙ্গের দণ্ড আমাদের অত্যন্ত কঠিনরূপে গ্রহণ করিতে হয়; আমি মনে মনেও যদি নিজের কাছে অবিশ্বাসী হই আর কেহ না জানিলেও সে পাপ, সর্ব্বান্তর্য্যামীর দিব্যদৃষ্টিতে লুকানো থাকিবে না আমার নিজের কাছেও তো তাহা অবিদিত থাকিবে না। আজ আমি তোমায় আমার প্রথম জীবনের সঙ্গিনীর মতই অকপটে সকল কথা বলিতেছি শুন, কিন্তু তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, "কাল হইতে তুমি আর আমার কাছে আসিয়ো না আমি; যাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছি তাঁহার নিকটে অপরাধিনী হইব।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া শুদ্ধ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বীকার করিতে সাহস হইল না। কুমারী গ্রেস্ তখন আমার খুব কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। (ক্রমশ)।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কুশদহ বৃত্তান্ত (১২)

গোবরডাঙ্গা গ্রামের চাটুজ্যেপাড়ার উত্তরাংশে আজো একটি বাড়ি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কোনো বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবার এই বাড়ির অধিবাসী ছিলেন এবং এই বাড়িতে বিস্তর ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। ফলত এই বাড়ি "ভরত চাটুজ্যের বাড়ি" বলিয়া খ্যাত। দুঃখের বিষয় এখন এই বাড়ি প্রায় জনশূন্য। দেওয়ানজী মহাশয়দিগের জ্ঞাতি স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার সারদাপ্রসন্ন বাবুর চিরকালিয়া, মধুদিয়ায় বহুদিবস আমিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ মহাত্মা রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের

মৃত্যু-দিনে তাঁহার পত্নী গৌরমণি দেবী সংমৃতা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু-কালে তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে অলঙ্কারাদি যাহা ছিল বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি পান্তাভাত ও ভাজা মাছ খাইয়া, চেলির কাপড় পরিয়া যখন তাঁহার স্বামীর অনুগমন করেন, তখন নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু নর নারী যমুনার ঘাটে আসিয়া তাঁহাদের দাহন দেখিয়াছিলেন।

ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা চারি সহোদর ছিলেন। প্রথম ৺রামপ্রাণ, দ্বিতীয় ৺রামকানাই, তৃতীয় ৺ভরতচন্দ্র ও চতুর্থ ৺ঈশ্বরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠের একমাত্র বিধবা কন্যা ছিলেন, মধ্যমের একপুত্র ও এক কন্যা ছিলেন, তৃতীয়ের একপুত্র ও দুই কন্যা, এবং কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র—উমেশচন্দ্র ও পতিরাম, তাঁহারাও গত হইয়াছেন। এখন একমাত্র বিধবা কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর প্রথমা কন্যা যখন তিনবৎসরে তখন ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রানুসারে মহাসমারোহে তিন মাস পাঠ ও কথকতা দিয়াছিলেন।

পরলোকগত

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সম্ভবত এই সময়ে রাখালচন্দ্রের আত্মীয়গণের এবং প্রধানত পুণ্যবৌয়ের যত্নে পুঁড়া গ্রামে স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এক সুন্দরী কন্যার সহিত রাখালচন্দ্রের বিবাহ হয়।

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ডিরির আড়তে চাকুরী করিয়া ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন তখন হঠাৎ একদিন তিনি শঙ্কট পীড়াক্রান্ত হইলেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, অজ্ঞান অবস্থায় মধ্যে মধ্যে রক্তবমণ হইতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া পুণ্যবৌ পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন, এদিকে মুক্তহস্ত কর্ম্মবীর দুর্গাচরণ, বড় ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার কিছুমাত্র ত্রুটী করিলেন না। ঈশ্বর-কৃপায় রাখালচন্দ্র সে যাত্রা মুক্তিলাভ করিলেন। পরে জানা গেল এই সঙ্কট পীড়া "কার্ত্তিক পূজা" কিম্বা "সরস্বতী পূজার" রাত্রির পরেই হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব কুঅভ্যাস তখনো তাঁহাকে পরিত্যাগ না করাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক এই হইতে যে তিনি বিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

তৎপরে রাখালচন্দ্র, দত্ত ফার্‌মের চাকুরী ছাড়িয়া দীননাথ রক্ষিত ও গোপালচন্দ্র পালের দোকানে চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে যখন উভয় অংশীদার পৃথক্ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন, তখন তিনি গোপালচন্দ্র পালের দোকানে অংশীদার হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর কার্য্য করিয়া পরস্পরের স্বার্থে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রয় কুণ্ডু পরিবারের গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে চিনির দোকান করিতে সচেষ্ট দেখিয়া, খাঁটুরা নিবাসী রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় একযোগে দোকান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে রাখালচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বসূত্রে যোগীন্দ্র নাথের বিশেষ সদ্ভাব থাকায় উভয়ের বৈষয়িক জীবনের পরামর্শ হইত। ক্রমে ঘটনা এমন অনুকূল হইয়া আসিল যে, যোগীন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও তাঁহার এক সঙ্গী মহেন্দ্রনাথ দেকে লইয়া রামকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে একযোগে অংশীদারী ফার্‌ম খুলিবার কথাবার্ত্তা ২।৩ দিনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল। ১২৮৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে "রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোং" নামে ঘৃত, চিনির দোকান খোলা হইল। ক্রমে এই ফার্‌মের অতি আশ্চর্য্য জনক উন্নতি হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসর এইভাবে কার্য্য করিয়া যোগীন্দ্রনাথ মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হওয়ায় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঐ ফার্‌মের একমাত্র অংশীদার হইয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সেই হইতে তাঁহার ধন সম্পত্তি হইতে লাগিল তাহাতে গোবরডাঙ্গায় বাড়ি নির্ম্মাণ ও কলিকাতায় একখানি বাড়ি খরিদ করিলেন। তিনি যে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে অনেকটা মান সম্ভ্রম লাভেও সক্ষম হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন সংসার-ধর্ম্মে প্রবেশ করেন, তখন কোন কোন কারণে পুণ্যবৌএর প্রভাব তাঁহার স্ত্রীর নিকট তেমন কার্য্যকরী হয় নাই। পুণ্যবৌ কিছু ধর্ম্মানুরাগিনী ছিলেন। "হরিবোলা" "কর্ত্তাভজা" দলের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কোন কোন পরিবারের স্ত্রী-সমাজে "গুরুগিরি" করিয়া বেড়াইতেন। যাহা হউক রাখালচন্দ্র পুণ্যবৌএর জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসহারা দিতে ত্রুটী করেন নাই।

রাখালচন্দ্রের সেই কঠিন পীড়ার পর হইতে এক প্রকার দুরারোগ্য শিরঃপীড়া জন্মিয়াছিল। এজন্য তিনি সময় সময় অতিশয় কাতর হইয়া

পড়িতেন। রামকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পরেও তিনি ফার্মের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন অন্যান্য রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন তখন পুরী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহাতেও শরীর তেমন ভাল হইল না। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলচন্দ্র অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। সম্ভবত এই শোকে তাঁহার যেটুকু শক্তি সামর্থ্য ছিল, তাহাও চলিয়া গেল। তাই "ধনে সুখ নাই, জনে সুখ নাই মান সম্ভ্রমেও হৃদয় বেদনা দূর হয় না" এই সকল মহাবাক্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।"

রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ ছিলেন। প্রধানত তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বেশ প্রখর ছিল। বোধ হয় তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে একজন উচ্চ শ্রেণীর যশস্বী ব্যক্তি হইতে পারিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবও ছিল, সময় সময় তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু বিষয়াবর্ত্তে পড়িয়া তদ্বিষয়ে উন্নতিরপথ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি কি রূপ সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিধাতার কৃপায় ইহজীবনে এতটা উন্নত হইয়াছিলেন, তাহাই ভাবিবার, বুঝিবার বিষয়। অনুমান ত্রিষষ্টি বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি যে ধন সম্পত্তি এবং সন্তানবর্গ রাখিয়া গেলেন তাঁহারা তাহা রক্ষা করিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করুন ইহাই আমাদের কামনা।

স্থানীয় সংবাদ

শোক সংবাদ—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার ক্ষিরোদা বাবুর সহিত পূর্ব্ব হইতে আমাদের পরিচয় ছিল না। ঐ বংশাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার সদ্‌গুণে অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সহসা বিগত ৬ই বৈশাখ তারিখে আশুবাবুর এক পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আহা! ক্ষিরোদা বাবুর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র আশু বাবুর স্বাস্থ্য ভাল না, ছোটটির এখনো পাঠ্যাবস্থা। আশু বাবু লিখিয়াছেন "দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় ডয়েবিটীশ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ২৮শে পৌষ তারিখে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। * * * আমরা আগামী পরশু বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া যাইব।" অনাথনাথের বিধানের উপর আমাদের বলিবার কি আছে?

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রচার কার্য্য—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির সংক্রান্ত যে মোকর্দ্দমা হইতেছে তাহা আমরা গতবারে বলিয়াছি। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন দত্তের অধিকার হইতে মন্দির লক্ষ্মণ বাবুর স্ত্রীর হাতে আসা পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য চালাইবার কোনো চেষ্টা আমরা দেখি নাই। কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া মন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহাদের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা কি জানেন না যে, এ পর্য্যন্ত এ মন্দিরে কাহার দ্বারা কার্য্য চলিয়াছে? এবং উপস্থিত মোকর্দ্দমাই বা কেন হইতেছে? বোধ হয় এ সকল কথার আদৌ বিচার না করিয়া একপক্ষের কথায় তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপে কার্য্য করা তাঁহাদের উচিত হয় নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

সুপ্রভাত (চৈত্র ১৩১৭) শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, সরস্বতী সম্পাদিত; ৬নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২।৵০ মাত্র।

প্রবন্ধ-গৌরবে বাংলা মাসিক পত্রের মধ্যে "সুপ্রভাত" শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যার প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাজের নূতন আদর্শ" একটি সময়োপযোগী সুচিন্তিত প্রবন্ধ; বর্ত্তমান সময়ে সমাজের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, লেখক তাহা বেশ মুন্সিয়ানার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের "খাদ্য বিচার ও খাদ্য পাক" সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকারের "গৌড় ভ্রমণ" বহু তথ্য-পূর্ণ। "কো—কো—কি" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিত 'ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে'র অনুবাদ ক্রমশ প্রকাশ্য, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "কর্ত্তব্য ও প্রেম" শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিত একটি চমৎকার উপভোগ্য গল্প। "বঙ্গ সমাজে মহিলার কাজ" শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র লিখিত একটি অতি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ, লেখিকা এই প্রবন্ধদ্বারা এদেশের মহিলাগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, প্রত্যেক মহিলারই ইহা পাঠ করা উচিত। "শঙ্খ" শ্রীযুক্ত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখিত চমৎকার হৃদয়গ্রাহী কবিতা। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত

"ইউলালিয়া" নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, এমন সুন্দর সুলিখিত প্রবন্ধ সচরাচর বাংলা মাসিকে দেখা যায় না। একটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ লেখক অতিশয় দক্ষতার সহিত সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ভ্রমণে' কাণপুর সম্বন্ধে বহুবিধ ঐতিহাসিক তথ্য বেশ নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অনেক গুলি চিত্র এই প্রবন্ধটির মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এক সংখ্যায় তিনটি ভ্রমণ কাহিনীর সমাবেশ কি কাগজের গৌরব বর্দ্ধক? —না দৈন্য প্রকাশক? "মহারাষ্ট্র গৌরবের একটি চিত্র" উল্লেখযোগ্য রচনা।

দেবালয়—(বৈশাখ, ১৩১৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, ও বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ২১০.৩.২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখিত একটি চমৎকার প্রসাদগুণ বিশিষ্ট কবিতা "চারিকন্যা" কবি তাঁহার এক কবি-বন্ধুর চারিটি কন্যা দেখিয়া এই মনোহর কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক ছত্রেই ভক্ত কবির প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয়। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম্মযোগ এই সংখ্যায় শেষ হইল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "বিশ্বজনীন প্রেম" একটি সুন্দর গবেষণাত্মক প্রবন্ধ, ইহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। "চক্রধরপুর" শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইহার শেষাংশ পড়িবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর "হিন্দু ও গ্রীক" একটা ব্যর্থ রচনা, এরূপ অসার আবর্জ্জনা দ্বারা 'দেবালয়ের সাতটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিবার কারণ কি, বুঝিলাম না। সম্পাদক যুগল কি চোক বুজিয়াই ইহা ছাপিয়াছেন? শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "বিশ্বদেবালয়" সূচক মত "কবিতা", কিন্তু কেবল কথা গাঁথিলেই যে কবিতা হয় না, সেই বুদ্ধিটুকু এই সকল স্বয়ং সিদ্ধ কবিযশপ্রার্থীর ঘটে কে দিবে? কবিতা লেখা ছেলে খেলা নহে।—এরূপ লেখা ছাপিয়া বাংলা সাহিত্যে আবর্জ্জনা বাড়ানো কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আশা করি সম্পাদকদ্বয় এখন হইতে সতর্ক হইবেন।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ আষাঢ়, ১৩১৮ ৩য় সংখ্যা

গান

—*—

বাগেশ্রী—তেওরা

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী।
প্রথম প্রভাতে নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম তোমারে সঁপিব স্বামী।
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
মনে ভেবে রাখি সদা,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যা বেলায় বসিব তোমারি সনে;—
দিন অবসানে ব'সে ভাবি ঘরে
তোমার নিশীথ বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি।

আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর চক্ষু আছে, কিন্তু তাহা তখনো প্রস্ফুটিত হয় নাই, দৃষ্টি-শক্তি লাভ হয় নাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, ক্রমে দৃষ্টি-শক্তি উজ্জ্বল হয়, শিশু ক্রমে বস্তু-জ্ঞান লাভ করে, বাহ্য-জগতের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইতে থাকে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আস্বাদন, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-যোগে মানুষের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। মানুষের আত্মারও চক্ষু আছে, দৃষ্টি-শক্তি আছে। যে পর্য্যন্ত সে দৃষ্টি না প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ আধ্যাত্মিক জগৎ অন্ধকারাবৃত থাকে। যাহার দৈহিক চক্ষু ফোটে নাই, বাহিরের জগৎ তাহার নিকট তিমিরাচ্ছন্ন, তাহার নিকট এই শোভন সুন্দর বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কথা বর্ণন কর, সে তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারে না। অগণ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশের কথা তাহার নিকট বর্ণন কর, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের বিচিত্র দৃশ্যের কথা বর্ণন কর, জল স্থলের কত অসংখ্য সুদৃশ্য বস্তুর বিষয় বল, সে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম কি বুঝিবে? আধ্যাত্মিক চক্ষু না ফুটিলে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যও দেখিতে পাওয়া যায় না।

চর্ম্ম-চক্ষুর স্রষ্টা মানুষ নহে, কিন্তু যিনি দেহ রচনা করিয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা দেহের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই রচনা করিয়াছেন। আত্মার চক্ষুও মানুষ রচনা করে না, কিন্তু পরম স্রষ্টা পরমেশ্বরই আত্মার দিব্যচক্ষু রচনা করিয়াছেন। চর্ম্ম-চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার না করিলে—দিবানিশি অন্ধকারে বাস করিলে অথবা অত্যুজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আত্মার চক্ষুরও উপযুক্ত ব্যবহার আছে। অবিশ্বাসের অন্ধকারে সে চক্ষুকে ক্রমাগত ঢাকিয়া রাখিলে উহা দৃষ্টিহীন হইয়া যায়। আর বিশ্বাসের আলোকে তাকাইলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরের উপর যত বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিবে, তত তাঁহার পরিচয় পাইতে থাকিবে। যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই, অধ্যাত্মরাজ্য তাহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই লোকের দিব্যচক্ষু ফুটিলে ক্রমে অধ্যাত্মলোকের শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে থাকে। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আধার পরম দেবতা সে লোকের প্রাণ, সে লোকের ভূমি, আকাশ, জীবন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যখন আমার দিব্যচক্ষু লাভ হয়, তিনি আমার জ্ঞান-গোচর হন; সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষের

পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাঁহার স্পর্শে মৃতপ্রাণে নবজীবন লাভ করি। তিনি জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কত শাসিত হই, কত আশ্বাস লাভ করি। তাঁর অনন্ত স্বরূপের পরিচয় পাইয়া আমিত্বের বিকারশূন্য হই, অনন্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকি। আর অল্পে তুষ্ট, ক্ষুদ্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না। প্রেমময়ের পরিচয় পাইয়া তাঁর প্রেমে না মজিয়া কে থাকিতে পারে? সে প্রেম তো সামান্য নয়, অনন্ত অগাধ প্রেম, সে প্রেম মানুষকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বহির্বিষয়ের জ্ঞানলাভে চক্ষু একটি পরম সহায়, চক্ষু-যোগে যাহা দর্শন করিয়া থাকি, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খুলিয়া গেলে আবার এই দৃশ্য জগতের কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। যে আকাশ সাধারণ দৃষ্টিতে শূন্য দেখায়, বিজ্ঞান-চক্ষু সেই আকাশ বায়ুপূর্ণ দর্শন করে। সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ যে সূর্য্যকে থালার ন্যায় দর্শন করে, বিজ্ঞান-চক্ষু সেই সূর্য্যকে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ-লক্ষগুণ বৃহত্তর দেখিতে পায়। সাধারণ দৃষ্টি পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যাদির কোনো ঘনিষ্ট সম্বন্ধ লক্ষ্য করে না, বিজ্ঞান-দৃষ্টি দেখে এই পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রাদি এক অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ট যোগে আবদ্ধ রহিয়াছে। মানুষের আত্মারও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি আছে, দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে যখন ভক্তির চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন তাঁহার সেই বিচিত্ররূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি সত্যরূপে সমুদয় বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র কুশল—কল্যাণ বিধান করিতেছেন। আমার দেহের মালিক আমি নই, কিন্তু সেই লীলাময় পরমেশ্বর দেহ-গৃহে লীলা করিতেছেন। আমার যে ঘর শূন্য ভাবিতেছিলাম, সেই ঘরে জগতের জননী মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। যে সংসারের ভার আমি মাথায় বহন করিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি, সেই সংসারের ভার পরম মাতা স্বয়ং বহন করিতেছেন। যে মানুষকে পর ও শত্রু ভাবিয়াছি, সে মানুষ আমারই পিতার সন্তান। যে মনুষ্য জাতিকে বিভক্ত, পরস্পর সম্বন্ধ—বিবর্জ্জিত মনে করিয়াছি, তাহারা সকলেই সেই এক পিতার স্নেহের সন্তান, এক মাতার কোলে প্রতি-পালিত, সকলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যে পরলোককে শূন্য মনে করিতাম, এখন দেখি সেই পরলোক আমার গম্য স্থান, অনন্তকালের বাসস্থান। পরম মাতার স্নেহ-ক্রোড়েই সে লোক স্থাপিত। আত্মার দিব্যচক্ষু—ভক্তির চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ভক্তবৎসলের পরিচয় পাইয়া পরম কৃতার্থতা লাভ হয়। (ধঃ তঃ)

দান

—ঃ—

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট বেলায় যে কনভেণ্ট স্কুলে পড়িতাম সেখানকার স্বল্পভাষিণী নিয়মচারিণী স্নেহশীলা সন্ন্যাসিনীদের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহাদের উপবাস-কৃশ অঙ্গের পবিত্র জ্যোতি ও একটি সাধারণ-দুর্লভ মহিমাময় ভাব আমার বালিকা-হৃদয়কে বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলিত। মনে হইত ইঁহারা যেন পৃথিবীর নয়, অন্য কোনো জগতের বার্ত্তা প্রচার করিতে কোন্ সেই অজানা দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন! যখন খুব ছোট ছিলাম অনেকবার আমাদের শিক্ষয়িত্রীর জানু ধরিয়া তাঁহার ক্রশ ও মালা ধরিয়া টানাটানি করিয়াছি; আমার 'সিল্ক-ফ্রক' দূরে নিক্ষেপ করিয়া বায়না ধরিতাম "তোমাদের মতন পোষাক আমায় করে' দাও"। 'মাদার অগষ্টাইন' কেবল স্নেহের হাসি হাসিতেন ও সস্নেহে বলিতেন "এই বালিকা একটি এঞ্জেল;" তারপর যত বড় হইতে লাগিলাম ক্রমেই আমার এ পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, একদিন ছুটির সময় বাড়ি আসিয়া মাসী-মাকে বলিলাম "আমি 'নানে'দের কাছে দীক্ষিত হবো"; মাসীমা শিহরিয়া জিহ্বা দংশন করিলেন, ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—"খবরদার অমন কথা মনেও করিয়োনা", আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন ?' তখন মাসীমা অনেক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জিনিষটাকে এমন জটিল করিয়া তুলিলেন যে, আমি সবটা না বুঝিলেও মনে হইল যেন সমস্তই বুঝিয়াছি। আমার যেন কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব এবং উহা করিতে গেলে কি যেন একটা ভয়ানক অধর্ম্ম এবং অত্যাচার করা হইবে!—আমার কল্পনা ফুরাইল।

আর একটু বড় হইলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল। আমি মাসীমার সুবিশাল সম্পত্তির 'এয়ারেস' তজ্জন্যই বড় লোকের মেয়ে না হইলেও আমি অপর্য্যাপ্ত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে শৈশব হইতেই লালিতা কিন্তু মাসীমার 'এয়ারেস' হইলেই তো যথেষ্ট হইল না; মেসো মহাশয়েরও একজন 'এয়ার' ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার মাসীমা যখন আমাকে তাঁহার অর্দ্ধ-দরিদ্র ভগ্নী-গৃহ হইতে নিজের ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাসাদ-গৃহে আনাইলেন তখন নাকি মেসো মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু মতান্তর হইয়া পরে তাহা গভীর মনান্তরে

দাঁড়াইয়াছিল, বৃদ্ধ মেসো মহাশয় তাঁহার পত্নীর ক্ষুদ্র আত্মীয়াটিকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণীরূপে গ্রহণ করিতে একান্তই অসম্মত হইলেন। তাঁহার ভাইপো 'গেব্রিয়েল'কে তিনি নাকি বরাবরই একটু বেশি করিয়া স্নেহ করিতেন তাহাতেই সকলকার—এমনকি তাঁহার নিজেরও বরাবর বিশ্বাস ছিল সে-ই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে।

এমন সময়ে আমি একটি সুকুমারকান্তি বালিকার মূর্ত্তিতে সেই সার্ব্বজনীন্ ভরসাকে হঠাৎ সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া সেই শিশু-পদ-চিহ্নহীন 'গ্রেভেল' পথে অকুণ্ঠিত-সাহসে দ্বিধাশূন্য হইয়া চিন্তামগ্ন নতদৃষ্টি বৃদ্ধের নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিলাম "মেসো মশাই!" মেসো মহাশয় চকিত ভাবে উঠিয়া সোৎসুক-দৃষ্টে আমার মুখের পানে চাহিলেন, আমার বেশ মনে পড়ে, তাঁহার বিরক্তি-কুঞ্চিত ললাট মুহূর্ত্তে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি নত হইয়া আমার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সস্নেহ-চুম্বন অঙ্কিত করিয়া নিজের শীর্ণ-হাতে আমার হাত লইয়া মাসীমার কাছে গেলেন। তারপর কি হইয়াছিল তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম—সেই দিনই নাকি তাঁহার দৃঢ়-আপত্তি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। মাসীমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমার সপক্ষে এমন একটি উইল করিয়াছিলেন, যাহার ফল সকল সময় শুভ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। বরং আমাদের সমাজে একটু অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আরো শুনিয়াছিলাম মাসীমা প্রথমে ইহাতে অনেক আপত্তি করিয়া শেষে দ্বিতীয় উপায় না দেখায় অগত্যা এই নিয়মেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সে নিয়মটি কি, তাহা জানিতে তোমার হয় তো কৌতূহল জন্মিতেছে। সে সর্ত্ত হইতেছে এই যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে দুইজন উত্তরাধিকারী মনোনীত হইল, কিন্তু ইহারা যদি পরস্পরকে বিবাহ করিয়া সম্মিলিত হয় তবেই তাঁহার ষ্টেটের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে নতুবা যাহার দ্বারা এই নিয়ম ভঙ্গ হইবে সে ইহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, এবং অপর ব্যক্তি একাকী এই বিপুল সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার পাইবে। যাঁহারা তাঁহার 'ট্রষ্টী' হইলেন তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস এতটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। সেদিন মাসীমা আমাকে সেই কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম অতকথা বুঝিলাম না, বুঝিলাম না যে, যে সংসার ত্যাগ করিতেই চাহে, সে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবে? তাহার

একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্তওতো থাকার প্রয়োজন নাই। তখন শুধু বুঝিলাম আমি এক জনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়া আছি, আমার সেই দূরস্থ চন্দ্রমাকে সুধা-পিপাসু চকোর পাখীর মতন উর্দ্ধে চাহিয়া প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আমার আর অন্য পথ নাই। সেদিন প্রথম মনে হইল তিনি কে?

পূর্ব্বেও এ উইলের খবর আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, একথা লইয়া আমার দাসীরা আমাকে অনেক উপদেশ দিত, এমন কি মাসীমাও অনেকবার আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন আমি কোনো সময় এ প্রধান কথাটা ভুলিয়া না যাই। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্বেও এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি আমার জীবনের প্রধান ভাবনা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। আজ হঠাৎ তাহা স্মরণ হইল। আমাদের বসিবার ঘরে ছোট টিপয়ের উপর মেসো মহাশয়ের যে মরকো-মণ্ডিত 'অ্যালবাম' খানা পড়িয়া থাকিত, বহুবার দৃষ্ট হইলেও সেদিন চুপিচুপি এক সময় সে খানা খুলিয়া ফেলিলাম এবং মোটা মোটা পাতাগুলা উল্টাইতে উল্টাইতে যেখানে মিঃ ব্রাউনের ছবি ছিল সেইখানটা বাহির করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু যেন কেমন সঙ্কোচ ও লজ্জা-নুভব করিলাম। ছবিখানা যে জড় পদার্থ মাত্র এক মুহূর্ত্ত তাহা মনে পড়িল না এবং চঞ্চল ও মিশুকে বলিয়া যে নাম অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহা সেই চিত্রিত কিশোরের প্রতিভা-ব্যঞ্জক মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তেই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সে কী নূতন ভাব! আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না, সেই বহুবার-দৃষ্ট ফটোগ্রাফ সেদিন আমার নববিকশিত-হৃদয়ে কী আশা কী আনন্দ, কী যৌবন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। মুগ্ধা আমি, পুলক-কম্পিত-বক্ষে সেই আমারই—একান্ত আমারই জন্য যিনি কোনো অচেনা দেশের অজানা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতিকৃতি খানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম। সে চুম্বন জড়ে চেতনে—সে গভীরতা-ভরা প্রথম চুম্বন অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই! তাহা কোন পবিত্র পুষ্পাঘ্রাণের মত আমার কৌমার-অধরকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল!—অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি হর্ষ, একটি বিস্ময়, একটু খানি লজ্জা, আমার বুকের মধ্যে আলো-ড়িত হইত! আমি মুগ্ধ-চিত্তে ভাবিতাম ইহা হয় তো প্রেম, হয় তো 'আভানূহো'র প্রতি 'রোয়েনা'র এবং 'রোমিও'র প্রতি 'জুলিয়েটে'র যে রকম একটা সুমধুর গভীর উচ্ছ্বাস ছিল, এ সেই।

তারপর অল্পে অল্পে উচ্ছাস চলিয়া গেল, স্বপ্ন ফুরাইলে স্মৃতি যেমন জাগিয়া থাকে তেমনি একটি আভাষ রহিল মাত্র! পরীক্ষা আসিয়া পড়ায় মন তাহার কাল্পনিক স্বপ্ন ভুলিয়া গিয়া বাস্তবের পানে ছুটিয়া আসিল। (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

কে আমার

মানুষ এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক জনকে আপনার করিতে চায়। শিশু মাকে সম্পূর্ণরূপে চায়, তার মা কেবল তাহারই হয়। কিন্তু তাহা হয় না; কিছুদিন পরে তাহার আর এক ভাই কিম্বা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার সে আকাঙ্খায় বাধা প্রদান করিল। শিশু দেখিল তাহার মা সম্পূর্ণ তাহার হইল না। পিতা চান, আমার পুত্র সম্পূর্ণরূপে আমারই হইবে। বিদ্যা-সম্পদে পুত্র যদি সম্পন্ন হন, "আমার পুত্র" বলিয়া পিতা আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু পুত্রও পিতার সম্পূর্ণরূপে হয় না। স্বামী, স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধু কেহই সম্পূর্ণরূপে আপনার হয় না,—কেবল কি সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যেই এইরূপ হয়? যীশু চাহিলেন তাঁহার দেশ জেরুজেলামকে আপনার করিতে,—জেরুযেলামকে বুকের ভিতর লইতে; জেরুযেলাম! জেরুযেলাম! বলিয়া কত কাঁদিলেন, কিন্তু জেরুযেলাম তাঁহাকে আঘাত করিল. ক্রুশের উপর তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিল,—শুধুকি তাই?—তাঁহার পিটার প্রভৃতি প্রিয় শিষ্যগণ কি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইল? সেই গেথ্‌সিনামের উদ্যানে শেষ রজনী, তাহারা দুই ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। এমন স্নেহময়ী মা, যিনি নিমাইকে আপনার করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা পারিলেন না। পতিপ্রাণা গুণময়ী ভার্য্যা, তিনিও তাহা পারিলেন না। এই যে আপনার দেহ তাহাও আপনার হয় না, এমন কি পৃথিবীর একটি ধূলি-কণাকেও আপনার করা যায় না।

এই দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন;—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়তঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিহং ভ্রাতঃ।"

অর্থাৎ "কেই বা তোমার স্ত্রী, কেই বা তোমার পুত্র, এ সংসার অতি বিচিত্র স্থান; তুমিই বা কার এবং তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? অতএব হে ভ্রাতঃ! আত্মতত্ব জানিতে চেষ্টা কর।"

এ পথে কেহ আপনার হয় না, তখন পথ ফিরিয়া গেল। বহির্জগৎ ছাড়িয়া আগে আপনার ভিতরে আসিতে হইল। সেখানে আসিয়া দেখিলাম আমার এই জীবন কাহার দান? কে ভালবাসিয়া আমার এই জীবনকে সৃজন করিয়া পাঠাইয়াছেন। কে আমাকে এই প্রকৃতি, আকাশ, আলোক, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি পরিশোভিত সমস্ত বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য বিনামূল্যে দান করিয়াছেন? আমি কার? সম্পূর্ণরূপে কে আমার? আমাকে সম্পূর্ণ নিজের করিবার জন্য নিয়ত কার চেষ্টা চলিয়াছে? তিনিই এই জীবন-দাতা, এবং সমস্ত জগতের সৃজনকর্ত্তা ও প্রতিপালক। যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন সমস্ত জগৎ আমার হইল; আমিও সকলের হইলাম। আমি সম্পূর্ণ যাঁহার, সমস্ত জগৎও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার। আমি যদি তাঁহার হইলাম, কেহই আমার পর থাকিতে পারে না।

এ সংসারে কত তাপ কত দুঃখ, তাহাতো আর কিছুতেই যায় না! যখন দেখি আমাকে যিনি সৃজন করিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইবার জন্য এবং সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র তাঁহাকেই আপনার করিবার জন্য তাঁহার আদিষ্ট কাজ করিতে আসিয়াছি; আমি গরীব, তিনি আমাকে যে কাজ দিয়াছেন এ আমারই কাজ, আমি আমার কাজ সমস্ত মন প্রাণ দেহ দিয়া যদি তন্ময় হইয়া করিতে পারি তাহা হইলে আমার কত সুখ কত আনন্দ! গরীব কৃষক ভাই, তোমার যে কাজ, সে তোমারই কাজ, সে কাজ বিদ্বান কিম্বা ধনীর দ্বারায় হইতে পারে না।

দুঃখ দূর করিবার এই উপায়;—যিনি আমাকে ভালবেসে এতটুকু কর্ম্ম করিতে দিয়াছেন, আমি তাঁহার ভালবাসা দিয়া, তাঁহার কর্ম্ম করিয়া সংসারে দুই জনকেও যদি ভালবাসিতে পারি, সেবা করিতে পারি, তাহাতেই আমার কত সুখ, পাঁচজনকে পারি আরো সুখ, দশজনকে পারি আরো ভাল!

সংসারে এক প্রকার ভাসা ভাসা জীবন আছে। তাহা, জল-স্রোতে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে তদ্রূপ সে সকল জীবনের কোন গভীরতা দেখা যায় না, কিন্তু এই সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহারা কত কাজ

করিল; জনসমাজের সঙ্গে মিলিত হইল, কাজেও তেমন আনন্দ লাভ করিতে পারিল না, জন-মণ্ডলীতেই বা কি দেখিল? কেবল নর-শিরঃ শ্রেণী মাত্র। যে ভাষা জানে না সে পুস্তকে কি দেখে? কেবল কি সাদার উপর কালদাগ গুলি মাত্র নহে? কিন্তু ভাষাজ্ঞ তাহাতে কত জ্ঞান, কত ভাব, কত আনন্দ লাভ করিতে পারেন। ভগবানের আলোকে মানবের মুখ-শ্রীতে কি দেখা যায়? কত পরিচিত মুখ দেখিয়া কত জ্ঞান, কত ভাব কত ধর্মোৎসাহের কথা মনে আসে, তাহাতে কতই আনন্দ পাই। ভগবানের আলোকে দেখিলে সকলেই সুন্দর দেখায় কোনো বস্তু অর্থশূন্য মনে হয় না।

বাসনার অধীন হইয়া মোহের দিক দিয়া কাহাকেও আপনার করা যায় না, কিন্তু ভগবানের ভালবাসার ভিতর দিয়া গেলে সমস্ত হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। মৃত্যুতেও এ যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। (মন্দিরে উপদেশের ভাবে লিখিত)

উদ্ধার

আমার ভরসা আশা সব জলাঞ্জলি
দিয়েছিনু একেবারে। কভু ভাবি নাই
এই দগ্ধ-অবশেষ, এই ভস্মছাই,
নির্ব্বাপিত এ জীবন, পুনরায় জ্বলি'
উঠিবে কণক-দ্যুতি দীপ্ত-শিখা-মুখে
লভিয়া ইন্ধন নব, প্রাণ বায়ু ভরা
ফুৎকার-মারুত তব! কি অপূর্ব্ব সুখে
দুখ নিশি হ'ল ভোর, আলোক-অম্বরা
তুমি দেখা' দিলে যবে! চলেছিল ভেসে
জীবন-তরণী মোর বহিত্র-বিহীন
অকূলের মৃত্যুমুখে। কোথা হ'তে এসে
দাঁড়ালে সে তরী মাঝে, করিলে উড্ডীন
সোনার অঞ্চল খানি, সেই ভরাপালে
বাহি' মোর তরীখানি' কূলেতে ভিড়ালে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৩)

স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অক্ষয় চন্দ্র, সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; কিন্তু সুপথে সংসাধনার অভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অকালে জীবন হারাইলেন।

অক্ষয় দৈহিক আকারে অনেকটা শ্রীমানই ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কলিকাতার-ভবানীপুরে কুসঙ্গে মিশিয়া অক্ষয় অসৎচরিত্র হইয়া পড়েন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ অক্ষয়ের জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সমস্ত কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর বেশে বাহ্য সদাচার পালনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় গোবরডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবরডাঙ্গা ও খাঁটুরা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী (বর্ত্তমান রেলওয়ে-ষ্টেশন সন্নিহিত) কতকগুলি আম কাঁটালের পুরাতন বাগান আছে। তন্মধ্যে "ভরত চাটুর্য্যের বাগান" প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ বাগানের একাংশে সন্ন্যাসী অক্ষয়, এক আশ্রম কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধনের ঠিক পথ ধরিতে না পারিয়া অক্ষয় যে বিশেষ কিছু আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার লক্ষণ কিছু দেখা যায় নাই। অধিকন্তু তখনো একটি অতি-কুভ্যাস (গঞ্জিকা সেবন) সাধনার অঙ্গরূপেই (যাহা অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীর দেখা যায়) তাঁহাতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাতে অক্ষয় কিছু কোপন-স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক আহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যশীল হওয়াতে তাঁহার স্বভাব-সুলভ শ্রী আরো উজ্জ্বল হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী অক্ষয়, গ্রীষ্মকালে "জলসত্র" ছোলা ভিজানো, গুড় বাতাসা ও সন্দেশ রসগোল্লা দিয়া সাধারণের সেবা করিতেন। কিছুদিন তাঁহাতে সেবার ভাব বিকাশ পাইয়াছিল। অক্ষয়ের কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল, তাহা লইয়া কিছু দিন আবদ্ধ থাকার পর, একটি ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ঐ অর্থ গুলি যখন ব্যয়িত হইয়া গেল, তখন অক্ষয় দেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে বোধ হয় কাশীতে আসিয়া স্বর্গীয় ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া "হিংলাজ" প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ সকল এবং নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাংলা

১৩০৫ সালে যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন আমরা তাঁহার ভয়ানক অবস্থা দেখিলাম। শোনাগেল "গুরু আজ্ঞায়" এখন তিনি যথেচ্ছা-চারী,—মদ্য, মাংস যাহা পান্ তাহাই অবাধে পান ভোজন করেন, এমন কি প্রতিদিন সুরাপান তাঁহার সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। মাংসাদি যাহা ভোজন করিতেন তাহা পরক্ষণেই বমন করিয়া ফেলিতেন। এই অবস্থায় কালীঘাটের শ্মশানে তাঁহার 'আসন' ছিল। এই সময় হঠাৎ একদিন শোনা গেল, অক্ষয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু বিবরণ বিচিত্র ভাবে প্রথমে প্রচারিত হয়। শেষ জানা গেল ভয়ানক জ্বর-বিকারে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে! যাহা হউক, অক্ষয়ের ধর্ম্ম সাধন-প্রণালী আমরা অনুমোদন না করিয়াও ধর্ম্মানুরাগ, ত্যাগ এবং কঠোর সাধনানুরাগের জন্য অক্ষয়ের নাম 'কুশদহ' বৃত্তান্তে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করি।

তৎপরে স্বর্গীয় রামকানাই চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের নাম আমরা আহ্লাদের সহিত কুশদহ-বৃত্তান্তে সন্নিবেশিত করিতেছি। মহেন্দ্র বাবু যৌবনের প্রারম্ভ কালে বিবাহিত হইয়া অবস্থার গতিকে গোবরডাঙ্গারবাস ছাড়িয়া ভবানীপুর বকুলবাগান লেনে বসবাস আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় অদ্যাপি তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি যখনই দেশের ভুতপূর্ব্ব সদ্ভাবের কথা সকল বলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আবার দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথায় তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসে! মহেন্দ্র বাবু চিত্র-অঙ্কনে নিপুণ এবং স্বভাব কবি—প্রেমিক ভক্ত ও ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ। তাঁহার চরিত্র যেমন নির্ম্মল, অন্তঃকরণও তেমন কোমল। যিনি একবার তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন তিনিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

মহেন্দ্র বাবু বিনা আয়াসে সময়ে সময়ে কতকগুলি গান রচনা করিয়া-ছিলেন; তৎপরে ১৩১০ সালে "চরিত্রবান কুলীন" নামক, নাটকের ন্যায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া, ঐ গানগুলি তাহাতে সন্নিবিষ্ট করাতে পুস্তকের স্থান-বিশেষে সঙ্গীতের ভাবের স্বার্থকতা হয় নাই। একখানি স্বতন্ত্র সঙ্গীত পুস্তক হইলেই ভাল হইত। তদ্ভিন্ন "চরিত্রবান" কুলীনের ভাষা ও রচনা প্রণালী মনোজ্ঞ নহে। তিনি যে প্রাচীন বহু-বিবাহ পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়া গ্রন্থের মৌলিকতা স্থাপন

করিয়াছেন তাহা সমাজ-হিতকর নহে। ঐ প্রথা বর্ত্তমান সভ্য সমাজের অযোগ্য। তথাপি তিনি যে চরিত্রবান্-কুলীনের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে। আন্তরিক অনুরাগের তুলিকায় তাহা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এখানে মহেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার চরিত্রগত সদ্ভাবের প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলা হইল মাত্র।

তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীতের ভাব চমৎকার! স্থানাভাবে তাহার দুইটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

রাগিণী ভীমপলশ্রী—যৎ।

"দান করিলে দৈন্য হয় না শাস্ত্রের লিখন।
যাহার যেমন সম্বল, পথের সম্বল করে লও কিছু এখন।
যে জানে অর্থের অর্থ, তার অর্থ যায় না ব্যর্থ,
মেলে অর্থ হ'তে ধর্ম্ম, অর্থ, পরমার্থ পরম ধন।
এ দিনে যা দীনকে দিবে, সে দিনে তা সঙ্গে যাবে;
শেষে তিলটি তোমার তালটি হবে লোকে বলবে সুকৃপণ।"

২য় গান—

রাগিণী পরজ কালাংড়া—কাওয়ালী।

"বিশ্বাসীর নিকটে কেহ অবিশ্বাসী নয়!
(মনরে) সে জনের এই মনের ভাব সব ব্রহ্মময়।
মিলায়ে দুগ্ধ জলে, মরালের মুখে দিলে,
জল ফেলে সে অনায়াসে দুগ্ধ পিয়ে লয়,
বিশ্বাসীর কাছে তেম্নি গুণের পরিচয়।
সে জনে কা'র দোষ ধরে না,
সামান্যতে রোষ করে না,
ও তার বিবাদ কালেও বাক্ সরে না,
অবাক্-হয়ে চেয়ে রয়।"

সাময়িক ও বিবিধ মন্তব্য

বিগত ৬ই মে অপরাহ্নে এলবার্ট হলে মিঃ গোখ্‌লের বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল সমর্থন জন্য বাবু সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল। সভায় সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্যের বক্তৃতায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন "আমরা কি ইচ্ছা করি যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা চিরদিন দাসের ন্যায় নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকে? এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টেরও টাকা দেওয়া উচিত এবং দেশের লোকের ও কষ্ট করিয়া ট্যাকস্‌ দেওয়া আবশ্যক।"

এই বিল সমর্থনের জন্য বিশেষ আন্দোলন হওয়া আবশ্যক, তবে গবর্ণমেণ্ট বিল পাশের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন।

স্কুল কলেজের শিক্ষায় সাধারণ ভাবে কি নীতি শিক্ষা হয় না? তথাপি বিশেষ ভাবে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধে, কলিকাতায় দুইটি এবং মফস্বলেও কোথাও কোথাও নীতি-বিদ্যালয় বা 'সাণ্ডে-স্কুল' আছে। প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার কার্য্য হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রদিগের, নীতি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য "হায়ার ট্রেণিং ক্ল্যাশ" হইয়াছিল। এক্ষণেও নীতি, ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে যদি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় তবে তাহা উদার ভাবেই করিতে হইবে। বিশেষ ধর্ম্ম শিক্ষারস্থান গৃহ, স্কুল কলেজে সাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এখনো যাঁহারা উচ্চরব করিতেছেন, তাঁহাদের কল্পনা কার্য্যকরী হইবে তাহা বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িক শিক্ষায় কি দেশের ইষ্ট হইবে?

বর্দ্ধমান মহারাজার ঠাকুর বাড়ীতে দোল ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে যে সকল অপবিত্র নৃত্য-গীতের বন্দোবস্ত ছিল, মহারাজা তাহার পরিবর্ত্তে শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বহুস্থলে এইরূপ সৎসাহস এবং সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্যামবাজারে কোনো ভদ্রগৃহে এক বিবাহ-সভায় বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সভায় "বাই নাচ" হইয়াছিল। যাঁহারা চিরদিন বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের পক্ষ সমর্থন করেন, এমন এক সাপ্তাহিক পত্রে (ঐ কাগজের নাম প্রচার করিতে আমরা ইচ্ছা করি না) সংবাদটি প্রকাশ করিয়া এই সভায় কোনো নীতিবান্ আপত্তি কারীর প্রতি ও 'সঞ্জীবনী'র নামোল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা বলি কোনো ভদ্র-গৃহে যেকোনো অনুষ্ঠানেই হউক না কেন বারাঙ্গনার নৃত্যগীত করানো উচিত নহে। তৎপরে ঐরূপ রুচির সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে আর কি বলিব? যাহার অস্তিত্ব যে রুচির তাহা ত্যাগ করিলে তাহার অস্তিত্ব থাকে কি?

বিধবা বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে বাদানুবাদ নিয়ত চলিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়োপযোগী ইহার সামঞ্জস্যের কোনো কথা প্রায় শোনা যায় না। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বাল-বিধবার অবস্থাগত বিবেচনায় বিধবা বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট সহানুভূতি করিতেন। যেখানে স্বভাবত ধর্ম্ম বা বৈরাগ্য ভাবের অভাব দেখিতেন সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতেন না। পক্ষান্তরে হিন্দুর 'এক-পতিজ্ঞান' এবং ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের গৌরব যাহাতে নষ্ট না হয় তেমন সংস্কারকে রক্ষা করিতে যত্নশীল ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস বাল্য-বিবাহ সংখ্যা যত কমিয়া আসিবে তৎসঙ্গে যদি সুশিক্ষা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বিস্তার পায় তবে ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। যদি কেহ বলেন, সুশিক্ষিত ইউরোপে তো বাল্য-বিবাহ নাই, তথাপি বিধবা বিবাহ প্রবল হইল কেন! তাহার কারণ ইউরোপের শিক্ষা অত্যন্ত স্বাধীনতা মূলক এবং বহির্জাগতিক বিজ্ঞানপ্রধান; কিন্তু ভারতবর্ষ, বাধ্যতামূলক এবং অন্তর্জাগতিক শিক্ষা-সংস্কারে গঠিত।

এক সময় উপবীত ত্যাগের জন্য হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন সমুপস্থিত হইয়াছিল; এখন আবার উপবীত গ্রহণ জন্য আর এক আন্দোলন চলিয়াছে। সকল শ্রেণীই যদি উপবীতধারী হয় তবে কি সকল উপবীতধারীর সমান আদর বা উন্নতি হইবে? তবে এমন উপবীত গ্রহণের ফল কি? উপবীতে কি এমন কোন বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ শক্তি আছে যে, তাহা গ্রহণ করিলে নীতি চরিত্র, আচার অনুষ্ঠান উন্নত হইবে? নচেৎ হইতেই পারে না?

স্থানীয় সংবাদ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল—বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় গোবরডাঙ্গা নিবাসী ৺উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ তুষিতকুমার মুখোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল কঃ স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে, ডাক্তার কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিদপুর জেলাস্কুল হইতে প্রথমবিভাগে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ স্কটিস্‌চার্চ্চ কঃ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে, ৺গঙ্গাধর সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবলচন্দ্র বরাহনগর ভিক্‌টোরিয়া স্কুল হইতে তৃতীয় বিভাগে, এবং 'কুশদহ' সম্পাদক—দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সরলকুমার কুণ্ডু সিটী কঃ স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এবং স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র আশের দৌহিত্রী (স্নেহলতা দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা) কুমারী শান্তিলতা লোরেটো হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এবার গোবরডাঙ্গা স্কুলের দুইটি ছাত্রই উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

ডাক্তারী পরীক্ষা—বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সহায়রাম রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ হরিসাধন রক্ষিত মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক (প্রথম এম, বি,) পরীক্ষায় এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিতের পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত প্রথম বার্ষিক (প্রিলিমিনারী এম, বি,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কর্ণবেধ—সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা জমিদার বাটীতে বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার কর্ণবেধ উপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণ ভোজনাদি এবং বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজনও নাকি যথেষ্ট হইয়াছিল।

এ সংবাদ কি সত্য?—বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠের "সঞ্জীবনী"তে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায় এইরূপ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে,—"গত ৩০শে বৈশাখ বিষ্ণুপুর চকবাজারে কলিকাতা হইতে তাম্বুলী সমাজের ৪ জন সভ্যের আগমনে বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীধর চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাজের এক অধিবেশন হইয়াছিল। গান এবং বক্তৃতাদি সভার কার্য্য দুইদিন হয়। শেষ দিনের কার্য্যান্তে ঐ সভায় "বাই নাচ" হয়। সমাজের উন্নতি-কল্পে সভা আহ্বান করিয়া তৎসঙ্গে বাইনাচ বেশ রুচির

পরিচয়! তাম্বুলী সমাজে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, অনেকেই সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা কি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন না?"

যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে বড়ই লজ্জার কথা; অতঃপর এই "তাম্বুলী সমাজ" যে স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল—প্রবর্ত্তিত সমাজ, সে পরিচয় দিবার উপযুক্ততা আর থাকিবে না। "কলিকাতার ৪ জন সভ্য" এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন. তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

বহু-বিবাহ—বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রণালী সকল মানব-সমাজেরই উন্নতির অনুকূল। শিক্ষা, সংস্কারে সমাজ উন্নত না হইলে তাহার কুপ্রথাগুলি সংশোধন আশা করা যায় না; তাই এক স্ত্রী সত্বে পুনর্ব্বার বিবাহ অশিক্ষিতের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা লেখা পড়া শিখিতেছে, শিক্ষিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কাহার কি এরূপ কুকার্য্য করা উচিত? সম্প্রতি কুশদহ তাম্বুলী সমাজে ঐরূপ একটি ঘটনা সম্ভাবনার কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। পারিবারিক কোনো কারণে ঐ আন্দোলন হইলেও এ কার্য্যের বিরুদ্ধে যুবকের একান্ত দৃঢ় হওয়া কর্ত্তব্য। এক স্ত্রী সত্বে আর এক বিবাহ করা কখনই উচিত নহে। তাহার কি দায়ীত্ব জ্ঞান নাই? তবে শিক্ষার ফল কি হইল?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

বাণী (চৈত্র, ১৩১৭)—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। কলিকাতা, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২।৵০

প্রথমেই ভক্ত কবি দেবেন্দ্র নাথ সেনের কবিতা "ব্রজেন্দ্র ডাকাত" অপূর্ব্ব জিনিষ, ইহা পড়িলে নিতান্ত ভক্তিহীনের প্রাণেও ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে। শুধু এই কবিতাটির জন্য এবারকার "বাণী" সার্থক বলা যায়। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর "মহাভারতের গঠন" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পাগলিনী" কবিতা বড়ই সুন্দর-বড়ই মধুর! 'বৌদিদি' শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, লেখকের মতে বোধ হয় এটি গল্প; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বার বার পড়িয়াও আমরা ইহার গল্পত্ব বুঝিতে পারিলাম না। যেমন 'প্লট' তেমনি ভাষা। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের "মালদহের সাপ্তাপূজা ও গ্রাম্য দেবতা" বহুতথ্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'ঋণ-পরিশোধ' মন্দ হইতেছে না।

শ্রীমতী সরলা দেবী বি. এ

Photo by
Bourne & Shepherd.

KUNTALINE PRESS.

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩১৮ | ৪র্থ সংখ্যা

গান

(কাফি—একতালা)

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু! এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু'হাত ভরে ওঠে ধনে;—
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে
আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগবানের স্বরূপে নিষ্ঠা

সাধকগণ জানেন, সাধন পথে প্রথম কথা নিষ্ঠা। কিন্তু নিষ্ঠা জন্মায় কিসে? বস্তুর মর্ম্ম যতদিন না বোঝা যায় ততদিন তাহাতে নিষ্ঠা, অনুরাগ বা আসক্তি হয় না। বালিকা কি পতি মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হয়? বালক কি কেবল উপদেশ শুনিয়া পিতৃ-ভক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারে? স্বাভাবিক অনুরাগ সত্ত্বেও জ্ঞানানুরাগ নিতান্তই জ্ঞান-সাপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুর গুণ বা স্বরূপ অবগত না হইলে বস্তুতে প্রকৃত অনুরাগ হইতেই পারে না। তাই দেখা যায় পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান পরিষ্কার রূপে না জন্মিলে সাধন-পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন বর্ণমালা না জানিয়া ভাষা-জ্ঞান হইতেই পারে না, তদ্রূপ উপাস্যের স্বরূপে স্পষ্ট ধারণা না হইলে উপাসনায় নিষ্ঠা ও গাঢ়তা জন্মায় না। "ধর্ম্ম ভাল, ঈশ্বরের নাম করা কর্ত্তব্য" এইরূপ কোনো বাহ্যিক ভাব হইতেও কখনো কখনো সাধনানুরাগ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ততদিন নিরাপদ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যত দিন না উপাস্যের স্বরূপের জ্ঞান পরিষ্কার হয়।

মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া কোনো না কোনো ভাবে তাঁহার স্বরূপের ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু সকলের ধারণা যে পরিষ্কার প্রকৃতিস্থ তাহা তো দেখা যায় না। যদি একই বস্তুর ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হইল, তবে ধর্ম্ম-ভাবও যে বিভিন্ন প্রকারের হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুত এ দেশে বিশেষভাবে তাহাই হইয়াছে। একই হিন্দুর একই উপাস্যের এত বিচিত্র স্বরূপ আর কোনো দেশে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলিবেন "ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁহার গুণ অসংখ্য, সুতরাং যিনি যে ভাবে তাঁহার যে স্বরূপের ভজনা করুন না কেন, তাহাতে সেই একেরই ভজনা করা হয়।"

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও এক দিকে ভয়ানক ভ্রম রহিয়াছে ;—তিনি অনন্ত গুণময় হইয়াও এক অদ্বিতীয়। সুতরাং তাঁহার অদ্বিতীয় স্বরূপের মৌলিক আদর্শ ছাড়িয়া যে কোনো ভাবে তাঁহার উপাসনাদি করিলেই যে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করা যাইবে, ইহা কখনো সম্ভবপর নহে। মানবত্বে সকল মনুষ্য সমান হইলেও ভোলানাথ কর্ম্মকারকে ডাকিয়া কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের দেখা পাওয়া যায়? অথবা পাঁচু মণ্ডলকে ডাকিয়া কি রামকৃষ্ণ

পরমহংসের দর্শন হয় ? তাহা যদি না হয়, তবে মানবীয় ভাব মিশ্রিত পৃথক পৃথক দেব-দেবী ভাবে ভাসিয়া কি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরব্রহ্ম সনাতন নিত্য নিরঞ্জন মুক্তিদাতা পরম পিতা পরমেশ্বরের ভাব লাভ করা যায় ? পরমাত্মার মৌলিক স্বরূপের কি কোনো আদি নিদর্শন কিম্বা আদি শাস্ত্র নাই ? ইহা কি কেবল কল্পনার কথা ? এ দেশের প্রথম অবস্থায় ধর্ম্ম-সাধন-কালে যখন মানব-মন স্বাভাবিক ছিল—সরল ছিল, তখন স্বতই মানব-হৃদয়ে কোন্ স্বরূপের উদয় হইয়াছিল ? যে আদি কালকে বৈদিক কাল বলা হইয়াছে, যে বেদ 'আপ্তবাক্য' অর্থাৎ ঈশ্বর-বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ,—বাস্তবিক ঈশ্বর দেহধারী হইয়া একখানি বেদগ্রন্থ কাহারো হাতে দিয়া গিয়াছিলেন কিম্বা স্বয়ং বেদ-মন্ত্র কাহাকেও বলিয়া ছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক সরল চিত্তে ঈশ্বরতত্ত্ব-পিপাসু ব্যাকুল মানবগণ যে জ্ঞান-তত্ত্ব এক সময় লাভ করিয়াছিলেন, যাহা আজো পর্য্যন্ত বিশুদ্ধচিত্ত মানব-মণ্ডলী অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছে সেই বেদান্ত বা উপনিষদ্ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন ?—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,
আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি ;
শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ।"

"সত্যং" অর্থাৎ সত্য-স্বরূপ,—সত্য কি ? সৎ—যিনি আছেন—যিনি মূল সত্ত্বা, যিনি কারণ, সত্যই সকলের মূল কারণ। সেই মূল কারণ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি আছেন।

তৎপরে—"জ্ঞানমনন্তং" সেই সৎস্বরূপ, জ্ঞানময়। তিনি সকল জানেন, সকল জানিয়া সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের মহিমায় এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান অনন্ত-অসীম, তাঁহার কোনো সীমা নাই, আরম্ভ নাই, শেষও নাই, মৃত্যুও নাই। তিনি শক্তিতে অনন্ত, জ্ঞানে অনন্ত, তাই সত্যং জ্ঞানমনন্তং।

"আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—অর্থাৎ তিনি এই জগতে আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি স্বয়ং পূর্ণানন্দময়, তাই ভক্ত কবি গাইলেন "তোমারই আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে।" জীব সকল তাঁহারই আনন্দ-রসে অমৃত-স্বরূপে জীবন ধারণ করিতেছে, তিনি পূর্ণানন্দময়।

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"—অর্থাৎ তিনি একমাত্র স্থির, শান্ত, নিস্তরঙ্গ,

নির্ব্বিকার, অদ্বিতীয় মঙ্গলময়। সাধারণ জীব সকল মৃত্যু দেখিয়া ভয় পায়, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাঁহার মঙ্গলময়-স্বরূপে বিশ্বাসী হইয়া জন্মে যেমন মরণেও তেমন মঙ্গল-বিধান দর্শন করেন; তাই তাঁহারা স্থির শান্ত, শোক-মোহে অধীর হইবার কোনো কারণ দেখেন না। অতএব সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ এবং শান্ত নির্ব্বিকার পবিত্র-স্বরূপ, অথচ সকল স্বরূপে যিনি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহাই ঋষিদিগের সাধন পথ। তবে পরবর্ত্তী সময়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহারো একটা প্রয়োজন ছিল। উপনিষদ্-যুগের জ্ঞান ক্রমে অদ্বৈতমার্গে "মায়াবাদের" মধ্যে পড়িয়া যখন কঠোর সাধনার পথে গিয়া দাঁড়াইল, তখন মানব-হৃদয় আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। ব্যাকুল প্রার্থনার ফলে পৌরাণিক যুগের অবতরণ হইল। ঈশ্বরে মানব লীলার ভাব আসিল। দূরস্থ জ্ঞানের ঈশ্বরকে "লীলা-রসময় হরি" রূপে দর্শন করিতে মানবাত্মা ধাবিত হইল। ভক্তি-প্রেমের ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কিন্তু সাধন-পথ সহজ করিবার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইতে লাগিল। উচ্চ জ্ঞান-পথ খর্ব্ব হইল। ভাবুকতার প্রাবল্যে জ্ঞানের আদর্শ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। লীলা-বর্ণনাচ্ছলে মানবীয় ভাবের বিবিধ আখ্যায়িকা শাস্ত্র-মধ্যে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। পৌরাণিক আদর্শ, বেদ-বেদান্তের পরিণতি বলিতে চাও বল, কিন্তু আদর্শ যে নামিয়া গেল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা হউক যুগ যুগান্তরের সাধন-ফলে এখন ধর্ম্ম-জগতে এক সুসময় আসিয়াছে। জ্ঞান,ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধর্ম্মই এখন সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন অধিকাংশের গতি সামঞ্জস্যের দিকে। এখন সেই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত-মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, অদ্বিতীয় নিরাকার ভগবানকে পরম পিতা, পরম মাতা, বিধাতা, প্রভু, রাজা, সখা, স্বামী রূপে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিযোগে, প্রেম-যোগে তাঁহার সাধন ভজন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। ভারতবাসী আবার সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকেই লীলা রসময় বিধাতা রূপে পূজা করিয়া ধন্য হইবে। প্রথমে এক একটি ভাবকে যুগের পর যুগ পৃথক ভাবে লাভ করিয়া সাধন করিয়াছে, এখন সকল ভাবের সামঞ্জস্যে এক মহাভাব সাধিত হইবে তাহারই আয়োজন চারিদিকে দেখা যাইতেছে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তাঁহার মহিমা জয়যুক্ত হউক।

দান

(৩)

ইহার পর আরো দুই বৎসর গত হইল। আমার সপ্তদশ বৎসর ঊনবিংশে পর্য্যবসিত হইল। সে বৎসরের জন্ম-দিন উপলক্ষে বাড়ি আসিয়াছি। তখনো দুই দিন ছুটি আছে, কাল রাত্রের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আজ হইতেই নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলাম। গানগুলা একবার মাসীমার কাছে গাহিয়া বাজাইয়া 'রিহার্সেল' দেওয়া হইল। আমার জন্ম-দিনের উপহার দিবার জন্য মাসীমা যে সুশুভ্র অম্লানোজ্জ্বল মুক্তার কণ্ঠি ও চুণির দুইটি 'ব্রেস্‌লেট্' তৈরি করাইয়াছিলেন, সেগুলি পরাইয়া শুভ্র স্থূল 'ফ্রেঞ্চ' সাটিনের উপর রৌপ্য-সূত্রের 'এম্‌ব্রয়ডরি' করা সুন্দর পোষাকটি ও সাদা সাটিনের জুতা পরাইয়া আমায় সম্মুখে দাঁড় করাইয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার মুখ খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল! সে প্রফুল্লতার মধ্যে অনেক খানি যে বিজয়ের আনন্দ-গৌরব ছিল, তাহা আমি তাঁহার চোখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম! যেন খুব বড় সেনাপতি একটা মস্ত বড় দুর্গ জয় করিবার জন্য খুব ভাল একদল সৈন্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে! আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,"আমায় বুঝি কাল কোনো একটা নতুন 'এ্যাক্ট'করতে হবে?" মাসীমা আমার মুখ খানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে ললাটে চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ মা, একেবারে নতুন।"

সেদিন ও তার পর দিন উপহারের জিনিষপত্র ও নিজের সাজ পোষাক লইয়া আমি নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলাম! যথেষ্ট বেলা থাকিতে আমাদের পাশের নদীর তীরটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নূতন গানটা আপনার মনে গাহিয়া গাহিয়া অভ্যাস করিতে লাগিলাম। তখন দ্বিপ্রহরে শীত বা কোয়াসা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া পাখীরাও আমার সঙ্গে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে ছিল। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর মতন উল্লাসে আত্মহারা হইয়া গেলাম! এমন সময় পশ্চাতে শুষ্ক পত্র মর্ম্মর করিয়া উঠিল, আমাদের সঙ্গীত অতিক্রম করিয়া এক গুরু পদশব্দ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল! পিছন ফিরিয়া দেখিলাম,— একজন অপরিচিত পর্য্যটক আমার অদূরে ব্যাগ্রমুখে দাঁড়াইয়া আছেন! ঈষৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলাম। সে ব্যক্তি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া

খুব সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদূরস্থ বাড়িটাই "রেড্ হাউস" কিনা? আমি ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিতেই তিনি পুনশ্চ আমায় অভিবাদন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অপরিচিত পর্য্যটককে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। ইঁহাকে যেন আমি কখনো দেখিয়াছি—যেন ইনি আমার খুব বেশি পরিচিত! অথচ মোটেই তাহা নয়। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া শেষে মীমাংসা করিয়া লইলাম—'হয়তো ইঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।'

একটু পরে নূতন পোষাকে, অলঙ্কারে পুষ্পে ও 'সেণ্ট' সাজিয়া সুবাসিত কুসুমের ন্যায় আমার দর্পণস্থ পরিচিত প্রতিবিম্বকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া মাসীমার উদ্দেশে গেলাম। বড় 'হল' সেদিন তখনো সাজানো চলিতেছিল;—নাচের জন্য নৃত্যাগারটাকে একেবারে আগাগোড়া নূতন করিয়া তোলা হইয়াছিল। সেদিনকার 'বলে' মাসীমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সমারোহে একমাত্র নায়িকা-বোধে আমার মনে সেদিন যে একটু আনন্দ মিশ্রিত গর্ব্বের উদয় হয় নাই তাহা বলিতে গেলে মিথ্যা কথা বলা হয়! মাসীমার 'প্রাইভেট্' ঘরে অবশেষে তাঁহার সাড়া পাইলাম। প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াও তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম! শুনিলাম তিনি বলিতেছেন,—"আশ্চর্য্য হয়েছি! ক্রমাগত লিখে লিখে অবশেষে তুমি আফ্রিকা চোলে যাচ্চো, জানতে পেরে টেলিগ্রাম করে তোমায় আনাতে হয়েচে, আর তুমি বল্‌চো কিনা সাতটার ট্রেণ "মিস্" করলে তোমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি! এ কী রকম লোকের হাতে আমি মেয়ে দোব? যদি তুমি তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক থাকো সে কথা স্পষ্টই কেন বলো না?"

এ কাহার সহিত কথা হইতেছে? আমার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা এমন জোরে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত উত্তেজনার আনন্দে আটকাইয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় শুনিলাম তিরস্কৃত লোকটি বলিতেছেন, "আপনি আমার মা, সন্তান দোষী হ'লেও মা তাকে শতবার ক্ষমা ক'রতে পারেন, এত দিন যদি ক্ষমা করেছেন, আরো কিছুদিন করুন, এখন আমি একেবারেই সুস্থ নই।"

তাঁহার কণ্ঠে বেদনা ও কাতরতা যেন ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছিল! আমার

বড় দুঃখ হইল, 'আহা মাসীমা কেন তাঁহাকে আমার জন্য ভৎসনা করিতে-ছেন? নাইবা তিনি আজ থাকিতে পারিলেন!'

মাসীমা উত্তেজিত স্বরেই বলিলেন, "ক্ষমা আমি শতবার কেন সহস্রবারও করতে পারি; কিন্তু কথা এই যে, এখন 'ভায়ালো' বড় হচ্চে,—তোমার সঙ্গে তার সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হওয়া তো উচিত! নইলে তার স্বাধীন ইচ্ছায় আমিতো চিরকাল চৌকি দিয়ে বেড়াতে পারবো না! কোন্ দিন কাকে হয়তো সে পছন্দ করে বস্‌বে তার ঠিক কি? পড়া-শুনায় বদ্ধ আছে তাই রক্ষে নইলে এতদিন কত স্তাবকের গান শুন্‌তে পে'ত তার সংখ্যা আছে? এখুনি তো আর আমি বিয়ে দিচ্চি নে, কিন্তু তার আগে তোমার তো আসা যাওয়া চাই।"

গোপনে কাহারো কথা শুনা উচিত নয় জানিতাম, চলিয়া যাইব স্থিরও করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি একটা অনিবার্য্য কৌতূহল রোধ করিতে না পারিয়া এ অন্যায়টুকু করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি কি উত্তর দেন শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উত্তর শুনিয়া খুবই চমৎকার লাগিল না, বরং মাসীমার এত কষ্ট করিয়া বিশ্লেষণের পরে সেই কুণ্ঠিত-বিষাদপূর্ণ স্বরে সেই সংক্ষিপ্ত 'চেষ্টা করবো' কথাটা আমার সেদিনকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও অভিমানকে এক মুহূর্ত্তে আহত করিয়া ফেলিল! "চেষ্টা করবো" তিনি কি তবে আমার উপর আমারি মতন আগ্রহ রাখেন না? আমিই ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি? তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিয়া তবে কিছু পাইব? কেন আমার দরকার কি? কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই শ্রান্ত পর্য্যটকের অসামান্য সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িল! আমার সেই ছবিখানা মনে পড়িল!—প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া প্রেমের জয় ঘোষিত হইল! তিনি এখনো আমায় দেখেন নাই, দেখিলেও চেনেন না। মাসীমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এতক্ষণে আমার মুখ লজ্জায় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল! তাঁহার জয়ের হাসি মনে পড়িয়া আমারো এখন হাসি আসিল!—বুঝিলাম সেনাপতি অনর্থক সেনা প্রস্তুত করেন নাই!

নিজের ঘরে গিয়া তৃষ্ণা-শুষ্ক-কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া যে টুকু প্রসাধন স্থান-চ্যুত হইয়াছিল ও যে টুকু হয় নাই সে সমস্ত সযত্নে যথা স্থানে স্থাপন করিলাম। বাম হাতের মধ্যমা অঙ্গুলিতে একটি মুক্তা ও চুণি বসানো আংটি পরিলাম! তার পর বড় 'পারলারে' নিমন্ত্রিতগণের অপেক্ষায় প্রবেশ করিলাম। মনটা

এখন খুব বেশি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; বিলম্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরো অধিকতর অসহ্য হইয়াছিল, কেবলি চোখের পাতা নত হইয়া পড়িতেছিল এবং বুকের মধ্যে অসম্ভব দ্রুত-তালে হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিতেছিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য—অন্যমনা হইবার জন্য একটা পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীতের একটি চরণ মৃদু মৃদু আপনার মনে গাহিতে গাহিতে একখানা আসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার সেই সঙ্গীতের ক্ষুদ্র চরণ টুকু ফিরিয়া ফিরিয়া আমারি কণ্ঠে অন্যের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! গলা এত কাঁপিতেছিল যে, আমার ভয় হইল, কি করিয়া আজ আমি অভ্যাগতগণের নিকট মর্য্যাদা রক্ষা করিব? একি—আনন্দে আমাকে এমন শক্তি-হীন করিল কেন? কি আশ্চর্য্য! ঘরে যে অন্য এক ব্যক্তি জানলার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাও এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই? আমি অন্ধ হইয়াছিলাম নাকি? ইনিই তো সেই নূতন অতিথি!—নবীন পর্য্যটক—এবং আর—কে? তিনি গভীর বিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া আমি ঘোর লজ্জায় আরক্ত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছি—ছি, তিনি যদি মনে করেন সত্য সত্যই আমি নির্লজ্জের মতন তাঁহাকে দেখা দিতে আসিয়াছি!—কিন্তু বেশি ক্ষণ এ সঙ্কটে থাকিতে হইল না। তিনি বিস্ময় দমন করিয়া কোচখানা ঘুরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাত বাড়াইয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন "গুড্ আফ্টারনুন"—একটু ম্লান হাসির-সহিত কহিলেন,—"আমি আপনাকে বোধ হয় এখন 'মিস ম্যানিং' বলে সম্বোধন করতে প্যারি। পূর্ব্বে চিনতুম না, সেজন্য যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা কোরবেন।"

আমি আনন্দে লজ্জায় বিস্ময়ে জড়ীভূত ভাবে ঘাড় নাড়িলাম, এমনি করিয়া আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম পরিচয় সাধিত হইয়া গেল। যে অলক্ষ্য হস্ত আমাদের সকল কার্য্যকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই মঙ্গল হস্ত ভিন্ন সেখানে আর কাহারো সাহায্য আবশ্যক ছিল না। আমরা দু'জনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বিভিন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া অন্তরের মধ্যে একটা পুলক-কম্পন অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি কি ভাবিতেছিলেন জানি না। দু'একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি নতমুখে থাকিয়াও

বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার সৌন্দর্য্য, আমার জীবন, আমার সযত্ন-রচিত সজ্জা সমস্ত আজ সার্থক মনে হইল!

তারপর মাসীমা আসিয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখিয়া প্রথমে যেন খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন, তারপর আমাদের ভাব দেখিয়া হাসিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "গেব্রিয়েল, এই আমার বোনঝি মিস্ ম্যানিং; ভায়োলা, ইনিই মিঃ ব্রাউন।"

তিনি মৃদু-গম্ভীর স্বরে অথচ ঈষৎ হাস্যির সহিত উত্তর দিলেন—"আমি ঘরের ছবি থেকে এঁকে চিনতে পেরেচি তা ছাড়া আসবার সময় নদী-তীরে মিস্ ম্যানিং এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ওঁকেই তো আমি 'রেড্ হাউসে'র কথা জিজ্ঞাসা করি।' মাসীমা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন,—"ও-তবে তো তোমাদের মধ্যে বেশ রোম্যাণ্টিক হ'য়ে গ্যাছে তা গেব্রিয়েল, তুমি বাড়ি পর্য্যন্ত ভুলে গেছ?" তিনি অপরাধীর মতন মাথা নীচু করিলেন—বিজড়িত ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ। আমি এক রকম ভুলেই গেছি বই কি খুব ছোটো বেলা ভিন্ন আর আসা হ'য়ে ওঠেনিতো"। মাসীমা বলিলেন—"আচ্ছা যা হয়েছে তা যাক, এখন থেকে যেন সর্ব্বদা আসা হ'য়ে ওঠে, কি বলো ভ্যালী, আমরা এখন থেকে গেব্রিয়েলের প্রতীক্ষা করবো—কেমন না?"

আমি আরো লাল হইয়া উঠিয়া চক্ষু নত করিলাম,—শুনিতে পাইলাম তিনি গভীর বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া তেমনি নিরুদ্যম মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—'আমি চেষ্টা কোরবো।'

মুহূর্ত্তে আমার কল্পনা-কানন তীব্র তাপে শুকাইয়া উঠিল, নিদারুণ আঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু আমাকে আর যাইতে হইল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মাসীমার পানে চাহিয়া বিনয়ের সঙ্গে কহিলেন, 'আজ তবে চল্লুম, বিদায়।"

আলোকময়ী পৃথিবী! তুমি এই মুহূর্ত্তে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাও! সূর্য্য, তুমি আমার অপমান দাঁড়াইয়া দেখিয়ো না! মাসীমার উপর অত্যন্ত ক্রোধ হইল,— ইচ্ছা হইল সমস্ত মুক্তা ও সাটিন কঠোর হস্তে ছিন্ন করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়ি! আমি কি সৌন্দর্য্যের জাল পাতিয়া হরিণ ধরিতে আসিয়াছিলাম? সে দিনকার সমস্ত সঙ্গীত, সমুদয় আলোক ও সমস্ত আনন্দালাপ তিক্তস্বাদ হইয়া গিয়াছিল! (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বুন্দেলখণ্ড-কেশরী

মহারাজ ছত্রসাল

ভারতে আর্য্যসভ্যতা যখন উন্নতির প্রায় চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন বৈদিক ঋষি দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বলে যে মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা এই,—

কলিঃশয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।)

অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজ যখন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বা অলস-ভাবে শয়ান থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থা কলিযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ ও জ্ঞানের উন্মেষ হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহা দ্বাপর নামে পরিচিত হয়। যে অবস্থায় মানব-সমাজ আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইবার বা অভ্যুদয় লাভের চেষ্টা করে, সে অবস্থাকে ত্রেতা যুগ বলে। তাহার পর যখন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থা কৃতযুগপদবাচ্য।

প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্য-ঋষি কল্যাদি যুগের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিলে বলিতে হয়, প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে ভারতীয় আর্য্য-সমাজে ত্রেতা যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে যে দিন ভারতীর বরপুত্র কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য-মালা রচনা করিয়া, বৌদ্ধমত-প্লাবিত ভারতের যথেচ্ছাচার কলুষিত সমাজে বেদমূলক আর্য্য ধর্ম্মের সুপবিত্র প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন, সেইদিন হইতে আমাদিগের দেশে ত্রেতা যুগের আরম্ভ হয়। সেইদিন হইতে অবসন্ন হিন্দু-সমাজ নূতন পুলক-সঞ্চারে চঞ্চল হইয়া, বৌদ্ধ প্রভাবের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য উদ্যম প্রকাশপূর্ব্বক "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নশীল হয়। বৌদ্ধ প্রভাব-কালে রচিত মৃচ্ছকটিকের সামাজিক আদর্শের সহিত রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের সামাজিক আদর্শের তুলনা করিলেই আমাদিগের উক্তির যথার্থ্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম

হইবে। কালিদাস যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় করিবার তেমন কোনও প্রবল কারণ দৃষ্ট হয় না। এই কারণে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনারম্ভ ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভকাল বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। ঐ সময় হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যানুসারে, ভারতীয় সমাজে ত্রেতা যুগের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কালিদাসের সময় হইতে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রেরও অভিনব কাব্য অলঙ্কার সাহিত্য ও জ্যোতিষ বেদান্ত প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা এদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ণ সহস্র বর্ষকাল এই উন্নতির স্রোত এদেশে অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া হিন্দু জাতি এক দিকে যেমন সুদূর প্রাচ্য রাজ্য জাপান হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত প্রদেশে বিশাল বাণিজ্য ও উপনিবেশ-মালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ অর্দ্ধ পৃথিবীর ধন-সম্পদভোগের অধিকারী হওয়ায় হিন্দু নরপতিদিগের মধ্যে স্বভাবতই বিলাসিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হর সেন নামক একজন গন্ধার-বাসী হিন্দু আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন এবং তিনি ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-রাজধানী পিকিনে ফিরিয়া আসিয়া চীন-সম্রাটের নিকট স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সহ আমেরিকার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হয়। হিন্দুদিগের এই উন্নতি-কালেই মেক্সিকো ও পেরু প্রদেশে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অত্যুন্নতির ফলে হিন্দু নরপতিগণের মধ্যে বিলাসিতা ও মাৎসর্য্যের প্রভাব এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, রণকর্কশ মুসলমান-দিগের হস্তে তাঁহাদিগের পদে পদে পরাজয় ঘটিতে থাকে।

ভারতবর্ষের মুসলমান শাসন কালের ইতিহাসও "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য ঘোষণা করিতেছে। মুসলমানেরা দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুদিগের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ও পুনঃ পুনঃ উত্থান-চেষ্টার জন্য তাঁহারা কখনও অধিকদিন নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। প্রথমত ভারতবর্ষ জয় করিতে মুসলমানকে যেরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল, অন্য কোনও

দেশ জয় করিতে সেরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে মুসলমানেরা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটিপ্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা।" বঙ্কিম বাবু আর একটি প্রদেশের নাম করিতে পারিতেন,—তাহা বুন্দেলখণ্ড। পূর্ব্বোক্ত জনপদ সমূহের অপেক্ষা বুন্দেলখণ্ড জয় করিতে মুসলমানকে অধিক ভিন্ন অল্প ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে দীর্ঘকালের চেষ্টায় ঐ প্রদেশ আংশিক জয় করিয়াও তাঁহারা অধিক দিন তাহা আপনাদের শাসনাধীন রাখিতে পারেন নাই। ভারতের দুই একটি প্রদেশ ভিন্ন অপর সকল প্রদেশেরই হিন্দুগণ প্রথমে মুসলমান শক্তিকে বাধা দিয়া ও তাহার পর ঐ শক্তির উপর জয় লাভ করিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিককে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

"So far as now can be estimated the advance of the English powor in the beginning of the present (19th) century alone saved the Moghal Empire from passing to the Hindus. The British won in India not from the Moghals but from the Hindus.—W. W, Huntor's History of the Indian people,

এই কারণে ভারতের মুসলমান শাসন-কালীন পঞ্চ শত বৎসরের ইতিহাসকে পরাধীনতার ইতিহাস না বলিয়া "হিন্দু সমাজের সকল জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস" নামে আখ্যাত করাই বিধেয়। এই সকল জীবন-সংগ্রামের ইতিহাসে হিন্দুদিগের পুনঃ পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,তাহাতে "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই বৈদিক বাণীর স্মরণ করিয়া ঐ কালকে হিন্দুসমাজের ত্রেতা যুগ বা ত্রেতাবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়; তাই বলিতেছিলাম, প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে ভারতে ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈদিক ঋষির মতানুসারে ত্রেতা যুগের প্রধান লক্ষণ পুনঃ পুনঃ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা। দক্ষিণাপথে, রাজপুতনায় ও পঞ্জাবে এই চেষ্টা যেরূপে হইয়াছিল, তাহার অল্পাধিক বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট বিদিত আছে। বুন্দেলখণ্ডবাসীর উত্থান চেষ্টার পরিচয় এদেশের অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত

এই কারণে এই প্রস্তাবে আমরা সেই পরিচয় দান করিবার সংকল্প করিয়াছি। দাক্ষিণাপথের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শিবাজীর নাম যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, রাজ-স্থানের ইতিহাসে প্রতাপ যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে মহারাজ ছত্রসালের নাম সেই গৌরবকর স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যচেষ্টার ফলেই সম্রাট্ আওরঙ্গ জেবের শাসনকালে বুন্দেলখণ্ডবাসী "উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি" এই বৈদিক-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

বুন্দেলখণ্ড ভারতবর্ষের কেন্দ্র-ভাগে—এই রত্ন-গর্ভা ভারত-ভূমির মধ্যবিন্দু-রূপে অবস্থিত। এই প্রদেশের উত্তর প্রান্ত খর-স্রোতা কালিন্দীর নীল জল-রাশি দ্বারা সর্ব্বদা ধৌত হইতেছে; ইহার পশ্চিম দিক্ দিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধ; স্বচ্ছতোয়া চর্ম্মন্বতী (চাম্বেল) নদী ধীর-মন্থর গমনে, তট-ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে, যমুনার শ্যাম সলিলের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ-স্থিত সাগর, জব্বলপুর প্রভৃতি সুরম্য প্রদেশ সমূহ বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্ব দিকে বাঘেল খণ্ডের অন্তর্গত, রত্ন-খনি-নিকরে পরিপূর্ণ রেওয়া প্রদেশ ও বিন্ধ্যাদ্রির চিত্রকূট-প্রমুখ শিখর-মালা। হীরক-খনির জন্য প্রসিদ্ধ পান্না চরখারী রাজ্য, ১৮৫৭।৫৮ সালের সিপাহী-বিপ্লবে লব্ধগৌরব ঝাঁসী ও কাল্পীপ্রদেশ এবং বর্ত্তমান কালের অর্দ্ধ স্বাধীন ওরছা (তেহরী), দতিয়া; সমথর, ছত্রপুর, বিজাবর ও অজয়গড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় করদ রাজ্যগুলি বুন্দেলখণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বেত্রবতী নদী ও ধসান, পহুজ, কেন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী এবং মদন-সাগর, কিরাত-সাগর, কাচনেরা, বরওয়া-সাগর, ও পাচওয়ারা-প্রমুখ যোজন-ব্যাপী প্রকাণ্ড সরোবর সমূহ এই প্রদেশের রমণীয়তা ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

মালব-প্রদেশের ন্যায় বুন্দেলখণ্ডও রাজপুত-প্রধান দেশ। বুন্দেলারা শৌর্য্য ও সাহসে ভারতবর্ষের কোনও বীর জাতীর অপেক্ষাই হীন নহেন। ইঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী। এই কারণে পাঠানদিগের সবিশেষ চেষ্টা-সত্ত্বেও এই প্রদেশের অতি অল্পাংশ-মাত্র মুসলমানের করতল-গত হইয়াছিল, কিন্তু সে আংশিক অধিকারও তাঁহারা চিরকাল সমান রাখিতে পারেন নাই। বুন্দেলা নরপতিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করিয়াছেন। মোগলদিগের আমলেও সম্রাট্‌ শাহজাহানের সিংহাসনারোহণ-কাল পর্য্যন্ত বুন্দেলারা শৌর্য্য-সহকারে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য প্রায় অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিলেন। শাহ জাহানের রাজত্ব কালে তাঁহারা দুইবার মোগল-সর্দ্দার বাকী খাঁন ও শাহবাজ খাঁনকে এবং একবার স্বয়ং সম্রাট্‌কে সম্মুখ সমরে পরাভূত করিয়া বুন্দেলখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অন্যতম দলপতি মাহোবার রাজা চম্পৎ রায়ের শৌর্য্য-বলে মোগলদিগকে বুন্দেলখণ্ডে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইতে হয়। এই কারণে সম্রাট্‌ শাহ জাহান চম্পৎ রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। চম্পৎ রায়ও মোগল-শক্তির প্রাবল্য অনুভব করিয়া কিঞ্চিৎ মস্তক অবনত করেন। তাহার পর রাজকুমার আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অভিযান-কালে চম্পৎ রায়ের নিকট সৈন্য-সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন! সিংহাসন-লাভ করিবার পর আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার-পদে নিয়োজিত করিয়া ওরছা হইতে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ জাইগির-স্বরূপ প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন দিল্লীর দরবারের প্রথম শ্রেণীর উমরাহগণের মধ্যেও তাঁহাকে প্রথম স্থান দান করা হয়। কিন্তু তেজস্বী চম্পৎ রায় এই অবস্থায় দীর্ঘকাল যাপন করিতে না পারিয়া মোগলদিগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সংঘর্ষে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রত্যাবর্ত্তন *

৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার অমৃতসর হইতে লাহোর যাত্রা কালীন একটী বিশেষ কথা মনে পড়িয়া গেল। যশোহরের পাঞ্জাবী বন্ধুরা যাঁহার নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, একবার তাঁহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম পশমীনা কাটরা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবে, কিন্তু এখন জানি-

* দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ" পত্রে আমার 'হিমালয়-ভ্রমণ' প্রবন্ধ শেষ হইয়া গেলে মনে করিয়াছিলাম, ঐ খানেই বৃত্তান্ত শেষ করিব। কেননা, আমার প্রধান বক্তব্য "ঋষিকেশ" এবং "অমৃতসর" তাহা শেষ হইয়াছে। কিন্তু

লাম, আমার অবস্থিত ছত্রের নিকটে বড় রাস্তাটিই পশমীনা কাটরা। তখন মনে মনে একটু হাসিলাম! যাহা হউক আমি বংশীধর বাবুর সন্ধানে বাহির হইয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাঁহার দোকানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পত্র খানি দিলাম। তিনি আমাকে দোকানের উপর বসাইয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র মুরলীধরও উপস্থিত ছিলেন। পিতা-পুত্রে পত্র পড়িয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অনুযোগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন প্রথমেই এখানে আসেন নাই?" আমি বলিলাম, যদিও এ সহরে আমার কেহই পরিচিত ছিলেন না তথাপি ভগবানের কৃপায় আমার কোনো অভাব বা কষ্ট হয় নাই; এক্ষণে আপনারা আমার ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। তারপর বংশীধর, মুরলীধর আমাকে কয়েক দিন তাঁহাদের গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি কাতরভাবে বলিলাম, আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না, আজই রাত্রে লাহোর যাত্রা করিব। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু সৎ প্রসঙ্গ হইল। মুরলীধর, সুন্দরমূর্ত্তি, কোমল-হৃদয়, সাধু-ভক্তানুরাগী যুবক। স্বভাবটি বেশ শিষ্য-প্রকৃতির; তাঁহাকে আমার খুব ভাল লাগিল। অবশেষে আমি আজই চলিয়া যাইতেছি বুঝিয়া অন্তত রাত্রির জন্য আমাকে তাঁহারা আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে "এখানে এক মহাত্মা আছেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "এখন আমি সহরের বাহিরে ক্যানেল-ধারে বেড়াইতে যাইব মনে করিয়াছি।" "তাঁহারা বলিলেন, বেশতো মহাত্মার আশ্রমও সেই খানে"

এখনো পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "প্রত্যাবর্ত্তন কালীন আরো বক্তব্য আছে কি না?" তদ্দ্বারা এই বুঝা গেল যে, তাঁহারা আরো শুনিতে চাহেন! আমিও বাস্তবিক দেখিতেছি প্রস্তাব শেষ হয় নাই। দেশে ফিরিবার কালীন নানা স্থান হইয়া আসিতে আসিতে ভগবানের যে সকল করুণার পরিচয় পাইয়াছি,—যাহা বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে একান্ত সুখ-পাঠ্য যদি পাঁচটি আত্মাও তাহা শুনিতে চাহেন, আমার অপ্রকাশ রাখা উচিত নহে। এই জন্যই আমি আমার "প্রত্যাবর্ত্তন" কাহিনী বলিতে বাধ্য হইলাম।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

এই বলিয়া "তরণ তারণ বাগ" তাঁহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন। বেলা তখন প্রায় ৪টা। আমি বোধ হয় ক্রমাগত সহরের দক্ষিণ দিকেই গেলাম, কেন না, রাত্রে ট্রেণে চলিয়া প্রাতে কোনো সহরে নামিলে প্রায়ই দিক-ভ্রম হইয়া থাকে। আমি কোনো কোনো স্থানে সূর্য্য দেখিয়া দিক ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম। দুই মাইল গিয়া অনুসন্ধানের পর "তরণ তারণ বাগ" উদ্যান-বাটীকা পাইলাম। সেটা নানাবিধ ভিখারী-সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটা আড্ডা বিশেষ। মহাত্মা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কেহ কেহ একটু ভিতরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমি যখন মহাত্মার কুটীরের (পাকা ঘর) দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি হাত মুখ ধৌত করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। আমি একটু অপেক্ষা করিলে তিনি আসিয়া আমাকে বসিতে আসন দেখাইয়া দিলেন। তিনি প্রশান্ত-মূর্ত্তি, প্রৌঢ়বয়স্ক সুশ্রী পুরুষ। ব্যাঘ্র-চর্ম্মের এক পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মাথার টুপিটি পর্য্যন্ত ঐ এক প্রকার চর্ম্মের। শয্যাদিও ব্যাঘ্র-চর্ম্মের। আমার দুই চারিটি কথায় বোধ হয় তিনি আমার উদ্দেশ্য ও ভাব বুঝিয়া লইলেন। তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহারও আভাষ পাইলাম। কিন্তু কেন জানি না, তিনি এ মূর্খের প্রতি অল্পক্ষণেই অত্যন্ত স্নেহ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে কয়েক দিন সেই স্থানে থাকিতে বলিলেন। আমি কুণ্ঠিত-ভাবে জানাইলাম যে, আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। অদ্যই লাহোর যাত্রা করিব।

আমি বাস্তবিক সাধু কিম্বা ভক্ত নহি; কেবল ভগবানের কৃপায় কিছু কাল তাঁহার পথে পড়িয়া থাকিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সংসারে পিতৃ-মাতৃ-স্নেহই হউক বা প্রীতি-প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যেই হউক, যে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনো কোনো সাধু ভক্তের মধ্যে একাধারে প্রকাশ পায়। বোধ হয় তাহার কারণ, ভগবানে সকল ভাব গুলি একাধারেই কেবল বর্ত্তমান, ভক্ত, ভগবানেরই ক্ষুদ্র-আদর্শ, সুতরাং ভক্তের সেই প্রকার ভাব হওয়া স্বাভাবিক। আজ এই সাধুর মধ্যে যেন সহসা সেইরূপ এক আশ্চর্য্য ভাবের বিকাশ দেখিলাম। সাধুজী আমার কথায় যেন একটু দুঃখিত হইয়া; আমার মুখের দিকে "ফ্যাল ফ্যাল" করিয়া চাহিতে লাগিলেন। সেই চাহনির মধ্যে যেন কি এক স্নেহভাব প্রকাশ পাইতেছিল। তাহা মাতৃ-স্নেহ কিম্বা পিতৃ-স্নেহ-ভাব বলিব তখন ঠিক যেন বুঝিতে পারি নাই! তারপর তিনি মৃদুস্বরে

বলিলেন,—"কুছ চাইয়ে ?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, আপলোককেঁা কৃপাসে সব কুছ পুরা হয়।" তথাপি বলিলেন "তব্ বি কুছ কুছ ?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমার গাত্রে পাত্‌লা কাপড়ের 'যাদশাপদ্ম" পিরাণটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা একটো কুরতা চাইয়ে, আচ্ছা, বৈঠ।" তারপর একটি টাকা আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন,—"বংশীধরকো বোল্‌না কুরতা বানায় দেগা।" অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনাটি হইল বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য ইহার একটি অব্যক্ত স্মৃতি মনে রহিয়া গিয়াছে !

বেলা শেষ হইয়া আসিল, ক্যানেলের দিক দিয়া সহরে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ছত্র হইতে আসন লইয়া দ্বারবানের নিকট বিদায় হইলাম। বংশীধরের দোকানে আসিতে একটু রাত্রি হইল। তথায় কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া সেই রাত্রেই (সময় ডায়রীতে লেখা নাই) লাহোর যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব দিন অমৃতসরের একটি বাঙালী ভদ্রলোক আপনা হইতে একখানা ইনটার ক্লাস টিকেটের দাম দিয়াছিলেন। (ক্রমশ)

দৃষ্টি

আমি আপনারে নাহি জানি যত খানি
তার চেয়ে বেশী মোরে জেনেছ কি তুমি ?
কোথা স্বর্ণ-খনি মোর কোথা রত্ন-ভূমি
তুমি রাখ সে সংবাদ ! আমি যা' না জানি
আছে কি না আছে মোর ত্রি-সীমার মাঝে
তুমি অনায়াসে আসি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
দেখাইয়ে দিলে কোথা গোপনে বিরাজে
অজ্ঞাত সম্পদ মোর ! তবু ভালবেসে
হয়েছ কি সর্ব্বদর্শী, নখর-দর্পণে
হেরিছ কি যুগপৎ ভূত ভবিষ্যৎ—
সম্পূর্ণ করিয়া মোর সমগ্র জীবনে ?
চির দারিদ্র্যের তরে ঐশর্য্যের পথ
এখনো রয়েছে খোলা, হে রমা আমার
মোর বক্ষে থাকে যদি তোমার ভাণ্ডার।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

দক্ষিণ রায়

যাঁহার ভুজবলে ব্রাহ্মণ নগরাধিপ মুকুট রায় বহুদিন পর্য্যন্ত নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহার নিকট বার বার পরাজিত হইয়া পাঠানেরা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাঁহার প্রতাপে ব্যাঘ্র, কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রাণি-হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। যিনি ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়া সুন্দর বনাঞ্চলে এখনও পূজিত হইয়া থাকেন। যাঁহার উদ্দেশে 'রায় মঙ্গল' পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। যে বীর-পুরুষের নামে বাঙালী নাম ধন্য হইয়াছিল, তাঁহার বিশেষ পরিচয় যে কেহই অবগত নহেন,—ইহা কি নিরতিশয় দুঃখের বিষয় নহে ?

গৌড়ের পাঠান বাদশাহদিগের রাজত্বকালে ইছামতী হইতে ভৈরব-তীর পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গুড় উপাধিধারী পরে 'রায়' ও "রায় চৌধুরী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অধুনা—যশোহর নামে পরিচিত ভূভাগ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার ছিল। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও যশোহর জেলার অনেক স্থানে বাস করিতেছেন। অনেকের ভূসম্পত্তিও আছে।

গুড় বংশীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, যৎকালে পাঠানেরা গৌড় অধিকার করে তখন আধুনিক যশোহর জেলার অন্তর্গত ভূভাগ অনেক নদ নদী খালে বিলে পূর্ণ ছিল। নদীতীরস্থ ভূভাগে কৈবর্ত্ত জাতির বসতি ছিল। তাহাদের বংশধরগণ এখন রাজবংশী নামে খ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রদত্ত জল ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল জেলে-রাজার আশ্রয়ে আসিয়া গুড় ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারাই রাজবংশীদিগকে জলাচরণীয় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া তাহারা অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল অথবা কার্য্যতঃ করিয়াও থাকিবে। সেই জন্য গুড় ঠাকুরেরা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া আপনারা রাজা হইয়াছিলেন এবং পাঠান আমলে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। যখন মুসলমানেরা ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিল তখন অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গুড় মহাশয়েরাই প্রথম নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে

চেঙ্গটিয়ার ভূস্বামী কামদেব ও জয়দেব, সর্ব্বপ্রথম স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়েই 'পিরালী' থাকের সৃষ্টি হয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে যে সকল ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য ছিল তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ নগর (বা লাউজানি) প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মুকুট রায় এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। উত্তরে ঝিনাইদহ হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। নবাব খাঁ জাহান আলীর সময় হইতে তাঁহারা মুসলমানের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, বটে কিন্তু সে অধীনতা নাম মাত্র। রাজা মুকুট রায়ের নিজের সৈন্যদল, সেনাপতি নৌসেনা প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জার অভাব ছিল না। রাজা মুকুট রায় অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি মুসলমানের অধীন হইলেও কখন মুসলমানের মুখ দেখিতেন না। মুসলমানের সহিত আলাপ করিতেন না। মুসলমান পথিক, ফকির বা ব্যবসায়ীকে রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। কিন্তু এই গোঁড়ামী পরিণামে তাঁহার ধ্বংশের কারণ হইয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি বিলক্ষণ মুসলমান-দ্বেষী হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ রায় মুকুট রায়ের আত্মীয় ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি যেমন রূপবান তেমনই দৈহিক-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অসীম শক্তির অনেক প্রবাদ আছে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য তিনি সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা মুকুট রায়ের নগরে "মুকুটেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দক্ষিণ রায় তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিলেন। শিব পূজা না করিয়া তিনি কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার শারীরিক বল ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণানুবাদ তাঁহার পরম শত্রু মুসলমানগণের মুখে আজও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ আছে যে, কোন সময় দক্ষিণ রায় নদীতে নামিয়া স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় এক বৃহদাকার কুমীর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি পদাঘাতে কুমীরের দাঁতের পাটি উড়াইয়া দেন এবং কুমীরের মৃত-দেহ জলে ভাসিতে থাকে। যে সকল মুসলমান বীর ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন ইতিহাসে তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু যে সকল বাঙালী বীর ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র লাউসেন ভিন্ন আর কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই! দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্রের দেবতা

বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন কিন্তু কিরূপে তিনি এই পূজা পাইয়া আসিতেন তাহা সকলে অবগত নহেন। আমাদের দেশে যখন নীলকর সাহেবেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন তখন সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত যে, নীলকর ওয়াই সাহেবের নামে কুমীর বা বাঘ হিংসা করিত না। তাঁহার নামে দোহাই চলিত দক্ষিণ রায় সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তবে বেশীর ভাগ, তিনি অস্ত্র সাহায্য না লইয়া অনেক বাঘ কুমীর বধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার শত্রুগণের রচিত পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমান সেনাপতি গোরাগাজি বা পীর গোরাচাঁদ যখন ব্যাঘ্র সৈন্য লইয়া মুকুট রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন দক্ষিণ রায় বাহুবলে তাঁহাকে বার বার পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মুসলমানেরা কিরূপে ব্রাহ্মণ-রাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইল তাহা বারান্তরে বলিব।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহাপুরুষ মোহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার

আবুবেকরের প্রতি অত্যাচার। *

যে দিবস (হজরতের পিতৃব্য) হম্জা এস্লামধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই দিবস আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা এই ;—যাঁহারা এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান নামে অভিহিত হন। এপর্য্যন্ত উনচত্বারিংশৎ লোকমাত্র মোসলমান হইয়াছিলেন। উনচল্লিশ জন বিশ্বাসী দলভুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আবুবেকর হজরতকে বলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আর কেন এসলামধর্ম্ম গুপ্ত রাখিব, দলবদ্ধ হইয়া সকলে কেন প্রচার করিব না?" মহাপুরুষ মোহম্মদ কহিলেন, এখনও "এবিষয়ে সম্পূর্ণ বল লাভ হয় নাই।" আবুবেকর তদ্রূপ প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে হজরতকে দৃঢ় অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সদলে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং কাবার প্রাঙ্গণে যাইয়া বসিলেন। আবুবেকর দাণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। উপদেশে এস্লামধর্ম্ম গ্রহণের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করা হয়। পৌত্তলিক কোরেশদিগের নিকটে তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়া উঠে।

* স্বর্গীয় মহাত্মা গিরিশ্চন্দ্র সেন কৃত "মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত" হইতে উদ্ধৃত।

তাহারা মোসলমানদিগকে গুরুতররূপে আক্রমণ করে। প্রথমতঃ আবুবেকরকে আক্রমণ করে। রবয়ের পুত্র আতবা আবুবেকরের মুখে এরূপ পাদুকা প্রহার করে যে, দৃঢ় আঘাতে তাঁহার নাসিকা চূর্ণ হইয়া মুখ মণ্ডলের সঙ্গে সমতল হইয়া যায়। তমিম পরিবারের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া আবুবেকরকে সেই নির্দ্দয় শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন ও তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহে লইয়া যান। সেই দিন তাঁহার ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছিল, দিবারাত্রি চৈতন্য ছিল না। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথমতঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, "হজরত মোহম্মদের অবস্থা কিরূপ ?" আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ভৎসনা করিয়া বলিল, "চুপ কর, মোহম্মদের নিমিত্ত তোমাকে এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইল তুমি এক্ষণও সেই প্রকার তাহার জন্য উন্মত্ত!" মাতা ওম্ম খয়র অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, যে পর্য্যন্ত হজরত কিরূপ আছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত না হইব তাবৎ অন্ন গ্রহণ করিব না।" জননী বহু কাকুতি মিনতি করিলেন, কোন ফল দর্শিল না। অনন্তর আবুবেকর স্বীয় মাতাকে হজরতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য খেতাবের কন্যা ওম্মজমিলের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ওম্মজমিল স্বয়ং আবুবেকরের নিকটে আসিয়া বলেন, "চিন্তা নাই হজরত কুশলে আছেন।" আবুবেকর বলিলেন "আমি সংকল্প করিয়াছি যে, প্রেরিত পুরুষকে দর্শন না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না।" এই বলিয়া তিনি নিশার আগমন পর্য্যন্ত কিছুই ভোজন করিলেন না। রাত্রিকালে রাজপথ জনশূন্য হইলে উক্ত দুই মহিলা আবুবেকরকে উঠাইয়া হজরতের নিকটে লইয়া যান, হজরত তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন দান করেন। অন্য মোসলমান সকল প্রেমালিঙ্গন দেন। সকলে তাঁহার ক্লেশ যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবুবেকর বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, দুরাত্মা আত্‌বা আমার মুখে যে আঘাত করিয়াছে, এই ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা ব্যতীত আমার অন্য কোন ক্লেশ নাই, এক্ষণে আমার জননী আপনার নিকট উপস্থিত, আপনি প্রার্থনা করুণ যেন ঈশ্বর তাঁহাকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন।" তখন হজরত মোহম্মদ আবুবেকরের জননী ওম্মখয়রের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, তদনুসারে ওম্মখয়র দীক্ষিতা হন। হজরত বন্ধুবর্গ সহ সেই গৃহে কয়েকদিন স্থিতি করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সংবাদ

পাসের কথা—গোবরডাঙ্গা জমিদার পরিবারের পরলোকগত ছোট বাবু প্রমদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় হেয়ারস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সংবাদ যথা সময়ে জানিতে না পারায় গতবারের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইণ্টার মিডিএট্ পাস—কুশদহ-বাসী কত ছাত্র নানা স্থান হইতে ইণ্টার-মিডিএট্ পাস করিয়াছে, তাহার সমস্ত সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে; যে কয়েকটির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান মুরারীধর কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আই এ, প্রথম বিভাগে; বেড়গুম নিবাসী শ্রীযুক্ত-ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্কটীস চার্চ্চ হইতে আই এ, প্রথম বিভাগে; ও পরলোকগত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হাজারীবাগ সেণ্ট কলম্বস কলেজ হইতে আই-এ, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বালিকা পাস—আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গোবর-ডাঙ্গার অন্তর্গত সুলতানপুর নিবাসী ডাক্তার কাজি আবদল গফ্‌ফরের কন্যা কুমারী সোফিয়া বেথুন কলেজ হইতে আই-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এখানে ডাক্তার কাজি সাহেবের একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাজি আবদল গফ্‌ফর সাহেব ৩৫ বৎসরাধিক কাল হইতে ধর্ম্ম সাধন, ও পারিবারিক শিক্ষা বিধান এবং সমাজ-সংস্কার ব্রতে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী, নিষ্ঠাবান, নিরামিষ-ভোজী সাধক। এ বিষয়ে তাঁহাকে তৎপ্রদেশস্থ মোসলমান সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলা যায়।

বনগ্রাম হাই স্কুল—বর্ত্তমান ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় মহকুমা বনগ্রাম হাই স্কুল, প্রথম হইয়াছে। প্রেরিত ৪টি ছাত্রই প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া, একটি প্রথম ২০৲ টাকা, দুইটি ১০৲ টাকার স্কলারসিপ্ প্রাপ্ত হইয়াছে। কুশদহবাসীর পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই আহ্লাদের সংবাদ যে, গোবরডাঙ্গা-গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, বনগ্রাম স্কুলের হেড্ মাষ্টার।

বান্ধব-পুস্তকালয় —জ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, আলোচনার্থে সাধারণ পুস্তকালয় (লাইব্রেরী) যে বিশেষ অনুকূল তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে ঐরূপ একটি শুভ চেষ্টা হইয়াছিল; তখন সময় তেমন অনুকূল হয় নাই, এক্ষণে সময়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ভগবানের কৃপায় গোবরডাঙ্গার কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। আমরা আশা করি এই পুস্তকালয় যেন কেবল নাটক নভেল পড়িবার স্থান মাত্র না হইয়া, যাহাতে জ্ঞান এবং নীতি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন জন্য সদালোচনার স্থান হয়, উদ্‌যোগীগণ তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। দ্বিতীয় কথা দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রকৃত প্রণালীতে ইহার নিয়মাবলী গঠন করা আবশ্যক। লাইব্রেরীর নাম "কুশদহ বান্ধব পুস্তকালয়" রাখা যদি সকলের মত হয় তবে তাহাই রাখিলে ভালো হয়।

আবার শোক-সংবাদ —কুশদহ তাম্বুলী সমাজে ভালো ছেলের সংখ্যা অতি কম। তাহার মধ্যে যদি কেহ অকালে পরলোকে চলিয়া যায়, তবে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। এই অল্পদিন হইল আমরা গৌরহরিকে ইহলোকে হারাইলাম! আবার বিগত ১৫ই আষাঢ় শুক্রবার খাঁটুরা এবং কলিকাতার কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখমগোপালের পরলোক গমন বার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মাখমগোপাল বাস্তবিক একটি ভালো ছেলে ছিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে এণ্টান্স পাস করিয়া ফাষ্ট-আর্ট পড়িবার জন্য সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইবার পরই ব্যারামের সূচনা হয়, এবং দেড় বৎসরাধিক কাল কত চিকিৎসা ও স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও শেষে কিছুই হইল না। ভগবান, তোমার কি খেলা? তুমি ইহাদিগকে লইয়া গিয়া ভবিষ্যতের জন্য কোন্ রাজ্য গঠন করিতেছ, তাহা তুমিই জান, আমরা আর কি বলিব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মাখমগোপালের জননী তো আগেই সে লোকে গেলেন; এখন ভব-পান্থের শ্রান্ত-পথিক, শোকার্ত্ত পিতার প্রাণে তুমি ভিন্ন আর কে সান্ত্বনা দান করিবে।

সচ্চেষ্টা।—অধিকাংশ পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে সুতরাং তাহার লোক যাত্রা নির্ব্বাহকর পাঠশালা, স্কুল, পথ ঘাট, পোষ্টাপিস প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য-প্রণালীগুলির অবস্থাও ভালো রাখা কঠিন হইয়া পড়ি-

তেছে। আমাদের একটা কথা ভাবা নিতান্ত আবশ্যক এই যে, আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ভবিষ্যৎ বংশ, আমরা কি তাহাদের জন্য কার্য্য করিতে দায়ী নহি? দেশের স্কুল পাঠশালা গুলি যদি উঠিয়া যায় তবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে?—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গোবরডাঙ্গা—ইছাপুর নিবাসী বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের স্কুল এবং পোষ্টাপিস প্রভৃতির অবস্থা ভালো করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শ্রাবণ সংখ্যা "কুশদহ" আকারে এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু বার্ষিক চাঁদা পূর্ব্ববৎ ১৲ টাকাই রহিল। আমরা নূতন গ্রাহক চাই; এবং পুরাতন গ্রাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র চাঁদা প্রেরণ করুন।

গ্রন্থ-পরিচয়

শেফালিগুচ্ছ—শ্রীমতী সুকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত; এবং তথা হইতে শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য বারো আনা মাত্র।

এখানি কবিতা পুস্তক, লেখিকার এই প্রথম উদ্যমে কোনোরূপ অস্বাভাবিকতা বা অস্পষ্টতা নাই দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। কবিতাগুলি বেশ প্রাঞ্জল, মধুর ও সদ্ভাবপূর্ণ। বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার এই সব অমৃতময় ফল, স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধীদিগকে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ করিবে। এই কবি অবরোধ-বাসিনী মহিলা, বর্ত্তমান সময়োপযোগী উচ্চশিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ ইঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু ইনি কবি—তাই হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগগুলি, অন্তরের একান্ত নিজস্ব ভাবগুলি স্বতইবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনোরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধার অপেক্ষা করে নাই। কবিতাগুলিতে আবেগ আছে,—স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে,—অশ্রুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান আছে,—বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা আছে। সাধনা করিলে এই কবি কালে কাব্য-সাহিত্যে আপনার পথ করিয়া যশোলাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ সুন্দর দিব্য নয়ন-রঞ্জন হইয়াছে। সমালোচক।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Massine Press
35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from
28/1 Sukea Street, Calcutta

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। ভাদ্র, ১৩১৮ ৫ম সংখ্যা।

নূতন-গান

(মিশ্র জয়জয়ন্তি—দাদ্‌রা)

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই ত, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অদ্বৈত-জ্ঞান

বা

জ্ঞানীর লক্ষণ

তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধন-পথে চলিতে চলিতে সাধকের পক্ষে প্রায় এমন একটী অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন তিনি মনে করেন, "আমি 'আত্ম-তত্ত্ব-বিদ্যা' লাভ করিয়াছি।" ইহা মনে করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন,—আনন্দিত হন। কিন্তু উন্নতিশীল সাধকের পক্ষে এ আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

অজ্ঞানতার মূল কারণ "দেহাত্মিকা বুদ্ধি" অর্থাৎ এই দেহই 'আমি', এই বুদ্ধির নাম দেহাত্মিকা বুদ্ধি। জ্ঞানের মূল কারণ "নিত্যানিত্য-বিবেক" অর্থাৎ নিত্য বস্তু কি? অনিত্য বস্তুই বা কি, এই প্রকার বিচার-বুদ্ধির নাম নিত্যা-নিত্য-বিবেক। দেহ 'আমি' এই ভ্রান্তি হইতে 'আমার' সংসার এই ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে বলে 'মায়া-মোহ'। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিত্ত, এই প্রকার ধারণা মায়া-মোহের মূল। মোহ অবসানে বা জ্ঞানোদয়ে আমি দেহ নহি,—আমি আত্মা, আমি স্থূল বস্তু নহি, কিন্তু পরমাত্মা—পূর্ণ-জ্ঞান চৈতন্যের অংশ মাত্র, সুতরাং আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার নহে, ভগবানের স্বরূপাংশ মাত্র. এ জগৎ সংসার সকলই ভগবানের। আমি আত্মা, আমার প্রকৃত স্বরূপ যাহা, তাহা জ্ঞানের স্বরূপ, চৈতন্যেরই স্বরূপ; আমি আত্ম-স্বরূপে জরা-মরণাতীত অবিনাশী পদার্থ; আমি সংসারের মোহ-বদ্ধ জীব নহি। এই তত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলে আত্ম-জ্ঞানের একটি প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায়। এই জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রথম সোপানে আরোহণকারী নব-জীবন প্রাপ্ত সাধকের পক্ষে আনন্দের দ্বিতীয় কারণ এই যে, তখন তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত মানুষ অনুভব করেন। তাঁহার ভাব, ভাষা, রুচি এবং কামনা সমস্তই জীবনের মূল উদ্দেশ্যাভিমুখীন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নূতন মানুষ করিয়া তোলে। ভগবানের ইচ্ছা পালন ভিন্ন তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য থাকে না। আপনাকে অকিঞ্চন—দাসানুদাস রূপে পরিণত করিতে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া, নর-সেবায় আপনাকে অর্পণ করিতেই তাঁহার বাসনা

প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু সেবার কার্য্য করিতে করিতে সাধক পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হন। কেন যে এমন হয় প্রথমে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি যাহা করিতে চান, যেন্ন তাহা গড়িয়া উঠে না। বার বার চেষ্টা ভাঙিয়া পড়ে; কখনো কখনো অবিশ্বাস আসিয়া মনে হয়, তবে কি আমি যাহা করিতেছি তাহা ভুল করিতেছি; বিশ্বাস তখনো ভিতর হইতে বলে, না, ভুল কোথায় ? অগ্রসর হও, সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে!

মানুষ যে আপনাকে "আমি" বোধ করে, তাহা মৌলিক। এই আমি বোধ না হইলে মানব, চেতনা-রাজ্যে, জীব-চৈতন্য বা জীবাত্মা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইত না। জড় আপনাকে "আমি" বোধ করে না, বৃক্ষ লতারাও করে না; ইতর প্রাণিগণ করে মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞান,—সেই বোধ-শক্তি অমুক্ত; মানব-জ্ঞান মুক্ত, স্বাধীন, অনন্তমুখীন।

এই "আমি" জ্ঞান প্রথমে স্থূল প্রকৃতি জড়িত হইয়া দেহ "আমি" জ্ঞান হয়। তারপর ক্রমে উন্নত হয়; শেষ পুনরায় সেই 'আমি' জ্ঞানই উন্নত জ্ঞান-পথের বিঘ্ন জনক হয়। "দেহাত্মবুদ্ধি" চলিয়া গেলে, 'আমি' আত্মা এই জ্ঞান লাভের পরেও মনে হয়, আমি এই অনন্ত-বিশ্বের মধ্যে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি; জগৎ, ব্রহ্ম এবং আমি এক একটি ভিন্ন অস্তিত্বের, এই ধারণা অজ্ঞানতা মূলক, সুতরাং পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী। ইতিপূর্ব্বে না হয় স্থূল ভাবে দেহ "আমি" বোধে আপন স্বতন্ত্রতা অনুভব করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবে আত্মা "আমি" জ্ঞান করিতেছি। জগৎ ও ব্রহ্মের সহিত আমার অস্তিত্ব যে এক, আমি যে জগৎ এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহি, একথা হয়তো বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, বারম্বার বলিতেছি, তথাপি বাস্তবিক স্বরূপ-তত্ত্বে আমার সে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দ্বৈত-জ্ঞান পরিচালিত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র "আমি" বোধ করিতেছি।

দেহ "আমি" জ্ঞানের অবসানে আত্মা "আমি" জ্ঞানে অজর, অক্ষয়, অশোক হইয়া অনেক আনন্দ পাইলাম—সেবার কার্য্যেও অনেক আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম, কিন্তু আমি যাহা চাই তাহা এখনো পাইলাম না, কি যেন এক বাধা আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। আমি এখনো কেন অনাবিল আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারিতেছি না ?

এইরূপে চলিতে চলিতে সাধক, ভগবৎ প্রসাদে যখন প্রকৃত 'অদ্বৈত-জ্ঞান-তত্ত্ব' শ্রবণ করেন, তখন বলেন "হায়! আমি এত দিন কি

করিতেছি কি ভাবিতেছি আজিও যে আমার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই।”

আত্ম-জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায়, ‘অদ্বৈত-জ্ঞান’ লাভ হয়; তখন বুঝিতে পারি “আমি” স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি কিছুই নহি। আমি এই বিশ্বের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। আমার যে স্বতন্ত্র জ্ঞান, সে কেবল সংজ্ঞা মাত্র, প্রকৃত পক্ষে আমি স্বতন্ত্র কিছুই নহি। এই জ্ঞান অতীব দুর্লভ;—এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সমপ্রাণতা উপস্থিত হয়, প্রাণী মাত্রের বেদনা এবং আনন্দ অনুভূত হয়, কোনো প্রাণী হইতে বাধা পাই না, আমার হইতেও কেহ বাধা প্রাপ্ত হয় না। নর-সেবার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব-ভাব-শূন্য হইয়া কিছুতেই আনন্দের অভাব হয় না; কোনো দিন জ্ঞানে অবসাদ—প্রেমেও শুষ্কতা আসে না; সে অকথিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা কে করিতে পারে?

ঘোর অজ্ঞান কে? যে বিশ্বপ্রাণ হইতে আপনাকে পৃথক মনে করে। জ্ঞানী বিশ্বপ্রাণেই প্রাণীরূপে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন দর্শন করেন। কবে সে দৃষ্টি লাভ হইবে?

বুন্দেলখণ্ড-কেশরী

মহারাজ ছত্রসাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চম্পৎ রায় যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার পুত্র ছত্রসালের বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর ছিল। ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া সোমবারে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোনও বন প্রদেশে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম কালে মোগলদিগের সহিত তাঁহার পিতা চম্পৎ রায়ের ঘোর বিগ্রহ চলিতেছিল। কথিত আছে যে, সপ্তম মাস বয়ক্রম কালে একদা তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইতে হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া ছিলেন। তাঁহার বাল্য জীবনের প্রথম চারি বৎসর মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। সপ্তম বর্ষ বয়ক্রম কালে ছত্রসাল বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য সে কালের রীতিক্রমে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই দেশীয় কাব্য, সাহিত্য, গণিত ও নীতি-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভের সহিত যুদ্ধ-বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া

উঠেন। ছত্রসালের জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-বিদ্যায় অতিবাহিত হইলেও তিনি বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে 'কবি-বৎসল' অর্থাৎ পণ্ডিত ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বলিয়াছি;—ছত্রসাল ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা চম্পৎ রায়ের মৃত্যু হয়। সেই সুযোগে কতিপয় দেশদ্রোহী বুন্দেলা-সর্দ্দার মোগলদিগের সাহায্যে চম্পৎ রায়ের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সম্রাটের প্রীতি-ভাজন হইলেন। কিন্তু যুবক ছত্রসাল ইহাতে হতাশ না হইয়া তাঁহার জননীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ ও সেই অর্থের বলে একটি ক্ষুদ্র সেনা-দল সংগঠন করিলেন। সেই সেনা-দলের সাহায্যে দিল্লীশ্বরের প্রতিকূলতা করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়া, তিনি প্রথমে শক্তি-সঞ্চয়ের আশায় দিল্লীশ্বরের রাজপুত সেনাপতি মহারাজ জয়সিংহের অনুরোধে, বাহাদুর খান নামক জনৈক মোগল সেনাপতির অধীনতায় স্বীয় সৈন্যদল লইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। কিন্তু প্রথম অভিযানের পরেই তিনি সম্রাটের ব্যবহারে অতীব বিরক্তি অনুভব করায়, জীবনে আর কখনও কোনও প্রকারে মুসলমানের অধীনতা-স্বীকার করিবেন না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই সময়ে মহাত্মা শিবাজী দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোগলদিগের সহিত সংগ্রামে যশস্বী হইতেছিলেন। তরুণ ছত্রসাল তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। মহারাজ শিবাজীর অধীনতায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ-পূর্ব্বক তিনি চিরপ্রদীপ্ত শত্রুতানল শান্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভীমা নদীর তীরে নবীন মহারাষ্ট্র-পতির সহিত সেই তরুণ ক্ষত্রিয়-কুমারের সাক্ষাৎকার ঘটে। মহারাজ শিবাজী তাঁহাকে আশ্রয় দান করিতে বিমুখ হন নাই। শিবাজীর সেনানীদিগের সাহচর্য্যে অব্যবস্থিত যুদ্ধ-কৌশলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ও রণক্ষেত্রে কয়েক বার স্বীয় স্বাভাবিক শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া ছত্রসাল অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখন মহাত্মা শিবাজী, তাঁহাকে আর দক্ষিণাপথে শক্তিক্ষয় না করিয়া স্বদেশে গমন পূর্ব্বক মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদ-সহকারে বুন্দেলখণ্ডে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে উপদেশ দান করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি তাঁহাকে স্বীয় ইষ্ট দেবতা ভবানীর প্রসাদ-চিহ্ন-স্বরূপ একটি তরবারি

দান করিয়া ও প্রয়োজনমত তাঁহাকে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় করেন। এই সময়ে মহাত্মা শিবাজী ছত্রসালকে যে বীরত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,মৎপ্রণীত "ঝাঁসীর রাজকুমার"-নামক পুস্তকে তাহা বিস্তারিত-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর উপদেশামৃত পানে ও প্রয়োজনমত তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় উৎসাহিত হইয়া ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময়ে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ডের দেবমন্দির সমূহ ভগ্ন করিয়া তত্তৎস্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুবেদার ফিদাই খানের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাপি বুন্দেলা সর্দ্দারগণ ও তাঁহাদের অধিপতি ওরছার রাজা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চ-বাচ্য করিতে সাহসী হন নাই। কারণ, মোগলদিগের সাম্রাজ্য-বৈভব-দর্শনে তাঁহাদিগের চিত্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। দেশের পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কোনও প্রকার সহায়তা-প্রাপ্তির সবিশেষ আশা নাই দেখিয়া, ছত্রসাল সাধারণ বুন্দেলা প্রজার হৃদয়ে স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রাণনাথ প্রভু নামক জনৈক সন্ন্যাসী দেশবাসীগণকে স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে 'সমর্থ' রামদাস স্বামী ও শিবাজীর সম্মিলনে যেরূপ শুভ ফলের উদ্ভব হইয়াছিল, বুন্দেলখণ্ডে প্রাণনাথ প্রভুর সহিত ছত্রসালের সম্মিলন বহু পরিমাণে সেইরূপ শুভকর হইয়াছিল। ইঁহাদিগের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই তেজস্বী বুন্দেলা জাতি স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া ছত্রসালের নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মভাব-প্রমত্ত জনসাধারণকে মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘোরতর উত্তেজিত দেখিয়া ওরছার রাজা সম্রাটের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জনসাধারণের সহিত মিলিত হইবামাত্র হিন্দু মুসলমানে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল।

ছত্রসালের সৌভাগ্যক্রমে প্রথম যুদ্ধেই জাতীয় দলের বিজয়-লাভ ঘটিল। সুবেদার ফিদাই খাঁন সসৈন্যে পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বহুসংখ্যক বুন্দেলা সর্দ্দার ঔদাসীন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ছত্রসালের দলে আসিয়া মিলিত হইলেন। যে সকল সর্দ্দার মোগল সম্রাটের

মঙ্গলকামী হইয়া চম্পৎ রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও জাতীয় দলের প্রাবল্য অনুভব করিয়া ছত্রসালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তখন ছত্রপতি শিবাজীর অনুকরণে ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডের গিরিদুর্গগুলি ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন-প্রধান অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতি-ক্রমে মুসলমান রাজশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোগল শাসন বিলুপ্ত হইল। বহু মোগল সর্দ্দার ছত্রসালের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বুন্দেলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহার দমনের জন্য ত্রিংশৎ সহস্র অশ্ব-সাদী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ কয়েক জন বড় বড় সেনাপতিকে বুন্দেলখণ্ডে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ছত্রসালের নেতৃত্বে পরিচালিত বুন্দেলাগণের বিক্রমে সম্মুখ সমরে সেই বিশাল মোগল বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। ইহার পরেও আওরঙ্গজেব বহুবার বুন্দেলখণ্ডে মোগলসৈন্য প্রেরণ করিয়া ছত্রসালের দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ছত্রসাল রাজা উপাধি ধারণ-পূর্ব্বক বুন্দেলা বীরগণের সাহায্যে ক্রমশঃ মোগল-শাসিত দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ আক্রমণ করিয়া বাহু-বলে "চৌথ" আদায় করিতে লাগিলেন। বুন্দেলা জাতির এই স্বাধীনতা-লাভার্থ সমর-কালে প্রাণনাথ প্রভু বহুবার তাঁহাদিগকে আশ্বাস ও উপদেশ দান করিয়া কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু-কালে রাজা ছত্রসালের রাজ্যের আয় কিঞ্চিদধিক এক কোটি টাকা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সম্রাট্ বাহাদুর সাহ বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন রাজ্য ও রাজা ছত্রসালকে বুন্দেলাদিগের প্রকৃত নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তরে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে চাম্বেল নদী হইতে পূর্ব্বদিকে রেওয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

মহাত্মা শিবাজীর উপদেশ-ক্রমে পরিচালিত হইয়া রাজা ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানগণ সহজে বুন্দেলখণ্ডের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। অবসর পাইলেই তাঁহারা ঐ প্রদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭২৮।২৯ খ্রীঃ মহম্মদ খান বঙ্গষ-নামক জনৈক রোহিলা সর্দ্দার দিল্লী দরবারের আদেশে এই হিন্দু-রাজ্য নষ্ট করিবার জন্য যত্নশীল হন। ফরুখশায়রের রাজত্ব কালে তিনি সৈয়দ

ভ্রাতৃ-যুগলের প্রিয় ভাজন হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে নবাব উপাধি সহ চারি সহস্র তুরঙ্গ সৈন্যের মনসবদার-পদে নিয়োজিত করিয়া বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কুঞ্চ, কাল্পী, জালবন সিপ্রি প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। ঐ পরগণাগুলি রাজা ছত্রসালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে মহম্মদ খানের পক্ষ হইতে যখন উক্ত প্রদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করা হয় তখন রাজা ছত্রসাল তাহাতে বাধা প্রদান করেন। ১৭১৯।২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উক্ত পরগণাগুলির জন্য রাজা ছত্রসালের সহিত মহম্মদ খানের প্রতিনিধিগণের বিগ্রহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সংঘর্ষে বুন্দেলাগণ জয়লাভ করিয়া মুসলমানদিগের অনেকের প্রাণ-নাশ ও তাহাদের মসজিদ ও গৃহাদি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। এই ঘটনায় দিল্লীর দরবার অতিমাত্র বিচলিত হইয়া ছত্রসালের দমন করিবার জন্য যত্ন প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু নানা কারণে সে কার্য্যে সে সময়ে বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

ইহার পর ১৭২৮ সালে দিল্লীর দরবার হইতে বুন্দেলখণ্ডে অভিযান দেলেল খান নামক সর্দ্দারের প্রতি অর্পিত হয়। বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসাদী সহ দেলেল খানের আক্রমণে বাধা দান করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দুইজন দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আসন্ন-যুদ্ধ-কালে পিতার সহায়তায় বিমুখ হইলেন। তথাপি রাজা ছত্রসাল সমর-ক্ষেত্রে দেলেল খানের বধ-সাধন করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হন। এই পরাভব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বরের আদেশে মহম্মদ খাঁন বিশাল বাদসাহী সৈন্য লইয়া বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। মোগল সেনা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বুন্দেখণ্ডে আপতিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই উহার বহুলাংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল নানা স্থানে মুসলমান সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, কখনও তাহাদিগকে পরাস্ত, কখনও বা স্বয়ং পরাভূত হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে তাঁহার অপর পুত্রগণ এক দল বুন্দেলা সেনা-সহ এলাহাবাদ প্রদেশে গমন করিয়া উক্ত প্রদেশ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক ছারখার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মালব ও গোণ্ড-বন প্রদেশের অনেক জমিদার. রাজা ছত্রসালকে সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গখণ্ড দিল্লীর সামন্তগণের নিকট হইতে নূতন সেনা-সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল এইরূপ সমরের পর একটি যুদ্ধে বৃদ্ধ রাজা ছত্রসাল মহম্মদ খানের বল্লমের আঘাতে গুরুতররূপে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ক্রম-কালে যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণরূপে আহত হইয়াও রাজা ছত্রসাল জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি রাজ্য-রক্ষার জন্য আবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনায় মোগল সেনার দ্বারা তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ রাজধানী জেতপুরের নিকটে অবরুদ্ধ হইলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে নিকটবর্ত্তী হিন্দু রাজন্যবর্গ এ সময়ে বঙ্গষেরই সহায়তা করিতেছিলেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন নিরুপায় ছত্রসাল মহারাষ্ট্র-চূড়ামণি পেশওয়ে বাজীরাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া, তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনাপূর্ব্বক এক পত্র লিখেন। উক্ত পত্রের শেষে তিনি লিখিয়া-ছিলেন,—"পূর্ব্বকালে নক্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়া-ছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে, হে বাজীরাও, তুমি তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ কর।" এই কাতরোক্তি-পূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় মুসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজ শাহুর নিকট হইতে পত্র-যোগে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কয়েক জন সর্দ্দার ও বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১৭২৯ সালের ১২ই মার্চ্চ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মোগল সৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এক মাস কাল যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র সৈন্য মহম্মদ খান বঙ্গষকে সসৈন্যে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। রসদের অভাবে মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা অশ্ব, উষ্ট্র ও গো-গর্দ্দভাদি নিহত করিয়া উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। শত মুদ্রার বিনিময়েও এক সের গোধূম দুষ্প্রাপ্য হইল! শত্রু পক্ষীয় অনেকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া বাজীরাও ঘোষণা করিলেন, "যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, তাহা-দিগকে মুক্তিদান করা হইবে।" তখন দলে দলে মুসলমান আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। বাজীরাও সদ্ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। তখন মহম্মদ খান উপায়ান্তরের অভাবে নারীবেশে অবরুদ্ধ দুর্গ হইতে অতি কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন।

এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম-বলে মহম্মদ খান বঙ্গষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া হিন্দুরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। অতঃপর বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর ছত্রসালের পুত্রগণের সহিত বাজীরাওয়ের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে মহারাষ্ট্রীয় ও বুন্দেলাদিগের মধ্যে সখ্য-বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠে। ইহার কয়েক বৎসর পরে মুসলমানেরা আর এক বার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। কিন্তু সেবারেও মারাঠা ও বুন্দেলাগণের সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদিগের পরাভব ঘটে।

এইরূপে বুন্দেলা জাতিকে স্বাধীনতা-রত্নে ভূষিত করিয়া মহাত্মা ছত্রসাল বুন্দেলখণ্ডে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এখনও তাঁহার স্বদেশবাসী প্রত্যহ প্রাতঃকালে—

"ছত্রসাল মহাবলী, রহে সদা ভলী ভলী।"

ও—"কৃষ্ণ মহম্মদ দেবচন্দ প্রাণনাথ ছত্রসাল।
ইন্ পঞ্চন্‌কো জো ভজে দুঃখ হরে তৎকাল॥"

প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া থাকেন। বুন্দেলখণ্ড এখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, কিন্তু সেখানকার প্রত্যেক রাজ্যেই রাজা ছত্রসালের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র সিংহাসন, ও তদুপরি একটি করিয়া ছত্রসালের চিত্র স্থাপিত আছে। প্রত্যহ সেই সকল চিত্রের ও সিংহাসনের পূজা করিয়া বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত নরপতিগণ বুন্দেলখণ্ড-কেশরী মহারাজ ছত্রসালের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মুসলমান শাসন-কালে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ছত্রসালের ন্যায় মহাপ্রাণ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতিকে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই মহীয়সী বাণী শ্রবণ করাইয়া জাতীয় জীবন-সংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, "উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি"—এই শ্রুতি বাক্যে বর্ণিত লক্ষণ মুসলমান আমলেও এদেশে বিদ্যমান ছিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

দান

৪

মিস্ গ্রেস্ অনেকক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সেবারে ইস্কুলে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিনের মধ্যে একজন নূতন সঙ্গিনী পাইলাম, সে একটি অনাথা বালিকা তার নাম 'মিস্ গর্ডন', মিস্ গর্ডনের খৃষ্টান নাম ছিল 'মার্লট' কিন্তু আমরা তাহাকে লোটি বলিয়া ডাকিতাম।

লোটি আমাদের কাছে অপরিচিতা নয়, অনেক দিন পূর্ব্বে আমরা যখন অত্যন্ত ছোটো ছিলাম, সেই সময় সে আমার সঙ্গে একত্রে পড়িত ; তখন আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল,তারপর আমার বয়স যখন বারো বৎসর এবং লোটির চৌদ্দ তখন সে এখান হইতে চলিয়া যায়। শুনিলাম, তাহার মা মারা গিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতার সেবা এবং শিশু ভাই বোন গুলির পালনের জন্য দরিদ্র পাদরি কন্যাকে নিকটেই রাখিবেন। লোটি চলিয়া গেলে কিছুদিন পর্য্যন্ত আমার সব শূন্য হইয়া গিয়াছিল, কিছুই ভালো লাগিত না; তারপর আবার বিরহ-ব্যথা অভ্যস্ত হইয়া গেল।

এবারে গভীর বিশ্বাসের উপর যেন একটা আকস্মিক নিদারুণ আঘাত পাইয়া সুপ্রচুর গর্ব্ব ও রমণীর স্বভাবজ লজ্জাভিমান নিরাশ হৃদয়কে যখন নীরবে পীড়ন করিতেছিল, অথচ একথা লইয়া জগতে একটি প্রাণীরও নিকটে আলোচনা করিবার উপায় ছিলনা. এমন কি মাসীমা শুদ্ধ যখন এ বিষয়ে আমায় একটি মাত্র সান্ত্বনার কথা না বলিয়া বরং উল্টিয়া পাল্টিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ সুঠাম দেহের,—তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল নেত্রের এবং বিনীত ব্যবহারেরই উল্লেখ করিতে লাগিলেন, সেই সময় পূর্ব্ব-স্নেহের সঙ্গিনীকে পাইয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা আর হইবার নয়। লোটি আর সে লোটি নাই। আমি আমার বেদনা দু' দিনেই ভুলিয়া আসিলাম কিন্তু তাহার সুগভীর আঘাত-ক্ষত শুকাইল না। মাতৃ-হীনা লোটি সম্প্রতি সংসারের একমাত্র ভরসা পিতাকে হারাইয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধ পাদরী রোগ-শয্যায় অনেক দিনই পড়িয়াছিলেন, সম্প্রতি 'হার্ট ফেল' করিয়া অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন। অনাথা লোটি 'মাদার আগষ্টাইন'কে পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহাদের তিনটি ভাই বোনকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই যে

লোটির শুভ্র ললাটে বিষাদের কালিমা ঘনীভূত হইয়াছিল, আমাদের শত চেষ্টাতেও তাহা আর মুছা গেলনা। সে স্বভাবতই খুব ধীর ও সহিষ্ণু ছিল; আজ কাল আর যেন তাহার ছায়ার মতন ক্ষীণ, মার্ব্বেলের মতন শুভ্র, দলিত পুষ্পের মতো পরিম্লান অঙ্গে জীবনী শক্তির সঞ্চার আছে কি না তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হইত। আমার চোখ ফাটিয়া কেবলি জল আসিত! কী লোটি—কী হইল! প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা দিতাম। পড়া ভুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম! মধ্যে মধ্যে তাহার গলা ধরিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতাম "লোটি, কি করলে তুই সুখী হোস্, ভাই বলনা, আমি প্রাণ দিয়েও তা কোরবো।"

লোটি স্নেহের হাসি হাসিয়া আমার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিত,—গভীর নিরাশার হাসি হাসিয়া বলিত—"অসম্ভব—সে অসম্ভব!"

তারপর অনেকদিন পরে—প্রায় বৎসরাধিক পরে একদিন সে আমায় তাহার নিরাশার কারণ জানাইল। শুনিলাম সে একজনকে ভালোবাসিয়াছিল এবং প্রতিদানও পাইয়াছিল! শুনিয়া আমার হৃদয়ের তুফান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তবে আবার তাহার দুঃখ কি? ভালোবাসিয়া যদি প্রতিদান পাওয়া গেল, তাহার পর আর কী চাই? কিন্তু লোটি এতটা স্বার্থহীনা হইতে ইচ্ছুক ছিল না! সে ভালোবাসার প্রতিদান পাইয়াই লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল কিম্বা মানব-ধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া জানিনা, কেন অশরীরী এবং শরীরী দুইটি পদার্থের উপরই আশা করিয়া বসিয়াছিল। অবশ্য এ আশার মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহার প্রণয়ী। লোটির মুখে শুনিলাম তাহার প্রণয়ী তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিতেন—বাসিতেন কেন এখনো তিনি তাহাকে তেমনি ভালোবাসেন এবং প্রতিজ্ঞা আছে চিরদিনই তেমনি বাসিবেন! কিন্তু এ জন্মে আর একটি বারও তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই! 'কেন?' তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাই নাই, একটা মর্ম্মভেদী রোদনোচ্ছ্বাসে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আহা বেচারা লোটি! নিশ্চয়ই হৃদয়হীন কালের কঠোর হস্ত তাহার সুকোমল হৃদয় খানিকে দলিত করিয়া ফেলিয়াছে! বেদনায় আমার মুখে সান্ত্বনা বাক্য মিলাইয়া গেল!

তারপর আরো দুইটি সুদীর্ঘ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছিল। এখন আর আমি 'কন্‌ভেণ্টে'র ছাত্রী নই। প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল আমি বাড়ি আসিয়াছি।

মাসীমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আফ্রিকার যে যুদ্ধে মিঃ ব্রাউন দুই বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরি জয় হইয়াছিল ও লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রাউন সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। এবার আফ্রিকার ফেরত তিনি আমাদের বাড়িতে আপনিই আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও ভৎর্সনায়ও আমি বেশভূষার প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ললাট ও কপোল যে অস্বাভাবিক রক্তিমার দ্বারা আনন্দ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহাকে কেমন করিয়া বাধা দিব?

আমাদের দ্বিতীয় মিলন প্রথম পরিচয়ের অপরিসীম লজ্জার স্মৃতিতে আমার কাছে যতখানি নিরানন্দকর হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য ক্ষণের কথাবার্ত্তায় সেটুকু মুছিয়া গিয়া যে আনন্দ, যে আশা বুকে বহিয়া ঘরে ফিরিলাম, তাহার একটুখানি কণা মাত্র আমার আনন্দহীনা সঙ্গিনী লোটির নিরানন্দ মুখকেও আলোকিত করিয়াছিল। সূর্য্যের আলো মেঘের ও রাত্রের সমুদয় অন্ধকার মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দেয়। লোটিকে চুম্বন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিলাম—"কী ভুল বুঝেছিলুম লোটি, তিনি এত স্নেহময়! তাঁকে কত নিষ্ঠুর ভেবেছি!" লোটি ম্লান মুখে হাসিয়া কহিল,—"স্নেহ, প্রেম যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ভ্যালী, তোমার প্রেমাস্পদ এবার তবে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন?" প্রকৃতিস্থ? হাঁ তিনি তখন তবে বাস্তবিকই অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর স্বার্থপরায়ণা অভিমানে জ্ঞানহীনা আমি তাঁহার এই নির্ম্মল চরিত্র কী মসীবর্ণেই রঞ্জিত করিতেছিলাম! না বুঝিয়া না জানিয়া অনর্থক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলাম, 'হায় দুর্ভাগিনী, লোটি প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে জানে; তাই সে তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিল। ছি ছি এমন হৃদয়হীনা আমি—আমি তাঁহাকে চিনিলাম না!' লজ্জায় লোটির বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলিলাম,—"ঠিক কথা লোটি, ঠিক তুমি বলেছ। সেই সময় তাঁর বাপ মারা যান আর তাঁদের বৃহৎ সংসারে তখন দারিদ্র্যের বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর হস্ত পতিত হয়েছিল, আমি তাঁকে চিনিনি লোটি, তাঁর সেই গভীর বেদনাভরা দৃষ্টিতেও আমার অভিমান চূর্ণ হয়নি! আহা গেব্রিয়েল! যে তোমার সুখ দুঃখ বোঝে না এমন

পাষাণীকেও তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী করতে হবে।

লোটি চমকিয়া আমায় তাহার বাহু-বেষ্টন হইতে ছাড়িয়া দিল। আমার কপালের উপর খুব বড় বড় নিশ্বাসের বাতাস মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া আমি বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলাম;—একি! মৃগী রোগীর মতন তাহার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু কি? লোটির শুভ্র কপোলের সমুদয় রক্তাভা নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল! রক্তহীন অধর কাঁপিতে-ছিল, সভয়ে উঠিয়া বসিয়া তাহার কম্পিত হাত দু' খানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া ভীতকণ্ঠে ডাকিলাম,—"লোটি' কি হ'ল! এ কি হ'ল!" সেই রক্তহীন মুখের বিবর্ণ ওষ্ঠে বিষাদের হাসি কী ভয়ানক বিবর্ণ ও ম্লান দেখাইল। লোটি বলিল,—"কিছু হয়নি ভ্যালী, তোমার প্রেমাস্পদের নাম কি ভ্যালী গ্রেবিয়েল? * * ডেন্‌সলির ডাক্তার ব্রাউনের ছেলে কি তিনি?"

নিশ্চয়ই লোটির হিষ্টিরিয়া আছে 'হার্ট' নিশ্চয়ই খুব দুর্ব্বল, জীবন্ত মানুষের মুখে এ রকম দুর্ব্বল অস্ফুট স্বর আমি আর কখনো ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই! সে তাঁহাকে তবে চেনে! শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল, আজ তবে লোটিকে ছাড়া হইবে না; আমাদের নূতন সুখের সেও কিছু অংশ গ্রহণ করিলে নিজের দুঃখ কতকটা তবু ভুলিতে পারিবে! বলিলাম,—"তবে তো খুব ভালোই হ'ল, আমিও যে ভুলে গেছলুম, তিনি যে তোমার দেশের লোক! আয়না ভাই তোদের আলাপ করিয়ে দি। তবে ভয় হয় লোটি যদি তিনি তোকে দেখে আমার আর না চেয়ে দেখেন। যদি............"

আমার চপলতার এমন ফল হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোটি তড়িতাহতের মতো এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া 'পর মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মতন উঠিয়া চলিয়া গেল, লজ্জায় অনুশোচনায় আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

কর্ণেল ব্রাউন এবার সর্ব্বদাই মাসীমার কাছে কাছে থাকেন, আমাকেও দিনের অধিকাংশ সময় তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বেই কাটাইতে হয়; মাসীমা তাঁহার স্নেহ-ব্যাকুল দুই স্তিমিত নেত্রে যখন আমাদের পানে চাহিয়া থাকেন, তখন তাহার মধ্য হইতে এমন দুইটি নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদের ধারা নীরব-আনন্দে আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতে থাকে তাহাতে মনে হইত যে, আমার ভবিষ্যতের দিকটা আমার কাছে যেন সমধিক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইয়া

উঠিতে লাগিল। মাসীমাকেও এবার আমার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত দেখিলাম। আমরা অধীর,—একটু খানি বিলম্বও আমাদের সহেনা। তাই আমরা এত দুঃখ পাই, লোটির শরীর ভারী অসুস্থ কিন্তু বেশ বুঝিলাম শরীরের অপেক্ষা তার মনে অশান্তি শতগুণ বেশি। কি আশ্চর্য্য! আমি সন্দেহ করিয়া ছিলাম সর্ব্ব নিয়ন্তার নিয়মে সে আজ এ অবস্থায় পতিত! তাহা নয়, মানুষের স্বার্থপর হস্ত তাহাদের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আজ তাহার এ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়াছে। তাহার প্রাণাধার, পিতার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, যে কোনো কারণেই হোক তাহাকে তিনি পত্নী-পদ দান করিবেন না। পিতৃভক্তির পদে হৃদয়কে বলিদান করিয়া তাই তিনি সুদীর্ঘ কালের জন্য দেশত্যাগী; এ জগতে আর তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। লোটি তাই উৎসুক-চিত্তে পরলোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! কী নিষ্ঠুরতা! কী কঠোর পিতৃ-আজ্ঞা! আহা অভাগিনী! মৃত্যুর অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই! এ যে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত নির্ম্মমতা!

অনেক অনুরোধেও লোটি তাহার প্রেমাস্পদের নাম বলিল না। চোখের জল মুছিয়া কেবল মাত্র বলিল,—"ও কথা ছেড়ে দাও ভ্যালী।"

ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু কি একটা অস্ফুট সন্দেহের ছায়া অন্ধকার ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র আলোকের মতো মনের ভিতর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে চাপিয়া রাখা কঠিন বুঝিলাম। (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

তামাক, গাঁজা, সিদ্ধি, চরশ, অহিফেন, সুরা প্রভৃতি মাদক শ্রেণীভুক্ত। চিকিৎসকগণ এই সকল দ্রব্য ঔষধ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অনেকানেক কষ্টসাধ্য পীড়ার শান্তি করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ উহাদের অপব্যবহার প্রযুক্ত কিরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ও আত্ম-সম্ভ্রমহীন হইয়া সমাজে বসতি করেন তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল, সেই সকল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাহাতে অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কুফল জানিয়া সতর্ক হইতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

তামাক। সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়ানা ট্যাবেকম্ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র। ইহা আমেরিকায় জন্মে। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে রোপিত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন বহু প্রাচীন কালে তামাক ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং মুসলমান রাজত্বকালেই উহা এখানে আনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমাদের দেশে হুঁকায় সেবন, চুরুট টানা, নস্য গ্রহণ এবং গুঁড়া করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তামাক সেবনের প্রচলন আছে। তামাকে নাইকোটিন (Nicotine) নামক এক প্রকার ভয়ানক বিষ আছে। বিষ মাত্রায় এই নাইকোটিন্ উদরস্থ হইলে তিন মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। একদা একটি ৮ বৎসর বয়স্ক বালকের মস্তকের ক্ষতে তামাকের রস প্রয়োগ করায় ৩ঘণ্টার মধ্যে উহার মৃত্যু হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে, ফুটন্ত জলে তামাকের পাতা অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া মলদ্বারে উক্ত জলের পিচ্‌কারী দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্যার্ আষ্ট্‌লি কূপার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হইতে দেখায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় এই প্রয়োগ-প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব দেখুন তামাকের পাতা গুঁড়া করিয়া পানের সহিত চর্ব্বণ করা কতদূর বিপজ্জনক। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে তাম্বুলের সহিত দোক্তা খাইয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। তামাকের নস্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে ঘ্রাণশক্তির হানি হয়, স্বরভঙ্গ হয় এবং আনু-নাসিক বর্ণ উচ্চারণের শক্তি থাকে না। তামাকের ধূম পান করিলেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রথম ধূমপান আরম্ভ কালে বমন, শারীরিক অবসাদ এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। অধিক পরিমাণে তামাক সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, স্মরণ শক্তির হানি, পরিশ্রমে অনিচ্ছা, শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়।

যাহা দ্বারা এতদূর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কি তাহার দাসত্ব স্বীকার করা সমীচীন? স্কুলের বালকগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদা সিগারেট্ ও বিড়ি টানিয়া থাকেন। ইহাতে তামাক সেবনের অপকারিতা তো আছেই অধিকন্তু কাগজ ও নানাবিধ শুষ্ক পত্রের ধূম গ্রহণে বায়ুনলী ও

ফুসফুসের পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হাঙ্গেরী রাজ্যে কোনো লোক প্রত্যহ অন্যূন ৫৬টি সিগারেটের ধূম পান করিতেন। এক দিন তাঁহার হটাৎ মৃত্যু হওয়ায় ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ হইল যে, নাইকোটিন্ বিষই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। আশা করি ধূমপানরত যুবকগণের ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবে।

গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশ। ক্যানেবিনেসী জাতীয় ক্যানেবিস সেটাইভা নামক বৃক্ষের শুষ্ক মুঞ্জরিত ও ফলিত শাখাগ্রের নাম গাঁজা। এই বৃক্ষের পত্রকে সিদ্ধি এবং ইহার পত্র ও শাখা প্রভৃতি হইতে যে ধূনাবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাকে চরশ কহে। চরশই গাঁজার বীর্য্য। ডাক্তারী শাস্ত্রে চরশকে ক্যানেবিন বলে। গাঁজার মাদকতা শক্তি এই ক্যানেবিনের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধির মাদকতা শক্তি অপেক্ষা গাঁজা ও চরশের মাদকতা শক্তি অনেকগুণে অধিক। গাঁজা, সিদ্ধি ও চরশ ইহারা সকলেই মস্তিষ্কের উত্তেজক; অধিক মাত্রায় সিদ্ধি খাইলে জিহ্বা শুষ্ক হয় এবং মত্ততা উপস্থিত হয়।

মত্ত ব্যক্তি কখনো হাস্য করে, কখনো গান করে এবং কখনো বা নানারূপ প্রলাপ বকিতে থাকে। গাঁজা-খোরের দুর্দ্দশা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। গাঁজা ও চরশের ধূম পানে ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। গাঁজা খাইলে দেহ কঙ্কালসার হইয়া থাকে। গাঁজা-খোরের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয়, আত্মসম্ভ্রম বোধ থাকে না এবং সচরাচর শতকরা প্রায় ৫০ জনের পরিণামে উন্মাদ রোগ হইতে দেখা যায়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার উন্মাদাগারে ২৯৬ জন উন্মাদ রোগী ছিল। ডাক্তার সিম্পসন্ সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ উহাদের মধ্যে ১৪৩ জন অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া উক্ত রোগগ্রস্ত হয়।

যে দ্রব্যের অপব্যবহারে সম্মানী ব্যক্তিও সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকেন, যে দ্রব্যের অপব্যবহারে মানুষ সমস্ত সদ্‌গুণ হারাইয়া নিরন্তর কুকার্য্যেই রত থাকে, যে দ্রব্যের অপব্যবহারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিও উন্মাদ হয়, সে বিষাক্ত দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

অহিফেণ ও সুরার কথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সম্বল

প্রতি প্রভাতেই, বাজিলে ললিত
আমি আসি এই পথে,
এই তরু তলে, স্নিগ্ধ ছায়ায়
এই নদীটির তটে!
কত লোক যায়, কত ফিরে আসে
সফল-গরবে, মলিন হতাশে
আপনার মনে চেয়ে চেয়ে হাসি,
বসে থাকি গ্রাম-পথে!
কেহ বেণু-বীণা বাজাইয়া চলে
কেহ বর্ষে গায় গান;
কারো আঁখি-কোণে ম্লান চেয়ে থাকে
রিক্ত, ব্যাকুল প্রাণ!
তাদের মিলন-বিরহ-নেশায়
পলে-পলে-বাঁধা, দিন চলে যায়,
বেলা পড়ে আসে, নদীতেও পড়ে
ভাঁটার অলস টান!
তীরে এসে লাগে ভোরে-খুলে-যাওয়া,
প্রবাসী আঁধার-তরী
ভেঙে আসে মেলা দিবস-গাঁয়ের
জয়-পরাজয়-ভরি!
পাখী আসে ফিরে আশ্রয়-নীড়ে
শান্তি শিশুটি ঘুমে নদী-তীরে,
চোখের পাতায় ফুটে উঠে মোর
ছোট এক ফোঁটা জল!
জীবনে আমার হাসি ও অশ্রু
করেছি সম্বল!

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন (২)

গতবারে যে বলিয়াছি, ৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রেই লাহোর যাত্রা করিলাম, তাহা ভুল বলা হইয়াছে। রাত্রে বংশীধর, মুরলীধরের নিকট বিদায় লইয়া ছত্রেই ছিলাম। ৯ই প্রাতে লাহোর যাত্রা করি। লাহোরের ঠিকানা এবার আগে হইতে ঠিক ছিল। শ্রদ্ধাষ্পদ সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন দেরাদুন হইতে লাহোর যাত্রা করেন, তখন আমাকে তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিয়া Address দিয়া যান। লাহোর ষ্টেসন হইতে সহরে পৌঁছিতে বেলা ৯ টার অধিক হইল। বাবু হরলালের বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম। লাহোর সামান্য সহর নহে। সহজে রাস্তা ঠিক করা কঠিন।

বাবু হরলাল বলিলেন, "বাবু সাহেব (সারদা বাবু) অন্য বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছেন; আপনি সে ঠিকানা খুঁজিয়া পাইবেন না, এখন এখানে বিশ্রামাদি করুন, তারপর আমি লোক সঙ্গে দিয়া আপনাকে তথায় পৌঁছিয়া দিব।" অবশ্য তিনি সকল কথাই হিন্দি ভাষায় বলিয়াছিলেন। বাবু হরলাল তদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার অমায়িক ভাবে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যে এমনই বাধ্য হইতে হইল যে, আমি তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না, অধিকন্তু ভগবানের এ কি করুণা দেখিয়া সেই সঙ্গীতের অংশ আমার মনে আসিল.—"একি করুণা তোমার ওহে করুণা নিধান! অধম পতিত জনে এত তোমার করুণা কেন!"

তারপর বাবু হরলালের গৃহে স্নান আহার কালীন গৃহ-পদ্ধতি সকল দেখিয়া বুঝিলাম ইহা নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিকের গৃহ। ইতিমধ্যে পার্শ্বস্থ আর একটি ছোট বাড়ির দ্বিতল ঘরে আমার জন্য কখন শয্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে জানি না। আহারান্তে বাবু হরলাল বলিলেন "আপনি ঐ ঘরে গিয়া বিশ্রাম করুন, এবং বাবু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া এখানেই থাকিবেন। এখানে থাকিলে আপনি আরামে থাকিবেন, এবং আমার গৃহে রুটী প্রস্তুত থাকিবে, যখন ইচ্ছা আপনি আহার করিলেও অভাব হইবে না, না করিলেও ক্ষতি হইবে না।" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় একব্যক্তি আসিয়া আমাকে সারদা বাবুর বাসা দেখাইয়া দিবার জন্য ডাকিলেন; আমি তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেলাম।

শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু পুনরায় আমাকে এখানে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আমার নামে যে সকল পত্র আসিয়াছিল. তাহা ও লিখিবার উপাদান এবং কয়েকখানা টিকিট দিয়া, তাঁমাকে অগ্রে পত্রোত্তর সকল লিখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং তখন আর কোনো কথা না বলিয়া নিজেও যে সকল পত্রাদি লিখিতেছিলেন তাহা শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি পত্রগুলি পাঠ করিয়া আবশ্যক মত ৪ খানার উত্তর লিখিলাম।

সে দিবস অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ধর্ম্মানুরাগী সাধক-প্রবর বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি গেলাম। অবিনাশ বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ছিল না বটে,কিন্তু অল্পক্ষণেই বেশ আলাপ হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সে দিন রবিবার, মন্দিরে উপাসনায় যাইবার সময় হইল; একত্রে মন্দিরে গেলাম। বেদীর কার্য্য অবিনাশ বাবুই করিলেন। লাহোর ব্রহ্ম-মন্দিরটি মধ্যমাকারের—সুদৃশ্য সুরুচি সম্পন্ন। সেদিন ১৫।২০ জন উপাসক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রচারক প্রকাশদেবজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। এখানে আরো যে সকল ব্রাহ্ম আছেন, সকলের সহিত সাক্ষাত করিতে সময় পাইলাম না।

আমি এখানে কবে আসিয়াছি. কোথায় আছি, একথা অবিনাশ বাবু আমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমার থাকার কোনো কষ্ট নাই বরং স্বচ্ছন্দেই আছি .শুনিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আমার কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হইবে আপনি তাহাতে যোগ দিবেন এবং রাত্রে আমার বাড়ি আপনার আহারের নিমন্ত্রণ।"

আজ ১০ই সোমবার সারদা বাবুর বাড়ি মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ ছিল। তারপর তাঁহার "আশ্রিত-কন্যা" আমার পারিবারিক সাহায্যার্থে খুলনায় পাঠাইবার জন্য আমাকে ৪৲ টাকা প্রদান করেন।

১১ই মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় প্রবীন ব্রাহ্ম বন্ধু লালা কাশীরামের বাড়ি গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলাম, তিনি তাঁহার কুমারী কন্যাকে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে বলিলেন, বালিকাটি হারমোনিয়াম যোগে একটি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইয়া শুনাইলেন। আমিও একটি গান গাহিলাম,—সে গানটি তখন অল্পদিন মাত্র রচিত হইয়াছিল, সে গানটি এই;—

ভৈরবী—একতালা।

"আমি বাছিয়া লব না তোমার দান, তুমি যাহা দাও তাই ভালো।
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ আঁধারের পাশে আলো।
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল, যদি তাহে কণ্টক রহে?
নিভাতে হবে কি পুণ্য হোমের অনল, যদি তাহে অন্তর দহে?
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা, তোমার কৃপা-পবনে,
আমি, কেমনে রোধিয়া লইব শরণ নীরব শূন্য মরণে।
এই শান্ত বিমল জীবন আকাশ, ঘেরে যদি মেঘ-জাল,
তব মন্দির-পথে ফেলে কি পালাব তোমার পূজার থাল?
যদি কামনায় সাধ না মিটে আমার, আশা যদি নাহি পুরে,
আমি তুলিব কি তবে বিদ্রোহ-গীত ক্ষুব্ধ-হতাশ সুরে?
আমি হেরিব সকলে চির মঙ্গল অক্ষয় চির সুখ,
আমার সব ব্যর্থতা-দুঃখের মাঝে, জাগে ঐ প্রেম মুখ;
তোমার মহা পূর্ণতা-মাঝে ক্ষুদ্র বাসনা মোর,
চিরতরে নাথ যাউক ডুবিয়া ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর।"

লালা কাশীরাম ধর্ম্মানুরাগী নিষ্ঠাবান সাধক এবং ভক্ত ব্যক্তি। তিনি শিমলা পাহাড়ে গবর্ণমেণ্ট আপিসে কর্ম্ম করেন, এবং শিমলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তিনি আমাকে কিছু পান-ভোজন করাইবার জন্য যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনিয়া তাহা পান করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর অনেক বেলায় আমি বাবু হরলালের বাড়ি আসিলাম।

বাবু হরলাল একজন বিষয়ী, সাংসারিক লোক; অধিকন্তু তিনি পৌত্তলিক। আমি অন্ধের সন্ধানে মাত্র তাঁহার বাড়ি আসিয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে এত যত্ন করিয়া (আমার অন্যত্র স্থান পাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও) গৃহে স্থান দান করিলেন কেন? এ কথা আমার একবার মনে যে না হইয়াছিল এমন নহে। তারপর সাধারণত মনে হয় যে, সাধু-ভক্ত লোক, তাই আমাকে ২।৫ দিনের জন্য রাখিয়াছেন।

মঙ্গলবার রাত্রে আহারাদি অন্তে নির্জ্জনে আমাকে লইয়া বাবু হরলাল ধর্ম্মালাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে শাস্ত্রজ্ঞ

মনে করিয়া তদ্রূপ ভাবে কথা কহিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, আমি সংস্কৃত জানি না এবং প্রকৃত প্রণালীতে শাস্ত্রাধ্যয়নাদিও করি নাই; কেবল সাধু, ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞগণের প্রমুখাৎ শাস্ত্রের ভাব এবং তাৎপর্য্য কিছু কিছু শুনিয়া বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শাস্ত্রার্থ অবগত আছি মাত্র। তার পর সরল ভাবে কিছু কিছু বিশ্বাস-ভক্তির কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ হইল। ফলত তখন বুঝিলাম বাবু হরলাল বাহিরে সংসারীর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আছেন মাত্র, কিন্তু ভিতরে অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী তত্ত্ব-পিপাসু জ্ঞানী ব্যক্তি।

তারপর কথা প্রসঙ্গে আমার স্মরণ হওয়ায় তাঁহাকে বলিলাম, অমৃতসরে এক মহাত্মা 'কুর্ত্তা' প্রস্তুত করিতে ১৲একটাকা দিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া বাবু হরলাল পরদিন আমাকে ঠিকানা লিখিয়া এবং নগদ ২৲ টাকা দিয়া বলিলেন যে, "আমার সময় অল্প আপনি এই দোকানে গিয়া ১টা পট্টি (পট্টুর) কাপড় খরিদ করিয়া আনিয়া আমার বাঁড়ির সম্মুখে যে ওস্তাগর আছে তাহাকে ১টা কোট প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিবেন।" পরে তিনি দর্জ্জীকে বলিলেন, "এক কোট বানায়কে মহারাজ কোঁ অংমে চড়ায় দেনা, মজুরী ম্যায়সে লেনা।"

আমি পট্টুরওয়ালা মহাজনের বৃহৎ দোকানে গিয়া ৩৲ টাকার মত এক পট্টুর চাহিলাম, কিন্তু ৩॥০ টাকার কম একটু ভাল রকম পছন্দ হয় না;—৩৶০ দামের একটা থান (এক পট্টিতে ৪॥০ গজ কাপড় থাকে, বহর খুব কম কিন্তু তাহাতে প্রমাণ ১টা কোট বেশ হয়) পছন্দ করিয়া কর্ম্মচারীকে বলিলাম আমার নিকট ৩৲ টাকার বেশী নাই। তখন কর্ম্মচারী যেন মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিয়া কাপড়সহ আমাকে স্বয়ং ধনীর সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল "এই মহারাজ ৩৶০ দামের এই থান লইতে ইচ্ছা করেন কিন্তু ইঁহার নিকট ৩৲ টাকার বেশী দাম নাই; ধনী একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "দে দেও।" আমি পট্টুর লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম এ দেশটা—এ লোকগুলা কী রকমের!

পট্টুর আনিয়া ওস্তাগরের দোকানে দিয়া, পরদিন বেলা ১১টার সময় কোট প্রস্তুত পাইলাম। আজ ১২ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার। এইরূপে কয়েক দিন লাহোরে কাটাইলাম। প্রতিদিন প্রাতে এবং বৈকালে আমার বেড়ানো অভ্যাস। তাহাতে দেখিলাম, লাহোর প্রকাণ্ড সহর। ইহার মধ্যে কতকগুলি গেট আছে, তাহার নাম দরওজা, অর্থাৎ দিল্লী দরওজা কাণপুর

দরওজা ইত্যাদি। এখানে মুসলমানের সংখ্যা যেন অধিক; বাদসাই ভাবের সঙ্গে শিখদিগের মিশ্রভাব। ইংরাজী ভাব তত যেন এখনো প্রবল হয় নাই। আর্য্যসমাজের উৎসব সে সময় ছিল, কিন্তু আমি তাহাতে তেমন মনোযোগ দিয়া বক্তৃতাদি শুনি নাই এবং কোনো বক্তৃতা আমার হৃদয়-গ্রাহী হয় নাই। যাহা হউক যথাসময়ে সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। খুলনায় ২৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বেলা ১টার সময় পুনরায় অমৃতসর যাত্রা করিলাম। (ক্রমশ)

স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত (গোবরডাঙ্গা) ইছাপুর গ্রামে ইংরাজি ১৯৪৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮১০ অব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে প্রয়াগ-ধামে মানবলীলা সংবরণ করেন। বাল্য-কালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি কঠোর দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হন। স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় গুণে এবং আন্তরিক চেষ্টার ফলে তিনি গোবরডাঙ্গা হাই-স্কুলে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া উক্ত গ্রামস্থ ৺ছকুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৎগুণসম্পন্না সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তদীয় খুল্লশ্বশুর এলাহাবাদের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তত্রত্য ট্রেজারি আপিসের কেরাণী-পদ প্রাপ্ত হন; এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলে ক্রমশ উন্নতিলাভ করিয়া হেডক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হন ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানে কার্য্য করেন। তিনি বহুবার অস্থায়ীভাবে ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অমানুষিক গাম্ভীর্য্য, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সকলে মোহিত হইত। তাঁহার পরলোক গমনের ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় একমাত্র কৃতবিদ্য তনয় সত্যচরণ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনায় নবীনচন্দ্রের স্ত্রী এবং পরিজনাদি শোকাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার গম্ভীর হৃদয় এক বিন্দুও কেহ টলিতে দেখে নাই।

তিনি অতি সদাশয় সদ্‌গুণসম্পন্ন ও দয়ালু ছিলেন। কি কর্ম্মস্থলে, কি স্বীয় গৃহে বা সমাজে তিনি তৎসমুদয় গুণের নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। এরূপ সজ্জনের অভাব তাঁহার দেশবাসী প্রত্যেকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় সংবাদ

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের "কুশদহ"র স্থানীয় সংবাদে ইণ্টারমিডিএট পাসে,—ঘোষপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম অতুলকৃষ্ণের স্থলে ভ্রমক্রমে মুরারীধর লেখা হইয়াছে।

অনিবার্য্য ত্রুটী—কুশদহবাসী যে সমস্ত ছাত্র বিবিধ পরীক্ষায় নানা স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া এবং "কুশদহ"তে প্রকাশ করা অসম্ভব, সুতরাং এ ত্রুটী অনিবার্য্য।

বি-এ পাস—চন্দনপুর হইতে শ্রীযুক্ত হাজারীলাল মিশ্র লিখিয়াছেন, "আমাদের জন-প্রিয় কবি, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জয়গোপাল রায় এবার বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ফুটবল খেলাতেও বিশেষ পারদর্শী।"

ইংলণ্ড প্রত্যাগত—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ির স্বর্গীয় কালীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র,—সিটি কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, গত অক্টোবর মাসে "পলিটীক্যাল ইকনমি" অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন, এ সংবাদ আমরা যথাসময়ে দিয়াছি; ঈশ্বর-কৃপায় তিনি উক্ত বিষয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন,এবং তিনি যে য়ুনিভার্সিটীতে অর্থ-নীতির লেকচারার হইয়াছেন, এজন্য আমরা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

উপাধিলাভ—রাণাঘাটের নিকটস্থ হবিবপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাধারমণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণ সিংহ প্রায় চারি বৎসর কাল আমেরিকায় অধ্যয়ন করিয়া ইলিনয়স্ Illinois বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি অতি সম্মানের সহিত বি-এস-এ (Bachelor of Agricultural Science) উপাধি লাভ

করিয়াছেন। তিনি যুক্ত সাম্রাজ্য ও ইউরোপের বিখ্যাত কৃষিকার্য্যের কেন্দ্র সকল দর্শন করিয়া আগামী জানুয়ারি মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন।

বুদ্ধমূর্ত্তি -বেড়গুম হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, — "এখানে সেখ সাতু মণ্ডল এক পুস্করিণী খনন করাইতেছেন, তাহাতে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে।"

প্রতারণা—সম্প্রতি ১২।২, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বিনয়ভূষণ কুণ্ডুর নিকট হইতে ধরণী সাহা প্রতারণা করিয়া ৬১৲ টাকা লইয়া গিয়াছে, পরে জানাগেল সে আরো কোথাও কোথাও ঐরূপ প্রতারণা করিয়াছে এবং করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কুশদহবাসী সাবধান! যিনি ধরণীকে চেনেন বা তাহার যদি বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিলে উপকৃত হইবে। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে ধরণীর বাসস্থান খাঁটুরা গ্রামে ছিল।

চুরি—গত ১৮ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রে গোবরডাঙ্গা বাবু পাড়ায় বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বাক্স, ভাঙ্গিয়া প্রায় ১৫০ দেড়শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। শরৎ বাবুর বাড়ি গড়পাড়ার নিকট। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে চুরি হয় কেন?

এবারে স্থান অভাবে আরো কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইল না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

অর্চ্চনা।—(আষাঢ়, ১৩১৮)—শ্রীযুক্ত কেশবলাল গুপ্ত এম্-এ, বি-এল সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রাচীন খৃষ্টিগণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম" বহু জ্ঞাতব্য বিষয়-পূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেশ সুন্দর হইতেছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দের ডিটেক্‌টিভ গল্প "বিদ্যাসাগর-বিদ্রোহ" এবার শেষ হইল, আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। "প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর" উল্লেখ যোগ্য রচনা, এরূপ

সারবান প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করে। "বর্ষার সুখ দুঃখ" কুৎসিৎ অপাঠ্য, ইহা যে কেন ছাপা হইল বুঝিতে পারিলাম না।

ভারত মহিলা (আষাঢ়, ১৩১৮)—শ্রীমতী সরযুবালা দত্ত সম্পাদিত। উয়ারি ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মুল্য ২॥৵০।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "এডুকেশন" নামক গ্রন্থ হইতে একটি প্রবন্ধের সারাংশ সংকলন পূর্ব্বক "নৈতিক শিক্ষা ও পরিবার গঠন" শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্বারা এ দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের গভীর গবেষণার ফল ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া লেখিকা আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় শেষ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিবনা, কিন্তু লেখিকার ভাষা অতি সুন্দর ও ওজস্বী। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের রচনা "পরশুরামের প্রতি তদীয় পত্নী" নীরস ও বিশেষত্ব বিহীন ;—যেমন উদ্ভট ভাব তেমনি উৎকট ভাষা,—আবার ততোধিক সঙ্কট অব্যবসায়ীর কবিতা রচিবার সাধ। "নন্দন-বন" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা,—শ্রীমতী অনিভ শ্রীনারের স্বপ্ন হইতে অনুদিত,—অনুবাদ সুন্দর ও মনোজ্ঞ। মূলের ভাব ও রস ইহাতে অবিকৃতই রহিয়াছে। এই লেখকের ভাষা মধুর ও মিষ্ট, রচনাভঙ্গী অসাম্য সাধারণ এবং অনুকরণাতীত! বর্ণনা-রীতি ও শব্দ-বিন্যাস বাংলায় অতুলনীয়! 'তুমি' শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত চমৎকার কবিতা, এমন সুন্দর কবিতা কদাচিৎ মাসিক পত্রকে অলঙ্কৃত করে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় "মডার্ণ রিভিউ" হইতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির অনুবাদ করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'সন্দেহের ফল' বেশ মুন্সিয়ানার সহিত লিখিত, ইহা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতা আছে, সাধনা করিলে ইনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। 'ধনী ও নির্ধন" চলনসই কবিতা।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press
35/8, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from
28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। আশ্বিন, ১৩১৮ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গান্

—:•:—

বিভাস।—একতালা।

সংসার মন্দিরে. প্রতি পরিবারে,
করিছ বিরাজ ওগো মা জননী।
পরম যতনে, পুত্র কন্যাগণে,
পালিছ আদরে দিবস রজনী।
মহাশক্তিরূপে নারীর হৃদয়ে,
সুকোমল মাতৃভাব প্রকাশিয়ে,
করিলে মোহিত, মানবের চিত, (জননী গো)
তুমি দেখালে মুরতি ভুবনমোহিনী।
প্রকৃতি মাধুর্য্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা প্রেমের অবতার,
তুমি মাত সকলের মূলাধার, (দয়াময়ী গো)
শিশু ভক্ত সন্তানের হৃদি বিলাসিনী।

———

চিরঞ্জীব শর্ম্মা

যিশু চরিত

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত)

বাউলসম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা সকলের ঘরে খাও না ? সে কহিল, "না।" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।" আমি কহিলাম "তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন ?" সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল "তা বটে ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।"

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখাদ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো না কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিশেষ-ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি—আপনাকেই ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চ্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র, এদেশে ধর্ম্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দুসমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল—স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সঙ্কট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ্ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচাররূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্য্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিপদ আমাদের পূর্ব্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না কিন্তু আমাদের অহঙ্কার বাড়িল। পূর্ব্বে এক দিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কার বশত আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহঙ্কারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট

দিব না, কোনো আবর্জ্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্ব্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জ্জীবতাই যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালও যেমন, মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি। জীবনের ধর্ম্মই নির্ব্বাচনের ধর্ম্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জ্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাল, তাহার কিছুই বর্জ্জনীয় নহে ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না—কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্ব্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি

আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না,—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্দ্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্ম্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সকল বিড়ম্বনাসৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই,—যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিলে সমস্ত কৃত্রিমতা, কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করি[illegible] দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন. অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্ব্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জালবুনানীর মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্ত্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড় সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি;—স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব-চিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন. তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখ কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়োনা, আঘাত করিয়োনা, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়োনা, তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়োনা। সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীত-কেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই

লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্ত্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহবা দাস্যবৃত্তি, কেহবা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়, এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোমসাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যেদিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরব-চূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারিদিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র য়িহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোমসাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের যেমন প্রবল মূর্ত্তি, য়িহুদি সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

য়িহুদিদের ধর্ম্ম স্বজাতির গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোবা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু য়িহুদিদের সনাতন আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্রমর্ম্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃত-

বাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি য়িহুদি ঋষিগণ পরম দুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্রজ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে তাহাদের বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্ম্মের দ্বারাই য়িহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতি লাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে য়িহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসঙ্কলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম্ম-পালনের মূলে যে একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে য়িহুদিরা আপনাআপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র য়িহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেককারী যোহন্‌ যখন য়িহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। য়িহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি ত রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন করিবে কি করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, সয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত য়িহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়া ছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই সর্ব্বত্রব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক্ দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; "যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।" "ধীরাঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাহা সর্ব্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। যেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না; যেখানে যে নত সেই

উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে।' এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র, আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্ত্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও, বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য, কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন, মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছু দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই সয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা, তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে

আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে, আর, আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে মানকে দেখে, তখনি আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আচারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না, কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই; যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলি ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সঙ্কীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া নৈবেদ্য দিয়া বস্ত্র দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক্ তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চ্চনাদ্বারা দিন রাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দূর দেশ দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—কেননা; যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে

মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে; কারণ, এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে উহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখ বহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। দুর্ব্বলের নির্জ্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা—দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কারের গৌরব নহে—কারণ অহঙ্কারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক তাহার নিজের মধ্যে স্বত উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ যিশুর এই বাণী 'কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না—তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মত নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ব্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে—শক্তিউপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্ব্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে

নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাহাদের পিতার গৃহে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সঙ্কোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

দক্ষিণ রায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন সাহ গৌড়ের বাদসাহ হইলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ের বাদসাহগণ দিল্লীশ্বরের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আরব্যোপন্যাসেও দেখা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড় বাদসাহের সেনাপতি উড়িষ্যার গজপতির নিকট হইতে হিজলী অধিকার করেন। ক্রমে পিছলদহ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যবিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তখনও হিন্দু ভূস্বামিগণ নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিলেও কার্য্যত স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৩৩৭ সালে সপ্তগ্রামে মুসলমান সুবাদার, তৎপরে লাউপালাগ্রামে মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইলেও ভূস্বামিগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

গোরাগাজি বা পীর গোরাচাঁদ হিজলির মুসলমান সেনাপতির পুত্র—এই সময়ে, বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ দৈবীশক্তিসম্পন্ন ফকির হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বারো জন সাগরদ্বীপে গিয়াছিলেন। অপর দশ ব্যক্তি আধুনিক নদীয়া যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার অনেক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পীর একদিল সাহেব পরগণা আনরপুরে, গোরাগাজি সাহেব বালিণ্ডায় মবারক সাহা বারুইপুরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই এখন পীর নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মবারক সাহাকে সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে ব্যাঘ্রের বিধাতা বলিয়া সকলেই জানে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের হিত করিতেন বলিয়া মবারক সাহা হিন্দু মুসলমান সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। এখনও সকলে ভক্তির সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু গোরা গাজি সাহেব সে প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি যে কেবল হিন্দুকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে, তাহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রথমেই বালিণ্ডায় আড্ডা স্থাপন করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ নগরে মুকুট রায়ের রাজ্যে ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন কালু নামে তাঁহার এক শিষ্য বা ভ্রাতা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঐ কালুকে দিয়া তিনি মুকুট রায়ের সুভদ্রা নামে অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এ প্রস্তাব ছলমাত্র। মুসলমান বিদ্বেষী মুকুট রায়কে জব্দ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন মুকুট রায় ক্রুদ্ধ হইয়া এমন কোন কাজ করিবেন যাহাতে তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইবার ছল খুঁজিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না। মুসলমান রচিত গ্রন্থে দেখা যায় কালু যেমন মুকুট রায়ের সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন অমনই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মুকুট রায় কালুকে কারারুদ্ধ করিলেম। এবং মুসলমান দর্শন ও সম্ভাষণের জন্য উপবাসী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সংবাদ অবিলম্বে গোরাগাজির নিকট পৌঁছিল। তিনি বাদসাহ হুসেন সাহার নিকট উক্ত সংবাদ পল্লবিত ও নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পাঠাইলেন। মুসলমানের রাজ্যে সামান্য বিধর্ম্মী কাফেরের নিকট সত্যধর্ম্মপ্রচারক ফকিরের অপমান—ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? এরূপ অপরাধের শাস্তি বিধর্ম্মীর প্রাণদণ্ড। তাহাতেও রাগ যায় কি? কাজেই মুকুট রায়ের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য বাদসাহী আদেশ প্রচারিত হইল। দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষত হিজলীর বাদসাহী শাসনকর্ত্তাগণ গোরাগাজির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। বালিণ্ডার অন্তর্গত হাড়োয়া নামক স্থানে সৈন্য সমবেত হইতে লাগিল। সমস্ত সাহায্যকারী সৈন্য উপস্থিত হইলে নৌকা-যোগে ব্রাহ্মণ নগরে আসিয়া সহসা আক্রমণ দ্বারা নগর হস্তগত করিবার মতলব স্থির হইল। তদনুসারে চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ নগরে একদল বণিক বানিজ্যার্থ আসিতেছিল। তাহারা এই ব্যাপার অবগত হইয়া যথাসম্ভব সত্বর গতিতে আসিয়া রাজা মুকুট রায়কে এই সংবাদ প্রদান করে। সেনাপতি দক্ষিণ রায় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ নৌসেনা সংগ্রহ করিয়া বালিণ্ডা অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার ছিপগুলি এক রাত্রিতেই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছিল। প্রাতে দক্ষিণ রায় বজ্রপাতের ন্যায় শত্রুদিগের

উপর পতিত হইলেন। অতর্কিত আক্রমণের জন্য গোরাগাজি প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহার সৈন্যগণ সহজে পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিল। গোরাগাজি ও তাঁহার ভগিনী রোসন বিবি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইলেন। ইছামতী তীরে তারাগুনিয়া গ্রামে তিতু মিঞার পূর্ব্বপুরুষ সৈয়দ সাদাউল্লার নিকট আশ্রয় লইয়া গোরাগাজি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পরে গোরাগাজি উক্ত সাদাউল্লা ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রোসন বিবির বিবাহ দিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সংবাদ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের নিকট পৌঁছিল। কিন্তু কিছু দিন এ অপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইল না। সম্ভবত গৌড়েশ্বর তখন উড়িয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অথবা অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় কিছুদিন মুকুট রায়কে নষ্ট করার অবসর পাইলেন না। দক্ষিণ রায় বুঝিয়াছিলেন গৌড়াধিপের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং তিনিও চুপ করিয়া ছিলেন না। রাজ্যের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে নৌসেনা সংস্থাপন করিয়া সৈন্য সুসজ্জিত করিলেন।

কতকগুলি মুসলমান লেখক বলেন গাজি সাহেব একবার কতকগুলি ভেড়া লইয়া ব্রাহ্মণ নগরে আসিবার জন্য নদী পার হইয়াছিলেন। এবং পাটুনিকে একটি ভেড়া পারাণীর মূল্য স্বরূপ দিয়াছিলেন। রাত্রিতে সেই ভেড়াগুলি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ভেড়া বাঘ হইতে দেখিয়া পাটুনীও ভয়ে অভিভূত হয়। কিন্তু দক্ষিণ রায় যুদ্ধে আসিয়া ব্যাঘ্রদিগকে নিগৃহীত করেন এবং তাহারা পলাইতে বাধ্য হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে গাজি সাহেব প্রচ্ছন্নভাবে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যগণকে ছদ্মবেশে আনিয়াছিলেন। পরে তাহারা রাত্রিকালে নগর আক্রমণ করিলে দক্ষিণ রায়ের বাহুবলে পরাস্ত হইয়া দূরীভূত হয়। এইরূপ কুম্ভীর সৈন্য লইয়া বারান্তরে গাজি সাহেব দক্ষিণ রায়কে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে বারও পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুম্ভীর লইয়া আগমন সম্ভবত নৌ-সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ জলে ও স্থলে বার বার পরাজিত হইয়া এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গোরাগাজি পুনরায় গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দান

৫

মানুষের জীবনে এমন এক একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে যে সময় সে তাহার সমুদয় সুখ দুঃখ লাভ লোকসানের খতেন ভুলিয়া—এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়া অন্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সঁপিয়া দিয়া বসে। তখন নিজেকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়া অপরের জন্য কোনো একটা কিছু কাজ কোনো একটা প্রবল আত্মবিসর্জ্জন না করিতে পাইয়া বুকের মধ্যে প্রাণটা যেন রুদ্ধদ্বার লোহার খাঁচায় টিয়া পাখীর চঞ্চুর আঘাতের মতন খোঁচা মারিতে থাকে। মনের মধ্যে যখন সেই আত্মত্যাগের স্রোতময় উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠিয়া তাহা তটের উপর আছড়াইয়া পড়িতে চাহে তখন মনেও করে না সেই উচ্ছ্বাসের আবেগ তাহাকে সেই আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতে পারে!

লোটির সহিত সাক্ষাতের পর হইতে আমার মনে যে নূতন ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটাকে বুকে করিয়া লইয়া সেদিন সারা দিনটাই আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। জানালার বাহিরে মাসীমার বাগানে কোন্ সময় জানিতে পারি নাই বসন্তের বুঝি শুভাগমন হইয়াছিল, ছোট নদীটি গ্রীষ্মের আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই শীর্ণ হইয়া বালু-শয্যার উপরে অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করিয়া নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যালোকে তাহার তলস্থ কম্পিত নুড়িগুলি ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, বসন্তের বাতাস তাহার অঙ্গে পুলক-স্পন্দন আনিতেছিল, ও আকাশের প্রতিবিম্ব তাহার বক্ষে মৃদু আবেগের মতো কম্পিত হইতেছিল। বই খানা মুড়িয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া একবার ভালো করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। নদী-তীরে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ যুগ-যুগান্তরের সাক্ষীস্বরূপ নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মস্তক হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ জটাজাল নামিয়া ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার অবিরল শাখা প্রশাখার মধ্যে কোনো একটি নীড়ে সদ্য-প্রত্যাগত একটি পাখী মৃদু কাকলীতে সন্তানগুলির সহিত আলাপ করিতেছে। এ সমস্তই পুরাতন দৃশ্য, প্রায় প্রতিদিনই আমি ঐ নদী-তীরে ঐ বৃক্ষ-তলে ভ্রমণ করিয়া আমি এই জানালায় দাঁড়াইয়া ঐ শাখাজাল-নিবদ্ধ তরু-শ্রেণী-তলে সূর্য্য কিরণের নিভৃত লুকোচুরি খেলা অন্ধকারের গভীর সুপ্তি চাহিয়া দেখি। ঘন পল্লবের মর্ম্মরিত দীর্ঘ নিশ্বাসে,

সন্ধ্যার স্তব্ধ তন্ময়তায় এবং তরুতল-বিচ্যুত ঝরা ফুলের গন্ধের সহিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসা আর একটা মধুর মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনিতে সহসা আজ আমার জাগ্রত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! একটা অজানা আনন্দে প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! আনন্দে কি বেদনায় বলিতে পারি না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুরবাঁধা বেহালার তারের মতন আমার হৃদয়-তন্ত্রি কয়টা আপনা আপনি কোন এক অজ্ঞাত অঙ্গুলির স্পর্শ-সুখে বিহ্বল হইয়া বাজিতে লাগিল! মনে হইতে লাগিল—এ সুর যেন বিশ্বের বুকের মাঝখানে যে একটি মৃণাল-তন্তুর মতো সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপী অচ্ছিন্ন তন্ত্রিজাল পাতা আছে তাহারি মধ্যে বাঁধা ছিল! আজ বিশ্বের মাঝখানে আমি আমার চিত্ত-কমলের মধু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছি, আমার আলোক, আমার পুলক, আমার বসন্ত, আমার জ্যোৎস্না সমস্তই আজ বিশ্বের বিরাট প্রান্ত ছুঁইয়া আসিয়া আবার আমার নিবেদিত উৎসর্গিত চিত্তকে স্পর্শ করিতে লাগিল! প্রকৃতির মর্ম্মোচ্ছ্বাসময় আলিঙ্গনে নিঃশব্দে কণ্টকিতচিত্তে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া দিলাম,অন্তরের মধ্যে তাঁহারি মতো উদার উন্মুক্ত অবাধ স্বাধীন ও তেমনিতর সর্ব্বত্র বন্ধন-সুখ অনুভব করিতে করিতে নতমস্তকে বলিলাম,--'তুমি ধন্য, তোমার মতন আমিও তৃপ্ত হইতে চাই, ধন্য হইতে চাই।" প্রকৃতির অদৃশ্য করাঙ্গুলি তাহার দক্ষিণা বাতাসের সমস্ত পুষ্প-পরিমল লইয়া তাহার স্নেহ-স্পর্শের মতন আমার আনত ললাটের চারি পাশে ফিরিতে লাগিল। তাঁহার অনিমিষ দৃষ্টি দূরে ও নিকট হইতে আসিয়া উঠিয়া কোমল-স্নেহে আমার নবোচ্ছ্বাস-দীপ্ত মুখের উপর জাগিয়া রহিল! বৃক্ষলতা হইতে প্রকাণ্ডকায় বটবৃক্ষ এবং পরস্পরের ছায়া-ঢাকা বন-বীথী সকলেই মর্ম্মর তানে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে পত্র পুষ্প বর্ষণ করিয়া কহিল,—"তুমি এসো, তুমি আমাদের মতন হও,—তুমি আমাদের কাছে এসো।"

পুরস্কৃত বালিকা পুরস্কার বস্তুটিকে যেমন গর্ব্বিত আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুরস্কার প্রদাত্রীকে মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া আমার পুরস্কার, আমার উচ্ছ্বাস, আমি বক্ষে সংযত করিয়া—মাথা নীচু করিয়া জগতের রাজরাজেশ্বরীকে পুনঃপুন প্রণাম করিলাম। খুব একটা গুমোট করিয়া স্নিগ্ধ সুবিমল বারি-ধারায় ধূসর ধূলিজাল ও নিদারুণ উত্তাপ ঘুচাইয়া ধরণী-বক্ষ শীতল করিয়া যখন বর্ষার বাতাস প্রথম বহিতে থাকে,

তখন প্রকৃতির অঙ্গ যেমন নবীন স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় ভরিয়া উঠে, তাঁহার মুখে যেমন একটি পরিতৃপ্তির ভাব দেখা যায়, আমিও বোধ হয় সেই রকম একটি তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ করিয়া সেদিন আগতপ্রায় সন্ধ্যায় আমাদের উদ্যানে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন বাতাস একটু এলোমেলো বহিতেছিল। আমার 'পিন্'-বদ্ধ নীল আকাশের মতো নীল রঙের আঁচল খানা,দড়ি-বাঁধা নৌকার পা'লের মতন সেই দক্ষিণা বাতাসে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কপালের উপর এবং কানের পাশে কতকগুলো শ্লথ চূর্ণ কুন্তল বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকিত, তাহারা এবং শৃঙ্খল-মুক্ত হরিণ-শিশুর মতন আরো কয়েকটা গুচ্ছ সেই বাতাসে চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়া চঞ্চল-ক্রীড়াচ্ছলে আমায় বিরক্ত করিয়া তুলিল! মনটা তখন খুব উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল, প্রকৃতির মতন হঠাৎ ততখানি গাম্ভীর্য্য হইতে নামিয়া একেবারে এতদূর চাঞ্চল্য দেখানো মানুষের আত্ম-মর্য্যাদার অনুকূল নয়। মনে যে বিচিত্র আলো জ্বলিতেছিল পাছে তাহাতে ছায়াপাত করে তাই হাস্যোচ্ছ্বসিত সুখী প্রকৃতির পানে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলিলাম। আমার গলায় সেদিন একগাছি অম্লান মুক্তার ছোট মালা ছিল,হাতের চুড়ি কয়গাছি মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল! আকাশের একখানা চঞ্চলগতি চলন্ত তরল মেঘের মতন লঘু বলিয়া নিজেরি আজ অনুভব হইল। যেন এখানের মাটিতে না বেড়াইয়া আর কোন অদৃশ্য নূতন জগতে নব বসন্তের শোভাকীর্ণ বনবীথীকায় বনদেবীর মতন বেড়াইবার জন্য আজ আমার ডাক আসিয়াছে! সেখানকার পুষ্প-কুঞ্জ, সেখানকার তরু-মর্ম্মর, সেখানকার ছায়া-নিপতিত অপরাহ্নের রবি-রশ্মি, সেখানকার স্মিত হাস্যময়ী করুণোজ্জ্বলা প্রকৃতি, সেখানকার সন্ধ্যা-শ্রী সমস্তই এখান হইতে বিভিন্ন! আমার প্রতিদিনকার জগৎ আমার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিতে লাগিল! নিজেকে আজ জগতের কেন্দ্রস্থলে অভিষিক্তা মহিমাময়ী নারীরূপে 'তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য সমুদয় আলোক এবং সমুদয় সঙ্গীতের সারভূতা বলিয়া কল্পনা করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল! পৃথিবীর ছোট বড় কামনা বাসনা সব আজ সকরুণ স্নেহে নিজের কাছ হইতে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর মধ্যেই বিলাইয়া দিয়া নিস্ব হইয়া বসিবার জন্য প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল!

কিন্তু মধ্যপথেই আমার নির্জ্জন কল্পনা আমার সুকুমার দিবা-স্বপ্ন সহসা

একটি অতর্কিত সম্বোধনে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সেই সময় বসন্তের দক্ষিণ বাতাস জগতের সমুদয় সার্থক কবিত্বের বিজয় সঙ্গীতের মতন হু হু করিয়া বহিয়া গেল! গাছ-ভরা কুন্দ ও বেলফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া আমার চূর্ণালকগুলি চোখে মুখে আনিয়া ফেলিল! আমার বীণা তাল কাটিয়া ফেলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া আবার নূতন রাগিনীর সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিল! নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম! (ক্রমশ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

প্রত্যাবর্ত্তন (৩)

লাহোর হইতে সোজা পথে "গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন" দিয়া দিল্লী যাইব মনে করিয়া যখন দেখিলাম, অমৃতসর দিয়া সাহারাণপুর হইয়া যে লাইন গিয়াছে, সে পথে গেলেও ভাড়া একই, তখন আর একবার অমৃতসর দেখিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। ফলত অমৃতসর 'গুরু দোয়ারা' আমার এত ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই আমি আবার অমৃতসরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার আমার "প্রত্যাবর্ত্তন" বাস্তবিক আরম্ভ হইল। উত্তর সীমা হৃষিকেশ হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দক্ষিণে অমৃতসর আসা পর্য্যন্ত "হিমালয় ভ্রমণ" প্রবন্ধের শেষ করিয়া, এবং "প্রত্যাবর্ত্তন" প্রবন্ধ আরম্ভে অমৃতসর হইতে লাহোর যাওয়া তাহাও গমন পক্ষেরই বৃত্তান্ত। যাহা হউক বেলা অনুমান ৪ টার সময় অমৃতসর আসিয়া প্রথমে দরবারার সেই ভজনানন্দ কিছুক্ষণ সম্ভোগ করিলাম। আজ আর সেই সাধুজীকে তথায় দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরে বংশীধর, মুরলীধরের দোকানে গিয়া মুরলীধরের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলাম "আমি এখান হইতে একেবারে দিল্লী যাইতে চাই, কিন্তু আমার নিকট সম্পূর্ণ ট্রেণভাড়া নাই; এক টাকা কয়েক আনা আছে।"

মুরলীধরকে এই কথা বলিবার পূর্ব্বে আমার মনে একটু সন্দিগ্ধ ভাব ছিল, একথাও সত্য যে, তার পূর্ব্বেও আমি আরো একটু ভাবিয়াছিলাম যে, তাইতো! আমার নিকট এক টাকা কয়েক আনা আছে, কিন্তু দিল্লীর ভাড়া তিন টাকা কয়েক আনা; মধ্যে আর কোথাও হইয়া যাইতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই অতএব মুরলীধরকে বলা ভিন্ন আর উপায় কি?

সাধারণত দেখা যায়, যখন যে কোনো ভাবে হউক না, নিজস্ব একটা ইচ্ছা প্রবল হইয়া পড়ে তখনই যেন ভগবানের করুণার প্রতি নির্ভরের ভাব কমিয়া আসে। এই সুযোগে সয়তান আপনার রাজ্য বিস্তারে অর্থাৎ নিজের মনের মধ্যে যে একটা দুর্ব্বলতার ভাব আছে তাহা মনকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু ভগবান যে আমাকে তাঁহার করুণার মধ্যে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন তাহাই তিনি জীবনের এই শুভ সুযোগে দেখাইলেন, এ ক্ষেত্রে তিনি আমার আব্দার বজায় রাখিলেন। মুরলীধর আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রসন্নভাবে দুই টাকা প্রদান করিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে চলিয়া আসিলাম। দিল্লীর টিকিট করিতে ৩৸৶০ আনা লাগিল। রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় ট্রেন ছাড়িল।

টিকিট করিয়া এক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। দিল্লী পর্য্যন্ত টিকিট হইল, এই আনন্দে—"রাত্রিতে যদি কিছু খাওয়া না হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?" এই ভাব মনের উপর এমন জোর করিয়া ছিল যে, তখন কোন অভাব বোধ আসিতেই পারিল না। এক পয়সার ছোলা সিদ্ধ লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। কতক নিদ্রায় কতক জাগরণে রাত্রি শেষ হইল। মন খুব সুস্থ, অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত। দয়াল নাম-স্মরণ বেশ যেন মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

প্রাতে ষ্টেসনে (নাম স্মরণ নাই) আধ ঘণ্টার জন্য গাড়ি থামিল। হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম। "চাই জল খাবার, চাই গরম দুধ" ইত্যাদি রব শুনিয়া মনকে ঠিক রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ রাত্রিতে এতটা সংযম চলিয়াছে, কিন্তু উপায় কি? বসিয়া আছি। আমার কামরায় একটি হিন্দু-স্থানী লোক পুরি তরকারি ইত্যাদি কিনিবার সময় আমার দিকে ২।১ বার দৃষ্টি করিল। তাহার মুখে কতকটা সাত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখিয়া কেমন আমার মনে একটু ভাব আসিল, বলিলাম "কুছ্ খানেকো মিলনে সক্তা?"

"ক্যা চাইয়ে মহারাজ?"

"যো কুছ তুম্‌হারা ইচ্ছা"।

অতঃপর সে ব্যক্তি বোধ হয় এক পোয়া পুরি ইত্যাদি প্রদান করিল।

এইরূপ ঘটনা অনেক সময় হয়তো আমাদের মনে সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে ঘটনায় ভগবানের প্রকাশ দেখায় তাহাতো সামান্য নহে। ফলত আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই সামান্য নহে। আমাদের জড়তার মধ্যে যে ঘটনা ঘটে তাহাকে মহৎ করিয়া দেখিতে পারি না, জীবনে যখন

শুভক্ষণ আসে তখনকার ঘটনাগুলি সাধারণ বুদ্ধির অতীত রাজ্যের অনেক সংবাদ প্রকাশ করে।

ট্রেন চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা হইয়া গেল। 'টাইম-টেবল্' দেখিয়া পূর্ব্বেই জানিয়াছি (এ শ্লো প্যাসেঞ্জার ট্রেন) বেলা ২টার পর দিল্লী পৌঁছিবে। তার পূর্ব্বে ক্ষুধা যতই হউক, আরতো কোনো উপায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া আ'ছি, এমন সময় পাশের কামরা হইতে একজন পাঞ্জাবী শিখ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ ভোজন করেঙ্গা ?"

"করণে সক্তা।"

"বহুৎ আচ্ছি" বলিয়া নিজেদের কামরায় চলিয়া গেল। আমি ইতি পূর্ব্বে কয়েকবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে ৭।৮ জন শিখ, অনেক অ.সবাব সঙ্গে, এক কামরা পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। পরে জানিলাম তাহারা এক রাজার সঙ্গী কারপরদাজ, রাজা ফাষ্ট কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাশে আছেন, তাহারা দূরে চলিয়াছে, সঙ্গে পর্য্যাপ্ত খাদ্যাদিও আছে। যখন তাহাদের আহারের সময় হইল তখন আমাকে বোধ হয় সাধু-বেশী দেখিয়া, আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া আহার করা তাহাদের নিয়ম বিরুদ্ধ, কিম্বা ইহার মধ্যে বিধাতার আর কি খেলা ছিল, তাহা তখন তো তেমন যেন বুঝিতে পারি নাই, এখন যত ভাবি মনে হয় এ সকল কি রহস্য !!

একটু পরেই সে ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহাদের কামরায় লইয়া গেল এবং এক খানি থারিয়ায় (থালায়) যথেষ্ট পুরি তরকারি মিষ্টান্ন দধি পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া দিল। আহার করিয়া যথাস্থানে আসিয়া বসিলাম, তাহার পর গাড়ি ছাড়িল এবং আড়াইটার পর দিল্লী পৌঁছিলাম।　　(ক্রমশ)

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

অহিফেণ। প্যাপেভারেসী জাতীয় প্যাপেভার সামনিফেরাম্ নামক গাছের অপক্ক ফলকে অল্প অল্প চিরিয়া দিলে উহার গাত্র হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হয়। ঐ রস বায়ুতে শুষ্ক হইলে যে পাটলবর্ণ পদার্থ হয়, তাহাকে অহিফেণ বলে। তুরস্ক, মিশর এবং ভারতবর্ষে অহিফেণ জন্মিয়া থাকে।

তুরস্ক দেশীয় অহিফেণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অহিফেণের যে সকল বীর্য্য আছে তন্মধ্যে মর্ফিয়া নামক বীর্য্যই প্রধান; কারণ অহিফেণের মাদকতাশক্তি এই মর্ফিয়ার উপর নির্ভর করে।

অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ন্যায় অহিফেণও মস্তিষ্কের উত্তেজক। ইহা সেবনের অব্যবহিত পরেই মস্তকে অল্পভার বোধ হয়, প্রাণে আনন্দোদয় হয় এবং শারীরিক শ্রমপটুতা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু শীঘ্রই আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে অনেকেই কোন পীড়া বিশেষের শান্তি লাভের জন্য প্রথমে অল্পমাত্রায় অহিফেণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহার এমনই আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, প্রথম-ব্যবহৃত মাত্রা কখন স্থির থাকে না। দিন দিন ইহার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পরিশেষে অহিফেণসেবী ভয়ানক দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। ইহা দ্বারা রোগের শান্তি অনেক স্থলেই হয় না, অধিকন্তু ইহা নিজেই তখন শরীরে নানা-বিধ নূতন রোগ আনয়ন করে। অহিফেণ সেবনের নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে অহিফেণসেবী কিরূপ অস্থির হইয়া পড়ে তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় অহিফেণ সেবন করিলে শরীর শীর্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন অহিফেণসেবীর ধারণা ইহাদ্বারা পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অজীর্ণ রোগীকে অল্প অল্প অহিফেন ব্যব-হার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এতৎ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সিড্নি রিঙ্গার (Dr Sydney Ringer) মহোদয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Taken into the stomach; opium lessens both its secretion and its movements, and consequently checks digestion."

অহিফেন দ্বারা প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়; চর্ম্মের স্পর্শানুভব হ্রাস হয় এবং কখন কখন সমস্ত গাত্রে চুলকানি উপস্থিত হয়। অহিফেণসেবীর আদৌ সুনিদ্রা হয় না। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অকালে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সুরার কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পূজা

—০:0:—

ভরি লয়ে সাজি বাহিরিনু আজি
পূজিবারে দেবতায়,
শূন্য আকাশে দেবতা-সকাশে
হের হের পূজা যায়।
হৃদয় কালিমা শূন্য নিলীমা
মাখিল আপন অঙ্গে,
ঢালি দিনু তার চরণে আমার
কালো যাহা ছিল সঙ্গে।
কালো সনে কালো মিলাইয়া গ্যালো
কালের কালিমা শেষ,
নিরখিল হৃদি সে কাল-জলধি
কালের সে কালো বেশ।
না জানি কেমনে দেবতা গোপনে
ছিল সে কালোর মাঝ,
কালো করি পার আলোকে আমার
পূজা তুলি' নিল আজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৪)

কুশদহে—গোরবডাঙ্গায় ও ইছাপুরে যমুনা নদীর তীরে কার্ত্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় "ধর্ম্ম সন্ন্যাস" নামে বুদ্ধ দেবের পূজা উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে।

পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মপাল নামক পাল বংশের একজন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিবার সময় প্রচারক দ্বারা বাংলা দেশের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়া ছিলেন। সে সময়ে এই কুশদহে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। কারণ উক্ত "ধর্ম্মসন্ন্যাস" মূর্ত্তির দ্বারা হইয়া

থাকে। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে লোক পাঠাইয়া ছিলেন তাহারা বুদ্ধ দেবের উপদেশ অনুসারে চলিতে শিক্ষা দিয়াছিল। কালে লোকে সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহার (বুদ্ধদেবের) মূর্ত্তি পূজায় রত হইল। ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হয়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। বুদ্ধ দেবের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পূজা হইত তাহা কালে হিন্দু পূজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন এই কুশদহে ধর্ম্মপাল দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয় তখন এখানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বাস ছিল না। সম্ভবত সে সময়ে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। কালে তাহারা মুচি এই নীচ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সেই সময়ের অনার্য্য জাতি এই মুচির দ্বারা এই ধর্ম্মসন্ন্যাসের পূজাদি হইয়া থাকে। মুচিরা এক্ষণে গোচী অর্থাৎ পাপ-মুক্ত জাতি বলিয়া আর্য্য জাতির মধ্যে স্থান পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

"কুশদহ" এই নাম কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা রাখা হয় তাহার কোনো স্থিরতা নাই। মাধব সেন যখন বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন তখন নবদ্বীপ বারোটি উপ-বিভাগে (দ্বীপে) বিভক্ত ছিল। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতে এই উপ-বিভাগ গুলির মধ্যে কুশদ্বীপও লিখিত হইয়াছে। মাধব সেনের সময় নবদ্বীপ যে দ্বাদশটি বিভাগের অগ্রণী ছিল নিম্নে সেই কয়টি লিখিত হইল। ইহাতে কুশদ্বীপের কথাও লিখিত আছে। মাধব সেন ও তাহার বংশধরেরা ১০০০ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে "কুশদহ" ১০০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বেও কুশদ্বীপ নামে অভিহিত হইত।

১ম। অগ্রদ্বীপ—উত্তরে মুর্শিদাবাদ প্রদেশ, দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। অতএব দেখা যাইতেছে অম্বিকা পরগণা পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত।

২য়। নবদ্বীপ—ব্রাহ্মণী ও খড়ী নদীর পূর্ব্ব সীমা এবং ভাগীরথীর মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশ।

৩য়। মধ্যদ্বীপ—গঙ্গার পূর্ব্বাংশ জলঙ্গী ইচ্ছামতী ও অঞ্জনা নদীর মধ্য-বর্ত্তী প্রদেশ।

৪র্থ। চক্রদ্বীপ—মথাভাঙ্গার (বর্ত্তমান চূর্ণী) দক্ষিণ, গঙ্গার পূর্ব্ব এবং

যমুনা নদীর উত্তরাংশের ভূমিভাগ চক্রদ্বীপের অন্তর্গত বর্ত্তমান চাকদা।

৫ম। এড়ুদ্বীপ—যমুনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, গঙ্গার পূর্ব্বাংশ, কলিকাতার উত্তরাংশ এড়ুদ্বীপের অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ। প্রবালদ্বীপ—কলিকাতা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। জয়নগর, পলাবাড়ী প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৭ম। বৃদ্ধদ্বীপ—বুড়ান, ধুলেপুর পরগণা, সেনহাটী প্রভৃতি।

৮ম। কুশদ্বীপ—চক্রদ্বীপের পূর্ব্ব, এড়ুদ্বীপের উত্তর ও বৃদ্ধদ্বীপের পশ্চিম ভাগ অর্থাৎ গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর প্রভৃতি কুশদ্বীপের অন্তর্গত।

৯ম। অন্ধুদ্বীপ—চক্রদ্বীপের উত্তর, মধ্যদ্বীপের পূর্ব্ব, কুশদ্বীপের পশ্চিম এবং করতোয়া বেত্রবতী নদীর দক্ষিণাংশ।

১০ম। সূর্য্যদ্বীপ বা যোগীন্দ্রদ্বীপ—ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, ইছামতীর পূর্ব্ব ও উত্তরাংশ করতোয়ার উত্তরাংশ, কপোতাক্ষ নদ ও বড়গঙ্গার পূর্ব্বাংশস্থিত প্রদেশ।

১১শ। জয়দ্বীপ—ভৈরব নদের উত্তর, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী ও গৌরী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ।

১২শ। চন্দ্রদ্বীপ—বাক্‌লা নামে কোন প্রসিদ্ধ স্থান।"

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

বেড়গুম

(প্রাপ্ত)

গোবরডাঙ্গার তিন মাইল পশ্চিম দক্ষিণে কুশদহ সমাজের অন্তর্গত বেড়গুম গ্রাম অবস্থিত। খুলনা রেল লাইনের, মসলন্দপুর ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পশ্চিম-উত্তরে পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখীন, বৃক্ষাদিতে পরিবৃত হইয়া বেড়গুম এখনও অতীতের শান্তিময় নিস্তব্ধতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কতকগুলি জনশ্রুতি প্রবাদ বাক্য এবং ঐতিহাসিক দুই একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রাম সংক্রান্ত পূর্ব্ব বিবরণ লিখিত হইল।

অতীত কালে এ প্রদেশ সমুদ্রগর্ভে নিহিত থাকিয়া তৎপরে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে অদ্যাপি

পুষ্করিণী খনন করিতে গেলে নৌকার জীর্ণ কাষ্ঠ, পেরেক ইত্যাদি পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

বেড়গুমের উত্তরে "ঝোর" নদী বর্ত্তমানে যাহার নাম "ঝোরা" এক্ষণে সামান্য খালরূপে পরিণত হইয়াছে। এক সময় ইহা স্রোতস্বতী ছিল। প্রবাদ আছে, বঙ্গের সুবাদার মানসিংহ যখন মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন, তৎকালে রসদপূর্ণ বৃহৎ নৌকা সকল এই নদী দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল। এই নদী বালিয়ানী গ্রামের নিম্নে যমুনা নদী হইতে বহির্গত হইয়া বেড়গুমের উত্তরাংশে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি গ্রামের দক্ষিণ বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে চাবড়া, মানিকনগরের মধ্যদিয়া গুমার সন্নিকটে পদ্মা নামক নদীতে সম্মিলিত হইয়াছে। এই পদ্মা নদী পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রবল ছিল। এই নদী ইছামতীর সহিত মিলিয়াছে। ঝোরার দ্বিতীয় শাখা বেড়গুমের উত্তরাংশ হইতে যথাক্রমে কলাসিম, ধর্ম্মপুর, জলেশ্বরের পশ্চিম দিয়া চণ্ডীগড়ের অনতিদূরে পুনরায় যমুনায় মিলিয়াছে।

১১০৬ সালের পূর্ব্বে এই জঙ্গলাবৃত গ্রামে যখন মাত্র কয়েক ঘর কর্ম্মকার ও গোপের বাস ছিল, তখন সর্ব্বপ্রথমে সনাতন ও জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় দুই সহোদরে এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে ছিল। ১১০৬ সালের কিছু পূর্ব্বে ইছাপুরের সিদ্ধপুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশকে জব্দ করিবার জন্য মহারাজা প্রতাপাদিত্য, গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে, বর্ত্তমান প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া যখন শিবির স্থাপন করেন, তখন সম্ভবত ইছাপুরবাসী অনেকেই ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। সনাতন ও জনার্দ্দনের বেড়গুম বাসের ইহাই কারণ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সনাতন খুব বলবান এবং কনিষ্ঠ জনার্দ্দন ধর্ম্মভীরু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে গিয়া, মল্লিকপুর, বালিয়ানি, বেড়গুম, জানানগর (বর্ত্তমান জানাপোল) প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম পাট্টা লইয়া আসেন। প্রথমে মল্লিকপুর কিম্বা বালিয়ানি বাস করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ঝোরা নদী পার হইয়া বেড়গুমে আসিয়া দেখিলেন উত্তর-বাহিনী ঝোরা নদী অগাধ বারি-রাশি বক্ষে লইয়া হেলিতে দুলিতে, নাচিতে নাচিতে প্রবলবেগে যমুনার দিকে চলিয়াছে। গ্রামের এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অথবা কয়েক ঘর গরীব

অধিবাসীকেই প্রিয় বোধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

জঙ্গল কাটিবার সময় দেখেন তন্মধ্যে এক বিশাল মনোহর সরোবর শোভা পাইতেছে। এই সরোবরের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদিগের বসবাসের উদ্যম আরো বর্দ্ধিত হইল। এই সরোবর বর্ত্তমানে দীঘী নামে প্রচলিত এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়, তথাপি ফাল্গুন চৈত্র মাসে পদ্ম-পুষ্প বক্ষে ধারণ করত নিজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে এখনো বিস্মৃত হয় নাই।

বর্ত্তমানে সকল রকমেই এই গ্রামের হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ভালো রাস্তা নাই। যাহা আছে ক্রমশ জঙ্গলাবৃত হইতেছে। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র বড় রাস্তা হাবড়ার অনতিদূরে যশোহর রোডে মিলিত হইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। গোবরডাঙ্গার চাটুজ্যে বংশের প্রাতস্মরণীয় স্বর্গীয় শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১২৫৯ সালে যশোহর রোড হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত ৬ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া ও বেঁড়গুমের পূর্ব্বাংশে এই রাস্তার ধারে একটি পুষ্করিণী দান করিয়া কুশদহবাসীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে উভয়েরই অবস্থা মন্দ হইয়াছে। রেল হওয়ায় যদিও এ পথে ভদ্র লোকের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে তথাপি মাল বোঝাই গাড়ী এবং অপর সাধারণের এখনো এই পথেই যাতায়াত করিতে হয়। এখন এই রাস্তা জেলা বোর্ডের অধীন হইয়াছে; ইহার বর্ত্তমান অবস্থার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বেড়গুমের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের কাছারী বাড়ির নিকট ঝোরা নদীর তীরে ১২৪০ সালে জমিদার মহাশয় দিগের এক নীলকুঠী হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান দেখা যায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

আঙুর—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। ৩৫।৬।২ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানিপুর হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত মূল্য আট আনা—বাঁধাই দশ আনা।

এখানি ছোট গল্পের বই, ইহাতে এগারোটি মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষক গল্প

আছে। অল্প স্থানের ভিতর একটি ছবি আঁকিয়া তাহাতে একটা উচ্চ ও পবিত্র ভাব ফুটাইয়া তোলা যেমন চিত্রশিল্পীর নিপুণতার পরিচায়ক, ছোট গল্পের ভিতর একটি সম্পূর্ণ ছবিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অঙ্কিত করাও তেমনি গল্পলেখকের কৃতিত্বের নিদর্শন। পাঁচুবাবুর 'আঙুর' এই শ্রেণীর বই। ইহার প্রত্যেক গল্পই খুব ছোট অথচ সেগুলি লিপিচাতুর্য্যে, ভাব মাধুর্য্যে ও ভাষার বিচিত্র লীলায় এমনি মনোহর হইয়াছে যে পড়িলেই মনের ভিতর একটি সঙ্গীতের মতন সুমধুর অথচ নির্দ্দোষ পবিত্র ছবি অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকে। 'আঙুরে'র সমস্ত গল্পগুলিই ছবির ন্যায় উজ্জ্বল—কবিত্বে রসে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ 'আঙুরে'র এই পূত ও মিষ্ট রসে যে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

ইন্দ্রিয়-গ্রাম—শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্য মিশন দ্বারা প্রকাশিত, স্বদেশ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

শরীর কিভাবে রক্ষিত হইলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে নিয়মিত হইলে রিপুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এবং তাহাতেই যে শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক শান্তি সম্পাদিত হইতে পারে; এই সমস্ত বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ নিজ জীবনের অনেক পরীক্ষিত ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে অনেকের উপকার হইতে পারে।

বারাণসী-রহস্য—শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত, মূল্যের উল্লেখ নাই। বোধহয় বিনামূল্যে বিতরিত।

এখানিও লেখকের নিজ জীবনের কয়েকটি ঘটনা এবং কতকগুলি সাধারণ মত ও বিশ্বাসের কথায় পূর্ণ, লেখকের মত বা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমারা কিছুই বলিতে চাহিনা। তবে গ্রন্থ খানিতে বারাণসী সম্বন্ধে দুই একটি জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্যামবাজার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষট্‌পঞ্চাশদ্বার্ষিকী বিজ্ঞাপনী।—এখানি উক্ত স্কুলের ১৯১০ খৃঃ অব্দের কার্য্য বিবরণী।—কলিকাতা মহানগরীতে গভর্ণমেণ্ট বাংলা পাঠশালা ব্যতিরেকে সুন্দররূপে

বঙ্গ-ভাষা শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় না থাকায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মৈত্র ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের যত্নে ৮টি মাত্র বালক লইয়া ১৮৫৫খৃঃ অব্দের ১০ই জুলাই "শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়" নামে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ইহা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসর পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গড়ে ৪ জন হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুশদহ-খাঁটুরা নিবাসী প্রবীণ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মে মাসে নিযুক্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত, আন্তরিক যত্ন সহকারে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে পণ্ডিত মহাশয় এই স্কুলের প্রাণ-স্বরূপ। এমন কি শ্যামবাজার অঞ্চলে এই স্কুল "জগদ্বন্ধু পণ্ডিতের স্কুল" বলিয়াই খ্যাত।

গত বৎসর অনারেবল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ সভার সভাপতিরূপে একস্থানে বলিয়াছেন " * * * আজ আমি যেখানে উপস্থিত হইয়াছি ইহা আমার প্রথম শিক্ষাস্থল এবং প্রধান পণ্ডিত মহাশয় আমার গুরু। * * * প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় বশিষ্টদেবের ন্যায় সুদীর্ঘকাল গুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।"

(সমালোচক)

স্থানীয় সংবাদ

আবার সেই ভীষণ সময় উপস্থিত। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশবাসী আচ্ছন্ন। ভাবিলে আতঙ্ক হয়,—কি এক বিষাদ-কালিমা-ছায়া আসিয়া প্রাণে পতিত হয়। যেরূপ প্রবলবেগে এই লোকক্ষয়-কারিণী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দেশ ধ্বংশ করিতেছে যদি অচিরাৎ ইহার বিশেষ কোনো প্রতিকার সাধিত না হয়, তবে মনে হয়, আর পঁচিশ বৎসর পরে এ প্রদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। গত পঁচিশ বৎসরে কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না? অবশ্য গভর্ণমেণ্ট হইতে এজন্য বহু আলোচনা আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার ফলে ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি,

কিন্তু তাহা আমরা বুঝি কয় জনে, বিশ্বাস করি কয় জনে,—দেশব্যাপী কুসংস্কারে যে আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন, প্রতিকার চেষ্টাই বা কে করে?

ম্যালেরিয়ার অনেকগুলি কারণ থাকিলেও প্রধান প্রতিকার পানীয় জলের বিশুদ্ধি, বাসস্থানের স্যাঁৎ সেঁতে দূর করা, এবং অতিরিক্ত জঙ্গল না রাখা। এগুলি যে আমাদের একেবারেই সাধ্যাতীত তাহা নহে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, দৃঢ়তার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। আহারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে থাকিয়াও অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়।

বেড়গুম হইতে আমরা যে একটি বিবরণ পাইয়াছি তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। এইরূপ কুশদহের প্রত্যেক গ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে আমরা দেশভক্ত গ্রামবাসিগণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

খাঁটুরা নিবাসী পরলোকগত যাদবচন্দ্র মোদকের পুত্র,—পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদকের দুহিতৃ-জামাতা শ্রীমান্ ফণিভূষণ মোদক এবার আই-এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমরা ক্রমশ "কুশদহ"র আকার বৃদ্ধি ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত বিশিষ্ট লেখক লেখিকাগণের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিয়া ইহার উন্নতি-কল্পে, একান্ত চেষ্টা বিস্তর আয়োজন ও অর্থব্যয় করিতেছি; দেশ-ভক্ত, এবং শিক্ষিত মহিলা মাত্রেই "কুশদহ"র গ্রাহক হউন।

গোবরডাঙ্গার ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—বিদ্যোৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের যত্নে এখানে "গোবরডাঙ্গা বান্ধব লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সকলেই ৵০ দুই আনা মাসিক চাঁদা দিয়া এখান হইতে পুস্তক লইয়া পড়িতে পারেন। আশা করি, যুবক সম্প্রদায়ের এই শুভানুষ্ঠানে দেশবাসী সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press 35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from 28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩১৮ ৭ম সংখ্যা।

গান

কীর্ত্তন—খয়রা

(ভক্ত গায়ক—কালীনাথ ঘোষ রচিত)

এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে রয়েছ হে তুমি হরি !
(কিন্তু) মনে ভাবি আমি, কতদূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাসরি !
(আমি পাপী ব'লে)
(যেমন) ছায়াবাজী করে, কত খেলা করে, আড়ালে লুকায়ে থেকে,
(পাছে কেহ দেখ্‌তে পায়)
(তেমনি) আমাদের ল'য়ে, লীলা-মত্ত হ'য়ে, তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে।
(পাছে ধ'রে ফেলি)
(যেমন,) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বন-মাঝে, না জেনেও অলি ধায়,
(ফুল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে)
(তেমনি,) না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে, আমার প্রাণ কোথা যেতে চায়।
(ঘরে রইতে নারে)
(নিজ,) নাভি-গন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ, ছুটে গন্ধ-অন্বেষণে,
(কোথা গন্ধ না জেনে)
(তেমনি,) তোমায় বুকে ধরে', আকুল তোমা-তরে, ছুটে বেড়াই ভব-বনে।
(কোথায় আছ বলে !)

(যেমন,) আলোক-সাগরে, অন্ধ স্নান করে, আলো কেমন বুঝতে নারে ;
(কত অনুমান করে'ও তবু)

(তেমনি,) তোমাতে বাঁচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া, বুঝতে নারি হে তোমারে।
(প্রভু কেমন তুমি)

(কাওয়ালি)

দেখা যদি নাহি দিলে, দুই আঁখি কেন দিলে ? কেন দিলে এই প্রাণ-মন !
(হরি হে)

ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে, কেন প্রাণে এই আকর্ষণ ?
(হরি তোমার তরে হে)

খুলে দা . আঁখির ভোর ঘুচাও হে মোহ-ঘোর, দূর কর যত ব্যবধান ,
(হরি হে)

এই তুমি, এই আমি, এই ত হৃদয়-স্বামী, দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ।
(জনম সফল কর হে)

(ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন)

কর্ম্মদেবী

রাজপুত, ইতিহাসে "কর্ম্মদেবী" নামটিতে যেন দৈবশক্তি নিহিত। গৌরবাত্মক অবদান ও কঠোর বীরধর্ম্ম প্রায়ই এই নামের অনুসরণ করে, এইরূপ পরিলক্ষিত হয়। রাজপুত বীর জাতি ; বীরত্বই তাহাদের আরাধ্য। রাজপুত রমণিগণ নিজেরাই শক্তিস্বরূপিনী, অপিচ বীর্য্য-আরাধনায় তাঁহারা নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া থাকেন। এই স্থলে যে কর্ম্মদেবীর কথা উক্ত হইতেছে, তিনিও চিতোরের ভূতপূর্ব্ব রাণা সংগ্রামসিংহের দয়িতা কর্ম্মদেবী অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহেন। যদিও ইনি সম্মুখ-সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তাঁহার অমানুষী মানসিক বল ও অপূর্ব্ব তেজ অধিকতর গৌরবজনক। বস্তুত উভয়েই রাজপুতের আদর্শস্থানীয় এবং আদরের বস্তু।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে মাণিক রায় মোহিল নগরের রাজা

ছিলেন। কর্ম্মদেবী তাঁহারই কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মারওয়ার দেশের তাৎকালিক বরবর্ণিনিগণের মধ্যে কর্ম্মদেবী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন। চন্দ্র-রশ্মির লাবণ্য, কুসুমের সৌকুমার্য্য, গুঞ্জরবের হৃদয়োন্মাদকারী ক্ষমতা, বালসূর্য্যের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ একাধারে তাঁহাতে মিলিত ছিল। বিধাতা পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের একটা আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন বিরলে বসিয়া একান্তমনে তাঁহাকে সৃজন করিয়াছিলেন।

তত্রত্য রাজপুত রাজগণ-মধ্যে কঠোর বীর মহারাজ চণ্ডই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমল অতি সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতি অপেক্ষা সাধু নামক অপর একজন সামান্য যুবকের বীর্য্য-মহিমা এই সময়ে অধিকতর প্রখ্যাত হইয়াছিল। সাধু, পুগল নামক জনপদের ভট্টবীরদিগের সর্দ্দার রণঙ্গদেবের পুত্র। সাধুর বীরত্ব, সাধুর উৎসাহ, সাধুর কার্য্যকরী ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে, মরুস্থলীর ভদ্রেতর সকলেরই সে ভীতিস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ড-পুত্র অনঙ্গদেবের সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহ-প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মোহিল-কুল গৌরব ও ক্ষমতায় রাঠোর অপেক্ষা হীন হইলেও কর্ম্মদেবীর সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চণ্ড এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়েন নাই। মাণিক রায়ও এ বিবাহ শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহে সহসা এক অন্তরায় উপস্থিত হইল। বীরহৃদয় কর্ম্মদেবী স্বভাবতই বীরত্বের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি এ বিবাহে অসম্মত হইয়া সাধুকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। রাজবধূ হইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সামান্য গৃহস্থের গৃহিণী হইতে প্রলুব্ধা হইলেন।

মাণিক রায় তনয়ার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে মুহ্যমান হইলেন। অরণ্যকমলের সহিত বিবাহ না হইলে উচ্চতর বংশ-গৌরব লাভের আশা তো নির্ম্মূল হইবেই. অধিকন্তু অরণ্যকমল ক্রুদ্ধ হইয়া মোহিল বংশের উচ্ছেদসাধন না করিলেই মঙ্গল! মাণিক রায় কন্যাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সকলই নিরর্থক হইল। পরিশেষে তিনিও অপত্য-বাৎসল্যের প্রবণতায় কর্ম্মদেবীর সহিত একমত হইয়া সাধুর নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন এবং ভাবী বিপদের কথাও যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তেজোদীপ্ত সাধু বিপদের আহ্বানই ভালো

বাসিতেন, তাই তিনি আগ্রহের সহিত বিবাহে সম্মত হইয়া বলিলেন—"আপনি কৌলিক-প্রথানুসারে পুগলে নারিকেল প্রেরণ করুন, তাহা হইলেই আমি বিবাহে অগ্রসর হইব।" নারিকেল প্রেরিত হইল এবং অল্পদিন মধ্যেই পিতৃভবনে কর্ম্মদেবী সাধুর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহান্তে কর্ম্মদেবী স্বামী-সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। পঞ্চাশৎ মোহিল সৈন্য ও সাধুর সমভিব্যাহারী সপ্তশত ভট্টবীর তাঁহাদের অনুগমন করিল। এদিকে অরণ্যকমল বিবাহের কথা অবগত হইয়া সাধুর শোণিতে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য চারি সহস্র পরাক্রান্ত রাঠোর সৈন্য সঙ্গে লইয়া সাধুর পথাবরোধার্থ ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে সাধু সদলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অরণ্যকমল সেই স্থলেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চারি সহস্রের সহিত সার্দ্ধ সপ্তশতের যুদ্ধ হাস্যকর হইলেও বীরবর সাধু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইবার সময়ে বিদায় গ্রহণার্থ কর্ম্মদেবীর চতুর্দ্দোল-সন্নিধানে গমন করিলেন। কর্ম্মদেবী বলিলেন,—"আপনি স্বচ্ছন্দমনে যুদ্ধে গমন করুন, আমি আপনার যুদ্ধ দর্শন করিব। আপনি তরবারি ধারণ করুন, আমি আপনাকে উৎসাহিত করিব, আর যদি দৈববশে আপনার বরদেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয় আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হইব।" সাধু মহোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে অযথা লোকনাশ অরণ্যকমলের উদ্দেশ্য ছিলনা, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধুর বিনাশ। সাধু ভীষণবেগে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনি সানন্দে স্বীয় অশ্ব তদভিমুখে ধাবিত করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র সৈনিক শিষ্টাচারে ব্যয়িত হইল, পরক্ষণেই আবার ভীষণ সংগ্রাম। দেখিতে দেখিতে সাধুর ভীম অসি অরণ্যকমলের মস্তক-উদ্দেশে প্রহৃত হইল। অরণ্যকমল তাহার আংশিক প্রতিরোধে সমর্থ হইয়া সাধুর মস্তকে বিপুল বলে স্বীয় অসির প্রহার করিলেন। উভয় বীরই ভূপতিত হইলেন। অরণ্যকমল অল্পই আঘাত পাইয়াছিলেন সুতরাং কিছুকাল পরে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল ;—সাধু আর উঠিলেন না। তাঁহার জীবন-দীপ চিরদিনের মতো নির্ব্বাপিত হইল।

নব-বিবাহিতা সতী কর্ম্মদেবীর সমুদয় আশা ভরসা বিলয় প্রাপ্ত হইল। সুখের তরুণ ভানু উদিত হইতে না হইতেই অস্তমিত হইল! বীণার মধুময়

স্বর-লহরী আলাপের প্রশ্রবণোচ্ছ্বাসেই নীরব হইল! এ দুঃখ অসহ্য। বীরনারী তাঁহার দুঃখ বিমোচনের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন—তিনি চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন।

চিতা সজ্জিত হইলে তিনি যথাবিহিত পূর্ব্বকৃত্য সমাপন করিয়া একখানি তরবারিদ্বারা নিজের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিলেন, তৎপরে সেই ছিন্ন হস্ত একজন ভট্টবীরের করে অর্পণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—"ইহা আমার শ্বশুরকে প্রদান করিয়া বলিবেন,—"আপনার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" পরে সেই তরবারিখানি অপর সৈনিকের করে অর্পণ করিয়া তাহাকে বাম হস্ত ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। সৈনিক সেই অপার্থিব তেজোময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না—বাম হস্তও ছিন্ন হইল। তখন তিনি নিরুদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন—'ইহা ভট্টকবিদিগকে প্রদান করিয়া বলিবেন,—'কর্ম্মদেবী তাহার ক্ষুদ্র জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে।" সতী চিতায় আরোহণ করিলেন; ক্ষণকাল মধ্যে হৃদয়োন্মাদকারী হাহাকার ধ্বনির মধ্যে তেজোগর্ব্বমিশ্রিত প্রেমপবিত্রতাপূরিত অনিন্দ্য যৌবন-সুষমা চিতা-ভস্মে লুক্কায়িত হইল!

হায়! সে মুখের কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! সে নয়নের কী দৃঢ় কটাক্ষ! সে হৃদয়ের কী মধুর সৌরভ ও কী প্রবল তেজ!

রাজপুতনার সে দিন গিয়াছে। তাহারা এখন নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ। তবে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই সব জলন্ত দৃষ্টান্ত চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

দান

৬

সম্মুখেই লতাগৃহের কাচের দরজা খুলিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। একজন শুধু আমার দিকে চাহিয়া বিনম্রমস্তকে নমস্কার করিয়া প্রতি নমস্কার পাইতে না পাইতেই উদ্যানের

রাস্তা ধরিয়া বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। অপর লোকটি একটুখানি হাসিয়া মাথাটা একটু নীচু করিলেন, কিন্তু চলিয়া গেলেন না; বরং কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা গিয়েছিলে?" মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্ত-স্রোত থম্‌কিয়া থম্‌কিয়া বহিতে লাগিল। তাহার একটা উচ্ছ্বাস মুখের উপর যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। মনের সে বিশ্বাসঘাতকতায় ঈষৎ বিরক্ত হইয়া অথবা স্বাভাবিক লজ্জায়—তাহা ঠিক বলিতে পারি না, আমার নেত্র-পল্লব সহসা আনত হইয়া আসিল, ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে তাঁহার প্রসারিত করে আমার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম,—"নদীর ধারে।" আমার হাতখানা সস্নেহে স্পর্শ করিয়া—এক মুহূর্ত্ত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিলেন! আমার চকিত নেত্র তাঁহার প্রেমোদ্দীপ্ত মুখ-মণ্ডলে এক মুহূর্ত্তের জন্য একটা পুলকোচ্ছ্বাস আনিয়া দিল! কমনীয়তার সঙ্গে সুদৃঢ় হৃদয়-বৃত্তির একটি ছবি কে যেন এই মর্ম্মরিত লতা-কুঞ্জের পাশে অপরাহ্নের আলোকে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিল! আমার জীবনের যে অংশটা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবার জন্য এত খানি আগ্রহ, এত খানি অস্থিরতা জাগিয়া উঠিয়াছিল; মুহূর্ত্তে তাহা ঐ মুখের, ঐ হৃদয়-ভারাবনত সুগভীর দৃষ্টির তলে আকুল হইয়া পরিত্যাগভীত শিশুর মতন দুই হাতে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল!

তিনি বলিলেন,—"নদীতীর তোমার খুব ভালো লাগে, না ভায়োলা?" এই 'ভায়োলা' সম্বোধনটা আমার হৃদয়-বীণার একটা তারের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। সে আহত তন্ত্রীর মধুময় রাগিনী আমার কানের কাছে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল; আমি স্পষ্টই তাহা শুনিতে পাইলাম! ইতিপূর্ব্বে 'মিস্ ম্যানিং'এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ দাঁড়াইয়াছিল 'ভায়োলীন'; আজ বন্ধন যখন শিথিল হইয়া খুলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় আবার সজোর চেষ্টা কেন? আমি মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নত নেত্রযুগল তুলিয়া বলিলাম,—"আমার একটি অনুরোধ আছে—" কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাধা দিলেন—"যেখানে আদেশ করলে চলে সেখানে অনুরোধের প্রয়োজন?"

আমি এ কথাটায় কান না দিয়া নিজের বক্তব্য শেষ করিলাম,—"অনুগ্রহ করে যদি শোনেন তবে বল্‌তে সাহস পাই।" আমার ভবিষ্যৎ প্রভু সচকিতে এক

বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া অদূরস্থ কাঁঠাসনখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"অনুগ্রহ করে যদি কিছু আদেশ কর ঐখানে বসেই সেটা শোনা যাক্‌না, তোমার ভূমিকা দেখে মনে হচ্চে দুই এক কথায় বক্তব্যটা শেষ হবে না!" আমিও তাহাই খুঁজিতেছিলাম—ঠিক মুখো-মুখি দাঁড়াইয়া বলা কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল। বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিলে তিনি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলবে বলো।" বলিলাম,—"আগে বলুন আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি স্বীকার করলুম; নিশ্চয়ই তুমি কিছু আমায় 'রক' পাখীর ডিম বা তেমনি কিছু খুঁজে আন্‌তে বলবে না।"

উপমার ধরণটায় আমার মুখে বোধ হয় একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; বলিলাম,—"না সে রকম খেয়াল আমার হয়নি, আমার একটি বন্ধু আছে তার নাম লোটি—" বলিয়া একটু থামিয়া আমার শ্রোতার পানে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তিনি একটু ঝুঁকিয়া হাতে-হাতে বদ্ধ করিয়া মনোযোগ দিবার ভাবে বসিয়াছেন। সেই দক্ষিণে এলোমেলো হাওয়া তাঁহারো প্রশস্ত ললাটের উপরে সংযত সুবিন্যস্ত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে তাহার সরু সরু অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া সযত্নে একটু একটু নাড়িতেছিল! পশ্চাতের 'অরোকেরিয়া'র ছায়া-বিচ্যুত সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখের উপর তাঁহারি মতো কৌতূহলে চাহিয়া দেখিতেছিল! আমি বলিলাম,—"না, তার নাম লোটি নয়, তার নাম সার্লট, সবাই তাকে 'লোটি' বলে ডাকে; সে ছোট বেলা থেকে আমার বন্ধু, আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।"

এই কথার পরেই যে তাঁহার অধর-প্রান্ত একটা সকৌতুক অবিশ্বাসের হাস্যে ঈষৎ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা আমার অগোচর রহিল না; মনের উচ্ছ্বাসটা যেন একটা অনাবশ্যক আঘাত প্রাপ্তে চারিদিক দিয়া আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! স্বর একটুখানি উচ্চ করিয়া—দ্বিধা একটুখানি কাটাইয়া বলিতে লাগিলাম,—"আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, সেও আমাকে তেমনি ভালোবাসে।" এই কথাটায় প্রমাণ করিতে চাহিলাম, তোমার হাসিটা তুমি ফিরাইয়া লও। স্ত্রীলোকের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় জিনিষটাকে যে এমন উপহাসের সহিত সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিতেছ, সেটা তত ক্ষুদ্র জিনিষ নয়! কিন্তু তিনি কি বুঝিলেন জানি না; তাঁহার মুখেবেশ একটু রহস্যপূর্ণ করুণার হাসি

ঈষৎ আগ্রহের সহিত ফুটিয়া রহিল। আমার বড় রাগ হইল, এ কী অন্যায় অবিশ্বাস! ইনি বোধ হয় ভাবিতেছেন, আমি আজ বসন্তের উন্মাদ সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে মুগ্ধ পুষ্পের মদিরাময় পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া এই নির্জ্জন উদ্যানের প্রান্তে বসিয়া একপাতা 'নভেল' শুনাইবার অদম্য লোভে তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া সাধিয়া আনিয়াছি! কেমন করিয়া আমাদের সুপ্ত-প্রেম-নির্ঝরের ধারা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিব, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু এ লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য মন পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম হইতে অবিশ্বাসের হাসি! তবে শেষ হইবে কিসে? এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অত কষ্ট করে তাঁর পরিচয় দিতে হবে না, আমি তাঁকে খুব চিনি, 'মিস লোটি' কনভেণ্টের একটি ছাত্রী, তোমার সখী এবং একটি অনাথা, 'নান্'দের দয়ায় পড়াশোনা অনেকটা হয়েছে," আমি এইখানে বাধা দিলাম, "হ্যাঁ'লোটি পড়াশুনা ভালোই করেছে, সে ভারি সুন্দরী! শুধু অনাথা এইটুকু তার খুঁত" মিঃ ব্রাউন ঈষৎ হাসিলেন,—"কী আমায় আদেশ কর্‌চো? কুমারীটির জন্য একটি কুমারের যোগাড় করা? সে এমন কি আশ্চর্য্য, তোমার সখী দু' একটা দিন আমাদের সোসাইটিতে ঘুর্‌লেই অনেকের আবেদন পত্র পাবেন। আচ্ছা আমি আমার একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটু কথা কইব; তিনি বিপত্নীক—" আমার বেশ মনে হইল তিনি এসব কথাগুলো যতক্ষণ বলিতে লাগিলেন, সমস্তক্ষণই তাঁহার মুখে একটা বেদনার ভাব স্পষ্ট জাগিয়া রহিল, গলাটাও কেমন যেন কাঁপিয়া যাইতে লাগিল! ঠিকই ইহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না, হয়তো ইহা আমারি কল্পনা। তিনি চুপ করিলেন বেঞ্চের পিঠের উপর একটু হেলিয়া বসিয়া একটুখানি নিশ্বাস ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন! আমি সঙ্কোচের সহিত বলিয়া ফেলিলাম,—"আমার অনুরোধ—আপনি নিজেই লোটিকে বিয়ে করেন।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, অস্ফুটবিস্ময়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি? সে কী করে হবে? সে কি কখনো হয়?" আমি তাঁহার তরল বিদ্রূপের উচ্চ হাসি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কল্পনা করিতে ছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে এতখানি মনোদ্বেগ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যানুভব করিলাম, একটু সুখ কি দুঃখ, আশা কি নিরাশা, কে জানে কি একটা একবারটি মাত্র বুকের কাছটাতে ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তখনি জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"কেন হবে না? আপনি স্বাধীন, ইচ্ছা করলেই হয়; মাসীমাকে আমি বোল্‌বো 'আমার অনিচ্ছাতে এ বিয়ে ভেঙে গেল।' উইলের সর্ত্তেও এ-তে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না।" তিনি যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! হাতে-হাতে ঘর্ষণ করিয়া ঠোঁটে-ঠোঁটে চাপিয়া নিজেকে যেন কি একটা ঘোর প্রলোভনের হাত হইতে—কঠোর পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া রুদ্ধপ্রায়স্বরে কহিলেন,—"কেন ভ্যালী! আমায় কেন প্রত্যাখ্যান করচো? আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি?" আমি বলিলাম,—"কিছুই না"। তারপর আর কি বলিব তাহা ভুলিয়া গেলাম।

সমস্ত দিন ধরিয়া এতক্ষণ নদীর কূলে বসিয়া বসিয়া বক্তব্যটিকে এমন প্রাঞ্জলভাবে এমন শোভনীয়-রূপে সাজাইয়া লইয়াছিলাম! কিন্তু যে রকম আশা করিয়াছিলাম ঠিক তেমন হইল না; তাই আমার কল্পনা, আমার কাব্য ম্লান হইয়া গেল। ইহার চেয়ে তিনি যদি আমার এই মহত্ত্ব, এই অপরিসীম আত্মত্যাগকে ছেলেখেলা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, তাহাহইলেও বোধ হয় আমার সাধের কল্পনা এমন করিয়া শুকাইয়া উঠিতে চাহিত না! হৃদয়ের বল মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গিয়া বুক ফাটিয়া হাহাকার বাহির হইয়া আসিত না! কিন্তু এখন আর উপায় নাই! আমার সন্দেহ সত্য, আমার আশা স্বপ্নমাত্র! হায় স্বার্থ-পরিপূর্ণ মানবী!

(সমাপ্ত) শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ফুল

(মূল পারসী হইতে)

প্রভাতে কাননে যবে ফোটে ফুল সুষমা বিকাশি'
সোহাগ সম্মান কত দেয় তারে ধরণী-নিবাসী।
নৃপতি-উরসে কভু বিলসিত—সাজি' ফুল হারে,—
বিবাহ-বাসরে কভু হেরিয়াছি নব বধূ-করে;
পড়েনি কভু গো কিন্তু আঁখি-পথে হেন ভাব আর,
হতাশের শবোপরি নিরখিনু তার যে আকার।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

দক্ষিণ রায়

প্রবাদ আছে, গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেনসাহা বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র খাঁ-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ হুসেনসাহার পিতা বালক-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থ বাংলায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হয়। যে স্থানে হুসেনসাহার জাহাজ ডুবিয়াছিল, সে স্থান এখনও বৃদ্ধেরা দেখাইয়া থাকেন। বালক হুসেনসাহা কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রথমে গোচারণে নিযুক্ত করেন। এক দিন বালক হুসেন গোরু ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষ-তলে নিদ্রাগত হইলে এক বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প তাঁহাকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করার মানসে ফণা বিস্তার করিয়া মস্তকে ধরিয়াছে, এমন সময়ে দৈবাৎ রামচন্দ্র সেই দিকে যাইতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন; এবং হুসেন যে ভবিষ্যতে রাজ-মুকুট ধারণ করিবে তাহা বুঝিতে রামচন্দ্রের বাকী রহিল না। তদবধি রামচন্দ্র গোচারণ হইতে হুসেনকে অব্যাহতি দিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। হুসেন অল্প দিনের মধ্যে যথেষ্ট শিখিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র তাঁহাকে এক পত্র দিয়া নিজ উকিলের সহিত গৌড়ে পাঠাইয়া কোন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সুবুদ্ধি রায় ঐ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার নিকট সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া নিজ অসাধারণ প্রতিভা-বলে হুসেনসাহ কয়েক বৎসরের মধ্যে গৌড়ের বাদসাহ হইয়াছিলেন। কিন্তু বেনাপোলে অবস্থিতি-কালে স্বার্থপর রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, হুসেন রাজা হইয়া কখন ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিবেন না এবং রামচন্দ্রকে নিজ ভূ-সম্পত্তি নিষ্কর ভোগ করিতে দিবেন। কার্য্যতঃ হুসেনসাহ রাজা হইয়া শেষ প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমটি কতদূর রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

বেনাপোলে অবস্থিতি-সময়ে হুসেনসাহ মুকুট রায়ের মুসলমান বিদ্বেষের সংবাদ রাখিতেন। দক্ষিণ রায়ের অসামান্য রণকুশলতার পরিচয়ও জানিতেন। এক্ষণে গোরাগাজি কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া ভূরি পরিমাণে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেক সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে

একদল সেনা নৌকাযোগে পাঠাইলেন। উত্তর দিকে মুকুট রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সেনাদল আদিষ্ট হইল। গোরাগাজি দক্ষিণ দিক হইতে ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ দেশস্থ হিজলী প্রভৃতি স্থানের পাঠান ভূস্বামিগণ গোরাগাজির সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। এইরূপে যুগপৎ ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া গৌড়েশ্বর জয়াশায় উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু তিনি মুকুট রায়ের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। এই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া সম্ভবতঃ হুসেনসাহ পরলোক গমন করেন।

দক্ষিণ রায় এই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নদী-তীরস্থ গ্রামগুলি বসতি-শূন্য করিয়া খাদ্য-সামগ্রী মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে গুপ্ত সৈন্যদল স্থাপন করিয়া শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে পাঠান সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি নবগঙ্গা বাহিয়া আসিয়াছিলেন। আবশ্যকমত খাদ্য সামগ্রী নৌকায় ছিল। তিনি কয়েক দিনের আহারীয় সঙ্গে লইয়া শত্রুর রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আধুনিক কালীগঞ্জের নিকটস্থ নদী পার-কালে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণ রায় তাঁহাকে হটাইয়া তাঁহার অনুসরণ জন্য অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া গোরাগাজির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সত্বর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন।

পাঠান-সেনাপতি পশ্চাৎ গমন করিয়া আধুনিক নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌঁছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আহার্য্যাভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হইয়াছিল। সেনাপতি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া সৈন্যগণের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বেঙ্গা নদী-তীরে শিবির-স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর এক অতি প্রিয় শিষ্য বেঙ্গা নদী-তীরে ক্ষেত্রগুনি গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নাম শ্রীগালিম। নলডাঙ্গা রাজবংশের স্থাপয়িতা বিষ্ণুদাস ঠাকুর। সেখ গালিমের শিষ্য ছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীগালিম রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম আনন্দে বাস করিতে ছিলেন। জীবে দয়া সাধুর ধর্ম্ম। বিপন্ন পাঠান সেনার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাঁহার ঠাকুরের কৃপায় বিপন্নকে অন্নদান করিতে সমর্থ

হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুদাস সুযোগ বুঝিলেন। তিনি সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচুর আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার ভার লইলেন এবং পাঠান সৈন্য সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত শস্য সকল দেখাইতে লাগিলেন। প্রচুর শস্য সংগৃহীত হওয়ায় সেনাপতি আশান্বিত হইলেন। তিনি বিষ্ণুদাসকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া দক্ষিণ রায়ের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করিতে বলিলেন। বিষ্ণুদাস স্বীকৃত হইলেন। পরম ভাগবত শ্রীগালিম ইহাতে বিষ্ণুদাসের উপর বিরক্ত হইয়া ক্ষেত্রগুলি পরিত্যাগ করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে সেখানে দেখে নাই। শিষ্যের বিষয়-লোভে বিরক্ত হইয়া সম্ভবতঃ তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদাস এই কার্য্য করিয়া পাঁচ খানি গ্রাম লাভ করেন। তাহাই নলডাঙ্গা রাজ্যের প্রথম সম্পত্তি।

যাহা হউক, বিষ্ণুদাসের সহায়তায়, পাঠান সেনাপতি কিছুদিনের মধ্যে আবশ্যকীয় সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। দক্ষিণ রায় যুদ্ধার্থ সৈন্যসহ দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছেন শুনিয়া অবিলম্বে অরক্ষিত ব্রাহ্মণ নগর অবরোধ করিলেন। দক্ষিণ রায় সে সময় গোরাগাজির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন। নগর সেনাপতি-শূন্য হইলেও রাজা মুকুট রায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ সজ্জ হইলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁহার সহায় ছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পরে মুসলমান সৈন্য কৌশলক্রমে পানীয় জল বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। মুসলমান লেখকেরা বলেন যে, ব্রাহ্মন নগরে অমৃত কুণ্ড ছিল; তাহার জল ছিটাইয়া দিলে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত। সূর্য্যদেবের বরে এইরূপ ঘটিত। যাহা হউক, সেই কুণ্ডে নিষিদ্ধ মাংস নিক্ষিপ্ত করায় কুণ্ডের গুণ নষ্ট হইয়া গেল। আর দৈব-সাহায্য মিলিল না। কাজেই মুকুট রায় পরাস্ত হইলেন। পরাজয়ের পর জীবন রক্ষা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মুকুট রায় কূপ-মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনীও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণের মধ্যে দুই জন সপরিবারে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব ধৃত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার কেবল উপনয়ন হইয়াছে মাত্র। কনিষ্ঠা কন্যা সুভদ্রাকে লইয়া জনৈক বিশ্বস্ত আত্মীয় বুড়নের গণরাজার আশ্রয় লইয়াছিল।

যখন ব্রাহ্মণ নগরী বিধ্বস্ত হইল, তখন দক্ষিণ রায় প্রধান শত্রু গোরাগাজির

সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন-কালে তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার আগমনের অনতিপূর্ব্বেই নগর শত্রু-হস্তগত হইয়াছে। রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে মৃতপ্রায় হইয়া তিনি সহচর ও সঙ্গিগণকে বিদায় দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বুড়নের গণরাজার নিকটে আশ্রয় লইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। তিনি নিজের নিতান্ত বিশ্বস্ত কয়েক শত সৈন্য লইয়া বিজয়ী মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ লোককে হতাহত করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, দক্ষিণ রায়কে তাঁহারা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদ অনুসারে দক্ষিণ রায় নিজ ইষ্টদেবতা সূর্য্যের মন্দিরের সম্মুখে, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন! তাঁহার দৈহিক বল, সাহস, সমর-কুশলতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রভুভক্তি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছে। এখনও সুন্দর-বনাঞ্চলে তাঁহার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তাঁহার দেবতুল্য চরিত্র ও ইষ্ট-নিষ্ঠার জন্য তিনি তথায় দেবতা-তুল্য পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পানীয় জল

মনুষ্য-শরীর একটি কল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কল দিবা ও রাত্রি সকল সময়েই চলিতেছে। যেমন কয়লা ও জল না দিলে কল অচল হয়, তেমনি খাদ্য ও পানীয় জল সময়মত না যোগাইতে পারিলে শরীর ক্ষয় হইয়া জীবের মৃত্যু হয়। আমাদের শরীর সর্ব্বদাই ক্ষয় হইতেছে। সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য আমরা আহার করি ও জল পান করি। ফল কথা শরীর রক্ষা করিতে হইলে খাদ্য যেমন প্রয়োজনীয়, পানীয় জলও তদপেক্ষা কম নহে। দারুণ গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিনে, যখন তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন আহার না করিয়া বরং দিন কাটাইতে পারি কিন্তু জলপান না করিয়া থাকা বড়ই কষ্টসাধ্য। এই জন্যই বোধ হয় জলের আর একটি নাম জীবন। আর্য্য ঋষিগণ জলের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,—"আপো নারায়ণঃ স্বয়ং"। হিন্দু-শাস্ত্রে জলকে দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবার

কথা বহুস্থলে লিখিত আছে। "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃশন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ" ইত্যাদি কথা আজও ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, অপরিষ্কার ও দূষিত জল পানে আমাদের শরীরে কোন্ কোন্ ব্যাধি কি ভাবে আসিতে পারে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপকারিতাই বা কি এবং কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমরা বিশুদ্ধ সুপেয় জল লাভ করিতে পারি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা দেশে কলিকাতা, ঢাকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় সহরে কলের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ জল যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সুপেয় তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং উক্ত সহরবাসী ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হয় না। মফঃস্বলে কলের জল নাই; তথায় নদী, পুষ্করিণী বা কূপের জল লোকের একমাত্র সম্বল। ঐ জলের অবস্থা ভাল থাকিলে কোন দুঃখ ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা দেখিতে পাই, নদী স্বল্পতোয়া ও মৃদুস্রোতা হইয়া মজিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীতে শৈবালাদি জন্মিয়া জল দূষিত হইতেছে। অগভীর ও কাঁচা কূপ সকলের মধ্যে নানা আবর্জ্জনা পড়িয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতেছে। কদর্য্য আহারে যেমন নানাবিধ রোগ জন্মে, দূষিত জল পানে সেইরূপ অনেকানেক পীড়া জন্মাইয়া থাকে। আমরা সচরাচর যে সকল মরা নদী বা পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকি, তাহাতেই স্নান করি, বাসন মাজি ময়লা কাপড় ও মলমূত্র সংযুক্ত বিছানাদি ধৌত করি। একে উহারা স্বচ্ছসলিলা ও খরস্রোতা নহে, তাহাতে আবার তৈল, ময়লা, মলমূত্র কফ কাসাদি মিশ্রিত হইয়া উহাদের জল দ্বিগুণ দূষিত হইয়া পড়ে। অনেকে পুষ্করিণীর সন্নিকটেই পাইখানা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী বা কূপের ২০০ হাতের মধ্যে পাইখানা, পচা ড্রেণ, খানা ডোবা প্রভৃতি থাকিলে তাহার চোয়ানি জল আসিয়া পুষ্করিণী বা কূপের জলে মিশ্রিত হইতে পারে।

মল-মূত্রাদির অংশ পানীয় জলের সহিত উদরস্থ হইলে কলেরা, অতিসার, উদরাময়, রক্ত আমাশা, কৃমি এবং আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, যে পুষ্করিণীতে কলেরা রোগীর মল ও বমিত পদার্থ সংযুক্ত শয্যাদি ধৌত করা হয়, সেই পুষ্করিণীর জল পানে সেই পল্লিবাসী বহুলোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে অনেক সময় কলেরা

রোগ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। সেই জন্য কলেরা রোগীর শয্যা-বস্ত্রাদি মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত করা অথবা পুড়াইয়া ফেলা সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। পরিপাক যন্ত্রের অধিকাংশ পীড়ার বীজ মল ও বমিত পদার্থের সহিত নির্গত হয়। আবার ঐ সকল বীজের এমন স্বভাব যে উহারা কোন জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে উহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যে জলে কফ, কাস নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা কফ কাসাদি রক্ষা করিবার আধার পরিষ্কার করা হয়, সেই জল পান করিলে যক্ষ্মা প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া জন্মাইয়া থাকে। মল ও বমিত পদার্থের সহিত পরিপাক যন্ত্রের ব্যাধি-সমূহের বীজ যেমন নির্গত হয়, কফ কাসাদির সহিত সেইরূপ শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি-সমূহের বীজ নির্গত হইয়া থাকে।

কর্দ্দম ও বালি-পরিপূর্ণ ঘোলা জল পান করিলে উদরাময়, অজীর্ণ, শূল প্রভৃতি রোগ জন্মে। যে "প্রাসাদ-নগর" কলিকাতা আমাদের বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান, ইতিপূর্ব্বে সেই কলিকাতাই ব্যাধি-নিকেতন ও যমালয় বলিয়া বোধ হইত। এই সহরের অবস্থা তখন এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল যে, কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে এখানকার য়ুরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিন ভাগ মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। যে এক ভাগ জীবিত থাকিত তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটি আনন্দ-ভোজের অনুষ্ঠান করিত। আমাশা ও পাকাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বর রোগে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইত। যদিও তখন কলিকাতায় বন-জঙ্গল, আর্দ্র মৃত্তিকা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর অনেক কারণ ছিল, তথাচ উত্তম পানীয় জলের অভাবও তন্মধ্যে অন্যতম। তৎকালে কলিকাতায় একটি লবণাক্ত হ্রদ ছিল; স্থানে স্থানে যে দুই চারিটি পুষ্করিণী দৃষ্ট হইত তাহাদের জলও কদর্য্য। বর্ষাসমাগমে গঙ্গার জল আবিল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিত। সুতরাং ঐ জল পান করিয়া লোকে আমাশা ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

ভাদ্র আশ্বিন মাসে আমাদের দেশে পাট ও শৈবালাদি পচা জল পান করিয়া অনেকেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। স্থানে স্থানে ঐ সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব এত অধিক হয় যে, সঙ্গতিপন্ন লোকেরা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সহরে পলায়ন করেন। অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিরা গ্রামে থাকিয়া শীর্ণ কঙ্কাল-সার-দেহে প্লীহা যকৃতের দুঃসহ বোঝা বহিয়া সাশ্রুলোচনে

ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকে। যদবধি আমাদের যমুনা নদী মজিতে আরম্ভ করিয়াছে, তদবধি উহার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল গ্রামে প্রবল স্রোতযুক্ত বড় নদী নাই, তথায় কেবল মাত্র পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র দুই একটি পুষ্করিণী (Reserved Tank) রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল পুষ্করিণীতে স্নান করা, বাসন মাজা, শয্যা বসনাদি ধৌত করা নিষিদ্ধ। পানীয় জলের পুষ্করিণী রৌদ্র ও আলোকময় স্থানে খনন করা উচিত। ঐ জল যাহাতে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ থাকে তৎ-পক্ষে গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্র মহোদয়গণের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া ভাল; ইহাতে জল পরিষ্কার থাকে।

বিশুদ্ধ জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদি দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ সকল নির্গত হইয়া যায়। অতি ভোজন বা অল্প ভোজন যেরূপ দূষনীয়, অতিরিক্ত জল পান করা অথবা অত্যল্প পরিমাণে জল পান করা, সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর। অতিরিক্ত জল পানে অজীর্ণ রোগ জন্মে, অপর পক্ষে স্বল্প পানেও শরীর কৃশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, ফল কথা পরিমিত পানই শ্রেষ্ঠ। রোগ ও অবস্থা বিশেষে জলপানের অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। অজীর্ণ রোগী আহারের অন্যূন অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে জলপান করিবেন। পরিশ্রান্ত অথবা নিদাঘ-তপ্ত হইয়া কিছুকাল বিশ্রামান্তর জল পান করা কর্ত্তব্য। যাহাদের পেট সর্ব্বদা গরম হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহাদের পক্ষে উষা-পান হিতকর। কাহার কাহার অতি প্রত্যূষে জল পান করিলে প্রথম প্রথম একটু সর্দ্দি হয়; কিন্তু উষা-পান অভ্যস্থ হইলে আর কোন অসুখ থাকে না। যখন অম্লরোগীর অম্লোদ্গার ও বুকজ্বালা উপস্থিত হয়, তখন এক গ্লাস পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পান করিলে সাময়িক উপকার দর্শে।

দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করিবার অনেক প্রকার উপায় আছে। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জল অনায়াসলভ্য নহে; সুতরাং সকলেরই ঐ সকল উপায় কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

১। জল গরম করিয়া ফট্‌কিরির দ্বারা শোধন করা:—এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। প্রথমে পনেরো মিনিট কাল জলকে উত্তমরূপে ফুটা-ইতে হইবে। পরে ঐ সুসিদ্ধ জল শীতল হইলে উহাতে অল্প ফট্‌কিরি ফেলিয়া দিবেন অথবা একখণ্ড ফট্‌কিরি লইয়া ঐ জলের মধ্যে আট দশ বার ঘুরাইবেন।

পাঁচ বা সাতঘণ্টার মধ্যে, ইহা দ্বারা জলের সমস্ত ময়লা মাটি পাত্রের তলায় জমা হইবে। তখন আস্তে আস্তে ঐ উপরের পরিষ্কার জল অপর একটি কলসীতে ঢালিয়া ব্যবহার করিবেন। জল সিদ্ধ করিলে উহাতে যে সকল রোগবীজ থাকে, তাহারা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২। জল ফিলটার করা:—পূর্ব্বোক্ত রূপে জল সিদ্ধ করিয়া ফিল্টার করিতে হয়। ধনবান লোকেরা "প্যাস্চার-ফিল্টার" (pasteur filter) ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে কলসী-ফিল্টারই ভাল। তিনটি কলসীর তলদেশে এক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া একটি কাষ্ঠের বা বাঁশের ফ্রেমে পর পর বসাইবেন। মধ্যের প্রথম কলসীতে কাষ্ঠের পরিষ্কার কয়লা ও দ্বিতীয়টীতে ভাল বালি দিবেন। সর্ব্ব নিম্নে জল ধরিবার জন্য আর একটি ভাল কলসী রাখিবেন। জল সিদ্ধ করিয়া উপরের কলসীতে ঢালিয়া দিলে উহা কয়লা ও বালীর ভিতর দিয়া পরিষ্কার হইয়া নিম্নের কলসীতে জমা হইবে। কলসী-ফিলটারের জল প্রথম তিন চারি দিন নির্ম্মল হয় না; সুতরাং ঐ জল অব্যবহার্য্য। চারি পাঁচ দিন পরে জল বিশুদ্ধ ও সুপেয় হয়। মধ্যে মধ্যে কয়লা ও বালি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৩। পারম্যাঙ্গানেট্ অফ্ পটাশ (permanganate of potash) দ্বারা কূপ বা পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ করা:—এই দ্রব্য ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। ইহা রক্তবর্ণ দানাবিশিষ্ট পদার্থ। একটি পরিষ্কার পাত্রে এই পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাশ কূপ বা পুষ্করিণীর জলে ঢালিয়া দিতে হয়। যতক্ষণ জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ না হয়, ততক্ষণ অল্প অল্প গুলিয়া জলে ঢালিয়া দিবেন; জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ হইলে আর দিবার আবশ্যক নাই। এইরূপে শোধন করার পর দুই তিন দিন ঐ জল ব্যবহার না করিলে ভাল হয়। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে বারো ঘণ্টা পরে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য এই উপায়ে জল শোধন করা কিছু ব্যয়সাধ্য। গ্রামে কলেরা, অতিসার প্রভৃতি রোগ আরম্ভ হইলে সকলেরই নিজ নিজ কূপ বা পুষ্করিণীর জল ব্যতীত বাড়ীতে অন্য কোন জল ব্যবহার করা উচিত নহে। অবিশুদ্ধ জলে বাসন মাজিয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখিলে অনেক সময় অলক্ষিত ভাবে রোগ-বিষ উদরস্থ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রত্যাবর্ত্তন (৪)

লাহোর হইতে আসিবার সময় বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে বলেন,—"দিল্লীতে বাবু নেহালচাঁদ আছেন, তিনি তথায় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক; তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন, তিনি খুব বাঙালীপ্রিয়।"

আমি দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রথমে তাঁহার অনুসন্ধানে স্কুলে আসিয়া তাঁহার দেখা পাইলাম। সংক্ষেপে অবিনাশ বাবুর কথা ও আমার পরিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন, "সম্প্রতি এখানে এল. জি, অর্থাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন সম্বন্ধে আমার উপর অনেক কাজের ভার আছে, আমি সে জন্য বড় ব্যস্ত আছি; আপনি আমার বাসায় যান, আমি পরে যাইব।" এই বলিয়া তিনি আমার সঙ্গে একজন লোক দিলেন, সে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেল। দিল্লী হেড্ পোষ্ট আপিষের উপর পোষ্টমাষ্টার বাবু ও তিনি সপরিবারে থাকেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুও পাঞ্জাবী।

আমি বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; কিছুক্ষণ পরে বেহারা আসিয়া আমাকে বলিল, "মাজী আপ্‌কো বোলাতে হেঁ।" আমি তাহার সঙ্গে বারাণ্ডার অপর দিকে গেলাম, সেখানে কতকটা যায়গা রান্নাঘরের মত ঘেরা ছিল, নেহালচাঁদ বাবুর স্ত্রী তথায় রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন। অনতিদূরে একখানি আসন পাতা ছিল, তিনি আমাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া সেই আসনে বসিতে বলিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি বাঙালী স্ত্রীলোক। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি ঘরের ভিতর হইতে আপনাকে দেখিয়া চিনিয়াছি, আমি বরাহনগর শশিপদ বাবুর 'মহিলা আশ্রমে' যখন ছিলাম, সেখানে আপনার ভগিনীর সঙ্গে আমরা একত্রে থাকিতাম, আপনি তথায় মধ্যে মধ্যে যাইতেন।" আমি এই ঘটনায় অবাক্ হইয়া গেলাম! বলিলাম,—"তোমার এদেশে বিবাহ হইয়াছে?" তারপর সেই আসনে বসাইয়াই আমাকে গরম গরম রুটী পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি সুন্দর শিশু পুত্র অনুমান চারি ও দুই বৎসরের হইবে, তাহারা মায়ের কাছে কাছে এদিক ওদিক করিয়া কিছু কিছু খাইতে লাগিল, এবং হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাংলা কথাও বলিতে শুনিয়াছিলাম।

রাত্রে নেহালচাঁদ বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইল, তিনি বলিলেন, "আমি বড় ব্যস্ত আছি, আপনি এখানে ৩।৪ দিন থাকুন, আপনাকে লইয়া কিছু কাজ করা যাইবে। এখানে আর যাঁহারা আমাদের বন্ধু আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করাইয়া দিব।" আমি বলিলাম,—"আর বিলম্ব করিতে পারিব না, এক আধ দিনে ভগবান্ যাহা করান তাহাই হইবে।" দ্বিতীয় দিন প্রাতে পারিবারিক ঈশ্বরোপাসনা হইল।

পরদিন প্রাতে ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমি প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া সহসা পথিমধ্যে আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু কলিকাতা নন্দরাম সেনের গলি-নিবাসী বাবু মনীন্দ্রমোহন মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য; তিনি এখানে রেলওয়ে অডিট্ আপিষে কাজ করেন। সহসা আমাকে পাইয়া তিনি যেমন আনন্দিত হইলেন, আমিও তাঁহাকে পাইয়া তেমনি আহ্লাদিত হইলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি ভদ্র লোকের নিকট লইয়া গেলেন, এক বাড়ীতে রাত্রে আমার গান গাইবার ব্যবস্থা করিলেন, গান হইল, ৩০।৩৫ জন লোক হইয়াছিল।

আমার বন্ধু স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের পুত্র শ্রীমান্ অনুকূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে "কুতব মিনার" "জুম্মা মস্‌জিদ্" প্রভৃতি দেখাইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু ভিতরে গিয়া সমস্ত দেখিতে হইলে বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা একটু সময় সাপেক্ষ বলিয়া ঘটিয়া উঠিল না এবং তখন আমার মনের ভাব এক রকম আন্তরিকতার দিকেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয় ঐ বাহ্য-দর্শনে মন আকৃষ্ট হইল না।

বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক এখানে ছিলেন, তাঁহার বাড়ী এক বেলা আমার নিমন্ত্রণ হইল। সেখানে ব্রহ্মোপাসনা হইল।

এইরূপে তিনদিন দিল্লীতে কাটাইয়া বেশ আনন্দসম্ভোগ করা গেল। ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়া টাইম্ টেবলে দেখিলাম, এখান হইতে খুর্জা খুব নিকটে, তাহাতে মনে হইল, স্নেহাস্পদ বসন্তকুমার দত্ত তথায় ঘৃত খরিদার্থে সপরিবারে আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ বেলা সাড়ে এগারোটার ট্রেণে দিল্লী হইতে খুর্জায় আসিলাম। গমনকালে নেহালচাঁদ বাবু ট্রেণ ভাড়ার জন্য এক টাকা প্রদান করেন।

খুর্জা ষ্টেশন হইতে খুর্জা, সিটী প্রায় ৩ মাইল কিন্তু একা এবং ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া এক আনা ও দুই আনা মাত্র। এখানে অত্যন্ত ধূলা; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অধিকাংশ স্থানে যেমন পাথরের সঙ্গে কাঁকর মাটী, এখানে তদপেক্ষা দোআঁশ মাটী অধিক ও বেশ নরম, এজন্য অধিক ধূলা।

বসন্ত বাবু সহসা আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। প্রায় দুই দিন তথায় থাকা হইল। এখানকার ভঁয়সা ঘৃত উৎকৃষ্ট; কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে জন্মায় না। জগতে উৎকৃষ্টতা প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক জন্মায় না, নিকৃষ্টের উৎপত্তিই অধিক; এ রহস্য কে বুঝিবে?

ঘৃত খরিদ উপলক্ষে এখানে আরো কয়েকটি বাঙালী থাকেন। এখানকার ঘৃতে কোনোরূপ কিছু মিশ্রিত হয় না। ঘৃতে ভেজাল দেওয়া প্রধানত কলিকাতাতেই হয়, তবে গয়া জেলা বা গোরখ্‌পুর অঞ্চলের নিকৃষ্ট ঘৃতে ভেজাল হয় বলিয়া বোধ হয়। এখান হইতে বসন্ত বাবু যে ঘৃত খরিদ করিয়া কানেস্তারায় "অন্নপূর্ণা" মার্কা দিয়া কলিকাতার হাটগোলায় স্বর্গীয় মহানন্দ দত্তের ফার্মে চালান দেন, তাহা বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট।

খুর্জা সিটী সামান্য রকমের; এখানে তুলা, ঘৃত প্রভৃতি মাল খরিদ-বিক্রয়ের জন্য বাজারটি একটু জম্‌কালো। ক্যানেলের ধারে অনেকগুলি সাধুর আশ্রম দেখা গেল, কিন্তু কোনো বিশিষ্ট মহাত্মার সংবাদ এখানে পাইলাম না।

২০শে তারিখে আহারাদি করিয়া বেলা ১২টার পর সানন্দচিত্তে ভ্রাতা বসন্তকুমারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম। বিদায়-কালীন বসন্ত বাবুর নিকট ট্রেণ ভাড়া দুই টাকা প্রাপ্ত হইলাম।

একেবারে বৃন্দাবনে আসা আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনেক দিন হইতে হাতরস জংসনে বাবু অটলবিহারী নন্দীর নাম শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সাধনানুরাগ, তাঁহার সাধুভক্তির কথা তিনি নিজে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও ধর্ম্মানুরাগী যে কোনো ব্যক্তি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখনো ভুলিতে পারেন না। বৃন্দাবন যাতায়াতের সন্ধিস্থল এই হাতরস জংসন ষ্টেশনে যেন তিনি ভক্তবৃন্দের পথ আগ্‌লাইয়া আছেন। দুঃখের বিষয়, আমি এখানে আসিয়া এক বেলাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিলাম না, কেবল একবার দেখা করিয়াই করস্‌পণ্ডিং ট্রেণে বৃন্দাবন রওনা হইলাম।

(ক্রমশ)

প্রভাতে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই

হের দেখ ওগো চাহিয়া!

সমীর এনেছে কার সংবাদ

সুপ্তি-সাগর বাহিয়া!

রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও আঁখি মেলে চাও,

কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,

চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী

উড়িছে পড়িছে গাহিয়া,

স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ

প্রেম-নীরে অবগাহিয়া।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কুশদহ-বৃত্তান্ত (১৫)

মানব সামাজিক জীব। মানব কোন কালে সমাজবদ্ধ না থাকিয়া একাকী বাস করিত এরূপ বোধ হয় না। "কুশদ্বীপ" এই নামকরণ হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে যদিও সামাজিক প্রথা ছিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত আদিম অবস্থার ন্যায়। তৎপরে যখন ভাল মন্দের নির্ব্বাচন হইয়া মাঝামাঝি একটা গড়িয়া উঠিল, তখন "কুশদ্বীপ" সমাজ হইল। * এই সময় হইতে সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কালকে কুশদ্বীপের প্রথমাবস্থা বলা যাইতে পারে।

কুশদ্বীপের প্রথমাবস্থার প্রথমভাগে এই স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্য দৃষ্টি-গোচর হয়। বর্ত্তমান হাড়ী, মুচী প্রভৃতি জাতিরা সেই সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা প্রাচীন সময়ের বুদ্ধ মূর্ত্তিকে মহাদেবের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। (শঙ্করাচার্য্যের জীবনী)

এই সময়ে "কুশদহ"তে দৈহিক বলের আদর অত্যন্ত ছিল। তৎপরে সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। তখন দৈহিক বল অপেক্ষা মানসিক বলের আদর বেশী হইতে লাগিল। মানসিক বল চিরকালই দৈহিক বলকে

---

* Galton's "Law of Regression" towards Mediocrity.

পরাজিত করে। সেই জন্ত প্রতাপাদিত্য দৈহিক বলে বলীয়ান হইয়াও নিঃস্ব, মানসিক বলে বলীয়ান সিদ্ধান্তবাগীশের পদানত হইয়াছিলেন। এই সময়কে "কুশদহ"র দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় "কুশদহতে" ধীরে ধীরে বিস্তার জ্যোতিঃ "কুশদহর" তৃতীয়াবস্থায় পূর্ণমাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয়াবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

তৎপরে 'কুশদহ'র শেষ বা অন্তিম অবস্থা। কুশদ্বীপ-মধ্য-প্রবাহিতা যমুনা নদীর পতনের সহিত "কুশদহ"রও পতন দেখা যাইতেছে। এই স্থানে যমুনা নদীর একটু বিবরণ লিখিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না।

১১৪০ খৃষ্টাব্দে ডি, ব্যারস্ বঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে সরস্বতী ও যমুনা এই দুইটি ভাগীরথীর বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমান। ভ্যাণ্ডেন ব্রুকের ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, তখন যমুনা একটি ক্ষুদ্র খালে পরিণত হইয়াছিল। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যমুনা নদী যত দিন প্রবল ছিল "কুশদহ"র অবস্থা তত দিন ভালো ছিল। এক্ষণে এই যমুনা নদী গোস্পদে পরিণত হইয়াছে। 'কুশদহর' ভাবী উন্নতি এই যমুনা নদীর পঙ্কোদ্ধারের উপর নির্ভর করিতেছে। গৈপুর নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পঙ্কোদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু "কুশদহ'-বাসীর সমবেত চেষ্টা ব্যতীত ইহার পঙ্কোদ্ধার সুদূরপরাহত।

এক্ষণে ম্যালেরিয়ায় এই "কুশদহ"কে কঙ্কালসার করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি হইতেছে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে দেশবাসীকে উদ্ধার করিতে কবিরাজগণ অক্ষম হওয়ায় দেশের লোক চিকিৎসা-অভাবে মারা যাইতে লাগিল। এই সময়ে এখানে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হয়। যেন দেশকে রক্ষা করিবার জন্য গোবরডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত L. M. S. উপাধিতে ভূষিত হইয়া "কুশদহ'র চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন "কুশদহ"র বর্ত্তমান চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেশব বাবু অগ্রণী।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

প্রেরিত পত্র

"কুশদহ" সংক্রান্ত, সম্পাদকের নামীয়, একখানি পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, পত্রখানি দীর্ঘ হওয়ায় সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হইল। (কুঃ সঃ)

প্রিয় যোগীন বাবু!

সে দিন বৈকালে কলিকাতার *** পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আপনার সম্পাদিত "কুশদহ" কেমন চলিতেছে জিজ্ঞাসা করায় আপনি উত্তর করিলেন—"দেশের কাগজ, আপনাদের যত্ন নাই।" সত্যকথা বলিয়াছেন। দেশের প্রতি (আমাদের) যত্ন আদৌ নাই ****।

দেশের মধ্যে আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহোদয় নিজ অর্থব্যয়ে ও শারীরিক, মানসিক যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে যে "কুশদহ" সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশ করিয়া দেশের অভাব মোচনার্থেই স্থানীয় সংবাদ প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, আমার বেশ মনে হইতেছে, অবশ্য আমি নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও, 'কুশদহ'র পুষ্টি সাধনে, কাটবিড়ালের সাহায্যবৎ যে কিছু না করিয়াছি, এমন তো মনে হয় না। তখন মনে হইত—"কুশদহ" পত্রিকাখানিকে বোধ হয় কালে বাংলার (একখানি) প্রধান সংবাদ পত্ররূপে উন্নীত করিতে পারা যাইবে। এখনকার মত তখন এত বড় বড় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু কালের কুটিল ভ্রূভঙ্গে 'কুশদহ' অকালে লীলাসম্বরণ করিল। এখন আবার দেখিতেছি, আপনি সেই মরা 'কুশদহ'কে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ধন্য আপনার যোগবল—ধন্য আপনার সাহস। যে কার্য্যে পূজ্য ক্ষেত্রমোহন বাবু টাকা ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তিনি ঘরের পয়সা দিয়া কাগজ ছাপাইয়া গ্রাহকদিগকে দিলেও, গ্রাহক এক সহস্রও হয় নাই। **** দেশের কয় জন লোকে বুঝিতে শিখিয়াছেন যে, স্থানীয় খবরের কাগজ একখানি থাকিলে দেশের হিতসাধন হইতে পারে। পরন্তু অতীত স্মৃতির ছবিগুলি একে একে সংগৃহীত করিয়া 'কুশদহ'র অঙ্গে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিলে ভাবী-সন্তানদিগের যে কীদৃশ্য উপকার হইবে, তাহা গবেষণা-গরিষ্ঠ মস্তিষ্কের বিচার্য্য বিষয়, সাধারণে কি বুঝিবে? *****।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতী (ভাদ্র, ১৩১৮)—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত। ৪৪নং ওল্ড্ বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০।

মুখপত্রে একখানি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি তিনবর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "নব ভারতে নব সামাজিকতা" সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ। তিনি লিখিয়াছেন,—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া অনেক নূতন প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, নব ভারতের সামাজিক জীবন কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা কি পুরাতন ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অদৃষ্টবাদ, পারত্রিকতা, শাসন-ক্ষমতা, অধীনতা, জাতিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব? না, প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্বাবলম্বন, ঐহিকতা ও সাম্য অবলম্বন করিব?—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, নব ভারতে নব সামাজিকতার প্রয়োজন, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পশ্চিমকে মিলিত করিবে, যাহা ঐহিকতার সহিত পারত্রিকতাকে, স্বাধীনতার সহিত সাধুভক্তিকে মিলিত করিবে তাহারই আবশ্যক; এবং তাহা তখনই সম্ভব যখন সামাজিক জীবনে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নানাতথ্যপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষের "রাজা" গল্পটি অতি সুন্দর—অতি মনোরম হইয়াছে। "আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ" শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের সুচিন্তিত সদ্ভাবপূর্ণ সারবান প্রবন্ধ; ইহার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রতিমা" গল্পটি বড় সরসও কবিত্বপূর্ণ; বর্ণনাভঙ্গীতে প্রাণের সহানুভূতি স্বতই জাগিয়া উঠে। 'চিরমৌন" শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা, চমৎকার হইয়াছে। 'চয়নে'র মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত "ঠগী-কাহিনীর একটি চিত্র" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক সরস ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। এই লেখকের ভাষার মধ্যে চমৎকার একটি নিজস্ব স্বচ্ছ প্রবাহ আছে যাহাতে বক্তব্য সর্ব্বত্রই অনন্যসাধারণ কবিত্বরসে ভরপুর এবং সুপরিস্ফুট ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র

মোহন মুখোপাধ্যায়ের "মাতৃঋণ" চলিতেছে। "পৃথিবীর বয়স" উল্লেখযোগ্য রচনা। "রাজকন্যা" নাট্যোপন্যাস, সম্পাদিকার নিজের লেখা এখনো শেষ হয় নাই; ইহার শেষাংশ পড়িবার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক রহিলাম। "উদীয়মান কবি" প্রবন্ধে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সমালোচনা করিয়াছেন, এই সঙ্গে কবির একখানি হাফটোন্ ছবিও ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশেষ সাবধানতার সহিত নিরপেক্ষভাবে লিখিত। সত্যেন্দ্র বাবুর সুমধুর কবিত্ব-ঝঙ্কারে বঙ্গভাষা আজ মুখরিত একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার অমূল্য কাব্যগুলির বিস্তৃত সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবিও এই সংখ্যায় আছে। বাংলা মাসিক পত্র সমূহের মধ্যে ভারতী যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্থানীয় সংবাদ

সম্প্রতি গোবরডাঙ্গার জমীদার এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত দেশের স্বাস্থ্য এবং সাধারণ নীতি ও অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দেশের বিবিধ অভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া, এ সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টাই যে প্রধান কার্য্যকরী, এ কথা আমরা তাঁহাকে বলায়, তিনি তাহা অস্বীকার করেন নাই, বরং অনেক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলেন, দেশের সাধারণ জ্ঞান এবং সংস্কার এত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে যে, এখানে কোন হিতকর কার্য্য করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে পানীয় জলের জন্য ঘটক পাড়ায় যে একটী ইদারা কাটান হইয়াছিল, তাহা কেবল দেশের লোকের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গেল।"

আমরা তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আরো একটি বিশেষ কথার আভাষ পাইয়াছি তিনি এখনো দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী হইতে গোবরডাঙ্গা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী (Reserved Tank) কাটাইবার ইচ্ছুক আছেন। দেশের এখনো যাঁহারা প্রধান লোক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা যদি সচেষ্ট হন, তবে বোধ হয় ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া

অসম্ভব নয়। সাধারণে মনে করিতে পারেন যে, একগ্রামে একটি পুষ্করিণী হইলে তাহাতে কয় জনেরই বা সুবিধা হইবে? কিন্তু আমরা বলি, এই হিতকর কার্য্য একটি হইলে ক্রমে গ্রামান্তরে আরো হইতে পারে। দেশে সাধারণের অবস্থা ভাল নহে বটে কিন্তু মনে করিলে দেশের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যক্তি বিশেষে এক একটি পুষ্করিণী দান করিতে পারেন।

রাস্তা সম্বন্ধে যে কথা হইয়াছিল, তাহাতে আমরা বলি, "মিউনিসিপ্যালিটীর দুই একটি সদর রাস্তা ছাড়া অধিকাংশ রাস্তা ঘাটের অবস্থা সকল সময় ভাল থাকে না, বিশেষত বর্ষা কালে কোনো কোনো রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হয়। এজন্য গ্রামবাসী করদাতাগণের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শোনা যায়। এ কথার উত্তরে তিনি বলেন, "গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ১৪ মাইল রাস্তা আছে, তাহার জন্য ১১০০৲ এগার শত টাকা থাকে সুতরাং সমস্ত রাস্তা ভালরূপে ম্যারামৎ হইতে পারে না।"

হয়দাদপুর, ডাক্তার বরদাকান্ত ঘোষের বাড়ী যাইবার পাকা রাস্তা এবং কাছারী বাড়ীর সম্মুখ হইতে সরকার পাড়ার রাস্তার মধ্যে একস্থানে অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। এই দুটি রাস্তা এবং গৈপুর গ্রামের মধ্যের কোনো কোনো রাস্তার প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক।

গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমীদার বাবু অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত হয়দাদপুরের জমীদার বসু মল্লিকদিগের প্রায় বৎসরাবধি ব্যাপিয়া ভুমোর বাঁওড় লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ ও মোকর্দ্দমা চলিতেছে, পর্য্যায়ক্রমে উভয়পক্ষেরই জয় পরাজয় হইতেছে, ইহাতে উভয়পক্ষেরই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইতেছে। দেশের মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছে যে, জন সাধারণে মামলা মোকর্দ্দমা না করিয়া যাহাতে শালিসী নিষ্পত্তি হয় তাহার চেষ্টা করা হউক। দেশের যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি, যাঁহারা ঐ সকল কাজে অগ্রণী হইবেন, তাঁহারা যদি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখান, তবে আর সাধারণে কি করিবে?

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press
35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from
28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ ৮ম সংখ্যা

প্রার্থনা

প্রভু, অসার ভাবনা অসার কল্পনা
মন হ'তে মুছে দাও হে ;
আজি অহমিকারূপে ঘিরেছে যা' মোরে
সে গুলোও কেড়ে নাও হে।
তুমি দাও হে আমারে শকতি নব
পর-হিত-ব্রত সাধিতে ;—
মম দাও হৃদে প্রেম, অনাবিল প্রীতি,
জীবগণে ভালোবাসিতে।
শুধু ভকতি দাও হে করুণা-নিলয়,
ভক্ত সাধুকে পূজিতে,—
আর নিখিলের মাঝে পারি যেন নাথ,
তোমারি নিদেশ পালিতে।
আমি চাহিনাক প্রভু অন্য কিছুই
এই গুলি তুমি দিয়ো হে,
যদি কুপথে কথনো যাই পরমেশ,
সুপথে টানিয়া নিয়ো হে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সংযমা

(সামাজিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বৌমা—বৌমা—ও বৌমা!"

"কেন মা!"

"হরিপদ আজ নাকি একটা চাকরির চেষ্টায় যাবে, তুমি একটু সকাল সকাল কাপড় খানা কেচে দুটো ভাত চড়িয়ে দাও। তাকে নাকি ন'টার মধ্যেই বেরুতে হবে।"

"তা যাচ্চি মা" বলিয়া কমলা তাহার পরিচিত দেবতাগুলিকে উদ্দেশে এক এক বার প্রণাম করিল ও অস্ফুটস্বরে বলিল,—"হে মা কালী, হে মা দুর্গা, যেন এবার তাঁর চাকরিটুকু হয়। আমার পাঁচ সিকা পূজো মানসিক রইল।"

কলিকাতা সহরতলীর কোনো এক ভদ্রপল্লীতে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটী। তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও তাঁহার পল্লীতে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম। তিনি একটি সরকারী (Government) আপিসে চাকরি করিতেন। এখন সামান্য পেন্‌সনের উপর তাঁহার সংসারটি নির্ভর করিতেছে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁহার গৃহিণী, পুত্র হরিপদ, পুত্রবধূ কমলা, অবিবাহিতা কন্যা মেনকা ও তাহার আদরের বিড়াল ছেনু। আর একটি আছেন কৈলিসী—তবে কৈলিসী সম্পূর্ণ পরিবারভুক্ত নহেন। ইনি সকালে বাটীতে পদার্পণ করেন ও কাজ কর্ম্ম সারিয়া আহারাদির পর, পান চিবাইতে চিবাইতে স্ব-স্থানে যাইয়া নিদ্রা দেন (এখানে নাকি নিদ্রার ব্যাঘাত হয়) ও চারিটার সময় আসিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। রাত্রি নয়টার পর এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। অতি আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য অনুনয় বিনয় করিলেও রাত্রে এ বাটীতে থাকিতে পারেননা কারণ তাঁহার বাসায় নাকি তাঁহার কোনো আপনার লোক থাকে।

এই গুলি লইয়াই রাজকৃষ্ণ বাবুর সংসার। উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্র হারাইয়া শোকে তাপে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। হরিপদ ও মেনকা তাঁহাকে কতকটা শান্তি প্রদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের আর উন্নতি হইল না। ইদানীং তিনি নানাবিধ রোগে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

মানসিক কষ্টই তাঁহার রোগের প্রধান কারণ। প্রথমত তিনি যে পেন্‌সন পান তাহা দ্বারা কোনো রকমেই এই কয়েকটি জীবের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় না। কাজেই সঞ্চিত ধন ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত মেনকার বিবাহের অর্থ কোথা হইতে আসিবে। এই সমস্ত চিন্তাতেই তাঁহার রোগ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হরিপদ গত বৎসর এল্‌-এ পাশ করিয়াছে। বি-এল্‌ পাশ করিয়া উকিল হইবার তাহার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থের অভাব বশত ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এবং শীঘ্র একটি চাকরির জোগাড় করিতে না পারিলে সমূহ বিপদ বুঝিয়া, চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে লাগিল। হরিপদ দরখাস্ত হস্তে এ আপিস্ সে আপিস্ যেখানে যায়—কর্ম্ম খালি নাই শুনিয়া বিষন্নমনে ফিরিয়া আসে। তবে হরিপদকে কখনো কখনো আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে যে, যদি সে কোনো আপিসের বড় বাবুর শ্যালক হইত, তাহা হইলে চাকরির বিশেষ ভাবনা থাকিত না।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় হরিপদ ফিরিয়া আসিল।

আগ্রহসহকারে হরিপদর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজকের খবর কি বাবা!"

"মা তোমার আশীর্ব্বাদে আজ একটু সুবিধা হয়েচে বলে বোধ হয়। একটা ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি খালি ছিল, আমরা দশ জন তার জন্যে দরখাস্ত করে-ছিলুম। বড় সাহেব নিজে আমাদের সকলকে একজামিন করলেন। আমি একজামিনে সকলের ওপরে হলুম। বড় সাহেব সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকেই সেই চাকরিতে বাহাল করেচেন।"

"বুঝি এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চাইলেন। বৌমা কাল স'পাঁচ আনার চিনি-সন্দেশ কিনে মা কালীর পূজো দিতে হবে, মনে থাকে যেন।"

কমলা মনে মনে বলিল, মা তুমি স'পাঁচ আনার পূজো মেনেছিলে আমি যে পাঁচ-সিকে মেনেচি—হাতে কিন্তু একটিও পয়সা নেই। যাই হোক্ কানের মাকড়ি ক'টা তো আছে!

হরিপদ বলিল,—"মা পূজো দেওয়াটা এখন থাক্‌না—এক মাস কাজ করি, মাইনেটা পাই—তার পর পূজো দেওয়া যাবে।"

"বাপরে—দেবতার পূজো সেকি হয়? দেবতাদের রাগ কিসে হয় কিসে যায়, তা' কে বল্‌তে পারে?"

পীড়িত রাজকৃষ্ণ বাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, —"সেটা কোন আপিস হরিপদ?"

"বাবা সেটা টেলিগ্রাফ আপিস।"

"তা বেশ—সরকারি আপিস, পেন্‌সন আছে।"

"আপনি আজ কেমন আছেন?"

"আমার আর থাকা না থাকা—এখন তোমাদের রেখে যেতে পারলেই সুখী হই।"

হরিপদ তাহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তাঁই তো মা, এত ভাল ভাল ওষুধ দেওয়া হচ্চে, ঐ খুক্‌খুকে কাসি আর জ্বর টুকু কিছুতেই যাচ্চে না—কাল প্রফুল্ল এলে তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে' এক জন ভাল কবিরাজ আন্‌বার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

"সেই ভাল, এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দাওগে। সমস্ত দিনটা গায়ের ওপর দিয়ে গেছে।" কৈলিসি বলিল,—"মা, দাদা বাবুর চাকরি হয়েচে, মাইনে পেলে আমাকে মিটুই খেতে দিতি হবে।" মেনকা বলিল,—"মা, দাদা মাইনে পেলে আমার ছেনুর জন্যে ঘুঙুর কিনে দিতে বোলো।"

"আচ্ছা তা হবে।"

রাত্রি নয়টা বাজে,হরিপদ আপনার প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক খানি খবরের কাগজ পড়িতেছে—পড়িতেছে কি কাগজের আকার দেখিতেছে, তাহা বুঝা গেল না। কাগজ খানি রাখিয়া বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" বাহির করিল। দুই এক খানি পাতা উল্টাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এক বার একটা দেরাজের টানা টানিয়া কি দেখিল—এক বার বাক্স খুলিল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। কি যেন হারাইয়াছে তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, কি হারাইয়াছে, তাহা যেন সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একটু এ দিক ও দিক করিয়া অলস-ভাবে পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল, হরিপদ উৎসুকনেত্রে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কমলা ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিপদ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

কমলা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল, মেঘান্তরিত চন্দ্র যেন গগন-পটে হাসিয়া উঠিল! কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি ভাব্‌চ এখনো যে ঘুমোও নাই!"

"তবু ভাল—মনে পড়েচে।"

"কি কোর্‌বো বল, মা স্বভাবতই একটু বেশি রাত্রে খান—মার খাওয়া হ'লে তবে কৈলিসী ভাত নিয়ে যায়, তারপর আমি রান্নাঘর পরিষ্কার করে, হেস্কেল তুলেই তো আর এখানে আস্‌তে পারি নে ; মা যতক্ষণ না শোন ততক্ষণ আমাকে বসে' থাক্‌তে হয়" কমলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হরিপদ বলিল,—"বাঃ তোমার তো বেশ বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা আছে দেখ্‌চি। আজ বলে' নয়, মাঝে মাঝে আমি তোমার এ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে থাকি। আচ্ছা একটা কাজ......"

কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া পতির মুখে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বাম হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—"এর গুরু কে ?"

হরিপদ এতক্ষণ যাহা শত চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পায় নাই, এখন যেন তাহা কোথা হইতে আপনি হাতে আসিয়া পড়িল।

হরিপদ কমলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল—কমলা ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা সুখী আর কে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাত সাতটার সময় মেনকা আসিয়া বলিল,—"মা ফুল বাবু এসেছেন।"

"যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসোগে—তোমার দাদা কোথায় ?"

"দাদা বুঝি এখন বাগানে লড়াই করচে" বলিয়া মেনকা আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।

প্রফুল্ল মেনকার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মা, কাজের ঝঞ্চাটে ক'দিন আস্‌তে পারিনি—বাড়ির সব খবর ভাল তো ?"

"কাল থেকে নাকি হরিপদর একটা চাকরি হয়েচে। আর কত্তার যা'হয় একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। ডাক্তারি ওষুধে তাঁর কোনো সুবিধা হচ্চে না। তা বাবা একটু বসো হরিপদ এল বলে'। তোমার ছেলে পুলে সব ভাল—বৌমা ভাল আছেন তো ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভাল" বলিয়া প্রফুল্ল এক খানি চেয়ার লইয়া কর্ত্তার নিকটে বসিল।

মেনকা প্রফুল্লকে ফুল বাবু বলিয়া ডাকিত ; তাহার কারণ এই যে, প্রফুল্লকে দেখিতে ঠিক সাহেবের মত। সাহেবী পোষাক পরিলে তাহাকে ইংরাজ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রফুল্ল একে তো সুপুরুষ তাহাতে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত—

তাহার সোনার চশমা, পম্প সু, আইভরি ষ্টীক্, শান্তিপুরের মিহী ধুতি—সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর সিল্কের চাদর—এই সব দেখিয়া মেনকা তাহাকে ফুল বাবু ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত পদ খুঁজিয়া পায় নাই।

প্রফুল্লের বাটী হইতে হরিপদর বাটী একটু তফাত। প্রফুল্লের পিতা কমলার কৃপায় 'ডারবি সুইপে'র একটা প্রাইজ পাইয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছেন। ইহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ অমূল্য ও কনিষ্ঠ প্রফুল্ল। অমূল্যের সন্তানাদি হয় নাই। প্রফুল্লের দুইটি পুত্র। প্রফুল্লের সহিত হরিপদর বাল্য প্রণয়, তাহাতে আবার সহাধ্যায়ী এক সঙ্গে উভয়েই এল্-এ পাশ করিয়াছে। হরিপদ অর্থাভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রফুল্ল এবার বি-এ, পাশ করিয়া কলিকাতার কোনো একটি কলেজে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—সে ইংরাজি ও গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। প্রফুল্লের ইচ্ছা —সে এবার বি-এল্ পরীক্ষা দিয়া উকিল হয়।

হরিপদ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ। তাহার শরীরের গঠন দেখিলে তাহাকে একটি ছোট খাটো 'রামমূর্ত্তি' বলিয়া বোধ হয়।

হরিপদর বাটীর খিড়কিতে একটি বাঁধা ঘাটযুক্ত পুষ্করিণী আছে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বাগান। এই বাগানে তাহার একটি ব্যায়ামের আখ্ড়া আছে। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে পাড়ার ছেলেরা এই বাগানে ব্যায়াম শিক্ষা করে। হরিপদ উহাদের নেতা। লাঠি খেলা কুস্তি ও অন্যান্য ব্যায়াম-কার্য্যে হরিপদ সিদ্ধহস্ত। হরিপদর শারীরিক বলও কম নয়, সে একটা তিন মণ লোহার গোলা দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। এক দিকে যেমন সে মহাবলে বলীয়ান, অপর দিকে তেমনি সে নম্র বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। অনেক বার সে তাহার বলের পরিচয় দিয়াছে। এক বার প্রফুল্ল ও হরিপদ নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল, হটাৎ একটা বড় ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা এক পেশে হইয়া জল উঠিতে লাগিল। মাঝি মাল্লা সকলে লাফাইয়া পড়িল। প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি যে সাঁতার জানিনা, ভাই।"

হরিপদ বলিল,—"আমি বেঁচে থাক্‌তে তুমি কি ভাই ডুবে মরবে?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিপদ প্রফুল্লকে আপনার পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল,— "তুমি আমার পিঠের উপর শুয়ে দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে থাক। আমার হাত আর পা খালি থাক্‌লেই হ'ল।" নৌকাও ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও বন্ধুকে পৃষ্ঠে লইয়া অবলীলাক্রমে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদ বাগান হইতে আসিয়া দেখিল যে প্রফুল্ল তাহার পিতার নিকট বসিয় রহিয়াছে। প্রফুল্ল হরিপদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কিহে তোমার পালোয়ানী করা শেষ হ'ল।"

হরিপদ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"একটু না করলে শরীরটা থাকে কি করে?"

"তোমার চাকরি হয়েচে শুনে সুখী হলুম।"

"বাবাকে কেমন দেখ্‌লে? আমার ইচ্ছা—কবিরাজ দেখাই।"

"আমারো সেই মত। ডাক্তারি মতে ঘুশ্‌ ঘুশে জ্বরের বিশেষ সুবিধা হয় না।"

"আমার ইচ্ছা—দ্বারিক কবিরাজকে আনি।"

"তা মন্দ নয়।"

এই বার ক্ষীণকণ্ঠে রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"তাঁর ভিজিট্ কত?"

হরিপদ বলিল,—"বোধ হয় ষোলো টাকা।"

রাজকৃষ্ণ বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"ষোলো টাকা! টাকা গুলো কি খোলাম্‌ কুচি? না তোমাদের কবিরাজ আনতে হবে না।"

"তবে না হয় এখন এক জন ছোট কবিরাজ এনে দেখাই, তারপর যা' বিবেচনা হয় করা যাবে" এই বলিয়া হরিপদ প্রফুল্লকে উঠিতে সঙ্কেত করিল—প্রফুল্ল প্রণাম করিয়া হরিপদর সহিত বাহিরে আসিল।

হরিপদ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"দেখ্‌লে ভাই, দ্বারিক কবিরাজকে যে আনবো, টাকা দেবে কে!"

"তুমি যা'ই বল ভাই, রোগটি আমার সহজ বলে' বোধ হচ্চে না।"

"তাই তো কি করা উচিত?"

"তুমি দ্বারিক কবিরাজকেই নিয়ে এসো—ভিজিট্ আমি দেব।"

"তবে আমি আপিস থেকে আসবার সময় তাঁকে বলে' আসবো যেন তিনি কাল ৭ টার সময় এখানে আসেন—আর তুমিও ঐ সময় এখানে এসো।"

"সেই ভাল এখন আসি" বলিয়া প্রফুল্ল গমনোদ্যত হইল।

হরিপদ তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিল,—"ভাই টাকাটার কথা কিছুই বল্লেনা—কবে দিতে হ'বে?"

"সেকি তুমি আমায় পর ভাবো, আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? আমার ছেলে দুটো যদি খেতে না পায়, তুমি কি তা'দের দেখবে না? এখন ভগবানের কৃপায় যা'হোক দশ টাকা উপায় করচি, এখন কি আমি তোমার

কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি না? ছি ভাই, আর ও কথা আমায় বোলো না প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।"

"বেলা হ'ল ভাই এখন আসি" বলিয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল। হরিপদ নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। পুলকে প্রাণটা ভরিয়া উঠিল। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ-সঙ্গীত

যুদ্ধের সময়কার বাদ্যধ্বনি যোদ্ধাগণকে উৎসাহিত করিয়া দেয়। সেই বাদ্যধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রে যে নবীন শক্তির সঞ্চার করিয়া তুলে, তাহা তরবারীর ক্ষমতা অপেক্ষাও ভীষণ! সেই প্রাণ-মাতানো বাজনা যোদ্ধাগণকে জয়ের অভিমুখে নিঃসন্দেহ অগ্রসর করিয়া দেয়। তাহারা অনেকে আহত হয়, অনেকে নিহত হয়; কিন্তু সে কেবল চরম লক্ষ্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া। আমাদের জীবনেও জয়ের আনন্দ-সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে! সংসারে, সমাজে এবং আমাদের নিজের কাছে আমরা যে প্রত্যেকে জয়ী, তাহা সত্য করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তথাচ, আমাদের এই আশার সঙ্গীত,—আমাদের, এই জয়-গান যেন পৃথিবীর সমগ্র কষ্টের উপর, ক্ষোভের উপর, দারিদ্র্যের উপর, সংসারের প্রবল প্রতিকূলতার উপর অনাহত শব্দে ধ্বনিত হইতে থাকে। আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁহার পক্ষের বিজয়-গাথা গীত করি। এই জগতে আজ পর্য্যন্ত কত মনীষি সেই মহান্ পুরুষের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত অত্যন্ত সহজেই তাঁহাতে নিজেদের নিঃশেষে সমর্পন করিয়া দিয়াছেন। গ্রহণ করিয়াছেন,—দুঃখের কণ্টকময় শিরোভূষণ, দান করিয়াছেন—আপনাদের সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনা সাধারণের মঙ্গল-উদ্দেশে। পৃথিবীর সংগ্রামে তাঁহারা নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন আর নিঃশেষ হইতেছে না, মানব-সমাজে আদর্শ স্থানে তাহা চিরবিরাজিত, সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিদ্বারা তাহা চির-প্রণম্য।

কে আমাদিগকে জীবনের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করাইবে? সংগ্রামের সেই মহাবাদ্য ধ্বনিত করিয়া তুলিবে কোন জন? কে

ডাকিয়া কহিবে—পৃথিবীতে কেবল দুঃখ নাই—আছে আশা, আছে আনন্দ, আছে কল্যাণ? কে সেই আনন্দময়ের আনন্দ-সঙ্গীতে মত্ত করিয়া দিবে? কে সে জন, যে জন বিধাতার পাতাকাকে সহস্র দুঃখের ভিতর দিয়াও অবিচলিতচিত্তে বহন করিয়া আনন্দে উত্তীর্ণ হইবে? কে প্রত্যেকের আত্মশক্তির উপর গভীর বিশ্বাসী, একান্ত শ্রদ্ধাবান হইতে শিক্ষা দান করিবে? কে আমাদের আশ্বাস দিয়া কহিবে,—"হে বিধাতার সৈনিক, তোমাদের প্রত্যেকের ললাটে তাঁহার শুভস্পর্শ রহিয়াছে,—নির্ভয়চিত্তে বাহির হও জয়ী হইবে। ভীত হইয়ো না। দৃঢ়মুষ্টিতে আপনার অস্ত্র ধারণ করিয়া ছুটিয়া যাও, পাপ থাকিবে কোথায়? হে মানব! তুমি যে বীর—বীরের পুত্র!"

চারিদিক্ হইতে যে, সকল দ্রব্যই আমাদিগকে বন্দী করিতে চায়। কিন্তু আমাদের এই বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া বীরের ন্যায় চলিতে হইবে। মরুভূমির উপর শঙ্কিত না হইয়া আমাদের মরু-বালুকা-নিম্নস্থ নির্ম্মল জলধারাটি আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু হায়, শক্তি কোথায়?—লাভ করিতে হইবে সাধনা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা। দিনের পর দিনে যে উত্তাপ এবং বোঝা বাড়িয়া চলিল। একবার পূর্ণ জয়ীর বিজয়গাথা গীত করিয়া জয়ের টিকা ললাটে ধারণ করিয়া এখন আমাদের যে নির্ভয় হইতে হইবে। ভাসিয়া যাক্ তোমার সমস্ত—আজ আনন্দের পূর্ণ স্রোতে। ধরণীর সমস্ত শব্দের উপর তোমার জয়গান ধ্বনিত হইতে থাক্। তোমার চতুর্দ্দিকে ঘন অন্ধকার,—কিন্তু হে সাধক! হে বীর! তুমি সেই সত্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে সমস্ত বিভীষিকা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ভয় করিয়ো না। তুমি যে মানুষ হইয়া কী প্রকাণ্ড অধিকার লাভ করিয়াছ, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি বীর, তুমি বিধাতার সৈনিক, পারিবে না আনন্দিত হইতে? লাভ করিবে না অমোঘ পদার্থ? ধরাতলে ব্যর্থ হইবে?

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

একটা আবশ্যক কথা

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের পত্তন হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় এই গ্রাম বর্ত্তমান ছিল,—ইহার প্রমাণ এখনো বিদ্যমান। গ্রামের উত্তর-

পূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত প্রতাপপুরের মাঠ। চাষী লোকের বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইছাপুরনিবাসী স্বনামধন্য রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ধূমঘাট যশোরের অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই বিস্তীর্ণ মাঠে সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই মাঠ সেই প্রতাপের নামে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে। মাঠের উত্তর-পূর্ব্বে কঙ্কণা হ্রদ। জনপ্রবাদ, বিষ্ণুচক্রছিন্ন সতীর হস্তের কঙ্কণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার নাম কঙ্কণা হইয়াছে। কিন্তু এই জনশ্রুতির মূল কোথায়, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।*

এই গ্রামে ভট্টাচার্য্য পাড়ার দক্ষিণে 'ধোপার বিতেরে' এখন ধর্ম্মপূজা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-প্রভাবের ক্ষীণ নিদর্শন, ইহা ইদানীন্তন ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বৌদ্ধদিগের নিদর্শন সেই শ্বেতছত্র এখনো ধর্ম্মসন্ন্যাসের দিন ঐ মেলায় ক্ষুদ্র সোলার ছাতারূপে বিক্রয় হইয়া থাকে। লোকে উহা ঐ পূজার উপহারস্বরূপ ধর্ম্মঠাকুরকে প্রদান করে। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মঠাকুরের গৃহ প্রস্তুতে ও মৃন্ময় স্তূপগঠনে বৌদ্ধ ঢং বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের দ্বারা এই ঠাকুরের পূজা হয় না। ইহা যে বৌদ্ধ উৎসব তাহা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে "কুশদহ"তে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। সেই অতীতের স্মৃতি অতীতেরে অন্ধকারেই আত্মগোপন করিয়াছে।

গোবরডাঙ্গার অতীত ইতিহাস যাহাই হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আলোচনা করিব না। এই গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থাই আমার আলোচ্য বিষয়। ইদানীং শ্রমশিল্পেই গোবরডাঙ্গা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। চিনির কারখানার জন্যই এই গ্রাম বিখ্যাত, পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা ও ইহার সন্নিহিত জনপদে প্রায় নব্বইটি চিনির কারখানা ছিল। এক একটি কারখানায় গড়ে প্রায় সাত আট হাজার টাকার চিনি প্রস্তুত হইত। নিতান্ত ছোট কারখানাতেও আনুমানিক দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার চিনি জন্মিত। ইহা ভিন্ন তাহাতে বিস্তর টাকার চিটা গুড় ও খাঁড় গুড় প্রস্তুত হইত। এখন সে সমস্ত প্রায়

* প্রবাদ আছে কঙ্কণের ন্যায়, আকার বলিয়াই, ইহার নাম কঙ্কণা। (কুঃ সঃ)

লোপ পাইয়াছে। এখন প্রতি বৎসর দুইটি কারখানা 'উঠে' কিনা সন্দেহ। এখন কারখানার ভাঙা বাড়ি ও রাস্তা ঘাটে 'খাপরা'র ছড়াছড়ি সেই অতীত শিল্পের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

এই শিল্প লোপে আমাদের লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করা উচিত। এক একটি কারখানায় মরশুমের সময় আট হইতে ষোলো জন করিয়া মজুর কাজ করিত। প্রতি কারখানায় গড়ে দশ জন করিয়া মজুর ধরিলেও এই নব্বুইটি কারখানায় নয় শত মজুরের বা নয় শত গৃহস্থের অন্ন-সংস্থান হইত। ইহা ভিন্ন মুটে, মাঝি, দালাল, কয়াল প্রভৃতি প্রায় তিন শত লোক এই কাজে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইত। মুটেই ছিল প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন। হাটুরে নৌকা আনুমানিক একশত পঁচিশ। ইহা ভিন্ন প্রায় ত্রিশ চল্লিশ খানি নৌকা পাটা শেওলা (শৈবাল) কাটিতে ও বেচিতে নিযুক্ত থাকিত। চালানি কাজেও বিস্তর নৌকা খাটিত ; ঝুড়ি, চুপড়ি, কোলা, মেছলা, নাদা, খুলি, ঝর্ণি, ডাবা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কত ডোম ও কুমার স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা বলা কঠিন। আর এক কথা,—এই নব্বুইটি কারখানায় নব্বুই জন মুহুরীর আবশ্যক হইত। সামান্য শুভঙ্করের অঙ্ক কসিয়া ও হাতের লেখা দোরস্ত করিয়া অনেক ভদ্র সন্তান এই মুহুরীগিরি করিতেন। ইহাতে নব্বুই ঘর ভদ্র গৃহস্থ প্রতিপালিত হইত।

কারখানার অবস্থা যখন ভাল ছিল,—তখন কারখানার স্বত্বাধিকারীরা বৎসরে খরচ খরচা বাদ প্রায় দুই তিন হাজার টাকা লাভ করিতেন। অবশ্য সকল বৎসর সমান লাভ হইত না। যাহা হউক, তাঁহারা বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিয়া, দশজন আশ্রিত অনুগতকে প্রতিপালন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত কারখানার মরশুম ছিল। মজুরেরা অনেকে চৈত্রে বিদায় লইয়া বৈশাখে চাষে মন দিত। ফলে মোটের উপর এই কারবার লুপ্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আনুমানিক দুই হাজার লোকের জীবিকা উপার্জ্জনের একটা উপায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভদ্র লোক মহলে ইহার প্রভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, অনেক বড় বড় বাড়ির চূণকাম খসিতেছে, দেউল ভাঙিতেছে,—অনেক পূজার দালানে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনির পরিবর্ত্তে চামচিকা ও বাদুড়ের ছুটাছুটি শুনা যাইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে,—তাহা কি অন্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না ? অবশ্য যে উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইত, সে উপায়ে আর

চলিবে না। যদি চলিবে তাহা হইলে কারখানা গুলি যাইবে কেন? উহাতে অপচয় অধিক, খরচও অধিক,—সুতরাং প্রতিযোগিতায় উহা তিষ্টিতে পারেই না। কিন্তু যদি বর্ত্তমান যুগের উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে শর্করা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে খরচও অল্প হয় মালেও অধিক ভজে। অবশ্য প্রথমে যন্ত্রাদি কিনিয়া দেখিতে হয়। লোককে যন্ত্রাদির ব্যবহার শিখাইতে হয়। তাহাতে প্রথমে কিছু ব্যয় এবং ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ সকল কার্য্যে প্রথমে একটু ক্ষতি স্বীকার না করিলে পরিণামে মঙ্গল হইতেই পারে না। একটা বৃত্তি—জীবিকার্জ্জনের একটা উপায়—একবার ছাড়িয়া দিলে আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না। তাই বলি বৃত্তি ছাড়িবার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের কথাটা এক বার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জানিয়া শুনিয়া প্রথমে ক্ষতি স্বীকার করিতে কে অগ্রসর হইবে? সমস্যা ঐ খানেই। আমার বোধ হয়, দশ জন ধনী মিলিত হইয়া সকলে কিছু কিছু টাকা দিয়া প্রথমে পরীক্ষা-স্বরূপ একটা কারখানার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যদি কারবারে লাভ হয়, এক জন ঐ কাজ বুঝিয়া লইবেন, এবং অন্যের অংশের টাকা মায় সুদ ফিরাইয়া দিবেন। যিনি কারবারের কর্ত্তা থাকিবেন,—তাঁহার দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। সুদের হার অল্প করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে দশ জনেই যৌথ-কার্য্যের পত্তন করিতে পারেন। শুনিতে পাই, আমাদের 'সাজার' কাজ সাজে না। এখন দেশ কাল পাত্র ভাবিয়া যাহাতে সাজে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কেবল 'ফরওয়ার্ড সেলে' যাভার চিনি কণ্ট্রাক্ট্ পত্রে স্বাক্ষর করত খরিদ করিয়া হাজার হাজার টাকা লোক্‌সান দিলে চলিবে না। ঐরূপ স্ফুর্ত্তি খেলা পরিণামে শুভাবহ হইতেই পারে না। কারণ যাহাদের সহিত আমরা স্ফুর্ত্তি খেলিতেছি, তাহাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক পাকা তাহারা কানে জল দিয়া কানের জল বাহির করিতে জানে।

অনেকেই ভাবিতে পারেন যে,দশ জনে টাকা দিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠা করিব--কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করা যায়? দুই তিন বৎসর ধরিয়া তাহার পরীক্ষা দশ জনেই করিব, লোক্‌সান হয় দশ জনেই তাহা সহিব, কিন্তু যেমন লাভের উপায় আবিষ্কৃত হইবে, অমনই তাহা এক জনে পাইবে, বাকী সকলে নিজ নিজ অংশের টাকা লইয়াই সরিয়া পড়িবে, ইহা কেমন ব্যবস্থা?

ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ কি ? আমার ধারণা, স্বার্থকে অত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়িয়া সমাজগত স্বার্থের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি ঐ চিনির কারবার রক্ষা করিবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে সকলেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন ; সকলেরই অর্থ উপার্জ্জনের একটা পন্থা হইবে। নতুবা পরে আমাদের বংশধরগণ কি করিবে ? চাকুরী মিলে না, আড়তদারী থাকেনা, অন্য ব্যবসায়ও সুবিধাজনক নহে। এই ব্যবসায়ের প্রভাবে তাম্বুলি-সমাজ এই অঞ্চলে প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও ইহার দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন,—এখন ইহার লোপে অনেকের দুর্দ্দশা হইয়াছে,— পরে দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদিবে।

আমার শেষ কথা,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে গোবরডাঙ্গা গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছিল,—আমাদের আমলে যাহাতে উহা একেবারে অপদার্থ লোকের আবাসস্থলে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি চিনির-কারখানার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভবই হয়, অন্য কারবারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে পরিণামে সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

সুরা। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, রম্, জিন্, ধেনো প্রভৃতি বহুবিধ সুরা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত সুরার নাম ব্রাণ্ডি ; যব হইতে প্রস্তুত সুরার নাম হুইস্কি ; গুড় হইতে প্রস্তুত সুরার নাম রম্ ; জুনিপার ফল হইতে প্রস্তুত সুরার নাম জিন্ ; ধান্য হইতে প্রস্তুত সুরার নাম ধেনো। সুরা সাধারণত উত্তেজক। এই উত্তেজনা শরীরের সমস্ত যন্ত্রে প্রকাশ পায়। পরন্তু মস্তিষ্কের উপর ইহার ক্রিয়া কিছু অধিক। মাত্রাধিক্য হইলে উত্তেজনা শীঘ্রই অবসাদাবস্থায় পরিণত হয়। সুরাপানের অল্পকাল পরেই পাকাশয়ে উষ্ণতা বোধ হয়, চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, আত্মশাসন-শক্তি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হয়, পেশীসকল দুর্ব্বল হয় এবং গতিশক্তি লোপ পায়। সুরাপায়ী অসংলগ্ন বকিতে থাকে, কখনো চীৎকার, কখনো হাস্য কখনো বা ক্রন্দন করে এবং ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। সচরাচর

৬ হইতে ১০ ঘণ্টার মধ্যে বা কিছু পরে চৈতন্যোদয় হয়। তখন বমন বা বমনেচ্ছা, পিপাসা, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা প্রভৃতি অনেক প্রকার শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হয়। সুরাপায়ীদিগের বিবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ, অম্ল, অজীর্ণ, শোথ, মস্তিষ্ক ও যকৃতের পীড়া, হৃদ্‌রোগ, ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ, মৃগী ও পক্ষাঘাত সর্ব্বদাই হইতে দেখা যায়। অবিরত সুরাপানরত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রা, অতিঘর্ম্ম, প্রলাপ, ভয়, কাল্পনিক চিন্তা, নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন, হস্তপদাদির কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ সংযুক্ত এক প্রকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তারেরা এই অবস্থাকে Delirium Tremens বলেন। সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার Roberts প্রমুখ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"Spirits do by far the greatest harm, specially when taken in frequent drams, strong and on an empty stomach".

F. T. Roberts, M, D, , B, Sc, F, R, C, P.

"When taken in a large dose it may immediately destroy life, like any other active poison, In smaller quantities, frequently repeated, its effects are very prejudicial; all the important organs suffeing more or less from its influence, but specially the stomach, liver, kidneys, and the nervous system."

T. H, Tanner, M,, D, M. R. C. P. F. L. S.

প্রত্যহ অল্প পরিমাণে সুরাপান করিলে শরীর স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার আধার হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসকের বিনা পরামর্শে অনেকে গোপনে সুরাপান অভ্যাস করেন। প্রত্যহ সুরাপান করিলে শীঘ্রই উহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং মাত্রাও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমতে স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে গিয়া অনেকে পাকা মাতাল হইয়া উঠেন। সুরা পানে মাননাশ, অর্থনাশ, জীবননাশ, সমস্তই হইয়া থাকে। কত শত ধনী, মানী ব্যক্তি এক সুরার প্রসাদে ধন, মান হারাইয়া রাস্তার কাঙাল হইতেছেন। "একোহি দোষোগুণরাশিনাশী।" এক সুরাপানদোষে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। সুরাপায়ী সমস্ত মান সম্ভ্রম শৌণ্ডিকের চরণে সমর্পণ করিয়া সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-প্রবল দেশে ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপান একই প্রকার মহাপাতক বলিয়া গণ্য হয়। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—"সুরা অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য।" আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে

উক্ত আছে ;—

"মদ্যোপ হত বিজ্ঞানো বিযুক্তঃ সাত্ত্বিকৈগু'ণৈঃ।
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥"

মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ বিযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দূষ্য, নিন্দনীয় ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

"গচ্ছেদগম্যান্ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্ট সংজ্ঞঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদিস্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ॥"

মদ্যপায়ী ব্যক্তি অগম্য স্থানে গমন করে, গুরুজনের সম্মান করে না, অভক্ষ্য ভোজন করে, জ্ঞানহীন হয়, হৃদয়ের গুহ্য কথা প্রকাশ করে এবং তাহার আত্ম-শাসন-শক্তি থাকে না। "Habit is the second nature" ইহা মহাজন-বাক্য। এক বার সুরাপান অভ্যস্ত হইলে সে অভ্যাস সহজে দূর হয় না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে মনঃসংযোগ করা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঐ পাপ অভ্যাস ত্যাগ করা ব্যতীত উহার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। আর অধিক বলিব না ; কেবল এই মহা কবিবাক্যটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করি—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-পরিচয়

পাট বা নালিতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে শ্রীযুক্ত রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকের অধিকাংশই 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাটের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রভৃতি জানিতে ইচ্ছা-করেন, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহারা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

An Easy Introduction, to the study of Telegraphy—শ্রীযুক্ত সুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বেনারস মহালক্ষ্মী-প্রেসে এ, কে, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা।

Telegraphy সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্যই এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রথম শিক্ষার্থীরা ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

সমালোচক।

স্বপ্ন-স্মৃতি

—০:0:০—

আজি, চন্দ্র কিরণে, ধীর সমীরণে,
মনে পড়ে তার ছবিটি,
আজো, হৃদয়ের পটে, আছে মোর ফুটে,
তাহার করুণ আঁখিটি।
আমি, স্বপন-মাঝারে, দেখেছিনু তারে,
নিমেষের তরে আবেশে,
সে যে, স্বপনের বেশে, জ্যোছনার দেশে,
ছিল বসে' তথা হরষে।
সেথা, নীলাকাশ-কোলে, স্বরগের ফুলে,
জ্যোছনা আছিল ছড়া'য়ে,
তথা, কুসুম-বালিকা, চামেলি-কলিকা,
দিতেছিল শোভা বাড়া'য়ে।
সেথা, আরো কত ফুল, শোভায় অতুল
ফুটেছিল বন ভরিয়ে,
যেন, কেহ নানা বন করি বিচরণ,
এনেছিল শোভা হরিয়ে।
আমি বারেকের তরে, আবেশের ভরে
দেখেছিনু চারু শোভাটি,
সেথা চকিত-মাঝারে, দেখেছিনু ফিরে,
তাহার করুণ আঁখিটি।
তাই চন্দ্র-কিরণে, ধীর সমীরণে
পড়িতেছে স্মৃতি মনেতে,
আজি তাই দূর হ'তে, এ মধুর রাতে
পশে তারি গান কানেতে।

শ্রীহরিপদ দে।

———

প্রত্যাবর্ত্তন (৫)

বৃন্দাবনে কোনো পরিচিত ব্যক্তির সন্ধান জানিতে না পারায় 'লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ি' গিয়া উপস্থিত হইব, এইরূপ একটা সঙ্কল্প লইয়া চলিয়াছি। হাথরস জংশন হইতে পথেই সন্ধ্যা হইল, তখনো বৃন্দাবন, আরো দুই একটা ষ্টেশন পরে। আমি যে গাড়িতে ছিলাম তাহাতে আর অধিক লোক ছিল না, বোধ হয় দুই একজন মাত্র ছিল। অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে; একটি ভদ্র লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

"আমি বৃন্দাবন যাইব।"

ক্রমে আমাদের আরো কথাবার্ত্তা চলিল; তাহাতে জানিলাম তিনি মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনে আসেন। এবার কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন, আজ গোকুলে গিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে থাকেন, নাম গৌরাঙ্গচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গৌরাঙ্গ বাবু শিক্ষিত যুবক, অল্পক্ষণের মধ্যে এতটা পরিচয় করা—বিশেষত পিতার নাম পর্য্যন্ত বলার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কেন জানি না—আমারো ঠিক স্মরণ নাই, কি কথার সূত্রে তিনি পিতার নাম বলিলেন। আমার তখন মনে হইল, ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম প্রচারক-দল গঠনের সময়, যে অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছিলাম, ইনি কি সেই অন্নদা বাবু? জিজ্ঞাসা করায় গৌরাঙ্গ বাবু বলিলেন,—"তিনিই আমার পিতা—মুঙ্গেরে থাকেন।"

এখন গৌরাঙ্গ বাবু আমার পরিচিত ব্যক্তির মধ্যেই হইলেন। তার পরেও আমাদের আরো কিছু কথাবার্ত্তা হইল, কথার ভাবে বুঝিলাম তিনি ডাক্তারী পাশ করিয়াছেন, মুঙ্গেরে একটি ডিস্‌পেন্সরীও আছে। তিনি আজো বিবাহ করেন নাই,—অর্থাৎ তিনি একজন দস্তুরমত সংসারী লোক নহেন কিম্বা চিকিৎসা ব্যবসারী নহেন। ধর্ম্ম কর্ম্মে আর সাধু সেবায় তাঁহার বেশী সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতাও এখন বিশেষ ধর্ম্মের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়াও উদার ভাবেই ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। অবশ্য তাঁহার বয়স এখন অধিক হইয়াছে।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমরা বৃন্দাবন ষ্টেসনে আসিয়া নামিলাম। গাড়িতে গৌরাঙ্গ বাবু জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি বৃন্দাবনে কোথায় যাইবেন?"

"আমার তো যাইবার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, তবে 'লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ি' যাইব মনে করিতেছি।"

"আজ পর্য্যন্ত আমার একটা ঘর ভাড়া করা আছে, আগামী কল্য আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, আজ রাত্রে আপনি সেই ঘরে থাকিতে পারেন।"

আমি তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন,—"আমি রাত্রে আর কিছুই আহার করিব না, আপনার জন্য কিছু দোকানের খাবার লইব, অপনি কি লইতে চান লউন।"

কিছু পুরী ও তরকারি লওয়া হইল, আমার নিকট কিছু পয়সা ছিল দিতে গেলাম কিন্তু তিনি বাধা দিয়া নিজে পয়সা দিলেন। এই সকল ঘটনা এখন যেন আমার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে।

পরদিন প্রাতে গৌরাঙ্গ-বাবু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাকে লইয়া তাঁহার ভক্তিভাজন হরিচরণ বাবাজীর বাড়ি গিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়া গেলেন। রাত্রে গৌরাঙ্গ বাবু আমার নিকট হরিচরণ বাবাজী সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চভাব প্রকাশ করিয়া বলেন,—"তিনি শিক্ষিত বাঙালী, সংসারত্যাগী ভক্ত-সাধক।"

হরিচরণ বাবাজী অল্প কথায় আমার পরিচয় লইলেন। আমার এই ভ্রমণ সম্বন্ধে দুই এক কথার পর বলিলাম,—"ষোলো বৎসর পূর্ব্বে একবার আমরা তিন বন্ধুতে এখানে আসিয়াছিলাম, সে বারে আমি তেমন কিছু বুঝিতে পারি নাই, আমার এবারকার ভ্রমণ একপ্রকার স্বাধীনভাবের, তাই আর একবার এই স্থানটা দেখিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তবে বাহ্য ব্যাপার দর্শনে আমার অধিক আকাঙ্ক্ষা নাই, আপনার নিকট রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্ন খুব সরল সোজাসুজী রকমের, কেন না পুরাণ-বর্ণিত কোনো ভাবের দিক দিয়া কোনো কথা শোনা আমার উদ্দেশ্য নহে। উত্তর যদি খুব সরল ভাবে পাই তবেই আমার আনন্দ হইবে।

আমার ভাব দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ সস্নেহভাবেই প্রথমে বলিলেন,—"তুমি এখানে কিছুদিন থাকো, ক্রমে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।"

"আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে, অতএব মূল তত্ত্ব-সম্বন্ধে আপনার নিকট কিছু শুনিলে বোধ হয় আমার আনন্দ হইবে।"

তাঁহার যত্নে মধ্যাহ্নে তাঁহার বাসায় আহার করিলাম। ইতিমধ্যে একবার বেড়াইয়া আসিলাম; হরিদ্বারে যে যুবকটির সহিত কথা ছিল যে, প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে

যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাই, (নাম ঠিকানা লেখা ছিল) মদনমোহনের বাড়িতে তাঁহার দেখা পাইলাম। পরে যমুনায় স্নান করিয়া আসিলাম।

আহারান্তে বিদায়ের পূর্ব্বে হরিচরণ বাবাজীর সহিত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা হয়,—আমার প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দেন, তাহা তখন তেমন সন্তোষ-জনক হয় নাই। আমি দেশে ফিরিয়া আসার পর আমার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ধর্ম্মবন্ধু জনার্দ্দন সরকারের সন্নিধানে, তাঁহার পরিচিত একটি বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হরিচরণ বাবাজীর কথা হইতে পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট অথচ একই রকম ভাবের কথা, এজন্য আমার প্রশ্ন এবং উভয় উত্তরের সার কথা এখানে উল্লিখিত হইল ;—

প্রশ্ন ;—"উপনিষদে স্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আত্মা, পরমাত্মা ; পিতা, পুত্র ; প্রভু, দাস, সখা-সুহৃদ প্রভৃতি ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখা যায়। তারপর দেহধারী অবতার-ভাবে রাম-সীতার ভাব তখনো পর্য্যন্ত পবিত্র ভাবেই ছিল ; কিন্তু তারপর রাধাকৃষ্ণ-ভাব অবতারণার কি আবশ্যক হইল ?—অবশ্য স্বাধীন প্রেমের মাধুর্য্য রক্ষার জন্যই বোধ হয় রাধা বিবাহিতা স্ত্রী না হইয়াও নায়িকা-রূপে পর-কীয়া মাধুর্য্য রসের লীলা দেখানো হইল, কিন্তু এই ভাবুকতার প্রাবল্যে জ্ঞানের যে উচ্চ আদর্শ, তাহা কি খর্ব্ব হইয়া গেল না ? ইহাতে ধর্ম্ম-জগতের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ কি অধিক হয় নাই ?"

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—"রাধা কে ? কৃষ্ণই বা কে ? ইঁহারা কি প্রকৃত কোনো নর-নারী ছিলেন, কিম্বা কল্পিত ? অথবা পরমাত্মা (কূটস্থ চৈতন্য) এবং জীবাত্মা (হ্লাদিনী-শক্তি) ? যদি উঁহারা পরমাত্মা এবং আত্মার রূপকই হন তবে উপনিষদে আত্মা-পরমাত্মার এমন নিগূঢ়, বিশুদ্ধ অথচ 'প্রাণস্য প্রাণম্' 'মধুরম, মধুরম্' স্বরূপের প্রকাশ স্বত্বেও—যে সাধনায় ঋষিরা উচ্চ ভাব এবং বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ করিয়া 'ব্রহ্মানন্দ' 'ভূমানন্দ' সম্ভোগ করিয়া গেলেন, সে আদর্শ ম্লান করিয়া এমন রূপক-সাধনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন তবে বড়ই উপকৃত হইব।"

উত্তর ;—(১) "উপনিষদোক্ত আত্মা-পরমাত্মা-ভাবের মধ্যে মাধুর্য্যরসের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। (২) রাম-সীতার ভাবেও মাধুর্য্যরস তেমন নাই, উহা করুণ-রসাত্মক এবং বিধি-বাদে বদ্ধ অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সীতা পরিত্যাগ করা হইল। (৩) রাধা-কৃষ্ণে মাধুর্য্যভাবের পূর্ণাদর্শ ;—স্বকীয়া হইতে পরকীয়া রস

গাঢ়; পরকীয়া কামগন্ধ-বর্জ্জিত হইলে মধুর রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝিবার উপায় হয়। পবিত্র ভাব না হইলে এ তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি।"

এই উত্তর দ্বারা আমার প্রশ্নের প্রকৃত আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে ইহার কাম-গন্ধ-শূন্য ভাবটি উচ্চ বটে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা বড়ই জটিলতা-পূর্ণ, সাধারণে তাহা কিরূপে বুঝিবে? আর যাহা বুঝিয়াছে তাহাও সাধারণের ভাবেই প্রকাশ দেখা যাইতেছে।

২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা ৪ টার পর বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশ)

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি

—০:৬:০—

পশ্চিমের পুণ্যস্নিগ্ধ মুক্ত স্বচ্ছধারা
মিলিল পূরবে আজি; বল,—বল কা'রা
বাজাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা এ পুণ্য সঙ্গমে,
মহামন্ত্র উচ্চারিয়া মহৎ করমে
করি দিবে অগ্রসর? নহে অশ্রু নহে।
মহাসিন্ধু-অম্বুরাশি যেই পথে বহে
সে' পথে মিলালো এই স্নিগ্ধ স্রোত আসি',
কি পুণ্য প্রয়াণ তব, কি মধুর হাসি,
কি শুভ জনম তব, কি অমৃত বাণী
কি কঠিন ত্যাগ তব, করুণ-পরাণী;
কি দুঃখ-ক্রন্দন তব পর দেশ লাগি'.
হে ভগিনী ভারতের! নিত্য রহি' জাগি'
কি পন্থা দেখা'য়ে দিলে ভারত-ভ্রাতারে
কি শান্তি বরষি' গেলে ভারত-মাতারে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

একখানি পত্র.

প্রিয় যোগীন্দ্রনাথ —

সাংসারিক বর্ত্তমান অবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে তুমি "কুশদহ" কাগজ যেরূপ কষ্ট করিয়া বাহির করিতেছ তাহা দেখিয়া আমি কষ্টানুভব করি।

স্থানীয় লোকে দেশের উপকারের জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর নয়। এখনও কাগজের উপকারিতা সাধারণ লোকে তেমন বুঝে নাই।

আমি ২৪।২৫ বৎসর হইবে, "কুশদহ" কাগজ প্রথম বাহির করিয়াছিলাম। তখন স্থানীয় অনেক লোক কাগজের মূল্য দিত না। যদিও মূল্য আদায়ের অভাবেও কয়েক বৎসর কাগজ চলিয়াছিল, লোকের অনুরাগের অভাবেই কাগজ বন্ধ করিতে হইল।

এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তুমিও সময়ের উপযোগী করিয়া কাগজ বাহির করিয়াছ, তথাপি লোকের তেমন অনুরাগ দেখা যায় না।

তুমি বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে একখানি যোগ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় সামান্যভাবে অবস্থিতি করত স্থানীয় লোকের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য পরিশ্রম করিতে, তখন তোমার মনের অবস্থা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতাম।

তুমি গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত এক ধনাঢ্য ব্যবসাদার পরিবারের সন্তান। পূর্ব্ব অবস্থার সুখ-সম্ভোগ বোধ হয়, তোমার ভাগ্যে বেশি দিন ঘটে নাই। তুমি তজ্জন্য যৌবন কাল হইতে কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছ।

এখন তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে কাগজ চালাইবার জন্য পরিশ্রম ও ব্যয় নির্ব্বাহের চিন্তা দেখিয়া আমাদের কষ্ট বোধ হয়। আমরা ভাল অবস্থায় যাহা করিতে পারি নাই, তুমি সকল প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া তাহা করিতেছ। এমন দুষ্কর কার্য্যে আশ্চর্য্য তোমার অধ্যবসায়। শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত।

১২/২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা। ৮।৭।১১

(ভূতপূর্ব্ব "কুশদহ" সম্পাদক
ও খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক)

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্যামবাজার মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খাঁটুরা নিবাসী পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ঃ—

সরল-পাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ। নীতি পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) নীতি পাঠ, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ (মধ্য বঙ্গ পাঠ্য) ব্যাকরণ প্রবেশিকা (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সার (উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য) বাঙ্গালা-ব্যাকরণ (ম্যাট্রিকুলেসান পাঠ্য)।

সমস্ত পুস্তকগুলিরই কাগজ, ও ছাপা সুন্দর।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

গত আশ্বিন মাসে পুঁড়া নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে কেবল পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়, তিনি এক জন নিষ্ঠাবান সাধকও ছিলেন। তাঁহার উপদেশপূর্ণ জীবনী বারান্তরে যাহাতে "কুশদহ"তে প্রকাশিত হয় আমরা তাহার চেষ্টা করিব।

দেশের দিন দিন হীনাবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে নিরাশার কথাই অধিক শোনা যায়। আমাদের মনে হয়, রোগীর জীবনের আশা যখন সংশয়াপন্ন হয় তখনো আত্মীয় স্বজন তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; তদ্রূপ দেশের দুর্দ্দিনেও কি আমাদের কোনো কর্ত্তব্য নাই ? তারপর আমরা, প্রত্যেকে কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা করিয়াছি বা করিতেছি ? তাহা যদি না পারি তবে ফলের আশা কিরূপে করিতে পারি ?

কুশদহ-সমাজে তাম্বুলী-শ্রেণী ঘৃত চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসাদ্বারা এক সময়ে একটি শ্রীমান্ ক্রিয়া-কর্ম্মশীল সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আজ

সেই চিনি ও ঘৃতের ব্যবসায়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শ্রেণীর ক্রমশ হীনাবস্থাই দেখা যাইতেছে, কিন্তু এখনো কি কোনো প্রতিকারের উপায় নাই? এখনো কি তাঁহাদের মধ্যে দশ পাঁচ জন, এমন অবস্থাপন্ন নাই যাঁহারা বর্ত্তমান সময়োপযোগী নূতন প্রণালীতে কল-কারখানার সাহায্যে ঐ গুড় চিনি উৎপন্ন করিয়া আবার সেই ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন? উপায় নিশ্চয়ই আছে, নাই কেবল শিক্ষা। শিক্ষার অভাবেই এত সংকীর্ণ ভাব, তাই এত অবনতি।

কলিকাতার বড়বাজারে চিনি-ব্যবসায়িগণের দ্বারা প্রতি বৎসর কালী পূজার সময় 'বারোয়ারি' হয়। তাহাতে প্রায় দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। তাহার অধিকাংশই নাচ গান যাত্রা ইত্যাদিতে খরচ হয়। কিছুদিন হইতে অধ্যক্ষগণ নিয়ম করিয়াছেন যে, বারোয়ারির তহবিল হইতে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত রাখিয়া গরীব দুঃখী ভদ্র-শ্রেণীর সাহায্য করা হইবে, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে ইহা অবগত আছি। তাঁহারা কয়েক বৎসর হইতে এরূপ কাজে অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন; ইহা অতিশয় প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আজ আমরা তাঁহাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল উন্নতির মূল শিক্ষা; লেখা পড়া শিক্ষার দ্বার দিয়াই সকল প্রকার শিক্ষার ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই জন্য যাহাতে লেখা পড়া শিক্ষার উন্নতি হয় সমাজে তাহার ব্যবস্থাটি ভাল করা অথবা ভাল রাখা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। বিশেষত বর্ত্তমান সময়ে লেখাপড়া জানা ভিন্ন কোনো রকমেই উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। আর যদি কেবল পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট মনে করিয়া স্ত্রী জাতির শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা না হয়, তবে তাহাতেও ঠিক সমাজ উন্নত হইতে পারেনা। সমাজকে উন্নত করিতে হইলে 'স্ত্রী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।'

কিছুদিন পূর্ব্বে খাঁটুরা গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় হইয়াছে, এই ইস্কুলটি যখন হয়, তাম্বুলী-সমাজ হইতে ইহার সাহায্য করা হইবে এমন কথা তখন শোনা গিয়াছিল; সে যাহা হউক এপর্য্যন্ত ইস্কুলটির অবস্থা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না, তাহার প্রধান কারণ অর্থাভাব। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, 'বারোয়ারির' টাকা প্রধানত তাম্বুলী-শ্রেণীর টাকা,—সেই শ্রেণীই অন্যান্য সাহায্যে মাসিক যথেষ্ট দান করিতেছেন কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়টির উন্নতি করা যে তাঁহা-

দেরই ঘরের কাজ,—প্রধান কাজ, এ কথা কেন ভাবিতেছেন না? এই কাজে সর্ব্বাগ্রে ব্যয় করা উচিত—এমন কি একটি ইস্কুল ভালরূপে চালাইতে যে অর্থের আবশ্যক তাহা তাঁহাদেরই বহন করা কর্ত্তব্য।

"তাম্বুলী-সম্মিলন-সমাজের" কেন্দ্র-সভার অভ্যুদয় "কুশদহ-তাম্বুলী-সমাজ" হইতে। এই কেন্দ্র-সভা অন্যান্য স্থানে সভা করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, 'তাম্বুলী-সমাজ' মাসিক পত্রিকা খানিও এক রকম কেন্দ্র-সভা হইতেই পরিচালিত, ইহা বড়ই ভাল কথা,—বড়ই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের নিজের সমাজ যে দিন দিন কোথায় কি অবস্থায় চলিয়া যাইতেছে তাহার কি করিতেছ? শিক্ষা বিস্তার এবং কুপ্রথা দূর করাই সামাজিক উন্নতির মূল, তাহার কি করিতেছ? আগে নিজ সমাজের এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বালক বালিকাগণের শিক্ষা বিস্তারের উপায় করিয়া তারপর ব্রাহ্মণ-বালকের পৈতা দেওয়া এবং "কন্যাদায়" হইতে উদ্ধার করার জন্য অর্থদান করিলে ভাল হয় না? কেন্দ্র-সভা অনুগ্রহ করিয়া এ কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'কুশদহ'র চাঁদা অগ্রিম দেয়, কিন্তু সাত মাস কাগজ পাইয়াও যাঁহারা চাঁদা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না, দয়া করিয়া সত্বর এই সামান্য চাঁদাটি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার না পাইলে পৌষের কাগজ ১লা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব।

এখন যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে নমুনা-স্বরূপ এক সংখ্যা বা দুই সংখ্যা "কুশদহ" পাঠানো হইতেছে, তাঁহারা ঐ নমুনা-প্রাপ্তির পর যদি কাগজ লইতে অনিচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাদিগকে একটু জানাইলে ভালো হয়, নচেৎ আমরা বড়ই সন্দেহের মধ্যে থাকি। যদি কোনো মতামতই না পাই তবে এখন হইতে বুঝিব যে, তাঁহাদের গ্রাহক হইতে অমত নাই, সুতরাং বৈশাখ হইতে গত সংখ্যা গুলি তাঁহাদের নামে ভিঃ পিতে পাঠাইব। কুশদহ -কার্য্যাধ্যক্ষ)

Printed by J. N. Kundu at the Banga Bhoomi Machine Press 35/3, Baniatola Lane and Published by J N Kundu from 28/1 Sukea Street, Calcutta

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

তৃতীয় বর্ষ। পৌষ, ১৩১৮ ৯ম সংখ্যা

গান

বাউলে স্থর—খ্যামটা।

সহজ মানুষ সরল ভাবে সোজা পথে চলে।
সে সহজে বুঝে তত্ত্ব, সহজ কথায় বলে।
সহজে ধ্যান ধরে, হরিগুণ গান করে,
সহজে দেখে তাঁরে হৃদয়-কমলে;
সে সহজ ভক্তি রসে মজে' ভাসে নয়ন-জলে।
সহজে মন প্রাণ, জাতি কুল, ধন মান,
করে সব বলিদান হরি পদতলে;
সে সহজে প্রণয়ী হ'য়ে, সহজ প্রেমে গলে।
সহজে পায় ধরে, শত্রুকে ক্ষমা করে,
সহজে ভালবাসে মানব সকলে;
সে সহজে অদ্ভুত কীর্ত্তি করে দৈব-বলে।
প্রেমদাস পাটোয়ারি, সহজ প্রেমের ভিখারী,
সহজে চায় মিশিতে হরিভক্তদলে;
সে সহজে সর্ব্বদা যেন, হরি হরি বলে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

অন্তর্জগতে আনন্দময় ভগবান

বাইবেল শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের বিবিধ গ্রন্থে সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুর দশ অবতার, সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলত সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-গ্রন্থেই কোনো না কোনোরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বে সাধারণত স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু উন্নত জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া অনেক দার্শনিক পণ্ডিত স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, কেবল জ্ঞান-বিচারে অথবা কেবল সরল বিশ্বাসে এ তত্ত্বের যে ঠিক মীমাংসা হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। কেননা, এখানে জ্ঞানিগণ হয় নাস্তিকতাবাদ কিম্বা সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছেন, আর বিশ্বাসিগণ ভাবের দিক দিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

অধ্যাত্ম জগতে কোনো কোনো স্বাধীন চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান সাধক, সাধন করিতে করিতে যোগ-তত্ত্বের ভিতর দিয়া এমন আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন উপনিষদের কোনো কোনো ঋষি, প্রথমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি স্বীকার করিয়াও অন্তর্জগতের এমন এক স্থানে বা অবস্থায় গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, যেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, এ জগৎ সৃষ্ট বস্তু নয়, এখানে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, এ সকলই সেই আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ! "কি ভয়ানক কথা! এই জরা, মৃত্যু, দুঃখ, তাপ পূর্ণ জগৎ, ইহা আবার আনন্দময়ের প্রকাশ?" হাঁ, নিশ্চয়ই, তাই তাঁহারা বলিলেন,—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশই আনন্দ—অমৃতরূপ।

যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি একটা কথা আছে, তেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ আর একটা কথা আছে, কিন্তু অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বলিয়া দুইটা জগৎ নাই, একই জগতের দুই প্রকার ভাব মাত্র। জগতের বাহ্যভাবে নানা বস্তু ও বিষয় যাহার নানা প্রকার গুণ এবং ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, আর সমস্ত বহুত্বের মধ্যে একটি আন্তরিক ভাব, একত্ব ভাব; যেখানে সকলের মূলে এক শক্তির কার্য্য, তাহারই নাম অন্তর্জগৎ বা জ্ঞানময় জগৎ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান দৃষ্টি থাকে,—সাংসারিক বাসনার ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'আমি' 'তুমি', এইরূপ সকলই পৃথক্ পৃথক্ বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান এবং সাধনপুষ্ট ভাব গাঢ় হইলে তখন অন্তর্জগতের অভেদ ভাব দৃষ্ট হয়, তখন দেখা যায় দুইটা জগৎ বা বহির্জগৎ কিছুই নাই সকলই অন্তর্জগৎ বা জ্ঞানময় জগৎ। এই জগৎ সৃষ্ট পদার্থ নয়—এ সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ, সুতরাং জগৎ অনাদি এবং অনন্ত।

তবে কি জগৎ ব্রহ্ম? না তাহাও নয়, অনাদি অনন্ত দুই হয় না, ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" জগৎ ব্রহ্ম-পদার্থ, ব্রহ্মীভূত, ব্রহ্ম এবং জগৎ স্বতন্ত্র নয়। "ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চিনাসীৎ!" পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না, তখন আর স্বতন্ত্র বস্তু কিরূপে কোথা হইতে আসিবে জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সুতরাং প্রকাশে অপূর্ণতা আছে, খণ্ডভাব আছে; পূর্ণ এবং অপূর্ণে একটি ভেদও আছে। অপূর্ণতা জন্যই আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে, সাধারণত তাহাকেই মৃত্যু বলা হয়। যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে, যাহা জন্মায়, তাহাই মরে। কিন্তু যাহার জন্ম নাই তাহার মৃত্যুও নাই। মূল পরমাণুর ক্ষয় নাই সকলই রূপান্তরিত হইতেছে মাত্র, সে কেবল উন্নততর বিকাশের জন্য।

যখন সাধকের এই তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—জ্ঞান স্থির হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' বলে, তখন আর কোনো দুঃখ তাপ থাকে না। 'সম্যক্ জ্ঞানে'ই দুঃখ বা মোহ অপসারিত হয়।

এইরূপে জগদ্দর্শন কি আনন্দ-দায়ক! যাঁহার এই অবস্থা লাভ হয় তিনিই বুঝিতে পারেন। জগতের সকলই যদি ভগবদ্বস্তু হইল,—সকলই যদি ভগবৎ লীলা হইল তবে আর ভয় ভাবনা কেন? দুঃখ তাপ কেন? এই অবস্থায় চিত্তে স্বতন্ত্র বাসনা থাকে না। আপনাকে স্বতন্ত্র একজন এবং আমার স্বতন্ত্র আর একটা সংসার, এই ধারণা ও সেই সংসারের ভোগ-বাসনা থাকিতে কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। কেননা সেটা ভ্রান্তির অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভ্রান্ত বস্তু লইয়া তৃপ্তি বা শান্তি কিরূপে হইবে? মানবাত্মা একটা মিথ্যা বস্তু নয় যে, সে মিথ্যা লইয়া তৃপ্ত হইবে। মানবাত্মা সত্য বস্তু, সে যতক্ষণ সত্য বস্তু না পায় ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। সমস্তই ভগবদ্বস্তু, এই জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হইলে, সংসার-জ্ঞান এবং মায়া মোহ চলিয়া যায়,

তখন সাধন-পথে সংসার বিঘ্ন না হইয়া বরং অনুকূল হয়। "সংসারে ভগবদ্দর্শন মেলে না," এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারাই সংসার ত্যাগ করেন কিন্তু দর্শনের পূর্ব্বাবস্থায় যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া সাধন করেন তাঁহাদের সংসার ত্যাগ করিতে হয় না,—তবে সাধনাবস্থায় পরীক্ষা সহ্য করিতে হয় কিন্তু যথা সময়ে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," এই সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জগৎ আনন্দময়ের প্রকাশ, সকলই মঙ্গলময়,—সকলই আনন্দময়, ইহা একটি মহা সত্য বলিয়াই, যাঁহারা এই বিশ্বাস এবং জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া সাধন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সকল পরীক্ষা কাটাইয়া পরম বস্তুর দর্শন লাভ করেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া এই বক্তব্য শেষ করিব। আমরা যাহা চিন্তা করি, যাহা অনুভব করি এবং ক্রিয়া দ্বারা যাহা প্রকাশ করি তাহা কোথা হইতে আসিতেছে এবং পরক্ষণেই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে? কল্যকার চিন্তা,—দশ দিন পূর্ব্বের চিন্তা এমন কি, পর মুহূর্ত্তের চিন্তা আর আমার আয়ত্ত থাকে না, কোথায় চলিয়া যায়, আসিল কোথা হইতে আবার কোথায় চলিয়া গেল, সুতরাং বুঝিতে হইবে সকলই অনন্ত-জ্ঞান হইতে আসিতেছে। এবং অনন্ত-জ্ঞানেই চলিয়া যাইতেছে, আমার পশ্চাতে অনন্ত, সম্মুখে অনন্ত; আমি ক্ষুদ্র জ্ঞান টুকু—ক্ষুদ্র বোধ-শক্তি টুকু লইয়া চলিয়াছি। এ জগৎ বা এই সৌর জগতাতীত আর কোনো বিষয় যদি কিছু আমি বুঝিতে পারিয়া থাকি, তাহা আমার জ্ঞানের ভিতর দিয়াই প্রকাশ হইয়াছে। যে জগৎ আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে তাহা আমার জ্ঞানের ভিতরে। জগৎ যদি আমার জ্ঞানের ভিতরে হইল এবং আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান যদি অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্গত হইল তবে জগৎ, আমি এবং অনন্তজ্ঞান বস্তুত এক অখণ্ড—কেবল ক্ষুদ্র ভাবে, আংশিকভাবে জগৎ ও আমার প্রকাশ মাত্র।

এইরূপে আত্ম-স্বরূপেই জ্ঞানের প্রকাশ, জগৎ, জ্ঞানময়ের প্রকাশ; বহির্জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, সকলই অন্তর্জগৎ; অন্তর্জগতে জ্ঞানময়-আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া যথার্থ শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা জগতের যেটুকু সেবা করা যায়, তাহা আত্মসেবা মাত্র; কিন্তু তাহা পরোপকার করা নহে। পরোপকার করা—এ কথা ধর্ম্মের নিম্ন সোপানের।

জগৎ সৃষ্ট বস্তু নয় কিন্তু আনন্দময় ভগবানের প্রকাশ, ইহা গভীর বিশ্বাস, একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন সাধকের নিকটই প্রকাশ পায়। দাস—

দুর্যোধন চরিত

(কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত অবলম্বনে লিখিত)

আমরা শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি ও মহাভারতের প্রতি পৃষ্ঠায় পড়িতেছি—হীনমতি ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধনের উপর এই বিশেষণ গুলি প্রজোয্য কিনা তাহাই বিবেচ্য। সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে রাখা উচিত, মহাভারত আখ্যায়িকা রচনা হইয়াছিল—রাজা জন্মেজয়ের আদেশে ও অনুকম্পায়। রাজা জন্মেজয় পাণ্ডুবংশ সম্ভূত ও তখন তিনি ভারতের সম্রাট। কাজেই ভারতের ভাগ্য বিবর্ত্তনকারী কুরুক্ষেত্র সমরের প্রধান প্রতিপক্ষ নায়ক দুর্য্যোধন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা অতি সন্দেহ-চক্ষে দেখিতে হইবে। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর আমরা পড়িয়া ছিলাম সিরাজ কদাচারী, নিশৃংস ও অন্ধকুপ হত্যার নায়ক ; কিন্তু সমদর্শী ঐতিহাসিকের নিকট আমরা সিরাজ চরিত্রের অন্যবিধ আভাষ পাইতেছি। কিন্তু দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কুরুক্ষেত্র অভিনয়ের যদি যথাযথ সত্য আবিষ্কার করা যায় তবে দুর্য্যোধনকে আমরা ভিন্ন চরিত্রে দেখিতে পাইব! এখন দেখা যাউক কুরুক্ষেত্রের কারণ কি? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরের রাজ্য দখল করিয়াছেন, তিনি বিনাযুদ্ধে খুল্লতাত পাণ্ডুরাজ-পুত্রদিগকে স্থচ্যগ্র ভূমি দিবেন না। এই অজেয় প্রতিজ্ঞাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ। এখন দেখা আবশ্যক, হস্তিনাপুর রাজ্য কাহার। শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মরিয়া যান।

“মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে
শোকেতে আকুল হইল যত বধুগণ”

রাজার মৃত্যুর পর কুরুকুল অস্ত যায় দেখিয়া রাণী সত্যবতী নিয়োগ প্রথানুযায়ী সন্তান কামনায় ভীষ্মকে ধরিলেন। কিন্তু ভীষ্ম সে পাত্র নহেন,—

“যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব বামা সত্য নহে মম আন॥
দিনকর ত্যজে তেজ চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥”

ভীষ্মের অটল প্রতিজ্ঞার নিকট হার মানিয়া রাণী সত্যবতী, পুত্র ব্যাসের স্মরণ লইলেন। ব্যাস মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

"তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য-হিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥"

মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে রাণী অম্বালিকা দুই পুত্র প্রসব করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজ কিন্তু অন্ধ। দ্বিতীয় রাজা পাণ্ডু। ক্ষত্রিয়গণের ও পৃথিবীর সমস্ত রাজগণের এই একই নিয়ম—জ্যেষ্ঠ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য অবিভক্ত ভাবে প্রাপ্ত হন। কাজেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই হস্তিনা সাম্রাজ্যে একছত্র রাজা, কিন্তু তিনি অন্ধ বিধায় পাণ্ডুই রাজ কার্য্য চালাইতেন। মহাভারতকারও এ কথাটা বিশেষ জানিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে উল্লেখ করিতে তিনি মহারাজা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডু শুধু রাজা। পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া

"যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল।
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যত্ন করিয়া করিল বহুদান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।"

হস্তিনা রাজ্যের সেনাপতি রূপে রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া লুণ্ঠিত ধনরত্ন মহারাজে অর্পণ করিলেন এটা স্বাভাবিক। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্রাটই করিতে পারেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র করিয়াছিলেন; রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের আশা কখনও রাখেন নাই। রাজ্য চলিত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়, রাজা পাণ্ডু সেই আজ্ঞানুযায়ী রাজ্য চালাইতেন। কাজেই দেখা যাইতেছে হস্তিনারাজ্য পাণ্ডুর নয়— ইহা অন্ধ নরপতির।

"যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায়॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে ছিল অনুক্ষণ।"

এখন পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডু-পুত্রগণের এই রাজ্যে কোনো দাবী নাই। কাজেই দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি পাণ্ডু-পুত্রগণকে দিবেন না। স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিলে অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু রাজনীতি বহির্ভূত নহে। কুরু-

ক্ষেত্র সমর বা ক্ষত্র সাম্রাজ্য বিনাশ হেতু দুর্য্যোধনকে দোষ দেওয়া যায় না উহা পাণ্ডু-পুত্রগণের অন্যায় আবদারেরই ফল। তারপর যদি কেহ বিবেচনা করেন হস্তিনাপুর সাম্রাজ্য পাণ্ডু পাইয়াছিলেন উপযুক্ত বলিয়া। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই হিসাবে কে পাইতে পারেন। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক হইলেও বীর নহেন। তখন রাজাদিগের সৈন্য চালাইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে নামিতে হইত। যুধিষ্ঠিরের সে ক্ষমতা ছিল না। ভীম বীর হইলেও ক্রোধান্ধ, রাজোচিত গুণ তাঁহার ছিল না। অর্জ্জুন মহারথী বটে, কিন্তু রাজনীতি-জ্ঞান হীন। নকুল সহদেবের চরিত্র মহাভারতে পরিস্ফুট হয় নাই। আর দুর্য্যোধন—

"সসাগরা ধরা সাশিলাম বিদ্যমান
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।
মম বাহু খ্যাতি সর্ব্বলোকে করে পূজা"

যখন সমস্ত কুরুসৈন্য লয় হইয়াছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণ রণ প্রাঙ্গনে শায়িত হইয়াছেন একাকী দুর্য্যোধন বিষাদে ও নিরাশায় ম্রিয়মাণ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্য পরিবৃত ভীমের সহিত কিরূপ গদাযুদ্ধ করিয়া ছিলেন শুনুন।

"দুর্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি।
হরিষে বর্ষণ করিলেন পুষ্প বৃষ্টি ॥"

তারপর দুর্য্যোধন গদাঘাতে মৃতপ্রায়। রাজা যুধিষ্ঠির কাঁদিতেছেন,

"রাজার লক্ষণ ভাই, আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে ॥
সমর-সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয় ॥
তব যশ ঘুষিবেক এ ত্রিন ভুবনে ॥"

মহাভারতকার দুর্য্যোধনের মহৎ অন্তঃকরণ, উদার হৃদয়ের পরিচয় অনেক স্থলে অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কুরুক্ষেত্র সমরের শেষ দৃশ্যটি দেখি। অন্যায় গদা প্রহারে রাজা মুমূর্ষপ্রায়—

"দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥"

রিপুনাশ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবের মুণ্ড স্বহস্তে ভাঙিতে চাহিলেন,

"শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেই ক্ষণে"

তখন রাজা দুই করে সেই মুণ্ড চাপিয়া ফেলিলেন।

"তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল॥"

তখন রাজা বুঝিলেন ইহা পাণ্ডবের মুণ্ড নহে পাণ্ডব পুত্রগণের,

"এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি।
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ভাই পঞ্চ জনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলা"

দুর্য্যোধনের বিবাদ পাণ্ডবগণের সহিত, তাঁহাদের শিশু পুত্রগণ কুরু রাজের বৈরী নয়। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাদীপ্ত ইটালি মহাপ্রাণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

রাজার মহৎ হৃদয়ের আর একটি পরিচয় দিব। সপ্তম দিবসের যুদ্ধ অবসানের পর রাজা দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয়ে ভীষ্মের নিকট দুঃখ করিতেছেন,—

"সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥"

তখন ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন, পর-দিবস রণে পাণ্ডব নাশ করিবেন, অব্যর্থ বাণ পৃথক করিয়া রাখিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইহা গোপন রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন—রাজা দুর্য্যোধন সত্যবাদী। দুর্য্যোধন একদিন গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের সাহায্যে মুক্ত হয়েন,—

"তুষ্ট হয়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লও যাহা চায় মন॥

আজ শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রণায় অর্জ্জুন সত্যবদ্ধ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত।

"জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল॥"

এই বদান্য, এই সত্যশীল, এই মহাপ্রাণ রাজা দুর্য্যোধনকে কে বলিতে পারে

দুষ্ট মতি? জগতের ইতিহাসে এমন কয় জন আছেন? আর একটি কথা। কুরুক্ষেত্রের রণ সাঙ্গের পর রাজা দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম পালিনু সকল।"

এই কথাটির আলোচনা করা যাউক। ক্ষত্রিয়গণের যে উদার, যে উন্নত যুদ্ধ-নীতি আছে তাহা অন্য জাতিতে নাই। ক্ষত্রিয় নিরস্ত্র শত্রুকে মারিতে জানে না।

"অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখন।
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
একা সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ-নীতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিব হীনে॥
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে॥"

ভীষ্ম প্রণোদিত এই উচ্চ আদর্শ হইতে রাজা দুর্য্যোধন একটিবার স্খলিত হইয়াছিলেন। সপ্ত রথীতে বেষ্টন করিয়া বালক অভিমন্যু বধের কলঙ্ক তিনি বহন করিতে বাধ্য। আর পাণ্ডবগণ কি করিলেন? ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথ বধে কি ছলনা—কি চাতুরী! ইহা প্রত্যেক মহাভারত পাঠক বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন, বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীবিজয়বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

রাজা শ্রীরামচন্দ্র খাঁ

দক্ষিণ রায় প্রবন্ধে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। এজন্য যথাস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু রাজা মুকুট রায়ের রাজ্য নাশের সহিত দক্ষিণ রায়ের বিবরণ যেরূপ জড়িত রাজা শ্রীরামচন্দ্রেরও সেইরূপ। রাজা শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম চন্দ্র খাঁ উপাধিধারী অনেক ভূম্যধিকারী ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে বেনাপোলের ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত রাজা রামচন্দ্র প্রধান ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে ছত্রভোগে যে রামচন্দ্র খাঁর উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ গৌড় বাদসাহগণের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাদ্রি-গমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের কোন কথা বলিবার নাই। বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্রের কথাও পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এ প্রবন্ধে আমরা যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলিতে চাহি, তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভূত। যশোহরের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বজ্রদ্বীপ (আধুনিক বাজেডীহি) নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হরিদেব স্বাধীন হিন্দু রাজগণের অধীনে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সপ্তগ্রামের নিকট মুড়াগাছা গ্রামে তাঁহাদের বসতি ছিল। হরিদেবের অধস্তন অষ্টম পুরুষ পুরুষোত্তম দেব পাঠান রাজগণের অধীনে সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র মুড়াগাছায় বাস করা নিরাপদ জ্ঞান করেন নাই। ঐ সময়ে হিন্দু কর্ম্মচারীগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার ধুম পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ নগরের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজা শ্রীরামের পিতামহ ব্রাহ্মণনগরাধিপ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া বজ্রদ্বীপ জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন, এবং মুকুট রায়ের রাজ্যের উত্তরাংশ অর্থাৎ ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত রক্ষা ও শাসনের ভার পাইয়াছিলেন। রাজা মুকুট রায়ের সময়ে রাজা শ্রীরাম ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুকুট রায়ের রাজ্য রক্ষার জন্য রাজা শ্রীরাম ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কিরূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

বজ্রদ্বীপে শ্রীরামচন্দ্রের বাটীর আর চিহ্ন মাত্র নাই। তবে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বাজদিয়াতে (বজ্রদ্বীপের অপভ্রংশ) এখনো শ্রীরামচন্দ্রের বাটীর চতুস্পার্শ্বস্থ গড় আছে। গ্রীষ্ম কালেও সেখানে প্রচুর জল থাকে। এবং নানা বর্ণের পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া স্থানটিকে অতি মনোহর ও সুন্দর দেখায়। একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ইহার নিকটে দেখা যায়। বহুদূর হইতে গ্রীষ্ম কালে লোকে সেই জলাশয়ের জল লইয়া যায়। এই স্থান হইতে অল্প পশ্চিমে বারবাজার নামক স্থানে অনেক বৃহৎ

পুষ্করিণী আছে সে গুলিও শ্রীরাম রাজার দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দারুণ অনাবৃষ্টির সময়ও সেগুলিতে প্রচুর জল থাকে। কোন কোনটতে সান বাঁধা ঘাটের চিহ্ন দেখা যায়। প্রত্যেক পুষ্করিণীর উপর এক একটি শিব-মন্দির ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ এক শত আটটি পুষ্করিণী ও সেই সংখ্যক শিব-মন্দির ছিল বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। একটি মাত্র মন্দির আজো দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু তাহার চূড়াটি ১১৯৪ সালে পড়িয়া গিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। এ মন্দিরটিও পতনোন্মুখ। তবে ইহার মধ্যে এখনও কষ্টে যাওয়া যায়। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য কুড়ি হাত, প্রস্থও সেই পরিমাণে। উচ্চতা মাপিবার উপায় নাই। ইহার দেওয়ালের ভিত্তি আড়াই হাতেরও অধিক। মন্দিরটি দেখিয়াই মনে হয় যে, ইহা প্রাচীন হিন্দু-প্রণালীতে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দির নির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তবে এ বিষয়ের আলোচনা-কার্য্যে আমি অভিজ্ঞ নহি সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করিব না। এই মাত্র বলিতে পারি—এ-টি দেখিবার যোগ্য। এবং যশোহরের সর্ব্ব প্রাচীন মন্দির বলিয়া হাল আইন অনুসারে অবশ্য রক্ষণীয়। যাঁহারা একবার দেখিবেন তাঁহারা ইহার খিলানের গঠন দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিবেন। ইহার প্রাচীর-গাত্রে কয়েকটি প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। এরূপ প্রস্তর-স্তম্ভ যে কোথা হইতে এখানে আনীত হইয়াছে তাহাও বিচার্য্য। কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভ গুলি সম্ভবত শ্রীহট্ট বা চট্টগ্রাম হইতে আনীত হইয়াছে। কেননা নৌকা-পথে ভিন্ন ইহা আনিবার সুবিধা হইত না। ইহার অল্প দূরে নদী দেখা যায়। কাজেই নৌকায় লইয়া আসা সম্ভবপর বোধ হয়। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাননীয় ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব কৃত যশোহরের বিবরণের ১৫৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইয়াছে,—রাজা শ্রীরামচন্দ্র, রাজা মানসিংহের সাহায্য করিয়া ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌত্র কমলনারায়ণ সর্ব্বস্ব হারাইয়া বোধখানায় যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নওপাড়ার কালীকান্ত বাবুর সংগৃহীত প্রবাদ হইতে যে তিনি ইহা লিখিয়াছেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু মুসলমান লেখকেরা বলেন যে, গোরাগাজী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ নগর ধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীরাম রাজার রাজ্য ধ্বংস করা হইয়াছিল। তাঁহাদের লিখন ভঙ্গীতে এরূপও বুঝিতে পারা যায় যে, যতদিন তাঁহারা বঙ্গদ্বীপের শ্রীরাম রাজাকে নষ্ট

করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন ব্রাহ্মণ নগর ধ্বংস করা তাঁহাদের পক্ষে সুকর ও সহজসাধ্য হয় নাই। প্রবাদ দ্বারাও এই মত সমর্থিত হয়। আর এক কথা, বারবাজার প্রভৃতি স্থানে যাহারা মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত অর্থাদি পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হুসেন সাহার সময়ের টাকা।

প্রবাদ-মতে রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পৌত্র ও পৌরজন বহু ক্লেশে বোধখানায় যাইয়া আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং কালীকান্ত বাবুর সংগৃহীত বিবরণে আস্থা স্থাপন করা যায় না। মুসলমান লেখকের উক্তির সহিত যখন প্রবাদের অনৈক্য নাই, তখন তাহাই গ্রাহ্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালীগঞ্জের নিকট মুসলমান সেনা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দক্ষিণ রায়, দক্ষিণ দেশস্থ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। সেই সময় পাঠান সেনাপতির গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাকে বাধা দেওয়ার জন্য রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজা শ্রীরাম অগ্রসর হইয়া পাঠান সেনাপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গোরাগাজী জলপথে বহু সৈন্য আনিয়া তাঁহার নগর আক্রমণ করিলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া রাজা রামচন্দ্রের পুত্র বজ্রদ্বীপ হইতে নিজ পরিজন ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বোধখানা নামক স্থানে পাঠাইলেন। পরে গোরাগাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র সংবাদ পাইয়া পুত্রের সাহায্যার্থ আসিলেন। কিন্তু পাঠান সেনাপতিও বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনিও এখন অবসর পাইয়া রামচন্দ্রের পশ্চাদ-নুসরণ করিলেন। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কাতরভাবে দক্ষিণ রায়ের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু দক্ষিণ রায় তখন রাজধানী ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়াছিলেন। কাজেই মুকুট রায়ের জনৈক পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থ আসিলেন। যখন সাহায্য আসিল তাহার পূর্ব্ব দিবস ছয় দিন অনবরত যুদ্ধের পর শ্রীরাম ও তৎপুত্র বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণকারিগণ গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে, দেবমন্দির হইতে বিগ্রহ গুলি স্থানচ্যুত ও ভস্মীভূত করিয়াছে। হতাবশিষ্টগণের প্রতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা মৃত্যু স্বীকারের আদেশ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাজপুত্র ভৈরব নদের তীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গোরাগাজীও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। দক্ষিণ রায়ের অনুপস্থিতি রূপ সুযোগ পাইয়া সমবেত পাঠান সৈন্য ব্রাহ্মণ নগর আক্রমণ করিল। বাহা

ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। রাজা শ্রীরামচন্দ্র খাঁর বংশধরগণ এখনও গঙ্গানন্দপুর ও নওপাড়ায় আছেন। শোভাবাজার রাজবংশের সহিতও তাঁহারা জ্ঞাতি-সূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মায়ার বন্ধন

অন্তরে বাহিরে তীব্র পুতি গন্ধময়
পাপের উত্তাপে দেব, হয়েছি কাতর।
শৈশবে জননী-অঙ্ক করিয়ে আশ্রয়
ভাবিতাম স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহিক অন্তর।
শৈশব চলিয়ে গেল, দেহ দৃঢ়তর
হইতে লাগিল ক্রমে, স্বর্গ-লিপ্সু মন
ধরণীর পাপে তাপে হইয়ে জর্জ্জর
ভাবিতে লাগিল—ধরা সুখ-নিকেতন!
বার্দ্ধক্যে শিথিল দেহে জাগিল চেতনা,
মায়ার বন্ধন কিন্তু দেখি দৃঢ়তর!
হুতাশনে পতঙ্গের যেমন বাসনা,
তেমনি সংসার-লিপ্সা ছাইল অন্তর!
দাও দেব, কাটি' এই মায়ার বন্ধন,
চিরধাম—তব পদে করিগো গমন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

সরমা

—ooo—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে কবিরাজ আসিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, তাহাতে সকলেই বিষণ্ণ। সকলের প্রাণে একটা কালিমার গভীর রেখা পড়িয়া গেল। সকলেই শঙ্কিত। কবিরাজ যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা যথারীতি

চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগ আর ঔষধ মানিল না। দিন দিন শরীর জীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। সাহেব ডাক্তার আনা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পাড়ার সকলেই একে একে দেখিতে আসিল ও বিমর্ষভাবে ফিরিতে লাগিল। নবকৃষ্ণ আচার্য্য আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"আর না—এখনই গঙ্গা-যাত্রা করতে হবে।" রাত্রি দুইটার সময় তীরস্থ করা হইল। ভোর পাঁচটায় তিনি ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। দামোদরের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—একটা ভীষণ ক্রন্দনের রোল আসিয়া সকলকে তোলপাড় করিয়া দিল। হরিপদ শোকে একেবারে মুহ্যমাণ হইয়া পড়িল। শোক চিরস্থায়ী নয়। শোক যদি মানুষের হৃদয়ে সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে সংসার শ্মশান হইত। হাসি কান্না জগতের রীতি। এক আসিতেছে, আর এক যাইতেছে। পাঁচ ছয় দিবস পরেই হরিপদকে কোমর বাঁধিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যথা সময়ে প্রফুল্লের সাহায্যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে একটি দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গেল। মেনকা বারো ছাড়াইয়া তেরো বৎসরে পড়িয়াছে—আর রাখা যায় না। হরিপদ বিব্রত হইয়া পড়িল। সুপাত্র জুটিয়া উঠিতেছে না। অনেক চেষ্টার পর শ্যামবাজারের রসিকলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। পাত্রটি দু'টি পাশ করিয়াছিল, কাজেই রসিকবাবু দুই হাজার টাকা দর হাঁকিলেন। আজিকার দিনে উহা কিছু অসঙ্গত হয় নাই। তবে প্রফুল্লের পিতার অনেক অনুরোধে দেড় হাজারে নামিয়াছিল। রসিকবাবু নাকি বলিয়াছিলেন,—এত হীন অবস্থার লোকের কন্যা ঘরে আনিলে তত্ত্ব-তাবাসে সুখ হইবে না। সে যাহা হউক, এক শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

হরিপদর পিতা যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কতক শ্রাদ্ধাদিতে ও বাকী মেনকার বিবাহে ব্যয়িত হইয়া গেল—তাহাতেও বিবাহের সম্পূর্ণ খরচ সঙ্কুলন হইল না, কিঞ্চিৎ দেনাও করিতে হইল।

এক দিন আপিস হইতে বাহির হইয়াই হরিপদ দেখিল, একখানি "টেওম" লইয়া একটি ঘোড়া তীরবেগে ছুটিতেছে, উহার আরোহী একটি সাহেব ও একটি মেম। উহারা প্রাণ ভয়ে করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর।" উহা যেখানে গিয়া লাগিবে—ঘোড়াটি সেইখানে পড়িবে। গাড়িখানা চুরমার হইয়া যাইবে—আর সাহেব মেমের পরিণাম যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দর্শন মাত্রেই হরিপদ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া

গিয়া লাট সাহেবের বাটীর ফটকের নিকট গাড়ি খানিকে ধরিয়া ফেলিল। সাহেব ও মেম হরিপদকে শত ধন্যবাদ দিয়া তাহার নাম ও আপিসের ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন এগারোটার সময় উক্ত সাহেব ও মেম হরিপদর বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়া হরিপদকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিবার মত প্রকাশ করিলে, বড় সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিপদ আসিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সাহেব ও মেম পুলকবিহ্বলহৃদয়ে বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, এই লোকই কাল আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছিল—বাঙালীর ভিতর এরূপ ভীম বলশালী সাহসী পুরুষ আছে, তাহা আমরা জান্‌তুম না। এই যুবক, বাঙালী জাতির গৌরব; তাতে সন্দেহ নাই।". বড় সাহেব হরিপদকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন,—"ইঁহারা তোমাকে পারিতোষিকস্বরূপ কিছু দিচ্চেন, তুমি উহা গ্রহণ কর" বলিয়া এক খানি ৫০০ টাকার চেক টেবিলের উপর রাখিলেন।

হরিপদ নম্রভাবে বলিল,—"আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছি, পা..."

বড় সাহেব কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমি বলচি, তুমি নাও—না নিলে উঁহাদের অপমান করা হবে, বুঝেছো।"

অগত্যা হরিপদ চেকখানি গ্রহণ করিয়া সাহেব ও মেমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপিসে আসিয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আপিসের বড় সাহেব হঠাৎ একদিন হরিপদকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, হরিপদ, আমি তোমার কার্যতৎপরতা দেখে খুসী হয়েচি। তোমার বল বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পেয়েচি, আমার ইচ্ছা তোমাকে একটি ভাল চাকরীতে বাহাল করি ; এখানে কেরাণীদের মাহিনা বড় কম। যদি তুমি বর্ম্মায় যেতে পার তা' হলে আমি তোমাকে একটি ১৫০ টাকা মাহিনার চাকরী দিতে পারি। তোমার মত কি ?"

দেড় শত টাকা মাহিনার চাকরী শুনিয়া হরিপদর প্রাণটা এক নব আনন্দে ভরিয়া উঠিল—দেড়—শত টাকা—ইহা সে কথনো স্বপ্নেও ভাবে নাই,

কল্পনাতেও আনে নাই, সে উদ্বেলিতহৃদয়ে আবেগভরা প্রাণে বলিয়া উঠিল—"আমার বর্ম্মায় যেতে কোনো আপত্তি নাই।"

সাহেব সহাস্যমুখে বলিলেন—"এই তো আমি চাই। তবে আমি তোমাকে বাহাল করলুম বলে' সেখানে টেলিগ্রাফ করি?" হরিপদ অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—করুন।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তুমি জানো তোমায় কোথায় যেতে হবে, কি কাজ করতে হবে?—একটু বিবেচনা করে স্থির হয়ে বল।" হরিপদ নম্রভাবে বলিল—"আমার বিবেচনা করবার কিছুই নেই আপনি যদি আমাকে বাঘের মুখে পাঠান তাতেও আমি রাজি আছি।" সাহেব হরিপদর চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত কাজেই বাহাল করচি—তোমাকে বর্ম্মার Executive Engineer Construction Branchএর Personal Assistant হয়ে থাকতে হবে, পারবে তো?" "আজ্ঞে হাঁ—পারবো বৈকি!"

"বেশ—আমি তাঁর নিকট তোমার পরিচয় পত্রও পাঠিয়ে দেব; আজ থেকে তোমার ছুটী—পরশু তোমাকে রওনা হ'তে হবে। কাল একবার আপিসে এসে তোমার এক মাসের অগ্রিম মাহিনা আর জাহাজ-ভাড়া নিয়ে যেয়ো।"

হরিপদ বড় সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চঞ্চলচরণে সোজাসুজি গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন স্তব্ধ—নীরব। বায়ুটা যেন আগুনের হল্কা মাখিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দুই একটি সাধা গলার বাঁধা সুর কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে—"ওগো বেলোয়ারি চুড়ি লেবে গো—ভালো ভালো খেলেনা চাই গো"—"জুতিয়ে শিলাই বুরুস বাবু"—"রিপু কর্ম্ম।" শেষোক্ত কথাটি ক্রমে এমন করুণ রাগিণীতে বাজিতে লাগিল যেন বোধ হইল, বেচারা প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিতেছে আর করুণস্বরে হাঁকিতেছে—"রি পু কর্ম্ম।"

মেজেতে মাদুর পাতিয়া মেনকা নিদ্রা যাইতেছে, ছেনু কখনো তাহার অঞ্চল লইয়া কখনো তাহার ক্ষুদ্র কর-পল্লব লইয়া কখনো বা তাহার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ লইয়া নানা ভঙ্গে সুদক্ষ বাজীকরের ন্যায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা দেখাইতেছে, কমলা তাহার শয়ন-কক্ষে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িতে পড়িতে

রোহিণীর জন্য শতমুখীর ব্যবস্থা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"আবাগী পোড়ার মুখী, রাক্ষসী তুই ম'লি না কেন? তা' হ'লে তো ভ্রমর গোবিন্দলালকে হারা'ত না।" এমন সময়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হরিপদ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এই অসময়ে হরিপদকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া কমলার প্রাণটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল, কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এমন সময় বাড়ি এলে যে? কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি তো।"

"না—মা কোথায়?"

"বাঁচলুম। মা ও-ঘরে ঘুমুচ্চেন ডাক্‌বো নাকি?"

"না ডাক্‌তে হবে না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না কমলা, এতক্ষণ কি আমি তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম—এখন হঠাৎ তুমি আমার একটি কথাতে প্রাণ পে'য়ে বেঁচে উঠ্‌লে—ধন্যি তোমরা, এক কথায় মরো আর বাঁচো।"

"তোমার এখন ঠাট্টা পড়্‌লো—আমার ভয় হয়েছিল।"

"কিসের ভয় কমলা—কালথেকে যদি তুমি আমাকে আর দেখ্‌তে না পাও?"

কমলা মুখখানা ভার করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল;—"যাও যাও কেবল ঐ কথা, এখন কাপড় ছাড়ো, মুখে হাতে জল দাও"—বলিয়া কমলা হরিপদর ঘর্ম্মাক্ত কোটটি স্বহস্তে খুলিয়া লইল।

হরিপদ হাত মুখ ধুইয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিলে কমলা বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েচে বোল্‌বে না?"

"এমন কিছু নয়—তবে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি।"

"তোমার ও সব ঠাট্টা তামাসা আমার এখন ভালো লাগ্‌চেনা—কি হয়েচে স্পষ্ট করে বলো।"

"ঠাট্টা নয় কমলা—সত্যি সত্যি।"

"ঐ এক কথা—না বলো নাই বল্‌বে—আমি চলে যাই।"

হরিপদ মৃদু হাসিয়া করুণস্বরে বলিল—"যাও যাও, শুনিলে না—ব্যথিত বেদন—যাবে যাও, নাহি কিছু মোর।"

কমলা অধর-প্রান্তে একটু হাসি ফুটাইয়া কহিল,—"এই যে আবার কবি হ'লেন! আজ যে ভারি স্ফূর্ত্তি দেখ্‌চি হয়েচে কি বলোনা।"

"অম্‌নি কি বল্‌তে পারি?" বলিয়া হরিপদ সোহাগভরে কমলার হাস্যোজ্জল

মুখের উপর একটি মধুর চুম্বন রাখিয়া দিল। কমলা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ একে একে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। কমলার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাহার কষিত কাঞ্চনের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখ খানা হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল! তাহার ভাসা ভাসা চোক দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল,—"না, যাওয়া তো হবে না—তিরিশ টাকায় আমাদের সংসার বেশ চল্‌বে।"

হরিপদ সে কথা কানে না তুলিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার মাতা দালানে মেনকার নিকট বসিয়া আছেন।

হরিপদর মাতা পুত্রকে অসময়ে বাটীতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েচে বাবা আজ আপিস থেকে——"

মাতার কথায় বাধা দিয়া হরিপদ বলিল,—"কিছু হয় নি মা, আমাকে মগের মুল্লুকে যেতে হবে। বড় সাহেব দয়া করে আমায় দেড় শো টাকা মাহিনার একটি চাকরি দিয়েচেন। আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নে'বার জন্যে সাহেব আমাকে ছুটী দিয়েচেন। কাল একবার আপিসে গিয়ে খরচ পত্র নিয়ে আস্‌বো পরশু ১০টার সময় রওনা হ'তে হবে।"

"থাম্ বাছা থাম্—মগের মুল্লুক—সে কি হেথায়?—সেখানে তোমার চাকরি কর্‌তে যেতে হবে না।"

"সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে মা—এখন আর যাবো না বল্লে চল্‌বে না। আর এক শো পঞ্চাশ টাকা মাহিনা আমার মতন লোকের সম্ভব নয়। এ অদৃষ্টটা একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তে ক্ষতি কি আছে মা?"

"আমাদের কার কাছে রেখে যাবি বাবা! বুড়ো বয়সে আর দাগা দিস্‌নে। অন্ধের যষ্ঠি তোকে নিয়েই সংসার।"

"তুমি কিছু ভেবনা মা, আমি শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বো। আর প্রফুল্ল রইল--সেও যে, আমিও সে—দায়ে অদায়ে সে দেখ্‌বে—যখন তখন তোমাদের খবর নেবে।"

"যা ভালো বোঝো তাই কর বাপু—আমি যেন তোমাদের রেখে মরতে পারি।"

হরিপদ আর সে কথার উত্তর না দিয়া একেবারে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। ভিতরে থাকিলে অনেক ব্যাঘাত। বেলা পাঁচটার সময় হরিপদ পাড়ার বন্ধু বান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া আসিল।

পরদিন যথাসময়ে হরিপদ বড় সাহেবের সহিত দেখা করিল, বড় সাহেব খাজাঞ্চিকে টাকা দিবার হুকুম দিলেন। হরিপদ প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া পাইয়া বড় সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একেবারে চাঁদনীতে আসিয়া দুই স্যুট কোট প্যান্ট টুপি মোজা—খান কয়েক ধুতি এক স্যুট বিছানা একটা বড় ট্রাঙ্ক এবং আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া বেলা তিনটার সময় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদ একটু বিশ্রাম করিয়া প্রফুল্লের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। প্রফুল্ল শুনিয়া বলিল,—"তা ভাই বিদেশে না গেলে উন্নতি হয় না। আর বর্ম্মায় তো আজকাল অনেকেই যাচ্চে।"

হরিপদ প্রফুল্লের পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। পথে আসিতে আসিতে হরিপদ বলিল—"দেখ ভাই, আমি মা, মেনকা আর কমলাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্চি তুমি এদের দেখো, তুমি ছাড়া আর আমার আপনার কেউ নেই!" কথা কয়টি বলিবার সময় হরিপদর নয়ন-প্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল হরিপদকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভাই আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমি আমার কর্ত্তব্য বুঝি। তুমি বৃথা চঞ্চল হয়ো না।"

এইরূপ কথায় কথায় প্রফুল্ল হরিপদর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে দেখিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—"মা করেন কি? কাঁদবেন না, হরিপদর অমঙ্গল হবে যে। আজকাল তো সকলেই বিদেশে চাকরি করতে যায়; আবার দু দিন পরে ফিরে আসবে। আর আমি তো রইলুম, আপনাদের কোনই অভাব হবে না। সর্ব্বদাই দেখে শুনে যাব।"

হরিপদর মা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"বোসো বাবা বোসো, আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে—আমি ভালো মন্দ কিছুই বুঝতে পারি নে। তা বাবা তুমি রইলে আমাদের একবার একবার দেখে যেয়ো। আমার হরিপদও যা তুমিও তাই।"

মেনকা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আসিয়া হরিপদর হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"দাদা তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে?"

হরিপদ সস্নেহে বলিল—"ছি মেনু কেঁদনা, আমি চাকরি করতে যাব; শিগ্‌গির ফিরে আস্‌বো।"

মেনকা নতমুখে দাঁড়াইয়া আপনার বস্ত্রাঞ্চলটা অঙ্গুলীতে জড়াইতে লাগিল। কমলা এখনো দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তরল মুক্তার ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়ন-প্রান্তে আসিয়া দুলিতেছে—পড় পড় হইয়াও পড়িতেছে না।

কমলার প্রাণের ভিতর একটি সংগ্রাম চলিতেছে, প্রথমে সে স্থির করিয়াছিল যে, কোনো রকমেই হরিপদকে যাইতে দিবে না। কিন্তু এখন সে ভাবিতে লাগিল—সে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কে? হরিপদ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—সে কেন তাহার পথের কণ্টক হইবে? যাহাতে হরিপদ এখন স্বচ্ছন্দমনে যাইতে পারে, তাহাই তাহার করা উচিত। কমলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ট্রাক্‌টি টানিয়া লইল এবং একটি একটি করিয়া তাহাতে হরিপদর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় আসিবে বলিয়া হরিপদর মাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল।

নতমুখী মেনকার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া হরিপদ বলিল—"মেনু, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি নেবে এসো।" মেনকা হরিপদর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি দাদা।" হরিপদ একটা কাগজের বাক্সের মধ্য হইতে একখানি পার্শিসাড়ী বাহির করিয়া মেনকার হস্তে দিল। মেনকা সাড়ীখানি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল,—"না দাদা এ আমি নেবোনা—এ বুঝি তুমি বৌদির জন্যে এনেচো।"

"না, ওখানি তোমার জন্যেই এনেচি—তার জন্যে আর এক খানি আছে।"

"কৈ দেখি।"

হরিপদ আর এক খানি দেখাইলে, মেনকা আনন্দে অধীর হইয়া উহা তাহার মাতাকে দেখাইতে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ আসিয়া তাহার মাতাকে বলিল—"মা, তোমাকে গঙ্গা-স্নান পূজা আহ্নিক করতে হয়, তুমি এই গরদের কাপড়খানা রেখো, আর এই সাড়ীখানা কৈলিসীকে দিয়ো।"

"কেন বাবা এখন এ সব কিন্‌তে গেলি কেন? চাকরি করে ফিরে এসে দিলে হত না?"

"মা, ফিরে এসে আবার দেবো—তত দিনে এ কাপড় ছিঁড়ে যাবে।"

কৈলিসী আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু, জায়গা হয়েচে খাবে এসো।"

হরিপদর মা কৈলিসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"এই নে কৈলিসী তোর দাদা-বাবু তোকে এই কাপড় দিয়েচে।"

কৈলিসী ভগবানের নিকট হরিপদর দীর্ঘ জীবন ও সোনার দোয়াত কলম কামনা করিয়া কাপড় খানি খুলিয়া দেখিল ছেঁড়া কাটা আছে কি না!

হরিপদ আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমলা আজ সাধ করিয়া বহুবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছে। "এ-টি খাও ও-টি খাও" বলিয়া একে একে সকল গুলি খাওয়াইতে লাগিল—হরিপদ দ্বিরুক্তি না করিয়া কমলার মনোরথ পূর্ণ করিল।

কমলা আজ একটু সকাল সকাল রান্নাঘর সারিয়া লইল। রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে নিজ গৃহে আসিয়া দেখা দিল। হরিপদ কমলার দিকে চাহিয়া বলিল—"ট্রাঙ্ক্‌টা বন্ধ যে—চাবি কোথায়?"

"চাবি—এই যে আমার কাছে, আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেচি।"

"খোলো তো দেখি—আমার মাথামুণ্ড কি করেছ।"

কমলা চাবি ফেলিয়া দিল। হরিপদ ট্রাঙ্ক্‌টি খুলিয়া দেখিল—যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেইটি পরিপাটীরূপে সাজানো রহিয়াছে।

"বা—বেশ হয়েচে" বলিয়া হরিপদ কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল—"আর কিছু রাখ্‌তে হবে কি?"

"না, আর কিছুই রাখ্‌তে হবে না, তবে সরা-চাপা এ হাঁড়িটাতে কি? এটা তো আমি এনেচি বলে বোধ হয় না।"

"ওতে গোটাকতক সন্দেশ আছে—জাহাজে তো জল খেতে হবে।"

কমলার দূরদর্শিতা দেখিয়া হরিপদ মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল এবং মুখে বলিল—"যদি দিয়েচ তবে থাক্ কাজে লাগ্‌বে বটে।"

হরিপদ ডাকিল—"কমলা!"

কমলার হৃদয়-তন্ত্রিতে সেই স্বরটা যেন বাজিয়া উঠিল। কমলা ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"কি।"

"আচ্ছা কমলা, আমি যাবো শুনে কাল তুমি কত কেঁদেছিলে—আর আজ আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কত উদ্‌যোগ আয়োজন করচো এর কারণ কি? তুমি আমাকে ভালোবাস না বুঝি?"

"তুমি আমাকে বাস ?"

"বাসি—হৃদয়টা যে দেখাবার নয়—নইলে দেখাতুম।"

"তা'হলে এমন অবস্থায় ফেলে চলে যেতে না।"

"কেন, মা রইলেন, মেনকা রইল—প্রফুল্ল যখন তখন এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাবে—সে আমার ছোট ভা'য়ের মত—আর কি চাও ?"

"না আর কিছু চাই নে—তবে পুরুষের প্রাণ বড় কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।"

"তারপর—আর কিছু আছে ?"

"তুমি সাহসী বীর—তুমি আজ আমাদের জন্যে—সংসারের উন্নতির জন্যে কোথাকার কোন অজানা দেশে চলেচ—আর আমি কিনা তোমার পথের কণ্টক হয়ে পথ আগ্‌লে পড়ে থাক্‌বো। ছি—তা তো পারবোনা—তাই আজ প্রাণটাকে পুরুষ অপেক্ষাও কঠিন করেছি—পাষাণে বেঁধেছি।"

"তোমার বক্তৃতা শুনে আমি খুসী হলুম বটে, কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-টা 'টাউন হল' নয় এখানে শ্রোতা কেউ নাই। এ-টা গরীবের কুটীর" বলিয়া হরিপদ কমলাকে আপনার হৃদয়ে টানিয়া লইল।

অসহায় কমলা যেন মস্ত একটা সহায় পাইল। তরুলতা যেন শাল তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। গঙ্গা যেন সাগরে আসিয়া মিলিত হইল। মরুভূমে যেন ফল্‌গু নদী বহিয়া গেল! কমলা কাঁদিয়া ফেলিল কে যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দিল। প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল!

"কমলা, এ কি হ'ল—পাষাণের ভিতর এত জল ছিল" বলিয়া হরিপদ কমলার অশ্রুসিক্ত মুখের উপর সাদর চুম্বন করিয়া তাহার মস্তকটি আপন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। কমলার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না; সে হরিপদর আলিঙ্গনের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

পরদিন সতাটার মধ্যে হরিপদর বাটী তাহার বন্ধু বান্ধবে পূর্ণ হইয়া গেল। হরিপদ সকলকেই সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিল। নয়টার মধ্যে হরিপদ আহারাদি সারিয়া প্রফুল্ল ও অপর কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া জাহাজাভিমুখে যাত্রা করিল। হরিপদর মাতা চক্ষু মুছিতে মুছিতে রোরুদ্যমানা মেনকার হস্ত ধারণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং হরিপদর মঙ্গল কামনা করিয়া পূজা মানসিক করিলেন। কমলা ছাদের উপর থাকিয়া হরিপদর গাড়ির দিকে নির্নিমেষ-

নয়নে চাহিয়া রহিল। গাড়িখানি যখন তাহার দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, এবং নিজ কক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া ভূমি-শয্যায় লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। প্রাণ ভরিয়া খানিকটা কাঁদিয়া লইল —সেই পূত সলিলে হৃদয়ের মলিনতা ধুইয়া গেল—হৃদয়টা একটু হাল্কা হইল। তখন কমলা উঠিয়া বসিল এবং যুক্তকরে ভগবানের নিকট কাতর প্রাণের কি ব্যথা জানাইল কে জানে! সে দিন বাড়িটা যেন নীরব নিস্তব্ধ শোকের ঘন ছায়ার ভিতর আত্মহারা! (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আনন্দ-সংবাদ

"ভারতে ইংরাজ রাজত্ব, বিধাতার বিশেষ বিধান," তাহাতে আমাদের বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ-রাজত্বে ভারতের কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা আজ আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী যে এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ ভারতে আসিয়াছেন; আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনাগুলিকেও জনসাধারণের সংস্কার, (কুসংস্কার) কত দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিল——কি আশ্চর্য্য!! যে অভ্রান্ত নিয়মে জগৎ-কার্য্য চলিতেছে, ভূমিকম্পও কি সেই অভ্রান্ত নিয়মের ফল নহে? রাজা আসিতেছেন বলিয়াই কি ভূমিকম্প হইল? আর তাহাতেই বা কুলক্ষণ কি? হায়! কত শত বিজ্ঞানবিদ্‌ও যে এই পুরুষানুক্রমিক কুসংস্কার-বশবর্ত্তী! যাক্ সে কথা, তাই বলিতেছিলাম কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজা রাণী আসিয়াছেন। এখন আমরা তাঁহার মুখে কোন্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণীটি শুনিবার জন্য আশা করিয়াছিলাম?——সম্রাটের আগমনে ভারতবাসী জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে একটি বিশেষ আনন্দলাভের প্রয়াসী হইয়াছিল। সে আনন্দ-সংবাদ কি? "বঙ্গভঙ্গ রহিত" তাই কি নিশ্চয় আশা ছিল? কত সন্দেহের মধ্যে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এ যে বিধাতার বিশেষ বিধান!! যাহা এতদিনে কিছুতেই হয় নাই, এমন কি মর্লি সাহেব পুনঃ পুনঃ বলিয়া ছিলেন ইহা Settled fact (অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা) কিন্তু আজ ভারত সম্রাট ভারতে আসিয়া নিজ-মুখে বলিলেন—"বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল।"

বঙ্গ আর ছোট লাটের অধীন রহিল না, এখন সমগ্র বঙ্গ একজন সকৌন্সিল গভর্ণরের অধীন হইল। আর এতদিন যে বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলার-পার্শ্বে পড়িয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে একজন পৃথক ছোটলাটের অধীন হইল। রাজধানী দিল্লী হইল। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতেছেন কলিকাতার —সুতরাং বাংলার ক্ষতি হইল; কিন্তু এ কথাটি আপাত দৃষ্টিতে কিছু সত্য হইলেও সেই কত কালের ঐতিহাসিক দিল্লীর (হস্তিনাপুর) পুনরুত্থান ভারতের অকল্যাণকর বলিয়া মনে হয় না।

স্থানীয় সংবাদ

আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকটি শোকের আঘাৎ পাইয়া এখন প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এই ঘটনা তাঁহার পক্ষে যে বড়ই ক্লেশকর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সংসারের কোনো অবস্থাতেই আমরা ভগবানের কৃপার অভাব স্বীকার করিতে পারি না, তাঁহার পাদপদ্মের নিকটস্থ করিবার জন্য তিনি শোক তাপ প্রেরণ করেন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে জনমে মরণের মধ্যেও তাঁহার ইচ্ছার জয় হউক। ভগবান তাঁহার ক্রোড়স্থ কন্যার আত্মাকে শান্তি-ধামে স্থান দান করুন এবং পরিবারবর্গের মধ্যে এ সময় শান্তি বিধান করুন।

১২ই ডিসেম্বর রাজা রাণীর সম্মানার্থে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী হইতে আনন্দোৎসব হইয়াছে। হস্তী-পৃষ্ঠে রাজা রাণীর ছবি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, এবং কাঙালী ভোজন, আলোক-মালা দান প্রভৃতি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের 'কুশদহ'র প্রথম পৃষ্ঠায় 'প্রার্থনা' শীর্ষক যে কবিতাটি বাহির হইয়াছে, ভ্রমক্রমে উহার নীচে 'শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী' এই নামটি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উহা তাঁহার রচিত নহে।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

৩য় বর্ষ। মাঘ, ১৩১৮ ১০ম সংখ্যা

গান

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নয়রে কঠিন, কোন দিন, জননী আমার।
নিরাশ অন্তরে তবে কেন মন তুই কাঁদিস আর।
মা যদি সন্তানে মারে,
কে বল রাখিতে পারে ?
কিন্তু মায়ের প্রহারে বিনাশে দোষ দুরাচার।
বনের পশু দুষ্ট ছেলে,
ভাল কি হয় মা'র না খেলে ?
মেরে ধ'রে লবেন কোলে আদর করে মা আবার।

(ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন।)

দ্বৈতাদ্বৈত ভাব

পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যে বস্তুগত এক—জগৎ ও জীব যে সেই ভগবানেরই প্রকাশ এ কথা একপ্রকার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। যেমন এক "কঁদা" মিছিরি আর এক "দানা" মিছিরি, সমুদ্রের সমগ্র জল আর তাহার এক বিন্দু জল, স্বাদে একই কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন, তেমন পরমাত্মা এবং জীবাত্মা স্বরূপগত এক, কেবল পরিমাণে ভিন্ন। পরমাত্মা অনন্ত, জীবাত্মা ক্ষুদ্র। পরমাত্মার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্যের শেষ নাই, কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্যের সীমা আছে। সুতরাং এইখানে একটি গভীর ভেদও আছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে ভেদ তাহা দুই প্রকার; একপ্রকার অজ্ঞানতা জনিত, আর এক প্রকার ভেদ মৌলিক। অজ্ঞানতার আমি—স্থূল আমি—শারীরিক আমি এবং সমুদয় স্থূল "আমি আমার" ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাধন-পথে আরোহণ করিলে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। আর মৌলিক আমি— আত্ম-বোধ, আপনাকে আপনি প্রতীতি করা, ইহাই জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য (Personality)। তাই শিক্ষা-সংস্কার-বিরহিত সদ্যজাত শিশু, ক্রন্দন করিয়া আত্ম-বোধ জ্ঞাপন করে। কিন্তু জড়, আপনাকে আপনি জানে না। মানবাত্মা চৈতন্য-পদার্থ, সে আপনাকে আপনি আত্ম-জ্ঞানে জানে। এই জ্ঞানই সকল বস্তু-বোধের মূল কারণ, সুতরাং জীবাত্মা এই আত্ম-বোধের দ্বারাই পরমাত্মার জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

এ দেশ-প্রচলিত অদ্বৈতবাদের কথা বলিলে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন। "সোহহং" কিম্বা "শিবোহহং" এই ভ্রান্ত মতের ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু মানুষ কখনই ভগবান্ হয় না,—কোনো মানুষই ভগবান নহে; যতবড় সাধু মহাপুরুষ হউন, কেহই পূর্ণ ভগবান নহেন, একথা সকলে বোঝেন না, কেহ কেহ বোঝেন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদী সাধক, তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলেও বুঝিবেন যে, অত্যন্ত উচ্চাবস্থাতেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দৃষ্ট হয়। আবার অনেকে মনে করেন —"যতদিন 'পূর্ণ সমাধি' 'নির্ব্বাণ মুক্তি' না হয়, তত দিনই এই ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তিতে আর ভেদ থাকে না।" এ কথাও সত্য নহে। দুই না হইলে যোগ হয় না। যদি বলি, "পূর্ণ যোগে আত্ম-বোধ তো থাকে না"; হাঁ, এ কথা

সত্য বটে ; তখন কেবল মগ্নাবস্থা—আনন্দে আনন্দাবস্থা ; কিন্তু এই, খানেও সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে হইবে, এক পূর্ণানন্দ সত্বায় ডুবিয়া আর এক সত্বা আনন্দিত হইতেছে। এক সত্বা স্বয়ং আনন্দময় হইতে পারেন, কিন্তু এককে দেখিয়া আর এক আনন্দিত হইতে হইলে দুই সত্বার প্রয়োজন। মূলে এই দুই সত্বা যদি স্বরূপগত এক না হইত, তবে যেমন এক আর এককে কখনই বুঝিতে পারিত না, তেমন মূলে দুই সত্বা পৃথক না হইলে, এক আর এককে ভোগ করিতে—উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারিত না।

তারপর আর একটি গুরুতর কথা এই যে, "নির্ব্বাণ মুক্তি" অর্থে "আমি আমার" ইত্যাকার জ্ঞানের বা স্থূল আমিত্বের নির্ব্বাণ হইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু কোনো কালে দুই সত্বার যোগ বা সম্ভোগের শেষ হইতে পারে না। অনন্ত-কাল এই যোগ এবং ক্রমোন্নতি চলিবে। কেন না, আজ যাহা আছে, আর কোনো কালেও যদি তাহা না থাকে, তবে তাহা নিত্যবস্তু হইতে পারে না। জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিত্য, জীবাত্মা পরমাত্মা সাপেক্ষ নিত্যবস্তু, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মা অনন্ত কাল থাকিবে। সুতরাং জীবাত্মাও নিত্য। আর জগৎ ও জীবাত্মা, এ উভয়ই ভগবানের প্রকাশ, কিন্তু জগৎ ও জীবাত্মায় একটি ভেদ আছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার স্বরূপগত জ্ঞান-বস্তু, আর জগৎ, আত্ম-বোধ রহিত, সুতরাং জড় বস্তু। জড় বস্তুর প্রাণ আছে, শক্তি আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই—আত্ম-বোধ নাই। জীবাত্মা, পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রকাশ, আর জগতের তাবৎ জড় বস্তুর মধ্যে, পরমাত্মার জ্ঞান-কৌশল, শক্তি, সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশ পাইতেছে।

এখন দেখিতে হইবে এই যে—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ, ইহা কি ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে।

প্রথমে জ্ঞান যোগ, এবং ধ্যান সাধন ; যাহা উপনিষদ্-যুগে সাধিত হইয়াছিল। তখন পরমাত্মার নিষ্ক্রিয় শান্ত ভাব উপলব্ধি করা, স্বরূপ সাধন করা এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ করাই উদ্দেশ্য ছিল। "আনন্দ রূপমমৃতং" "রসো বৈ সঃ" আত্মাতে পরমাত্মার আনন্দ-স্বরূপ—রস-স্বরূপ উপলব্ধি করাই তখন কার প্রধান সাধন ছিল। যখন এই আন্তরিক সাধনার ভাব প্রবল ছিল, তখন বহির্জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন ভাব স্বভাবত আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্যাগের পথই একমাত্র প্রশস্ত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় ত্যাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু যখন এই সাধনার ভাব পুষ্ট হইল, তখন এই জগতের সমস্ত তত্ত্ব সেই জ্ঞানের

আবেষ্টনে লইবার আয়োজন হইল। অন্তর্জগতের দৃষ্টি ধীরে ধীরে বহির্লীলার প্রকট হইতে লাগিল। কিন্তু তখনো দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া সাধন চলিল।

তত্ত্বজ্ঞ সাধক দেখিলেন, শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে মাতৃক্রোড়ে, মাতৃ-স্নেহ পাইয়াই বর্দ্ধিত হয়। তারপর পিতার প্রেম এবং ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজনের প্রীতির মধ্যে—সমগ্র মানব সমাজের প্রীতির মধ্যে সে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হয়। সাধক দার্শনিক-চক্ষে দেখিলেন এই প্রেমের মূল কোথায়? যে আত্ম-বোধের মূল অনন্ত জ্ঞান, এই খণ্ড খণ্ড প্রেমের মূলও সেই অনন্ত প্রেম। তিনি যেমন জ্ঞানময়, তেমনই প্রেমময়। সেই একই প্রেম বহুরূপে লীলা করিতেছে মাত্র। সুতরাং এ সকল কেবল মায়া নহে। এই সংসার পরিত্যাজ্য স্থানও নহে, এ যে মহা সাধন-ক্ষেত্র। তখন সমস্ত ভাবগুলিকে ভগবৎ প্রেমের মধ্যেই দর্শন করিবার যুগ আসিল—ভক্তি-ধর্ম্ম সাধনের দিন আসিল। উপনিষদ-যুগে প্রধানত শান্তভাব সাধনের পর, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব সাধন চলিল। সুতরাং এক একটি সম্বন্ধ বাচক ভাবের ভিতর দিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন্ সূত্রে সেই অখণ্ড ব্রহ্ম-জ্ঞান, খণ্ডভাব ধারণ করিয়া ভারতের ধর্ম্মে এত ভেদ-নীতি, প্রবেশ করিল তাহার আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। দাস—

শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থান

পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্য ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কি অলৌকিক কৌশলে মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর। যে দুই বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে আমার সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সেই রূপ দুই বস্তুর সংমিশ্রণে কত রথী মহারথীর উৎপত্তি হইতেছে। সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তির কি মহা প্রভাবে জীবের জন্ম-মরণ রূপ প্রবাহ কত যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তুমি আমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, কি বুঝিব?

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানানুসারে শিশু, জননী-জঠরে নয় মাস দশ দিন অবস্থান করিয়া যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। আমরা কতকগুলি বাহ্য লক্ষণা-

বলী দেখিয়া গর্ভধান-কাল নির্ণয় করি। গর্ভাধান হইতে প্রসব-কাল পর্য্যন্ত গর্ভিণীর অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগিনী হইতে হয়; যেহেতু এই সময়ে তাঁহারই স্বাস্থ্যের উপর শিশুর জীবন-মরণ নির্ভর করে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় স্নান, আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, গৃহকর্ম্মাদি করণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মিতাচারিণী হইয়া কালযাপন করাই সুব্যবস্থা। গর্ভিণী তাঁহার অভ্যাসমত স্নান করিবেন। স্নানান্তে সিক্ত বসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সত্বর সমস্ত গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন। পুরাতন চাউলের অন্ন, সহজপাচ্য ব্যঞ্জন, টাটকা মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ প্রভৃতি লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণমত আহার করিবেন। গুরু ভোজন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আমাদের দেশের প্রাচীনারা কিন্তু এই মতের পরিপন্থিনী। তাঁহারা বলেন সহজ অবস্থায় যে আহার করা যায়, গর্ভাবস্থায় তদপেক্ষা আহার বৃদ্ধি না করিলে গর্ভস্থ-শিশুর কি উপায়ে পরিপোষণ হইবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত। পরিমিত আহার দ্বারা গর্ভিণী সুস্থ ও সবল থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির অভাব হয় না। অপর পক্ষে সন্তানের দোহাই দিয়া আহারের মাত্রাটি দ্বিগুণ করিয়া তুলিলে, অথবা গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় উদরাময়, আমাশা, পেটকামড়ানি প্রভৃতি পীড়া, হওয়া ভাল নহে। এই সকল রোগ হইতে গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব যে গর্ভিণী নিজের ও সন্তানের মঙ্গলকামিনী, তিনি যাহাতে গর্ভাবস্থায় পরিপাক-বিকার না জন্মে তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক পূর্ণগর্ভা হইলে তাহাকে "সাধ" দিবার একটি প্রথা আছে। "সাধভক্ষণ" করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে গর্ভিণীকে ইচ্ছামত পায়স পিষ্টকাদি রসনাতৃপ্তিকর নানাবিধ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়া হয়। একে এই সময়ে গর্ভিণীর শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভাল থাকে না, তাহার উপর হঠাৎ এক দিন গুরুভোজন করিয়া কখন কখন "সাধে" বিষাদ ঘটিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন করা ভাল বটে কিন্তু হঠাৎ এক দিন এরূপ গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় ব্রত নিয়মাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে গিয়া অভুক্ত থাকা ভাল নহে। গর্ভিণীর ক্ষুৎপিপাসা উপস্থিত হইলে অবিলম্বে তাহা নিবারণ করা উচিত।

আহারান্তে গর্ভিণী কিছুকাল বিশ্রাম করিবেন। ইহাতে পরিপাক-ক্রিয়া সমুন্নত হয়। দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ সকলের পক্ষেই অহিতকর। দিবা-নিদ্রায় শরীরের স্বচ্ছন্দতা তিরোহিত হয় এবং নৈশনিদ্রার প্রতিবন্ধকতা ঘটে। বিনিদ্রনয়নে রাত্রি যাপন করিলে নানাবিধ পীড়া হয়। গর্ভিণীর কোষ্ঠশুদ্ধি থাকা আবশ্যক। দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অকালপ্রসব অথবা কষ্টকর প্রসব হইতে পারে। সুপথ্যের দ্বারা গর্ভিণীর কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ করাই ভাল। ডুমুর, পেঁপে প্রভৃতি তরকারি এবং সুপক্ক ফলের রস খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে রোগিনীকে 'ক্যাষ্টর অয়েলে'র জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে। গর্ভাবস্থায় অন্য কোন উগ্র বিরেচক জোলাপ-ঔষধ দিতে নাই। অত্যধিক ভেদে গর্ভস্রাব হওয়া অসম্ভব নহে। অনেকের সংস্কার আছে যে, গর্ভাবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এই সংস্কার নিতান্ত ভিত্তিহীন। যে সমস্ত ঔষধ সাক্ষাৎ বা পরম্পরিত ভাবে গর্ভাশয়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, তৎসমুদয় বর্জ্জনীয় বটে, কিন্তু অপরাপর নির্দ্দোষ ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বাধা নাই।

গর্ভিণীর প্রাতর্বমন অতি কষ্টকর ব্যাধি। যে সকল স্থলে বমিত পদার্থের সহিত পিত্তের অংশ না থাকে অথবা বমন না হইয়া কেবলমাত্র বমনেচ্ছা থাকে, সে সকল স্থানে পরিপাক-যন্ত্রের অবস্থান্তর ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। পাকস্থলীর উত্তেজনা বশত ঐ রূপ বমন বা বমনেচ্ছা হয়। কিন্তু যে সকল স্থলে পিত্তসংযুক্ত বমন হয়, শিরঃপীড়া ও সমল জিহ্বা থাকে, তথায় গর্ভিণীর পাক-যন্ত্রের বিকার উপস্থিত হইয়াছে বুঝিবেন। প্রথম প্রকারের প্রাতর্বমনে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই এক পেয়ালা উষ্ণ দুগ্ধ অথবা তদভাবে উষ্ণজল পান করিলে উপকার হয়। দ্বিতীয় প্রকারের পীড়ায় কোষ্ঠশুদ্ধি করিবেন। তদ্দ্বারা উপকার না দর্শিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় পরিধেয় বসনাদি সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখিবেন। ভ্রূণের বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর উদর ও স্তনদ্বয় স্থূল হইতে থাকে। সুতরাং অন্তঃসত্বা নারী এমতভাবে বেশভূষা পরিধান করিবেন যাহাতে ঐ সকল স্থানে চাপ না পড়ে। ধনবান্দিগের গৃহে প্রায়ই দেখা যায় গর্ভিণী দাস-দাসী-পরিসেবিতা হইয়া নিয়ত অলসভাবে বসিয়া থাকেন। এ নিয়ম ভাল নহে। গর্ভাবস্থায় নিয়মিত পরিশ্রম করা উচিত। ইহাতে প্রসব-ক্লেশ কম হয়। বঙ্গের সাধারণ [illegible] রমণীগণের প্রসব-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা

উপলব্ধি হইবে। অতিরিক্ত শ্রমও গর্ভিণীর পক্ষে হিতকর নহে। গর্ভাধান কাল হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। এই সময়ে অনেক গর্ভ নষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন, কষ্টকর যানারোহণ, স্পর্শাক্রামক রোগীর নিকট গমন প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গর্ভিণী সুপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, মনোহর বাক্যশ্রবণ ও নয়নাভিরাম দৃশ্য দর্শন করিয়া কালযাপন করিবেন। যাহাতে মনোমধ্যে কোনক্রমে ভয়, শোকাদি উপস্থিত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকিবেন।

সাধারণত চতুর্থ মাস হইতে পঞ্চম মাসের মধ্যে গর্ভিণী উদরে শিশুর সঞ্চলন অনুভব করেন। এই সময়ে তাঁহার পেটের উপরে কান পাতিয়া শুনিলে শিশু-হৃদয়ের টিক্ টিক্ শব্দ কর্ণগোচর হয়। সচরাচর নাভীর কিছু নিম্নে বামদিকে এই শব্দ হইয়া থাকে। এই স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ হইতে ১৪০ বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। গর্ভে যমজ সন্তান থাকিলে দুইটি শিশু-হৃদয়ের শব্দই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গর্ভ লক্ষণাবলীর মধ্যে এই দুইটি-ই নিশ্চিত লক্ষণ। গুল্ম বায়ু প্রভৃতি রোগে স্ত্রীলোকের অধিকাংশ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে: এমন কি গর্ভস্থ বায়ুর ইতস্তত গতিবিধিতে রোগিণী শিশু নড়িতেছে বলিয়া ভ্রম করেন। গর্ভিণী যে সময়ে শিশুর সঞ্চলন অনুভব করেন, সেই সময়ে তাঁহার গর্ভোপরি কান পাতিয়া যদি শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনা না যায় তাহা হইলে ঐ গর্ভ মিথ্যা। উহা নিশ্চয় পীড়া বিশেষ বলিয়া ধারণা করিবেন। প্রসবের এক পক্ষ পূর্ব্ব হইতে গর্ভিণী উপর-পেট কিছু হাল্‌কা বোধ করেন। ঐ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুনঃ পুনঃ মলমূত্রত্যাগেচ্ছা হইয়া থাকে। এই লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বুঝিবেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। প্রসব-কাল নির্ণয় করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। এই উপায় সকল স্ত্রীলোকেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। যে তারিখে গর্ভিণী শেষ ঋতুস্নাতা হইয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখিবেন; কারণ তদ্দিবস হইতে নয় মাস দশ দিন গণনা করিলেই প্রসব-দিন অবগত হওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই চারি দিন অগ্রে বা পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে।

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীদিগের কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কখন কখন এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। গৃহস্থ হঠাৎ এই বেদনাকে প্রসব-বেদনা বলিয়া মনে করেন উভয় বেদনার প্রভেদ-লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রকৃত বেদনা ।	অপ্রকৃত বেদনা ।
১। বেদনা কটি দেশের পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে আসে। পরে তথা হইতে উরুদেশে চলিয়া যায়।	১। বেদনা কটি দেশের সম্মুখে আরম্ভ হইয়া পশ্চাতে চলিয়া যায়।
২। বেদনা ক্রমে ঘন ঘন ও অধিক হইতে থাকে।	২। বেদনা কখন অল্প, কখন বা অধিক অনুভূত হয়।
৩। কিছুতেই বেদনার উপশম হয় না।	৩। পিচ্‌কারী দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ দূর করিলে বেদনা থাকে না।
৪। গর্ভাশয় হইতে আঁটাবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে।	৪। আঁটাবৎ পদার্থ নির্গত হয় না।

জ্বর, উদরাময়, আমাশা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগ হইলে কখন কখন প্রসব-বেদনার ন্যায় এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। অতি হর্ষ, ভয়, শোক, দুঃখাদি হইলেও ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। গর্ভস্রাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র গর্ভিণীকে শয্যা গ্রহণ করিতে বলিবেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত মলমূত্রত্যাগের জন্যও কখন শয্যা হইতে উঠিতে দিবেন না। তাঁহার শয়ন-গৃহটি যেন যথোচিত ঠাণ্ডা হয়। দুগ্ধ, দুগ্ধ-সাগু প্রভৃতি লঘুপথ্য শীতল অবস্থায় রোগিনীকে খাইতে দিবেন। উষ্ণ খাদ্য-পানীয় এ সময়ে দিতে নাই। শীতল জল ও বরফ ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইলে অল্পমাত্রায় "ক্যাষ্টর অয়েল" খাওয়াইয়া অন্ত্র পরিষ্কৃত করিবেন। বেদনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; যেহেতু এ অবস্থায় গর্ভস্রাব এক প্রকার দুর্নিবার্য্য।

কোন কোন গুর্ব্বিণী রমণীর বারম্বার একই সময়ে গর্ভনষ্ট হয়। আবার কেহ কেহ মৃতবৎসা হইয়া থাকেন। এতদুভয়ই রোগ বিশেষ। অজ্ঞান-তিমির-রান্ধ রোগিনী এই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত বিফল চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহাতে সুদীর্ঘকাল গর্ভাধান না হয় এবং মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলে এই রোগের শান্তি হইয়া তিনি সুপুত্র-জননী হইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সরমা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল যথাসময়ে বি-এল পাশ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে যথেষ্ট পসার জমাইয়াছে, তাহার এখন বেশ দশ টাকা উপায়ও হইতেছে। সকলেই তাহার বাক্‌পটুতায় মুগ্ধ। বিশেষ যখন সে বিচারপতির নিকট অঙ্গসঞ্চালনপূর্ব্বক ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা (Plead) করিতে থাকে তখন অপরিচিত লোকমাত্রেই তাহাকে হাইকোর্টের বড় কাউন্‌সলী (Bar-at-law) মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কাজেই প্রফুল্লের পশার বাড়িতে বিলম্ব হইল না।

যথারীতি হরিপদর পত্র আসিতে লাগিল। সকলের আশঙ্কা দূর হইল। প্রতি মাসে হরিপদ ত্রিশ টাকা করিয়া সংসার খরচের জন্য প্রফুল্লের নামে পাঠাইতে লাগিল। এখন আর প্রফুল্লকে অন্দরে আসিবার সময় মেনু মেনু বলিয়া ডাকিতে হয় না। কমলা আর প্রফুল্লকে দেখিয়া দরজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায় না। তবে মাথার কাপড়টা কিঞ্চিৎ টানিয়া দেয় মাত্র। মেনকা আর তাহাকে এখন ফুলবাবু বলিয়া ডাকে না। পিফুদাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকে। প্রফুল্ল এখন ঘরের ছেলের মত সর্ব্বদাই হরিপদর বাটীতে আসা যাওয়া করিয়া থাকে। এখন সে নিজ হস্তে এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে চালাইতেছে। কি আছে, কি নাই, নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকল অভাব দূর করিবার কষ্টটুকু অবাধে সহ্য করিতেছে। ইহাতে তাহার নির্ম্মল চিত্ত একটা স্বভাবিক আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিত। সে যাহাকিছু করিত তাহা সে কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিত। প্রফুল্ল ইতিমধ্যে হরিপদর পুরাতন ঘর গুলির জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া দিল। মেনকা প্রফুল্লকে পাইয়া বুসিল, তাহার বালিকাসুলভ ছোটো ছোটো আবদারগুলি রক্ষা করিতে প্রফুল্লের অনেক কার্য্যের ক্ষতি হইত। কিন্তু সে মেনকাকে আপনার ছোটো ভগিনীটি ভাবিয়া তাহার শত আবদার মাথায় করিয়া লইত এবং সহ্য করিত। ছুটী-ছাটা থাকিলেই মেনকার আবদারমত প্রফুল্লকে আসিতে হইত এবং তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি দেখাইয়া আনিতে হইত। এমনিভাবে তাহাদের সংসারটি প্রফুল্লের

যত্নে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। অভাব অনাটনের মর্ম্মভেদী হাহাকার দূরে সরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত খরচ পত্র হরিপদর ত্রিশ টাকায় কুলাইত না। প্রফুল্ল যেমন উপায় করিত, তেমনি ব্যয় করিতে ভালোবাসিত। সঞ্চয়ের লালসা তাহার আদৌ ছিল না।

একদিন অপরাহ্নে প্রফুল্ল আসিয়া হরিপদর মাতাকে বলিল—"মা, আজ মেনুর চুড়ী এনেচি।"

হরিপদর মাতা মালা জপিতে জপিতে বলিলেন,—"আঃ বাঁচালে বাবা! মেনুর শ্বশুর সে দিন পর্য্যন্ত লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েচে যে, 'চুড়ী দেওয়া হবে কিনা, বিয়ের সময় দেবার কথা ছিল এখনো হল না! সব জুয়াচুরি নাকি?' বাবা! মিন্সের কী মন! টাকার হাণ্ডিল নিয়ে বসে আছে—তবু আমাদের এই একরত্তি সোনার জন্যে যেন হাঁ করে রয়েচে, লোকের উপর লোক আস্‌চে, আর কত খোঁটা!"

"টাকা থাক্‌লে কি হয়, মা, লোকটার মন বড় নীচ।"

মেনকা কোথায় ছিল কে জানে, চুড়ীর কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দেখি, পিফুদা কেমন চুড়ী হয়েচে?" প্রফুল্ল গম্ভীরভাবে বলিল—"কৈ চুড়ী কোথা?" "আমি যে শুনলুম চুড়ী এনেচ" বলিয়া মেনকা প্রফুল্লের পকেট অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হরিপদর মাতা মেনকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অত ঝাঁপাই ঝুড়চিস কেন, একটু থির হ' না; এনে থাকে তো পাবি এখন।" মেনকা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল।

প্রফুল্ল তাহার সার্টের পকেট হইতে সবুজ কাগজে মোড়া এক জোড়া চুড়ী বাহির করিয়া হরিপদর মাতার হস্তে দিয়া মেকনার দিকে চাহিল—মেনকার মৌন ম্লান মুখখানা তখন বালিকাসুলভ সরল সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার মাতার নিকট বসিল এবং চুড়ী জোড়াটির কারুকার্য্যের পারিপাট্য দেখিতে লাগিল।

প্রফুল্ল পকেট হইতে আর এক জোড়া চুড়ী বাহির করিয়া বলিল—"মা, এই জোড়াটা বৌদির জন্যে এনেচি—বৌদির হাতে কাচের চুড়ী দেখ্‌লে মনে বড় কষ্ট হয়।"

হরিপদর মাতা বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এ চুড়ী কি করে হ'ল বাবা, হরিপদ তো কেবল মেনুর চুড়ীর জন্যেই টাকা পাঠিয়ে দিছ্‌লো—তবে ?"

"সংসার খরচ হয়ে যে টাকা বাঁচতো তা'তেই হয়েচে।"—"তাও কি হয় ? এ চুড়ী জোড়াটা ক' ভরি ?"—"বারো ভরি।"

"বারো—ভ—রি ! এর দামতো সামান্য নয় বাবা, তুমি নিশ্চয়ই নিজেই টাকা দিয়েএনেচ ; কেমন ?"

"তাই যদি হয় মা,—আমার টাকা কি আপনার টাকা নয় ? আপনি কি আমাকে পর ভাবেন—আমি শৈশবে মাতৃহীন হয়ে মা বলে' ডাক্‌তে পাইনি—এখন আপনাকে পেয়ে আমার সে অভাব দূর হয়েচে"—প্রফুল্ল আর বলিতে পারিল না বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। হরিপদর মাতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"তা নয়, বাবা সংসারে বিপদ আপদ আছে আমাদের জন্যে সব টাকা খরচ————"

প্রফুল্ল কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে সব বিপদ আপদ কেটে যাবে।"

মাতার আদেশে মেনকা চুড়ী লইয়া কমলাকে দেখাইতে গেল। কমলা দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল—তখনো তাহার নয়নদুটি অশ্রুপূর্ণ—স্থির—অচঞ্চল ! সে ভাবিতেছিল—প্রফুল্ল মানব—না দেবতা !

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহাকে পাইয়া তিনি আর হরিপদর অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না। এক দিন প্রফুল্ল না আসিলে পরদিন কৈলিসীকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দোকান খানি ক্রেতায় ভরিয়া গেলে ব্যবসায়ীর প্রাণে যেমন একটা আনন্দের লহরী খেলিয়া বেড়ায়—উকিলের আপিস-গৃহটি প্রাতঃসন্ধ্যায় মক্কেলপূর্ণ থাকিলে তাহার হৃদয়েও তেমনি একটা আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠে, মেজাজটাও ভালো থাকে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে প্রফুল্ল সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কাজেই তাহার প্রাণের মধ্যে কোনো গোলমাল ছিল না—পরিষ্কার ঝরঝরে শিশুর ন্যায় সরল—পবিত্র !

সেদিন সকাল বেলা প্রফুল্ল তাহার আপিস-গৃহে বসিয়া মক্কেলদের সহিত মোকদ্দমা-সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে, এমন সময়ে ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। খামের উপর হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, উহা হরিপদর

নিকট হইতে আসিয়াছে। পড়িবার জন্য তাহার বিশেষ কৌতূহল জন্মিল। কারণ উহা সাধারণ চিঠির মত নয়। উহার গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমনি ডাকমাশুলও অতিরিক্ত লাগিয়াছিল। প্রফুল্ল আজ একটু সত্বর মক্কেলদের বিদায় করিয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিল ঃ—

সোদরপ্রতিম,

ভাই, তুমি আমাকে প্রায়ই লিখিয়া থাকো যে, আমার কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে, কি দেখিতেছি, কি শিখিতেছি ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে তোমাকে জানাইতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বিশেষ বিবরণ তোমাকে জানাইতে পারি নাই, আজ একটু অবকাশ পাইয়া লিখিতেছি।

তুমি জানো, আমি এখন রেঙ্গুন হইতে ম্যাণ্ডেলে আসিয়াছি—এখানে আমাদের হেডকোয়ার্টার। আমার নূতন সাহেব আমাকে বেশ পছন্দ করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত ও শীকারপ্রিয়। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আর তিন মাসের মধ্যেই আমাদিগকে কার্য্যে বহির্গত হতে হবে। এই সময়ের ভিতর তোমাকে ঘোড়ায় চড়', টেলিগ্রাফ্ সিগ্ন্যালিং ও মগদিগের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিখ্তে হবে।" ঘোড়ায় চড়া ও টেলিগ্রাফ সিগ্ন্যালিং শেখা আমার পক্ষে একটা বিশেষ শক্ত কার্য্য বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু মগ্দিগের দুরূহ ভাষা শিখিতে হইবে শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল! কিন্তু করি কি? আমার আপিসের একটি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ মগের নিকট মগের বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিগ্ন্যালিং ও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াফেলিলাম। তিন মাসকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া মগের তিন চারি খানি পুস্তক শেষ করিলাম।

বড় সাহেব নিজে আমাকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। আমার নাম গেজেটে বাহির হইল। ইহার তিন চারি দিবস পরেই সাহেব আমাকে বলিলেন,—"তুমি প্রস্তুত হও—কাল আমাদিগকে কার্য্যে বাহির হতে হবে। বর্ষার পূর্ব্বে আমাদিগকে ২৫০ মাইল পথে টেলিগ্রাম বসাতে হবে। তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্তে হবে, যা কিছু দরকার দেখেশুনে গুছিয়ে লও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আপিসে আসিয়া অগ্রে হিসাবের খাতা পত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্যাক করাইয়া, নিজের কাছে তাহার একটি লিষ্ট রাখিয়া দিলাম।

পর দিন প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। আমাদের যাত্রা বড় সহজ যাত্রা নহে, একটি ছোটোখাটো যুদ্ধ-যাত্রা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতাধিক কুলী মজুর খালাসী, বহুসংখ্যক অশ্বতর আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ডায়মান। সঙ্গে দেশীয় হাঁসপাতাল। কুলীদিগের আহার যোগাইবার জন্য কণ্ট্রাক্টিরেরা যেন একটি প্রকাণ্ড বাজার লইয়া চলিয়াছে। গো-শকটগুলি টেলিগ্রাফের অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাঁবু ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত পরিচালনা করিয়া যাইতে হইবে দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল। সাহেব ঘোড়ায় চড়িলেন আমিও ঘোড়ায় চড়িলাম। আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। ক্রমে আমরা লোকালয় ছাড়াইয়া একটা জঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। চারি দিকে ছোটো বড় পাহাড় ঘেরা। স্থানটি বেশ রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। সন্মুখে ইরাবতী নদী কলতানে বহিয়া যাইতেছে। স্থানটি সাহেবেরও ভালো লাগিল। তাঁহার আদেশে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই ইরাবতী নদীর তীরে একটা সমতল ক্ষেত্রে আমাদের তাঁবু ফেলা হইল। ইহার প্রায় দুইশত গজ তফাতে কুলীদের আড্ডা হইল। আমার ও সাহেবের তাঁবু পাশাপাশি পড়িল। আমার তাঁবুতে একজন হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ স্থান পাইল। সাহেবের তাঁবুর পশ্চাতে তাঁহার আর্দালী ও খানসামার ছাউনী হইল। আমরা এখান হইতে সন্মুখে বারো মাইল ও পশ্চাতে বারো মাইল পথ টেলিগ্রাফ বসাইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য যে আমরা জরিপকারীদিগের সাংঙ্কেতিক চিহ্ন ও নক্সা দেখিয়া আমাদের পথ নির্ণয় করিতে লাগিলাম। ইহা ব্যতীত পথ প্রদর্শকও ছিল। আমি প্রত্যহ সকালে চা-পান করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধানে বহির্গত হই। তার লইয়া যাইবার জন্য কোনো স্থানে ডিনামাইট্-সাহায্যে পাহাড় উড়াইয়া ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ফেলিয়া দিতে হয়। আমার সহিত সর্ব্বদাই একটি গুল্লিভরা রিভল্‌ভার ও একটি বন্দুক থাকে, কারণ এই সকল স্থান হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ।

আমি প্রত্যহ বেলা ১১টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসি এবং সাহেবকে কার্য্যের রিপোর্ট দিয়া স্নানাহারে প্রবৃত্ত হই। কোনো কোনো দিন আমরা উভয়ে এক সঙ্গেই বহির্গত হই এবং একত্রেই ফিরিয়া আসি। বেলা ১টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই সকল লোকের হিসাব কিতাব প্রভৃতি আপিসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। বৈকালে সাহেবের সহিত খোস গল্প করি। সাহেব এখন

আমাকে তাঁহার তাঁবেদার মনে করেন না, বন্ধুভাবে দেখেন ও সেইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা বলেন।

একদিন সাহেবের তাঁবুর সম্মুখে দুইজনে দুইখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছি, সাহেব কথায় কথায় বলিলেন,—"দেখ আমাদের মুর্গিগুলোর সঙ্গে কেমন একদল বুনো মুর্গি এসে মিশেছে।" আমি বলিলাম,—"ও গুলোকে মারতে হবে?" সাহেব সেই ঝাঁকের ভিতর একটি মুর্গিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মারো দেখি ঐ মুর্গিটাকে—তোমার কেমন লক্ষ্য স্থির হয়েচে দেখি।" "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি" বলিয়া আমার বন্দুক আনিবার জন্য উঠিলাম। সাহেব বলিলেন—"না না, আমার বন্দুক নিয়েই মারো।" আমি সাহেবের বন্দুকে একটি মাত্র গুলি দিয়া ঝাঁকের মধ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট মুর্গিটির পায়ে মারিলাম। সাহেব আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এখন তুমি শীকারের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েচ।"

আমাদের তাঁবু উঠিল। আমরা গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ এই নিবিড় অরণ্য-মধ্যে বন্য জাতির বসবাস দেখিলাম। আমাদের আগমনে তাহারা উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল, আমাদের লোকেরা তাহাদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহা করিতে দি নাই। তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া দেখিলাম—গোটাকতক বড় বড় তীর, ধনুক ও বল্লম ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই। দেখিলাম দুই চারিটি শিশুসন্তান ভূমিতে পড়িয়া আকুলস্বরে কাঁদিতেছে; ইহাদের পিতামাতা আমাদের অভিযান দেখিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে; সন্তানগুলিকে লইয়া যাইবার অবকাশ পায় নাই। এ দৃশ্য প্রাণের ভিতর একটা গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলিল। আমরা সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সাহেবের ইচ্ছা ছিল ইহাদের দুই এক জনকে ধরিয়া তাহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। একটিকেও ধরিতে পারিলেন না—আমাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহারা কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যায়, কোন্ গভীর বনে লুকাইয়া থাকে তাহাদের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। যে স্থানে আমাদের তাঁবু ছিল তথা হইতে আঠারো মাইল দূরে আমাদের শিবির-সন্নিবেশ হইল। ইহাও ইরাবতী নদীর তীরে, কিন্তু নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সাহেব বলিলেন—"ইহাই প্রকৃত শিকারের স্থান।"

আমাদের কার্য্য পূর্ব্বমতই চলিতে লাগিল। একদিন আমি কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় রোল উঠিল—মিংসা উকে (একটা মগকুলী) বাঘে ধরিয়াছে, সে ইরাবতীতে জল শৌচ করিতে আসিয়াছিল, কোথা হইতে হঠাৎ একটা বাঘ আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। আমি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া নিমেষ-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলাম—বাঘটা এখনো তাহাকে মারে নাই, সে বালুকার উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে আর বাঘটা তাহার বুকের উপর বসিয়া মহানন্দে লাঙ্গুল নাড়িতেছে। আমি দূর হইতে তাহার কর্ণমূলে গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইল, আমি নির্ভীকহৃদয়ে আর একটা গুলি করিলাম, উহাতেই তাহার পতন হইল। শেষ গুলিটা তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তারপর কুলীরা আসিয়া লাঠি মারিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিল। সংজ্ঞাহীন কুলীটার মুখে চোখে জল সেচন করাতে সে চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

কুলীরা বাঘটাকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। সাহেব খুসী হইয়া আমাকে অপেক্ষাকৃত একটি ভালো বন্দুক উপহার দিলেন।

আমার বাঘ শীকার দেখিয়া সাহেবেরও বাঘ শীকার করিবার ঝোঁক চাপিয়া গেল। তিনি এই অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে একটা ৩০ ফুট উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করাইলেন। আমরা জ্যোৎস্নারাত্রে বাঘের প্রতীক্ষায় এই মঞ্চের উপর বসিয়া থাকি, কিন্তু বাঘ আমাদের ত্রিসীমায় আসে না। একদিন সাহেব বুদ্ধি করিয়া একটা ছাগল আনিয়া বাঁধিয়া দিলেন। ছাগলটার কাতর ক্রন্দনে একটা বাঘ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল; আমরা উভয়ে এক সঙ্গে উহাকে গুলি করিলাম। আহত ব্যাঘ্র বিকট গর্জ্জনে বনভূমি কাঁপাইয়া তুলিল—আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সে বার বার লাফাইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস সাহেবের গুলির আঘাতে ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার প্রকাণ্ড দেহটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—স্থানটা রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল। তারপর কত নিশি জাগিয়া কাটাইয়াছি, বাঘ আর সে দিককও আসে নাই। এইবার সাহেবের হরিণ-শীকার করিবার ইচ্ছা হইল। ইরাবতীর বালুকাময় তটভূমিতে কম্বল মুড়ি দিয়া আমাদের সারারাত কাটাইতে হয়। যখন হরিণের পাল জল পান করিতে আসে, তখন এক সঙ্গে উভয়ে দুই চারিটাকে গুলি করি; উহারা গুলি খাইয়া ছুটিতে ছুটিতে অনেক তফাতে যাইয়া পড়ে। পর দিন কুলীরা খুঁজিয়া আনে; দুই একটাকে বাঘেও লইয়া যায়।

একদিন নদী-তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম—এক স্থানে ছোটো ছোটো মৎস্য সকল লাফাইয়া উঠিতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড জীব ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি সাহেবের নিকট তিনটা ডিনামাইট্ চাহিয়া পাঠাইলাম। সাহেব ডিনামাইট্ হস্তে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া যে স্থানে ঐ জীবটি ভাসিয়াছিল তাহার তিন দিকে তিনটি ডিনামাইট্ অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক ফেলিয়া দিলেন। উহারা "বড়্ বড়্" শব্দে ডুবিয়া গেল এবং এক মিনিট্ পরেই প্রায় কাঠাখানেক জমির মাটি ও জলকে গভীর গর্জ্জনে অন্যূন বিশ ফুট উর্দ্ধে তুলিয়া দিল। সেই স্থানের সমস্ত মৎস্য ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জীবটিও দেখা দিল। সাহেব তাহার মস্তকে গুলি করিলেন। কুলীরা উহাকে জল হইতে উঠাইয়া আনিল। উহা একটি মৎস্য-বিশেষ, ওজনে পাঁচ মন ত্রিশ সের। কুলীরা উহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া উদর পূর্ণ করিল।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম দিনে

সে দিন বসন্তবায়ু বহেছিল হেথা
পিকের ঝঙ্কার
প্রকৃতির কম শোভা আলোকিত পূর্ণ
শোভার ভাণ্ডার
নন্দনের পারিজাত ভুলে ফেলে দিয়ে
বিভুর আদেশে
রমা-সম ফুটেছিলি এ দীন আলয়ে
ফুল্ল হাসি হেসে।
কম প্রাণ রক্ষাতরে বিভু-আজ্ঞাক্রমে
বায়ু এল ছুটে,
মাতৃ বক্ষে রক্ত-ধারা প্রেমে দুগ্ধ হয়ে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে।

আলোকে বাতাসে স্নেহে কি উজ্জ্বল লেখা
ফুটে ব্রহ্মবাণী,
ধরিত্রী শ্যামল বক্ষে চির প্রেমভরে
তোরে নিল টানি' !
জননী জনম-ভূমি স্বর্ণ শস্য-ছলে
শ্যামাঞ্চল পাতি'
তোমারে বরিয়া নিল স্নিগ্ধ শয্যা রচি'
প্রেমভরে অতি।
জগত-জননী স্নেহে তোরে আমন্ত্রিল
দিয়ে সব দান;
ত্রিভুবনে পড়েগেল ক্ষুদ্র শিশু-তরে
সেবার বিধান।
শিশু হ'তে কৈশোরেতে যে বিভু তোমারে
এত দিন ধরে'
শত ঝঞ্ঝা ঝড় হ'তে রক্ষা করে তোমা
ভীষণ আঁধারে।
ধাত্রী-ক্রোড়ে দিয়ে যিনি মাতৃপ্রেমে ভরে
তব সঙ্গে আছে,
সুখে দুঃখে সুপথেতে হাতখানি ধরে'
সঙ্গে ফিরিতেছে।
সামান্য সে দিন নয় যেই দিনে ভবে
বিভু-কৃপা পে'লে,
যাঁর প্রেম আজীবন সুখে দুঃখে ফেরে
ঢাকে স্নেহাঞ্চলে,
তাই আজ শুভদিনে তাঁর সেবা-তরে
বল ভিক্ষা চাও;
জন্ম যেন ধন্য হয় প্রিয় কার্য্য করে'
চিহ্ন রেখে যাও।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

প্রত্যাবর্ত্তন (৬)

বৃন্দাবন হইতে মথুরার ভাড়া এক আনা মাত্র। যখন মথুরায় আসিলাম তখন বেলা বোধ হয় পাঁচটা। আমি যেরূপ অল্পে অল্পে চলিয়াছি তাহাতে এখানেও অন্তত একবেলা থাকিয়া এ স্থানটা দেখিয়া যাওয়াই উচিত মনে হয়, কিন্তু কেন জানি না, কেমন একটা আন্তরিক অনিচ্ছার ভাব আসিল। মথুরা হইতে যেখানেই যাইব রাত্রি হইবে, সম্মুখে এমন কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান জানা ছিল না যেখানে গেলে রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় পাইব। ইহা জানা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ ভয় ভাবনা হইল না; যাহা হউক এই আন্তরিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সন্ধ্যার পর আগ্রার টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। বোধ হয় ট্রেণ খানি শ্লো-প্যাসেঞ্জার ছিল। রাত্রি ১০টার সময় আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। তখন মনে হইল কোথায় যাই। অধিকন্তু বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আজ শরীরটা ভালো ছিল না—পেটেরও কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; যাহা হউক বাহিরে আসিয়া একব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এখানে সাধারণ 'সরাই' আছে, সেখানে একআনা ভাড়া দিলে রাত্রি যাপন করিতে পারা যাইবে। ক্ষীণালোকে পথ খুজিতে খুজিতে সরাইয়ে আসিয়া সহজে আশ্রয় পাইলাম। যদিও ঘরের অবস্থা ভালো না,কিন্তু তখন ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। রাত্রে শরীর অনেকটা ভালো হইল। বোধ হয় দুই আনার কেনা খাবারে রাত্রি গুজরাণ হইল। খুর্জ্জায় ভ্রাতা বসন্তকুমার-প্রদত্ত দুই টাকার বোধ হয় তখনও দুই এক আনা অবশিষ্ট ছিল।

২২শে অগ্রহায়ণ প্রাতে আগ্রা সহরে চলিয়া আসিলাম। এখানেও তেমন নির্দ্দিষ্ট পরিচিত ব্যক্তি কেহই ছিলেন না, কেবল দিল্লীতে নেহালচাঁদ বাবু বলিয়াছিলেন যে "আগ্রায় বাবু নিলমণি ধর (Law lecturer.) এবং প্রফেসার নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এই দুইটি ব্রাহ্ম পরিবার আছেন।" সুতরাং আমার গন্তব্য পথের এই শব্দ টুকুই অবলম্বন মাত্র। কিন্তু লাহোরে যেমন সারদা বাবুর উদ্দেশে গিয়া বাবু হরলালের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলাম, এখানেও প্রায় তদ্রূপ এক ঘটনা উপস্থিত হইল।

নিলমণি বাবুর ঠিকানা, এক ভদ্রলোকের বৈটকখানায় গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া আমার সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা

করিয়া বলিলেন, 'নিলমণি বাবু এখন কলেজে যাইবেন, তা ছাড়া তাঁর একটি পুত্র অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় আছেন। ইচ্ছা করিলে আপনি আজ্ এখানেই থাকিতে পারেন'; পরে জানিলাম, তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ দে মল্লিক। এই বাড়ি তাঁহার। আমি তাঁহার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে রহিলাম। তারপর এখানে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, তাঁহার নাম পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে অসবর্ণ-বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্ত্রী মারা গিয়াছেন; তিনটি ছোটো ছোটো কন্যা আছে, তাহাদিগকে নিলমণি বাবুর স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। পরেশ বাবুকে দেখিয়া আমার মনে কষ্ট হইল, কেননা যাঁহারা কেবল সমাজের জন্য সমাজ সংস্কার করেন, তাঁহারা পরীক্ষার সময় মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না।

পরেশ বাবুর সঙ্গে নিলমণি বাবুর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন কলেজে যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ হইল। দেখিলাম তাঁহার একটি বয়স্ক পুত্র অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় আছেন। তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে একটু বসিলাম। নিলমণি বাবু আমাকে বলিলেন, "আপনি আগামী কল্য প্রাতে রবিবারে উপাসনায় আমার এখানে আসিবেন এবং এখানেই আহার করিবেন।"

যতীন বাবু কাজে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার একটি দশ এগার বৎসরের কুমারী ভগিনী আমাকে বাড়ির ভিতর উপর বারণ্ডায় লইয়া গিয়া স্নানের আয়োজন দেখাইয়া দিল। তৎপরে সেইখানে বসিয়া আহারাদিও করিলাম। যতীন বাবুর বাড়িতে তাঁহার বিধবা মাতা, বিবাহিতা ভগিনী আর ছোটো ভগিনীটিকে দেখিলাম। তাঁহাদের ব্যবহার এবং ভাব দেখিয়া আমার প্রাণে অতিশয় সদ্ভাবের উদয় হইল। যেন ঘরের মত বোধ হইল। ঐ দিনের ডায়রীতে এইটুকু লেখা ছিল;—"ও! আর পারিনা 'তাঁর' করুণার কথা লিখিতে!"—"তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর।" মেয়েটি কিছুক্ষণ আমার কাছে আসা যাওয়া করিয়া এবং গল্প শুনিয়া আরো গাঘেঁশা হইয়া পড়িল। যতীন বাবুর মা অপরাহ্নে আমার মুখে ভগবানের নাম গান ২।৩টি শুনিলেন।

পূর্ব্বে যে বারে তিন বন্ধুতে ভ্রমণে আসিয়া ছিলাম, সে বারেও "তাজমহল" দেখিয়াছিলাম; এ বারেও দেখিয়া আসিলাম, পূর্ব্বাপেক্ষা যেন এবার উদ্যানের পারিপার্ট্য আরো ভালো হইয়াছে মনে হইল।

রাত্রে পরেশ বাবুর উদ্‌যোগে একটি ভদ্র লোকের বৈটকখানায় ১০।১৫ জন শিক্ষিত বাঙালী সমবেত হইলেন, আমার গান হইল। গান মোটামুটি এক প্রকার হইল বটে কিন্তু আমার যেন তেমন তৃপ্তি বোধ হইল না। বোধ হইল যেন গান জমে নাই। পরদিন রবিবার প্রাতে নিলমণি বাবুর বাড়ি উপাসনায় যোগ দিলাম। তারপর নগেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। তিনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জামাতা। তখন তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় হাজারিবাগে ছিলেন। নগেন্দ্র বাবু আমার প্রতি অত্যন্ত সৌহাদ্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার পাথেয় অভাবের কথা বলিলাম। তিনি তজ্জন্য আমাকে দুই টাকা সাহায্য করিলেন।

নিলমণি বাবুর বাড়ী আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণে ৪-১০ মিনিটের ট্রেণে ফাফুণ্ড ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। কানপুরের কয়েক ষ্টেশন উপরে এটি একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন, সকল ট্রেণ এখানে থামে না। ষ্টেশনে থাকিবার কোনো রূপ সুবিধা না পাইয়া বাহিরে এক সরাইয়ে রাত্রি যাপন করিলাম। ফাফুণ্ড ষ্টেশনে নামিবার কারণ আগামী বারে বলিব। (ক্রমশ)

স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়াগ্রামে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্ম হইয়াছিল। পুঁড়া অতি প্রাচীন স্থান। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। এ গ্রামের বঙ্গজ কায়স্থ বাবুরা সমাজমধ্যে বিশেষ মান্য গণ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের জন্যই পুঁড়া বিখ্যাত। এক সময়ে পুঁড়ার "ছোটনবদ্বীপ" নাম হইয়াছিল।—তাহা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের জন্য। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরলোকগমনে পুঁড়া পণ্ডিতশূন্য হইল।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুঁড়ানিবাসী হইলেও আমাদের কুশদহের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি প্রথম বয়সে কুশদহের অন্তর্গত খাঁটুরায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অনেক দিন তিনি কুশদহে ছিলেন। কুশদহের সহিত তাঁহার সংস্রব বরাবরই ছিল। তাঁহাদের বংশের অনেক পুত্রকন্যার কুশদহে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কুশদহে আসিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে ৺হরদেব শিরোমণি একজন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পণ্ডিতবংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে অনেকে বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা গোবিন্দ চন্দ্র তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। দশকর্ম্মে তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রায়বাবুদের পৌরহিত্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় উদার, সরল, অল্পে সন্তুষ্ট বিপ্র আজ কাল দেখা যায় না। শাস্ত্রে গভীর দৃষ্টি না থাকিলেও চরিত্র ও ভগবৎভক্তিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথোচিত ভাগ দিতেন না বলিয়া তিনি কোন দিন বিরক্ত হন নাই। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবননির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পিতার অনুরূপ পুত্র। তিনি যেরূপ সরল, অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, এক স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভিন্ন সেরূপ অল্পই দেখিয়াছি। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদাই হাসি দেখা যাইত। তাঁহার যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত, সমস্ত দিন প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল লিখিতেছেন, অথবা প্রুফ দেখিতেছেন, হয়ত শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়াছেন, সে সময়ও দেখিয়াছি যে সকল ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সহিত হাসিমুখে তিনি কথা কহিতেছেন।

খাঁটুরা গ্রামে ৺ রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে থাকিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি শিক্ষা করেন। পরে কাশীধামে স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট যাইয়া ১২ বৎসর কাল দর্শন ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দেশে প্রত্যাগত হন। প্রথমে শ্রীরামপুরে আসিয়া মহাভারত ও পঞ্চদশী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকালেখক হইয়াছিলেন। তদনন্তর বহরমপুরের স্বনামখ্যাত ৺ ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং রামদাস বাবুর কলিকাতাস্থ বৃহৎ ভবনে অবস্থিতি করিতে থাকেন। উদারহৃদয় রামদাস বাবু বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। গুণী গুণের আদর জানেন। রামদাস বাবুর সংস্রবে আসিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে রামদাস বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামদাস বাবুর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ যে আন্তরিক দুঃখ পাইয়াছিলেন

তাহা তিনি সামলাইতে পারেন নাই। তাহার অল্পদিন পরেই রাণী আরনা কালীর টোলে বেদান্তাধ্যাপক হইয়া বহরমপুর গমন করেন এবং সেখান হইতেই তাঁহার হাঁপানি রোগের সূত্রপাত হয়। তিনিও পদত্যাগ করিয়া বাটীতে থাকিতে বাধ্য হন।

মহর্ষি পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালেও তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বৃত্তি পাইতেন। সেই জন্য শেষজীবনে নিতান্ত অর্থকষ্ট পান নাই। বাঙ্গালায় শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করার পথ প্রদর্শক না হইলেও সাংখ্যদর্শন সহজবোধ্য করিয়া সাধারণের বোধগম্য করার চেষ্টা তিনিই করিয়াছেন। পরে পাতঞ্জল বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের অনুবাদ করেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লেখার রীতি একটু নূতন রকমের ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হইত। তিনি নানাবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে লিখিতেন। অনেক মাসিকপত্রের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। তাঁহার প্রবন্ধে নাম না থাকিলেও সহজে বলা যাইত কোনটি তাঁহার রচনা। তিনিও আমাকে এরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। নটকুল চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। উভয়েই উভয়ের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন। কবিরাজ বিজয়রত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বেদান্তবাগীশ পীড়িত হইলে তিনি বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। দুইজনে এতটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল বলয়াই উভয়ে এক সঙ্গে দিব্যধামে গমন করিলেন। বেদান্ত বাগীশ মহাশয় দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও কোন দিন গঙ্গাস্নান বা নিত্যানুষ্ঠের কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। ঝড়বৃষ্টিতেও তাঁহার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইত না। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। কোন দিন অশান্তিতে পড়িয়াও ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, চরিত্রবান, পরম ভাগবত পণ্ডিত বিরল। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল পূঁড়া কেন সমগ্র কুশদহ পণ্ডিত শূণ্য হইল। বঙ্গদেশের সাহিত্য গগন হইতেও একটি উজ্জ্বল তারকা অন্তর্হিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

সম্রাট দম্পতীর দর্শনে কলিকাতায় বোধ হয় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। অবশ্য কুশদহবাসী বহু লোকও আসিয়া ছিলেন। দর্শনের উদ্দেশ্য সকলের এক নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা একজন মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু তিনি বিশেষ মনুষ্য। তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষা এবং ধর্ম্মাদি লইয়া একটি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের পরিচালক নিয়ম। বিধাতা নিয়ন্তা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক। পৃথিবীর যে রাজ-নিয়ম-বিধি, তাহা মানবীয় হস্তের ভিতর দিয়া কাজ করে। সুতরাং তাহা ত্রুটি মিশ্র; কিন্তু সে বিধি সাম্রাজ্যেরই জন্য,-সে বিধির মধ্যেও বিধাতার বিধান স্বীকার করিতে হইবে। বিধানে শ্রদ্ধা, বিধির প্রতিনিধি রাজাকে সম্মান করিতে আমরা ধর্ম্মত দায়ী। আন্তরিক সেই ভাবে যদি আমরা রাজ-দর্শন না করিয়া, কেবল ব্যাহ্যিক ব্যাপার দেখিয়া অর্থনষ্ট এবং শারীরিক কষ্ট করিয়া থাকি, তবে অপরাধ হইয়াছে মনে করি।

গত ২২শে পৌষ স্বর্গীয় ভুতনাথ পালের বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাম্বুলী সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সামাজিক উন্নতি বিষয়ক অনেক কথার অবতারণা হইয়াছিল। এমন কি "ইংলণ্ড, আমেরিকা গমনে জাতি যায়না, "অসবর্ণ বিবাহ এবং বাল-বিধবা বিবাহ অবিধি নহে," এ সকল কথাও উঠিয়া ছিল। সভা সমিতিতে দশজনে একত্র হইলে তখন মানুষের প্রাণে একটা স্বাভাবিক সদ্ভাব ও আনন্দের উদয় হয়; তখন ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। যাহা প্রাণের স্বাভাবিক কথা তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু সর্ব্বদা সাংসরিক গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে আর সে ভাব থাকে না।

পৌষ মাসের তাম্বুলী সমাজ মাসিক পত্রে "পুরাকালের স্ত্রী শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, স্ত্রী লোকের শিক্ষার জন্য বর্ণ-পরিচয় হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। মুখে মুখে সৎ শিক্ষাই যথেষ্ট। প্রবন্ধের একস্থানে

বলিতেছেন, "আমরা মহিলাদিগকে আদর্শ শিক্ষা দিতে পারি, দিয়াও থাকি কিন্তু অক্ষর পরিচয় কিছুতেই দিব না, যাহারা তাহা দিবে, তাহারা আপন ফাঁস গলায় পরিবে।" এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাই তাম্বুলী সমাজের মত না কি? যদি তাহা না হয়, তবে উহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

গোবরডাঙ্গা হইতে পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

'৬।৭ বৎসর যাবৎ আমি এক প্রকার পেটের বেদনায় যারপর নাই ক্লেশ পাইতেছিলাম। সায়ংকালে প্রায়ই বেদনার সূত্রপাত হইত। ক্রমে উহা অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাক্তারি, কবিরাজী, হোমিয়োপ্যাথিক সর্ব্বপ্রকার ঔষধই নিস্ফল হইল, অবশেষে নিরুপায় হইয়া দিবাভাগের আহার পরিত্যাগ করিলাম, তথাপি অব্যাহতি পাইলাম না, ফলত রোগ বা ঔষধের নির্ণয়ই হইল না। অবশেষে মৃত্যুই একমাত্র প্রার্থনার বিষয় হইল। এই দারুণ শোচনীয় অবস্থায় গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত হয়দাদপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষের সহিত আমার হঠাৎ সাক্ষাৎকার হইল, এই চেষ্টা যত্ন বিরহিত সুতরাং পুরুষকার পরিশূন্য সাক্ষাৎকারে মূলে অবশ্য কোন শক্তি কার্য্য করিয়াছিল। ভ্রান্ত মানব এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই পুরুষকারের বৃথা গর্ব্বকরে। যাহা হউক ডাক্তার আমার দুর্দ্দশার পরিচয় পাইয়া ব্যথিতভাবে বলিলেন 'যে কারণই পেটে বেদনা ধরুক, আমার ঔষধে আপনি নিশ্চিতই আরোগ্যলাভ করিবেন', বস্তুত তাহাই হইল। সাত দিন মাত্র ঔষধ সেবন করিয়া আমি নিরাময় হইলাম!!

কত লোক হয়তো আমারই মত বিপদে দিশে হারা হইয়া কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিয়া আমি সাধারণের গোচরার্থ 'কুশদহ" পত্রে নিজের আরোগ্য সমাচার প্রকাশের প্রত্যাশায় পাঠাইলাম।'

সংশোধন—গত অগ্রহায়ণ মাসের 'কুশদহতে প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতার নীচে নাম শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক হইবে।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে,পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তবচরণ।"

৩য় বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩১৮ ১১শ সংখ্যা

ব্রহ্মস্তোত্রম্

(অষ্টোত্তরশতনাম)

নমোঽকিঞ্চন নাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্য্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষযায় তে॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিল কারণ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধো অধমতারণ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
করুণা নিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন॥
নমো গুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে নমঃ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রম্যায় দুর্লভায় চ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমোনমঃ।

দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ ॥
নমস্তভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন ।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন ॥
নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে ।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবন প্রীতে নমঃ পতিত পাবন ।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণ প্রাণধনায় চ ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর ।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো ।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন ।
ভূমন্ ভবাব্ধিকাণ্ডারিন ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব ।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকার শুদ্ধ চ ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ ।
সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বমূলাধারায়াস্তু মনোনমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্ব্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্ব্বসাক্ষিণে ।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখ স্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্টে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমোনমঃ ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্ব্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমোনমঃ ।
নামান্যেতানি গৃহ্ণন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥

(ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন)

বিধি পালন

জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে স্বরূপগত এক কিন্তু ব্যক্তিত্বে ভিন্ন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধবাচক কোনো না কোনো ভাবের ভিতর দিয়াই সম্বোধিত হইয়া থাকেন তাহা গত মাসে "দ্বৈতাদ্বৈত ভাব". প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্গে সাধকের বিবিধ সম্বন্ধ যোগে ভাব-রসলীলা সম্বন্ধে পৌরাণিক যুগে যথেষ্ট উৎকর্য লাভ করিয়াছিল। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সকল ভাব গুলির সঙ্গে সঙ্গে মধুর ভাবটি অত্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের ভেদ ঘটিয়া ক্রমশ এমন ব্যভিচার দোষ ঘটিল যাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক এক্ষণে অদ্বৈতভাব, দ্বৈতভাব এবং সম্বন্ধবাচক ভাবের মীমাংসা করিয়াও ভগবানের সঙ্গে যে আমাদের যোগ তাহা কি রূপে আমরা বাস্তবিক লাভ করিতে পারি তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পিতা পুত্রে বস্তুগত অভেদ, কিন্তু ব্যক্তিত্বে ভেদ ; সম্বন্ধগুলি ভাব প্রকাশক, কিন্তু এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট নয় ; যদি পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন না করে, তবে পিতার সঙ্গে পুত্রের যে যোগ তাহা সত্য হয় না। আজ্ঞা পালনও কেবল বাহিরের একটা হুকুম মানা নহে। পিতার ইচ্ছা বুঝিয়া চলাই ইচ্ছা পালনের মূল কথা। এখানে ভাবের ভাবুক হইতে হয়—অনুগত হইতে হয়। ভক্তি বিশ্বাসই এ পথে একমাত্র সহায় কিন্তু তাহাতে স্বাধীনতার খর্ব্ব হয় না, কেন না, শুভ ইচ্ছার অধীনতাই স্বেচ্ছাচারনাশক এবং মঙ্গলদায়ক। ভগবানের ইচ্ছা পালন না করিলে কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের ইচ্ছা বুঝা যাইবে কি রূপে ? উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার উপায় তিনি নিজেই করিয়াছেন নচেৎ আমরা কোনো দিন তাহা বুঝিতে পারিতাম না। প্রত্যেকের অন্তরে তিনি বিবেক বলিয়া একটি উচ্চ বৃত্তি দিয়াছেন। এই বিবেক দ্বারাই তাঁহার ইচ্ছা বুঝা যায়। যদি বল, বিবেক সকলের তো সমান নহে ? একথা আপাতত সত্য বলিয়া বোধ হইলেও দেশ কাল শিক্ষাদি ভেদে বিবেকের কতকগুলি বাহ্য সংস্কারের ভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে ভেদ নাই ; এমন কি অতি অসভ্য মানবের মধ্যেও আচারব্যবহার এবং সংস্কারগত অনেক কুসংস্কার সত্ত্বেও বিবেকের প্রকাশ দেখা যায়। বিবেক প্রকাশের আর একটি লক্ষণ এই যে,

যেমন বারিধারা পতিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ মেঘের সঞ্চার, তেমন পাপাসক্ত হৃদয়ে পাপবোধ এবং অনুতাপের উদয় হইলেই ভক্তি-ধারা এবং বিবেকচন্দ্রের উদয় হয়। কিন্তু সর্ব্বথা সহজ জ্ঞানেই সদসৎ জ্ঞানের আভাস লক্ষিত হয়। এবং ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষতার সঙ্গেই বিবেকেরও উচ্চ প্রকাশ হইয়া থাকে।

তৎপরে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যে সকল বিধি নিবদ্ধ আছে—যাহা সাধারণত লোকে মানিয়া চলিতে বাধ্য তাহার মধ্যেও কত ভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং মানুষ কেবল শাস্ত্র পড়িয়াই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা; তাঁহা অপেক্ষা অন্তরের বিবেক শ্রেষ্ঠ। নচেৎ বিধি পালন করিয়াও তেমন কোনো সার্থকতা নাই। মানুষ যত দিন অন্ধভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে ততদিন জ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্রার্থ যখন বিবেকের সঙ্গে ঐক্য হয় তখনই তাহা কল্যাণদায়ক হয়।

তারপর আর একটি গুরুতর কথা এই যে, প্রত্যাদিষ্ট মহাজনগণের দ্বারাও কোনো কোনো অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে যে সকল বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে,--যাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—একটি জ্ঞান কাণ্ড বা আধ্যাত্মিকতা, অপর কর্ম্মকাণ্ড বা কর্ত্তব্যপালন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনো কোনো সত্য অপরিবর্ত্তনীয়, আর দেশ কালের ভিতর দিয়া যে সকল সত্যের আংশিক ভাবে প্রকাশ হয় তাহা ক্রমোন্নতির নিয়মে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিবদ্ধ হয় তাহাও কালের নিয়মে কতক কতক অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সকল বিধির আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নূতন বিধি প্রকট হইলে পুরাতন বিধি তাহার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন বিধিই গ্রহণীয় হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ নূতন বিধিতে বিশ্বাস করিব কি রূপে? অতএব এখানেও একটি গুরুতর চিন্তা করিবার কথা আছে।

মানুষ স্বভাবত পুরাতনে অধিক শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী। "যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া হঠাৎ নূতনে বিশ্বাস করিব কি করিয়া" এই হইতেছে সাধারণ লোকের কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, পুরাতনই বা আমি বুঝিব কি প্রকারে, যদি বর্ত্তমানে কিছু না বুঝিয়া থাকি। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের যে সকল চরিত্র, যে সকল বিধিনিষেধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে কত অস্বাভাবিক আখ্যায়িকা জড়িত হইয়াছে, যদি আমি বর্ত্তমানে কোনো বিশেষ চরিত্র না দেখি তবে সেই পুরাতন শাস্ত্রের নষ্টকুষ্ঠী উদ্ধার করিতে কখনই পারিব না। তারপর বর্ত্তমানের অন্য চরিত্র বুঝিবার পূর্ব্বে আমারও অন্তত কিছু

সেইরূপ ভাব, সেইরূপ দৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। কেবল ভূতকালের বর্ণনা শুনিয়া প্রকৃত সত্য বুঝা যায় না। যখন নিজ জীবনের সঙ্গে, বর্ত্তমান আদর্শের এবং ভূতকালের শাস্ত্রের সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারি, তখনই প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে পারি। অতএব প্রাচীন বিধি যখন বর্ত্তমান বিধির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়, তখন ভূত কালের বিধিও বর্ত্তমান কালের উপযোগী হয়, তখনই তাহা আমাদের সহজবোধ্য এবং মঙ্গলদায়ক হয়।

সকল বিধিই বিবেকের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে,—অন্তরে সায় পাইতে হইবে, তবেই বিধি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধনার পথ প্রাপ্ত হইব।

সাধনের একটি মূল স্থত্র বিধিপালন। সাধন ভিন্ন কোনো বস্তু লাভ হয় না। বিদ্যা, ধন এবং ধর্ম্ম সকলই সাধন সাপেক্ষ। অতএব সাধন সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরে করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে ইহাই সত্য যে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। নচেৎ কেবল মুখের কাথায়, মত বা শুষ্ক-জ্ঞান দ্বারা কখনো ভগবচ্চরিত্র লাভ করা যায় না।

দাস—

শিশুর খাদ্য

আহারের দোষে শিশুদিগের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন প্রসূতিগণ একথা বুঝিয়াও বুঝেন না। বৃথা নাটক নভেল পড়িয়া সময় ক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা যদি এই সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়— শত শত সহস্র সহস্র শিশুর জীবন রক্ষা হয়।

মাতৃস্তন্যই নবজাত শিশুর প্রধান খাদ্য। ইহার আপেক্ষিক ভার ১০৩০ এবং ইহার প্রতি শতভাগে ৩-৪২ অংশ পনির, ৩-৩৩ অংশ তৈলপদার্থ, ৪০৫৫ অংশ শর্করা, ৫-২১ অংশ লবণ এবং ৮৮-৯০ অংশ জল বর্ত্তমান থাকে। সুস্থ মাতৃস্তন্যের আকার পাতলা, ঈষন্নীলাভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, মিষ্টাস্বাদ বিশিষ্ট এবং এক স্থানে অধিকক্ষণ রাখিলে অসংখ্য নবনীত-কণিকা সকল পৃথক হইয়া পড়ে। ইহা স্নিগ্ধকারক এবং পোষক। ইহা ব্যতীত ইহার মৃদুবিরেচণ গুণ আছে। শিশুর উদরের সঞ্চিত মল স্তন্য পানে নির্গত হয়।

আমাদের দেশের প্রসূতিগণ শিশু কাঁদিলেই তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা সুনিয়ম নহে। ক্ষুধা না পাইলেও অন্য কারণে শিশু কাঁদিতে পারে। অনেক সময় অনিয়মিত দুগ্ধ পানহেতু শিশুর পেট কামড়ায় ও তজ্জন্য সে কাঁদিতে থাকে। ক্ষুধার কান্নায় শিশু-স্বভাবের নিয়মানুসারে নিজের হাত দুই খানি মুখে দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পেট কামড়াইলে উহারা প্রায়ই কান্নার সময় পদদ্বয় পেটের দিকে গুটাইয়া আনিয়া ছুড়িতে আরম্ভ করে। জন্মাবধিই শিশুকে একটি নিয়মপূর্ব্বক স্তন্যদান অভ্যাস করানই ভাল। প্রথম হইতে তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দেওয়া আবশ্যক। ভোর ৪ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত এইরূপ ২ ঘণ্টা অন্তর স্তন্যপান করাইয়া অবশিষ্ট রাত্রি শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিবেন। প্রথম হইতে শিশু এই নিয়মে অভ্যস্থ হইলে রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়া প্রসূতির নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। চতুর্থ সপ্তাহ হইতে বিরাম কাল আরো বৃদ্ধি করিবেন। তখন ২॥ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দান করাই উচিত। এইরূপ নিয়ম দ্বিতীয় মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া তৃতীয় মাস হইতে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দানের ব্যবস্থা করিবেন। ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাম কাল একটু একটু বাড়াইতে থাকিবেন। নিয়মপূর্ব্বক স্তন্যদানে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কসের ৪ টি দাঁত বাদে যত দিন অপর দাঁত গুলি না উঠিবে তত দিন শিশুকে স্তন্যত্যাগ করান ভাল নহে। মাড়ীর সমস্ত দাঁত উঠিলে আর তাহাকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া অনুচিত।

মাতৃস্তন্যই শিশুর ঈশ্বরদত্ত খাদ্য হইলেও অনেক সময় কেবলমাত্র উহার উপর নির্ভর করিয়া শিশুকে রাখা যায় না। মাতার স্তনে দুগ্ধের অল্পতা, মাতার শারীরিক পীড়া বশত স্তন-দুগ্ধের বিকৃতাবস্থা, অথবা মাতার মৃত্যু ঘটিলে কাজে কাজেই শিশুকে অন্য দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এমত ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ধনবানেরা দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং মধ্যবিত্ত বা গরীব লোকেরা শিশুকে গোদুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর বয়সের সহিত ধাত্রীর নিজ শিশুর বয়সের অধিক পার্থক্য থাকা ভাল নহে; উভয়ের বয়স তুল্য হইলেই ভাল হয়। ধাত্রীর নিজের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া চাই। উপদংশ, যক্ষা, কাস, অতিসার বা উদরাময়াদি পীড়াগ্রস্তার স্তন্য পানে শিশুর ঐ সকল রোগ জন্মাইতে পারে। পেট রোগা মাতার সন্তান প্রায়ই পেটরোগা হইয়া থাকে, ইহা

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। ধাত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ও নানাবিধ পুষ্টিকর অথচ লঘুপথ্য খাইতে দিবেন। স্তন্যদাত্রীর আহারের দোষগুণে অনেক সময় শিশুর রোগ জন্মে, অথবা শিশু নিরাময় হয়। অতিরিক্ত অম্ল খাইয়া শিশুকে স্তন্য পান করাইলে শিশুর পেট কামড়ায়। অপরপক্ষে মৌরী খাইয়া স্তন্যপান করাইলে শিশুর পরিপাকবিকার ও কাসি আরোগ্য হয়। স্তন্যদাত্রীর মনের সহিত স্তনদুগ্ধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কোন কারণে ক্রোধ, শোক, দুঃখ বা ভয় উপস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্তনদুগ্ধও দূষিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সকল স্থলে উক্ত দুগ্ধ শিশুকে তখন পান করিতে না দেওয়াই বিধেয়। এতদ্দেশের প্রসূতিগণ এক দিকে ঝগড়া করিতেছেন, অপর দিকে শিশুকে স্তন্য পান করাইতেছেন, এ ঘটনা বিরল নহে। এইরূপ অজ্ঞতার ফলে যে কত শিশু অকালে জীবন ত্যাগ করে বা জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের তিন চারিটি শিশু সন্তান একই বয়সে আমাতিসার রোগে মারা পড়ে। উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী অত্যন্ত কলহরতা ছিলেন। আমার এখনও বিশ্বাস আছে যে, উক্ত কলহরতা স্ত্রীর দূষিত স্তন্যই শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর অবধারিত কারণ।

গোদুগ্ধ মাতৃস্তন্য অপেক্ষা গুরুপাক। শিশুকে খাঁটি গোদুগ্ধ পান করানো কোন ক্রমে উচিত নহে। শিশুর পাকস্থলীতে উহা কখনই সহ্য হয় না।

শিশু জন্মাইবার পর দশ দিনের মধ্যে তাহাকে গোদুগ্ধ দিতে হইলে এক ভাগ দুগ্ধে দুই ভাগ গরম জল ও অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবেন। ঐ দশ দিনের পর ৫ মাস পর্য্যন্ত সম পরিমাণ দুগ্ধ ও গরম জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়ানই ব্যবস্থা। গোদুগ্ধে মাতৃস্তন্য অপেক্ষা পনিরাংশ কিছু অধিক থাকে কিন্তু আবার শর্করার অংশ কিছু কম থাকে, এজন্য যখনই শিশুকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইবেন তখনই উহাতে অল্প চিনি যোগ করিতে ভুলিবেন না। আমাদের দেশী চিনি না দিয়া সুগার অব্ মিল্ক বা দুগ্ধ শর্করা ব্যবহার করাই ভাল। *শিশুর বয়স ৬ মাস হইলে উহাকে খাঁটী দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।* এ স্থলে বলা নিতান্ত প্রয়োজন যে যখনই শিশুকে জলমিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইবেন, তখনই উহা অল্প গরম করিয়া লইবেন। অতিরিক্ত জ্বাল দিবার আবশ্যক নাই। যে সকল শিশুর পেটের দোষ থাকে তাহাদের দুগ্ধে জলের পরিবর্ত্তে তরল বার্লির জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উত্তম। বাসি বা ঠাণ্ডা দুগ্ধ শিশুকে কখনো খাইতে দিবেন না। ইহাতে শিশুর উদরাময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের জিহ্বার উপর এক প্রকার পুরু শ্বেতবর্ণ ছাতা পড়ে। কখন কখন ঐ ছাতা উঠিয়া গিয়া ক্ষত বাহির হয়। প্রতিবার দুগ্ধ খাওয়াইবার পর এক চামচ শীতল জল খাওয়াইলে আর ঐরূপ ছাতা জন্মাইতে পারে না। দুগ্ধ পান শেষ হইলে শিশুকে অল্পক্ষণ বসাইয়া রাখা ভাল। ইহাতে শিশুর উদরে যে অল্পাধিক বায়ু থাকে তাহা উদ্গারের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। ঐ বায়ু বাহির না হইলে কখন কখন শিশুর পেট কামড়ায় ও পেট ফাঁপিয়া উঠে। প্রতিবারে কোন্ বয়সের শিশুর পক্ষে কি পরিমাণ দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে তাহার মাত্রা ঠিক করিয়া দেওয়া অসম্ভব। প্রসূতি শিশুর শক্তি অনুসারে তাহা স্থির করিয়া লইবেন। অধিক খাওয়া হইলেই শিশুর পাকস্থলী তৎক্ষণাৎ প্রসূতিকে উহা জানাইয়া দেয়; শিশু তখন দুধ তুলিয়া ফেলে। পীড়াগ্রস্তা মাতার স্তন্য পানে যেমন শিশুর রোগ জন্মে পীড়িতা গাভীর দুগ্ধ পানেও সেইরূপ শিশুর নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যে গাভীর দুগ্ধ শিশু পান করিবে তাহার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তদ্বিষয়ে গৃহস্থ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। কলিকাতা বা অপরাপর বড় বড় সহরে যে দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহার দোষবহুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহরে যকৃত পীড়ায় শিশুর মৃত্যুর হার যে এত বাড়িতেছে, দূষিত দুগ্ধ পানই তাহার প্রধান কারণ। আজ কাল অনেক বাড়ীতে শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য ফিডিং বোতল (Feeding bottle.) ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রতিবার ব্যবহারের পর ঐ বোতলের ভিতরের সমস্ত অংশ উত্তম রূপে ধৌত করা উচিত। নতুবা উহার মধ্যে বাসি দুগ্ধ পচিয়া থাকে। ঐ পচা দুগ্ধের অংশ কোন প্রকারে শিশুর উদরস্থ হইলে মারাত্মক উদরাময়াদি পীড়া জন্মাইতে পারে। শিশুকে দুগ্ধ খাইবার জন্য যে সকল বাসন ব্যবহৃত হইবে উহা পরিষ্কৃত হওয়া চাই। গামছা বা অন্য কোন ময়লা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উহা মুছিবেন না। মোট কথা যাহাতে কোন ক্রমে শিশুর খাদ্য দূষিত না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

এক বৎসর বয়স হইলেই শিশুকে ভাত খাইতে দিবেন। শিশু ভাত খাইতে শিখিলে তাহার নখ যাহাতে সর্ব্বদা ছোট থাকে এবং সে যাহাতে হাত ধুইয়া আহার করে তদ্বিষয়ে মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর নখ বড় থাকিলে উহার মধ্যে নানা প্রকার ময়লা মাটি প্রবেশ করে এবং ঐ ময়লা মাটি খাদ্য দ্রব্যের সহিত শিশুর উদরস্থ হইয়া সমূহ বিপদ ঘটাইতে পারে।

ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। (গোবরডাঙ্গা)

সরমা

একদিন মধ্যাহ্নে আমি, সাহেব ও একজন মগ, এই তিন জনে মিলিয়া শীকারে বহির্গত হইলাম। আমরা অরণ্যের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিলাম। সকলের নিকট এক একটি (Bugle) ভেরি রহিল। যদি কেহ বন-মধ্যে হারাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা বাজাইয়া সঙ্কেত করিবে।

আমরা সেই শান্ত নীরব ছায়াবহুল অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড মহিষ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছে। সাহেব বলিলেন—"উহাকে শীকার করিতে হইবে।" উহাকে শীকার করা আমার বড় সহজ বোধ হইল না। অত বড় মহিষ আমি কখনো দেখি নাই। উহা একটা প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায়।

মহিষটা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সাহেব পশ্চাৎ হইতে গুলি করিলেন, সম্মুখে আমি ও পার্শ্বে মিকাউ (মগশিকারী)। আহত মহিষটা পুচ্ছ ঊর্দ্ধে তুলিয়া, কান খাড়া করিয়া একটা ভয়ানক রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে ছিল, দেহ হইতে রুধির গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি দুইটা গুলি মারিলাম, মিকাউ একটি মারিল। আর পারিলাম না। মহিষটা নিকটে আসিয়া পড়িল। আমি প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিলাম। ঘোড়াটাও বিপদ বুঝিয়া প্রাণের দায়ে ছুটিতে লাগিল। সাহেব ও মিকাউ কোথায় পড়িয়া রহিল। আমি প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম, যে খানে যাইয়া ঘোড়াটি আটক পড়িবে, সেই খানেই আমাদের উভয়ের যে কি দশা হইবে তাহা একবার চকিতে ভাবিয়া লইলাম; প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অন্য উপায় না দেখিয়া ঘোড়াটাকে কশাঘাত করিলাম। সে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। অদূরে একটা ছোট পাহাড় দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম পাহাড়টা আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃত্যুর কালো ছায়া সম্মুখে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। মৃত্যু স্থির নিশ্চয়, তবে "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" আমি ঘোড়াটাকে আবার কশাঘাত করিলাম—বেচারা বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

তাহার মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ চারিদিকে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়াটা পাহাড়ের নিকটে অন্ধকার দেখিল। সে তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি পাহাড়ের গায়ে ঢালিয়া দিল। আমি নিরূপায়! পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি-ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ মহিষটা তাহার প্রকাণ্ড শৃঙ্গ দুটি উর্দ্ধে তুলিয়া ভীমবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার ঘন নিশ্বাসের শব্দগুলি আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমাদের ব্যবধান ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল—আমি ঘোড়াটিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু হায়! সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ঘোড়াটা এক পদও অগ্রসর হইল না, ক্রমান্বয়ে হাঁপাইতে লাগিল। দেখিলাম মহিষটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে—ব্যবধান সামান্য কয়েক গজ মাত্র। বুঝিলাম মরণের দূত জীবনের দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছে। আমি সভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লইলাম। অনুমানে বুঝিলাম, মহিষটা আমার নিকটে আসিয়াছে; আর এক মুহূর্ত্ত! কিন্তু সে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই একটা বিকট চিৎকার করিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল। চাহিয়া দেখি একটা প্রকাণ্ড বল্লম তাহার মস্তক ভেদ করিয়া মাটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। মহিষটা যন্ত্রনায় ছটফট্ করিতেছে, স্থানটা রক্তে প্লাবিত হইতেছে।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এদিক ওদিক চারিদিক দেখিতে লাগিলাম—আমার এ দয়াময় দীনবন্ধু কে? পৃষ্ঠদেশে বল্লম বাঁধা, হস্তে ধনুর্ব্বাণশোভিতা এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। দেখিলাম সেই দেবী দক্ষিণ পদ মহিষমুণ্ডে রাখিয়া সবলে বল্লমটি তুলিয়া লইতেছেন। বোধ হইল—বোধ হইল কি স্পষ্ট দেখিলাম যেন মা আমার মহিষমর্দ্দিনীরূপে দণ্ডায়মান। তাঁহার পদভরে যেন ধরণী টলটলায়মান।

এই জনহীন বিজন অরণ্য-প্রান্তরে—কে এ দেবী,—কোথা হইতে আজ আমার প্রাণ রক্ষা করিতে আসিলেন! কৃতজ্ঞতায় সমস্ত হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া উঠিল—দুটি নয়ন হইতে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল!

আমি অনতিবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই দয়াময়ী দেবীর

সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অসুরদলনী ইত্যাদি বলিয়া দুর্গার স্তব পাঠ করিলাম।

দেবী আমায় অভয় দিয়া, হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া লইলেন—তাঁহার মোহন স্পর্শে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল; যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আমার দেহের ভিতর সঞ্চারিত হইল! আমি পুলকবিহ্বল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম—কী তেজপূর্ণ সে নয়নের জ্যোতি! কী সরল সুন্দর স্নেহসিক্ত মুখ খানি তাঁহার! তিনি আমাকে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি এই বিজন বনে—একা আসিয়াছ কেন?" আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে বলিলাম,—"আমি ইংরাজের দাস—আমি অর্থের লোভে, পেটের দায়ে এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি আমার প্রভুকে খুসী করিবার জন্য আমার জীবন পর্য্যন্ত দিতে বসিয়াছিলাম—আপনি না থাকিলে এই মহিষ-শৃঙ্গে আমি ও আমার ঘোড়াটির প্রাণান্ত হইত। আপনি আমার প্রাণদাত্রী আমার মাতৃস্বরূপা আপনার দয়া আমি কখনো ভুলিব না।"

দেবী আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"ভয় নাই বৎস—তুমি আমার পুত্রস্থানীয়; আমি তোমায় অসহায় অবস্থায় দেখিয়া মহিষটাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি প্রাণে বাঁচিয়াছ। তুমি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ আমিও তোমাকে সন্তান ভাবিয়া এই কয়টি প্রস্তর দিতেছি, ইহা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাও, ইহাতেই তোমার জীবন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে।" এই বলিয়া সেই দেবী আমার হস্তে সাত খানি বহুমূল্য প্রস্তর দিলেন—আমি উহা যত্নের সহিত কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলাম।

অদূরে ঘন ঘন ভেরী ধ্বনি হইতে লাগিল—বুঝিলাম সাহেব ও মিকাউ আমাকে খুঁজিতেছে, আমার হস্তের ভেরী হস্তেই রহিল বাজাইতে ইচ্ছা হইল না—ইচ্ছা হইল সেই দয়াময়ী মায়ের নিকট থাকিয়া দিন কতক তাঁহার পদ-সেবা করি। কিন্তু হায়, আমার সে আশা সফল হইল না।

সাহেব ও মিকাউ ভেরী বাজাইতে বাজাইতে যে স্থানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম উহার কিঞ্চিৎ দূরে, আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব তফাৎ হইতে মহিষটার মৃতদেহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া টুপিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে "হিপ, হিপ, হুররে" শব্দে বনভূমি কাঁপাইতে লাগিলেন। পরক্ষণেই সাহেব ধনুর্ব্বাণ বল্লম শোভিতা এক বন্য রমণীর নিকট আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ধরিলেন। রমণীও সাহেবের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া বল্লম উঠাইলেন। আমি বেগতিক

দেখিয়া চকিতে উহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বন্দুক নামাইলেন রমণীও বল্লমটি যথাস্থলে রাখিয়া দিলেন।

সাহেব আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"ব্যাপার কি?" আমি সংক্ষেপে সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। সাহেব বলিলেন—"আমি ভাবিয়া ছিলাম তুমিই মহিষটা মারিয়াছ আর এই বন্য রমণী তোমাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে—সেই জন্য আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহাই পাইয়াছি! ঐ রমণীকে ধরিতে হইবে।"

আমি করুণস্বরে বলিলাম—"আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি উঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছি।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে অকর্ম্মণ্য ভীরু বাঙালী বলিয়া তিরস্কার করিয়া নিজে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু রমণীকে ধরিতে পারিলেন না—তিনি নিমেষ মধ্যে তাঁহার চির পরিচিত বন-পথে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিলেন।

সাহেব রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে বলিলেন—"আজ উহাদের আড্ডা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সাহেব মিকাউকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন—আমি ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চাতে চলিলাম। প্রায় এক মাইল আসিয়া সাহেব পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি কুটীর দেখিয়া দূর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। সহসা কতকগুলি বন্য স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিল। সাহেব গতিক ভালো নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ব্যথিতমনে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় কিন্তু মৃত মহিষের মুণ্ডটা কাটিয়া আনিতে ভুলিলেন না।

প্রতিশোধ লইবার মানসে পরদিন বেলা দশটার সময় সাহেব ৫০।৬০ জন কুলি মজুর ডিনামাইট্ বন্দুক ইত্যাদি লইয়া সদর্পে সেই নিরীহ বন্য জাতির উচ্ছেদ সাধন করিতে বহির্গত হইলেন—আমি সাহেবের চাকর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে বাধ্য হইলাম।

বন্য জাতির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাহেব দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলেন পাহাড়ের উপর কয়েক জন লোক বিচরণ করিতেছে। সাহেব উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন, এবং কুলিদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ

পরেই দুই চারিটি তীর আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, সাহেবের আদেশে আমরা সকলেই পাহাড়ের যে দিক হইতে তীর আসিতেছিল সেই দিকে গুলি ছুঁড়িতে লাগিলাম। ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দিকে তীর আসিতে লাগিল। কুলিরা প্রমাদ গণিল—ভয় পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। তিন চারিটি কুলি বাণবিদ্ধ হইয়া আমাদের সম্মুখে ধরাশায়ী হইল। সাহেব বেগতিক দেখিয়া বীরের ন্যায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। কাজেই আমরাও তাঁহার পথানুসরণ করিয়া সুখী হইলাম। তাঁবুতে আসিয়া আমরা এই যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেখিলাম চারিটি কুলি হত ও দুইটি আহত হইয়াছে। সাহেব তৎক্ষণাৎ হেড্ কোয়ার্টারে এই যুদ্ধের বিবরণ টেলিগ্রাম করিলেন যথা—

"আজ এক দল বন্য জাতি অস্ত্র সস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আমাদের রসদ লুট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁবু আক্রমণ করিয়াছিল। উহাদের সহিত তিন ঘণ্টা কাল আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই যুদ্ধে আমাদের চারিজন হত ও দুই জন আহত হইয়াছে। শত্রু পক্ষে বহুতর হতাহত হইয়াছে, অবশিষ্ট লোক পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমাদের অপর কিছু ক্ষতি হয় নাই। আমাদের কাজ বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে। আমরা আজ এখান হইতে তাঁবু উঠাইলাম।"

আর অধিক কি লিখিব, এখন এইভাবে আমার কাজ কর্ম্ম চলিতেছে। ম্যান্‌ডেলে হইতে কখনো কখনো উপযুক্ত প্রহরীবেষ্টিত হইয়া ডাক আসে ও যায়; আমি সেই ডাকে এই চিঠি পাঠাইলাম। তুমি আর আমাকে এখন পত্রাদি লিখিয়ো না, কারণ উহা যথাসময়ে পাইব না। তবে টেলিগ্রাম করিলে তৎক্ষণাৎ পাইব—কারণ ম্যান্‌ডেলে হইতে প্রত্যহ আমাদের সঙ্গে তারে খবর আদান প্রদান চলিতেছে। মাকে আমার প্রণাম জানাইয়ো ইতি।

তোমার

হরিপদ।

পুঃ

বাটীর কাহাকেও আমার এ চিঠি দেখাইয়ো না বা পড়িয়া শুনাইয়োনা, কারণ তাহা হইলে তাহারা আমার জন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন হইবে।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাব

অধুনা মানবসমাজের কল্যাণার্থে যত প্রকার উন্নতিকর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারই প্রধান। শিক্ষাকে প্রধান সহায় করিয়া আজ যে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে উন্নতির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে কতশত বর্ষের সঞ্চিত কুসংস্কার-আবর্জ্জনা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। জ্ঞানের যে প্রখর আলোক দিন দিন দিঙমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, তাহাতে বহুদিনের অজ্ঞানতা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছে। একমাত্র সুশিক্ষার প্রভাবেই যে মানবের সর্ব্ববিধ সুখপ্রাপ্তি হয়, একথা এখন আর অনেকের অবিদিত নহে। এই শিক্ষা কেবল পুরুষের নহে—শিক্ষা কেবল এক বিষয়ে নহে; সমুদয় বিশ্বের সকল নরনারীকেই বিবিধ বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে।

জীবন ধারণ এবং সংসার পালনের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে মানুষ সংসারে সুখশান্তি লাভ করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তিই যে, সকল বিষয়ে সম্যকরূপে পারদর্শী বা পণ্ডিত হইবেন, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু পণ্ডিত না হইলেও প্রত্যেককেই বহুবিধ বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিতেই হইবে—ইহাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি লক্ষ্য এই যে, স্ত্রীলোকেও পুরুষের ন্যায় নানাবিধবিষয়ের শিক্ষালাভ করিবেন। স্ত্রীপুরুষেয় সম্মিলনে যখন গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তখন স্ত্রীলোককে সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ মনে করা অসঙ্গত নহে। স্ত্রীলোক যখন সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ হইলেন, তখন তাঁহাকে যে বিষয়ে যতটুকু অজ্ঞ ও হীন করিয়া রাখিবে, সমাজও তদ্বিষয়ে সেই পরিমাণে হীন হইয়া থাকিবে,—ইহা অতি সত্য, স্বতঃসিদ্ধ কথা। স্ত্রীলোককে বর্জ্জন করিলে যেমন সমাজ থাকিতে পারে না, তেমনই স্ত্রীলোককে শিক্ষা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে সমাজ কখনই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। ইহা বিধাতার অভিশাপ নহে, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফল। অতএব, দেখা যায়, যে সমাজ স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে যতখানি অধিকার দিয়াছে, সেই সমাজ তত অধিক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

আমেরিকা ও ইয়ুরোপ এক্ষণে বহুবিধ বিষয়ে অনেকের আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে; তথাকার স্ত্রীলোকেরা সর্ব্ববিষয়ে কিরূপ শিক্ষা ও অধিকার লাভ

করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মহিলারা পুরুষের সমকক্ষভাবে সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করিতেছেন। বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা ব্রতী আছেনই, এক্ষণে আবার ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রণক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এদিকে জাপানও এক্ষণে স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিষয়ে অল্প মনোযোগী নহে। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা পদ্ধতির গুণে তথাকার প্রত্যেক বালিকাকেও ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে যাইতেই হইবে। স্ত্রীশিক্ষার এতাদৃশ সমাদর যে, জাপানের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কারণ একথা কে অস্বীকার করিবে? জাপানে এখন স্ত্রীশিক্ষার এতদূর প্রসার যে, কেবলমহিলা-দিগের জন্যই সেখানে একটিস্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহামনীষী অধ্যাপক জিন-যো-নারুসি জাপানে সর্ব্বপ্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষিতসমাজে চিরস্মরনীয় হইয়াছেন। আর আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবাসী ব্রহ্মদেশের কথা বলি। যদিও ব্রহ্মদেশ আমাদের আদর্শ নহে; তথাপি স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও অধিকার বিষয়ে ব্রহ্মদেশ আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক উদার! ব্রহ্মদেশেরও প্রত্যেক বালিকা শিক্ষার্থে গুরুর নিকট গমন করে। ব্রহ্মদেশের দরিদ্র কৃষককন্যাও লিখিতে পড়িতে ও দ্রব্যাদির মূল্য অঙ্কদ্বারা নিরূপণ করিতে পারে। আর আমাদের জ্ঞানধর্ম্ম সমুন্নত অতীত-গৌরব বিভুষিতা দেশের অনেক মহিলা এক্ষণে কালদোষে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিতা হইয়া সংসার ও সমাজের নিম্নস্তরে অধিষ্ঠিতা হইয়া অতি দীন ও হীনভাবে জীবন কাটাইতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল তাহাতে হয়ত অনেকের মনে হইতে পারে যে, এ সকল ত বিদেশের কথা। এরূপ বিদেশীয়ভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা ও অধিকার দান এদেশে কখনও ছিল না; এখন আমাদের সমাজের মহিলাগণের এরূপ শিক্ষাদীক্ষায় সংসারে কোনওরূপ সুখশান্তি না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানাবিধ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে।

স্ত্রীজাতির শিক্ষার সম্বন্ধে ভারতের কি প্রকার ব্যবস্থা ছিল এখন তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি। সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক যুগে ভারতে অনেক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। মুনি ঋষিগণ যেমন সাংসারিক বহুবিধ কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রপ্রণয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের বিদুষী পত্নীগণও সেইরূপ রন্ধনাদি নানাবিধ

গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়াও স্বামীর সহযোগিনী হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে যেমন স্ত্রীজাতি অনেক প্রকার অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, বৈদিক যুগের মহিলাদিগের এরূপ অনেক বিষয়ে অনধিকার ছিল না। এক্ষণে যে বেদপাঠ শ্রবণেও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, সেই বেদ-শাস্ত্রের অনেক মন্ত্র তৎকালে কোনও কোনও স্ত্রীলোকের দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, জগতের অনেক আধুনিক উন্নত দেশ যখন অশিক্ষা ও অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে হীন অবস্থায় পতিত ছিল, সেই আদিকালেও অনেক ভারতমহিলা জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে ভারত ভূমিউজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। এখনকার ন্যায় সে সময়ের লোকের অন্তরে আত্মযশঃ প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই জীবনের কথা আমরা জানিতে পারি না। তবে যেসকল বিদুষী মহিলা জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিশেষরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এস্থলে আমরা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিতেছি ইনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম পত্নী। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহার উভয় পত্নীকে বিভাগ করিয়া দিতে চাহিলে, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণা বিদুষী মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই সকল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া কি আমি অমর হইতে পারিব ?" ইহার উত্তরে যখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "না তাহা হইবে না।" তখন আত্মদর্শিনী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন 'যাহা লইয়া আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?' বেদের শিরোভাগ উপনিষদের যে মহাভাব এবং শ্রেষ্ঠশিক্ষা এখনকার পণ্ডিতগণেরও দুরায়ত্ত সেই সার মন্ত্র "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" সর্ব্বপ্রথমে ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। জগতে এমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীব্যক্তি কয়জন আছেন যিনি জ্ঞানবতী মৈত্রেয়ীর ন্যায় দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" আজি যে ভারতে শত শত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক পুরুষ ভক্তিভরে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করেন "অসতো মা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা'মৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" অর্থাৎ 'অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতি স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা

আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাও সর্ব্বপ্রথমে সাধ্বী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল। বিদুষী মৈত্রেয়ীর উচ্চারিত বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া এক্ষণে কত কত পণ্ডিত নিজের উপাস্য দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতে-ছেন। কি সার্ব্বজনীন প্রার্থনা মৈত্রেয়ীর হৃদয় হইতে প্রথম উত্থিত হইয়াছিল যাহা কত শত বৎসর ধরিয়া বিশ্বের কত শত সহস্র নরনারী আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সহায় জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইহাকেই বলে যথার্থ বেদমন্ত্র।

বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগেও স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার অপ্রতিহত ছিল। পরে চৈতন্যদেবের সময়েও এই গতি একেবারে রুদ্ধ হয় নাই। গার্গী, দেবহুতী, খনা, লীলাবতী, মীরাবাই, জৈবুন্নেসা, রামমণি, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি বিদুষিগণের নাম স্মরণ করিয়া আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, বৈদিক যুগ হইতে বৈষ্ণব যুগ পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার একটি অবাধ গতি আমাদের দেশে প্রবাহিত ছিল। পরে নানারূপ সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া এই গতি একেবারে রুদ্ধপ্রায় হয় এবং তদবধি স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও অধিকার বিষয়ে এবম্বিধ সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল।

প্রত্যাবর্ত্তন (৭)

বোধ হয় আমি পূর্ব্বেও কোনো স্থানে বলিয়াছি যে, অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে অন্যায় বা নিষিদ্ধ নহে,কিন্তু বিধাতা আমাকে বিষয়-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটি বিশেষ কার্য্য-ভার দিয়াছেন। তাঁহার কথা বলা এবং তাঁহার দিকে মানুষকে ডাকা এইটিই আমার বিশেষ কার্য্য। সমগ্র মন প্রাণ দিয়া এই কার্য্য-সাধন করাই আমার পক্ষে তাঁহার আদেশ। এ কথা আমি জীবনের পরিবর্ত্তনের প্রাক্‌কালে বুঝিয়াও, মধ্যে জীবন-সংগ্রামে স্থির থাকিতে না পারিয়া ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে কিছুকাল কলিকাতায় নন্দরাম সেনের গলিতে থাকিয়া আর একটি বন্ধুর সহযোগে কিছু ব্যবসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই অবস্থায় ১৩০২ এবং ১৩০৩ সালে পশ্চিম অঞ্চলের ওরেরা নামক স্থানে ঘৃত খরিদ-উপলক্ষে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তখনো জীবনের সেই স্বভাবসিদ্ধ কাজ ভুলিতে

পারি নাই। এখানেও ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া ২।৪টি স্থানীয় লোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা জন্মে। তন্মধ্যে ঈশ্বরীপ্রসাদ নামক একটি যুবকের সহিত আমার অত্যন্ত ভালোবাসা হইয়াছিল। সেই স্থান ত্যাগের পর এই দীর্ঘ কালেও আমি তাহাকে ভুলি নাই। সুতরাং এই চল্‌তি পথে একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে অবশ্য উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হইব এবং ইহা আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি ফাফুণ্ড ষ্টেশনে নামিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাকের এক্কা গাড়িতে ওরেয়াঁ মোকামে গিয়া ঈশ্বরীকে পাইলাম। কিন্তু সাংসারিক নানাবিধ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়িয়া তাহার শরীর মন ভাঙিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। ঈশ্বরীপ্রসাদ আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল এবং যথাসাধ্য আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিল। আমি সেখানে একদিন মাত্র থাকিয়া পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় অযোধ্যাপ্রসাদ নামক আর একটি মহাজন বন্ধু—যিনি আমার কাজের আড়দার ছিলেন, আমাকে পাথেয়স্বরূপ একটি টাকা প্রদান করেন। রাত্রে আমি তাঁহারই নিকটে ছিলাম। ওরেয়াঁ হইতে ফাফুণ্ড ষ্টেশন ৭ মাইল ব্যবধান। টাইম্ টেব্‌ল্ ও ঘড়ী দেখিয়া চলিয়া আসিয়াও ৯-৩০ টার ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না। এখন কি করি ভাবিতেছি, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত অতর্কিতভাবে আলাপে প্রকাশ পাইল, তিনি কাণপুরের বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের আত্মীয়। আমি কাণপুর মহেন্দ্র বাবুর বাসায় যাইতে ট্রেণ ফেল করিলাম শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "সেই রাত্রি ৪টা ভিন্ন আপনি এখান হইতে আর কোনো ট্রেণ পাইবেন না,—আপনি আজ আমার বাসায় আহারাদি করিবেন।"

আমি এখানে এতটা সময় যেন স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। অতঃপর রাত্রি ৪ টার সময় ট্রেণে উঠিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ প্রাতে কাণপুর পৌঁছিলাম। এখানে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার সিবিল মিলিটারী হোটেলের অংশীদার, আমি তাঁহার বাসায় সমস্ত দিন থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় একত্রে উপাসনাদি করিলাম। তিনি আমাকে লইয়া আরো কয়েকটি ভদ্র লোকের বাসায় বেড়াইয়া আসিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক গুঢ় কথা বলিলেন। এখানে অনেক কল কারখানা আছে, বাহির হইতে তাহার ২।১টা দেখিলাম মাত্র। এই দিন রাত্রি ১ টার ট্রেণে উঠিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় মহেন্দ্র বাবু ট্রেণ ভাড়ার জন্য আমাকে একটি টাকা প্রদান করেন।

২৭ শে অগ্রহায়ণ প্রাতে এলাহাবাদ আসিয়া প্রথমেই প্রয়াগ-ঘাট চলিয়া গেলাম—যেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল। গঙ্গার উচ্চ তটভূমি হইতে সম্মুখে মুক্ত স্থানের দৃশ্যটি বেশ বোধ হইল। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারার কথা পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে গঙ্গার সাদা জল এবং যমুনার কালো জল,এই দুই ধারাই দেখা গেল। যাহাহউক এখানে স্নানাদি করিয়া এক ছত্রে আহারান্তে একটি ঘাটের উপর আসিয়া বসিলাম। জনৈক পরমহংসের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বল্লেন,—"আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা করা হইতেছে—কি উপায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু শান্তদিগকে সমবেতভাবে জনহিতকর কাজে নিয়োগ করানো যায়।"

তৎপরে অপরাহ্নে এলাহাবাদ সহরে আসিয়া বাবু রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের বাসায় উঠিলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ইন্দুবাবুর সঙ্গে আলাপ হইল; তিনি বলিলেন,—"সমাজে দুই দিন উৎসব আছে আপনি থাকিয়া যান।" আমি এই কথায় সম্মত হইয়া রামানন্দ বাবুর বাড়িতেই রহিলাম। উৎসবের মধ্যে গান গাহিবার কতকটা ভার আমাকে দেওয়া হইল, কিন্তু প্রথম দিনের আমার প্রথম গানের কোনো একটা শব্দ, কাহারো কাহারো মতে আপত্তিজনক হওয়ায় আর আমার তেমন করিয়া গান গাওয়া হইল না।

তারপর এখানে যে ২।৩ দিন রহিলাম তাহাতে চিত্তের অবস্থা ভালো রহিল না। এখান হইতে আর একবার কাশী হইয়া যাওয়াই আমার ইচ্ছা। ট্রেণ ভাড়া প্রায় সমস্তেরই অভাব, এখানে কাহারো নিকট অভাব জানাইবার একেবারে বাধা বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং এখান হইতে কিরূপে যাইব—এইরূপ একটা ভাবনা আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কাজেই যে দুই দিন এখানে রহিলাম তাহা কষ্টে স্পষ্টেই কাটিল। অনেক চেষ্টা করিয়া অপর ২।৩ জনের নিকট অতি অল্পই সংগৃহীত হইল। তখন হঠাৎ মনে কেমন একটা ভাব আসিল,—একেবারে যাত্রা করিয়া সহর ছাড়িয়া ষ্টেশনে চলিয়া আসিলাম। তখনো ট্রেণ ছাড়িবার এক ঘণ্টার বেশী সময় আছে।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া আমার মনে কেমন একটা ভাব আসিল,—তাঁহাকে বলিলাম,—"আমি কাশী পর্য্যন্ত যাইতে চাই,আমার ॥৵১৫ ভাড়ার অকুলান আছে।" ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিলেন। আমি এই ঘটনায় আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমার আর একটা নূতন বল আসিল।

কাশীতে যখন আসিলাম, তখন রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গিয়াছে। পুনরায় কাশী পর্য্যন্ত আসার প্রথম কারণ—ইহার অধিক ট্রেণ-ভাড়ার অভাব; দ্বিতীয় কারণ কৃষ্ণবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া।

ইতিপূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতায় বন্ধুবর প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট যাতায়াত করিতাম, তখন তথায় কৃষ্ণবন্ধু নামক একটি যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়; কৃষ্ণবন্ধু সংসারত্যাগী হইয়া কাশীতে বাবু ক্ষেত্রনাথ মল্লিকের অন্নপূর্ণা-মন্দিরে থাকেন। কিন্তু এখানে আসিয়া শুনিলাম—"তিনি আজো কলিকাতা হইতে আসেন নাই।" যাহা হউক আমি সে রাত্রে অন্নপূর্ণা-মন্দিরেই রহিলাম;

পরদিন শিবানী দেবীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আবার আমার গান শুনিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,—"যোগীন্দ্র, আমার ইচ্ছা ছিল, অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া তোমাকে খাওয়াই কিন্তু আজ আমার জ্বর বোধ হইয়াছে।" আমি বলিলাম,—"আপনি আর আমার জন্য কষ্ট করিবেন না।" তিনি আমাকে একটি টাকা প্রদান করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

৫ই পৌষ বেনারস হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর গাজীপুর শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু নৃত্যগোপাল রায় উকিল বাবুর বাড়ি আসিলাম। (ক্রমশ)

উদ্বোধন

মায়ের গৌরব হয়
যাত্রিগণ সব মহানন্দে ছুটে
মন্দির উৎসবময়।

কেহ আজ ঘরে থেকোনাকো দূরে
মহা নিমন্ত্রণ-বার্ত্তা ল'য়ে দ্বারে
বসন্তের বায়ু বয়।

জগত-জননী ডাকেন সন্তানে,
এস এস সবে মাতৃ-নিমন্ত্রণে,
পাপ তাপ সব দূরে তেয়াগিয়ে
মাতৃ-ক্রোড়ে এস সুনির্ম্মল হ'য়ে;
এস গো শান্তির ছায়।

ভব পান্থ-বাসে বিভুরে ভুলিয়ে,
মোহের আঁধারে পথ হারাইয়ে,
রিপু-পরতন্ত্রে আত্মহারা হ'য়ে,
শোক যাতনায় বিদগ্ধহৃদয়ে
শান্তি কোথারে হায়!

এস ভাই এস অন্ধ খঞ্জ জন,
দৈন্য-পীড়িত ব্যথিত-জীবন,
পাপ-ভারাক্রান্ত যে জন পতিত,
অনুতাপানলে যে জন পবিত,
পরিত্রাণ এই খানে।

নাহি তো এখানে ভেদাভেদ-জ্ঞান ;
নাহি তো এখানে জাতি-অভিমান ;
ধনী ও দরিদ্র সকলই সমান ;
দূরে ফেলে এস আমিত্বের মান,
এস হেথা বিভু গানে।

এস জগতের সাধক জীবন,
এস বিভুভক্ত সেবক সুজন,
এস কর্ম্মবীর এস ধর্ম্মশূর,
শিল্পী গুণী জ্ঞানী থেকোনাকো দূর,
বিষয়ী তোমারে বরি।

সর্ব্ব শেষে ডাকি তোমারে সন্ন্যাসী,
এস মাতৃভক্ত কারাগারবাসী,
দলিত লাঞ্ছিত ; অপমানরাশি
যতই বর্ষিবে তত মুখে হাসি
জগত-জননী স্মরি।

অন্যায় বন্ধনে আছ যোগাসনে,
আসিতে নারিলে মহা সম্মিলনে,
ভক্তদের সনে প্রেমোন্মত্ত গানে
পূজিতে নারিলে মাতৃ-আরাধনে ;
খেদে অশ্রু পড়ে ঝরি।

কিন্তু কারা হ'তে সুগম্ভীর স্বনে
মর্ম্মভেদী বাণী উঠিছে সঘনে ;—
"দেহ মোর বটে রয়েছে বন্ধনে,
আত্মা মোর আছে ভক্তদের সনে
মায়ের গৌরবে ভরি।"

সপ্ত স্বর্গ হ'তে এস মহাজন,
ব্রহ্ম-সেবক ঋষি রামমোহন,
শ্রীকেশবচন্দ্র, মহর্ষি সুজন,
বিভুভক্ত ঋষি রাজনারায়ণ,
এনেছ নামের তরী।

তোমাদের পুণ্য কাজে বঙ্গময়
নব যুগ আনে নবোৎসাহ হয় ;
এক জাতি বর্ণ এক ভগবান,
জাতীয় তরণী তুলেছে নিশান
সুপ্রভাতে সবে বরি।

খোল খোল দ্বার ওগো পূর্ব্বাসার,
পিককুল সবে দিতেছে ঝঙ্কার,
ত্রিভুবন আজ উৎসবময়,
স্বর্গের উৎসব ধরাতে উদয়
কি সুন্দর আহা মরি !

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

চারঘাটে কি দেখিলাম ?

গোবরডাঙ্গার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রায় ৪ মাইল দূরে চারঘাট গ্রাম অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ঠাকুরবার সাহেব ও হরিসাহা" সংক্রান্ত ঘটনার স্থল। ঐ সম্বন্ধে বিচিত্র জনশ্রুতি আছে। তাহার কিছু কিছু সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। এখনো উহার অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু সে বিষয় কিছু বলা আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে।

এ প্রদেশ সমুদ্র-গর্ভ হইতে বনভূমিতে পরিণত হইয়া কালক্রমে যে বাসভূমি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কুশদ্বীপে'সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ—বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর বসবাস। এ প্রদেশের ব্রহ্মোত্তর ভূমি সকল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও চারঘাটে ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ, ১০।১৫ ঘর কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণীর বাস ছিল। এক্ষণে ১০।১২ ঘর ব্রাহ্মণ, ১ ঘর কায়স্থ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বাস আছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি আমি এক দিন চারঘাটে গিয়া শ্রদ্ধেয় সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার বাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আনন্দে দিনযাপন করিয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসি। তথায় উপস্থিত হইয়াই আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল—মনশ্চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ এখানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার দুইটি দিক আছে ;—একটি বাহিরের দিক, অপর ভিতরের দিক। বাহ্যভাবে সকলেই দেখিয়া থাকেন—ডাক্তার সতীনাথ একজন চিকিৎসক—পল্লীগ্রামের ভিতর জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসা-কার্য্য করেন। এ অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট পসার ; ডাকিলে আসিয়া রোগী দেখেন—ভিজিট লন—কোথাও বা বিনা ভিজিটে দেখেন। নিজগ্রামে ভিজিট লন না। গরীবদিগকে বিনামূল্যে যথেষ্ট ঔষধাদি প্রদান করেন। অনেক লোক তাঁহার বাধ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমি ভিতরের দিক দিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম,—ভগবান্ তাঁহাকে এই পল্লীগ্রামের মধ্যে শত সহস্র লোকের জীবনের দায়ীত্ব দিয়া—তাহাদের সেবা করিবার জন্য তাঁহাকে পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহাকেই পাঠাইলেন কেন? এ কি তাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় নয়? এমন সেবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বিধাতা তাঁহাকে পুত্র কন্যা দেন নাই—যেন তিনি নিজের ২।১টি ক্ষুদ্র স্নেহাধারে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণমনা—স্বার্থপর না হন, কিন্তু উদার প্রেমে শত সহস্র লোকের পুত্র কন্যাকেই নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় ভালোবাসেন ও অকাতরে সেবা করেন। এটি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ ;—হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার প্রভুত্ব,—এ প্রভুত্ব কিসের জন্য? জন সাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য। তাই বলি, আহা! এখানে কি দেখিলাম! ভাষায় কি তাহার বর্ণনা হয়?

গ্রামের রাস্তা ঘাট ভালো না—অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত। গোবরডাঙ্গা পোষ্টাপিস হইতে প্রতিদিন ডাক-পীয়ন যায় আসে। একটিমাত্র পাঠশালা আছে। এখানে সাধারণের শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় হওয়া উচিত। দাস—

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

"কুশদহ" তে কতকগুলি মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বিধাতার বিধানে কুশদহ-বাসী,যাঁহাদের সহিত আমরা সুখ দুঃখে জড়িত তাঁহাদের শোকের দিনে নীরব থাকা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাই আমরা মধ্যে মধ্যে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য—এবারে উপর্য্যুপরি কয়েকটি মৃত্যু-সংবাদে আমাদের মনে বিচিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়াছে।

খাঁটুরা নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দত্ত গত ১১ ই মাঘ কয়েক দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে অসমাপ্ত বিষয় কর্ম্ম এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সন্ততিদিগকে ফেলিয়া তিনি সহসা চলিয়া গেলেন। অনেক সময় বিধাতার এরূপ লীলা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু না বুঝিয়াও অন্য উপায় নাই।

অনেকে হয় তো অবগত নহেন যে, আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু লক্ষ্মণচন্দ্র আশের জননী অদ্যাপি জীবিত ছিলেন; তিনিও গত ১৯ শে মাঘ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবত তাঁহার বয়স অশীতিপর হইয়াছিল। ইহাও বিধাতার এক বিচিত্র লীলা মনে হয়।

তৎপরে আর একটি বড়ই শোকাবহ বার্ত্তা প্রকাশ করিতে আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি,—বেড়গুম্ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথের গত অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয়। ২০শে পৌষ শুক্রবার, রাজা দেখিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ি যান, ২৪শে মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় জ্বর হয়, রাত্রি ১১ টায় সমস্ত শেষ, এ কী ঘটনা! এ অবস্থায় হৃদিস্থিত ভগবান্ ভিন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কে আর প্রবোধ দিবে?

অবশেষে আর একটি সংবাদ দিয়া এই শোক-কাহিনী শেষ করিতে চাই;— ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয়বন্ধু বাবু যোগেন্দ্রনাথ দত্তের একটি শিশু দৌহিত্রী

(শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ পালের কন্যা) হঠাৎ প্রবল জ্বররোগে দেহত্যাগ করে; তাহাতে ব্যথিত হইয়া যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার অগ্রজ পরম শ্রদ্ধেয় ভগবদ্ভক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়কে এক পত্র লেখেন। তিনি তদুত্তরে যে কয়েকটি সারগর্ভ অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—এই জন্য যে, শোকে দুঃখে জ্ঞানীজনের বাক্য কেমন মধুর এবং প্রাণপ্রদ।

"মৃত্যুতে হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, কোনো উচ্চ বিশ্বাস আশ্রয় করিতে না পারিলে চিত্ত বড় অস্থির ও ব্যাকুল হয়। পরীক্ষাতে বুঝিয়াছি, মৃত্যুতে যে কষ্ট তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই কষ্টের পর ভগবানের আশ্চর্য্য বিধি দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁ'র সকল রহস্যের ভিতরে গূঢ় মঙ্গল ভাব নিহিত আছে, যে শোকার্ত্ত হইয়া সেই মঙ্গল ব্যবস্থা বুঝিতে পারে সে দুঃখ পাইয়া আবার সুখী হয়। * * *—সংসারে দুঃখ সহ্য করিতে করিতে তাঁ'র শরণাপন্ন হইতে ও ক্রমে বিশ্বাসী হইতে পারিলেই তাঁ'র দুঃখ দেওয়ার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা লাভ করিয়া মনুষ্য, জীবনের সার বস্তু প্রাপ্ত হয়।"

রাণাঘাট—হবিবপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাধারমণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণ সিংহ সাড়ে চারি বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া কৃষি-বিদ্যায় যোগ্যতার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বর-কৃপায় গত ৩ রা ফেব্রুয়ারি (২০ শে মাঘ) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আমেরিকাতেই উচ্চ পদের চাকরী পাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশের কাজে আপনাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান তাঁহার সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

ইতিপূর্ব্বে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ঘৃতে সাপের চর্ব্বি পর্য্যন্ত মিশ্রিত হয়। এই সংবাদ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং অসম্ভাব্য বিবেচনায়, হাটখোলার প্রধান ঘৃত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং হুগলি কোর্টে এবং অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, এই সংবাদ ভিত্তিশূন্য ভ্রমাত্মক।—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে,—"কলিকাতার ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতি" শীঘ্র ভেজাল ঘৃতের প্রকৃত তথ্য সাধারণে প্রচার করিয়া ঘৃতের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন; কার্য্যটি মহৎ কিন্তু ইহাতে একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন।

কুশদহ

"দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।"

৩য় বর্ষ। চৈত্র, ১৩১৮ ১২শ সংখ্যা

বর্ষ-শেষ

বর্ষ গেল কি পেয়েছি করুণা-নিধান,
তোমার মঙ্গল কার্য্যে কি করেছি দান?
পেরেছি কি দুঃখে শোকে শান্তি-বারি দিতে,
অনাথার অশ্রুজল পেরেছি মুছা'তে?
তব প্রেমে হৃদি কি গো হয়েছে বিহ্বল,
পারি নাই—পারি নাই, অক্ষম দুর্ব্বল।
দুঃখী-মুখে হেরেছি কি তোমার বয়ান,
শোকীর ক্রন্দন-মাঝে তোমার আহ্বান?
শোক-মাঝে দেখেছি কি স্বর্গের আভাষ,
মিলনের মাঝে কি গো তোমার আশ্বাস?
পেরেছি কি তব কার্য্যে দিতে নিজ প্রাণ,
কঠোর কর্ত্তব্য-মাঝে আত্ম বলিদান?
পারি নাই—পারি নাই, করুণা-নিধান!
আগামী নবীন বর্ষে কর বল দান।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

ধর্ম্মলাভের উপায় কি ?

ধর্ম্মলাভের উপায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য ও সমাধি বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল বড় বড় কথা লইয়া আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমি ধর্ম্মের তিনটি সহজ কথা লইয়াই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই ঈশ্বর আছেন এই জ্ঞান উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কঠোপনিষদে একটি উৎকৃষ্ট শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই :—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

অর্থ—ইহাকে (ব্রহ্মকে) বাক্যের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং চক্ষুর দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যিনি বলেন যে "তিনি আছেন" তাহা ভিন্ন অন্যের নিকট তিনি কিরূপে প্রকাশিত হন ?

একটি কবিতায় আছে :—

"আলোক পাইয়া সবে বুঝিবে সত্যই ভবে
তুমি আছ—ধর্ম্ম আছে তব !"

ঈশ্বর আছেন ইহাই ধর্ম্মের প্রথম কথা। অন্তরে এই বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন, তিনি কিরূপে আছেন ? তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ? এ সম্বন্ধেও উজ্জ্বল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সমুদ্র যেমন আপনারই অনন্ত বারিরাশি হইতে কোটী কোটী তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে; তেমনি জগৎকারণ আপনারই অনন্ত শক্তি হইতে কোটী কোটী প্রাণীকে উৎপন্ন করিতেছেন। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, তেমনি আমরা সেই অনন্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছি। তিনিই আমাদের প্রাণ, আমরা লক্ষ লক্ষ প্রাণী; এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের জীবনের ক্রিয়া অনুভব করিতেছি, এই জীবনের মধ্যেই সেই জীবনের জীবন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাত্রিকালে আমরা নিদ্রায় মগ্ন থাকি; কিন্তু চিরজাগ্রত পুরুষ আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করেন;

প্রভাতকালে তাঁহারই মায়াস্পর্শে জাগ্রত হই এবং তিনিই আবার আমাদের স্মৃতিকে দিয়া আমাদিগকে ভূষিত করিয়া দেন। তাঁহার সঙ্গেই আমাদের আশ্রয় আশ্রিতের, পিতা পুত্রের ও প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক। এই যে পৃথিবীর স্নেহের বন্ধন,—এই বন্ধন-সূত্র একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাহা অনন্ত কাল থাকিবে। আমরা তাঁহারই স্নেহ-ক্রোড়ে অনন্ত কাল বাস করিব এবং তাঁহারই জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। ঈশ্বর ও তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে হৃদয়কে নির্ম্মল ও সংসারের বিকার হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন। আমরা নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-চিন্তা করিলে অন্তরের মধ্যে কি দেখিতে পাই? দেখি মোহ, বিকার, হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং আরো কত রকম জাল জঞ্জাল এই হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। হৃদয় হইতে এই সকল দূর করিতে না পারিলে কেমন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব? অগ্রে যে ঈশ্বর ও তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা বলিলাম;—সে বিশ্বাসই বা লাভ করা যায় কিরূপে? মোহ বিকার হইতে বিমুক্ত যে নির্ম্মল অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণেই ঈশ্বরের নব নব ভাবের স্ফুরণ হয়; তখন বিশ্বাসও উজ্জ্বল হয়। সুতরাং হৃদয়কে পবিত্র ও মোহ বিকার হইতে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হইলেও কার্য্যটি বড় কঠিন। হায়, মোহ, বিকার ও পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য, কত স্থানে যে কত ধর্ম্মলাভার্থী ব্যক্তি চোখের জল ফেলিতেছে, সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কত যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত দুর্ব্বল ব্যক্তি মোহ বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া উঠিতেছে—"এ জগতে কোথায়,কে এমন গুরু আছে যে, আমাকে মোহ বিকারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারে?"

আমি তো ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার একটিমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়াছি। সে উপায় অন্তরে ঐশী শক্তির প্রকাশ। যখনই মোহ, বিকার ও পাপচিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে চাহিবে, তখনই কাতরস্বরে করুণাময় ঈশ্বরকেই ডাকিতে হইবে,তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিতে হইবে। তিনি প্রকাশিত হইয়া অন্তরে তাঁহার ঐশী শক্তির সঞ্চার করিলেই আমরা সবল হইব এবং মোহ ও পাপের হস্ত হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে পারিব। তখন চিত্ত স্ফটিকের ন্যায়

স্বচ্ছ হইবে এবং সেই স্বচ্ছ হৃদয়ে ঐশ্বরিক ভাবেরও স্ফূরণ হইবে; সেই সময় অতি স্বাভাবিক রূপেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস লাভ করিতে পারিব।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ঈশ্বরকে প্রভু মনে করিয়া তাঁহারই হস্তে জীবনের ভারার্পণ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলে এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই মঙ্গল বিধাতাই এই জীবনের পরিচালক; তবে আর তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধা কি? বাধা যখন কিছুই নাই, তখন নিরন্তর তাঁহার দিকেই কান পাতিয়া থাকিতে হইবে। বিবেক-কর্ণে তিনি যে বাণী প্রকাশ করিবেন, সেই বাণী শুনিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ইহাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ। আমরা ধার্ম্মিক নই; সেই জন্য ঈশ্বরের হস্তে জীবনের ভারার্পণ করিতে পারি নাই; ঈশ্বরও আমাদের জীবনের পরিচালক নহেন। আমরা যদি আমাদের মনকে জিজ্ঞাসা করি—হে মন, তুমি কাহার দ্বারা পরিচালিত হও? মন বলিয়া উঠিবে—আমি আমার প্রবৃত্তির দ্বারা, আমার সুখ-স্পৃহা দ্বারাই পরিচালিত হই। কিন্তু আত্মচিন্তা, আত্মসংযম এবং প্রার্থনার দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; নচেৎ কিরূপে ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিবে? এ বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "মাঘোৎসবের উপদেশ" শীর্ষক গ্রন্থে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কিছুদিন পূর্ব্বে আমার অন্তরে কোনও একটি বিশেষ সুখের জন্য লালসার উদয় হয়। যে সুখটির প্রতি আমার বাসনা জন্মে। তাহার মধ্যে কোন পাপ কামনা বা অবিশুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ দেখিলাম যে, যে কয়েকদিন সেই ইচ্ছা আমার অন্তরে প্রবল রহিল সেই কয়েকদিন আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষ মলিন বোধ হইতে লাগিল; অর্থাৎ আর দৈনিক উপাসনাতে পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি অনুভব করি না; যাহা করি, যেখানে যাই, প্রাণটা বিরস বোধ হয়; দর্পণের উপর জলীয় বাষ্প পড়িলে তাহা যেমন ম্লান ভাব ধারণ করে এবং তাহাতে আর পার্থিব পদার্থের প্রতিবিম্ব যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ কোনও গূঢ় কারণে আমার চিত্তেরও সেই অবস্থা ঘটিল। আর তাহাতে প্রেমময়ের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইলাম না। এই অবস্থাতে আমার অন্তর অত্যন্ত অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। চিত্তের ম্লান ভাবের কারণ কি? গভীররূপে এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। নগরের কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন উদ্যানে আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলাম। গভীর আত্মানুসন্ধানের পর অবশেষে

একটি মহা সত্য প্রতীত হইল। আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম। যে সুখটি আমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম, সেই সুখের ইচ্ছা করিবার সময় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত কি না—এ চিন্তা মনে উদিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেবলমাত্র স্বীয় আসক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ সুখ কামনা করিতেছিলাম। তখন আমি মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, আচ্ছা ঐ সুখ যে আমার আত্মার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা কে বলিল? প্রভু কি ইচ্ছা করেন ঐ সুখ আমি পাই? সুখ আমি কেন চাহিব? সেবাই যাঁহার লক্ষ্য, সুখ ত তাহার লক্ষ্য নয়। ঐ সুখ দিতে হয় তিনি দেবেন, না দিতে হয় না দেবেন, আমি চাহিব কেন? তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, অবিশ্বাসী নাস্তিকের ন্যায় তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আসক্তির জন্য সুখ কামনা করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মন মলিন হইয়া গিয়াছিল।"

এই উক্তির দ্বারা আমাদের কথাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত না হইয়া শুধু আপনার বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখের কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া হৃদয় প্রেমহীন ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আবার যখনই তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তখনই অন্তরের প্রেম ভক্তি অন্তরে ফিরিয়া আসিল। সুতরাং ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের হস্তেই জীবনের ভারার্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার ইচ্ছা ও বিবেকে প্রকাশিত আদেশবাণীর দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করিতে হইবে।

ধর্ম্মলাভের উপায় সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক বলিয়া লাভ কি? অল্প কথাই যদি কাজে পরিণত করা যায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সরমা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণের সায়াহ্ন। সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সমস্ত দিনই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। রাস্তা ঘাট কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সহজে

চলিবার যো নাই। আকাশ এখনো ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন, বোধ হইতেছে যেন মুহূর্ত্তে পৃথিবী ভাসাইয়া দিবে। রাস্তায় লোক জন নাই বলিলেই হয়। এমন কি কুলি মজুর পর্য্যন্ত তাহাদের কুটীর ছাড়িয়া আজ পথে বাহির হয় নাই। ক্বচিৎ দু'একটা কুকুর আশ্রয় অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে এই দুর্য্যোগে কেহ বাটীর বাহির হয় না। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঐ আসিতেছে কাহারা—উহারা আমাদের দেশের অভিশপ্ত কেরাণী—পুরাতন ছিন্ন ছত্রে মস্তক ঢাকিয়া, প্রাণসম প্রিয়তম পাদুকাগুলিকে কেহ হস্তে, কেহ কুক্ষি দেশে ধারণ করিয়া অতি সংযতবসনে, ধীর নগ্ন পদে ভগবানের বিচারের পক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে সেই কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে চলিয়াছে—উহাদের পক্ষে জলঝড় দুর্য্যোগ যেন কিছুই নয়—উহাদের শরীর যেন পাষাণে গঠিত। হায় দুর্ভাগ্য কেরাণী! হায় দাসত্ব!

প্রফুল্ল আজ কোর্টে যায় নাই। সারাদিন বাটীতে থাকিয়া তাহার প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে একটি ছাতা লইয়া হরিপদর বাটীর উদ্দেশে পথে বাহির হইল; মনে ভাবিল এখনি ফিরিয়া আসিবে। তখন সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া কালো মেঘের গায় পড়িয়া ধরণীর উপর নিবিড় কালিমা ঢালিয়া দিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া হরিপদর বাটীতে প্রবেশ করিল।

কমলা দালানে দাঁড়াইয়া সবে মাত্র গাল দুটি ফুলাইয়া হস্তস্থিত শঙ্খটির অধর চুম্বন করিতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে প্রফুল্লকে দেখিয়া চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মেনকাকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"মেনু শাঁখটা বাজা তো, আমি তুলসী তলায় সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।" কমলা মনে মনে বলিল—'রূপের কী তেজ! মুখের দিকে চাওয়া যায় না—বিধাতা সার্থক মানুষ গড়েচেন। যেমন রূপ তেমনি গুণ, যথার্থ বন্ধু বটে!'

হরিপদর মাতা প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিলেন,—"তা বাবা এসেছ বেশ হয়েচে, আমি মনে করছিলুম আজো বুঝি আস্‌তে পারবে না। যে জল ঝড়! পোড়া আকাশ যেন ভেঙে পড়েচে।"

"একদিন না এলে আপনি যে করেন,—সেই জন্যেই এলুম।"

"সত্যি বাবা তোমাকে একদিন না দেখ্‌তে পেলে প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে, তাই কৈলিসীকে দিয়ে ডেকে পাঠাই। কাল আসনি কেন বাবা?"

"কাল মা সর্দ্দি হয়ে শরীরটা বড় ভার হয়েছিল, সেই জন্যে আস্‌তে পারিনি।"

"আজ কেমন আছ বাবা ?"

"ভালো আছি মা।"

"একটু না হয় চা খাও শরীরটা বেশ ঝর্‌ঝরে হবে এখন। বৌমা, একটু চা করে দাও।"

"তা না হয় দিন।"

মেনকা চা'ও চিনি আনিতে ছুটিল—কমলা চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"হাঁ বাবা, হরিপদর আর কোনো চিঠি পত্র পাওনি ?"

"না মা এখন তো আর তার চিঠি পত্র পাব না—বিশেষ দরকার হলে বলবেন আমি টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবো।"

"বিশেষ দরকার আর কি—তবে ভালো আছে ত ?"

"ভালো থাক্‌বে না কেন, সে সেখানে বেশ আছে, আপনি অত উতলা হ'ন কেন ?"

"না বাবা তোমাকে পেয়েই আমি তাকে ভুলে আছি, তা না হলে কি আমি দু'দিনও বাঁচতুম ?"

মেনকা চা আনিয়া বলিল,—"পিফু দাদা চা খাও।" কমলা পানের ডিবাটি প্রফুল্লের সম্মুখে রাখিয়া গেল। প্রফুল্ল চা পান করিয়া একটি পান তুলিয়া লইল। মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রফুল্ল বলিল,—"মা, জল এল—আমি এখন আসি।"

"বাপ্‌রে এই জলে কি মানুষ বাড়ির বার হয় ? কৈলিসী তুই গিয়ে বৌমাকে বলে আয় যে, এই জল ঝড়ে বাছা আমার যেতে পারবে না—যদি জল না থামে তো আজ এখানেই থাক্‌বে।"

কৈলিসী তাড়াতাড়ি টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইল—প্রফুল্ল সম্প্রতি তাহাকে এক জোড়া কাপড় দিয়াছিল।

প্রফুল্ল কহিল—"মা এখানে থাকা কি সুবি……"

হরিপদর মাতা কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"বাবা তোমার ঘর তোমার দোর, যে ঘরে তোমার ইচ্ছে সেই ঘরেই থাক্‌বে। বৌমা, ঐ বড় ঘরে বিছানা করে দাও। আর খানকতক গরম গরম লুচি ভেজে দিয়ো।"

কমলা লুচি ভাজিবার জোগাড় করিতে লাগিল—মেনকা বলিল,—"পিফু

দাদা, এক দিন আমাদের থিয়েটার দেখাতে হবে।"

"তা বেশ তো—মা আপনিও যাবেন।"

"আর বাবা, এখন হরিনাম করে মরতে পারলেই বাঁচি - আমার আবার থিয়েটার দেখা। তবে ওদের একদিন দেখিয়ে এনো।"

"যে দিন চৈতন্যলীলা কি প্রহ্লাদচরিত্র হবে সেই দিন আপনাকে নিয়ে যাব।"

মেনকা কহিল,—"তবে আমাদের কবে নিয়ে যাবে পিফু দাদা ?"

"তোমাদেরও সেই দিনে নিয়ে যাব।"

"ঐ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভালো—প্রহ্লাদচরিত্র নয় ?"

"আচ্ছা যে দিন প্রহ্লাদচরিত্র হবে, সেই দিনই তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব কেমন ?"

"তা আমি জানিনে, যে দিন ভালো হবে সেই দিন আমাদের নিয়ে যেয়ো।"

"তাই হবে।"

"আচ্ছা পিফু দাদা, এক দিন আমাদের দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতে নিয়ে যাবে।"

মেনকার মাতা কন্যার প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"মেনু তোর কেমন আক্কেল—তোর পিফু দাদার কি আর কোনো কাজ কর্ম্ম নেই কেবল তোদের হেথায় সেথায় নিয়ে বেড়াবে—বলিস্ কেমন করে ?"

প্রফুল্ল কহিল,—"যে ক'টা দিন এখানে আছে সেই ক'টা দিন একটু হেসে খেলে বেড়িয়ে নিক্—শ্বশুর-বাড়ি গেলে আর কি বাড়ি থেকে বেরুতে পাবে ?"

শ্বশুর-বাড়ির কথায় মেনকার মুখের উপর লজ্জার অরুণ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে কমলার নিকট চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মেনকা ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"পিফু দাদা ওট, ঠাঁই হয়েচে।"

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"তুমি বাবা, রান্নাঘরে গিয়া বস, এক একখানি ভেজে দেবে আর এক একখানি খাবে। আমি এখানে বসে বসে দেখ্‌চি।"

প্রফুল্ল রান্নাঘরে আসনের উপর আসিয়া বসিল। মেনকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা এক একখানি করিয়া পাতে দিতে লাগিল। হঠাৎ একখানি গরম লুচি প্রফুল্লের হাতের উপর পড়িয়া গেল ; প্রফুল্ল উহু করিয়া উঠিল—কমলা মৃদুস্বরে বলিল,—"মেনু একটু বাতাস কর হাতটা বুঝি পুড়ে গেছে"—প্রফুল্ল একটু হাসিয়া বলিল,—"এত ঠাট্টাও আপনি জানেন—আমার হাতটা জ্বালা করবে আর আপনি মুখ টিপে টিপে হাস্‌বেন।"

কমলা মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল,—"আহা ফোস্কা হ'ল বুঝি দেখ্‌ তো মেনু।"

"না ফোস্কা হয় নি তবে আর দু'চার খানা ঐ রকম ভাবে পড়লে যে ফোস্কা না, হবে তার কোনো মানে নেই। আচ্ছা সে দিনকার চুড়ী জোড়াটা আপনার পছন্দ হ'ল কি না তার তো কোনো খবর পেলুম না।"

নতমুখী কমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া মেনকা কহিল,—"সে চুড়ী বৌদির খুব পছন্দ হয়েচে।"

কমলা মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আপনি আমাদের জন্যে আর কিছু আনবেন না।"

"এত বড় অভিশাপটা হঠাৎ আমার উপর এসে পড়্‌ল কেন?" বলিয়া প্রফুল্ল কমলার দিকে চহিল।

কমলা মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"তবে আন্‌বেন।"

প্রফুল্ল সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"মেনু, কাল তোমাদের আঙুলের মাপ দিয়ো আংটী গড়িয়ে দেবো।"

মেনকা পাঁচটি আঙুল দেখাইয়া বলিল,—"পিফু দাদা, কোন আঙুলের মাপ চাই?"

"তা আমি জানি না।"

মেনকাকে একটু লজ্জিতা দেখিয়া কমলা ইঙ্গিতে আপনার নিকটে ডাকিয়া কানে কানে বলিল,—"হাবি কিছু জান না কোন্‌ আঙুলে আংটী পরে, শ্বশুর-বাড়ি গেলে ঘর করবে কি করে? ঐ দেখ তোমার পিফুদাদার কোন্‌ আঙুলে আংটী আছে।"

মেনকা একগাল হাসিয়া বলিল,—"ও—বুঝেচি।"

প্রফুল্লকে উঠিতে দেখিয়া "করেন কি একটু বসুন ও ঘর থেকে দুধটা এনে দিই" বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া প্রফুল্লের সম্মুখে রাখিল।

"আমার পেটে আর একটুও যায়গা নাই" বলিয়া প্রফুল্ল উঠিবার উপক্রম করিল।

মেনকা তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল,—"দুধটুকু খেতেই হবে, না খেলে মাকে ডেকে দেবো।"

"আর ডাক্‌তে হবে না" বলিয়া প্রফুল্ল দুগ্ধের বাটিটি নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল।

তখন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা বাতাস উঠিয়া ঝড়ের সূচনা করিতেছিল। প্রফুল্ল যখন হরিপদর মাতার নিকটে আসিয়া বসিল তখন তিনি মালা জপিতে জপিতে ঢুলিতেছিলেন।

প্রফুল্ল ডাকিল,—"মেনু!"

মেনকা এক ডিবা পান লইয়া ছুটিয়া আসিল, তাহার পদ-ধ্বনিতে হরিপদর মাতার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রফুল্ল।

মেনকা পানের ডিবাটি প্রফুল্লের হাতে দিয়া তাহার বৌদির কার্য্যের সহায়তা করিতে চলিয়া গেল। কমলা তখন বড় ঘরে প্রফুল্লের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল।

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"খাওয়া হয়েচে বাবা।"

"হ্যাঁ মা হয়েচে।"

"দেখ্‌লে বাবা, জলের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝড় উটেচে—এই জল ঝড়ে তুমি বাড়ি যাবে বলছিলে—তা হ'লে কি আর প্রাণটা আজ থাক্‌তো?"

"তাই তো মা বৃষ্টি ধরে যাবার তো এখনো কোনো সম্ভাবনা দেখ্‌চি না।"

"না বাবা—দেখচ না ক্রমেই বাড়্‌চে?"

মেনকা আসিয়া বলিল,—"পিন্টু দাদা বড় ঘরে বিছানা হয়েচে।"

হরিপদর মাতা বলিলেন,—"তবে শোওগে বাবা—কাল সর্দ্দি হয়েছিল আর এই ঠাণ্ডা হাওয়াতে এখানে বসে থেকো না।"

প্রফুল্ল বড় ঘরে চলিয়া গেল।

সারি সারি তিনটি ঘর, প্রথম ঘরে হরিপদর মাতা ও মেনকা থাকে। দ্বিতীয় ঘরটিই বড় ঘর। এই ঘরটিতে হরিপদর পিতা থাকিতেন এখন উহা খালি পড়িয়া থাকে। ইহার পার্শ্বেই কমলার ঘর। সকল ঘরের ভিতরে একটি করিয়া দরজা আছে তাহাতে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়া যায়। দরজা কয়টি সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। সম্মুখে দরদালান।

প্রফুল্ল দেখিল আড়ম্বরবিহীন ঘরটি সাদাসিধা ভাবে পরিপাটিরূপে সাজানো। গৃহের একপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র টেবিল, তাহার উপর কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়া আছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ার—টেবিল ও চেয়ারটি হরিপদর পিতার আমলের অতি পুরাতন কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অপর পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক। এই পালঙ্কের উপর প্রফুল্লর জন্য মল্লিকার ন্যায় শুভ্র শয্যা প্রস্তুত।

দেয়ালের উপর কয়েকখানি পুরাতন জীর্ণ দেব-দেবীর ছবি যেন গৃহটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। একটা ঘড়ি ব্রাকেটে বসিয়া মাথার উপর অবিরাম টিক্ টিক্ করিতেছে। দীপাধারে একটি দীপ জ্বলিতেছে। প্রফুল্ল চেয়ারে বসিয়া পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিল—প্রথম খানি টডের রাজস্থান—ভালো লাগিল না, রাখিয়া দিল আর একখানি লইল—এখানি ভাতবর্ষের ইতিহাস—নাম দেখিয়াই পুস্তক বন্ধ করিল। তার পর আর একখানি হইল--এখানি বাংলা কবিতা পুস্তক, নাম "কুসুম" নামের নীচেই দুই ছত্র লেখা আছে,—

"বুকে রাখা বিনা জানে কি কুসুম?
কুসুমের সুখ সমীরে ঝরা!"

ইহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর প্রাণস্পর্শী! অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পবিত্র! পুস্তকখানি পাইয়া প্রফুল্লের বড়ই আনন্দ হইল—সে তন্ময় হইয়া উহা পড়িতে লাগিল—যখন তাহার পড়া শেষ হইল তখন ঘড়িতে দশটা বাজিল। প্রফুল্ল প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। একটা চলিত কথায় আছে—"ঠাঁইনাড়া"—ঠাঁইনাড়া হইলে নিদ্রা হয় না। প্রফুল্লেরও তাহাই হইল। স্থানভ্রষ্ট প্রফুল্ল আজ নিদ্রা দেবীর মোহন স্পর্শে বঞ্চিত হইল। সে অলসভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল—কত চিন্তার লহরী তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার চক্ষের পাতায় ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিল না। এমন ভাবে শুইয়া থাকা তাহার অসহ্য বোধ হইল, সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল—তখন ঘড়িটা টুং করিয়া একটি শব্দ করিয়া রাত্রির গভীরতা জানাইয়া দিল। প্রফুল্ল শয্যা ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরজা খুলিল—তখন বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত ঝড় হইতেছিল—একটা প্রবল বায়ু ভীমবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল ঝড়ের দাপট দেখিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধ বায়ু গৃহের জানালা দরজায় ধাক্কা দিল—সেই ধাক্কায় কমলার কক্ষের দরজাটি ঈষৎ খুলিয়া গেল। বলা বাহুল্য এই দরজাটির অর্গল ছিল না। দরজার সম্মুখে একখানি কাঠের আন্‌লা বসানো ছিল—তাহাতে খানকয়েক কাপড় সাজানো ছিল।

প্রফুল্লের দৃষ্টি সহসা কমলার গৃহের মধ্যে পতিত হইল। সে দেখিল—কমলার মস্তকের নিকট প্রদীপটি এখনো জ্বলিতেছে—সে বুঝি কি একখানা পুস্তক পড়িতেছিল, উহা তাহার একপার্শ্বে পড়িয়া আছে। শ্লথবসনা কমলা গভীর নিদ্রার

নিমগ্ন। প্রফুল্ল দীপালোকে তাহার সেই বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—আজ আমি এ কী দেখিলাম! এ রূপের তুলনা নাই। এ অতুল রূপরাশি কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, আমি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই চাহি না—চাহি শুধু কমলার ঐ আরক্তিম গণ্ডস্থলে একবার অধর স্পর্শ—একটি চুম্বন! প্রফুল্ল নির্ণিমেষ নয়নে কমলার নিদ্রালস শিথিল দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। কে জানে কি বিষ তাহাতে ছিল, সে যেন মোহ-মদিরা-পানে মত্ত হইয়া উঠিল! কে যেন প্রফুল্লকে ডাকিয়া বলিল—মূঢ়, সাবধান হ'! এখনো সময় আছে! কিন্তু হতভাগ্য সে বিবেক-বাণী অগ্রাহ্য করিয়া এক পদ অগ্রসর হইল! তখনি তাহার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি মারিতে লাগিল—তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল—সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। প্রফুল্ল সরিয়া আসিল। দরজাটি বন্ধ করিয়া নিজের পালঙ্কে আসিয়া বসিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রফুল্ল ভাবিতে লাগিল—আমারো তো স্ত্রী আছে, তবে কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হইল—কমলা আমার প্রাণদাতা বন্ধুর পত্নী—আমি কী পাপিষ্ঠ—নরাধম! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কূট যুক্তি আসিয়া তাহার অন্তরে স্থান পাইল। সে মনে মনে উহার জবাবে বলিতে লাগিল - প্রাণদাতা বন্ধু—প্রাণ কে কাহাকে দিতে পারে? আমার অদৃষ্টে মৃত্যু ছিল না—আমি মরি নাই; হরিপদ উপলক্ষ মাত্র। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই হইবে, কে তাহার অন্যথা করিতে পারে? আমি কে? অদৃষ্টের দাস! অদৃষ্টের তর্জ্জনী-তাড়নায় ঘুরিতেছি ফিরিতেছি! আমার নিজের কোনো ক্ষমতা নাই। ক্রমে কু চিন্তার তাড়নায় প্রফুল্ল ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িল। সে প্রাণের ভিতর শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল আবার উঠিল, ধীরে ধীরে আসিয়া নিঃশব্দে দরজাটি খুলিল। নির্ব্বানোন্মুখ দীপ-শিখার সাহায্যে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে সেই শিথিলবসনা কমলাকে সেই ভাবেই দেখিল। পিপাসা বাড়িয়া উঠিল। প্রফুল্ল গৃহমধ্যে দুইপদ অগ্রসর হইল। তাহার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সে তিন পদ অগ্রসর হয়, দুইপদ পিছাইয়া আসে; এইরূপে কম্পিত-কলেবরে উন্মত্ত প্রফুল্ল সেই নিদ্রামগ্না কমলার কপোলে অধর স্পর্শ করিল! প্রফুল্লের স্পর্শে কমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, কমলা প্রফুল্লকে দেখিয়া তেমনি শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের ভিতর

একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—ত্বরিতে বসন সংযত করিয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল কি বলিবে কি করিবে সহসা সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না! একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাহার প্রাণটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। কমলার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না—সে একবার প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিল—কী কঠোর সে চাহনী! কী তীব্র তাহার জ্বালা! সে চাহনীতে বজ্রের সহিত বিদ্যুৎ মিশানো ছিল! প্রফুল্ল তখন কাঁপিতে ছিল। যুপ-কাষ্ঠের সম্মুখে ছাগ-শিশু যেমন করিয়া কাঁপিয়া থাকে, পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লও তেমনি করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কমলা মৃদু-গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান। আপনাকে আমি ভালো বলেই জানতুম। এখন দেখচি আপনি রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হ'তে উদ্যত হয়েচেন। আপনি জানেন—উপরে ভগবান বলে' একজন আছেন। তিনিই এর বিচার করবেন। আপনি বিশ্বাসঘাতক—আপনার নরকেও স্থা........"

কমলার কথায় বাধা দিয়া প্রফুল্ল কম্পিতকণ্ঠে দীনভাবে বলিল,—"কমলা, আমি আজ তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়েচি বটে, কিন্তু তার মূল কে? তোমার ঐ অতুল রূপরাশি! আজ যদি তুমি আমার জন্যে এখানে শয্যা রচনা না করতে, দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ যদি তোমার অসামান্য রূপ-লাবণ্য না দেখতুম তা হলে কে বল্‌তে পারে আজ আমি তোমার জন্যে পাগল হতুম! কমলা, আমায় মাপ কর আমি চলে যাচ্চি, একবার বল তুমি আমার হবে।" প্রফুল্ল কমলার মুখের দিকে চাহিল—সে চাহনিতে কতই কাতরতা, কতই বেদনা, কতই ব্যাকুলতা! তাহার সজল নয়ন দুটি যেন চাহিতেছে একটি ভিক্ষা!—একবিন্দু করুণা!

কমলা রুক্ষস্বরে বলিল,—"আপনি বলচেন কি? আপনি কি সত্যই পাগল হলেন! আমার রূপে আপনি মুগ্ধ হবেন আগে জান্‌লে এ পোড়ার মুখে কালী মেখে শুয়ে থাকতুম।"

"সত্যিই কমলা আমি পাগল হয়েচি—তুমিই আমাকে পাগল করেছ। একবার বল কমলা—তুমি আমার হবে" বলিয়া প্রফুল্ল কমলার পদদ্বয়ে আপনার মস্তক স্থাপন করিল, দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িল।

কমলা পা দু'খানি টানিয়া লইয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিল,—"আপনি এখনি চলে যান বলচি—না যান তো আমি মাকে ডাকি।"

প্রফুল্ল নিমেষ-মধ্যে জামার পকেট হইতে একখানি ছোট ছুরিকা বাহির করিল। প্রদীপের ক্ষীণালোকে, তাহার ফলাটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। প্রফুল্ল ছুরি খানি আপনার বক্ষের উপর ধরিয়া বলিল—"কমলা, মাকে ডাক—আমার এই তুচ্ছ প্রাণ তোমার চরণে ঢেলে দিয়ে চলে যাই।" কমলা মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। অতি নম্রভাবে সে প্রফুল্লকে বলিল—"আপনি যার দেহের লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েচেন তাকে বরং ঐ ছুরিতে বধ করুন, সকল আপদ ঘুচে যাক্!"

প্রফুল্ল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কমলার হাতদুটি ধরিয়া বলিল,—"বল কমলা, তুমি আমার?"

কমলা হাত ছাঁড়াইয়া লইয়া বলিল—"আপনি এখনি চলে যান—আমার মাথা ঘুরচে।"

"আমি তোমায় বাতাস করচি।"

"আমায় বাতাস করতে হবে না—আপনি চলে যান, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করচে।" কমলা কাঁদিয়া ফেলিল!

প্রফুল্ল কাতরস্বরে বলিল—"কমলা কাঁদ্‌লে তুমি—তোমার চোখে জল—আমার প্রাণটা যে ফেটে যায়—তোমার কী চাই বল—আমি প্রাণ দিয়েও কি তোমার..."কথায় বাধা দিয়া ক্রন্দন জড়িতস্বরে কমলা বলিল—"ক্ষমা করুন, আমি কিছুই চাই না—কেবল মরণ! আপনি এখন যান আমার বড় কষ্ট হচ্চে।"

"আচ্ছা যাই—কমলা, আমার হবে?"

নিরুপায় হইয়া কমলা বলিল—"আচ্ছা হব,—"মনে মনে বলিল—"যদি কাল বেঁচে থাকি।"

প্রফুল্ল সানন্দে আসিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিল।

কমলার প্রাণের ভিতর তখন কি হইতেছিল কে জানে—সে শয্যায় পড়িয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রফুল্ল ভাবিল অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে। কার সাধ্য অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করিতে পারে?

মুহূর্ত্তের পদস্খলনে মানব দানবে পরিণত হয়। হায়! প্রফুল্ল, কি অশুভক্ষণেই আজ তুমি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে—তোমার অনাবিল হৃদয়ে আজ এ কী কালিমার ছাপ পড়িল? হায়! রমনীর রূপ কী স্নিগ্ধ! কী মধুর! কী ভীষণ! মানব স্বেচ্ছায় সেই রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়া অহরহ পুড়িয়া মরিতেছে।

(ক্রমশ)

অভিভাষণ

২০শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনন্দ সম্মিলনে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত বক্তৃতা

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মত সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকী এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু কিছু যশের খোরাকী প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ্‌খোরাকী বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই ত গেল দিনের খোরাক—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে ত মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগামশোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে সে দালালী আদায় করিয়া লয়। কবি যত বড় কবিই

হউক তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্ত্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং পুরুষটার বালাই থাকে না--তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই ত ঐ দুর্ব্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এই জন্যই ত মনু বলিয়াছেন—"সম্মানকে বিষের মত জানিবে, অপমানই অমৃত।" সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভাল।

আমার ত বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে ত কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগশিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেই-খানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাহাকে আমার অহঙ্কারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায় প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য ত ঘোড়া আর প্রবীনতাই সারথী। সারথীহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি ত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার

সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরম রহস্যময়ী—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্য্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু অবসানের দিনান্ত কালেরও অনন্ত জীবনের পরম রহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কি ? অতএব বার্দ্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীন বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এ বয়সেও তরুণেরপ্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাব কিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেককাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই—যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কত বড় আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা শস্তা জিনিয নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিষটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না—কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুল চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি—তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিষ্ট, তাঁহারা মানসিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে কাছে ঘেঁসিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এই জন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্ব রথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মাণিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মত সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটা উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কষ্টম্ হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্ত গুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান্ দেওয়া গেছে,

তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল ত এই দেখিতেছি, অন্তত প্রাচুর্য্যের দ্বারাতেও বর্ত্তমান কালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে কালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে;—অঙ্গীকার সম্বর্দ্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারি করিয়া তোলা যায়—যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি,—দর অপেক্ষা দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই সকল ফাঁকি জ্ঞানে-অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে—সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মত করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মত করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক্ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না। আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক

সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুসি করা যায়—কিন্তু সেই খুসিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুসির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ বিদায় তাহাও আমাকে বারবার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনো দিন স্থায়ী কল্যাণলাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরিউপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এই খানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত মর্ম্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এই জন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে, যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন;—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধূলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্দ্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম,—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না। [ভারতী, ফাল্গুন]

প্রত্যাবর্ত্তন (৮)

গাজীপুরের নৃত্যগোপাল বাবু সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা না বলিলে এখানে আসিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বুঝা যাইবে না। যদিও কথাটি বিশেষ তথাপি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোধ হয় একেবারেই অনর্থক নহে।

সংসারে জ্ঞানীজনের সঙ্গলাভ করা একটি সৌভাগ্যের বিষয়। আবার যদি কখনো প্রকৃত ভক্তের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তবে ভক্ত চরিতের নিষ্ঠাযুক্ত সেবা ভক্তির লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া সেবা শিক্ষা হয়। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন বিবিধ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সম-সঙ্গী সাধকদলের যে এক শ্রেণীকে প্রেরিত প্রচারক আর একশ্রেণীকে গৃহস্থ বৈরাগী আখ্যা প্রদান করেন এবং শেষ জীবনে নবসংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের বাসগৃহ, পরিবার পরিজন, দাস দাসী, আহার বিহার, বিষয় কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান, সাধন ভজনাদি সমস্ত জীবনের একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, সেই চিহ্নিত গৃহস্থ-বৈরাগী দলের মধ্যে নৃত্যগোপাল বাবুও একজন; ইহাদের জীবন এক একখানি মূর্ত্তিমান নবসংহিতা বিশেষ। আজ এই ভক্তের গৃহে আসিয়া বুঝিলাম একটি বিশেষ স্থানে আসিয়াছি।

পরদিন প্রাতে আমাকে লইয়া নৃত্যগোপাল বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া, উপাসনা-সমাজগৃহ প্রভৃতি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। স্নানান্তে তাঁহার পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। আমি আজই এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা করি শুনিয়া তিনি কোর্টে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নিজেই আমার অবস্থা বুঝিয়া দুইটি টাকা পাথেয় দিয়া অত্যন্ত যত্ন ও প্রীতির সহিত ঘরের গাড়িতে করিয়া আমাকে ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিলেন।

গঙ্গাপার হইয়া তেরিঘাট হইতে ব্র্যাঞ্চ্ লাইনে বেলা একটার পর দিলদার নগর ষ্টেশনে আসিয়া মেন লাইনে ট্রেণ ধরিলাম। প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের জামাতা আমাকে এখানে দেখিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমার থাকা সম্ভবপর হইল না।

অপরাহ্ণে কৈলোরে বাবু ষষ্ঠিদাস মল্লিকের বাসায় আসিলাম। ষষ্ঠী বাবু হিন্দু-সমাজের নবশাক শূদ্র শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে আসিয়া কেশব-চন্দ্র প্রমুখ সাধক মণ্ডলীতে আকৃষ্ট হইয়া উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করেন। তাঁহাকে দেখিলে এই কথাই মনে আসে ;—"চণ্ডালহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ," এখন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেও মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে, কৈলোরে ষষ্ঠীবাবুর এখানে প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন অমৃতলাল বসু মহাশয় সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি আসিয়া অমৃত বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু আমার সেই পরিব্রাজক বেশ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন আমি আমার প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া এই ভ্রমণ ব্যাপার সমাধা করিয়া আসিলাম ; তাই প্রথমে একটু তীব্র ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। শেষ কংখল ঘণ্টা কুটীরের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সে ভাব অনেকটা দূর হইল। পরদিন উপাসনা কালীন আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বেলা ১০টার পর আহারাদি করিয়া একত্রেই বাঁকিপুর রওনা হইলাম। তিনি বাঁকিপুর জামাতৃগৃহে গেলেন।

বাঁকিপুরে ডাক্তার কামাখ্যা বাবুর ঠিকানায় আমার নামে পত্র আসিবার কথা ছিল ; আমি প্রথমেই ষ্টেশন ও ডাকঘর সন্নিহিত তাঁহার গৃহে আসিয়া শুনিলাম, আমার নামে একখানি পত্র আসিয়া ডাক পিওণের নিকট আছে। কিছুক্ষণ পরে পত্র পাইলাম ; খুলনা হইতে আমার স্ত্রী লিখিয়াছেন, "চণ্ডীবাবুর স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া কয়েক ঘণ্টা বাদে মারা গেলেন।" সংবাদ শুনিয়া মন বড়ই অস্থির হইল। শীঘ্র ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে হইতে লাগিল।

আজই এখান হইতে যাইতে হইবে, কিন্তু মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাওয়া ভিন্ন অন্য সুবিধা নাই। টাইম টেবল্ দেখিয়া জানিলাম আমার নিকট মোজুত বাদে আর পাঁচ আনা ট্রেণ ভাড়ার অভাব হইবে। একবার সহর বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর কামাখ্যা বাবুর গৃহে কিছু আহার করিয়া যাত্রা কালীন তাঁহাকে ঐ পাঁচ আনা

অভাবের কথা জানাইলাম কিন্তু সে সময় তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণ হইতেছিল, মজুর দিগের মজুরী দিয়া সেদিন তাঁহার নিকট এমন কিছুই ছিল না, যাহাতে আমাকে ঐ সামান্য সাহায্য করিতে পারেন। এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন; আমিও যেন একটু অপ্রতিভ হইলাম। যাহাহউক তখন আর উপায় কি? ষ্টেশনে আসিলাম। রাত্রে অত্যন্ত কন্ কনে শীতে মনে হইতে লাগিল ফিরিয়া যাইব কি? কামাখ্যা বাবুর বাড়ি ঘর ভাঙা—নিতান্ত স্থানাভাব—এখন সহরে যাওয়াও সহজ নয়—কি করি ষ্টেশনে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। রাত্রি দশটার পর ট্রেণ; তখন বোধ হয় নয়টা বাজিয়াছে, এমন সময় একটি মধ্যবিৎ রকমের মুসলমান ভদ্র লোকের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার সহৃদয় ভাবের মূর্ত্তি দেখিয়া মনে কেমন একটা ভাব আসিল ? তাঁহাকে বলিলাম;—"আমার পাঁচ আনা ট্রেণ ভাড়ার অভাব আছে আপনি আমার এই লোটাটা লইয়া উহা দিতে পারেন কি?" তিনি বলিলেন—"সে কি? আপনি এই নিন্—লোটা চাই না।"

প্রাতে মুঙ্গেরে আসিয়া অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। বৃন্দাবনে আলাপী গৌরাঙ্গ বাবুকে সদর রাস্তার উপর তাঁহার ডিস্পেন্সেরীতে দেখিতে পাইলাম। তিনিও পুনরায় আমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার পিতা অন্নদা বাবুর সঙ্গে শীঘ্রই বেশ আলাপ হইল। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধ সেবক দ্বারকানাথ বাগচি মহাশয়কে সমাজ-বাড়িতেই দেখিয়া আসিলাম। বাগচি মহাশয় তখন পীড়িতাবস্থায় ছিলেন।

অন্নদা বাবুও যেমন, গৌরাঙ্গ বাবুও তেমন, পিতা পুত্রে আমার প্রতি কতই যত্ন আদর প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমার মন ব্যস্ত হইয়াছে সত্বরভাবে প্রস্তুত হইয়া বেলা একটার মধ্যে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ ভাড়ার জন্য গৌরাঙ্গ বাবুর নিকট ৮০ আনা চাহিয়া লইলাম।

মুঙ্গের হইতে প্রায় অপরাহ্নে ভাগলপুরে বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আসিলাম। আজ ৮ই পৌষ রবিবার, সমাজে উপাসনায় গেলাম। ষ্টেশনে দেখি আমার প্রতিবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ভায়া এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার। ৯ই পৌষ নিবারণ বাবুর নিকট একটাকা পাইয়া শশী ভায়ার নিকট আর দুই টাকা লইয়া রাত্রির গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

আমার এই প্রায় চারিমাস কালব্যাপী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইখানে শেষ হইল।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে

অশ্রু

অয়ি সাধ্বী পতিব্রতা করুণাকোমল,
তেয়াগি এ মরধরা, পুণ্য পদতল
স্পর্শিল কি রম্য ভূমি—যেই দেশে হায়,
ধরণীর পাপ, তাপ পশিতে না পায়!
আঁধারি গোবরডাঙ্গা, ছাড়িয়া সকল
গেছ চলি, আজি মোরা ফেলি অশ্রুজল
স্মরি' ও মূরতি তব—লক্ষ্মী-স্বরূপিনী।
বিতরিয়া স্নেহ-সুধা পুণ্য-নির্ঝরিণী,
আজিরে শুকায়ে গেছে আঁধারি' অবনী।
কি কারুণা, স্নেহ, দয়া, নিষ্ঠা দেবতায়!
রোগে জ্বর জ্বর তবু পূজাহ্নিক হায়—
ছাড়োনি দিনেক তরে! অনাথ আতুরে
ক্ষুধায় দিয়েছ অন্ন মাতৃ-স্নেহভরে!
কি সৌজন্য! কি বাৎসল্য! স্মরি' সে সকলে
আজি এ প্রবাসে বসি' তিতি অশ্রু জলে!
বাজা'য়ে মঙ্গল-শঙ্খ দিগঙ্গনাগণ,
সীতা সাবিত্রীর অঙ্কে করেছে বরণ!
সাঙ্গ পুণ্য ব্রত মা গো পূর্ণ মনস্কাম;
"শৈলেন্দ্র" "সরলা"-পাশে লভেছ বিশ্রাম।

শ্রীসুকুমারী দেবী।

বর্ষ-শেষ

"কুশদহ"র আর একটি বৎসর পূর্ণ হইল। দীন-দাসের পক্ষে আজ আনন্দের দিন। সর্ব্বাগ্রে ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া, আজ আমার স্বদেশ-বাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব 'কুশদহ'র পৃষ্ঠপোষক সাহায্যকারী গ্রাহক গ্রাহিকা-গণের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা প্রীতি এবং শুভকামনা প্রকাশ করিতেছি। এত যে বিঘ্ন বিপদ-পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া "কুশদহ"র তিনটি বৎসর গত হইল, সে কেবল একমাত্র ভগবানের করুণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁহার নাম করিয়া কার্য্য করিলে তাহাকে তিনি কখনই প্রত্যাখ্যান করেন না। যে তাঁহার মুখের দিকে চায় তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করেন।

ভগবানের প্রেরণা হইতেই যে "কুশদহ" মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ এ কথা প্রথমেই বলিয়াছি। যখনই তিনি ইঙ্গিত করিলেন তখনই "কুশদহ" প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাস হইতে ১৩১৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম বর্ষ পূর্ণ হয়। তৎপরে কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়া, ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে বর্ষ পূর্ণ হয়। এই সময় এই অযোগ্য দাসের শরীর ভগ্ন এবং অর্থাভাবে কাগজ বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। অনেক বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু 'তাঁহার' নামে মরা মানুষ বাঁচে, আবার নবীন বর্ষে ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখে তৃতীয় বর্ষ "কুশদহ" বাহির হইল। এত অর্থাভাবের মধ্যেও ভগবানের একান্ত করুণাতেই প্রতি মাসের প্রথম দিবসে কাগজ বাহির হইয়াছে। এজন্য ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী বন্ধুগণ যথেষ্ট সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন। সম্পাদন-কার্য্যে বন্ধুভাবে যিনি যে পরিমাণে ইহার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই দীন দাসের প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই সম্বল নাই; ভগবান তাঁহাদেরও মঙ্গল করুন। আর যে শুভ উদ্দেশ্যে 'কুশদহ' পত্রের জন্ম, ভগবান সেই কুশদহ বাসীর মঙ্গল করুন, দাসের এইমাত্র প্রার্থনা।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

বারাসাত এবং বসিরহাটের মধ্যস্থিত ধান্যকুড়িয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ত্রিশ বৎসরাধিক হইতে এই গ্রামের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইতে হয়। এখানকার রাস্তা ঘাট, উচ্চ ইংরাজি ইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, চতুষ্পাঠী যাহা কিছু সকলই স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউয়ের একান্ত যত্নের ফল। দেশের জমিদারবর্গ এবং প্রধান ব্যক্তিগণ যদি দেশের উন্নতির ঐরূপ কিছু কিছু চেষ্টা করিতেন তবে আজ পল্লীগ্রামের এত দুরবস্থা হইত না।

সম্প্রতি ধান্যকুড়িয়ার নূতন ইস্কুল বাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মাননীয় কলিন্স সাহেব সভাপতি থাকিয়া বলেন,—"দেখা যায় অধিকাংশ ধনিগণ কলিকাতায় থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করেন ও তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন, কিন্তু ধান্যকুড়িয়ার ভূম্যধিকারিগণ সেরূপ নহেন, ***" এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ, (যাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ এখনো দেশের কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন,) এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গাইন মহাশয়গণ এই বিদ্যালয়ের জন্য এ যাবত লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

শিক্ষিত সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই প্রায় সহর বাসী; সুতরাং পল্লীর বাড়ি ঘর গুলি জঙ্গলাবৃত ভগ্নাবস্থা। এমন দিনে কাহাকেও দেশের প্রতি আস্থাবান দেখিলে স্বভাবত আহ্লাদ হয়। গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি দেশের বাড়ি-সংস্কার করিয়া উপস্থিত দোল-উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণকে সমারোহ পূর্ব্বক ভুরি ভোজন করাইয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ধীরাজ বাবু বাড়ির নিকটস্থ পুরাতন আমগাছ গুলির মায়া কাটাইয়া অনেকটা জঙ্গল পরিস্কার করাইয়াছেন। যাঁহাদের নিস্ফল পুরাতন বাগানগুলি গ্রাম অন্ধকার করিয়া আছে, তাঁহারা যদি উহা কাটাইয়া নূতন ফলের এবং তরকারি বাগান করেন, তবে তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে এবং গ্রামের স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হইবার সম্ভব।

এবার গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী কয়েকটি প্রধান রাস্তায় আলোর ... রিয়া পথের অন্ধকার দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু এত অল্প আলোতে আলো আঁধার লাগা' নূতন আর একটি অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, আশা করা যায় এ অভাব ক্রমে দূর হইবে।

সম্প্রতি খাঁটুরানিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ আশের কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রক্ষিতের পুত্রের বিবাহ বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর ধনিগণ নিতান্ত নাবালক পুত্রের বিবাহ দেওয়া এবং তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করা যেমন একটি অতীব কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করেন, তৎপরিবর্ত্তে যদি পুত্রের শিক্ষা ... মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য দায়ীত্ব বোধ এবং অর্থ ব্যয় করিতেন তবে শীঘ্রই সমাজের উন্নতির আশা করা যাইত।

বিনিময়-প্রাপ্ত-পত্রিকাদি

এ বৎসর আমরা বিনিময়ে যে সকল পত্রিকাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিলাম। কিন্তু এতগুলি মাসিকের মধ্যে 'ভারতী', 'দেবালয়' এবং 'তত্ত্ব-বোধিনী' ভিন্ন মাসের প্রথম দিবসে আর কোনো খানি প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। এমন কি মাসের মধ্যেও সকল গুলি বাহির হয় না, কতকগুলি দুই তিন মাস পিছাইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলির সকল মাসের পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ বাংলা মাসিক গুলির এইরূপ অবস্থা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। সহযোগীবৃন্দ এ বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে ভালো হয়। তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিয়মিতরূপে কাগজ বাহির করিতে একেবারেই যে পারেন না, তাহা মনে হয় না। আবার অনেকগুলি দুই মাসের একত্রে বাহির হয়, আমাদের বিবেচনায় ইহাও অত্যন্ত অন্যায়; যখন নাম মাসিক, তখন মাসে একখানি বাহির করাই কর্ত্তব্য।

সপ্তাহিক

১। Unity and the minister, ২। বঙ্গবাসী, ৩। সঞ্জীবনী ৪। বসুমতী, ৫। সময়, ৬। এডুকেশন গেজেট, ৭। প্রসূন, ৮। মেদিনীপুর হিতৈষী, ৯। সঞ্জয়, ১০। ত্রিশূল, ১১।১২। ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদী, (পাক্ষিক)

মাসিক

১৩। ভারতী, ১৪। দেবালয়, ১৫। তত্ত্ব-বোধিনী, ১৬। সুপ্রভাত, ১৭। বঙ্গ-মহিলা, ১৮। অর্চ্চনা, ১৯। প্রকৃতি, ২০। প্রতিভা, ২১। মহাজন-বন্ধু,

ভূমি, ২৩। গৃহস্থ, ২৪। বামা-বোধিনী, ২৫। মুকুল, (ভাদ্র পর্য্যন্ত)
২৬। কোহিনুর, (আশ্বিন পর্য্যন্ত) ২৭। প্রতিবাসী, (অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
২৮। যমুনা, (কার্ত্তিক পর্য্যন্ত) ২৯। জাহ্নবী, শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত
৩০। তাম্বুলী-সমাজ ৩১। মাহিষ্য-সমাজ, ৩২। কায়স্থ-পত্রিকা, ৩৩। সমাজ
৩৪। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব, ৩৫। প্রচার, ৩৬। বিজয়া, ৩৭। যুবব
৩৮। তিলি-বান্ধব, (আশ্বিন পর্য্যন্ত) ৩৯। বিজ্ঞান, (জানুয়ারী) ৪০। সোপা
(পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন) ৪১। Calcutta University Magazine
৪২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

প্রাপ্তি-স্বীকার

১৩১৮ সাল—তৃতীয় বর্ষ "কুশদহ"র বার্ষিক চাঁদা, প্রত্যেক নামে প্রাপ্তি-স্বীকা[র] [করিতে] পৃষ্ঠায় অনেক স্থানের প্রয়োজন; এজন্য আমরা আহ্লাদের সহি[ত] [জান]াইতেছি যে, অধিকাংশ গ্রাহকের চাঁদা প্রাপ্ত হইয়াছি। অল্প সংখ্যক যাঁহাদে[র] [নি]কট বাকি আছে, আশা করি তাঁহারা আপন আপন দেয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করি[য়া] শীঘ্রই প্রদান করিবেন। যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহ[া]দের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (হাটখোলা) ১০৲, কানাইলাল সেন ৬৲, অশোকচ[ন্দ্র] রক্ষিত ২৲, নগেন্দ্রনাথ দে ৩৲, ললিতমোহন নাগ চৌধুরী ২৲, সুরেন্দ্রনা[থ] পাল ও খগেন্দ্রনাথ পাল ৪৲, নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, পঞ্চাননপা[ল] (কালিপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট) ২৲, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (আহিরীটোলা) ৮৲, নীরোদলা[ল] চট্টোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীমন্ত সেন ২৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত পতির[াম] চট্টোপাধ্যায় (কাশ্মীর) ৪৲, বিরজাপ্রসাদ রক্ষিত ২৲, শরৎচন্দ্র রক্ষিত ৪৲, যতী[ন্দ্র] নাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৲, ভূতেশ্বর শ্রীমানি এটর্ণি ২৲, চার্লস্ এস, প্যাটারসন্ (ক[লেজ] ষ্ট্রীট, Y. M. C. A. ২৲,) পি, এন, বোস স্কোয়্যার ৪ , শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র [ঘোষ] মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ২৲, কাজী আব্দাল গাফার ডাক্তার ২৲, প্রফেসার মুরলীধর ব[ন্দ্যো] পাধ্যায় এম-এ ২৲, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুর) ৬৲, কালী[...] গঙ্গোপাধ্যায় (গৈপুর) ২৲, স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ১৲, শ্রী[যুক্ত] কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় ২৲, গোষ্ঠবিহারী হালদার ২৲, বসন্তকুমার দত্ত[...] গিরিন্দ্রচন্দ্র রায় (যশোর) ৫৲, সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ৪৲, ডাক্তার সতীনাথ ব[ন্দ্যো] পাধ্যায় (চারঘাট) ৪৲, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শিবদাস কুণ্ডু ২৲,